ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী

DHURJATIPRASAD RACHANAVALI

FIRST VOLUME

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী

ভূমিকা
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং । কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৭

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং,
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩।
মুদ্রাকর : শ্রীসনাতন হাজরা, প্রভাবতী প্রেস,
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৬।
শ্রীদুলালচন্দ্র ঘোষ, নিউ লোকনাথ প্রেস,
৮/এ কাশী বোস লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬।

নিবেদন

শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরীর এক ব্যারিস্টার বন্ধু তাঁকে না কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বই তো ছাপাচ্ছেন কিন্তু পড়ে কে?' চৌধুরীর মশাই জবাব দিয়েছিলেন, 'দফতরি'। একটু অপ্রস্তুত হয়ে বন্ধু বললেন, 'তা কাটে?' স্বভাবসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, 'হুঁ, পোকায়'। 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক এবং চৌধুরী মশাইএর শিষ্য ধূর্জটিপ্রসাদের অতটা দুর্ভাগ্য না হলেও তাঁর লেখা বইগুলি অনেক দিনই দুষ্প্রাপ্য হয়ে আছে। তাঁর জীবিতকালে কেবল 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের আর সংলাপের আকারে 'আমরা ও তাঁহারা' প্রবন্ধগুচ্ছের একটি করে নতুন সংস্করণ বেরিয়েছিল। কিন্তু 'আবর্ত' ও 'মোহানা', বাকি দুই খণ্ড উপন্যাসের ও একমাত্র গল্পসংকলন 'রিয়ালিস্ট'-এর এবং তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধের বইগুলির আর পুনর্মুদ্রণ হয় নি। তার কারণ, বইগুলির কপি সুলভ ছিল না এবং প্রকাশক মহলেও উৎসাহের অভাব ছিল। কিন্তু আগ্রহী পাঠকসমাজ চেয়েছিলেন এবং অনুরোধও জানিয়েছিলেন যে ধূর্জটিপ্রসাদের অন্ততঃ উপন্যাসত্রয়ী একত্রভাবে প্রকাশ করা উচিত অযথা বিলম্ব না করে। আর তাঁর সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি তো বহু কাল পুনর্মুদ্রণের অভাবে দুর্লভ হয়ে আছে। শুধু তাঁর 'কথা ও সুর' বইটি প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আবার ছেপে বার করেছেন।

সাধারণ বুদ্ধিমান পাঠক যাঁরা ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্যিক কৃতিত্বের কথাই শুনেছেন অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসে তাঁর এক দিক নির্দেশক মৌলিক অবদানের কথা শুনেছেন, তাঁদের চাহিদাই ছিল বেশি। কারণ, তাঁর সাহিত্যকর্মের পরিচয় এযাবৎ অবহেলিত ও প্রায় বিস্মৃত হতে চলেছে। অবশ্য অধ্যাপক

অন্তঃশীলা

মা

তোমার কাছে আমি যে কতো ঋণী তা আমিই জানি। সে ঋণের পরিশোধ হয় না। তাই উৎসর্গকে স্বীকারোক্তি ভেবো।

ধুকু

১লা আষাঢ়

১৩৪২

যখন করোনার সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে রায় দিলেন, 'সাবিত্রী দেবী, খগেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী, ক্ষণিক উন্মাদনার বশে আত্মহত্যা করেছেন', তখন খগেনবাবু সব কথা সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হল না। সাহেব চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সময় সকলে দাঁড়িয়ে উঠলেন; কিন্তু খগেনবাবু চেয়ারে বসেই রয়েছেন দেখে উকিলবাবু তাঁর জামা ধরে টানলেন, খগেনবাবুর মুখ থেকে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে এল, 'ধন্যবাদ'। সাহেব দুঃখ জানিয়ে চলে যাবার পর উকিল মহাশয় তাঁকে বাইরে এনে ট্যাকসিতে তুলে দিলেন। গাড়ি ছাড়বার পূর্বে তিনি খগেনবাবুকে তাঁর একটি ছোট্ট প্রাপ্যের কথা লজ্জার সঙ্গে স্মরণ করাতে বাধ্য হলেন। পকেট থেকে একখানি নোট বার করে উকিলবাবুকে দেওয়াতে তিনি বল্লেন, 'ধন্যবাদ, চিরকাল আদর্শ নিয়ে থাকলে চলে না, খগেনবাবু, আমরাও যুবাবয়সে ঐ রকম ছিলাম। কী আর বলব, তবে যদি কখনও উপকারে আসি সত্যি কৃতজ্ঞ হব; ভুলবেন না, আমি ঐ কোনের চেয়ারেই বসি। লোকে যে যাই বলুকগে, আপনি তোয়াক্কা করবেন না; আমি অন্তত আপনাকে বুঝেছি, আমি উকিল, পুলিশকোর্টে দশ বছর ঘুরছি, মানুষ চিনতে আর বাকি নেই। মেয়েমানুষ হিংসেতে সব করতে পারে কিন্তু ছেলের মা হতে পারে না, এই দেখুন না, পাঁচ পাঁচটি মেয়ে! হ্যাঁ, এই নিন, রায়টা, নচেৎ মড়া ছাড়বে না।' গাড়ি ছুটল মেডিক্যাল কলেজের দিকে।

বৌবাজার ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর কোনে ট্রাফিক্ পুলিশ গাড়ি থামিয়ে দিলে। এঞ্জিনের ধক্ ধক্ শব্দ হতে লাগল। পাশে একটি রিকশ'র ওপর একজন স্থূলকায় ভদ্রলোক বসে ছিলেন। পায়ের কাছে একটা মস্ত মোট, খুব বড় সতরঞ্চি হবে। রিকশ্‌ওয়ালা হাঁফাচ্ছে, সারবন্দী গাড়ি, গড়ের মাঠের দিকে ছুটবে। দেরি দেখে রিকশ'র ভদ্রলোক আলাপ জমাতে গেলেন, 'এই যে, খগেনবাবু। আজ খেলা

দেখতে যাবেন না? আমি যাই না, কেবল ভিড় খাও আর পয়সা খরচ কর! ট্যাকসিতে বসে সিগারেট খাবেন না।' খগেনবাবু সিগারেটটা উলটে পাঁচ আঙুল দিয়ে ঢেকে রাখলেন। ফাঁক দিয়ে গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছিল, হাতটা ট্যাকসির বাইরে রাখলেন। কোথায় যেন এঁকে দেখেছেন মনে হল, হাঁ, হাঁ মনে পড়েছে— ভদ্রলোক বিবাহাদি শুভকার্যে বাড়ি সাজান; তাঁর শ্বশুর বাড়ির পরিচিত, তাঁরই বিবাহে প্যাণ্ডাল সাজিয়েছিলেন, বিবাহের পূর্বরাত্রে শামিয়ানা পুড়ে যায়, পরের দিন নতুন আসরের কোনে গোটাকয়েক পোড়া বাঁশ জড় করা ছিল মনে আছে। ভদ্রলোকের অত লোকসান হওয়াতে পরে মাথা খারাপ হয়ে যায়, বিকারের খেয়ালে 'আগুন, আগুন, সিগারেট', বলে চেঁচাতেন না কি! সামান্য সিগারেটে অত ক্ষতি। পুলিশম্যান বাঁশি বাজালে, ট্যাকসির মিটারে এর মধ্যে বার আনা উঠেছে। গাড়ি বেঁকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে এল। তাঁরও মাথা খারাপ হবে না কি! না, তাঁর কেন হবে? তিনি তিল মাত্র দোষ করেন নি।

সাবিত্রীর স্বভাবই ছিল তাই, সন্দেহ আর সন্দেহ। এধারে ভাল মানুষ ছিল, বিবাহের কয়েক বৎসর পর পর্যন্ত ত কোন গোলমাল হয়নি, তারপর; তারপর কোথা থেকে তার দল জুটল, একেবারে গলাগলি ভাব। মাসীমা প্রথম প্রথম আপত্তি করতেন, খগেনবাবুই বরঞ্চ বলতেন, 'কেন মাসীমা, রমলা দেবী রীতিমত শিক্ষিতা, তাঁর মত স্বাবলম্বী পুরুষে যদি হতে পারত!' মাসীমা বলতেন, 'শিক্ষার মুখে ছাই, শিক্ষা দিয়ে ভালবাসতে শেখে না, পরকে ভালবাসাতে শেখায়। মেয়েদের আবার স্বাবলম্বন! দেখিস্ তুই!' মাসীমা অল্প কথার মধ্যেই জ্ঞানের সঙ্গে ভবিষ্যদ্‌বাণী মিশিয়ে দিতেন। সেই মাসীমারও অপবাদ! তিনি কিনা তার বোনপোর সব দোষ ঢাকতেন, আর তাঁর কিনা নিজের বাড়ির বৌ-এর ওপর জাত ক্রোধ! কারণ কি? বোনপোর সঙ্গে দেওরঝির বিয়ে দিতে পারলে দুদিক থেকেই সুবিধে হত, রাজত্যি করতে পারতেন, সেটা হয় নি! ছি, ছি,— মাসীমার দোষ ছিল কেবল ছেলেকে পশুর মতন ভালবাসা, তাঁর স্নেহ ছিল অন্ধ। তাঁর, সাবিত্রীর বন্ধুদের মত উচ্চশিক্ষা ছিল না, ছিল হৃদয়। হৃদয়ের শিক্ষা তাঁর হয়েছিল, স্বাবলম্বী হওয়ার অবকাশ না পেয়েও, পরকে ভালবেসেই তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ। তিনি কেবল ভালবাসতেই জানতেন, প্রথমে ছেলেকে, ছেলে বই বোনপো কখনও ভাবেন নি, তারপর ছেলের বৌকে। তবে ছেলের বৌ-এর সে ভালবাসা পছন্দ হত না, তাই মাসীমা চুপ করেই ভালবাসতেন, সাবিত্রীর কোন কাজে বাধা দিতেন না, বৌ-এর সংক্রান্ত সব ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতেন, বিশেষ কৌশলের সঙ্গে। সেই মাসীমাকে শেষে কাশীবাসী হতে হল।

ও ধরনের স্ত্রীলোক লোপ পাচ্ছে, আজকাল সকলে স্বাধিকার প্রমত্ত, অথচ ক্ষমতা নেই। অন্তত সাবিত্রীর ছিলনা, রমলা দেবী না হলে তার এক পা চলত না। যার ধর্ম তারে সাজে অন্যেরে লাঠি বাজে। মাসীমার মত স্ত্রীলোক সযত্নে, স্ব-যত্নে, নিজেকে ভালবাসার সামগ্রী ক'রে তোলে না, নানাপ্রকার মনোহারী সাজসজ্জার দ্বারা। আর সাবিত্রী ও তার বন্ধুরা, রমলা দেবীও। দামী শাড়ি সেঁটে পরা, হাতকাটা ব্লাউস, ঢিলে খোঁপা, চোখে সুর্মা, পায়ে নাগ্‌রা, তাদের হৃদয় কোথায়? হৃদয় হয়ত আছে, তবে হিংসায় পোরা, মাৎসর্যে ভর্তি। এ শিক্ষার মুখে ছাই!

রমলা দেবী ছিলেন আধুনিক মহিলা। মাসিক-পত্রিকার মহিলা-প্রশস্তিতে বোধহয় তাঁর ফোটোও বেরিয়েছিল। এক কাপি ছিল সাবিত্রীর কাছে, কোনে বাঁকা ক'রে গোটা অক্ষরে লেখা ছিল, 'রমা'। ফোটো তোলবার সময় কায়দা করে দাঁড়ালে বিশ্রী দেখায় সকলকে, স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে। ছবিটাতে রমলা দেবীকে খুব বিশ্রী দেখায় নি— তবে, সাবিত্রীর জন্য বলতে হত খুব ভাল হয় নি। অবশ্য মতগোপনের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। সাবিত্রী চাইত খগেনবাবু তার বন্ধুর সঙ্গে মেশেন, ঠিক মেশেন না, অল্প মিশেই সুখ্যাতি ও তারিফ্‌ করেন, সাবিত্রীকে আরো বেশি ক'রে মিশতে দেন। কিন্তু রমলা দেবীকে তাঁর বিশেষ ভাললাগত না, খগেনবাবু বরাবরই বলে এসেছেন। পুরুষত্ব ও দম্ভের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই মনেই হত না যে রমলা দেবী স্ত্রীজাতি, সাবিত্রী-জাতির অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ জীব। রমলা দেবীর বিপক্ষে এক আকৃতি ছাড়া বোধ হয় অন্য আপত্তি তাঁর বিশেষ ছিল না। তাঁকে দেখলেই খগেনবাবুর বুদ্ধি জাগ্রত হত, কদমফুলের রোঁয়ার মত, কিন্তু সাজসজ্জা দেখে সে প্রবৃত্তি আবার নিবৃত্ত হত, মন তাঁর কুঁকড়ে যেত। সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করত, 'রমাদিকে দেখতে পার না কেন তুমি? আমার বন্ধু বলে, আমাকে ভালবাসে বলে?' খগেনবাবু উত্তর দিতেন, 'তোমার রমাদি স্ত্রীলোক নন পুরুষ, তাঁর দেহ ও মন বিপরীতধর্মী, ওঁর দেহগত কোন আকর্ষণ নেই আমার কাছে, ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব চলে, প্রেম চলে না, ওঁকে শ্রদ্ধা করা যায় দূরে থেকে, ওঁর জন্যে পাগল হওয়া যায় না।' 'তবু ভাল, শ্রদ্ধা করা যায় বলছ!' 'হয়ত যায়। ওঁর আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবটি মন্দ লাগে না, কিন্তু আধারের সঙ্গে আধেয়ের সম্বন্ধ নেই, সামঞ্জস্য নেই। ভগবান কী ভুলই করেছেন!' 'তোমার কাছে সবই ভুল, সবই উলটো পালটা!' 'আমার কাছে কেন? কাকে ওলট্‌ পালট বল? যেটি তোমার তৈরি, তোমারই, বাঞ্ছিত রীতি, তারই বিপরীত কাজকে কোন অধিকারে ওলট পালট বল? শারীরিক চিহ্নের জন্য মেয়েদের মেয়ে মানুষ বলতে হবে? আমি পুরুষ ও স্ত্রীর দেহগত

প্রভেদকে প্রধান করি না, চরিত্রগত প্রভেদকেই স্বীকার করি, কেউ বহির্মুখী, কেউ অন্তর্মুখী, কেউ কড়ি, কেউ কোমল, পুরুষ-স্ত্রীর গঠননির্বিশেষে। রমলা দেবীর চরিত্রে যে বস্তুটি পাই সেটি পুরুষের সহজ শক্তি, স্ত্রীসুলভ খামখেয়াল নয়, যেটি তোমাকে অত লোভনীয় ক'রে তুলেছে।' সাবিত্রী হেসেছিল, কী বুঝে কী জানে! হয়ত সাবিত্রী বুঝতেই পারেনি যে খগেনবাবু নিজের চরিত্রগত কোন অভাব রমলা দেবীর চরিত্রে পূরণ হয়েছিল সন্দেহ করেই তিনি রমলা দেবীকে পছন্দ করতেন না, রমলা দেবীর উপর রাগতেন। রমলা দেবী খগেনবাবুকে তাঁর অসম্পূর্ণতার কথা স্মরণ করিয়ে দিত, সাবিত্রী দিত দুর্বলতার কথা, সামাজিক কর্তব্যের কথা। আজ— একটি স্মারক-লিপি ধুয়ে পুঁছে গেল। রইল বাকি নিজের অসম্পূর্ণতা, আর আফশোষ, বনাম ঘৃণার জের, সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা। **Ambivalence** ভেঙ্গে যায় নাকি? পরমাণু বিভক্ত হলে যে শক্তি নির্গত হয় তাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চৌচির হয়ে যেতে পারে। ভাবতে ভয় হয়। পরিষ্কার ভাবে দেখাই অন্যায়; ঘোলাটে অবস্থাতেই সোয়াস্তি। ঘৃণা বরং ভাল, চিন্তার চেয়ে; ঘৃণা কত সহজ, সত্যকে স্পষ্টভাবে দেখা শক্ত।

ট্যাকসি মর্গের সামনে এল। ভাড়া চুকিয়ে খগেনবাবু নেমে পড়লেন। অঙ্গনে দুটি পাহারাওয়ালা, আর অনেকগুলি মোটর রয়েছে। সকলেরই কি এক দশা, এক ভাগ্য? গাড়ি নিশ্চয়ই ডাক্তারদের। একটি তার মধ্যে যেন পরিচিত। কিছুদিন পূর্বে ঐ ধরনের শেভ্রলে কিনলেন রমলা দেবী। সাবিত্রী নতুন গাড়ি চড়ে বেড়াতে গেল। বেড়িয়ে ফেরবার পর খগেনবাবু লক্ষ করেছিলেন তাঁর স্ত্রীর চোখে সুর্মা, গালে ও ঠোঁটে রং, পরনে লাল ডগ্‌ডগে শাড়ি, শাড়িটা নিশ্চয়ই রমলা দেবীর। একবার রমলা দেবী ঐ শাড়ি পরে কোলকাতা শহরে আগুন লাগাতে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সে রং ঢাক ফুলের রং-এর মত তীব্র; রমলা দেবীকে মন্দ দেখাচ্ছিল না। শীতের পর নির্জলা দেশের দিগন্তব্যাপী মাঠে খড়ের গাদায় আগুন লেগেছে, তারই একটি লেলিহান শিখা যেন মূর্তি নিয়েছে, শহরের মধ্যে, এইটুকুই অশোভনতা। খগেনবাবু ঘোর রং পছন্দ করতেন না, এবং সাবিত্রীর ঐ রকম সাজসজ্জার উগ্রতা তাঁকে পীড়া দিত। অযথা অনুকরণে সাবিত্রীর রুচিবিকার ঘটছে দেখে তিনি বরাবরই প্রতিবাদ করতেন, ফল হত না। এবার প্রতিবাদ করেছিলেন, রমলা দেবীর সম্মুখেই। সাবিত্রীর কাছে উত্তর পান, 'তোমরা যখন মাছরাঙ্গা পাখি সেজে টেনিস খেলতে যাও, তার বেলা?' খগেনবাবু উত্তর করেন, 'কৈ আমার ব্লেজার নেই তো'? জবাব পান, 'তোমার নেই বটে, কিন্তু তোমাদের থাকে, বিজনের দুটো তিনটে আছে। তুমি মিশুক নও, নিজের

খেয়াল নিয়েই থাক আপনভোলা শিবঠাকুর। যারা লোকজনের সঙ্গে মেশে তাদের প্লেজার থাকে। তুমি নিজের সম্বন্ধে কেয়ারলেস বলে আমিও তাই হব?' রমলা এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, বাঁকা হাসি হেসে বলেন,'আপনি সত্যিই সাবিত্রীকে ভালবাসেন, নিজের মত ক'রে গড়তে চান।' রমলা দেবীর হাসিমুখের মন্তব্যকে শ্লেষ ভেবে খগেনবাবু চুপ ক'রে যান, সাবিত্রীর ইঙ্গিতে রমলা দেবীকে বাড়িতে পদার্পণ করতে অনুরোধ করেন, রমলা দেবী গাড়ি থেকে নামেননি। সে রাত্রি কত মান অভিমানের পালা হল। আজ রমলা দেবী মোটর চড়ে এসেছেন তাঁর মৃত বন্ধুর দেহের প্রতি সম্মানজ্ঞাপন করতে, খৃস্টান হলে যেমন মালা নিয়ে যেতেন গোরস্থানে। পরনে সাদা শাড়ি, কালো শাড়ি পরলেই মানাতো। এ দুদিন খুবই করেছেন অবশ্য, কিন্তু আজ এখান পর্যন্ত ধাওয়া করা উচিত হয়নি। আজ সাবিত্রীর সঙ্গে খগেনবাবুর অনেক কথা কইবার প্রয়োজন ছিল। আজ ভেবে-ছিলেন তিনি অনেক প্রাণের কথা কইবেন, মনে মনে তার সঙ্গে, কিন্তু গাড়িটা দেখেই তাঁর মন কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল। আজ ওঁর আসবার দরকার ছিল না, আসাটা তাঁর অন্যায় হয়েছে। সাবিত্রীর বন্ধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিলেন আজও কি তাকে অপসৃত করার সুযোগ মিলবে না! ব্যবধান! ব্যবধান আবার কি? সবই একটানা স্রোত। কার মধ্যে ব্যবধান? কে সরায়? রমলা দেবী ব্যবধান এনেছিলেন, না, সাবিত্রী আত্মহত্যা ক'রে খগেনবাবু ও তাঁর জগতের মধ্যের ব্যবধানটি সরিয়ে দিলে? এইবার তিনি পরিষ্কার দৃষ্টিতে সব বুঝতে পারবেন।

মর্গের মধ্যে কনকনে হাওয়া। চারধারে কাচের আলমারি, সর্বত্র সাদা পাথরের টেবিল, পায়াগুলো পর্যন্ত সাদা; একটার চারপাশে ডাক্তার ও ছাত্রের দল, সাদা ওভারঅল পরা, ডাক্তারের হাতে সাদা রবারের দস্তানা, ছাত্রদের মুখে একত্রে ব্যস্ততা ও অতিরিক্ত গাম্ভীর্য; সব মুখ বুজে কাজ করছে। ডাক্তার সাহেব খগেনবাবুকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। করোনারের রায় দেখে ডাক্তারসাহেব অ্যাসিস্টাণ্টকে বল্লেন, 'মল্লিক পাঁচ নম্বরের লাশ খালাস হল, ছেলেদের তাহলে ছুটি, আবার এলে দেখা যাবে।' হাতঘড়ির দিকে চেয়ে ডাক্তার সাহেব দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন। পাশের একটা গা-আলমারি থেকে ডালা বেরিয়ে এল, পা দুটো হলদে, বাকি অঙ্গ সাদা কাপড়ে ঢাকা, পায়ে সেই ছেলে বয়সে গরম দুধ পড়ে যাওয়ার দাগ। একজন সিনিয়ার ছাত্র এগিয়ে এসে বল্লেন, 'লোকজন এনেছেন, না আমাদের সমিতিকে খবর দেব? পাঁচ টাকা চাঁদা দিলেই হবে।' পিছন থেকে একজন মহিলা—রমলা দেবী এগিয়ে এসে বল্লেন, 'না, প্রয়োজন নেই আপনি গাড়িটা নিয়ে আত্মীয়স্বজনকে ডেকে আনুন।

চলুন, আমিই না হয় হয় যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।' 'না আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমি একলাই নিয়ে আসছি!' খগেনবাবুর সঙ্গে রমলা দেবী এলেন বাইরে। 'লোকজন কোথায় পাবেন?' 'লোকজন, আচ্ছা, কজন চাই? আমার সব বন্ধুরা, কিন্তু—' 'তাদের খবর পরে দিলেই হবে, পরে তাঁরা খবর পেলেই চলবে, আমার সঙ্গে আসুন।' রমলা দেবীর মুখের দিকে চেয়ে খগেনবাবু আপত্তি করলেন না; লোকই বা তিনি কোথায় পাবেন? বাইরে এসে খগেনবাবু গাড়িতে উঠলেন, সামনের সীটে নয়, রমলা দেবীর পাশে।

কী রকম অস্বস্তি হচ্ছিল, অথচ মজার, পরিহাসের। তিনি একবার সাবিত্রীর অপরিচিতা এক বন্ধুপত্নীকে বায়স্কোপ দেখাতে নিয়ে যান, ট্যাকসিতে যখন তাঁকে নিয়ে ফিরছেন তখন সাবিত্রীর একজন বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়! সেই সামান্য ঘটনা থেকে কত না গণ্ডগোল হল; সাবিত্রী বলেছিল, 'কৈ, কোন সমাজে কোন পুরুষ অন্যের স্ত্রীকে স্বামীর অবর্তমানে থিয়েটার বায়স্কোপ পাশে বসিয়ে দেখাতে নিয়ে যায়?' সাবিত্রীর ভিন্ন-সমাজ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখে খগেনবাবু চমৎকৃত হন, চুপ করেই থাকেন! খগেনবাবু বিলেত ফেরৎ ছিলেন না, বিদেশী-সমাজ সম্বন্ধে তাঁর পরোক্ষ অভিজ্ঞতা নভেল নাটক থেকেই আহৃত! হয়তো সাবিত্রী রমলা দেবীর কাছ থেকেই শিখেছিল! রমলা দেবী উচ্চ শিক্ষিতা, বিলেত ফেরৎ সমাজে তাঁর অবাধ গতিবিধি, রুচিও তাঁর মার্জিত হয়েছিল, বোধ হয় জেন অস্টেন পড়ে। আজ সেই রমলা দেবীর পাশে বসে চলেছেন, তবে বায়স্কোপ দেখতে নয়, শবযাত্রার যোগাড় করতে। আনন্দ উপভোগের নিয়ম থেকে নিরানন্দ উৎসবের রীতি একটু ভিন্ন হবে বৈ কী!

গাড়ির এক কোনে খগেনবাবু আলগোছে বসে রইলেন, দৃষ্টি তাঁর রাস্তার দিকে। পূর্ববঙ্গীয়দের জামা-কাপড়ের দোকান অতিক্রম করে গাড়ি মির্জাপুরের এক গলিতে প্রবেশ করল। মোড়ের মাথায় একটি গান্ধীটুপিপরা ছেলে আনন্দ-বাজার বিক্রি করছিল। সকালের কাগজ পরা হয় নি। কেনবার ইচ্ছা থাকলেও তাঁর সাহস ছিল না, পাছে নিজের খবর নিজেকে পড়তে হয়। রমলা দেবী নিজের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন, খগেনবাবু নামলেন না। খানিক পরে, রমলা দেবীর ফিরতে দেরি হবে ভেবে, তিনি মোড়ের ওপর এক চায়ের দোকানে এক কাপ চা তাড়াতাড়ি তৈরি করতে অর্ডার দেবার জন্য নামলেন। পাছে চা-এর নেশা রমলা দেবীর কাছে এই সময় বিসদৃশ ঠেকে এই লজ্জায় ডিশে ঢেলে অল্প সময়ের মধ্যেই চা-এর বাটি নিঃশেষ করলেন; একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়ির দিকে অগ্রসর হতেই দেখলেন জনকয়েক সুদর্শন যুবক নেটের গেঞ্জি পরে কাঁধে টার্কিশ তোয়ালে ফেলে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে; নিমন্ত্রণ বাড়ির মেয়ে

খাওয়ানর দিন তেতলায় ছাদের কোনে কর্মের অপেক্ষায় যেমন তারা দাঁড়িয়ে থাকে। বেচারারা ম্যাচ দেখতে যেতে পায় নি। রমলা দেবী একজনকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন, 'বিজন, সুজন কোথায় গেল ?' 'সুজনদা খাট নিয়ে আসছে।' রমলা দেবী ভেতর থেকে একটা ফরসা তোয়ালে জড়ান ধুতি এনে বিজনের হাতে দিলেন। একটি ছেলে, সুজন, মুটের মাথায় করে একটা খাট নিয়ে এল। হাল্‌কা জারুল কাঠ, দড়িগুলোর মধ্যে বড় ফাঁক ফাঁক। রমলা দেবী বল্লেন, 'আচ্ছা, সুজন, আর দেরি ক'রো না, খগেনবাবুর শরীর ভাল নয়। ওঁকে এখানেই নিয়ে এস।' 'বিজন তুমি বাড়ি যাও', 'যাচ্ছি, সুজনদা। তোমার কাছে থাকি রমাদি,' 'থাক', 'বিমল তুমি গাড়িতে ওঠ।'

গাড়িতে চারজন যুবক উঠলেন। ছাড়বার সময় রমলা দেবী। বিমলের হাতে কী একটা দিলেন। সুজন ও অন্য তিন জন খাট নিয়ে হেঁটে চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ি মর্গের দরজায় উপস্থিত হল। বিমল গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল, শেষে খগেনবাবু নামলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লেন, 'করোনারের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে আপনারাই বার করুন না?' 'আগে খাট আসুক', 'ততক্ষণ ?' 'এখনি এসে পড়বে; ততক্ষণ আর কী করা যায়, কলেজের রেস্তরাঁতে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, আপনিও আসুন, কিছু খেয়ে নিন, ভাল খাবার দেয়, ভেজাল দেবার জো নেই; এটা বেলগেছেও নয়, বাজারও নয়।' খগেনবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন 'বেশ তো বেশ তো চলুন না।' নিজের অজানিতে পকেটে হাত দিচ্ছেন দেখে একজন যুবক বল্লেন 'আপনি থাকুন আপনার শরীর খারাপ আমরা এখন আসছি।' 'ছেড়ে যাওয়াও উচিত হবে না বোধহয়' বলে খগেন-বাবু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

যুবকবৃন্দ চলে গেলে খগেনবাবু আজ এই প্রথম একলা হলেন। একলা তিনি মনে মনে বহুদিনই হয়েছিলেন। হয়ত, জন্মেছিলেন ভীষণ একলা হয়ে, যমজ আত্মার একটি হয়ে নয়। মনে কেউ যমজ হয় না, দেহেই হয়। কবিরা কী ভীষণ মিথ্যাকথাই না লিখতে পারেন। সেই মিথ্যাকথার জন্য কত লোকের সর্বনাশ হয়েছে যদি তাঁরা জানতেন, তা হলে তাঁরা……কী লেখা ছেড়ে দিতেন ? কখনই নয়। তাঁরা নিতান্ত অ-সামাজিক, সমাজের কল্যাণ-কামনায় তাঁরা বিনিদ্র নন। কেবল সমাজের কাছে সুখ্যাতি প্রশংসা করেন, এইটুকু তাঁদের দোষ। মানুষ হল একলা, সজারুর মত সে থাকে গর্তের মধ্যে; গর্তের মুখে কত পাতা কত কুটো দিয়ে সে নানা রকমের বাধা সৃষ্টি করছে, শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে। গর্তের মধ্যে সজারু থাকে শঙ্কিত চিত্তে, বাইরের হাওয়া প্রবেশ করল, ভেতরে সে ভয়ে কাঁপতে লাগল, ঐ বুঝি এল! এক নিঝুম গোধূলিতে সে

বেরিয়ে পড়ল খাদ্যের অনুসন্ধানে, বাইরে এসে তার পা আর চলে না, গর্তের মুখের কাছে এসে আর এগোতে চায় না, ছুটোছুটি করে ; কোথা থেকে ঝমর্ ঝমর্ শব্দ আসছে! আবার ভিতরে ছুটে যাওয়া, আবার— আবার ভয়ে বাইরে আসা, ক্ষুধার তাড়নায়। সেই বাইরে আসতেই হয়, সেই ঝমর্ ঝমর্ শব্দ সারাদেহ বেষ্টন ক'রে বাজতে থাকে, বাগানের কাঁটাবেড়ার কোন এক ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করতে হয়, মূল উপড়ে খেতেই হয়। কপালগুণে ফিরে আসে নিজ আবাসে, সেখানে সেই অন্ধকারের মধ্যে অন্তরীণ-বাস ; কপালদোষে আর ফিরে আসতে হয় না, বাগানের মালী কলাগাছের তেড়্ ছুঁড়ে তাকে মারে, কাঁটা গুটিয়ে নেবার পূর্বেই আটকে যায়, পালান তখন অসম্ভব, তখন আবার সেই অন্ধকার! এই-ত প্রকৃতির নিয়ম, এই বোধহয় জীবন! মানুষের, বুদ্ধিমান মানুষের প্রকৃতিও এই নিয়মে আবদ্ধ, পার্থক্য শুধু মালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব-স্থাপনের আত্ম-প্রবঞ্চনায়, পার্থক্য কেবল কাঁটার ওপর সামাজিকতার নরম আভরণে। মাতৃগর্ভে অন্ধকার, কবরের মধ্যে অন্ধকার ; মানুষ সীতার সন্তান, সীতাই হলেন আদিম মানবমাতা। অথচ, এই অন্ধকারের মধ্যে এক সহযাত্রী জুটল। নিজেই পথ পায় না আবার পথ দেখাতে হবে অন্যকে ; সে আবার অন্য পথ খুঁজতে ব্যগ্র নয়, কেবল নিছক নির্ভরশীলা, অর্থাৎ পথের কণ্টক। নিজেই গুহার মধ্যে ভয়েতে কাঁপছে, প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত হচ্ছে, তার উপর এই গুহাবাসিনী, অন্ধকার-ধর্মিনীর দেহ, মন ও আত্মার কল্যাণ-কামনা করা! তাও যদি মন কিংবা আত্মা রয়েছে প্রমাণ পাওয়া যেত! আপনি খেতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাক! তাও ডাকা যেত যদি তার অস্তিত্বেই শঙ্করীর ভয় দূর হত। কেবল অস্তিত্বে হবে না, উপস্থিতি, হাজরি চাই, তারও বেশি, সান্নিধ্য। মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, সে আবার পরের ভাবনা ভাববে! কী ভীষণভাবে মানুষ ব্যস্ত! সঙ্গিনীর পরিতোষবিধানের জন্য নয়, আরো আদিম, আরো দুর্নিবার যে প্রবৃত্তি সেই ভীতি দূর করতেই সে গুহার গায়ে ছবি আঁকছে, সেই দুরন্ত প্রকৃতির পরিতোষবিধান করতে তার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করছে ; সে আবার পরের তৃপ্তিসাধন করবে কখন ও কতটুকু? পারে না, শক্তির সীমা আছে সেইজন্যই পারে না, আর নিন্দে হয়, নিন্দে হয় জনসাধারণের কাছে। তাঁরা থাকেন হয়ত গুহার বাইরে, গাছের ডালপালায়, অন্যান্য সামাজিক জীবজন্তুর মতন ; কিংবা থাকেন ফলের রসশোষণ করবার জন্য, ভেতরটা ভুয়ো, ফুলে ফুলে মধু খেতেই ব্যস্ত। এঁদের উপদেশেই সাবিত্রী গুটি কেটে প্রজাপতি হয়েছিল। তাইত এই অঘটন ঘটল। সাবিত্রী স্বধর্মেই যদি আত্মনিধন করত তা হলে কোন আপত্তি ছিল না। পিন-এ আটকান মরা প্রজাপতি হওয়ার চেয়ে মরা গুটি হয়ে রেশমের যোগান দেওয়া ঢের বেশি সামাজিক কাজ।

খাট এল, শব নামান হল, খগেনবাবুকে শবের কপালে সিঁদুর পরাতে হল, সরু ক'রে পরাতে পারলেন না। মুখটা নীল, পা হলদে, পায়ের শিরগুলো নীল হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। কী ঠাণ্ডা! এক বিঘৎ ওপর থেকেই ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। সুজন নিজেই পায়ে আলতা পরিয়ে দিলে। এরা সব শিখলে কোথা থেকে? উল্‌টো মুখ ক'রে খাটে চড়ান হল। রঙিন বিস্রস্ত শাড়ির ওপর সুজন একটি খদ্দরের চাদর বিছিয়ে দিলে। ভৌতিক ক্রীড়ার মতন যেন সব আপনা থেকেই হয়ে যাচ্ছিল। রমলা দেবীর আত্মীয়স্বজন সব তাঁরই মত কর্মতৎপর। খাটটা কাঁধে তোলবার সময় মুণ্ডুটা নড়নড় ক'রে উঠল। একজন বাহক বলে উঠলেন, 'দোহাই মা জেগে উঠবেন না।' অগ্রবর্তী বাহকদের মধ্যে একজন ধমক দিলেন, 'কী ইয়ারকি কচ্ছিস্! সিগারেট নে— হরিবোল বলতে নেই জানিস তো।' খগেনবাবু কাঁধ দেন নি, তাই তাড়াতাড়ি দোকান থেকে একটিন সিগারেট কিনতে গেলেন। সুজন সঙ্গে গেল, নিজেই টিন কিনলে। কী রকম অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, যেন গলাটা বন্ধ হয়ে আসছে। রসিকতা না করলেই চলত! হরিবোলে আপত্তি কি? হরিবোলের আওয়াজটা যে মধুর তাও নয়, শুনলে ছেলেবেলা লেপমুড়ি দিতেন, বড় হবার সঙ্গে সে ভয়টা যায় নি, মনে হত নীচু জাতেই হরিনাম নেয়, নামকীর্তন করে, ভদ্রলোক হয় শাক্ত, না হয় বৈদান্তিক, হয় ব্রাহ্ম, না হয় অবিশ্বাসী। কিন্তু হরিবোল বলতে নেই— এ যেন মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে! যারা আত্মহত্যা করে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সেই জন্য বোধহয় ঈশ্বর-বিশ্বাসী শববাহীরা তাদের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করেন না। বিশ্বাসীদের ঈশ্বর বড়ই ছোট, প্রতিহিংসাপরায়ণ। নেটের গেঞ্জি, কাঁধের তোয়ালে, কেশের পশ্চাদ্‌ভিমুখিনতা লক্ষ করলে মনেও হয় না যে এরা সকলেই বিশ্বাসী। এ যুগে কেই বা বিশ্বাসী? বিশ্বাসী কেউ হতে পারে না, বিশ্বাস বড় বোঝা। কাঁধ কী তাঁকে দিতেই হবে? না দিলে বড় খারাপ দেখায়। দায় তাঁর, এদের নয়। না দিলে অশোভন দেখায়, রমলা দেবীর কানে উঠবে, নিশ্চয়ই বিদ্রূপ করবেন তাঁকে নিয়ে, গোপনে এঁদের কাছে। জীবিত অবস্থায় স্ত্রীবহন, আবার মৃতস্ত্রীর শববহন, দুই কাজই কী রমলা দেবীর ইচ্ছায় করতে হবে না কি? সুজনের হাত থেকে টিনটা নিয়ে, খুলে, দ্রুতপায়ে, এক রকম ছুটতে ছুটতেই খগেনবাবু শবযাত্রীদেয় নাগাল ধরলেন। কর্তব্য বোধে তাঁদের সাহায্য করতে গেলেন, কাঁধ দিলেন, কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল, কাঁধে ব্যাথা উঠল; খাটটা ক্যাঁচ্ কোঁচ্ করছিল, ভয় হল এই বুঝি তাঁরই দোষে ভেঙ্গে পড়বে রাস্তার ওপর। কাতরভাবে চাইতেই সুজন এগিয়ে এল, 'আপনার কষ্ট হচ্ছে?' 'না, কষ্ট আর কি?' 'আপনি ছেড়ে দিন।' খগেন-

বাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সুজনের মুখের হাসিটা বিদ্রূপের? না, স্বাভাবিক। পা-এর তলা জ্বালা করছিল, রাস্তার কলে হাত পা ও মুখ ধুয়ে নিলেন। বিডন স্ট্রীট দিয়ে চিৎপুর পার হয়ে নিমতলায় পড়লেন। এই রাস্তাটুকুর মধ্যে কী একটা রহস্য আছে, ডাক্তারের বাড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে কাঠের দোকান, মালসার দোকান পর্যন্ত সবই আছে এখানে, প্রত্যেক জিনিষটাই যেন শেষ মুহূর্তকে এগিয়ে আনছে। এ রাস্তায় বুড়োবুড়ি ভিন্ন অন্যলোক সহজে চোখে পড়ে না, বাকি সব হিন্দুস্থানী, মুস্কো মুস্কো দুষমনের মত চেহারা, বোধহয় চ্যারণের বংশধর মাঝিমাল্লা না হয়ে চিতের চালাকাঠ কাটে। নিমতলার ঘাটের এক অদ্ভুত ব্যস্ততা। আলো সতেজ জ্বলছে, কিন্তু গঙ্গাবক্ষের অন্ধকারে যেন আঘাত পেয়ে ফিরে আসছে; লোকজন শ্রমাবসানের আগেই শ্রান্তির আশায় যেন ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু শ্রান্তির সম্মুখীন হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই প্রত্যাখ্যানের খবর কেউ পায় না— না পাওয়ার নামই আশা। মুটে মজুর ছুটির আধঘণ্টা পূর্বে ভূতের মত খাটে, ক্ষিপ্র হয়, তার পর বাঁশি বাজল, আর মোড়ে মোড়ে তাড়ির দোকানে প্রবেশ! চমৎকার! তাড়ি না হলে চলেই না তাদের। কিন্তু জীবনটাকে যারা কলে পরিণত করে না, যাদের শক্তির অবশিষ্ট কিছু থাকে, তারা বরাবর বাড়ি চলে যায়, স্ত্রীপুত্রের কাছে। সেখানে শক্তি নিঃসাড়ে নিঃশেষিত হয়·······সুজন ছেলেটি হাঁফাচ্ছে না।··· ··· ছুটছে······ নড়ছে··· ···ঘাট এসেছে! ঘাট নামিয়ে সুজন কনেস্টবলের সঙ্গে আফিসের দিকে গেল, খগেনবাবুর কাছে করোনারের রায়টি চেয়ে নিয়ে। অন্যান্য যুবকেরা খাট ছুঁয়ে বসে থাকতে তাঁকে অনুরোধ ক'রে একে একে অদৃশ্য হলেন। খগেনবাবু গোটাকয়েক সিগারেট রেখে টিনটা তাঁদের হাতে দিলেন।

শবের মুখে পাংশুতা ভেদ ক'রে কমনীয়তা ফুটে উঠেছে। মুখের এই কমনীয়তা ছিল সাবিত্রীর প্রধান আকর্ষণ। এই শান্ত ও গম্ভীর মধুরিমায় সকলে মুগ্ধ হতেন। ব্রাহ্মরা বলতেন, 'কী মিষ্টি', গিন্নীরা বলতেন 'কচিকচি', পুরুষরা বলতেন 'লাবণ্য'। খগেনবাবুর খরদৃষ্টিতে সাবিত্রীর যে প্রকৃতিটা ধরা পড়েছিল সেটি রূপে বিশুদ্ধ লাবণ্যময়ী ছিল না, তার ধাতু ছিল খানিকটা লোহা, খানিকটা সর্বসাধারণের সন্তোষবিধানের জন্য প্রচেষ্টার খাদ। এবং সে রূপের ওপর পড়েছিল অন্যের প্রকৃতির ছাপ, অর্থাৎ অনুকরণ। মুখের ওপর, বিশেষত চোখে, একটা ভয়ের চিহ্ন থকত, সেটা লক্ষ করে সাবিত্রীকে ক'বে কে একবার 'বনের হরিণ' বলেছিল, সাবিত্রীর মুখেই শুনেছিলেন। আজ সেটা পরিস্ফুট হয়েছে, ঠিক যেন মরা হরিণ। কিসের ভয়? হরিণের, আদুরে পোষা খরগোসের সন্দিগ্ধচিত্ততার, না মৃত্যুর মতন সত্যের সামনা-সামনি দাঁড়াবার? ভয়ে যেন সব ঢিলে হয়ে

গিয়েছে। হাতের চুড়িটা ঢল্‌ঢলে হয়েছে, গলার হারটা উলটে গিয়েছে। একদিন না খেলেই রোগা হয়ে যেত, বেচারি দুদিন খায়নি। খগেনবাবু ধীরে ধীরে হারটা গুছিয়ে সোজা ক'রে দিলেন। এই হার নিয়ে একবার দীর্ঘ অভিমানের পালা হয় তাদের মধ্যে। সাবিত্রী বলেছিল, 'আমি হারটা পরলে সকলে বলে সুন্দর দেখাচ্ছে, তুমি তো মুখ ফুটে একবারও ভাল দেখাচ্ছে বল না,' খগেনবাবু উত্তর করেন, 'তোমাকে না প'রেই ভাল দেখায় কিনা, তাই বলিনা।' সাবিত্রী হঠাৎ রাগ ক'রে হারটা গলা থেকে টেনে খুলে ফেলে, আটকাবার পিনটা খারাপ হয়ে যায়, খগেনবাবু সারিয়ে দেবার জন্য পরের দিন নিজেই স্যাকরা ডাকেন। বাড়িতে স্যাকড়া এলে শোনেন, গহনাটা রমলা দেবীর নিজের পরিচিত ও আশ্রিত অন্য এক দোকানে ইতিমধ্যে নিজেই দিয়ে এসেছেন। খগেনবাবু অভিমানের ভান করেন ; উত্তরে সাবিত্রীর মুখ থেকে এক অদ্ভুত জবাব পান, 'পরের বৌ-এর গয়না ভেঙ্গে গেলে সারিয়ে দাওগে যাও, নতুন গয়না গড়িয়ে দাওগে, আমার জন্য কোন কষ্ট করতে হবেনা'। খগেনবাবুর এক বন্ধুপত্নীর কোন এক গহনা খারাপ হয়ে যায়, পথে স্যাকরা-বাড়ি পড়ে, তাই গহনাটা স্যাকরা-বাড়ি পৌঁছে দেন, স্যাকরাটি রমলা দেবীরই আশ্রিত লোক। কথা বেশ হেঁটে বেড়ায়। ঘটনাটি মনে পড়তেই খগেনবাবু উঠে পড়লেন। পাশে একটি লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছে। সুজনবাবু কোথায় গেলেন ? খগেনবাবু সাবিত্রীর মুখ আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন। আচ্ছা ভদ্রলোক তো! এই সমাজে মেয়েদের মুখ খুলে নিমতলায় নিয়ে যাবার উপায় নেই....। লোকটার ঠোঁট ভীষণ পুরু, হাতে পানের বোঁটায় চুন, চোখের কোল মিশকালা, খুব লম্বা কালো চুলের গোছা একটি চোখের ওপর এসে পড়েছে, বাকি চোখে জ্যোতি নেই। সব যেন তার ঘুমন্ত। কি দেখছে ? অসভ্য ছোকড়া। খগেনবাবু তার চোখের দিকে একদৃষ্টে চাইতে সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। খগেনবাবু আবার বসলেন, খাটের এক কোনে, সাবিত্রীর মুখ আড়াল ক'রে। ভয় হল খাট ভেঙ্গে যাবে, নেমে উবু হয়ে মাটিতে বসলেন, খাট ছুঁতে ভুলে গেলেন। মনে হল লোকটি আর নেই সেখানে, দেখার প্রবৃত্তি ছিল না। নিশ্চয় কোকেন খায়, ভদ্রলোকের ছেলে, তাই অত শঙ্কিত দৃষ্টি, শ্মশানচারীর মত খরদৃষ্টি নয়। সাবিত্রীরও ঐ রকম শঙ্কিত দৃষ্টি কখনও কখনও তিনি লক্ষ করেছেন —কেন কে জানে ? তাকে যেন কে যাদু করেছিল। পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা কত বশীকরণ মন্ত্রতন্ত্র জানে, কিন্তু সে তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ছিল না, পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের ঘৃণাই করতো, তার বন্ধুদের মধ্যে সকলেই প্রায় শহুরে, হাল ফ্যাশানের ও এদেশের উচ্চশিক্ষিতা, অর্থাৎ অর্ধশিক্ষিতা। কী আশ্চর্য ! সাবিত্রী বেশিদূর পর্যন্ত স্কুলে পড়েনি, তবু সে সকলের প্রিয়পাত্র ছিল। একজন খগেনবাবুকে

মুখের ওপরই বলেছিলে, 'আপনি পাসেরই কদর করেন, কিন্তু দেখুন দেখি সাবিত্রীকে, কলেজে পড়েনি দেখলে বোঝা যায় ?' খগেনবাবু উত্তর দেন, 'সবই আপনাদের আশীর্বাদে।' সাবিত্রীর বন্ধুরা বুঝতেই পারতেন না কখন খগেনবাবু কী ভাবে কথা বলছেন, সেই জন্য তাঁরা খগেনবাবুকে সাবিত্রীর সামনে বিদ্বান, অতিশয় বুদ্ধিমান, আদর্শবাদী ব'লে সুখ্যাতি করতেন, এবং দূরে সরে যেতেন। সেই রাত্রে খগেনবাবু সাবিত্রীকে বলেন, 'তোমাকে ওঁরা অমন পেট্রনাইজ করেন সহ্য কর কেমন ক'রে ? নিজেরা বেশ পাসটাস ক'রে কাজ গুছিয়ে নিয়ে অন্যের প্রতি, যারা পাস করেনি তাদের ওপর অনুকম্পা সকলেই দেখাতে পারে। নিজেদের জন্য পয়সা, প্রতিপত্তি, অধিকার, আর গরীব মজুরদের জন্য গির্জা ও ধর্মের সান্ত্বনা, সতী সাবিত্রীর তুলনা, আমার ভারী রাগ হয়।' সাবিত্রী রাগটাকে হিংসাই বলেছিল। খগেনবাবু নামে আপত্তি জানান, সে আপত্তি নামঞ্জুর হয়। পূর্ব হতেই তিনি অন্য দুএকটি ঐ রকম গুণের অধিকারী বলে সুনাম অর্জন করেছিলেন, তাই বোঝার ওপর শাকের আঁটি তাঁর লঘুভার মনে হয়েছিল। মৃদুস্বরে কেবল বলেছিলেন, 'হিংসে কার আছে আর নেই ভগবান জানেন।'

সেই সাবিত্রী আজ হলদে হ'য়ে খাটের ওপর শুয়ে নিমতলার ঘাটে প'ড়ে রয়েছে তার কারণও হিংসে। ব্যাপার কি ? সামান্য, অন্তত সামান্য ক'রে নেওয়া চলতো। খগেনবাবুর এক সম্পর্কে ছোট বোন বেড়াতে এল কোলকাতায়, সাবিত্রীরই সখী, সেই তাকে তার পাড়াগেঁয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিল। নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে বলে সেই শেষে আফ্‌শোষ করেছে। খগেনবাবু গান ভালবাসতেন, মেয়েটির গলা ছিল ভারী মিষ্টি, যদিও গান শেখেনি, পাড়াগেঁয়ে বাংলা গান গাইতো, অল্পদিনের মধ্যে সাবিত্রীর বন্ধুদের কাছে নতুন নতুন বাংলা গজল ও ঠুংরি শিখে তাদের চাইতে ভাল গাইত। সাবিত্রী নিজে গান গাইতে জানত না, তার দলের কেউই জানতো না, চেষ্টা করতেন সকলে। রমলা দেবীর বিফল প্রয়াসকে সাবিত্রী চরম সার্থকতা বিবেচনা করতো, খগেনবাবু করতেন না। ফলে রমলা দেবী তাঁর সামনে গাইতে চাইতেন না, এবং তাঁর বোনের আওয়াজ উঠেছিল ভীষণ নাকি, আর তাল ছন্নছাড়া। সকলেই সমজদার, নির্মম সমালোচক ! সে সব কথা স্মরণ না করাই ভাল। স্ত্রীর সামনে স্ত্রীকণ্ঠের যথার্থ সমালোচনা অসম্ভব, দলের স্বার্থে, ভেস্‌টেড ইন্‌টারেস্টে ঘা লাগে, আর না হয় অন্য ব্যাখ্যা হয়। উবু হয়ে বসে বসে খগেনবাবুর পা টনটন, শিরদাঁড়া ব্যথা করছিল ; কাঁধ আড়ষ্ট, সমস্ত দেহ ক্লান্ত, উঠে দাঁড়িয়ে নিজের হাতেই কাঁধ টিপতে আরম্ভ করলেন। কোলকাতা শহরেও কাঠ, ঘি, পুরুত যোগাড় করতে এত দেরি কেন ? শহর হলেও এই দেশের শহর, সব গজগমনে চলে। প্রায়শ্চিত্ত

করলে পুনর্জন্ম হয় না, সাবিত্রী যেন বাঙালী হিন্দু পরিবারে না জন্মায় আর। তাঁকে বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সেটা শ্রাদ্ধের সময় করলেই হবে। নাঃ, তিনি করবেন না। শ্রাদ্ধ তিনি করবেন না, শ্রদ্ধা নেই তার আর শ্রাদ্ধ কী? এ দেশে এ সমাজে, এ যুগে শ্রাদ্ধ অচল, চল হওয়া উচিত প্রায়শ্চিত্তের, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত, অপঘাত মৃত্যু কী দোষ করেছে! ধরা পড়েছে বিষ! যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে, আদালতে, লোকসমক্ষে, রমলা দেবীর কাছে সাহায্য নিয়ে। না নিলে কিন্তু চলত না, কোথায় কাকে পেতেন?

কাঠের যোগাড়-যন্ত্র শেষ হল। সাবিত্রীকে ঘি মাখিয়ে স্নান করান হল। বড় বড় কাঠ সাজিয়ে চিতা তৈরি ক'রে তার ওপর শব তোলা হল। দেহটা কী শক্ত! তার মনের মতন। নির্জীব বলেই কঠিন। এবার মুখে আগুন দেবার পালা। ঐ মুখের সঙ্গে এককালে, সে আজ থেকে বহু পূর্বে, অন্য জীবনে, তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। আজ গত কয়েক বৎসর ধরে ঐ মুখ থেকে নানা কথাই শুনে এসেছেন, সবগুলি মিষ্টি নয়, তবে সবই ভদ্রভাষায়, মার্জিতরুচি ঐ ঠোঁট দুটো থেকে যেন ক্ষরত। গলার আওয়াজ-ই দুরকমের! বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তায় নরম, স্বামীর বেলা ঈষদুষ্ণ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক, একটা আদরের ও আদর খাবার, অন্যটি আদর প্রত্যাখ্যানের; যেন আদর না পেয়ে পেয়ে অভিমানিনীর হৃদয় ও মন শুকিয়ে গেছে। হাতে নুড়ো জ্বলছে, ওপর হাতে তাত লাগল, নুড়োটা উঁচু ক'রে ধরলেন। পুরুতঠাকুর বল্লেন, 'এইবার দিন, আর মন্তর বলুন, ঐ দেখুন না আমার আরো তিনটে কাজ পড়ে রয়েছে।' খগেনবাবু মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে চুলীতে আগুন ধরালেন। মুখে আগুনটা স্পর্শ করল না বোধ হয়। কাঠ ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে, অতি শীঘ্র দাউ দাউ ক'রে। মাথার এক রাশ চুল গেল পুড়ে, কী দুর্গন্ধ! যেন উনুনে ফ্যান পড়েছে। সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। তখন তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল, তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন, 'যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না।' সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেন, 'এখান থেকে চলে যাও'। চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে।······প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট্ পুট্ করে শব্দ হতে লাগল, গা ফেটে জল বেরোচ্ছে, কী রকম হলদে রং-এর রস, বার হওয়া মাত্রই উবে যাচ্ছিল। বিশ্রী ধোঁয়া, চাওয়া যায় না, চোখ জ্বালা করে, করকর করে। হঠাৎ দড়াম ক'রে একটা কাঠ ফাটল। চমকে উঠে খগেনবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। একজন লোক লাঠি দিয়ে নিবন্ত কাঠ উলটে দিলে, আগুন আবার উঠল জ্বলে। খগেনবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

এই রকম কতবার হয়েছে! নানা রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সাবিত্রীর মনে

হয়ত সন্দেহ কমাম গেল, সাবিত্রী নিজে ননদকে ডেকে তার গান শুনলে, সে-গানের প্রশংসা করলে, দিন কয়েকের জন্য সংসার সুখের হয়ে উঠল। তারপর, তারপর হঠাৎ একদিন চা-পার্টি থেকে এসে সে কী কাণ্ড! সাবিত্রী ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই খগেনবাবু একটু চমকিত হয়েই বল্লেন, 'তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।' সাবিত্রী উত্তর দিলে, 'বল কী? তোমার আদরের বোনের চেয়ে? হঠাৎ চমকে উঠলে কেন? আর কেউ আসবে ভেবেছিলে বুঝি?' খগেনবাবুর মন মুসড়ে গেলেও হাসিমুখে জবাব দিলেন, 'তুমি সুন্দর। এত সুন্দর কখনও ভাবিনি, তাই হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দে চমকে উঠলাম।' 'কখনও ভাবনি? অথচ, সেদিন রমলাদি বলছিলেন....।' 'ত্যাখ, নজিরের প্রয়োজন নেই, আমার চোখ আছে। ঐ রমলাদিই তোমার মাথা খাবেন— তোমার সর্বনাশ করবেন।' 'তোমার আবার চোখ নেই! চোখ আছে, তবে পরস্ত্রীকে দেখবার জন্য, তাও যদি সম্পর্ক না হত! রমাদি যদি আমাকে একটু স্নেহ করেন তা হলে তোমার অত ঈর্ষা হয় কেন বলত? আমার মাথা ত গেছেই! আমার সর্বনাশ যদি যোগ্য পাত্রীর দ্বারা হত তবু ছিল ভাল। তুমি খুকীর মধ্যে কি পাও বলত?' 'ও সব কথা ছাড় লক্ষ্মীটি।' 'আদর করতে হবেনা আমাকে, তোমাকে বলতেই হবে আজ। না বলত মাথা খুঁড়ে এইখানে মরব। বল।' 'ওর মধ্যে ভদ্রতা আছে, স্নেহমমতা আছে, ভাল জিনিষকে ভাল বলতে জানে, সহজ মানুষটি, অনেকটা মাসীমার মত মনে হয়— এর বেশি বলতে পারি না।' 'মাসীমার মতন! তাঁর নাম আর করতে হবে না, তোমার সঙ্গে তাঁর দেওরঝির বিয়ে দিয়ে রাজরানীগিরি করতে পারলেন না, তাই মনের দুঃখে কাশীবসী হলেন। তাঁর কথা আর বোলো না। প্রাণের বোন ভালকে ভাল বলতে জানে! জানে ও ছলাকলা। আমার আর জানতে বাকি নেই। কী রকম ব্যবহার করে পাড়ার ছেলের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে, আমার জানা আছে— ওর ননদের বাড়ি রমলাদির বোনের বাড়ির পাশেই— তুমি যদি ওর নাম আবার কর, তা হলে আমি আর ভদ্রতা রাখতে পারব না, বিষ খেয়ে মরব।' এই বলে সে কানের দুল খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আবার আগুন জ্বলে ওঠে। বিষ তখন খায়নি, তবে ঐ রকম তুচ্ছ ব্যাপারেই বিষ খাব ভয় দেখাত, ওর চেয়ে তুচ্ছতর ব্যাপারে বিষ খেয়েছিল।

আগুন প্রায় নিবে এল। রমলা দেবীর আত্মীয়েরা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। পুরোহিত হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বল্লেন, 'এইবার শেষ কাজটি করতে হবে, নাভি-কুণ্ডলটি বার করুন, আত্মঘাতিনীর কার্যে দক্ষিণা আমরা বেশি নিয়ে থাকি।' সুজন তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, 'সে হবে'খন, বিমল বার করত ভাই।' পুরোহিত ঠাকুর তখন অন্য একটি নবাগত শবের দিকে চেয়ে আছেন। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে

বললেন, 'দেরি করবেন না।' বিমল ইতস্তত করছিল, পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্ত্রীর বুঝি সন্তান-সম্ভাবনা? তা হলে এলেন কেন? আপনার দ্বারা হবেও না, এটা স্বামীর কর্তব্য; সহধর্মিণী তো?' খগেনবাবু তখন বাঁশের ডগা দিয়ে ছাই ঘেঁটে একটা পোড়া মাংসপিণ্ড বার করলেন। সাবিত্রীর শেষ চিহ্ন? দুটো মালসার মধ্যে নাভিটা চাপা দিয়ে গঙ্গার ধারে অগ্রসর হলেন, সুজন সঙ্গে এল। মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে মালসা দুটো যত দূরে পারেন জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মনে মনে খগেনবাবু বল্লেন, 'তোমার আত্মা যদি থাকে তবে তার তৃপ্তি হোক।' মেয়েদের থাকে ভাব-গ্রন্থি। তাদের হিংসাদ্বেষও এই নাভিকুণ্ডল থেকেই ওঠে। এইটাই যোগসূত্র, বংশপরম্পরার। সবই এদের নাড়ির টানে। কে জানে! পরজন্ম যদি থাকে তা হলে সাবিত্রী যেন মেয়েমানুষ না হয়ে জন্মায়, বাঙালী হিন্দু পরিবারের মেয়ে হওয়ার চেয়ে পশুজন্মও বোধহয় ভাল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আত্মঘাতিনীর মানবজন্মও হয় না। মেয়েদের আত্মা! হিন্দুশাস্ত্রেই আছে— কী আছে খগেনবাবুর ঠিক মনে পড়ল না, তবে নিশ্চয়ই আছে ঐ ধরনের কথা। তারপর কলসি ক'রে জল এনে চুলী নেবাবার পালা, পুরোহিত বিদায়, বিছানা ভাগ, পোড়া গহনা খোঁজা, শ্মশানবন্ধু ও কনস্টেবলকে বখশিসদান, তারপর স্নান। সুজন একটা ফর্সা তোয়ালে ও ধুতি দিলেন খগেনবাবুকে। বেশ গন্ধ— কার তোয়ালে?

খগেনবাবুর শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল— কাঁধে ভীষণ ব্যথা, কলসি বয়ে বয়ে হাত টন টন করছে, ঘাটের সিঁড়ি ভেঙ্গে গোছ ফুলে উঠেছে, পায়ের তলায় পাকা ফোড়ার মত ব্যথা, আগুনের তাপে মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, চোখ জ্বলছে, করকর করছে ধোঁয়া লেগে। দু'খানা ট্যাকসি আনতে বলে খগেনবাবু সিগারেট ধরালেন, জিব শুকনো, ভাল লাগেনা, একটা মিঠা দোনা খেলে হয়, এখন এখানে খাওয়া যায় না, সিগারেটটা ফেলে দিলেন। একটা ট্যাকসি এল, আর সেই নতুন মডেলের শেভ্রলে, বনেটের সাদা ক্রোমিয়ম প্লেটগুলো গ্যাসের আলোয় ঝকঝক ক'রে উঠল। খগেনবাবু ট্যাকসিতে উঠতে যাচ্ছিলেন, সুজন বল্লে, 'না, এই গাড়িতে উঠুন।' খগেনবাবু মন্ত্রমুগ্ধের মত শেভ্রলেতেই চড়লেন, সুজনবাবুও এলেন। হুড ঢাকাই ছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ি বিডন স্ট্রীটে এসে পড়ল। দুধারের বাড়ির দোতলার বারান্দায় দু'একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, ভেতরে গান চলেছে, ঢুলঢুল টুলটুল, ভরা যৌবন— ব্যথার ব্যথী— সব বাংলা— সব গজলের চাল। একটা ঘরের ভেতরকার বড় আলোকচিত্র চোখে পড়ল— মাথায় পাগড়ি বাঁধা কোন শিক্ষিত সাধুর। গাড়ি জোরে ছুটছে— রাস্তায় আলো এক একবার যাত্রীর মুখের উপর

পড়ছে, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, আবার অন্ধকার। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর দক্ষিণে হাওয়া, শোভাবাজার, বাগবাজার অঞ্চলের বনেদী বাড়ির বড় বড় গাড়ি পাল তোলা নৌকার মতন মন্থরগতিতে বাড়ি ফিরছে, এঞ্জিনের আওয়াজ নেই। সাহেবদের গাড়ি তাদের অতিক্রম ক'রে ব্যারাকপুরের দিকে ছুটছে। সঙ্গের ট্যাকসিটা এগিয়ে চলল। ট্যাকসির নম্বর একটু অন্য ধরনের বুঝি? সব T দেওয়া, খগেনবাবু গাড়িতে ঠেস দিয়ে বসলেন, চোখ বুজতে পারছিলেন না, আগুন ও আলোর শিখা চোখ বুজলেই নেচে উঠছিল। চিরকালই জ্বলবে নাকি? একটু জ্বালা কমলে শান্তি পাওয়া যায়। কবে চোখ স্নিগ্ধ হবে?

গাড়ি সেই মির্জাপুরের গলির মধ্যে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে। আগের গাড়িতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা নেমে দরজার সামনে এক মালসা আগুনের উপর হাত তাতাচ্ছেন। গাড়ি থেকে নেমে খগেনবাবু আগুনের দিকে গেলেন না। সকলে নিমপাতা ও মটর ডাল চিবুলেন, খগেনবাবু পিছনেই দাঁড়িয়ে রইলেন, চাকরে জল ও তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সুজন ইঙ্গিত করতে চাকর খগেন-বাবুর কাছে এগিয়ে এল। খগেনবাবু হাত পা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছলেন—তোয়ালেটায় বেশ গন্ধ। রমলা দেবী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁকে নমস্কার করে যুবকেরা চলে গেল। রমলা দেবী সুজনকে বল্লেন 'সুজন কাল সকালে জিরিয়ে একটু আসতে পারবে?' একটু আমতা আমতা করে সুজন উত্তর দিলে 'কাল সকালে··· একটু কাজ ছিল।' 'যখন সুবিধে হয় এস।' সুজন সব শেষে চলে গেল। এক গেলাস সরবৎ নিয়ে রমলা দেবী যখন এলেন তখন খগেনবাবু নীচের ঘরে শোফার ওপর শুয়ে। লাফিয়ে উঠে তিনি এক চুমুকে পুরো গেলাসটা নিঃশেষ করলেন। 'আর এক গেলাস এনে দিই?' 'না।' বুকটা তবু ঠাণ্ডা হচ্ছিল না, চোখে বড় কষ্ট হচ্ছিল, হাত দিয়ে ঢেকে বসলেন। 'গোলাপজল এনে দিই?' 'বড় ভাল হয়।' রমলা দেবী গোলাপজলের শিশি আনলেন, খগেন-বাবু হাতের কোষে গোলাপজল নিয়ে চোখ ধুলেন। খানিকক্ষণের জন্য চোখ ঠাণ্ডা হল, খগেনবাবু চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। আবার জ্বলতে লাগল, চোখ খুলে দেখেন রমলা দেবী হাতে শিশিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'এখনও কষ্ট হচ্ছে? একটু মাথায় দিন।' খগেনবাবু খানিকটা ঢেলে মাথায় দিলেন। 'চোখের ভেতর এমন জ্বলছে!' 'চোখ বুজে থাকুন, এখনি আসছি, আলো নিবিয়ে দেবো?' 'না।' রমলা দেবী ওপর থেকে ড্রপার নিয়ে এলেন— খগেনবাবু উঠে বসতে চাইছিলেন। 'উঠে বসলে দেওয়া যাবে না, শুয়ে থাকুন।' হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন, আঙুল দিয়ে নিজের চোখের পাতা ফাঁক করলেন, রমলা দেবী ড্রপার দিয়ে ডান চোখে দু'ফোঁটা গোলাপজল ফেললেন। মাথার

ওপর পাখাটা জোরে ঘুরছিল, বাঁ চোখে ফেলবার সময় মাথার ওপর শাড়ির অংশটা উড়ে কাঁধের ওপর নেমে গেল, সামলাতে গিয়ে বাঁ চোখের ওপর দশ-বার ফোঁটা গোলাপজল পড়ে গেল। গড়িয়ে মুখের মধ্যে যাচ্ছিল। হাতের কাছে তোয়ালে না থাকার দরুন রমলা দেবী 'আমি একটা অপদার্থ' বলে তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলের কোন দিয়ে মুছিয়ে দিলেন। খানিকপরে বল্লেন, 'আবার ডান চোখটা খুলুন, ভাল পড়েনি।' 'পড়েছে?' 'না, মাত্র দু'এক ফোঁটা পড়েছে, লাগবে না, আরাম হবে, খুলুন।' বাঁ চোখটায় আরাম হচ্ছিল, ডান চোখে অস্বস্তি কমেনি। ডান চোখটা আবার আঙুল দিয়ে ফাঁক করলেন···ফোঁটা ফেলবার সময় রমলা দেবীর হাত কাঁপছিল। বেশ ফর্সা দেখাচ্ছিল হাতটা, চুড়ির রঙের সঙ্গে হাতের রং বেশ মিশে গিয়েছিল, মনঃসংযোগের একাগ্রতায় মুখের আদরা স্পষ্ট হয়েছে। চার পাঁচ ফোঁটা পড়বার পর খগেনবাবু বল্লেন, 'আর না।' তারপর চোখ বুজে ও হাত ঢাকা দিয়ে শুয়ে রইলেন।

দুই

খগেনবাবুর রাত্তিরে ভাল ঘুম হল না। সর্বাঙ্গ ব্যথা, বিশেষত ডান কাঁধটা। পা'র তলা ও চোখ ভারী জ্বালা করছিল। যে ক্লান্তিতে স্বপ্নবিহীন ঘুম আসে তার সীমা অতিক্রম করাতে দেহটা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করতে করতে কখন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাঁর মনে নেই। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখনও ভোর। মিউনিসিপালিটির ময়লা গাড়ির শব্দে তাঁর বিরক্তি হচ্ছিল। পূর্বে কতবার তিনি ভোরে, শয্যাত্যাগ করেছেন, কিন্তু কৈ শহরের আওয়াজ ত এমন কর্কশ মনে হয় নি। স্বরাজ-পার্টির দোষ, না তাঁর দৈহিক অবস্থার দোষ? এ রকম কত কর্কশ আওয়াজ শহরের বাসিন্দারা নীরবে সহ্য করছে, কেউ ত আপত্তি করে না! বোধ হয় তাদের স্নায়ুগুলী আরো শক্ত, কিংবা তাদের সহ্য হয়ে গিয়েছে। সহ্য হয়েছে না ছাই হয়েছে! লোকগুলো বোকা ভাল-মানুষ, আপত্তি করতে জানে না, অথচ আসে পাড়া গাঁ থেকে; ট্রাম, মোটর, বাস, লরির শব্দ, তাদের অজানিতে, দেহের প্রত্যেক স্নায়ুকে আক্রমণ করে, বিধ্বস্ত করে, তাই গলির মোড়ে মোড়ে চা-এর দোকান, নচেৎ সভ্যতার সঙ্গে লড়বে কি খেয়ে? বিবাহিত জীবনেও তাই। এই যে গলিতে গলিতে কন্‌সার্ট পার্টি, রাস্তায় রাস্তায় থিয়েটার পার্টি, কিসের জন্য চলছে? বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানর তাড়ায়, আত্মরক্ষার তাগিদে। প্রাণের মায়া ভীষণ মায়া, যুবক বৃন্দ ক্লাব

করছেন, ছাত্রসঙ্ঘ তৈরি করছেন, মাসিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করছেন, একই কারণে, বাড়ি থেকে, বাপ-মা-এর নীচ কলহ-বিবাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে। সব পালাচ্ছে, যা চায় না তা থেকে। যাবে কোথায় কেউ জানে না, তাই হট্টগোলে দিশাহারার দায়িত্বহীনতা ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমোয়। জোরে রেডিও না ছাড়লে গৃহিনীদের তুপুরবেলার কাজ, অর্থাৎ ঘুম হয়না।

খগেনবাবুর গলা শুকিয়ে আসছিল, কাঁধের ব্যথা, চোখ ও পায়ের জ্বালা যেন তাঁর শান্তির বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করেছে। সাবিত্রী পরিত্রাণ পেলে। তার প্রাণের মায়া বড় বেশি ছিল না— কী থেকে পালিয়ে গেল? বলবে সে, স্বামীর অবহেলা থেকে। তা নয়, নিজের থেকে। কোথায় পালাল? কিসের ডাকে? কিছুই জানা নেই। নাভিকুণ্ডলটাও জলে ফেলা হল, পুড়ে ছাই হল, রইল কি? তাকে কে ডেকেছিল? মরণ, বড় কিছু নয়।

ডাক শোনবার কানই তার ছিল না। কান ছিল রং-বেরঙের তুল পরবার। কান তুটো তার দেখাই যেত না, চুলের থাকে ঢাকা পড়ত, দেখা যেত লম্বা তুল। লম্বা তুল তাকে মানাত না, মুখ ছিল তার লম্বা। একবার ছোট্ট একজোড়া পুরানো তুল খগেনবাবু কোথা থেকে যোগাড় করেন, সাবিত্রী অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রহণ করে, একবেলা পড়েছিল, তারপর আর পরেনি, খগেনবাবুর ভাগ্নীর বিবাহে তাকে পালিশ ক'রে যৌতুক দেয়, গিন্নীপনার সুখ্যাতি-ট্যাক্সটি আদায় ক'রে। নিশ্চয়ই সাবিত্রীর বন্ধুরা তাকে এ পরামর্শ দেন, নিশ্চয়ই রমলা দেবীই দিয়েছিলেন, তাঁর নিজের মুখটা লম্বা ধরনের; পছন্দটাও সেকেলে নয়। কিন্তু সৌন্দর্যটাও নিজস্ব বস্তু, রমলা দেবীকে যা মানায় সাবিত্রীকে তা মানায় না। রমলা দেবী কী করে পুরাতন গহনার স্বাদ বুঝবেন? তিনি জানেন বম্বেওয়ালার দোকান। তাঁর রুচি বিদেশী; তাও বিদেশের মার্জিত রুচি নয়, যে রুচি কয়েক বৎসর পরে জাহাজের খোলের বন্ধ হাওয়ায় ভেপসে উঠে পচা অবস্থায় ভারতবর্ষে হাজির হয়, তারপর অন্দর মহলের খিড়কি দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রে বৈঠকখানার হাওয়া কলুষিত করে। বিলিতী সাজসজ্জা না পরলেই স্বদেশী হয় না, অথচ লোকে বলে মেয়েদের জন্যই হিন্দুস্থানের সভ্যতা অটুট রয়েছে। কারা জর্জেট কেনে, কারা পাউডার সেণ্ট্ মাখে, কারা চা চপ কাটলেট তৈরি ক'রে পুরুষের মনোহরণ করে? এই রমলারা। কটা মেয়ে চন্দ্রকোণার শাড়ির নাম জানে, কটা মেয়ে পুলিপিঠে মোচার ঘণ্ট রাঁধতে পারে। নিশ্চয় রমলারা নন্। ধনে-পলতা-সেদ্ধ জলের বদলে, চুণের জল, তুলসী পাতার বদলে, কারা দামি বিলিতী পেটেণ্ট ওষুধ খাওয়ায়? খাওয়াবে কাকে? ছেলেমেয়েই হয় না এদের, অবশ্য না হওয়াই ভাল। রমলা দেবীরও হয়নি, সাবিত্রীরও না। পুরুষমানুষদের

চা-এর কথা স্বতন্ত্র, হুঁকো, কলকেও সর্বত্র পাওয়া যায় না। চা-টা স্বদেশী, চীনেদের। তা ছাড়া আর ঘুম না হলে কী করা যায়? চা সিগারেট খেতেই হয়। সাবিত্রীও আপত্তি করত না, খগেনবাবুকে সিগার ও কফি খেতে বলত। করে কে? রমলা দেবীর কাছে কফি তৈরি করার কৌশলটা শিখে নিলেই হত, তা নয়, শেখা যত সব বদ অভ্যাস। যার যেটা ভাল সেটা নিলেই ত হয়!

কফির কথা মনে উঠতে খগেনবাবুর তৃষ্ণা তীব্রতর হয়ে উঠল। এতক্ষণ নিশ্চয় কলেজ স্কোয়ারের পাশের দোকানগুলো খুলেছে। খগেনবাবু উঠে পড়লেন, বাথরুমের মগটা ধড়াস ক'রে পড়ে গেল, কলের জল তখন আসেনি, কোনের বালতির বাসি জল দিয়ে হাতমুখ ধুলেন, আরসিতে ছায়া পড়তে কামাবার ইচ্ছে হল! কামাতেই হবে তাঁকে, কিন্তু সরঞ্জাম কোথায়? চা খেয়ে কামালেই হবে। দাড়িটা এত বড় হল কি ক'রে? একেবারে করকর করছে যে! সেইজন্য গা গরম? এই রকম তাঁর বহুবার হয়েছে। জ্যাঠাইমা মারা যাবার জন্য তাঁর অশৌচ হয়, দুদিন কামান নি, বিকেলে মনে হয়েছিল জ্বর আসছে, কামিয়ে সুস্থ হন। কামালে দু'চারটে সাদা চুল থুতনিতে দেখা যেত, অথচ অন্য কোথাও পাকা চুল নেই। কামাতে হবে তাঁকে, তারপর চা। কখন রমলা দেবী এসে পড়বেন কে জানে? যা শব্দ হল! হয়ত তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে ঐ শব্দে! খুটখুট ক'রে যেন জুতোর শব্দ হল না? রমলা দেবী কী বাড়িতেও জুতো পরেন না কি? চাপলি পারেন নিশ্চয়ই, চাপলির শব্দ অন্য ধরনের। খগেনবাবু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। দরজার হুড়কোটা ভারী কড়া, দরজা খুলে রাখলে যদি চোর আসে। সকাল হয়ে গিয়েছে, এখন চোর আসবে না। এ বাড়িতে বাসন মাজার ঝি আসেনা না কী? এলে ভাল হত, নচেৎ বাসন-কোসন চুরি হতে পারে! না, কলতলায় বাসন নেই ত। বাঁচা গেল খগেনবাবু বড় রাস্তায় এসে পড়লেন। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা— কিন্তু হাওয়া নেই।

রাস্তায় তোলা উনুনে আগুন ধরান হয়েছে, ধোঁয়ার স্তম্ভ সোজা উঠছে। চা-এর দোকানের বারান্দায় উনুন, মুখ তার ফুটপাতের ওপর, ছাই পড়ে আছে রাস্তায়! একজন লোক পেয়ালা ধুচ্ছে, বড় সাদা পেয়ালা, কিনারা গোলাপী। এরি মধ্যে কখন লোকটা স্নান ক'রে চুল আঁচড়েছে, দাড়ি কামিয়েছে। খগেনবাবু ধোঁয়া ভেদ ক'রে দোকানে প্রবেশ করলেন, জারুল কাঠের টেবিল, কালো অয়েল-ক্লথে মোড়া, ভেনেস্তা চেয়ার, কোনে তেকোনা পাথরের টেবিল রয়েছে, ঐ টেবিলে চা খেলে নিশ্চয়ই তিন পয়সা দিতে হয়। উনুন ধরাতে আর দেরি নেই, এই দশ মিনিটেই ধরে যাবে শুনে খগেনবাবু লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, এখানে সেলুন নেই?' 'আছে, একটু আগে, কিন্তু এখনও খোলে নি। একটু

পরেই রাস্তার মোড়ে হিন্দুস্থানী নাপিত বসবে— এখান থেকে দেখতে পাবেন।' 'আচ্ছা ততক্ষণ এক কেৎলি চা তৈরি করুন, কিছু কেক আছে?' 'ভাল ডেভিল আছে মশাই, গরম ক'রে রাখব?' 'না থাক, কেক হলেই চলবে, এলাম ব'লে।' খগেনবাবু রাস্তা ঘুরে যখন ফিরে এলেন, তখন ধোঁয়া নেই, উনুনে কেৎলি বসান হয়েছে। শীঘ্রই জল তৈরি হল, লোহার চাটুর উপর একটু ঘি ছাড়া হল, লোকটি একটা বড় ডিমের মতন লেচি ছেড়ে দিলে। চা এল, ডেভিল ভাজা হল, খগেন-বাবু লোকটির ব্যস্ততা দেখে আপত্তি করতে পারলেন না। ডিশের ওপর ডেভিল, খানিকটা রাই ও একটি কেক, গরম চা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ডেভিলের চেহারা দেখে খগেনবাবুর গা ঘিনঘিন ক'রে উঠল, একটা কামড় দিতেই কিসমিস মুখে এল। মন্দ নয় মোটর ওপর, কেকটা বাসি, চা-টা ভাল নয়, বাসি দুধের ধোঁয়ার গন্ধে বিস্বাদ ঠেকছিল। আর এক কাপ চা দেবার সময় লোকটি বল্লে, 'ঐ নাপিত এল, ডেকে দেব? এই পরামাণিক, ইধার আও।' লোকটির বাবরি কাটা চুল, গায়ে ফতুয়া, কানের পাশে লোহার কাটিতে তুলো, সযত্নে রক্ষিত গোঁফ, হাতে ন্যাকড়ার মোড়ক, তার ভেতর কত রকমের থলি। তার মুখে দারিদ্রের চিহ্ন নেই, বাঙালী গরীব কেরানীদের যেমন থাকে। তার পেতলের বাটিতে চা-এর দোকানের লোকটি খানিকটা গরম জল ঢেলে দিলে। খগেন-বাবু ক্ষুরটাকে গরম জলে ধুয়ে নিতে বল্লেন, সাবান ব্যবহার করতে দিলেন না। ক্ষুরের বাঁট কাঠের, দেহাতী জিনিষ। নাপিত খগেনবাবুর জামা ঢাকার জন্য একটা কাপড় বার করলে, খগেনবাবু নিলেন না। নাপিত ভাঁজ ক'রে রেখে দিলে। তার হাত চলল গরম জল দিয়ে ধোয়া দাড়ির ওপর। সাবানের চেয়ে ঢের ভাল। সেই পনের বছর বয়সে লুকিয়ে দাড়ি কামিয়েছিলেন; আর বিবাহের দিন বিকেল পাঁচটায় একেবারেই ছুট, বাড়ির লোক ভেবেই অস্থির, বর কোথায় পালিয়ে গেল বুঝি। 'পালাবে কোথায়?' বড় ভগ্নীপতি ঠাট্টা করেছিল, 'পালাবার জো আছে! পরেও নেই, আগেও নেই।' ছোট ভগ্নীপতি বলেছিল, 'পালিয়েই যদি থাকেন তো শ্বশুর বাড়িতেই, দাদার আর তর সইছে না।' ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শেষ হলেই সে বাঁচে। প্রতীক্ষা করা তার ধাতে ছিল না, যা হবার এসপার ওসপার একটা হলেই হল। ঠিক হলেই হল তা নয়, কেননা সে নিজে কনে দেখেছিল, পছন্দই হয়েছিল— অন্য মেয়েও তার পছন্দ হয়েছিল, একে যে বেশি তাও নয়, তবে বেশ কবিতা-কবিতা গোছের এই মেয়েটি। বিবাহ ক'রে রোমান্স করবে, নতুন জীবন যাপন করবে এ ধারণা ছিল বলে মনে পড়ে না, মনে পড়ে এইটুকু যে সে শুধু অপেক্ষা করতে পারছিল না, মনে পড়ে যে সকলে তাকে নিয়ে মাতামাতি করছে, ঠাট্টা করছে, তার মন্দ লাগছিল না। হাঁ, এই

ত তার মনোভাব ছিল; তাছাড়া আর কিছু ছিল না? কই, মনে আসছে না ত! হয়ত, আরো কিছু ছিল। সব মনে থাকে না, হয়ত আরো কিছু ছিল! সব মনে থাকে না, পরে তৈরি করে মানুষে, আর সুবিধা বুঝে পূর্বতনের স্কন্ধে চাপায়।

দাড়ি গোঁফ কামান হল; নাপিত ক্ষুর ধুয়ে এক টুকরো শক্ত চামড়ায় শান দিয়ে ও হাতে পালিশ ক'রে থলিতে রাখলে। খগেনবাবু গরম জলে মুখ ধুলেন, একটা দু-আনি দিলেন নাপিতকে। লোকটি কোন কথা না ব'লে দু-আনিটা মাথায় ঠেকিয়ে ফতুয়ার পকেটে রাখলে। কাজের লোক, নাপিত জাতের মত বাজে কথা কয় না ত? কেমন তাড়াতাড়ি নীরবে কাজ সারলে!

ভারী আরাম বোধ হতে লাগল, যেন ঝরঝরে; মন খারাপ হলে লোকে দাড়ি কামায় না কেন? বিধবা হবার পর যদি মেয়েরা একটু সাজতে পারত, তা হলে দুঃখবিলাস ও নিজের প্রতি অনুকম্পায় বিধবারা অমন অস্বাভাবিক হতেন না, আত্মীয়ারাও কেবল মুখে সহৃদয়তা ও সমবেদনা প্রকাশের সুবিধায় আত্মতৃপ্ত এবং মনে মনে বিরক্ত হতে পারতেন না, আর, একনিষ্ঠতার আদর্শে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নপুংসক হয়ে উঠত না। অবশ্য, পুনর্বিবাহটাও ভাল নয়; মুণ্ডিতমস্তকের পক্ষে বারবার বেলতলায় গমনাগমন মূর্খতারই পরিচায়ক। কিন্তু কী করা যায়? দু'ধারেই বিপদ। আদর্শেরও দরকার আছে, স্বাভাবিকতারও প্রয়োজন রয়েছে, না হলে সংসার চলে না। দুই অনন্যসম্বন্ধ প্রয়োজনের বিরোধ মেটে না, তাই মিথ্যারও প্রয়োজন। কল চলছে না, তাই তেল চাই। সাবিত্রীর মুখ থেকে তার মতে আদর্শ দাম্পত্যজীবনের কাহিনী শুনে বুঝেছিলেন যে বিবাহিত জীবনেও মিথ্যার একটি বিশেষ স্থান আছে; অন্তত আদর্শ স্বামীরা স্ত্রীদের ঠকান, নচেৎ ভদ্রতা রক্ষা হয় না। ভদ্রতারক্ষা সত্য আচরণের চেয়ে অনেক মূল্যবান এই সমাজে, এই নতুন সমাজে। ভদ্রতা ও মিষ্টতার মধ্যে একটা ভীষণ মিথ্যা থাকে, থাকতে বাধ্য। সব সভ্যতার মূলেই তাই, ইগ্‌ড্র্যাসিলের তলায় কাঠবিড়ালীর বাসা; সত্য হল সহজ ও স্বাভাবিক, ভদ্রতা হল অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম। তবে গোড়ার দিকে, সভ্যতার একটা তেজ থাকে, তখন দোষ অর্শায় না, পরে তেজ কমে আসে। প্রথম প্রথম সাবিত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে একটা সহজ স্ফূর্তির বিকাশ পেত, পরে এল কুণ্ঠা। পরে তেজ কমে আসে সভ্যতার, তখন অন্তরের সত্য ম্রিয়মাণ হয়, তার চার পাশে মিথ্যার অন্ধকার, বনের মাঝে গোধূলির মতন ঘিরে আসে গোপন-সোচ্চারে, চারধার থেকে নেমে আসে গাছের পাতা থেকে ধীরে, অজানিতে, মুমূর্ষুপ্রশ্বাসে। তখনও সভ্যতা ঘনতমসায় আবৃত হয় না, তখনও দীপ্তি থাকে। তাকেই বলে rococo, নিবে যাবার পূর্বে ঐশ্বর্যের ম্লান

হাসি। রমলা দেবী সভ্য মানুষ, তাই হাঁপিয়ে পড়েছেন মিথ্যার অদৃশ্য বোঝা বয়ে বয়ে— তাঁর নাকি হাঁপানি। হাঁপানি না ছাই! অপরিণত হৃদযন্ত্রের ধুকধুকুনি, স্পিরিটের বোতলে সযত্নে রক্ষিত। সাবিত্রীর মধ্যে প্রথমে মিথ্যা ছিল না, পরে এসেছিল— সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব, সভ্যতা ও স্বাভাবিকতার বিরোধ সে ধারণা করতে পারলে না নিজের মধ্যে, করোনার সাহেব বুঝতেই পারেন নি ব্যাপারটা কী। সাবিত্রীর না মরে উপায় ছিল না। অতবড় বিরোধ হজম ক'রে নতুন সমন্বয়ে উপস্থিত হওয়া কী চারটিখানি কথা! অধিকার-ভেদ রয়েছে যে— সব আধার সমান নয়। সাবিত্রী ছিল ভিজে তুবড়ী— তাই ফস ক'রে জ্বলেই নিবে গেল। কিন্তু ভিজে হলে চলবে না। রমলা দেবীর মধ্যে সত্য ও মিথ্যা নতুন ধরনের ফ্ল্যাটের বাসিন্দার মত ভদ্রভাবে, আলগোছে দিন কাটাচ্ছে। অন্যে কাটাচ্ছে কাটাক গে! তার কী! কিন্তু পরে টের পাবেন জীবনটা ফ্ল্যাট নয়। আর খগেনবাবু, নিজে? নিজে মিথ্যা আচরণ করতেই পারেন না। বরঞ্চ পালাবেন। তবে সাবিত্রীর উপায়ে নয়। ভিনদেশে চলে যাবেন, না হয় সন্ন্যাসী হয়ে দিব্যি খাবেন দাবেন, মোটা হবেন, রং তামাটে হয়ে যাবে, পরকে উপদেশ দিয়ে চরিতার্থ হবেন। লোকগুলো যা মূর্খ! উপদেশ, বিশেষত ধর্মোপদেশ যেন তাদের খাদ্য, না হলে চলে না। যত শিক্ষা ততই বুজরুকির প্রয়োজন। ছিঃ, ছ্যাঃ। সর্বদাই বিরোধ, না হয় মিথ্যা। আর ভাল লাগে না। তার চেয়ে, হাওড়া স্টেশনে, একটি সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ, একটি ভাল পাহাড়ি চাকর, একটা ভদ্র হোটেল, 'ভদ্রলোকের জন্য' নয়, ব্যস্! মশুরী ভাল না লাগলে উটি, উটি না লাগলে এটি। নিজের বাজে রসিকতায় খগেনবাবুর মুখে লজ্জার হাসি ফুটে উঠল।

বাড়িতে প্রবেশ করেই খগেনবাবু রমলা দেবীকে দেখতে পেলেন। গরদের শাড়ি, লাল পাড়, ধোপদোরস্ত, খসখসে নয়, নরম, আঁচলটি গলায় জড়ান, নজর করলে ব্লাউসের খচিত পাড়টি দেখা যায়, নচেৎ শাড়ির পাড়ের সঙ্গে মিশে থাকে, সবুজ ঘাসের মধ্যে ফড়িং-এর মতন। একটু উঁচু ক'রে শাড়ি পরা, পায়ের গাঁট থেকে নীল শিরগুলো নেমে আঙুলে প্রসারিত হয়েছে। যেন পূজারিণীর ছবি, ভবানী লাহার, হেমেন মজুমদারের নয়। চোখাচোখি হতে খগেনবাবু চোখ নামিয়ে নিলেন, মনে হল যেন তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন, যিনি অত করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে ভেবে, তাঁর রুচির সমালোচনা ক'রে। অত সকালে লুকিয়ে চা না খেয়ে এলেই হত, কিন্তু দেহের একটা ভদ্রতা আছে, নচেৎ দাড়ি কামান হতই না, অসভ্যের মুখ নিয়ে চায়ের টেবিলে বসতে হয়। রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'সারা রাত ঘুম হয়নি বুঝি?'

'ঘুম? ঘুম একরকম হয়েছে। এই একটু বাইরে গেছলাম।'— 'চা আনি?'

'এরি মধ্যে চা তৈরি ? আপনি ত খুব সকালে ওঠেন।' 'ওপরের ঘরে আসুন।' খগেনবাবু ওপরের ঘরে গেলেন। ছিটের পর্দা টাঙ্গান, দরজায় তারের পা-পোশ, সতরঞ্চি মোড়া মেজে, তার ওপর দুটি ছোট রঙীন কার্পেট, গদিঅলা চেয়ার, তেকোনা টেবিলের উপর ফুলদানী, ফুল নেই, চেয়ারের পিঠে লেসের রুমাল, দেওয়ালে বিলিতী ছবি, জানালায় পর্দা দেওয়া। ঘরটি ছোট, আসবাবপত্র বর্তমান লেখকদের লেখার মধ্যে মতামতগুলির মত ভিড় ক'রে রয়েছে, অবকাশ নেই, যেন হিংসেতে নিজের অধিকার বিস্তার করতেই ব্যগ্র। খগেনবাবু একটি মোটা চেয়ারে বসলেন, সামনের টেবিলে চায়ের বাসন সাজান। রমলা দেবী এক কাপ খগেনবাবুকে দিলেন, এক কাপ নিজের জন্য তৈরি করলেন। খগেনবাবু এক টুকরো চিনি নিলেন, চা-পানের পূর্বে একটি টোস্ট তাঁকে খেতে হল, পাৎলা, মুড়মুড়ে, ফিকে হলদে টোস্ট, খালি পেটে চা খেয়ে খেয়ে নাকি তাঁর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে।

'এবার দেখুন নিজেকে যত্ন করতেই হবে।'

'আমার শরীর মোটেই খারাপ নয়।'

'নাঃ, মোটেই খারাপ হবে কেন ? তবে ঐ যা, রাতে ঘুম হয় না, খেলে হজম হয় না, তাই কেবল মাছের ঝোল পথ্য, আর ওজনে একটু হালকা।'

'তাতে দেখুন কিছুই আসে যায় না। আপনিও ত হাল্‌কা।'

'আমাদের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের আবার স্বাস্থ্যের প্রয়োজন কী ?'

'সে কথা বলবেন না। আপনাদের স্বাস্থ্যের ওপরই আমাদের সুখশান্তি নির্ভর করছে। আপনাদের মাথাটি ধরলে আমাদেরই ভুগতে হয়।'

'সকলের নয়। আর একটু চা নিন। একি, গাল কাটলেন কী ক'রে।' 'না, কৈ ? কাটিনি ত ?' গালের ওপর হাত দিতেই আঙ্গুলে রক্তের দাগ লাগল। 'তাইত। নাপিতদের বিশ্বাস করতে নেই, তাইত।' রমলা দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এক মিনিটের মধ্যে একটা সেলুলয়েডের বাকস ও একটি শিশি নিয়ে এলেন— 'এই নিন, আগে আওডিন দিন, একটু জ্বলবে, তারপর পাউডার দিন, ভারী হলদে দাগ হয়।' খগেনবাবু আওডিন ও পাউডার লাগালেন। চা পান শেষ হবার পর রমলা দেবী তাঁকে বল্লেন, 'এখন এই ঘরেই বিশ্রাম করুন, না বলে যেন কোথাও চলে যাবেন না। ভাঁড়ার বার করে আসছি, ততক্ষণ কাগজটা পড়ুন না। কোন সঙ্কোচ বোধ করবেন না অনুগ্রহ ক'রে।' পিছনের আঁচলটা টেনে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেলেন।

কাগজ পড়তে ভাল লাগছিল না, সঙ্কোচ হচ্ছিল। 'সঙ্কোচবোধ করবেন না'— না, সঙ্কোচ আর কী ? হাজার হোক পূর্বপরিচিতা, সাবিত্রীর বন্ধু, সেই

সূত্রে আলাপ! বন্ধু বলে বন্ধু! একেবারে হরগৌরী! কে গৌরী, কে হর? রমলা দেবীই হর, তাঁর মধ্যে পুরুষের উপযুক্ত একটা সংহতি ছিল, আর সাবিত্রীর মধ্যে ছিল গৌরীর বাপের বাড়ি যাবার আবদারটা, গৌরীর অন্য কিছু থাক আর না থাক। আচ্ছা, সতীর যদি মানসিক বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে তাঁর চরিত্রে পিতৃপ্রীতির আতিশয্য এবং স্বামীর অবস্থায় অসন্তোষ পাওয়া যায় না কি? বিশ্লেষণে যা চাই তাই মেলে। কিন্তু হর ঠাকুরটি বড় ভাল। তাঁর মধ্যে আছে শান্তি ও আত্মসমাহিত ভাব, তাঁর মধ্যে নেই ভাবের উত্তাপ, চিত্তের বৈকল্য, চিন্তার বিক্ষেপ; অথচ রাগ রয়েছে, এমন কী কামও আছে,— বিষ্ণু কী জব্দটাই করেছিলেন মোহিনীমূর্তি ধারণ ক'রে! ভারী সরল, সহজ পুরুষ, যেমন সতী নিতান্তই সাধারণ মেয়ে। তাঁর দুই-ই চাই, বাপের বাড়ি যাওয়া চাই স্বামীকে আঁচল বেঁধে, আবার সেখানে স্বামীর অপমান হলে রাগও হবে; তপস্যাও করা চাই ঐ স্বামী পাবার জন্য, আবার পেয়ে ঝগড়া করাও চাই। এই বোধ হয় জীবন, কেননা এই স্বাভাবিক। এই ভাল বোধ হয়। হরগৌরীর জীবনে কোন কৃত্রিমতার সঙ্কোচ ছিল না, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় কিছুই ছিল না, প্রত্যেকেই সহজ ও সাধারণ ছিলেন, তাই হরগৌরীর মিলন আদর্শ বিবাহিত-জীবনের প্রতীক। কিন্তু দুই মেয়েতে ভাব হয় কি? কেন হবে না? পুরুষদের মধ্যে ত হয়, তবে খারাপ নাম না দিলেই হল। বন্ধুত্বের মধ্যে সঙ্কোচ? সমাজ ভয় দেখায়, সেইজন্য, না দেহের জঘন্য দুর্বলতার জন্য? পুরুষেরা ত তার ক্ষতিপূরণ করেছে, সুন্দর বলে, ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে, কবিতা লিখে, মিথ্যা ভাণ ক'রে। তবু কেন? তাঁরা মিথ্যার চেয়ে আরো বেশি কী চান? ভেবে কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় না। কেবল, কেবল সঙ্কোচ না থাকলেই হল, তা যে উপায়েই সঙ্কোচ দূর করা হোক না কেন! সঙ্কোচের জন্যই সাবিত্রী আত্মঘাতিনী হল, পোড়াবার সময় দেহটা সঙ্কুচিত হয়েছিল। আজ রমলা দেবী সঙ্কোচশূন্য হতে আহ্বান করছেন। এ আহ্বান সত্য নয়— নিশি-তে ডাকার মতন, 'খগেনবাবু আছেন, খগেনবাবু আছেন? আপনি আছেন, তুমি আছ, ওগো—।' প্রথম ডাকে উত্তর নেই, দ্বিতীয় ডাকেও নেই, কেবল উঠে বসতে হয়, তৃতীয় ডাকের পর উত্তর দিতে হয়; নচেৎ, স্বপ্নাটন অবস্থায় শয্যাত্যাগ ক'রে অন্ধকারে অদৃশ্য শক্তির পশ্চাদ্ধাবন, তারপর খালবিলে ডুবে মরণ। পরের দিন সকালে মাঠের চাষী বলে অমুক লোক আত্মহত্যা করেছে— তারা বোঝে না, করোনার সাহেবও বোঝেন নি। তিন বারের পর চার বারের ডাকে উত্তর দিলে মোহ থাকে না, কেটে যায়— তখন উত্তর না দেওয়া বোধ হয় একটু অভদ্রতা। সঙ্কোচ এখন কাটবে না, উত্তর এখন দেওয়া হবে না।

গদির চেয়ারে বসে খগেনবাবুর ঘুম আসছিল, উঠে বসে জোর ক'রে ঘুম ভাঙালেন। খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে দেশবন্ধু সপ্তাহ—টাকা চাই। আজকাল পাঁজি পুঁথি সব উল্টে গিয়েছে, এখন স্মৃতি-সপ্তাহ দিয়ে বৎসরের হিসেব হয়। কতদিন স্মৃতির পুঁজি নিয়ে চলবে? কলসির জল গড়াতে গড়াতে খালি হয়, স্রোতের জল খালি হয় না, জোয়ার, আসে ভাঁটা। গচ্ছতি ইতি জগৎ। এই দু'দিন আগে সাবিত্রী ছিল, আজ নেই, কিন্তু সূর্য বেশ উঠছে, সেই সূর্য থেকে আহৃত জীবনও রুদ্ধ হয় নি, যেমন ভূমিকম্পে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। জীবনটা ঘড়ি নয়। জীবন-প্রবাহকে স্বীকার করতেই হয়। রমলা দেবী জীবনের প্রতীক না কী? প্রতীক ভাবতে ইচ্ছা হয় না, ব্যক্তিত্বকে অপমান করা হয়। বরঞ্চ তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটি জীবন-স্রোতের ছোট্ট ঊর্মি, কলধ্বনির রেশ মাত্র। তাঁর জীবন তাঁরই। প্রত্যেকেই পৃথক। কিন্তু পৃথক থাকা যায় কি? নিশ্চয় যায়, না গেলেও থাকতে হবে, তবেই ব্যক্তিত্ব পূর্ণ হবে। সে জন্য প্রত্যাহার-সাধন, শম, দম অভ্যাস করতে হবে। না করলে প্রকৃতি পুরুষকে গ্রাস ক'রে ফেলবে। প্রকৃতিগ্রস্ত পুরুষের কোন সার্থকতা নেই। সার্থকতার অর্থ কি? কে জানে? আজ না হয় সে অর্থ নাই আবিষ্কৃত হল। আজ নিদ্রাতুর অবস্থাতেই কাটান যাক— নিদ্রা, ঘুম, সুষুপ্তি, শাস্ত্রে কতই আছে। বর্তমান মনোবিজ্ঞানে স্বপ্ন নিয়ে মাতামাতি চলছে, নিদ্রা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কৈ? স্বপ্ন নাকি নিদ্রার সহায়তা করে? স্বপ্ন যদি দেখতেই হয় তা হলে যেন মর্গের সাবিত্রীর ঐ করুণ রূপ না ভেসে ওঠে। তার চেয়ে ভেসে উঠুক সাবিত্রীর বিবাহের রাতের কিশোরী-শ্রী—'তার জলচুড়িটির স্বপ্ন দেখে, শিউলি ঝরে লাখে লাখে ......'

ঘড়িতে কটা বেজে গেল— চোখে দেখলেন এগারটা— ধড়মড়িয়ে খগেনবাবু উঠে বসলেন— চোখে পড়ল, কোনের চেয়ারে রমলা দেবী বসে আছেন, স্নানের পর শুভ্র দেখাচ্ছে, চুল ভিজে, নিশ্চয় খোলা। 'এইবার উঠুন স্নান ক'রে নিন।' 'শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়েছে; বসুন না, এই একটু দেরিতে নাইলে কী কষ্ট হবে আপনার?'

'আমার হবে না, আপনার হবে; খাবার জুড়িয়ে যাবে।'

'তা হোক', 'এখনি আসছি' বলে রমলা দেবী নীচে চলে গেলেন।

খগেনবাবু খবরের কাগজের পাতা সাজাতে না সাজাতেই রমলা দেবী প্রবেশ করলেন। 'কিন্তু বারটার মধ্যেই খেয়ে নিতে হবে!'

'সে হবে'খন। বসুন না।'

'এই ত বসে আছি।'

'কাজকর্ম শেষ হয়েছে ?'

'অনেকক্ষণ। আমাকে বেশি কাজকর্ম করতে হয় না, চাকর-বাকর সবই পুরানো।'

'আমি শুনেছি যে আপনি সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকেন ?'

'না, কাজ আর কৈ ? একলার আবার কী কাজ ? আমার হাতে বিস্তর অবসর।'

'অবসরে নিজেকে ব্যস্ত রাখা ভারী কঠিন। এবার থেকে আমার অবসর খুব বেশি হবে·······তাই ভাবছি শীঘ্র কোথাও বেরিয়ে পড়ব।'

'শীঘ্র যেতে পারছেন কি ক'রে ? কাজ রয়েছে।'

'কাজ আমার আর কি ?'

'কাজ রয়েছে বৈ কি।'

'ও'— খগেনবাবু খানিকক্ষণের জন্য চুপ ক'রে রইলেন। রমলা দেবীর কাছে কোন সারা না পেয়ে নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকেই করতে হবে ?'

'না হলে কে করবে বলুন ?'

'কেন, পুরুতে ? তাঁদের টাকা দিলে ত সব কাজই হয় শুনেছি ?'

'হয়, পূজা হয়, কিন্তু এ কাজ হয় না।'

'ও আমি পারব না।'

'জানি কত অপ্রিয়।'

'বেশ ·······আমি অপ্রিয় কাজ করতে কখনও দ্বিধা করিনি, নচেৎ এমন হয়।'

'তাকে অপ্রিয় কাজ বলে না। তাকে আপনার মনোমত ক'রে গড়ে তোলা আপনার নিতান্তই প্রিয় কাজ ছিল।'

'তবু আপনি গড়ার কথা তুললেন। সাবিত্রী বলত তাকে অযথা বকতেই আমার ভাল লাগে।'

'আমি তা কখনও বলিনি!'

'ঐ দেখুন! নানা মুনির নানা মত! আপনি বলতেন বলছি না, সেই নিজে বলত।'

'কেন— আপনার কি ধারণা নয় যে আমিই তাকে সব শেখাতাম ?'

'আপনি শেখাতেন বলতাম না; সেই শিখত, তার স্বভাবটা একটু দুর্বল ছিল কিনা, তাই! আপনার দোষ আমি কখনও দেখাই নি।'

'ও সব আলোচনা পরে হবে, এইবার উঠুন, দেরি হবে।'

'এই উঠছি·······একটু বসুন না·······আমার খিদেই নেই।'

'খিদে আপনি বুঝতে পারেন না। ভাতের কাছে একবার বসুন ত, সেই

সকালে একটুকরো টোস্ট খেয়েছেন।'

'খাবই না ভাবছি ; একটু চা হলে মন্দ হয় না, কী জড়তা আসছে।'

'এখন চা খায় না। এই করেই শরীর মাটি করেছেন। চলুন, উঠুন, তার পর বিশ্রাম করবেন'খন।'

'আচ্ছা, চলুন, কিন্তু তার পরে বাড়ি যাব। চাকর-বাকরগুলো ভাবছে।'

'খবর পাঠিয়েছি।'

'পাঠিয়েছেন এরি মধ্যে। আপনি খুব·······'

রমলা দেবী গম্ভীরমুখে উঠে দাঁড়ালেন। খগেনবাবুকেও উঠতে হল। পাশেই স্নানের ঘর। কোলকাতা শহরের বাড়িতে ঐ রকম বড় স্নানের ঘর পাওয়াই যায় না। বেশ বড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শুকনো, মেঝে বিলিতী টাইলের, স্নানের সব সরঞ্জামই রয়েছে, সল্‌টস্ স্পঞ্জ, শাওয়ার, আরসি, কেমন একটা গন্ধ ভরভর করছে···একটু উগ্র, তাও ভাল। উঃ কালকের গন্ধটা কী বিদকুটে! উনুনের ওপর ফ্যান পড়ার মত! খগেনবাবু কল খুলে দিলেন— জল পড়ল না, দেরি হয়ে গিয়েছে। নাইবার টবে জল ভর্তি। মাথায় একটু সুগন্ধি তেল ঘসে টবের মধ্যে নেমে পড়লেন, ছলাৎ করে মেজের উপর জল উপচে পড়ল, এই যাঃ মেজেটা ভিজে গেল! বেশ ঠাণ্ডা জল, নিশ্চয়ই সল্‌টস্ দেওয়া হয়েছে, বরফ বোধ হয়, না হলে অত ঠাণ্ডা! আঃ শরীর জুড়িয়ে গেল। লাল এনামেলের ঘটি দিয়ে মাথায় জল ঢাললেন— সেই কাল রাত্রে গঙ্গার জল মাথায় ছেটান! ভাল ক'রে সাবান মাখলেন। সাবিত্রী কখনও স্নানের ঘরে গান গেয়ে ওঠেনি, খগেনবাবু গাইতেন, সাবিত্রী বলত 'দেরি হচ্ছে, বেরিয়ে এস' বাইরে এসে তিনি বলতেন 'তোমার বন্ধু গান না?' 'তোমরা ভাইবোনে গাওগে না, আমার কী?' কথা বন্ধ হয়ে যেত। নাঃ আর দেরি করা চলে না, মেমসাহেবের দেরি হবে খানা খেতে। এমন বাথরুম না হলে স্নান ক'রে সুখ নেই। দেশী হোটেলে নাইবার বন্দোবস্ত নেই, বিদেশী হোটেলেই উঠতে হবে!, পাড়াগাঁয়েই অবগাহন শোভা পায়। দু'দিন পরে— কতদিন পরে রমলা দেবী ও পুরুতঠাকুরই জানেন— কিছুকালের জন্য তিনি দূরদেশে চলে যাবেন। সাহেবী হোটেলে ঘণ্টা বাজলে খেতে হয়, খিদে পাক আর নাই পাক! সর্বক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হবে— সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি। তার চেয়ে চলে যাবেন, গ্রামে, নদীর ধারে, যেখানে অবগাহন ক'রে শুদ্ধ হবেন, মুক্ত হবেন ; ছোট্ট নদীর ঐ ওপাশে আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে, যে আকাশের দিকে বলাকার দল ছুটলে ভয় হয় ধাক্কা খেয়ে হয়ত আবার তাদের ফিরে আসতে হবে— কোথায় আসবে? নীড়ে? নাঃ কোলকাতায় থাকা তার পরে অসম্ভব।

খগেনবাবু চুল আঁচড়ে, টার্কিস তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে, ফরসা ধুতি পরে বাইরে এলেন। দরজার গোড়ায় রবারের পা-পোশের ওপর একজোড়া রঙীন স্যাণ্ডল্। রমলা দেবী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন একটা নেটের গেঞ্জি নিয়ে। কার গেঞ্জি? কিন্তু খালি গায়ে কী ক'রে খেতে বসবেন? গেঞ্জিটা স্নানের ঘরে গিয়ে পরলেন, টাবের প্লাগটা খুলে দিলেন—হুড়হুড় করে জল বেরিয়ে গেল, মেজেতে জল থই থই করছে, পা দিয়ে বার করতে চেষ্টা করলেন, থাকগে দেরি হচ্ছে। খগেনবাবু বাইরে এলেন, রমলা দেবী তাঁকে অন্য একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। টেবিলে খেতে হবে, পাশের টেবিলে কাচের বাসনে খাবার ঢাকা রয়েছে। রমলা দেবী বড় চামচে দিয়ে পরিবেশন করলেন—সরু চালের ভাত, শুকতো, মোচার ঘণ্ট, বিউলির ডাল, পুরের ভাজা, দই। পাতে ঘি, বেশ গন্ধ, বিউলির ডালে আদা ও জিরে ভাজার গন্ধ। মাছ নেই। রমলা দেবী তা হলে দেশী রান্নাও জানেন। সাবিত্রী তাই বলত, পুডিং শিখেছিল তাঁর কাছে। খগেনবাবুর খিদে পেয়েছিল, অভ্যাসও তাঁর তাড়াতাড়ি খাওয়া। রমলা দেবী তাঁকে তাড়াতাড়ি খেতে বারণ করলেন, শরীর খারাপ হবে। মুখে আপত্তি জানিয়ে ধীরে ধীরেই খেতে লাগলেন—'আমার চিরকালের অভ্যাস।'

'সেই জন্যই শরীর খারাপ।'

'সেজন্য নয়। খাওয়ার ব্যাপারটা যত শীঘ্র সমাপ্ত হয় ততই ভাল।'

'কেন?'

'ভারি ভাল্‌গার! লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়া উচিৎ, যেমন গিন্নীরা খেতেন, রান্না ঘরে বসে, ভাল জিনিষও পেতেন। খাওয়া-দাওয়া অসূর্যম্পশ্যা হওয়াই উচিৎ। মাপ করবেন, আমি ভারি সেকেলে। সকলের সামনে স্নান করা যায় কি? অথচ স্নান ত একপ্রকারের, শুদ্ধি! কিছু মনে করবেন না।'

'মনে করছি না, কিন্তু ওটা আপনার খেয়াল। আর খেয়ালটা হয়েছে কেন তাও বলতে পারি।'

'বলুন না।'

'বুদ্ধির জন্য। বুদ্ধির চাষ করলে দেহকে ঘৃণা করতে শেখে।'

'ঠিক বলতে পারলেন না। ছেলেবেলায় উঠতে দেরি হত, পড়াশুনা শেষ করে খাবার সময় থাকত না, ছুটে স্কুল-কলেজে যেতাম।'

'বেশি রাত জাগতেন বুঝি?'

'জাগতেই হত। রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডাই দিতাম, কলেজে সুনাম বজায় রাখতে হবে ত।'

'সেই একই কথা। আচ্ছা, ছেলেবেলা থেকেই খুব পড়াশুনা করতেন বুঝি?'

'করতাম, স্কুলে মন্দ ছেলে ছিলাম না, কলেজে হলাম দুর্দান্ত, পাঠ্যপুস্তক ভাল লাগত না, পড়তাম বাজে বই, যা পেতাম তাই।'

'দুর্দান্ত! আপনি আবার দুর্দান্ত!'

'সত্যি, কী রকম হয়ে যাই ঐ সময়টায়। ঠিক খারাপ হওয়া যাকে বলে তা হই নি, তবু একটু বুনো হয়ে যাই— ওয়াইলড্ গোছের।'

'বুনো? বলুন না, আপনার ছেলেবেলার কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।'

'বলবার এমন কিছু নেই, তবে·······'

'তা আবার নেই! আপনি ত কলেজের কীর্তিমান ছেলে!'

'পরীক্ষায় নয়। তেমন কীর্তি কিছু রেখে আসি নি— এক ম্যাগাজিন বার করা, থিয়েটার করা, ডিবেটিং ক্লাবে তর্ক করা ছাড়া; আমাদের সময় ধর্মঘট ছিল না। লেকচার শুনতাম নির্বাচন ক'রে। বাকি সময়টা আড্ডা আর আড্ডা, তারপর গভীর রাতে পড়া, পাগলের মতন পড়তাম, বই কিনতাম আর পড়তাম, বই-এর সঙ্গে ফাঁকি দিই নি। মধ্যে মধ্যে থিয়েটার দেখতাম ও করতাম।'

'আবার থিয়েটার করাও হত? কিসের পার্ট করতেন? বলব? মেয়েদের, নিশ্চয়··· বেশ মানাত!'

'তা বুঝি মানায় কখনো! তবে দিত জোর ক'রে, ছোট্ট ছিলাম, তাই। মেয়ের পার্টও করেছি, ভাল লাগত না, লজ্জা করত, আপনাদের পার্ট আমি বুঝি না। একবার অমৃতলাল শেখাবার জন্য এসেছিলেন, তিনি অবশ্য ভাল বলেছিলেন— কিন্তু ও সুখ্যাতির মানে নেই!'

'তাঁর সুখ্যাতির মানে নেই ত থাকবে বুঝি আমাদের!'

'সেবার চন্দ্রগুপ্তে অ্যান্টিগোনাসের পার্ট করি, মন্দ হয় নি, কিন্তু সেকি বিপদ!'

'হেলেন ও ছায়া সেজেছিলেন কাঁরা?'

'কলেজেরই ছেলে। সেই ত বিপদ! সে ভারী মজা হয়েছিল— সে সব কথা আপনি বুঝবেন না, পুরুষদের ছেলেমানুষি কথা শুনে লজ্জা পাবেন!'

'আপনিই দেখছি লজ্জা পাচ্ছেন। বলুন না, যদি অন্যায় না ক'রে থাকেন!'

'না আমি আর অন্যায় করলাম কোথায়? আচ্ছা, বলছি। আমি ত অ্যান্টিগোনাস, একজন ছায়া, আর একজন হেলেন, দু'জনে কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে ভাল না বেসে আমাকেই ভালবেসে ফেল্লে। ভারী বিরক্ত করত! স্টেজে নয়, বাইরে! শেষে চিঠি পর্যন্ত! হোটেলে যেতে হবে, সিনেমা যেতে হবে, অথচ তারা নিচের ক্লাসে পড়ত। ছেলেরা ঠাট্টা শুরু করলে। পড়া বলে দিন, বই ও নোট ধার দিন, এই ক'রে সূত্রপাত। বন্ধুরাও মজা পেলে। আমার সঙ্গে তাদের আলাপ

গাঢ়তর করবার দোহাই-এ দুচারজন চালাক ছোকরা তাদের ঘাড় ভেঙ্গে খেতে লাগল। ভারী দুঃখ হত, কিন্তু তখন তাদের বারণ করে কে? শেষে দুজনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া, প্রাণ আমার যায় আর কী?'

'কি করলেন?'

'দুজনের মধ্যে ভাব করাতে গেলাম, ফল হল না, আলাদা ডেকে প্রত্যেককে বোঝালাম, ফল হল না, একজনকে ডেকে এনে নিজের ছবি দিলাম, বললে তা হবে না, এক সঙ্গে ছবি তুলিয়ে তবে ঠাণ্ডা। অন্যটিকে আর সন্তুষ্ট ক'রতে পারলাম না; ভয় দেখাত, নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, উচ্ছন্ন যাবে চোখের সামনে। ছোকরা গেলও তাই, আমার সামনে নয়, আমি তখন পশ্চিমে বেড়াতে যাই, আমার দোষেও নয়, নিজের দোষে। সে দিন দেখা হয়েছিল, চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, চেনাই যায় না, কিন্তু চোখ তেমনি ঢুলু-ঢুলুই আছে। এমনি ক'রে চাইলে যে আমি কেমন আছ জিজ্ঞাসা করেই দেছুট!'

'আপনার ভারী অন্যায়!'

'নিশ্চয়ই নয়, অমন ভাবপ্রবণ, না, না, আমাকে আর দেবেন না, দই খাব না, আচ্ছা— তাই দেবেন দুপুরে ঘোল ক'রে— চিনি দেবেন না···কোথায় অন্যায় বলুন? মানুষ নাকি ঐ কারণে আবার উচ্ছন্ন যায়! ও সব মেয়েমানুষে, I mean অশিক্ষিত মেয়েরাই করে, পুরুষ আর মেয়েতে তফাত কী তা হলে? আপনি বুঝি তফাত আছে মানেন না?'

'জানি না·······আর নেবেন না? পাখির আহার···এইবার চলুন একটু জিরুবেন। ন্যায় অন্যায় নিয়ে তর্ক করতে আপনার সঙ্গে পারব না, তবু কেমন ইচ্ছে হয় শুনতে। চলুন, আপনার বন্ধুদের গল্প শোনা যাক, যদি একান্ত অনুপযুক্ত পাত্রী না মনে করেন।'

খগেনবাবু উঠে পড়লেন। মুখ ধুয়ে ডিশ থেকে সুপারি এলাচ তুলে নিলেন, পান খেতে নেই বুঝি, মুখশুদ্ধি বলে না? একজনের মৃত্যু, অন্যের শুদ্ধি, ভাল ব্যবস্থা। ওপরেরই বসবার ঘরে এসে বসতে না বসতেই রমলা দেবী এসে পড়লেন।

'রোদ্দুরের ঝাঁজ আসবে, পশ্চিমের জানলা বন্ধ ক'রে দিই?' 'কিন্তু একটু পরেই আমি যাব।' 'বেশত! রোদ্দুর একটু চলুক, ততক্ষণ বিশ্রাম করুন, তারপর যা হয়···'

'যা হয় নয়, আমাকে যেতেই হবে··· ···আমাকে ছেড়ে দিন···এবার যাই?'

'ছেড়ে দিন মানে?'

'না, না, আমি তা বলছি না, মাপ করুন আমাকে···মানে— আমার কাজ আছে তাই বলছি। অনেক ধন্যবাদ·······এখনি যাচ্ছি না ত, আপনি ঘুমুবেন

না ?···এখন একটু বিশ্রাম করুন গে·······বিকেলে আবার হয়ত দেখা হবে···কোথায় বা যাব ?'

'যাবার আসে চা খেয়ে যাবেন, না সরবৎ ? বাড়িতে খবর দিয়েছি।'

'চা— আপনি একটু জিরিয়ে নিন গে·······'

রমলা দেবী চলে যাবার পর খগেনবাবু বিশ্রাম করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় সুজন ধীরে ধীরে দরজা খুলে ঘরের মধ্যে এলেন। 'বড্ড দেরি হয়ে গেল আসতে, আপনি বুঝি····' 'না, আমি বেশ ঘুমিয়েছি, আমার ঘুম পাবে না, আপনি বসুন না, উনি এই মাত্র শুতে গেলেন।' 'না, না ডাকবেন না, এখন না হয় যাই ?' 'বসুনই না'; সুজন এসে চুপ ক'রে বসে রইলেন। অপরিচয়ের শূন্য ব্যবধানে খগেনবাবু আড়ষ্ট বোধ করছিলেন, সুজনের মুখে ও চোখে সহজ ভাবটি লক্ষ ক'রে আশ্বস্ত হলেন····'আপনি সিগারেট খান ?' 'সচরাচর খাই না, এখন খাব না।' 'এক গেলাস জল দেবো ? বাইরে বড় রোদ্দুর, তাই গেলাম না।' 'এই মাত্র খেয়ে আসছি।' 'তা হলে কি দেবো ?' সুজন একটু হেসে উত্তর দিলেন, 'এ বাড়ির সঙ্গে, রমলাদির সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ।' তাওত বটে! ইচ্ছা হচ্ছিল কতদিনের আলাপ জিজ্ঞাসা করতে, কিন্তু ঐ ধরনের প্রশ্ন করাটা অসভ্যতা মনে হল। পরিচয়ের আবার ক্রমিক ইতিহাস কি ? দুজনে চিরদিন একত্র বসবাস করলেও পরিচয় হয় না, আবার এক মুহূর্তেই ব্যবধান অপসৃত হয়, সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, হঠাৎ যেন চোখ খোলে, ছানি খসে যায়। ছানি কাটাতে হয়, অস্ত্রের সাহায্যে, অতি ধারালো ও সূক্ষ্ম অস্ত্র, কয়েক সেকেণ্ডের অস্ত্রোপচার, তারপর চোখ বেঁধে কয়েক দিনের জন্য শুয়ে থাকতে হয়, শবের মতন, সে সময় কাশতে পর্যন্ত মানা। পরিচয়ের জন্য ধীর, শান্ত ও মৌন প্রতীক্ষার প্রয়োজন, চারপাশের ভিড় সরান দরকার, গোধূলির নীরব অবসরে একটি তারা ফোটার মতন। সাবিত্রীর সঙ্গে পরিচয় ঝড়ের মধ্যে— ভাবপ্রবণতার আবর্তে, তাই আলাপ জমল না। রমলা দেবীর সঙ্গে পরিচয় শুরু ঝড়ের পরে, ভাব যখন নিঃশেষিত হয়েছে, তখনও ঝড়ের স্মৃতি রেশ টানছে। সুজনের সঙ্গে কখন পরিচয় ঘটবে ? ধরিত্রী যখন শীতল হয়েছে, ঝড়ের চিহ্ন যখন লোপ পেয়েছে, বিশ্রামের পর যখন প্রাণটা, চোখটা জুড়িয়েছে। সুজনের মধ্যে একটা শীতলতা রয়েছে, বর্ষাস্নানের শীতলতা, বরফের কঠিন শৈত্য নয়।

সুজন বল্লেন, 'আপনার খুবই কষ্ট হয়েছিল কাল।'

'কষ্ট একটু হয়েছিল বৈকি।'

'চোখের জ্বালা কমেছে ?'

'অনেকটা। আপনার বুঝি চোখ খারাপ ?'

'বিশেষ নয়।'

'জল পড়ে, মাথা ধরে?'

'পড়ত, চশমা পরে সেরে গেছে তাই এখন আর বেশি পরি না।'

'অস্বস্তি হত না?'

'খুব, পরে অভ্যাস হয়ে যায়। কৃত্রিম, তাই কষ্টকর।'

খগেনবাবু হেসে বল্লেন, 'কৃত্রিমতাকে বাদ দেওয়াই চলে না।'

'তা বটে, তবু...'

'তবু কি?'

'অভ্যাস হয়ে গেলেই সহজ।'

'অভ্যাসের মধ্যেও জোর জবরদস্তি রয়েছে। জোর করেই অভ্যাস করতে হবেত!,

'আজকের জোর, পরশুর অভ্যাস।'

'সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে জবরদস্তি কোথায়?'

'সহজ প্রবৃত্তির, instinct-টাই তাগিদ। তার চেয়ে অত্যাচারী, জবরদস্ত কে আছে? জোরকে সভত্যা থেকে বাদ দেওয়া যায় না কিছুতেই।'

'রূপান্তরিত করাও যায় না?'

'তাও বলপ্রয়োগ।'

'একটা কোথায় যেন পার্থক্য আছে মনে হয়।'

খানিক চুপ ক'রে থেকে খগেনবাবু বল্লেন, 'তফাত ভেতরের জোরে আর বাইরের জোরে। তাও এমন বেশি কি?'

'নিজের বেলায় সংযম, পরের বেলা অত্যাচার।'

'দুইই এক। দুইই উদ্দেশ্যচালিত।'

'উদ্দেশ্য স্বীকার করেন না?'

'স্বীকার করাটি কি অর্থে প্রয়োগ ক'রছেন? অস্তিত্ব মানা আর সহজে আপন হতে ভাল লাগা এক বস্তু নয়। যে ব্যক্তি সংযমী সেও একটা সত্য কিংবা মিথ্যা আদর্শ খাড়া করে, যার তাগিদে সে সাধনা করে।'

'যদি আদর্শটা সত্য হয় তা হলে ক্ষতি কি?'

খগেনবাবু একটু জোরে হেসে উঠলেন, 'তা হলে আপনার মতে আদর্শের শ্রেণী-ভেদ আছে। কিন্তু সত্য বাছবেন কি ক'রে? লোকের ব্যবহার দেখে মনে হয় মিথ্যা আদর্শকেও সত্যে পরিণত করা যায়। সফলকাম হবার জন্য যে আদর্শ মানুষকে যত বেশি খাটিয়ে নিতে পারে সেই আদর্শই ততখানি বেশি সত্য। তা ছাড়া, সকলেই ভাবে নিজের আদর্শের জন্য খুবই খাটছে, অতএব নিজের আদর্শই

সত্য, এক মাত্র সত্য। আমারও তাই ধারণা, আমার সঙ্গে অন্যের তফাত হল এই যে, আমার বেলায় ঐ ব্যক্তিগত ধারণাটা সত্য, অন্যের বেলায় যাচাই দরকার।' সুজনের মুখে স্মিতহাস্য দেখে খগেনবাবু একটু অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে বল্লেন, 'আদর্শের অত্যাচার আপনি মাথা পেতে নিতে পারেন? নিজের আদর্শই বলছি।'

'পারতে হয়।'

'অত শীঘ্র দুহাত তুলে পরাজয় স্বীকার করতে শিখলেন কি ক'রে?' কথাবার্তায় একটা ছেদ পড়ে গেল। খগেনবাবু সুজনকে একটা সিগারেট দিলেন, সুজন নিলেন না, কেসে সেটা রেখে আর একটি বার ক'রে ধরালেন।

'আচ্ছা সুজনবাবু?'

'সুজন বলুন।'

'আচ্ছা, সুজন, আদর্শ বুকের মধ্যে নিতে এত কষ্ট হয় কেন?'

'জেনে শুনে নিলে কষ্ট হয় না বোধ হয়।'

'ঠিক বলেছো জানলেই কষ্ট থাকে না। যাঁরা বলেন— ভগবানকে না মেনে উপায় নেই তাই মানতে বাধ্য হয়েছি তাঁরা ভগবানকে ত অপমান করেনই, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মত অমন একটি নিষ্কাম জিনিসকে দৈহিক অভাবের সঙ্গে যুক্ত ক'রে নিজের শুদ্ধ অংশকেও অপমান করেন। আমি অবশ্য কোন নিষ্কাম ভাবের ওপর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই না। আদর্শকে গ্রহণ করলেই সেটা নিয়তি হল, কিন্তু নিয়তির নিয়ম জানাই স্বাধীনতা। কিন্তু সকলে নিয়ম না জানতে চেয়ে আদর্শকে অন্ধভাবেই গ্রহণ করেন, জানেন ত? তাঁদের বেলা?'

'তাঁদেরই কষ্ট।'

'কষ্ট নয় কেবল, মৃত্যু, অপমৃত্যু, ধার্মিকসমাজ আবার তাঁদেরকে martyr বলে! যে বিষ খায় সেই কি কেবল আত্মঘাতী? আশ্রমে যাদের অপমৃত্যু হচ্ছে তাদের হিসেব কে রাখে? কোন আদর্শের এমন ক্ষমতা নেই যে পরকে গড়ে তোলে! গড়ে তোলা যায় না, যদি পর নির্বোধ হয়।'

'এখানে বুদ্ধির প্রয়োজন কি?'

'প্রয়োজন, নিয়তির নিয়ম জানতে। আপনার রমলাদিকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

'আপনিই বলুন না'

'তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি বুদ্ধিমতী।'

'জানি; আপনি বলুন।'

'আমি কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারিনি। বোধ হয়, আপনিই ঠিক বলেছেন।

রমলা দেবী থাকলে এই কথাই বেশি ভালভাবে গুছিয়ে বলতেন, ডাকুন না। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।'

'তার চেয়েও বেশি।'

'আর বেশি কি হতে পারে?'

'হৃদয় আছে।'

'নিজের হৃদয়েরই পরিচয় দিচ্ছেন।'

'আলাপ করলেই টের পাবেন।'

'পূর্ব হতেই সাহায্য করুন।'

'বন্ধুত্ব করাতে আমি খুবই তৎপর! আজ কিন্তু নয়, রমাদি আসবার আগেই যাই, কাজ আছে।'

'আপনার সকালে আসবার কথা ছিল না? আবার না দেখা করেই পালাচ্ছেন?'

'কাজ ছিল বল্লেই তিনি বুঝবেন।'

'আপনিও দেখছি খুব কাজের লোক।'

'কাজের নেশা আছে স্বীকার করি।'

'সত্যি! ঐ নেশাই বোধ হয় সব চেয়ে ভয়ঙ্কর! জীবনে কখনও কাজকে ছুঁইনি সেইজন্যে। কাজের নেশার ভয়ে চিন্তাশীল হয়েছি।'

'চিন্তার পিছনে ভাষা আছে এবং ভাষার আদিতে ও অন্তে কাজ আছে এই শুনেছি, আপনি কি মনে করেন?'

'ঐ ধরনের ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানে বিস্তর গলদ আছে। এই ধরুন, একজনকে আমার অন্যের চেয়ে বেশি ভাল লাগছে। এই আপেক্ষিকতার অন্তরে কাজের কোন বালাই নেই। বেহাগ বাঁচিয়ে শঙ্করা গাওয়া হচ্ছে, দুটো রাগিণীর মধ্যে পার্থক্য বেশ বুঝলাম, এই পার্থক্যানুভূতির মধ্যে কাজের তাগিদ কোথায়?'

'তৃপ্তিসাধনের ফলে দৈহিক সামঞ্জস্যবিধানে?'

খগেনবাবু একটু বিস্মিত নেত্রে সুজনের দিকে চাইলেন, বেশ শান্তভাবটি, সুজন চোখ নামিয়ে নিলে— তারপর আস্তে আস্তে বল্লে, 'অবশ্য, একে কাজ নাও বলা চলে।'

'সামঞ্জস্যবিধানও কাজ বটে। বোধ হয় সব চেয়ে বড় কাজ।'

'আচ্ছা এখন আমি যাই, রমাদি উঠে পড়লে আমার যাওয়া হবে না।'

'চলুন আমিও যাই।'

'এই রোদ্দুরে! সে হতেই পারে না'

'রমাদি বুঝি আটক করবেন? এলে যাওয়া হবে না কেন?

'নিজেই আটক হব।'

সুজন আস্তে আস্তে দরজা খুলে চলে গেল। খগেনবাবু চুপ ক'রে শোফায় শুয়ে রইলেন। খানিকপরেই রমলা দেবী এলেন, পর্দা সরাতেই চোখাচোখি হয়েছিল। উঠে বসতে বসতে খগেনবাবু ধুতিটা পায়ের আঙুল পর্যন্ত টেনে দিলেন, 'বসুন'।

'ঘুমিয়েছিলেন?'

'না, সকালে যা ঘুমিয়েছি, আপনি ঘুমোননি?'

'দুপুরে ঘুমুই না।'

'মেয়েদের মধ্যে যাঁরা দুপুরে ঘুমোন না, তাঁরা সন্ধ্যাবেলাতেই ঢুলতে থাকেন। অবশ্য ঐ সময় আপনাদের পার্টি থাকে।'

রমলা দেবী একটু হাসলেন। খগেনবাবু বল্লেন, 'অবশ্য আপনার কথা নয়, আপনি সুগৃহিনী, নচেৎ এই শ্রী আসে কোথা থেকে?'

'চা এখনি দেবো? চলুন ঐ ঘরে।'

'এই ঘরেই আসুন— চা-এর সময় অ-সময় নেই, বোধ হয় স্থান অস্থানও নেই, পারছিনা উঠতে।'

রমলা দেবী নিজ হাতে ট্রে সাজিয়ে আনলেন, কাচের টপ্ দেওয়া একটি ছোট টেবিলের ওপর ট্রে, আর একটির ওপর কিছু ফল রেখে চা ঢাললেন।

'সুজন এসেছিল।'

'সুজন? চলে গেল বুঝি?'

'কাজ আছে বল্লে, কাজ নেই বুঝি?'

'থাকবে না, কেন? সরে যাওয়াই ওর কাজ; হয়ত বিজনের কাছে গিয়েছে, টেনিস র‍্যাকেট সারাতে।'

'সৎ ছেলে!'

রমলা দেবী চুপ ক'রে রইলেন দেখে খগেনবাবু প্রশ্ন করলেন, 'এটা বুঝি গোয়ালিয়র পোটারির?'

'না'।

'বিলিতী?'

'হুঁ, সেট্‌টা পুরানো, গোয়ালিয়রের ফিনিশ, ভাল কি?'

'চমৎকার হচ্ছে আজকাল। আপনি বুঝি বিলিতীর ভক্ত?

'না'

'না আবার! শাড়িতেই নন কেবল।'

'যার যেটুকু ভাল তার সেইটুকু নিতেই ভাল লাগে।'

'মানুষ হাঁস নয়।।'

'আপনার ত তাই বিশ্বাস! গোটা মানুষকে নিতে পারেন? দোষগুণ মিশিয়ে?'

খগেনবাবু নীরব রইলেন। সত্যি কথা, গুণই তিনি ভালবাসেন, মানুষকে নয়! কিন্তু বিলিতী জিনিস ভালবাসি বলবার মধ্যে দাম্ভিকতা আছে। রমলা দেবী ফ্যাশানের বিপক্ষে গিয়ে ফ্যাশান করতে চান। সাবিত্রীর সঙ্গে এই জন্যই তাঁর রুচি-বিরোধ ঘটত, শিষ্য আবার গুরুর চেয়ে এক কাটি সরেশ। এই গান্ধীর যুগে ভারি বিসদৃশ ঠেকে, একেবারে অসভ্যতা। সাবিত্রী বলত, খদ্দর পরাটাই ফ্যাশান, শীতকালে তবু চলে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অচল। তা নয়, জর্জেটের ভেতর দিয়ে পেটিকোট দেখান যায়, খদ্দরের ভেতর দিয়ে যায় না— সাবিত্রী ঐ কথা শুনলে চটে যেত, কিন্তু হাসি চাপতে পারত না, চাপতে গিয়ে ভাষা বেশি ঝাঁজাল হত, বলত, 'ভারি অসভ্য, অভদ্র'। খগেনবাবু তখন নব্যমনোবিজ্ঞানের নজির উদ্ধৃত করতেন, পোষাকের ইতিহাস বলতেন, সাবিত্রী উত্তর দিত, 'ঐ সব অভদ্র ইঙ্গিতপূর্ণ বই পড়ে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে জাননা।' খগেনবাবু জবাব দিতেন, 'পরবে জর্জেট আর ব্রাসিয়ার, মাখবে পাউডার পমেটম, আর ফ্রয়েড ফ্লুগেলে আপত্তি! যদি না জানতাম!' 'কি জান, এখনি বল, বলতেই হবে, ছাড়ব না।' খগেনবাবুর মুখে প্রত্যুত্তর আসত অনেক, কিন্তু বহিষ্কৃত হতে না পেরে অস্ফুট উত্তরগুলি চিবুককে সুদৃঢ় করেই তুলত। জবাব না পেলে সাবিত্রী বেশি চটে যেত, তাই দেখে খগেনবাবু অপ্রস্তুতের হাসি হাসতেন, ভাবতেন, মেয়েরা কখনও বিজ্ঞানকে বরদাস্ত করতে পারে না, কারণ মেয়েরা সব কষ্ট সহ্য করতে পারে, পৌনঃপুনিক জননী হতেও আপত্তি করে না হয়ত, কিন্তু ভাববার কষ্ট সহ্য করতে পারে না; তারা সব অনুরোধ রক্ষা করবে, গভীর রাতে ভাঁড়ার ঘর থেকে স্বামীর সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই এনে দেবে, কিন্তু ভাববার অনুরোধ পালন করবে না; চেষ্টা করবে ভ্রূ কুঁচকে, গালে হাত দেবে, ছোট্ট ফাউনটেনপেন ঠেকিয়ে, কিন্তু উদ্দেশ্য ভাবা নয়, উদ্দেশ্য, আমি ভাবছি, ভেবে তোমাকে কৃতার্থ করছি, আর ভাবতে ভাবতে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ, বল— উদ্দেশ্যটি এরি আমন্ত্রণ, পালটা অনুরোধ! রমলা দেবীও নিশ্চয়ই ঐ প্রকৃতির, গান্ধী এসে ভাবিয়ে তুলেছেন বলেই তাঁর খদ্দর পরা হল না, জর্জেটে কোন ভাবনার খোঁচা নেই, বেশ মিহি। তাই, উলটে, খদ্দর পরার ফ্যাশানের নিন্দে, তার বিপক্ষে বিদ্রোহ, যার যেটি ভাল বেছে নেবার অজুহাতে আত্ম-প্রবঞ্চনা। এঁদের সঙ্গে কথা কওয়া চলে না, খোসামোদ, তাও চেহারার। কী অদ্ভুত ধারণা ছিল সাবিত্রীর! কুরূপাই পড়াশুনা করে, বড় বড়

কথা কয়, মেয়েদের অনুপযুক্ত ও অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করে, পাশ করলে চেহারা খ্যাংরাকাটির মত হয়, মুখ আমসি হয়, চোখ কোটরে ঢোকে, চোখের কালি ঢাকতে চশমা পরতে হয়, হাতে চুরি ঢলঢল করে, গড়ন খারাপ হয়, মেজাজ রুক্ষ হয়, মেয়েলি মিষ্টত্ব লোপ পায়, সুখী হয় না……আরো কত কি? একলা সাবিত্রীদের দোষ কি? বিদুষীরা সাজগোজ করেন না ঐ একই কারণে, সুন্দরী নন জেনে ও রেগে। সমাজের ওপর তাঁদের কি ভীষণ অভিমান। আজ যদি হেদোতে ডুব দিলে কুরূপা স্বরূপা হতেন, তা হলে হেদোর পশ্চিম দিকের প্রতিষ্ঠানটি অনেক পূর্বে উঠে যেত! মন্দ হত না, পৃথিবী সুন্দর হত। হেদোর পূর্বদিক আনন্দময় হয়ে উঠত। তখনই পড়াশুনার যথার্থ কদর হত, তখনই খদ্দর ও জর্জেটের পার্থক্য ধরা পড়ত। ইতিপূর্বে মুড়ি ও মিছরির দরের তফাত দাম্ভিকতায়, সৌন্দর্যের আভিজাত্য-বোধে। মেয়েদের দাম্ভিকতা সহ্য হয় না; মানলে বেড়ে যায়, অথচ অভদ্রতা করা যায় না, মাত্র শ্লেষই চলে।

'আপনাকে কিন্তু খদ্দর পরলে মানাবে ভাল।'

'আমাকে মানাবার জন্য ব্যস্ত কেন?'

'আরো সুন্দর ভালবাসি বলে।'

'ওটা অভ্যাস-মাত্র।'

'অভ্যাস নয় অভাব।'

'ফল খান।'

'ফল খাই না, দেখি; দেখতেই ভাল লাগে, খেতে ভাল লাগে না। চোখেরও ভোগ আছে।'

'ফল খাওয়া ভাল।'

'ভিটামিনের উল্লেখ করবেন না জোড় হাত করছি। চা-এর সঙ্গে ফল অচল। তা ছাড়া মনে হয় রোগী। সাবুর সঙ্গেই ফল, চা-এর সঙ্গে ডালমুট।'

'খাবেন? আনাব?'

'এখন থাক, অসুখ হবে বল্লেন না!'

'ভুল হয়েছে। অভাব কেন? সাবিত্রীত দেখতে খুব ……'

'সুন্দর ছিল। বলতে খটকা বাধে, নয়? কত শীঘ্র সময় কাটে! ঘণ্টায় ৩৬০০ সেকেণ্ড বেগে। অতীত অকস্মাৎ হাজির হয় যেন রবাহূতের মত, আগন্তুকের মত, বাড়ির এক পাগলা খুড়োর মত, অসময়ে—নয়?'

'হাজির হয়, না চলে যায়? ভবিষ্যতই আসে…'

'আর বর্তমান?'

'এই মুহূর্তটুকু, ভারী পিচ্ছিল। নেই।'

খগেনবাবুর হাতে জ্বলন্ত দেশলাই কাটিটা নিবে গেল— চা-এর ডিশে ফেলে দিলেন····

'দেখুন, আমার সব গুলিয়ে যায় সময় সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই। পিছলে যায়ই বটে। কোনটাকে আঁকড়ে ধরব? এক অতীতকেই ধরা যায়, কিন্তু তার জন্য চোখ দুটো সামনে থেকে টেনে উপড়ে মাথার পিছনে বসাতে হয়, পা দুটোকে পিছনমুখো করতে হয়। ভূত হতে রাজি নই। অথচ, কী বিপদ! ভবিষ্যৎকে করায়ত্ত করতে পারি না, তার গায়ে আংটা নেই, টাকারই মতন। কি আর করি?··· দিন এক কাপ চা।'

রমলা দেবী ডিশটা বদলে দিলেন। ফিকে হলদে চায়ে আপত্তি জানাতে রমলা দেবী পটে একটু চিনি ও দু'চামচ পাতা দিলেন। লালচে লিকার শীঘ্রই তৈরি হল। পেয়ালা হাতে নিয়ে খগেনবাবু প্রশ্ন করলেন, 'বর্তমানটা কি?'

'জানি না। আপনিই বলুন না?'

'বর্তমান দেখছি আপনি— অর্থাৎ আপনার সেবাযত্ন খাওয়া।'

'সেবাযত্ন নিতে জানা চাই।'

'আমি খুব নিতে ভালবাসি, আদর খেয়েই মানুষ।'

'শুনেছি সব। আপনার মাসীমা আপনাকে যত্ন করতেন খুব।'

'খুব, ছেলেবেলার কথা মনে নেই। তারপর মাসীমা— মাসীমা আমার বড় ভাল ছিলেন। তারপর সাবিত্রী এল, সেও যত্ন করতে যেতো।'

'যেতো।'

'পারত না, আমার ভাল লাগত না।'

'কি রকম ভাল লাগে?'

খগেনবাবু মুখ নীচু ক'রে হেসে বল্লেন, 'এই যেমন আপনি করেন। অর্থাৎ নীরবে, দাবী না ক'রে; প্রতিদিনের প্রত্যাশা না ক'রে যে আদর করে তাকেই ভাল লাগে, আমি বলছি, সেই আদরই ভাল লাগে। ঠাট্টা করছি না। দেহি দেহি করলে দিতে ইচ্ছা হয় না, প্রাণটা কৃপণ হয়ে যায়।' রমলা দেবী একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, 'একমাত্র সুজনই দেহি দেহি করে না, সে কেবল দিতেই জানে, তাই সে যা পায়···'

'ও বুঝি খুব পায়? আপনি ত বল্লেন সুজন সর্বদাই ব্যস্ত। যে লোক পরের জন্য জীবনধারণ করে তার নিজের অবশিষ্ট থাকে কতটুকু? ঐ প্রকার চরিত্র ঠিক বুঝতে পারি না।'

'সুজনের নিজের জীবনও আছে, বড় চাপা, আপনি নিজেই দু'দিন পরে বুঝবেন।'

'গম্ভীর ছেলে বলুন।'

'মোটেই না, অতি সরল।'

'পরমহংসদেব! মাপ করবেন, ঠাট্টা করছি না। কি বলছেন বোধ হয় বুঝতে পেরেছি। গিরীশ ঘোষের কালাপাহাড় পড়েছেন নিশ্চয়? গিরীশ ঘোষের নাটক পড়া কী দেখা ফ্যাশান নয় জানি, তবু যদি কখনও হঠাৎ হাতে এসে পড়ে থাকে তাই উল্লেখ করছি। কালাপাহাড়ে চিন্তামণি নামে একটি চরিত্র আছে, সে নিজে কিছুই করছে না, অথচ কেন্দ্রের চারধারে বৃত্ত যেমন ঘোরে তেমনি সব চরিত্রই তার চারধারে ঘুরছে, এবং সেই কেন্দ্রচরিত্রের সম্পর্কে এসেই তারা সার্থক হয়ে উঠছে। ঘরে-বাইরের মাস্টারমশাই, ক্যারামজভ্ ব্রাদার্সের অ্যালিয়শা ঐ ধরনেরই চরিত্র; বাকি চরিত্রের অভিব্যক্তি আছে, তাঁদের ক্রমবিকাশ নেই, গোড়া থেকেই স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ম্ভূ। ওঁরাই স্থির ও শান্ত, কারণ ওঁরাই আছেন, বাকি সকলে অস্থির, কেননা তাঁরা তৈরি হচ্ছেন।'

'আমি সুজনকে শ্রদ্ধা করি।' রমলা দেবীর স্বরে অপ্রত্যাশিত গাম্ভীর্য লক্ষ ক'রে খগেনবাবু একটু অপ্রস্তুতে পড়লেন। একখানা বিস্কুট চাইলেন, 'খালি পেটে চা-পান না অস্বাস্থ্যকর?'

'যার যা ধাত!'

'স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে চাইনি, যত্ন পেতে চাই।'

'তা যাই যাই করছিলেন কেন?'

'বাড়ি খালি পড়ে আছে। তা ছাড়া যোগাড়যন্ত্র করতে হবে, ঐ সব কাজের জন্য। বাড়িটা রাখব না ছেড়ে দেবো? চাবিপত্র সব কোথায় কে জানে? সব লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে।' 'বাড়ি যেমন ছিল তেমনি আছে। ও সব কাজ বোধ হয় করতে নেই! সে চাবিপত্র কোথায় রাখত আমি জানি।'

'জানেন? তা হলে বাঁচা গেল। আপনি যদি— একবার কিছু যদি না মনে করেন, একবার যদি গোছান যায় আমার সুবিধায়, তা হলে আর গোল থাকে না। একবার চলুন না?'

'নিজে পারবেন না?'

'জানি না যে! গেলে খুব ভালই হত! আচ্ছা, নিজে গিয়েই দেখি, তারপর না পারি আপনাকে একবার, ও সুজনকে নিয়ে যেতেই হবে। ভাবছি বাড়িটা ছেড়ে দেবো। যেতে ভাল লাগছে না, থাকতেও ভাল লাগবে না, অথচ অমন সুবিধা। বাড়িটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বইগুলো রাখবার জন্য গা আলমারি করিয়ে ছিলাম এই সে দিন! তাই নিয়েই বা কত আপত্তি! বলছিল প্রয়োজন নেই অত খরচ ক'রে ছোট বাড়িতে, অথচ না হলে চলছিল না, শোবার

ঘরে বই-এর জন্য তার দম আটকাত? বই-এর জন্য কারুর দম আটকায়? আপনিই বলুন না? দম বন্ধ হয়, টেবিল চেয়ারে।'

'মেয়েরা অগোছ রাখতে ভালবাসে না।'

'মোটেই না, এমন অগোছাল মেয়ে দেখেছি যে কী বলব! তার আপত্তি ছিল অগোছে নয়, বইএতে। আর, আমি বই গুছিয়েই রাখি।'

'তা বোঝা গেছে, চা খাওয়া দেখে।'

'সে এখানে; একটু হাত পা ছেড়ে বিশ্রাম করব না? মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খল না হলে চলে না।'

'আমিও তাই বলি, হতে পারি না। নিজেকে মধ্যে মধ্যে ছেড়ে দিতে হয়, নয়ত প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।'

'আমিও ঠিক ঐ কথা বলি, সাবিত্রী তা মানত না। তার ধারণা ছিল সর্বদাই মুখোমুখি ক'রে বুঝি স্বামী স্ত্রীতে বসে থাকতে হয়।'

'না বুঝে করত।'

'সে জন্য ক্ষমা করা যায় না, বয়েসও হয়েছিল। যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি—তার সমালোচনা ক'রে লাভ নেই—এখন সে অতীত। ভাল লাগছে না ভাবতে……এখনি বাড়ি যাই, কাজ রয়েছে। আমার আরাম করা সাজে না। এইবার যাই? একবার সুজনকে নিয়ে, যদি ফুরসৎ পান…'

'এখনই?'

'না, না এখন না, যখন সুবিধা হয়, তাড়াতাড়ি কি? নিজেই পারব বোধ হয়, যদি না পারি তখন না হয় দেখা যাবে। আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করলেন, কিন্তু ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন মাত্র অনুভব করছি না!'

খগেনবাবু বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে বেরিয়ে পড়লেন। নিচে দরজা পর্যন্ত রমলা দেবী নেমে এলেন।

'একটা অনুরোধ।'

'কি?'

'এখানেই সন্ধ্যেবেলা খাবেন।'

'দেখি, যদি খাবার না জোটে আসতেই হবে। মুকুন্দের কৃপা!'

তিন

খগেনবাবু কলেজ স্কোয়ারে এলেন। যুবকবৃন্দ দল বেঁধে ঘুরছে, ঘাসের ওপর ছেলে মেয়েরা খেলা করছে। রঙ-বেরঙের ফ্রক আর ফিতে। একটি যুবকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল, খগেনবাবু নিজেকে সামলে নিলেন, যুবকটি ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেল, পৃথিবীতে ছোকরা নাম রেখে যাবে। এই সেই তাল গাছ যার তলায় আড্ডা বসত, নাম ছিল পাম লীগ। সকলেই ইনষ্টিটিউটের সভ্য, কিন্তু সেখানকার সংযত আমোদে প্রাণ ভরত না, তাই সাড়ে আটটার পর ইনষ্টিটিউট বন্ধ হলে সকলে এই তালগাছ তলায় আড্ডা জমাতেন। গান, আলোচনা, খোস গল্প, সবই হত। সেই দলের মধ্যে আবার ছোট্ট গণ্ডী ছিল, যার সঙ্গে যার ভাব বেশি তাদের নাম জুড়ে দেওয়া হত, একজন না এলে অন্যকে নিয়ে তামাসা চলত, তারপর রাত নটা দশটায় চা খাওয়া, থিয়েটারের আখড়া দেওয়া, বাড়ি ফেরার পথে বই ও নোট-সংগ্রহ করা····তারপর চুপি চুপি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ, মাসীমা ঘুমিয়ে পড়তেন, তারপর পড়া শুরু হত, রাত দুটো পর্যন্ত— সূর্য উঠত সাড়ে আটটায়, এগারটায় কলেজ, আবার আড্ডা, আবার কলেজ স্কোয়ার, কী না, হত সেখানে! দিনগুলো সব উড়ে যেত, বন্ধুরা ছিল সব মজার! প্রত্যেকেরই জীবনে এসেছিল এক একটি অনন্ত মুহূর্ত, প্রত্যেকেরই সেই মুহূর্তটি ফসকে গিয়েছিল, তাই প্রাণে ছিল সকলেরই ব্যথা! প্রত্যেকেরই ঠিক নয়, এমন দু'একজন ছিল যাদের জীবন সার্থক, যারা না পড়ে পরীক্ষায় পাশ করত, যাদের দেখেই বৌদির বাপের বাড়ির, বোনের শ্বশুর বাড়ির, মেয়ে-কলেজের বাসগাড়িব সব অনূঢ়া কন্যা ও কিশোরী প্রেমে পড়ত, আত্মনিবেদন করতে প্রস্তুত হত, চিঠিতেই তার প্রমাণ, হাতের লেখা গোল ধরনের····· কিন্তু তারা 'ও-ধরনের' নয় বলেই কোন ব্যাপার ঘটেনি·······বরঞ্চ তারা যতদূর জানতে পেরেছে তাঁতে তাদের প্রতীতি জন্মেছে, এই যে সেই সব মেয়েদের জীবনে দাগ থেকে গেছে, কেউ বিবাহের দিন কেঁদে ভাসিয়েছে, কেউ বিবাহ না ক'রে মাস্টারি নিয়েছে, কেউ বা সন্তানের মা হয়েও বুকে আগুন পুষে রেখেছে, তিব্বতী লামার মত। ভাগ্যবানের সংখ্যা কমই ছিল! খুব কম বন্ধুদের ভাগ্যে মেয়ে জুটত, জুটত যারা তারা ভিন্ন জাতির। সব গল্পই প্রায় মিথ্যা, নিছক মিথ্যা, তবে আত্মবিশ্বাসের জোরে মিথ্যাও সত্য হয়ে উঠত, তাই মজা লাগত! মেয়ে পাওয়া যেত না, তাই ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়তে হত। আজকালকার কত সুবিধা। সত্যের সন্ধান মেলেনা তাই মিথ্যা রচনা করতে হয়, মিথ্যায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তখন পারা যেত, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা বোধ

হয় যৌবনের ধর্ম। সাপের খোলশের মত মিথ্যা পরে খসে যায়, পুরাতন সবেরই মত, মাসীমার স্নেহের মত, সেগুলো সে-সময়কারেরই উপযুক্ত। সত্য চিরন্তন নয়, কালোপযোগিতার খাদে অশুদ্ধ। আজকার সত্য, আসছে কালের মিথ্যে, ইতিমধ্যে জীবন চলেইছে। বেঙ্গলী ব্যাট্যালিয়নের স্মৃতিস্তম্ভে যাদের নাম খোদাই করা আছে তাদের মধ্যে দু'একজনকে খগেনবাবু চিনতেন। করাচী যাবার আগের দিনের কথাও মনে পড়ে, কী ফুর্তি, অন্যের, যারা যাচ্ছে না। তারা চলে গেলে, পরের দিন সেই আড্ডা বসল, দু'একজন কেবল আসেনি! যে কে সেই। অথচ দুঃখ যে হয়নি কে বলবে!

খগেনবাবুর বন্ধু না হলে পড়া হত না, বন্ধু না হলে খেলা দেখা, ছবি দেখা হত না। চা-এর দোকানে তাঁর বিলই লম্বা হত, মাসীমা বিনা আপত্তিতে টাকা দিতেন। মির্জাপুর স্ট্রিট দিয়ে একটি ছোট্ট সুন্দর ছেলে যেত, তাকে এক শিশি ল্যাভেণ্ডার দেবার জন্য কী বোকামিটাই না করা গিয়েছে। খগেনবাবু আবার একটি ছেলের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন, ছেলেটি সাঁতারের পোষাক পরে বেড়া ডিঙ্গিয়ে ক্লাব রুমে ছুটে যাচ্ছিল, হঠাৎ খগেনবাবুর গায়ে এসে পড়ল। বেশ বলিষ্ঠ গঠন, কিন্তু লাজুক, না হলে ছুটে যাচ্ছিল কেন? কলেজ স্কোয়ারে বড় ভিড়, হাঁটা যায় না, কোথা থেকে এত ছেলে এল? অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। কোলকাতা শহরে ভিড় থেকে পরিত্রাণ নেই। বাড়ি পৌঁছে সদর দরজায় খিল দেবেন, তারপর নিজের ঘরে শুয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যাবে।

কলেজ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে দেখেন ইনস্টিটিউটে এক সভা বসেছে, মোটরের গাঁদি লেগেছে। এঁদের সব সার্থক জীবন, কেউ স্মাইলস সাহেবের বই থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কেউ বা উত্তরাধিকারসূত্রে সার্থকতা ভোগদখল করছেন। এঁদের বাড়িতে সব বড় বড় শোবার ঘর আছে, সেখানে বড় বড় খাট পালঙ, নেটের মশারি ঘেরা, তার মধ্যে ট্র্যাজেডি। কারুর ছেলে মাতাল, মা লুকিয়ে মদের টাকা জোগান, পিতা আপত্তি করেন, কারুর স্ত্রী চিররুগ্না, কেউ বা অভি-যোগই শুনে আসছেন, এত রাত্তিরে বাড়ি এলে কেন? সকলের ব্যাঙ্কে টাকা থাকুক আর নাই থাকুক, সকলেই পরস্পরের মূল্য নিরূপণ করেন টাকা দিয়ে। এঁরাই কোলকাতার বড় লোক, সভাসমিতির প্যাণ্ডাল অলঙ্কৃত করেন। খগেন-বাবুর গা গুলিয়ে উঠল, ভারতবর্ষের আদর্শ কোথায় গেল? এই দেশেই না মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ করতে উপদেশ দেয়? রমলা দেবী ত তাই বলছিলেন, ঠিকই বলেছেন, নিষ্কাম ধর্মের মর্মই তাই। কিন্তু পারা যায় না, দোষগুলিই প্রথমে চোখে পড়ে। সাবিত্রীর দোষ ছিল, হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই, গুণও যথেষ্ট ছিল। নিষ্কামভাবে দেখার অর্থই হল গোটাভাবে দেখা, অংশ দেখে বিচার করা নয়।

ভারী শক্ত কাজ, সাধনার প্রয়োজন। নিষ্কাম কর্ম কি উদ্দেশ্যবিবর্জিত? সুজনের সঙ্গে বৃথা তর্ক করলেন, অন্যে তাঁর মনের কথা বলছে শুনে, তাঁর মনের গোপন কন্দরের সমর্থন করছে দেখে তাঁর বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি নেচে উঠছিল। আদর্শ মানতেই হয়, সেই আদর্শের মাপকাঠিতে হবে নিষ্কাম কর্মের সাধনার বিচার। নচেৎ নিষ্কাম কর্ম ভয়ঙ্কর জিনিষ। মধ্য-যুগের শেষে মার্টিন লুথার ও ক্যালভিনের আশীর্বাদে নিষ্কাম কর্ম-প্রবৃত্তি ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে টাকা রোজগারে নিযুক্ত হল, সেই থেকে ধনিক-তন্ত্র, তাই ইনষ্টিটিউটের সামনে মোটরের ভিড়, যার জন্যে পথচলা যায় না। টাকা রোজগার করতে গেলে সন্ন্যাসী হতে হয়, সংসারের অন্য কর্ম থেকে বিরত হতে হয়····বড় চাকরে হতে গেলেও তাই, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, আত্মসম্মান, সংসার, সব জলাঞ্জলি দাও! এ-যুগের সার্থক জীবন এক প্রকার বৈরাগ্য সাধন, তার মূলে থাকা চাই একরোখামি, গোঁড়ামি, পিউরিট্যানিজম। সেই মূলের অন্য কাণ্ড হল বিশেষজ্ঞের মূর্খ অর্থহীন আত্মাভিমান, আত্মপ্রসাদ। আগে ছিল জ্ঞান, সর্বতোমুখী জ্ঞান, তত্ত্ব-জ্ঞানে-নিবদ্ধ জ্ঞান, এখন আর বিজ্ঞান বিশদ জ্ঞান নয়, বিশেষজ্ঞের ষড়যন্ত্র। তাই বৈদগ্ধ্য গেছে লোপ পেয়ে, তার আসনে বসেছে দম্ভ। তাই বলে এ-যুগে কোনপ্রকার ধর্মের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হওয়ায় যায় না। পূর্বকার নিষ্কাম ধর্মও ছিল ভয়ঙ্কর, ব্রাহ্মণেরা ছিলেন নিষ্কামভাবে ধার্মিক, এখনকার বিশেষজ্ঞেরা যেমন নিষ্কামভাবে বুদ্ধিমান ও বৈজ্ঞানিক; দুই-ই অত্যাচারের নামান্তর। আজকালকার ধনীরা নিষ্কামভাবে পরের উপকার করছেন, সেবাশ্রমে উপকারের বন্যা ছোটাচ্ছেন, কিন্তু হচ্ছে কি? চার্লি চ্যাপলিনের কিড ছবিখানায় তার মুখের মত জবাব আছে। এই ধরনের নিষ্কাম হিতসাধনের উত্তর দিয়েছিলেন এক ভদ্রমহিলা। কলেজে পড়বার সময় দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গে, কত গ্রাম যায় ভেসে, বন্যাপ্রপীড়িতের সেবার জন্য ছাত্রবৃন্দ টারমিন্যাল পরীক্ষার এক সপ্তাহ পূর্বে স্বেচ্ছাসেবকের দল তৈরি করে, খগেনবাবুও যোগ দেন। সারাদিন নৌকা ঠেলে, চা সিগারেট খেয়ে, খিদের চোটে, মাথার ব্যথায় সন্ধ্যাবেলা এক ভদ্র গৃহস্থের বাড়ি উপস্থিত হন। সেখানে তখনি সাহায্য-প্রার্থী গরীব চাবাভুষো এসে হাজির হল। খগেনবাবুর বন্ধুরা চটে যান তাঁদের দেখেই; দলের নেতা বলে ওঠেন— 'ব্যাটারা আব্দার পেয়েছে, গন্ধে গন্ধে এসে হাজির, এধারে পেট বাপান্ত করছে····।' বাড়ির অধিকারিণী ছিলেন একজন প্রৌঢ়া ও বিধবা, তাঁর কাছে মাছের ঝোল আর ভাত, লেবু আর দই খেয়ে কী তৃপ্তিই না হোলো! ঠিক মাসীমার মতন দেখতে! সকালে না খাইয়ে ছাড়লেন না, নমস্কার করে নৌকায় ওঠবার সময় মহিলাটির মুখ থেকে একটি বাক্য নিঃসৃত হয়, 'বাবা তোমরা যদি এদের মানুষ না ভাব, তা হলে

এদের উপকার করতে এলে কেন?' নৌকাতে উঠে সর্দার বলেছিল, 'এমন ভাবপ্রবণ হলে চলে না, নিষ্কামভাবে কাজ করে যাব, যা হয় হবে।' মন্তব্যটি খগেনবাবুর খারাপ ঠেকেছিল, সেই মহিলাই ঠিক বুঝেছিলেন, রমলা দেবীও তাই বল্লেন। পরকে গড়তে যাওয়াও অন্যায়, অধিকার ত নেইই, আত্মাভিমান আছে, তবে নিষ্কাম ধর্মের রূপ নিয়ে। আসল কথা, একজন অন্যের ব্যবহারের সামগ্রী নয়, উপকারের বিষয় নয়, উপকরণ নয়, প্রত্যেকেই শেষ, কেউ কারুর নিমিত্তমাত্র নয়। এ ভিন্ন নিষ্কাম-ধর্ম কথার কথা। সুজন বোধ হয় ঐ ইঙ্গিতই করছিল। আদর্শ না মানা গেলেও values মানতেই হয়, মানুষ ছাড়া নিষ্কামধর্মও নিরর্থক— এই হল সুজনের মত। সুজনেরও মত, রমলা দেবীরও মত। তাঁর নিজের কি মত? মত এখনও তৈরি হয়নি, তবে তৈরি হচ্ছে, হবার সুযোগও হয়েছে, সাবিত্রী থাকতে সুযোগ মেলেনি। সাবিত্রী তাঁকে ভেবেছে তার সুখের উপাদান হিসেবে, ভর্তা হিসেবে, সামাজিক স্থানের আসন হিসেবে, মোটরের পাদানি হিসেবে। এতদিন একত্র বাস করা গেল, কৈ সাবিত্রী ত তাঁকে একান্ত করে দেখেনি, মানুষ মনে করেনি! স্বামী কি কেবল সম্পত্তি, ভোগ্যমাত্র? অবশ্য দেখা শক্ত; তিনিও দেখেননি, তবে শিক্ষাদীক্ষার জন্য মেয়েদের পক্ষে ঐ ভাবে দেখা অপেক্ষাকৃত সহজ। কী করেই বা দেখা সম্ভব! খগেনবাবুর বীজ অন্য, সে-বীজের ব্যবস্থা ও বিন্যাস ভিন্ন, তাঁর ইতিহাস পৃথক, তাঁর শিক্ষা, তাঁর রুচি, তাঁর আশা ভরসা সবই তাঁর নিজের, অতএব আলাদা; অথচ প্রকৃতির নিয়ম, সমাজের হুকুম হল স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দিতে হবে, আদর্শ, স্নেহশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ স্বামী হবার জন্য। এ কী জুলুম! চাপ পড়ে তারই ওপর যার পার্থক্যানুভূতি বেশি, এখানে স্ত্রীপুরুষের কোন কথাই ওঠে না। রমলা দেবী আর সাবিত্রী সমশ্রেণীর নয়। সাবিত্রী ছিল ঐ প্রাকৃতিক ও সামাজিক জুলুমের যন্ত্র মাত্র, অতি সূক্ষ্ম, অতি সুন্দর, অতি লোভনীয় যন্ত্র। তার মধ্যে দিয়ে জুলুম করত সমাজ, সে ছিল অচেতন রাজ্যের রানী, তাই তার চোখেমুখে ছিল একটা নির্জীবতার আভাস— যন্ত্রেরই জীবন নেই, জীবন না থাকলেই চোখ হয় নিষ্প্রভ, কবিরা যাকে ঢুলু ঢুলু, মদির-নয়ন বলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম মন্দ লাগত না, ভালই লাগত। কে বলে সমাজ-ধর্মের সৌন্দর্য-জ্ঞান নেই! খুব আছে, অন্তরের নিছক, নিষ্কাম ব্যবহারিক-বুদ্ধিকে গোপন রাখবার জন্য সমাজ-ধর্ম সুন্দরকে ব্যবহার করে, মোহন ক'রে তোলে, আকাশ থেকে ভগবানের আশীর্বাদ কেড়ে আনে, প্রেতলোক থেকে পিতৃপুরুষের আত্মা টেনে আনে, আর বাজে রোশন-চৌকি, শঙ্খ, উলুধ্বনি! কী ভীষণ এই জুয়াচুরি! যেই সপ্তপদী শেষ হল, অমনি সমাজ-ধর্ম জীবনের সব মূল্য, সব তাৎপর্যকে চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত

করে দিলে, সেই মূল্যই হল শেষ? মানুষের সঙ্গে সোজাসুজি, প্রত্যক্ষভাবে, সমাজ-ব্যতিরেকে, সমাজের অতিরিক্ত অন্য কিছুর সঙ্গে যোগ নেই কি? যে যোগসাধনের ফলে জীবনের প্রতি কর্মের অর্থ সূচিত হতে পারে? কে জানে?

খগেনবাবু যখন হ্যারিসন রোডে এসে পড়লেন তখন একদল বৈষ্ণব কীর্তন গাইতে গাইতে চলেছেন। গান নয় ঠিক, নামকীর্তন, নামের আবৃত্তি, সমস্বরে নয়, যত লোক তত স্বরে; ধীরে মধুরে নয়, তারস্বরে। খোল, করতাল, শিঙার কলরোলের ভিতর থেকে একটা মোটা রকমের আওয়াজ আসছিল। সামুদ্রিক বহুপাদ জন্তুর মতনই ভিড়ের আকৃতি, এলোমেলো, রূপহীন। যেখানে দেহের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেখানে রঙ বেরঙের একটা ঝালর দেওয়া ছাতা, তার তলায় একজন নগ্নকায় কৃষ্ণবর্ণের পুরুষপিণ্ড, মুখে খোঁচা খোঁচা ও মাথায় লম্বা চুল, বাকি অঙ্গ চুলে ভর্তি, পরনে সবুজ চেলী, হাতে সোনার ছোট সিংহাসন। পাশের লোকে চামর দোলাচ্ছে। জনকয়েক আধাবয়সী লোক তাকে ঘিরে হাত তুলে লাফাচ্ছে, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে; আর যারা করতাল বাজাচ্ছে তারা নাচছে না, হাঁ করে নাম নিচ্ছে— কোন আওয়াজটা কার, টের পাওয়া যায় না। একটা লোকেরও দাড়ি কামান নয়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরিয়েছে সকলের, প্রত্যেকেরই অশৌচ? এক যারা শ্রীখোল বাজাচ্ছে তাদেরই গতি চোখে পড়ে, সেটা কিন্তু ঊর্ধ্ব দিকে, মাধ্যাকর্ষণশক্তির বিপক্ষে। ভিড়ের কোন গতি লক্ষ করা যায় না, কেন্দ্রস্থ ব্যক্তিগুচ্ছ একই স্থলে স্থিত রয়েছেন। ওপরদিকে চাইতেই ভিড়ের স্থিতিশীলতার কারণ খগেনবাবু বুঝতে পারলেন। সব ভিড়েরই সৌন্দর্যানুভূতি আছে, সে ভিড় যদি আবার ধর্ম-ভিড় হয় তা হলে কথাই নেই— এই খানেই সুন্দরের সঙ্গে সত্যের ও ধর্মের সম্বন্ধ। খগেনবাবু অন্যমনস্কভাবে কখন ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছেন বুঝতে পারেন নি। হঠাৎ দেখলেন একজন লোক তার গায়ে ঠেস দিয়েছে। প্রায় পড়পড়, চোখ আধ-বোজা, প্রায় জ্ঞানশূন্য, গায়ে ভীষণ দুর্গন্ধ। একটা গোঙানি কানে এল, 'হরে রাম হরে হরে।' খগেনবাবু সরে যেতে পারলেন না, পাছে লোকটা পড়ে যায়। কৃষ্ণের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারে না, নামের গুণে ত্রাণ পাবে! শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের ফলে মন্ত্রদ্রষ্টা হওয়া সম্ভব, তারই জন্য হিন্দু সভ্যতা এতদিন মুখে মুখে টিকে আছে, বেদমন্ত্র অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করলে মহাপাতকী হতে হবে। এ নামকীর্তনের সার্থকতা কি? একই কথা, একশবার একইভাবে, একই সুরে, একই মাত্রার বিরামের পর পর উচ্চারিত হলে ঘুম আসে— তাও আবার একশ জন মিলে। ভেড়ার দল চলেছে, বৃষ্টিপাত হচ্ছে ভাবলে কবিরও ঘুম আসে। হয়ত অর্থহীন আবৃত্তির ফলে দৈনন্দিন কর্ম থেকে নিবৃত্ত হলে মন পরিষ্কৃত হয়, তার আদিম পরিচ্ছন্নতায়

ফিরে আসে, তখনই প্রেম হৃদয়ে আশ্রয় করতে পারে। কিন্তু আদিম মন কি শুভ্র? তার ওপরও পূর্বপুরুষদের আঁচড়কাটা নেই কি? দেহের প্রয়োজন অভ্যাসে পরিণত হলে মনও অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ে, তখন মন তার স্বধর্ম হারায়। দেহ থেকে মন বিচ্ছিন্ন নয়। বৈষ্ণবেরা হয়ত মনকে শ্রদ্ধা করেন না, প্রেমকেই বড় করেন। বড় করুন আপত্তি নেই, কিন্তু বুদ্ধিকে নাকচ করলেই মৃত্যু আসবে, ঘুম আসবে; শুধু তাই বা কেন? চীনেরা সব চেয়ে পাষণ্ডকে হাত পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখত, তারপর তার ব্রহ্মতালুতে একমাত্রায় একলয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল ফেলত, ব্যস, দু'মিনিটেই লোকটা পাগল হয়ে যেত। খগেনবাবুর কষ্ট হতে লাগল। তাইত, এই ধরনের নামকীর্তন শুনতে শুনতে তিনিও পাগল হ'য়ে যাবেন। তাঁকে পালাতেই হবে এই জনতার নাগপাশ থেকে, এই নামকীর্তনের একটানা বারিপাত থেকে, এই গড্ডলিকা প্রবাহের একটানা স্রোত থেকে, নচেৎ ঘুম আসবে, না হয় পাগল হয়ে যাবেন। লোকটা মাটিতে শুয়ে পড়েছে, লোকজন তাকে ঘিরে নৃত্য করছে, এই ফাঁকে তিনি একটু সরে দাঁড়ালেন। 'হরে কেষ্ট হরে নাম হরে নাম হরে হরে।' লোকটি মূর্ছা গিয়েছে, তার চৈতন্য খুইয়েছে, কিন্তু মূর্ছিতের এক অর্থ হল প্রতিফলিত; কি প্রতিফলিত হচ্ছে তার মুখে? খগেনবাবু নিরীক্ষণ ক'রে বিহ্বলতা ভিন্ন কিছুই পেলেন না। সাবিত্রীর মুখে ত এই ছিল। না, ভাবা যায় না, কেবল অনুভব হয়। যেন তাঁরই চারধারে উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন হচ্ছে। খগেনবাবু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, হাঁটু কাঁপছে, অথচ হাত মুষ্টিবদ্ধ। দোয়ারকা দেখে, না নামকীর্তনের মোহাচ্ছন্নতায়? মনে হল একটা নেশায় তাঁর দেহ অবশ এবং চিত্ত নিরুদ্ধ, তালের সম-আঘাতে জ্ঞান স্তম্ভিত হয়েছে, লোপ পেয়েছে। শিশুকালের কথা মনে হয়, পাঁচ ছয় বছর বয়সে একবার একটা ছন্দোময় বাক্য তাঁকে পেয়ে বসেছিল, দু'বছর পরে কবিতায় পরিণত করবার পর তিনি রেহাই পান। এই কি কবিতার উৎপত্তি? সব কবিতার আদিতেই কি ঐ প্রকার কোন অর্থহীন আন্দোলন নেশাচ্ছন্ন ক'রে মনকে সংবিষ্ট করে? অসভ্য জাতির যাদুকর কি এই যুগের কবি হয়ে উঠেছেন? সর্বপ্রকার আহতধ্বনিই কি ঐ প্রকার একটানা সুরের পুনরাবৃত্তি? ভুটিয়া মন্দিরের দামামা বাজছে, সৈন্যের দল সারবন্দী হয়ে চলেছে, প্রত্যেক সৈনিক তার ব্যক্তিত্ব হারিয়েছে, চেতনা খুইয়েছে, কিন্তু চলছে, সৃষ্টি করছে গতি। মানুষের সভ্য অংশটুকুর ক্ষয় হয় ভিড়ের এই অগ্রস্থিতিতে। থাকে কি? যন্ত্রাংশটুকু, জীবাংশমাত্র। তাতে চলে না, ওটুকু মূলধন শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়। সাবিত্রীর মুখে ছিল বিহ্বলতা, কেন না সে তার স্বল্প-মূলধনের ওপরই ব্যবসা চালাচ্ছিল, তার দলের মধ্যে নিজেকে

বিসর্জন দিয়েছিল, অভ্যাসে তার বৈশিষ্ট্য ছিল না, তাই টান পড়ল তার জীবনে। মাসীমা বলতেন কলসির জল গড়াতে গড়াতে ফুরিয়ে যায়। খগেনবাবুর কেমন একটা আতঙ্ক হল, তাঁর পা দুটো দুলছে যেন, নামকীর্তনের লয়ে না ত? তাঁকে বাঁচতেই হবে, মূলধন ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে, সুদে টাকা বাড়বে, সেই সুদে তাঁর জীবন চলবে— ব্যবসা-বাণিজ্যে ধনবৃদ্ধি অনিশ্চিত, নিরাপদ স্থানে রাখাই ভাল, দরকার হলে চেক কাটলেই হবে, কাকে ধার দেবেন, কে দিতে পারবে না ঠিক সময়! না, সে ভারি গোলমেলে ব্যাপার— তাঁকে পালাতেই হবে লোকজনের সঙ্গ থেকে। পালাবার চেষ্টায় সচেতন হয়ে তিনি বুঝলেন যে গন্তব্যস্থান থেকে খানিকটা দূরে চলে গেছেন। প্রাণপণে ভিড় ঠেলে বাইরে এলেন। পায়ের তলায় অত ব্যথা কেন, গলায় ব্যথা হয়েছে কেন, গা দিয়ে ঘাম ঝরছে কেন? তিনিও নেচেছিলেন, নামকীর্তন করেছিলেন না কি?

সেই গলি, সেই গলির মোড়, রাজ্যের নোংরা টিনের খোল উপচে পড়েছে। দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। সাবিত্রী নাকে রুমাল দিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে একদমে চলে আসত, যেখানে রমলা দেবীর, আরো কত দেবীর মোটর থাকত। শাড়ির প্রান্ত উঁচু করে ডিঙ্গিয়ে হাঁটত, লাল শাড়িতে ফ্ল্যামিঙ্গো, সাদায় সারস। কোথা থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতী হাঁটা শিখেছিল কে জানে?

বাড়ির দরজা বন্ধ। গলির মোড়ের গ্যাসের আলো দরজার সামনে এসে পড়েছে। খগেনবাবু দরজা ঘেঁসে দাঁড়ালেন, কড়া নাড়তে সাহস হল না— আস্তে আস্তে ঠেললেন। দরজা একটু খুলে গেল। একজন অপরিচিত লোক ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বল্লে, 'বাবু, বাড়ি নেই, বাইরে গেছেন।' খগেনবাবু দরজা ঠেলে লোকটিকে কিছু না বলে বরাবর ওপরে উঠে গেলেন। কোত্থেকে জুটল! মুকুন্দের ফ্রেণ্ড নিশ্চয়! সব বাড়ি অন্ধকার, রান্নাঘরে কেবল আলো জ্বলছে, ধোঁয়ায় বিজলী বাতি প্রদীপের আলোর মতনই নিষ্প্রভ। খগেনবাবু আলো জেলে ওপরের বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন, ঘরদোর পরিষ্কার রয়েছে, মুকুন্দ নিশ্চয়ই পরিষ্কার করেছে। বেচারি! ইচ্ছাসত্ত্বেও বসবার ঘর কখনও গোছাতে পারেনি, বাধা পেয়েছে, আজ মনের সাধে ঘর গুছিয়েছে; এই যে, প্রমাণও রয়েছে যথেষ্ট, বইগুলো উলটো করে সাজান! লোকজন এলে মুকুন্দ না সেজে ঘরে ঢুকতে পেত না, তখন মুকুন্দকে ফরসা ও লম্বা কোট পরতে হত, কাঁধে তোয়ালে রাখতে হত, সকাল বেলাতেই দাঁড়ি গোঁফ কামাবার নোটিশ ও পয়সা পেত। আর বেচারি কাঁপতে কাঁপতে ট্রে নিয়ে আসত। সাবিত্রী ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে ট্রে তুলে নিত। মুকুন্দের জন্য বন্ধুদের কাছে সাবিত্রী লজ্জিত হত, অথচ তাকে যে বকত তাও নয়। মুকুন্দের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের সময়ে

কী একটা গহনাও দেয়। মুকুন্দ তাইতেই কত খুশী। চোখে জল এনে বলেছিল, 'বৌমা, এ গহনা তাকেই মানাত'— অর্থাৎ প্রথমাকে। এই কথা শুনে সাবিত্রীর মন ভারী নরম হয়ে যায়, রাত্রে খগেনবাবুকে বলে, 'ছোটলোকদের মধ্যেও দ্বিতীয়বার বিবাহে লজ্জা আছে।'

খগেনবাবু আস্তে আস্তে মুকুন্দ বলে ডাকলেন। নীচে থেকে অপরিচিত লোকটি উঠে এসে বল্লে, 'মুকুন্দ বাজারে গিয়েছে, এখনি আসবে।' অল্পক্ষণ পরেই মুকুন্দের গলা শুনতে পেলেন। পর্দা সরিয়ে মুকুন্দ এসে হাজির। 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল বাড়ি ছেড়ে?'

'আপনাকে খুঁজতে ওঁদের বাড়িতে, মেম সাহেব বল্লেন, আপনি বাড়ি ফিরেছেন, তাই ছুটে এলাম।'

'আবার খুঁজতে যাওয়া হয়েছিল কেন? ঠাকুর কোথায়?'

'ঠাকুর চলে গিয়েছে।'

'বেশ হয়েছে, এখন খাব কি? কেন গেল? তোমার কীর্তি বোধ হয়।'

'না বাবু, না বলে পালিয়েছে, কেন গেল বুঝলাম না, বড় ভয় লাগছে বলছিল।'

'কিসের ভয় রে?'

'ঠিক পুলিশ নয় বাবু, উড়ে বামুনদের কথা ছেড়ে দিন, ওরা যাতা বিশ্বাস করে আর ভয় পায়।'

'এখন অন্ন জুটবে কি ক'রে?'

'ভালই হয়েছে বাবু, রাঁধতে জানত না, এ লোকটিকে আমি নিজে এনেছি, তৈরি লোক, গোবরডাঙ্গার বাবুদের বাড়ি রেঁধেছে, বিলিতী খানা পাকাতে জানে।'

'ও এ বাড়িতে কি করবে? সব গুণ মাঠে মারা যাবে যে! আমি ত শিকারী নই, ওকে মুক্তাগাছায় পাঠিয়ে দে। এ বাড়িতে আর কে বিলিতী খানা খেতে আসবে— কেউ আসবে না। আমার জন্য শুকতো, মাছের ঝোল রাঁধতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা কর। আর দই পাততে জানে? কাজটি বড় সোজা নয়— যে সে পারে না।'

'ও সব জানে বাবু, তবে একটু দেখিয়ে দিতে হবে আমাকে, তা আমি খুব পারব। রান্না চড়াতে বলি? বাবু, কয়লা নেই, আর কিছু পয়সা দিন তরকারির জন্য, মশলাপাতি চাল ডাল সব আছে।'

'একটু পরে এসে নিয়ে যেও।' মুকুন্দ নিচে গেল।

তাইত চাবির গোছাটা কোথায়? রমলা দেবী জানেন, আনলেই তাঁকে

হত। না এনে ভালই হয়েছে ; কেমন খারাপ দেখায়, নিজেই খুঁজে বার করা যাবে। সর্বদাই আঁচলে চাবির গোছা থাকত। বেড়াতে যাবার সময় সাপের চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগে— সেটাই বা কোথায়, ঘরেই আছে নিশ্চয়। খগেনবাবু সাবিত্রীর ঘরে সন্তর্পণে প্রবেশ করলেন। ছোট্ট পৃথক ঘর, অন্ধকার, গন্ধ এল নাকে এক ঝলক, এই ত তার নিজের ঘর। তার ব্যক্তিত্বে ভরপুর। তা হলে ছিল, ছিল, ছিল····দেয়ালে হাত দিয়ে খগেনবাবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। টেবল ল্যাম্পটির রঙিন শেডটা আবছা দেখা যাচ্ছিল, তার সুইচটা টিপলেন, ছোট্ট পাথরের টেবল, ছোট ড্রেসিং টেবলে ভাল আয়না, বিবাহের যৌতুক, কোনে একটি সেলফে বাঁধান বই সাজান, পাশে একটি গদীর সোফা। অন্য একটি জাপানী র‍্যাকের ওপর চন্দন কাঠের বাক্স, তার ভেতর কাগজ পত্র, ড্রেসিং টেবলের চাবি সব থাকত ; চন্দন কাঠের বাক্সের চাবি থাকত বই-এর পিছনে। বইগুলি বেনারসী শাড়ির টুকরো দিয়ে বাঁধান, শান্তিনিকেতন থেকে রমলা দেবী বাঁধিয়ে এনে দেন। বেনারসী জরির পাড়ে বইগুলো চমৎকার দেখাত। বই-এর উপর তার মমতা ছিল অদ্ভুত, অন্য ধরনের, খগেনবাবুকেও হাত দিতে দিত না, এক রমলা দেবীই ধার পেতেন। নতুন বই বেরুলেই খগেনবাবু কিনে আনতেন, চাইলে পেতেন না, আসতে না আসতেই লোপাট হত। কত আধুনিক লেখকের বই ছিল, সেগুলো কোথায় গেল ? কত নভেল, কত কবিতা। সাজান রয়েছে প্রভাতকুমারের গ্রন্থাবলী ; আর নিচের থাকে ভারতবর্ষ, বসুমতী— সবুজপত্রও রয়েছে, সব চেয়ে নিচু থাকটায়। কিছুতেই সে সবুজপত্র পড়ত না,— বলত, ঘরে-বাইরে বই ত রয়েছে। বুঝতে পারত না বোধ হয়। কোনে রেকর্ডের বাক্স— সব বাংলা গান, মানদা, আঙুরবালা, পান্না। পান্নার কীর্তন শুনে সাবিত্রীর চোখে জল আসত তিনি নিজে দেখেছেন। তার ভাল লাগত কীর্তন, তাঁর নিজের ভাল লাগত ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরী। সাবিত্রী বলত, 'ও সব বুঝিনা, আমার অত বিদ্যে নেই।' সাবিত্রী একবার জোহরা বাই-এর রেকর্ড শুনে হেসেছিল ; খগেনবাবু অত্যন্ত চটে যান, 'যে জোহরা বাই-এর গান ভালবাসেনা সে যেন গান শুনতে ভালবাসে না বলে, জোহরা বাই-এর কোন রেকর্ড চলেনা বাজারে, তার থেকে প্রমাণ দেশ থেকে সুরের মর্যাদা উপে গিয়েছে, আমি চোরাবাজার থেকে খুঁজে এনেছি।' 'এনেছ বলেই শুনতে হবে।' 'তুমি অত কষ্ট ক'রে রাঁধলে আমাকে ভাল বলতেই হয়। আমার কষ্টের কথা ছেড়ে দাও ওস্তাদে শেখবার জন্য কত কষ্ট করেছে, তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য প্রাণপাত করছে, একটু ধৈর্য ধরে শোনবই না, যদি নাই বোঝ ?' 'বেশেরে। কষ্ট করলেই বুঝি ভাল হয় ?' 'কষ্ট ক'রে সাধলে শক্ত জিনিস সোজা হয়, আর সহজ হয় বলেই

আনন্দ দেওয়া সম্ভব হয়। যাকগে, ওসব বুঝবে না, অন্যে তোমার জন্য কষ্ট করছে দেখলে একটু ভদ্র হতে হয়। নিজে যদি এইটুকুও জানতে তা হলে দয়ালু হতে।' 'আমি বুঝিনা, বুঝিনা মানছি, হাসি পায় কি করব?' 'তা হলে ফ্যাশান ক'রে কালচার দেখাতে গান শুনতে যেও না, এ ওস্তাদ, অমুক খাঁ সাহেবের নাম নিও না, বাড়িতে বসে রেকর্ডে কীর্তন শুনো, আর কেঁদো।' সাবিত্রী উঠে যেত চুপ ক'রে, মুখে চাবি দিয়ে। তার মনের বাক্স বন্ধই রয়ে গেল, জগতে যা কিছু ভাল তার আস্বাদ পেল না। ভালর ওপর মোহ ছিল তার, আকর্ষণ ছিল না। আজ যদি ওস্তাদি গান শোনা, ছবি দেখা কোন কারণে বড়মানষী কিংবা আধুনিকতার লক্ষণ পরিগণিত না হয়, তা হলে সাবিত্রীরা কি গান শুনতে, ছবি দেখতে যাবে, না পান চিবুতে চিবুতে, দোক্তা জরদা মুখে দিয়ে, দাস দাসী, ননদ জা বৌদিদের সঙ্গে রসিকতা ক'রে কালাতিপাত করবে? চোখের জল সাবিত্রীর পড়ত কীর্তন শুনে, চোখের জল ফেলাই কি উপভোগের প্রকৃষ্ট পরিচয়? উপভোগ কি চোখের পিছনের গণ্ড থেকে গড়িয়ে পড়ে—উপভোগ মাথায়, বুদ্ধিতে, মনে; সেই মাথা, মন, বুদ্ধি সব বন্ধ, বেচারি কী করবে! খোলবার চাবি চাই।

বই-এর পিছনে চাবিটা পেয়ে খগেনবাবু আলমারি খুললেন। অনেকগুলি ব্যাগ, সাদা রোঁয়াঅলা, জন্তুজানোয়ারের চামড়ার, নানা রঙ-বেরঙের কাপড়ের, রূপোর চেনের ব্যাগ, ঐ এক শখ ছিল তার। এক একটি বার ক'রে আঙুল দিয়ে টিপতে লাগলেন, একটার মধ্যে টাকা রয়েছে। অনেক কষ্টে খুলে তার ভেতর থেকে টাকা ও খানকয়েক নোট বার করলেন। ব্যাগটা বন্ধ করা গেল না, আলমারিতে রেখে চাবি দিয়ে বসবার ঘরে এলেন। তার ঘরটা বাইরে থেকে তালা লাগালে বেশ হয়, নতুন লোক। ভেতর দিকের ছিটকিনি সে করিয়ে নিয়েছিল, খগেনবাবুরই পরামর্শে। প্রত্যেক মেয়েদেরই পৃথক একটি ঘর ও নিজের ঠাঁই থাকা উচিত। এখন কিন্তু চুরি হবার সম্ভাবনা, মুকুন্দ নেবে না, মাসীমার চাকর, কিন্তু মন না মতিভ্রম! পুরাতন ভৃত্যেরাও কি অবিশ্বাসী হতে পারে না, প্রলোভনের সুবিধা না দেওয়াই ভাল।

'মুকুন্দ, মুকুন্দ,'— মুকুন্দ এল, 'একটা ছুতোর ডাকতে পারিস?···আচ্ছা, কাল সকালেই ডেকো, এই নাও টাকা, এ কদিন খেলে কি?'

'আমরা খেয়েছি, সবই ছিল, আপনার জন্য ফুলকো লুচি করি? আধ ঘণ্টার ভেতর হয়ে যাবে, পাখাটা খুলি? আপনি বসুন, জায়গা ক'রে দিচ্ছি···বিলিতী ডাক এসেছে।' কত দিন কথা না কইতে পারলে চাকর মনিবের সঙ্গে অত ও ঐ রকম কথা কয়?

'নাইবার জোগাড় কর দেখি, সব ফরসা চাদর ওয়াড় বার কর।'

'নিজেই বার করুন না।'

'করছি, জল তৈরি ক'রে দে আগে।'

মুকুন্দের সঙ্গে একটু বেশি কথা কওয়া হয়ে গেল বোধ হয়। হোকগে, ভালই, চুপ ক'রে থাকলে মুকুন্দ ভাববে বাবু দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছেন ; অমনি সুযোগ পেয়ে নিজে থেকে বেশি কথা কয়ে সহানুভূতি জানাবে। সে সহ্য হবে না ; সহানুভূতি বড় একাকার করে দেয়, তাতে চাকরের সঙ্গে মনিবের সম্বন্ধ ঘুচে যায়, সব সামাজিক সম্বন্ধই লোপ পায়। সহানুভূতি-প্রকাশের সুযোগ দিলে মুকুন্দ আসকারা পাবে, এরি মধ্যে ঠাকুরটাকে তাড়িয়ে নিজের লোক ঢুকিয়েছে ; ক্রমে হবেন বাড়ির কর্তা। গম্ভীরভাবে কথা কইতে হবে নিজে থেকেই। ফরসা জামা কাপড় চাদর ওয়াড় আলমারি থেকে বার ক'রে রেখে খগেনবাবু স্নানের ঘরে গেলেন। আঃ পরের বাড়ি কখনও স্নান হয়, গান গাওয়া যায়? গান গাওয়া অশোভন হবে, গাইবার ইচ্ছা দমন করলেন জোরে কেশে, স্নান সমাপ্তির পর ধোপ-দোরস্ত গেঞ্জি ফতুয়া ধুতি পরে, চুল আঁচড়ে বেরিয়ে এলেন।

ওরে মুকুন্দ, গেঞ্জিটা ছেড়ে এসেছি, সবান-কাচা ক'রে ইস্ত্রি করবি, নিজেকে করতে হবে না, দোকান থেকে করিয়ে আনিস, বিকেলে চাই, তুলে রাখিস, হারিও না, যাও খাবার নিয়ে এস।'

নিজের গায়ে গেঞ্জি কেমন গায়ে ফিট করে। কতদিন গায়ে দেবার পর নিজের মনে হয় কে জানে? পরে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না, ফেলে দিতে মন চায় না, সবই অভ্যাস, এই বাড়ি ঘর, বসবার চেয়ার, চটিজুতো, বিছানা, স্ত্রীর সঙ্গ। সাবিত্রী অভ্যাস ভেঙে দিয়ে গেল— যদি ভুগে যেত অত কষ্ট হত না। কষ্ট আবার কিসের? অকস্মাৎ বলে? বিবাহও হয়েছিল অকস্মাৎ, আগে পরিচয় ছিল না। তবে, রোগশয্যায় রোজ রোজ একটু একটু করে অভ্যাসের কঠিন আবরণ সরে যেত— তারপর সয়ে যেত। নাঃ তার চেয়ে একদিনেই, চিত্তরঞ্জন দাশের তামাক ছাড়ার মতন অভ্যাস কাটানই ভাল। অনেক দিন রোগে ভুগলে মাসীমাকে আনাতে হত, হাসপাতালে দেওয়া যেত না। মাসীমা আসতেন কি? বোধ হয় আসতেন না, আত্মসম্মান আছে ত! অনেক দিন রোগে ভুগলে অল্পবয়সী মেয়েরা বড় ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে, বিশেষত যদি ছেলে-মেয়ে না থাকে— ওষুধ খেতে চায় না, 'আমার কিছু হয় নি, আমার কিছু হবে না গো, ভয় নেই, অত সুখ তোমার কপালে নেই যে রাঙা টুকটুকে বউ ঘরে আসবে'— এ রকম কথাবার্তা শুনলে পুরুষ একটু দুর্বল হয়ে পড়ে, কপালে হাত বোলাতে, চুলে বিলি কাটতে ইচ্ছে হয়····ইত্যাদি কত কী। তারপর দেবী মন্তব্য

করেন, 'তুমি কী কৃতজ্ঞ! আচ্ছা, যত শীঘ্র ততই ভাল, তোমার কত কষ্ট হচ্ছে! বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারছ না, তাঁদের পত্নীরা কত ভাবছেন! ভেবে ভেবে সোনার রঙ কালি হয়ে গেল, ও রকম কালো হয়ে গেলে কেউ পছন্দ করবে না—এই বেলাই যাই'···উঃ···বাধ্য হয়ে স্বামীকে কাষ্ঠ-রসিকতা করতে হয়, চীনদেশের বিপ্লব, মহাত্মাজীর অনশনব্রত, ঈজিপ্টের রানীদের পুরাতন গহনার কারুকার্য, বন্ধুপত্নীর উড্ডয়ন···প্রভৃতি উত্তেজক সংবাদ দিতে হয়···তারপর সন্ধ্যার ঝোঁকে, ঝাঁকে ঝাঁকে সখীদের আগমন, সেজেগুজে, মোটর চড়ে; ঘরে ঢুকেই সেবার পালা, যার প্রধান অঙ্গ সেবার ত্রুটি দেখান, অ-প্রধান অবয়ব প্রসাধন।··· দেওয়ানীর চেয়ে ফৌজদারী ভাল। নিয়তিতে টানছে, রুখবে কে? সারাজীবন ধরে মিথ্যা আচরণ, ছলনা···তার থেকে বেঁচেছেন ত! এই যথেষ্ট! সাবিত্রী কৃপাময়ী, বুদ্ধিমতী, সতী সাবিত্রী। স্বামীকে খুব ভাল না বাসলে স্ত্রী আত্মহত্যা করে না।

খাবার হয় নি বোধ হয়। খগেনবাবু আরামকেদারায় শুয়ে পড়লেন। হাতের কাছে বিলিতী কাগজ ছিল, মোড়ক খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন। বিলিতী কাগজ পড়া তাঁর ছিল একটি প্রধান শখ— নানা রকমের, সাপ্তাহিক, মাসিক ত্রৈমাসিক! বাংলা দেশে কাগজ নেই, যা আছে তাতে সমালোচনা হয় না, তাতে না থাকে খবর, না থাকে খাদ্য। ক্রাইটেরিয়ান এসেছে, দমে ভারি, কিন্তু যেন এ যুগেরই কাগজ নয়। বলে কিনা অথরিটি মান! ওরা মানুকগে— পাপের আধিপত্য, রাজার প্রভুত্ব, সাহিত্য-সম্রাটের অনুশাসন অনেকদিন ধরে ওদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চলেছে, নিজের ব্যবসায় নিজে লাভ করবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষায় ওদের সর্বনাশ হয়েছে; ওদের দেশে এসেছে নৈতিক অরাজকতা, তাই ওদের প্রামাণিক মানবার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু এদেশের সমাজে সবই প্রামাণ্য, সবই আপ্তবাক্য সবই শ্রৌত, সবই প্রথাগত, এখানে বরঞ্চ একটু পার্থক্যের ও আত্ম-নির্ভরশীলতার চেষ্টা দেখলে মন্দ হয় না। সর্বসময়ে চার্চের জন্য ওকালিত শুনে শুনে এলিয়টের ওপর কেমন আক্রোশ হয়— অত সূক্ষ্মবুদ্ধি, অত পাণ্ডিত্য, অমন লেখবার ক্ষমতা যেন নিয়োজিত হচ্ছে মাত্র একটি সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করবার জন্য। সাহিত্যে ধর্মের গোঁড়ামি! খগেনবাবু ক্রাইটেরিয়ান তুলে রাখলেন। হাতের কাছে ফিকে হলদে রং-এর অ্যাডেলফি— না এ কাগজটা আর নেওয়া চলে না। মিডলটন মারি লোকটি মজার— নিতান্ত ভাবপ্রবণ। এককালে লিখতেন ভাল— সাহিত্য সম্বন্ধে, অন্তর্দৃষ্টি আছে সাহিত্যে। যেই স্ত্রী ক্যাথারিন মারা গেল— অমনি ধসে, খসে গেল লোকটা। পাঠকবৃন্দকে পাদ্রীর গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বাণী পাঠালেন, আশ্রয় চাই, হয় ভগবান, না হয় যীশু; এখন আর ও চাহিদা নেই,

এখন কম্যুনিজম, তবে রাশিয়ান ছাঁচে নয়, ইংরেজী ছাঁচে। এক কথায়, স্থাখ গো তোমরা, আমি ভেঙে পড়েছি, খোঁটা চাই, উঠতে পারছি না, যা হয় একটা দাও হাতের কাছে, নচেৎ তোমাদের গুরুর তিরোভাব হবে। মারির চাই ভগবান, যীশু, কম্যুনিজম, কিন্তু লোকদের চাই মিডলটন মারি। কিন্তু তাঁর সত্যকারের প্রয়োজন ছিল আর্টের সেক্‌সপীয়র, কীটস্‌, দস্তয়েভস্কির সাহিত্যের, হয়ত ব্লেকেরও। একেই বলে পরধর্ম ভয়াবহ। যুদ্ধের পর মেয়েদের ঘাঘরা সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল, তখন ডাক্তারে বলেছিল, দেহ দেখান এক-প্রকার রোগ, মারি সাহেবের রোগ মানসিক দুর্বলতা দেখান। আত্ম-অনুকম্পা পাপ নয় কি? না, আর সহ্য হয় না। মারিও আশ্রয়প্রার্থী। যদি ভদ্রলোক অত চেঁচিয়ে না লিখতেন, নিজের বাৎসরিক ও মাসিক অভিব্যক্তি ও আবিষ্কার অত ঢাক ঢোল শাঁখ ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়ে না প্রচার করতেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাহিত্য নিয়েই পড়ে থাকতেন, তাহলে সাহিত্যের কল্যাণ হত— তাঁর বাণীর চিৎকারটাই শুনতে হত না। ব্যাকুলভাবে বাণীপ্রচার করার অর্থই তাই— আমার নিজের প্রতি তেমন বিশ্বাস নেই, তোমরা বিশ্বাস ধার দাও— আমার বন্ধু হও, আমার দলে এস। এ প্রকার ব্যাকুলতা মানুষের অন্তর্হিত সামাজিকতারই পরিচয়, তার বেশি কিছু নয়। 'আমি না মিশে থাকতে পারি না, তোমাদের আমার প্রতি স্নেহ ও বিশ্বাসের সমর্থনেই আমি বাঁচতে পারি, আমার সঙ্গে মেশ, অবশ্য বন্ধু হিসাবে নয়, শিষ্য হিসাবে।' আর মিশে কাজ নেই। সাবিত্রীও মিশেছিল রমলা দেবীর সঙ্গে। আগে মনে হত শিষ্যা হিসেবে। রমলা দেবীর কথা শুনে মনে হল ঠিক তা নয়। সাবিত্রী রমলা দেবীর বন্ধুও ছিল না। নিজে অতক্ষণ রমলা দেবীর সঙ্গে সময় কাটালেন কি করে? একটু বেশি কথা কয়ে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছেন মনে হচ্ছে। তিনিও আশ্রয় চান না-কি? ছিঃ, ভারী দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। খগেনবাবু অ্যাডেলফিটা মাটিতে ফেলে দিলেন। এখনও খাবার হল না, পাকা বামন ধরে এনেছে মুকুন্দ।

'কৈরে মুকুন্দ।' 'এই যাই বাবু।'

নেশন অ্যাথিনিঅম আগে পড়লে মাথা ঠাণ্ডা হত, নাম বদল করে যেন মাথা গুলিয়ে গেছে, বিবাহের অব্যবহিত পরে যেমন মেয়েদের হয়, না-বাপের বাড়ির, না-শ্বশুর বাড়ির— পুরো স্তোশিয়ালিস্টও নয় আবার পুরো লিবারেলও নয়। কিন্তু ইংরেজ জাতের তারিফ না ক'রে যেন থাকা যায় না— রমলা দেবীর সঙ্গে যত তর্কই হোক না কেন, অন্যায়ের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ায় ঐ জাতিই সর্বপ্রথমে— এশিয়ার প্রতি নিজেদের অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে সচেতন হতে অবশ্য

দেরি লাগে। নাৎসিরা কী অদ্ভুত প্রকৃতির? সব একরকম শার্ট পরতে হবে, সকলকে এক কদমে হাঁটতে হবে, আবার দেহের প্রত্যেক স্নায়ুতে আর্যরক্ত প্রবাহিত হওয়া চাই, মেয়ে ছেলে আইবুড়ো থাকতে পারবে না। জার্মানরা বরাবরই অনুশাসনপ্রিয়। জার্মানদের আশ্রয় চাই, তারাও কী লক্ষ্মীছাড়া হয়েছে, তাদেরও কী অভ্যাস ভেঙেছে? অভ্যাস আর ছিল কোথায়? অভ্যাসই ছিল আশ্রিত থাকা, মধ্যে পার্লামেন্টের প্রবর্তন হল, হিমারের রাজ্যতন্ত্র সংস্থাপিত হল— সবই পরীক্ষা হিসাবে। কিন্তু ও সব জার্মানের ধাতে বসল না, কেবল জার্মান কেন, রাশিয়া, ইটালি, পার্শিয়া, টারকী সবই একধরনের, কারুরই পার্লামেন্ট, সাধারণতন্ত্র ধাতে বসে না। ব্যাপার হল এই, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কিংবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা য়ুরোপীয় সভ্যতার ত্রিধারার একটিমাত্র ধারা; কুলজ, বংশজ, গোত্রীয়, ট্রাইব্যাল ধারা জার্মান জাতির প্রতিষ্ঠানে বেশি প্রকাশিত। যে যাই বলুক না কেন পশ্চিমী য়ুরোপকেই বেশি আপন মনে হয়, বোধ হয় ইংরেজের সম্পর্কে এসে; জার্মান ইটালির মধ্যে কোথাও যেন একটু অসভ্যতার ছোঁয়াচ আছে। জাতের মত মানুষেরও দু'রকম শ্রেণী আছে, ব্যক্তিত্বাভিমুখী ও কুলাভিমুখী। জাতীয়তাবোধের যুগে শেষেরই জয়। রমলা দেবী বেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন, তাই বোধ হয় স্বদেশী জিনিস না ব্যবহার করলেও তাঁর চলে। যারা একলা থাকার ভয়ে সদাই সন্ত্রস্ত তাদেরই চাই একাধিপতি, একচ্ছত্র সম্রাট, সম্রাট না হলে মহামানব। তাদেরই শাসনপদ্ধতি অত্যুগ্রভাবে নিজের যৌথ-অস্তিত্ব প্রকাশ করে। এই একাকী থাকার ভয় ও অক্ষমতার ওপর সমগ্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। রাজারা ক্ষমতাশালী, পুরোহিতরা চালাক, আমলাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত বলে প্রতিষ্ঠার ভক্ত, আর ধনীরা— তাঁরা লোভী ও চালাক দুইই, তাই তাঁরা একলা থাকার ভয় নামক সামাজিক প্রবৃত্তিকে নিজেদের অ-সামাজিক কাজে লাগান। অথচ এ জীবনের অর্থ, এ জীবনটা কি ঠিক বোঝা না গেলেও— তার প্রধান কথা একাকিত্ব, ঊষর সমতল ভূমির বুকের ওপর তাল গাছের মত সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু এই সব কাগজেই স্থির সংকেত রয়েছে যে জগতে একলা থাকা আর যাচ্ছে না, খোলাখুলি বলা হচ্ছে যেন একলা থাকতে গেলেই ভেঙে, নুয়ে, ধুলিসাৎ হবে। দেখাই যাক, এঁরা ঠিক কথা কইছেন, না প্লোটাইনাস খাঁটি খবর দিয়ে গেছেন।

মুকুন্দ ঘরে এসে বল্লে, 'বাবু খাবার দিই?'

'এতক্ষণে হল? খাবার নিশ্চয়ই দিবি, ভাবিস কি? বায়ুভুক?' একটু হতভম্ব হয়ে মুকুন্দ আসন পেতে দিলে।

'যা, ছোট টেবিল নিয়ে আয়— যা…'

মুকুন্দ ছোট টেবিল নিয়ে এল।

'দাঁড়া, টেবিল ক্লথ দিচ্ছি।' খগেনবাবু টেবিল-ক্লথ বার করতে না করতে বামুন খাবার নিয়ে এল। টেবিল-ক্লথ পাতা হল, খগেনবাবু লোকটিকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে বল্লেন, 'আমি একটু লাল লুচি খাই।'

'কাল থেকে তাই হবে, আজ তাড়াতাড়ি হয়েছে।'

'কাল তাড়াতাড়ি কোরো না, কোন কাজ হঠাৎ করতে নেই, নুন দাওনি?'

লোকটি নুন আনতে গেল।

'মুকুন্দ, লোকটা রাঁধে কেমন?'

'আজ্ঞে, খুব ভাল, একবার ওর হাতের পোলাও কোর্মা খাবেন, ওর সঙ্গে তত্ত্ব নিয়ে যেতে আলাপ— আপনার বোনের বাড়িতে কাজ করত।'

'কোন বোন রে?'

'সেই যে যিনি খুব গান গাইতেন, তাঁর বাড়িতে মা তত্ত্ব পাঠাতেন, তাই দেখা সাক্ষাৎ।'

'সে ত বিদেশে থাকত রে, বুদ্ধিমান, অন্য কোথায় তত্ত্ব দিয়ে এসেছিস নিশ্চয়ই— বোধ হয় যার গোবরডাঙায় বিয়ে হয়েছিল— সে গান গাইতে পারত না।'

ঠাকুর নুন নিয়ে এল।

'রান্না মন্দ হয়নি, আচ্ছা তুইও যা— আমার কিছু দরকার নেই— তোমরা খেয়ে নাও গে— মুকুন্দ বিছানা করে দে— এই নে চাবি— চাদর বার কর আলমারির নিচের তাক থেকে— দেখিস যেন ঘাঁটিস না—ভারি রাগ হবে, বুঝলি— চাবিটা হারিও না যেন, আমাকে দিও।'

'বাবু এই যে নিজে বার করলেন।'

'বার করেছি? চাবিটা নাও···তুমি বড় হারিয়ে ফেল, মুকুন্দ, এতদিনেও তোমার কিছু জ্ঞানবুদ্ধি হলনা, এইবার খাও গে যাও।'

ঠাকুর চলে গেল, মুকুন্দ দাঁড়িয়ে রইল— 'মুকুন্দ এত রাত্তিরে গোলাপ জল পাওয়া যাবে? যাবে বোধ হয়, ছাখ দিকিনি, মোড়েই পাবি, এই নে মনিব্যাগ থেকে টাকা, এক টানে তাড়াতাড়ি আসবি।'

মুকুন্দ চলে যাবার পর খগেনবাবু খাওয়া শেষ করলেন, খিদে নেই মোটেই, চোখ বড় খচ খচ করছে, রাঁধে ভাল, বড় মানুষের বাড়ি কাজ করেছে, একটু চাল আছে— বলে কিনা 'কাল থেকে তাই হবে'— মুকুন্দ বরাবরই মিশুক, তত্ত্ব নিয়ে যেতে আলাপ, সেই থেকে বন্ধুত্ব, হয়ত এরি মধ্যে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলেছে, ত্ব'দিন পরে টাকা ধার দেবে, তারপর খুড়ো পালাবে, তখন তাঁকেই

ক্ষতিপূরণ করতে হবে, মাসীমা দু'বার করেছিলেন, সাবিত্রীও একবার করেছিল, কিন্তু বেশ নাকের জল চোখের জল বার করিয়ে। সেই থেকে মুকুন্দ আর মিতে পাতায়নি। এতদিন রয়েছে, কোন বোন কোথায় থাকে জানে না, গুলিয়ে ফেলবার একজন, অন্য কোথায় তত্ত্ব দিয়ে এসেছে তারই বা ঠিক কি? আবার বাবুর বলা হয়, এই বাড়ির লোক! গান গায় মণিকা, থাকে বহুদূরে, তাকে আবার সাবিত্রী তত্ত্ব পাঠাবে? ছুরি পাঠাবে! তবে যখন কোলকাতায় এসেছিল তখন হয়ত তত্ত্ব কিংবা উপহার নেওয়া দেওয়া চলত। মুকুন্দের স্মৃতিশক্তিকে বিশ্বাস করতে নেই। তত্ত্ব টত্ত্ব বাজে কথা!

মুকুন্দ যখন গোলাপ জল নিয়ে ফিরে এল তখন ন'টা বেজে গিয়েছে।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'বাবু রাস্তায় ভিড়।'

'নাচ দেখছিলে বুঝি?'

মুকুন্দ চুপ করে রইল।

'শিশিটা খুলে আনি।'

মুকুন্দ চলে গেল নিচে।

খগেনবাবু চোখে হাত দিয়ে বসে রইলেন, সেই কীর্তনের দলে মুকুন্দ একটু নেচে এল।

'কইরে হল?'

'এই যে···ঐ যাঃ।'

'ভাঙতে পারলে— না যাব?'

মুকুন্দ ভাঙা শিশি নিয়ে হাজির।

'এখনও একটু আছে'।

'চোখে কাঁচের গুড়ো দিলে কি হয় জান মুকুন্দ? ফেলে দাও। আচ্ছা এইখানে রাখ। বিছানা করে খাওগে যাও— নিচের দরজা ভাল ক'রে বন্ধ করো, তোমার খুড়ো কি বাড়িতেই শোবে, না বাসায় যাবে?'

'না বাবু খুব ভাল লোক, বাসা নেই, আমার কাছেই থাকবে।'

'থাক, কিন্তু তোমার বাক্স চুরি গেলে আমি দায়ি নয়, গোড়াতেই বলে দিচ্ছি।'

'সে কি বাবু! তা কখনও হয়!'

মুকুন্দ বিছানা পেতে চলে গেল। খগেনবাবু স্নানের ঘরে গিয়ে তোয়ালেটা ভেজালেন, তার ওপর ভাঙা শিশি থেকে খানিকটা গোলাপজল ঢেলে দিলেন, বাকিটা ঢাললেন বিছানায়।

বিছানায় শুতে যাচ্ছেন এমন সময় মুকুন্দ এল।

'বাবু ওবাড়ি থেকে চাকর এসেছে।'

'কি বলে?'

'ডেকে দেবো?'

'দে।'

রমলা দেবী চাকর পাঠিয়েছেন, হাতে একটা ছোট্ট চিঠি। 'আপনার খাবার তৈরি, অনুগ্রহ করে দেরী করবেন না। শরীর খারাপ হয়নি ত?' খগেনবাবু তাড়াতাড়ি উত্তর লিখে দিলেন, 'আমার কি যাবার কথা ছিল? মাপ করবেন, যেতে পারছি না, শরীর ক্লান্ত, সামান্য কিছু খেয়ে নিয়েছি। আপনি এত রাত অবধি খাননি? সত্যই দুঃখিত।' চাকর চিঠি নিয়ে চলে গেল। মুকুন্দ নিচে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

তাও ত বটে! রমলা রাত্রে কিছু খান না— মোটা হবার ভয়ে। মোটা স্ত্রীলোক জঘন্য, কিন্তু প্যাকাটিতে পরিণত হবার আদর্শটাও লোভনীয় নয়। রোগা হওয়ার আদর্শটা বিদেশী। বিলেতের মেয়েরা রোগা হচ্ছে, তাই এঁরাও হাড় সার হচ্ছেন। যার যা ইচ্ছে করুকগে! তবে সাবিত্রীও খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল কেন? মাসীমা নতুন নতুন খাইয়ে দাইয়ে গোলগালটি করেছিলেন, তারপর যে কে সেই। বলে কিনা অম্বল হয়, আরো কত কি? যক্ষ্মা হবার সাধ হয়েছিল। ডাক্তারে একবার কি বলেছিল তাইতে খগেনবাবু ভয় পেয়েছিলেন। একজন ডাক্তারবন্ধু পরীক্ষা করে একটা দামী ওষুধ লিখে দিয়ে যান। তার মধ্যে অনেকটা সুরা ছিল। খগেনবাবু দু'তিন দিন অসুস্থতার জন্য খেয়েছিলেন— তারপর চেয়ে পান নি। সাবিত্রী দেয় নি, শিশিটা ভেঙে ফেলে, কী ফেলে দেয়। বেশ চন চন করে উঠত, কান-দুটো, নাকের ডগাটা, শ্রান্তির অবসান হত।

আজ ওষুধটা থাকলে বেশ হত। খগেনবাবু বিছানায় শুয়ে পড়লেন। দূর থেকে মনে হল নামকীর্তনের আওয়াজ কানে আসছে। কোলকাতার শহরে ঘুমোবার জো নাই। 'হরেকেষ্ট হরে রাম রাম হরে হরে'— কোলকাতায় থাকা চলবে না। শহরে সর্বসাধারণের উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। কোথা থেকে এ জনবৃদ্ধি হল কে জানে? রাস্তা চলতে গায়ের ওপর এসে পড়ে, ট্রামে বাসে ওঠা যায় না, কলেজ স্কোয়ারে বেড়ান যায় না, থিয়েটারে ও ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। আগে তবু সিনেমাতে গিয়ে খানিকটা চুপ ক'রে থাকা যেত, এখন সেখানেও কথা, টকি। এক মিনিট, এক ইঞ্চি জাগায় নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। কে এই ভিড়কে আদর দিয়ে মাথায় তুলেছেন! এরাই বাঙলা মাসিক, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বার করে, টাকা থাকলে এরা মিনিটে মিনিটে কাগজ

বার করত। গায়ে পড়া লোক সব। খগেনবাবু পাশবালিশটা সরিয়ে দিলেন, মাথার তলায় দুটো হাত দিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করলেন। ভারি আব্দার বেড়ে গেছে— আদুরে ছেলের মতন। সাবিত্রী বলত মাসীমার আদুরে বোনপো। মাসীমার কাছে গেলে হয়, কম কথা কন। কথা কেন কইবে না মানুষে? নিশ্চয়ই কইবে, তবে চেঁচিয়ে নয়। কথা কইবেনা কেন, তবে শেষের কবিতা, মালঞ্চ, বাঁশরীর চরিত্রের মতন। তা নয়, অর্থহীন প্রলাপ। কথা না কইলে মানুষে বাঁচে না— হয়ত বাঁচে, কে জানে? কথা কইবার ফাঁকে ফাঁকে নীরবতা চাই— আলাপে ভিড় করলে চলে না। তুমি কথা কইবে, আমি চুপ ক'রে শুনব, আমি হয়ত উত্তর দেবোনা, তোমার চোখ মুখ সমগ্র ভঙ্গিমা মুখরিত হবে, ঠোঁট নড়বেনা, কিংবা নড়বে, জাপানী ছবির বাঁশপাতার মতন। রবিবাবু ঠিকই বলেন— অবকাশ চাই। কিন্তু খালি ছবির ফ্রেম টাঙিয়ে রাখলেই নিরাকার ব্রহ্মের রস উপভোগ করা যায় না— একজন গায়ককে দেখলেই কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয় না। একটা কিছু অবলম্বন থাকা চাই যার চারপাশে নীরবতা চাক বাঁধতে পারে, তবেই মধুর গুঞ্জন— যেটা নাম-কীর্তন নয়। একলা হওয়ার মধ্যেও কথোপকথন, সেখানেও ভাবের ঠেলাঠেলি। একলা হওয়ার বাইরে খানিকটা দূরে, বেশ খানিকটা দূরে বহু জনসমাগম থাকে— থাকুকগে। দরবারে রাজা সিংহাসনে বসে আছেন,দূরে প্রজা সারবন্দী দাঁড়িয়ে আছে। সিংহাসন একটি। পাশে সিংহাসন নেই, থাকলেও খালি। বরাবরই শূন্য ছিল। হিন্দুরানী পর্দানশীন। কালো পর্দা ধীরে ধীরে ওপর থেকে নামছে, পাদপ্রান্তের আলো ধীরে ধীরে কমে আসছে। ঐক্যতান কমে এল, কীর্তন শোনা যাচ্ছে, না, যবনিকার ত্রিকোণ অবকাশে নটীর মূর্তি, হাতে ফুলের তোড়া— গোলাপ জলের শিশি, লজ্জা ও জয়ের মিশ্রিত আনন্দে অবনতমুখ, টানা চোখ টানা ভুরু, কোথায় যেন দেখা হয়েছে— কোন কেশতৈলের বিজ্ঞাপনে? যবনিকা পড়ছেনা কেন? কোথায় আটকে গিয়েছে, ভেতরের দড়িতে বোধহয়। খগেনবাবু মাথার নীচ থেকে হাত সরিয়ে পাশ-বালিশটা টেনে নিলেন।

চার

খগেনবাবুর পায়ে রোদ পড়তে ঘুম ভেঙে গেল। মুকুন্দ ট্রে করে চা ও দুটো টোস্ট নিয়ে এল। মুখ দিয়ে খগেনবাবু বললেন, 'টোস্ট চমৎকার হয়েছে, কিন্তু

ছেঁড়া যায় না।'

'বাসি বলে'—

'ওঃ তাজা রুটি নিয়ে আসা হয়নি কেন?'

'বাজার করতে যাবার সময় নিয়ে আসব। মা ঠাকুরণ লোক পাঠিয়েছেন।'

'মা ঠাকরুণ!' 'ও বাড়ির মেমসাহেব।'

'ডেকে নিয়ে আয়।'

জিনের গলা-বন্ধ ফরসা কোট পরে একটি লোক এসে নমস্কার করলে, চিন্তামণি ভারী সুসভ্য চাকর, একদিনের জন্যও লোকটা আধময়লা জামা পরলে না, কাঁধের ঝাড়ণ সর্বদাই পরিচ্ছন্ন, কোঁচার কাপড়, সারাক্ষণ ওলটানো, চুল সর্বদাই ফিটফাট, সামনের গোছাটা সাদা— আর, কখনও গোঁফ দাড়ি উঠেছিল বলে মনে হয় না; ভাষা সুমিষ্ট ও সংযত, ডিশ ভিন্ন জলের গেলাস আনে না, জগ থেকে জল ঢালে যেন মদ ঢালছে, বৎসরে ছয় মাস নিশ্চয়ই পাহাড়ে কাটায়, নচেৎ অত মেজাজ ঠাণ্ডা হয়না, উড়ে হয়েও জগন্নাথ দেখেনি, খোদ মেমসাহেবের হাতের তৈরি! চিন্তামণি খগেনবাবু হাতে খাম দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। মুকুন্দকে ঘরের ভিতর দেখে খগেনবাবু মুখ তুলে তার দিকে চাইলেন। তার মুখে চোখে ঔৎসুক্য প্রকাশ পাচ্ছে, 'এইবার রান্নাবান্নার জোগাড় দেখগে।'

'রান্নাবান্নার কথা বলতে হবে না, বনেদী ঘরের চাকর নিজে করে নিতে জানে, ওকে কারুর বলতে হয় না।'

'রত্ন! এখন যাও।' মুকুন্দ নেমে যাবার পর খগেনবাবু খাম খুলে পড়লেন, 'আশা করি বিশ্রাম লাভ হয়েছে। সকালে এখানে খেলে সুখী হব। অন্যান্য দরকারি কথা আছে।' বিশ্রাম? নিশ্চয়ই হয়েছে, নিজের বাড়ির তক্তপোষ ভাল পরের বাড়ির খাট পালঙের চেয়ে। দরকারি কথা না বাজে কথা! নাঃ এ বেশি হচ্ছে, এরকম করলে চলবে না, দু'দিন পরে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা করতে হয় নিজেই করা যাবে, স্নেহ মমতার আশ্রয়ে থাকা তাঁর ধর্ম নয়, দু'দিন পরে ভগবানে বিশ্বাস পর্যন্ত করতে হবে, শেষে গুরু বিনা, ঠিকুজী ছাড়া একপা হাঁটা যাবে না। 'মুকুন্দ! আচ্ছা, একটু পরে এস, বাজারে যাবার আগে দেখা করে যাস।' খগেনবাবু তাড়াতাড়ি চিঠির কাগজের প্যাডটা নিয়ে লিখতে বসলেন— শ্রদ্ধাস্পদা— দন্ত্য স, না মূর্দ্ধন্য ষ? কোন মহিলাকে কখনও চিঠি লেখেন নি, সাবিত্রীকে সাবু লিখতেন; আপত্তি উঠেছিল, 'কেন, আমি কি তোমার রোগের পথ্যি?' সেই থেকে রানী, মনু, কত-কী! সেসব গোড়ায়, তারপর সাবিত্রী, শুষ্ক সাবিত্রী, তার বেশি লিখতে ইচ্ছে হত না, কী করা যাবে? কি লেখা যায়? পাঠ লেখবার প্রয়োজন কি? না লিখলে বড় ন্যাড়া ন্যাড়া

দেখায়। সাবিত্রী নিশ্চয় রমাদি লিখত। পাঠের কোন দরকারই নেই, শ্রদ্ধারও দরকার নেই, শ্রাদ্ধেরও নেই, অপঘাত মৃত্যুর শ্রাদ্ধ হয়, কিন্তু এ যে আত্মঘাতী, শ্রাদ্ধ হয় না, হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বোঝা যায় না। যা হয় নমঃ নমঃ শেষ করেই কাশী যেতে হবে। সেখানে গিয়ে শ্রাদ্ধ, কী প্রায়শ্চিত্ত করলে মন্দ হয় না— কাশীতেই সুবিধা। তাই ভাল, মাসীমা আছেন, যোগাড়যন্ত্র ক'রে দেবেন, বিধবা মানুষ জানেন শোনেন। কিন্তু তাঁকে বিরক্ত ক'রে লাভ কি? ভারি বিরক্ত ঠেকে কলম থেকে কালি না পড়লে। কলমটা ঝাড়তে গিয়ে চিঠির কাগজে খানিকটা কালি পড়ল— বিশ্রী দাগ ব্লটিং কাগজ কোথায় গেল? মুকুন্দ ....উনি ত খুব জানেন! আর একখানা কাগজ টেনে নিয়ে খগেনবাবু লিখলেন, ধন্যবাদ। একটু পরে যাচ্ছি, কিন্তু এইখানেই খাব, কতদিন আপনাকে কষ্ট দেবো? যা করেছেন তার অন্য চিরকৃতজ্ঞ।— খগেন্দ্র।

চিন্তামণি চিঠি নিয়ে ঘর থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মুকুন্দ এল। 'ডেকেছেন?'

'এতক্ষণ আসা হয়নি কেন? বিশ দফায় জবাব দাও না।'

'আজ্ঞে না, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলে চলে কী আমাদের বাবু?"

'নিশ্চয়ই, তোমার কত কাজ! কি খেতে দেবে মনস্থ করেছ?'

'বাজারে যাই।'

'যাও, দু' পয়সার ব্লটিং পেপার কিনে এনো, আর একটা রোলার ছিল তাইতে লাগিয়ে দিও, সেটা খুঁজে রেখো'।

'ও আমি পারব না বাবু, ঠাকুরকে বলব'খন, বাবুদের বাড়ির খানসামা ছিল।' 'না তাকে আর ওপরে ঢুকিয়ো না, স্বস্থানেই শোভন হবে, ওরে আমার অনেক কাজ আছে বুঝিস না কেন? এখনি আসব, এখন বেরুচ্ছি।' 'তা হলে স্নান করে নিন।'

'যা বলেছিস! কামাবার যোগাড় কর, ঐখানে বাক্স আছে।' মুকুন্দকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খগেনবাবু বল্লেন, 'সব শিখে নাও না হলে কাশী যাবে কি করে? আমার সঙ্গে দেশবিদেশে ঘুরতে হবে ত, আগে এক পেয়ালায় গরম জল নিয়ে এস।'

'কাশী কবে যাবেন?'

'যত শীঘ্র পারি এখানকার কাজ শেষ হোক।'

'কবে হবে?'

'যথা সময়ে নোটিশ পাবে, যাও, নিয়ে এস, বেশি গরম এনো না।' মুকুন্দ এক পেয়ালা গরম জল নিয়ে এল।

'তা হলে মাকে আজই তার ক'রে দিন না বাবু?'

'অত ব্যস্ত হলে চলে কী মুকুন্দ। কিন্তু মার কাছে গেলে তাঁর কষ্ট হবে না ত?'

'একটু হবে বৈকি। তাঁকে আবার রান্নাবান্না করতে হবে, আমার হাতে ত খান না।'

'বেশত, তোমার ঠাকুরকে নিয়ে গেলেই হবে, কি বল?'

'আমি বলছিনা নিয়ে যেতে, সে আপনার ইচ্ছে······তবে মায়ের কষ্ট হবে তাই ভাবছিলাম।'

'বাস্তবিক মুকুন্দ, তুই বড় দূরদর্শী, অনেক ভাবিস্ তুই।'

'আর কে ভাববে বলুন?'

'থাক—'

খগেনবাবু যখন রমলা দেবীর বাড়ি পৌঁছলেন তখন প্রায় ন'টা। রমলা দেবী ঘড়ির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'চা খাওয়া হয়েছে?'

'হয়েছে সকালেই।'

'এই সময় আর একবার খান ত?'

'খাই।'

চিন্তামণি কেৎলিতে গরম জল নিয়ে এল— চা-এর সরঞ্জাম সাজান ছিল।

'রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন?'

'খুব, অনেকদিন এমন ঘুমুই নি।'

'ক্লান্তিতে, চোখে কষ্ট হয় নি?'

'বেশি নয়, মুকুন্দকে গোলাপজল আনতে দিলাম, শিশিটা ভেঙে গেল।'

'মুকুন্দ তৎপর নয়, চিন্তামণিকে নেবেন? লোকটি কাজের।'

'চিন্তামণি ভাল চাকর, কিন্তু সে কি হয়। মুকুন্দ কোথা যাবে?'

'সাবিত্রী বলত ওকে কাশী পাঠিয়ে দেবে, সেখানে থাকবে ভাল, লোকজন আছে, কথা কইবে আর মন্দির দেখে বেড়াবে।'

'আমিও ভাবছি কাশী যাব।'

রমলা দেবী উঠে চা ঢালতে ঢালতে প্রশ্ন করলেন, 'কবে?'

'যত শীঘ্র হয়ে ওঠে, কাজটা সমাপ্ত হলেই।'

'সে কাজ না করলেও চলে।'

'আমাদের ধর্ম কত সুবিধার দেখুন।'

'কাশীই যাবার প্রয়োজন?'

'একটু কোথাও বেড়িয়ে এলে, একলা একলা, মনটা ভাল হবে, শরীরটাও

ভাল যাচ্ছে না অনেকদিন থেকে।'

চিন্তামণি ডিশে করে চিঁড়ে ভাজা ও সিঙ্গাড়া নিয়ে এল। রমলাদেবী ডিশ দু'টো সামনে ধরতে খগেনবাবু বড় একচামচ চিঁড়ে ও একটি সিঙ্গাড়া তুলে নিলেন, কালো লঙ্কা ভাজা নেবার সময় রমলা দেবী বারণ করলেন।

'আর একটি সিঙ্গাড়া নিন।'

'লোভ হয়, কিন্তু নেওয়া উচিত নয়।'

'সব উচিত কাজ এখনই করা উচিত কি?'

'আগের কথা ছেড়ে দিন, এখন কোনটা করা অন্যায়?'

আপনি ভারী অভিমানী, শেষে বাড়ি গিয়ে ঠোঁট ফোলাবেন।' রমলা দেবী বলেই অপ্রস্তুতে পড়লেন।

খগেনবাবু তাঁকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্য হাসি মুখে উত্তর দিলেন, 'অত সহজে নয়, ওকাজ আপনাদেরই মানায়।'

'মানাচ্ছে আর কৈ?'

'কোথায় মানাচ্ছে না বলুন?'

ঠোঁট একটু চেপে রমলা দেবী উত্তর দিলেন, 'তা হলে বলি? অভয় দিচ্ছেন ত? শেষে রেগে দেশত্যাগী হন যদি?'

'অভয় দিচ্ছি।'

'কাল এলেন না কেন?'

'কাল? দেখুন, পরশুর কথা আলাদা, কিন্তু রোজ রোজ আসাটা·······'

'সে জন্য ভাববেন না, সাবিত্রী আমাকে বোনের মত ভাবত।'

'তা জানি···তা নয় ঠিক, বাড়িতে কী রইল, কী গেল, দেখতে হবে ত?'

'কী গোছানি লোক আমার। মুকুন্দ খুব বিশ্বাসী নয় কি?'

'তা বটে, কিন্তু....'

'তার মানে, আপনি···'

'বলুন না মানে কি?···আধখানা বলা কেমন আপনাদের অভ্যাস। বলুন না?'

'আপনি এখানে আসতে চান না···'

'আমি অকৃতজ্ঞ নই।'

'কৃতজ্ঞতার কথা যদি তোলেন তবে কষ্ট ক'রে আসতে হবে না।'

'তা হলে কী বলব?'

'কিছু বলতে হবে না। চা আর দেবো?'

'দিন।' দুজনের মধ্যে কষ্ট আবরণ নেমে এল।

নীরবে আর এক পেয়ালা নিঃশেষ করবার পর খগেনবাবু চোখ তুলে দেখলেন যে রমলা দেবী পাথরের মূর্তির মত চুপ করে, কোন বিশেষ দিকে দৃষ্টি না নিবদ্ধ করে বসে আছেন। মুখে তাঁর বিষাদের ছায়া স্ফটিকের অস্বচ্ছতা, কোন প্রকার মিথ্যার আবরণ নয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখোসটা অদৃশ্য হয়েছে, অন্তরের রূপ নগ্নভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছে। অনেক পুথিতে পুরাতন হস্তলিপির ওপর নতুন লিপি লেখা থাকে, তাল পাতার ওপর সেই পুরাতন অক্ষরের আঁচড়ই পুথির আন্তরিক ইতিহাসের খবর দেয়। খগেনবাবুর মনে হল যেন রমলা দেবীর মুখে সেই পুরাতন, বহু পুরাতন অক্ষরের ছাঁদ দেখা যাচ্ছে। ভাল ক'রে দেখতে ইচ্ছে হল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রমলা দেবী নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে পড়লেন— চিহ্ন লোপ পেল— স্ফটিক উজ্জ্বল হল, পরিস্ফুট হল ভদ্রতার চিকিমিকি, মুখোসের অন্তরালে মুখ দেখা গেল না, খগেনবাবু চোখ নামিয়ে নিলেন।

'এইখানেই স্নান করুন।'

'করছি; কিছু মনে করবেন না।'

রমলা দেবী ট্রে সাজিয়ে রাখলেন।

খগেনবাবু বল্লেন, 'আমার একটু একলা থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তাই আসিনি।'

'একলা ত আপনি চিরকালই থাকবেন। কাশী গেলেই কি একলা হবেন?'

'সেখানে কাউকে চিনি না, অতএব খানিকটা হওয়া সম্ভব।'

'পারবেন না।'

'কি পারব না?'

'সেখানেও স্নেহ মমতা আপনাকে ঘিরে ফেলবে।'

'একটু তফাত আছে।'

'কার সঙ্গে কার? কি তফাত? বলুন না স্পষ্ট করেই, ভয় কি? আচ্ছা আমিই বলছি, সাবিত্রীর স্মৃতি থেকে রক্ষা পেতে চান ত? এই না? আর আমি সর্বদাই সাবিত্রীর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি— এই ত? আপনি আমার স্নেহ মমতা থেকে নিষ্কৃতি চান— এই না?' রমলা দেবী খগেনবাবুর আনত চোখের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলে যেতে লাগলেন, 'আপনাকে বলতেই হবে। কাল থেকে এখানে আসতে বলছি, আর আপনি কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন, এর অর্থ আমি বুঝি।' একদমে অত কথার পর হাঁফিয়ে পড়ে রমলা দেবী একটু হাসলেন —'বেশ ভাল কথা, আমার সোজা কথার উত্তর দিন।'

'বেশ ত বলুন না, আপনাদের সোজা প্রশ্নই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কারণ তার উত্তর হওয়া চাই আপনাদেরই মনোমত। বলুন, আমি প্রস্তুত।'

'আমাদের মন সম্বন্ধে অত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন কোথায়?'

'একজনের কাছেই ঋণী।'

'সবাই আমরা এক ছাঁচের?'

'হাঁ...তোমরা সবাই ভাল।'

'নিজের ভাষার উত্তর দিন না।'

'কবি আমাদেরই ভাষা গুছিয়ে বলেন।'

'আপনার বোন, আপনার মাসীমা সব সাবিত্রীর মতন?'

'না, ঠিক তা নয়।'

'তবে?'

'আপনি বলুন। পুরুষে স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে যা জানে তার চেয়ে জানে স্ত্রী পুরুষ জাতিকে।'

'আমার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ।'

'বেশ লোক আপনি, নিজেকে সর্বদাই গোপন রাখবেন।'

'কি আছে যে প্রকাশ করব? যা আছে তাই বুঝে নিন, আপনি ত আর অন্যের মতন নন।'

'যা বুঝেছি সে ত ভুল প্রমাণ করে দিলেন, যা বুঝিনি তাই হয়ত ঠিক। বলুন না আমরা কি?'

'আপনি বড় ভাল মানুষ।'

'অর্থাৎ বোকা।'

'না, সত্যই ভালমানুষ।'

'ভালমানুষের কোন প্রয়োজন নেই এ সংসারে।'

'আমার হয়ত থাকতে পারে।'

'আপনার? যে লোক একলা থাকতে পারে তার আবার অন্যকে প্রয়োজন?'

কথাটা মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, খগেনবাবুর ইচ্ছা ছিল না রমলা দেবীর কোলকাতা শহরে একলা থাকার উল্লেখ করা। কোথায় যেন কার মুখে শুনেছিলেন যে রমলা দেবীর স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নেই— ব্যাপারখানা কী জানবার জন্য কখনও ঔৎসুক্য পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি, বাসনাও হয়নি। হয়ত পরের কথা জানবার ব্যগ্রতারূপ সামাজিকতা তাঁর ছিল না। সাবিত্রী তাঁকে একবার রমলা দেবীর স্বামী সম্বন্ধে কী একটা খবর দিতে যায়, তিনি তার মুখ বন্ধ করেন এই বলে, 'আমি ভদ্রলোক, কোন স্ত্রীলোককে অমুকের স্ত্রী ভিন্ন একজন মাত্র ভদ্রমহিলা হিসাবেই দেখতে পারি, তুমিও অনুগ্রহ করে কোন পুরুষকে স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন ভদ্রলোক হিসাবে দেখতে চেষ্টা কোরো, চেষ্টা কোরো, চেষ্টা কোরো। পারবে না জানি, মেয়ে মানুষে পারে না, পুরুষেও অনেকে

পারেন না। তোমাদের দণ্ডবৎ করি, কেচ্ছা শোনার ও করার প্রবৃত্তিকে তোমরা সামাজিক গুণে পরিণত করেছ, সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় তোমরা নভেল পড়, চা-পার্টিতে যাও, যদি প্রাণভরে কেচ্ছা না শুনতে পাও, তা হলেই বল নভেলে গল্প নেই, চা-পার্টি জমল না....মনের জচ্চুরিগুলো ধরতে শেখ। রমলা দেবী কেন, তোমার কোন বন্ধুরই গোপন কথা আমাকে শুনিও না। মানুষকে নিঃসম্পর্কিত ক'রে দেখাই সত্যকারের দেখা।' আজ অসাবধানে তিনি রমলা দেবীকে আঘাত করেছেন, প্রতিকারস্বরূপ তিনি বল্লেন, 'আপনার মতন আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির কি প্রয়োজন থাকতে পারে আর কাউকে?' বিষাদের শান্তি উদ্ভিন্ন ক'রে রমলা দেবীর মুখে উত্তরের কোন প্রকার লক্ষণ ফুটল না। খগেনবাবু ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলেন, 'মিথ্যে বলছি না, আপনাকে স্বয়ংসিদ্ধই মনে হয়, আপনার যেন কোন প্রকার সম্বন্ধেরই প্রয়োজন নেই, একেবারেই নিঃসম্পর্কিত। কি রকম মনে হয় জানেন? বাঁকুড়া অঞ্চলের শ্মশানের এক বুড়ো বটগাছ, ধূ ধূ করছে মাঠ, তারই গুঁড়ির মধ্যে এক পাথরের দেবীমূর্তি, ঝুরিতে ঢেকে রেখেছে সূর্যের তাপ ও লোকচক্ষুর জনতা থেকে। গ্রামের লোকে ভূতচতুর্দশী কী অমনি কোন অন্ধকার রাত্রে মধ্যে মধ্যে পূজো দিতে আসে, সকলে নয়, নেশাখোর দল, তান্ত্রিক সাধু দু' একটি। মূর্তির শীতল করুণ হাসি পূজার প্রতীক্ষায় ফোটেনি। দিগন্তব্যাপী নীরবতা, বুড়ো-বটের সনাতনত্ব, জীবন-মৃত্যুর পারম্পর্য, ঊষর ভূমির নিষ্ফল অবকাশের সাথে মিতে পাতিয়েই দেবীর আত্মা সন্তুষ্ট। এ দেবীকে ফুল দেবার দরকার নেই, এর পূজারী নেই, তবু এই মূর্তি হাসে, সুখদুঃখের প্রতি গভীর ঔদাসীন্যে, পরিবর্তনের প্রতি চরম নিরপেক্ষতায় এই দেবী সস্মিতবদনী ও চিরকুমারী।'

হঠাৎ রমলা দেবী খিল খিল করে হেসে উঠলেন, এ হাসি খগেনবাবু কখনও তাঁর মুখে,— কারো মুখে শোনেন নি, তাই চমকে উঠে বল্লেন, 'বিশ্বাস করেন না? লোকে জ্যকণ্ডার হাসিই উল্লেখ করে, কিন্তু আমি দু'একটি এমন মূর্তি দেখেছি, যাদের হাসি আরো অপার্থিব।'

'কোথায় বলুন না?'

'এ দেশেরই মূর্তি। একটি ব্র্যাকেটের ড্রায়াড, আর একটি বুদ্ধের।'

'বুদ্ধের মূর্তিতে ত থাকবেই, কিন্তু ড্রায়াডে কেন? ঐ সব যক্ষিনী কিন্নরী আমার ভাল লাগে না।'

'সবগুলিই ভাল নয়, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হল ভার বহন ও বিলি করা। মন্দির ও স্তূপের ওপরকার ভার ভীষণ, গ্রীক মন্দিরের এবং মেস্ট্রভিচের ক্যারিয়াটিডের দেহ অবলম্বন ক'রে সোজাসুজি সেই ভার নেমে আসে। তাতে দোষ হয় কি

জানেন ? মনে হয় যেন মেয়েরা সোজা দাঁড়িয়ে সব ওজনটা মাথায় বহন করছে ; এটা স্বাভাবিক নয়। অবশ্য রাজপুতানী যখন মাথার ওপর জলের ঘড়া বয় তখন মন্দ দেখায় না, কিন্তু ঘড়ার ওজন বেশি হলে একটু পুরুষালি ঠেকে না কি ? তবু ত রাজপুতানী জোরে হাঁটে। বোধ হয় অ্যাথিনীয়নরা তাদের শত্রু অ্যামাজনদের আদর্শে কিংবা তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই মাথার ওপর ভার চাপাত। তার চেয়ে বাঁকাভাবে দাঁড়ানই আমার, আমাদের ভাল লাগে, বেশ হালকা মনে হয়, স্থূল মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে যেন স্ব-ইচ্ছায় বঞ্চিত করা হল। তাই হওয়া উচিত, মেয়েরা জগতের সব ভার বহন করবে না, ভার হালকা ক'রে দেবে বাঁকাভাবে দাঁড়িয়ে বণ্টন ক'রে। তা ছাড়া··· না, বলব না।'

'কেন ? বলুন না, তাতে কি ?'

'তা ছাড়া, মেয়েদের গঠনরীতিই বাঁকা রেখায়।'

'কিসের গঠন ?'

'দেহের। অতএব, মেয়েদের পক্ষে, মনের। যে থাম ওপরের ভার বইবার জন্য ব্যগ্র হয়ে লাফিয়ে ওঠে সেই থামই সোজা, আমার অত সোজা ভাল লাগে না, তার মধ্যে দাম্ভিকতা আছে।'

'আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি না ?'

'না, পারেন না, পারা উচিত নয়, পারলে বিসদৃশ ঠেকে, তার চেয়ে ড্রায়াডের মতনই ভাল, পাথরকেও লঘু মনে হয়।'

'অথচ পরনির্ভরশীলতাও পছন্দ করেন না ?'

'তা ঠিক নয়।'

'কি ঠিক ?'

'একটা সামঞ্জস্য।'

'আপনার সুবিধায় ?' রমলা দেবী হেসে ফেললেন। খগেনবাবুর কুঞ্চিত ভ্রূ লক্ষ ক'রে তিনি বল্লেন, 'শুনেছি, ড্রায়াডের মূল্য ডেকরেটিভ ?'

'ও কথাটার মানে নেই, সভ্যসমাজের বুলি মাত্র। আমি মেয়েদের কেবল ঘরের আসবাব ভাবি না, সৌন্দর্যবৃদ্ধির উপকরণ ভাবি না। আপনি বেশ ঠাট্টা করতে পারেন।'

'কোথায় ঠাট্টা করলাম ? আপনিই ত আমাকে কালো কষ্টিপাথরে হাত পা ভাঙ্গা মূর্তি, আমার বাড়িতে যারা আসে তাদেরকে ডানপিটের দল বল্লেন, কত কবিতা ক'রে। এত কবিতাও জানেন।'

'ঐ দেখুন। ভুল বুঝলেন ত। আপনাদের সঙ্গে পেরে উঠি না। আমি দিলাম উপমা, আপনি উপমার পাদপূরণ করলেন ব্যক্তি দিয়ে। বেশ।'

'না, না, আমি ঠাট্টা করছিলাম এখন। যখন লোকে ঠাট্টা করে তখন বোঝেন না, অথচ নিজে ঠাট্টা করতে তৎপর! বেশ মানুষ! আচ্ছা, অপার্থিব হাসিটা কি রকম?'

'সে এখন উড়ে গেছে। আচ্ছা, আপনি তখন হাসলেন কেন?'

'কখন?'

'ঐ আমার উপমার উত্তরে?'

'মনে নেই ত! বেশ যা হোক, পরের ওপর দোষ চাপাতে পারলেই বাঁচেন দেখছি!'

'বলুন না।'

'মনে নেই। মিথ্যে কথা বলি?'

'তাই বলুন, সত্য কথা বেরিয়ে আসবে।'

'একটু সময় দিন। পরে বলছি, এখানে খেয়ে যান।'

'খুব দরকষাকষি করতে পারেন যা হোক!'

'বলছি। কি বলব? আপনি পরের ওপর অত দোষ চাপান কেন বলুন ত?'

'এর নাম বুঝি মিথ্যে বলা? আমি দোষ চাপাই না, আপনি দোষ করেছেন।'

রমলা দেবী উদ্বিগ্ন হয়ে চাইলেন।

'আপনি সাবিত্রীকে কুশিক্ষা দেন নি?'

'যা ভাবেন।'

'যা ভাবি তা প্রকাশ করেছি।'

'কুশিক্ষা কেউ দেয় নি। তার স্বভাবই ছিল নরম, কারুর হুকুম ভিন্ন সে চলতে পারত না। আমি হুকুম করতাম না,...আমি তাকে ভালবাসতাম।'

'তা জানি, সেও খুব ভালবাসত— তারও বেশি করত। কিন্তু আমার হুকুম সে মানত না।'

'আপনি হুকুমই করতেন না, করতেন যদি ভাল হত।'

'আমি হাকিম হয়ে জন্মাইনি, কি করব? আমি যে তাকে ভালবাসতাম না তাও বলতে পারি না। সে ভাল হোক, আমি এই চাইতাম।'

'সেও আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসত— বোধ হয়, অত ভালবাসার রীতিই তাই।'

'কখ্‌খনো না। বেশি ভালবাসলে ছেড়ে দেয়।'

'শেষের কবিতায়।'

'আদি সত্যের তাগিদে।'

'সে চেষ্টা করত আপনাকে ঐ ভাবে ছেড়ে দিতে, আমি নিজে জানি, কিন্তু পারত না। তার স্বভাব তখনও তৈরি হয় নি— আপনি তৈরি হবার সময়ও তাকে দিলেন না।'

'তা হলে আমারই দোষ।'

'দোষ আবার কি? তাকে একান্ত করে দেখেন নি। আপনার আদর্শ-সাবিত্রীকেই আপনি বাসতেন ভাল। তাকে ভালবাসা বলে না, মেয়েরা বলে না, মেয়েরা তা চায় না।'

'তারা কি চায় আমি জানি না, চেষ্টা করলেও জানতে পারব না। আমি যা আমি তাই। সেই জন্যই ত কাশী যাচ্ছি।'

'রাগ করলেন ত?'

'ক্ষমা করুন, সত্যই রাগ করিনি। রাগ করবার জন্য এখানে আসি না।'

'আপনি আর আসেন কোথায়? আমিই কেবল নির্লজ্জের মত ডেকে পাঠাই।'

'ছিঃ। বলবেন না। নিজেই আসি— কোথায় যাব বলুন?'

'যাবার জায়গা নেই বলে আসেন?'

'আমার সোজা কথার বাঁকা অর্থ বার ক'রে কী তৃপ্তি পান। আসতে ভাল লাগে বলেই আসি। সুজনকে দেখছি না কেন?'

'ডেকে পাঠাব?'

'না, ডাকতে হবে না।'

'আপনি কাশী যাচ্ছেন কবে?'

'জানি না।'

'এইবার স্নান করুন।'

'স্নান ক'রে এসেছি।'

'আপনার চোখ কেমন?'

'চোখ খারাপ হচ্ছে বোধ হয়।'

'দিব্যি চোখ আছে, নচেৎ অপার্থিব হাসিও দেখতে পান।'

'সত্যি দেখেছি। ঠোঁটে হাসি, চোখে জল নেই, কিন্তু কী অসম্ভব করুণা, জল জমে বরফ হয়নি, হাসি ফুটে লোভনীয় করেনি, অত্যন্ত সংযত, সংহত, যীশুর মুখে যে করুণা মাখান হাসি প্রত্যাশা করা যায়।'

'সেই লাল মাঠের মাঝখানে বুড়ো বটগাছের তলায় মূর্তির মুখে?'

'না, তার মুখ কঠিন।'

'তার চোখে জল দেখেন নি?'

'না।'

'সে জন্য চোখ থাকা চাই।'

'আমি কি এতই কানা? তার চোখ শুখনো।'

'হবে— আমি ত দেখিনি!'

'আপনার চোখে ছানি আছে।'

'হয়ত আছে।'

'নিজেই জানেন কিসের।'

'আপনারই আছে।'

'আদর্শবাদের ছানি? থাকতে পারে। যদি থাকে, নিজেই খসে যাবে।'

'তাই কি যায়? সার্জন ডাকতে হয়।'

'গোলাপ জলে হয় না?'

'আপনাকে খাবার দিই?'

রমলা দেবীর কণ্ঠে গাম্ভীর্য লক্ষ ক'রে খগেনবাবু বল্লেন, 'এইবার বুঝেছি। সাবিত্রীর জন্য আপনার যে কষ্ট হয়েছে আমার বোঝা উচিত ছিল। আমার বুঝতে একটু দেরি হয়।'

রমলা দেবী হঠাৎ উঠে পড়ে বল্লেন, 'দেরি হয়েছে। মুকুন্দ রাগ করবে না?'

'মুকুন্দ কেন রাগ করবে?'

'না, তাই বলছি, দেরি হয়েছে কিনা!'

'তা হোক গে। আপনি বসুন।'

'না, আগে খাবার দিই।'

রমলা দেবী যখন ঘরে এলেন তখন খগেনবাবু মাথা নিচু ক'রে বসে আছেন।

'এখনি খাবার দিচ্ছে। কি ভাবছেন?'

'কি আর ভাবব? কেবল অন্যায়ের স্তূপ বেড়েই যাচ্ছে— পরের কথা বুঝিনি। কেবল নিজের সম্বন্ধেই ভেবে এসেছি।'

'ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি যথেষ্টই হয়েছে। অবশ্য সেই জন্যই নিজের পায়ে দাঁড়ান আমার পক্ষে সোজা হবে। আমার জগৎ কোথায় জানেন? এই মস্তিষ্কের মধ্যে। আমার বাইরে কি আছে জানি না, তার একটা মোটা নাম দিয়েছি, সাধারণ মানুষ, জনগণ। ভিড়ের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ পেতেই হবে। বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না।'

'বুঝিয়ে কি আর হবে? আপনি তা হলে মাসীমার কাছে যান।'

'তাই যাব, এক একবার মনে হয় তাঁকে এই বয়সে বিরক্ত করবার আমার কি

অধিকার আছে? অনেক কষ্ট করেছেন, আর কেন?'

'আপনি ত দুঃখের পসরা উজাড় করতে যাচ্ছেন না, আপনি যাচ্ছেন নিরুদ্দেশে।'

'তা বটে। কিন্তু কাশী গেলেই যে সংসারত্যাগী হব তা বলছি না। আমার একাধিক বন্ধু আশ্রমবাসী হয়েছেন— তাঁদের কাজ চিঠি লেখা, আরো কত কী। বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে তাঁদের বড্ড ইচ্ছে হয় বেশ বুঝতে পারি।'

'সকলেই কি এক? একবার তাঁদের দেখিয়ে দিন না, কি ভাবে সমস্ত সামাজিক বৃত্তিগুলোকে সঙ্কুচিত করলেই প্রকৃত আত্মজ্ঞানী হওয়া যায়।'

'আপনি ঠাট্টাই করুন আর বিদ্রূপই করুন, আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি যে কাশী গিয়ে আমি কাউকে চিঠি লিখব না। বন্ধু-টন্ধু আর আমার নেই। নিজে নিজে সুখী হতেই তাঁদের প্রত্যেকের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে, বাকি যতটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু ব্যয় হচ্ছে নিজের ভণ্ড সুখের বিজ্ঞাপন দিতে। আচ্ছা, আপনি বন্ধুত্বে বিশ্বাস করেন?'

'করি।'

'সাবিত্রীর সঙ্গে যা ছিল তা নয়। ও-ত কেবল এক তরফা। আমি বলছি অন্য রকমের বন্ধুত্ব। এই কি রকম জানেন? পেটেতে ধক ক'রে লাগে যার কথা ভাবতে গেলে— একেবারে নাড়িতে টান পড়ে। কি যে পাগলামী করছি! কৈ খাবার দেবেন না? আজ স্নান করব।'

'একবার করেছেন না? শরীর ভাল থাকলে আবার না হয় করুন না, মাথাটা ধুয়ে ফেলুন।'

'আচ্ছা তাই ফেলি।'

'বসুন না একদিন না হয় দেরিই হল, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উল্টে যাবে না। কাল আপনার পুরোনো বন্ধুদের গল্প বলেছিলেন বড় ভাল লাগছিল। বন্ধুত্ব হলে কি রকম হয়?'

'ও সব ছেলেমানুষি কথা ভুলে যান।'

'সে কথা থাক। বন্ধুত্ব হলে কি করতে হয়?'

'কি আবার করতে হয়। কি রকম হয়ে যায়। ঠিক বলা যায় না।'

'বলা না গেলেও বন্ধুত্বটা আছে ত।'

'নিশ্চয়। বন্ধুত্বটা দেহগত, বুকটা কেমন ধক ধক করে, যেন ধসে যায়। প্রেমে যেন একটু হালকা মনে হয়— ওটা যেন মাথার ব্যাপার। আমি অবশ্য শেষেরটি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।'

'আপনার শুনেছি ছেলে বয়সে একজনের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল।'

'সে-সব ছেড়ে দিন। মনে নেই সব কথা, করতেও চাই না। তবে বন্ধুত্বটা বই-এর ধার-করা কথা নয়— কারণ বড় কেউ বন্ধুত্ব নিয়ে নভেল নাটক লেখেনি। যে সব কবিতাও আছে সেগুলি ছন্দে লেখা দর্শন। বেশির ভাগই কেন, সব কবিতাই প্রেমের— তাই কবিতা আমার নতুন না হলে ভাল লাগে না।'

'নতুন আর কি হবে বলুন?'

'নতুন বিষয়, নতুন ভঙ্গি। পুরাতন বিষয় হলে ভঙ্গিটা নেহাৎ ভাল হওয়া চাই। সত্যি বলতে গেলে ছেলেমানুষ না হতে পারলে কবিতা লেখা যায় না, কবিতামাত্রই মানসিক অপরিপক্কতার নিদর্শন, তাই যৌবনে কবিতা ভাল লাগে। আর যেই ভাল লাগা, অমনি কবিতার চোখা-চোখা ভাষা মাথার মধ্যে উকুনের মত বাসা বাঁধে, তখন আর মাথা ন্যাড়া না করা ছাড়া উপায় নেই। কবিতাই প্রেম সৃষ্টি করেছে, নভেল নাটক সাহায্য করেছে কবিতাকে। যদি না স্বীকার করেন তা হলে বলব প্রেম অপরিণত সাহিত্যিকের বই বিক্রি করবার ফন্দী, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত! কিন্তু বন্ধুত্বকে সাহিত্যিক বাগে আনতে পারেন নি। কি ক'রে পারবেন। ওটা যে সত্যকারের অভিজ্ঞতা, বাস্তব, খাঁটি জিনিস, যেমন— আপনি আমার সামনে রয়েছেন। কৈ কেউ আঁকুন দেখি আপনাকে! সকলে বলবেন, বেশ একজন মহিলা বসে রয়েছেন— কিন্তু হল না ঠিক— বাদ পড়ে গেল অনেকটা। আপনি আমার কথা শুনছেন, আমি কথা কইছি— এই মানসিক সম্বন্ধটি বর্ণনা থেকে বাদ পড়ল। এইটাই কিন্তু আসল, এই সম্পর্কেই আপনি আপনি, আমি আমি। কোন সাহিত্যিক এই চলিষ্ণু, গতিশীল, এই অশরীরী অথচ বাস্তব সম্বন্ধরূপী সত্তাকে রূপ দিতে পারেন কখনও? আঁকতে পারেন আপনাকে, আমাকে, টেবিল ক্লথকে, পৃথক, পৃথক করে….'

'ছবিতে কিন্তু এই সম্বন্ধটি ধরা পড়ে নাকি? এ রকম যেন দেখেছি, টেবিলের ওপর ফল রয়েছে, সেই জন্য টেবিল ও ফল ভিন্ন রকমেরই দেখাচ্ছে?'

'ধরা পড়ে, কিন্তু সত্য সম্বন্ধটি কিছুতেই পড়ে না! বলছি আপনাকে— আপনি ত ইম্প্রেশনিস্টদের কথা বলছেন? তাঁদের চোখ 'ক্যামেরার চোখ মানছি, তাঁরা আলোকে ছবির নায়ক করেছেন স্বীকার করছি, রঙের খেলা দেখানই তাঁদের উদ্দেশ্য স্বীকার করছি, তবু, তবু প্রত্যেক আর্টিস্টই সত্যকারের সম্বন্ধটিকে মেরে ফেলে তবে নতুন সম্বন্ধ রচনা করে। নতুনটা হয়ত সত্যের চেয়ে বেশি মনোহারী, তাতে আসে যাচ্ছে না, কারণ বন্ধুত্বের চেয়ে বেশি মধুর আর কি হতে পারে? প্রেম? কিছুতেই না, প্রেমের পরিণতি বন্ধুত্বে, বন্ধুত্বের অবনতি প্রেমে।'

'সম্বন্ধের অস্তিত্ব মানেন দেখছি' বলে রমলা দেবী একটু হাসলেন।

খগেনবাবু না লক্ষ করেই তাঁর চিন্তাধারার অনুসরণ করলেন :

'আর্টের মূলধন স্মৃতি, প্রেমেরও তাই, সেই জন্য আর্ট ও প্রেমে অত মিল! বন্ধুত্ব হয় আছে, না হয় নেই, নতুন কিছুতে পরিণত হয় না— ভারী মজার ব্যাপার! বড় খাঁটি জিনিস দেহটা যেমন। এ সব নিয়ে আলোচনা করা যায় না, অতএব সাহিত্যও করা যায় না।'

'খুব শুদ্ধ?'

'মাতৃস্নেহের চেয়ে! একটা ছেলে মারা গেলে মা অন্য ছেলে চায়, নতুন ছেলের ওপর মায়া পড়ে, কিন্তু বন্ধু মারা গেলে আর একটা বন্ধু কাড়তে ইচ্ছে হয় না। বন্ধু গেল, সূর্য নিবে গেল,····আপনি কি ভাবছেন? হল কি? কী সব বাজে বকছি। বন্ধুত্বটা প্রেমের চেয়ে বড় মনে হয়। অবশ্য সবই আমার মনে হয়, মনে হওয়া ছাড়া আর কি আছে বলুন? সবই আমার মনে।'

'কেন বন্ধুত্ব? সেটা ত মনে হয়?'

'তা বোধ হয় না, সেই জন্যই ত শুদ্ধ! ওলট পালট কথা হল, নয়? তা হোক গে। তার ভেতর মিল একটা কোথাও আছে, আপনি বুঝে নেবেন।'

'মন দিয়েই বুঝেছেন মনের অতিরিক্ত বন্ধুত্ব?'

'তা ছাড়া উপায় কি?'

'স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগের মহিমা আছে!'

'মহিমা অর্জনে ব্যগ্র নই, কিন্তু, রামচন্দ্র বনবাসে চললেন।'

'উপমাটি খাটল না'।

'কেন?'

'এই··· লক্ষ্মণের অভাব। এইবার মাথা ধুয়ে খাবেন চলুন, দেরি হয়ে গেল। কবে কাশী যাচ্ছেন?'

'যেদিন ছুটি পাব।'

'ছুটি কিসের?'

'দরকারি কাজ থেকে— চিঠিতে যা লিখেছিলেন।'

'শ্রাদ্ধের প্রয়োজন নেই, পুরোহিত ঠাকুর নিজেই ক'রে নেবেন, পঞ্চাশ টাকা চাই।'

'হিন্দুধর্ম বিপদেও ফেলে, আবার উদ্ধারও করে! চলুন!'

খাবার পর বসবার ঘরে এসে রমলা দেবী বললেন, 'ঠাট্টা করেছি বলে রাগ করবেন না।'

'রাগ করব কেন? নিজেই যদি পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করি, আপনার

দেখিয়ে দেবার অধিকার আছে নিশ্চয়।'

'অধিকার আবার কি! সম্পর্ক যে রাখতে চায় না তার ওপর অধিকার নেই।'

'বন্ধুদের অধিকার আছে নিশ্চয়, নিঃসম্পর্কিত হয়ে জীবন কাটান যায় কিনা পরীক্ষা করছি মাত্র; হয়ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব না।'

'নিশ্চয়ই পরীক্ষা করবেন, চেষ্টা করবেন, চেষ্টা করলে কি না হয়। তবে কিসের জন্য চেষ্টা?'

'জন্য আবার কি? ভিড়ের আর মানুষের মতন মানুষের পার্থক্য খোঁজা, এই চেষ্টা। যে মানুষ সে নিজের ওপর দাবি করে, নিজের কাছে চায়, যে সাধারণ সে চায় পরের কাছে। সেই জন্য অবলম্বনহীনতাই যোগ্যতার কঠিনতম পরীক্ষা।

ধ্যানী ও যোগীরাই একমাত্র মানুষ, বাকি সব canaille— সাধারণ। আমার সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র হবার প্রয়োজন আছে, অধিকার আছে।'

'শক্তি? পরে দেখা যাবে। শক্তি নিয়ে জন্মায় না, ঘসতে ঘসতে হয়। চেষ্টা করব না, আত্মসংযম করব না, গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যাব যে!'

'কোন সম্বন্ধই রাখবেন না? এই যে বললেন, ছবিতে....'

'বাজে কথা বলেছি... ও রকম মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, ধরতে নেই সব কথা!'

'একটিও বাজে মনে হয়নি আমার। বন্ধুদের খবর দেবেন না?'

'না। আগেই বলেছি, দেখাব কি ক'রে কর্মঠবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। নেহাৎ না পারি....'

'মুকুন্দ যাচ্ছে? লোকটা কি কাজের? যদি কিছু না মনে করেন তা হলে চিন্তামণিকে সঙ্গে নিয়ে থাকার অনুরোধ করতে পারি কি? চিন্তা সাবিত্রীকে বড়ই ভাববাসত, সাবিত্রীরও চিন্তাকে পছন্দ হয়েছিল, মুকুন্দ না হয় বাড়ি আগলাক্।'

'না, না, সে হয় না, বেচারি মাসীমার কাছে মানুষ, যাবার নাম শুনে অবধি কী খুশী। বাড়িটা আপনি এখান থেকে যা পারেন তাই দেখবেন। চাবি আপনার কাছেই থাকবে। দরকার হয় যদি কিছু— আচ্ছা, আমি গিয়েই আপনাকে চিঠি দেবো, যদি বইটই পাঠাবার প্রয়োজন হয় সুজনকে দিয়েই পাঠাবেন। চিঠির উত্তর দেবেন ত? আমিও অবশ্য নিয়মিত চিঠি লিখতে পারিনা।'

'দরকার হলে লিখবেন। কখন যাবেন? যাবার আগে যেন খবর পাই।'

'ভাবছি তা হলে কালই যাব।'

'গোছগাছের কি হবে?'

'ঐ ত বিপদ! মুকুন্দ যা বুদ্ধিমান, কোথায় কি আছে ছাই জানিও না, কখনও জানবার ইচ্ছেও ছিল না।'

'আমি....'

'সে-ত খুবই ভাল হয়— যদি অনুগ্রহ ক'রে, কষ্ট যদি না হয়....যদি একবার দেখিয়ে দেন....ও কাজ আপনাদেরই শোভা পায়। সুজনকে না হয় নিয়ে যাবেন।'

রমলা দেবী সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

বেলা একটার সময় রমলা দেবীর প্যারাসল নিয়ে নিচে এলেন। দরজার গোড়ায় খগেনবাবুর মনে হল চা-এর নিমন্ত্রণ করাটা ভদ্রতা, কিন্তু এ সময় নিমন্ত্রণ কেউ প্রত্যাশাও করে না; তা ছাড়া মুকুন্দটা একেবারেই অকর্মণ্য। ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ছাতাটা থাক্, রোদ্দুর নেই, বিকেলে ঐখানেই চা খাবেন।'

রমলা দেবী বললেন, 'যাবো, চা-এর প্রয়োজন নেই, প্যারাসলটা নিয়েই যান. আচ্ছা, থাক।'

পথে খগেনবাবু বই-এর দোকানে প্রবেশ করলেন। বেনারস যেতে হবে সেখানে প্যাঁড়া পাওয়া যায়, বই পাওয়া যায় না। এই দোকানটির প্রত্যেক আলমারির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। নতুন নতুন বই সর্বদাই বিদেশ থেকে আসছে, মালিক ও কর্মচারীরা সাহায্য করতে সদাই প্রস্তুত, যতক্ষণ ইচ্ছে বই ঘাঁটা যায়, বেচবার কোন অভদ্র তাগিদ নেই, মাঝে মাঝে চা পাওয়া যায়, মিঠে পানের দোনাও আসে। দোকানে প্রবেশ করতেই ছোটবাবু বললেন, 'এত রোদ্দুরে, এই দুপুরে। ভেতরে আসুন।'

দোকানের এককোনে একটি ছোট ঘর, খগেনবাবু সেইখানে গিয়ে বসলেন; খবরের কাগজে তা হলে বেশি উচ্চবাচ্য করেনি। এঁরা খুব ভদ্র, হয়ত জেনে-শুনেও উল্লেখ করছেন না। ছোটবাবু এক গাদা বই এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। সিগারেট ধরাতে ধরাতে খগেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'শরবতের দোকানে অর্ডার দিলে বাড়িতে দিয়ে আসে?'

'নিশ্চয়, কেন? ওরে খগেনবাবুর জন্যে এক গেলাস ঘোলের শরবত নিয়ে আয়, আর দু' দোনা মিটে খিলি।'

'না, না তা বলছি না।'

'খান না।'

'আনান তা হলে, ঘোলের শরবত গা ঘিন ঘিন করে।'

'ওরে, গেলাস ধুয়ে নিয়ে যা।'

যে সে লোকে তৈরি করে নোংরা আঙুল দিয়ে, বাড়িতেও···খগেনবাবু বাড়িতেও ঘোলের শরবত খেতেন না, আঙুল দিয়ে তোলা মাখনেও তাঁর আপত্তি ছিল, মেয়েদের হাত বড় নোংরা। সাবিত্রী একবার ঘোলের শরবতে কী একটা উগ্র গন্ধ দেয়, বড় তেতো হয়, খগেনবাবু খেতে পারেননি, মান অভিমান, সেই থেকে ঘোল ত্যাগ, ভাবে প্রেম।

'একটা ভাব আনতেই বলুন।' খগেনবাবু বই ঘাঁটতে লাগলেন।

বিদেশী নভেল, বেশির ভাগই তর্জমায়। অনুবাদ পড়তে তাঁর ভাল লাগত না; প্রত্যেক কথার প্রত্যেক বাক্যের শিকড় থাকে, অনুবাদক অপটু মালীর মতন গাছ উপড়ে ফেলে, শিকড়-সমেত তুলতে পারে না, ছিঁড়ে যায়, তাই টবে বসালেই যায় মরে। মেয়েদের কথারও শেকড় আছে, সাবিত্রীরও ছিল, তিনি তুলতে গিয়ে শিকড় ছিঁড়ে ফেলতেন; 'তুমি এই বলছ ত?' 'না বলিনি, তুমি আমার কথা বুঝবে না।' এক একজন অনুবাদককে মালী বলতেও ইচ্ছে হয় না, বাছুর বল্লেই হয়। স্কট মনক্রিফের ব্যাপারই আলাদা, কেমন ক'রে প্রুস্তের ঐ গোলক ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করলেন কে জানে? রচনাভঙ্গির ওপর বাঙ্গালী সাহিত্যিকের স্নেহযত্ন যে কমে আসছে তার কারণও ঐ অনুবাদ পড়ার অভ্যাস। নভেল পড়া আর চলেনা। এই যে! বটিচেল্লির জীবনটা সস্তায় বেরিয়েছে, কেনই বা আগে কেনা! অধৈর্য, সকলের আগে দামী বই কিনে পড়েছি— এই সংবাদ দেবার মধ্যে একটা মোহ ও দাম্ভিকতা আছে। বই পড়াতেও রেষারেষি, ঘোড়-দৌড়। কোলকাতায় থাকলেই সর্বাগ্রে কিছু করবার ইচ্ছা হয়— ভাল লাগেনা। বিলিতী প্রকাশকরা ভারী চালাক— গোড়ায় ৩০ টাকা, দু'বছর পরে ১০ টাকা! জাপানীরা ছবি ও কবিতা সম্বন্ধে লেখে ভাল— বটিচেল্লি ও ইটালিয়ান প্রিমি-টিভদের ছবি জাপানীরা বোঝে ভাল, রেখার কম্পন তাদের প্রাণে অতি সহজেই স্পন্দিত হয়। বেরেনসন-এর বইটা নিতে হবে— সত্যকারের সমালোচক। নতুন কবিদের কবিতা— এদের জগৎ থেকে সাধারণে বহিষ্কৃত এই লোকে বলে, তা নয়, প্রত্যেক আধুনিক নিজের পরিখার মধ্যে কেল্লা বেঁধে বসে আছে। সে কি করবে? পৃথিবীটাই বিগড়ে গিয়েছে, তাই মর্গ্যান লিউইসকে হল্যাণ্ডের এক কেল্লায় পুরেছেন। এটা কি? পাউইস নির্জনতার গুণকীর্তন করেছেন। মন্দ নয়, সাহেবরা হল কি? ভিড় থেকে পালাচ্ছে— কিন্তু কোথায় পালাচ্ছে। সে দেশের খবর পেতে হলে পড়তে হয় পুরানো বই।

'ছোটবাবু, এটাও দিন; প্যাসকালের পেনসীজ সস্তায় বেরিয়েছে?'

'হাঁ, এভরিম্যান সিরিজে, দিই।'

প্যাসকালের তুলনায় পাউইস পানসে। 'গ্যাসেটের "জনসাধারণের উপদ্রব";

বইটার খুব সুখ্যাতি দেখছিলাম, দিনত; কোন ভাল এডিশন আছে মার্কাস অরেলিয়াসের ?'

ছোটবাবু প্যাসকাল, অরেলিয়াস ও গ্যাসেট আনলেন।

রাশিয়া-সংক্রান্ত নতুন খবর আর কী থাকবে এ সব বই-এ? ও দেশে জনসাধারণকে স্বর্গে তোলা হয়েছে, ভাল লাগেনা। সাহিত্য তাই হচ্ছে না। সাহিত্যের জন্য চাই অবসর, অবসরের জন্য বড়লোকের দল থাকতে বাধ্য, যারা নিষ্কামভাবে চিন্তা করে যাবে, যাদেরকে কাজের জগতে নামতে বলা সমাজের পক্ষে মূর্খতা। প্রোগ্রাম বেঁধে প্রোপাগাণ্ডা ক'রে কখনও সাহিত্য হয়! রাশিয়ান ফিলমের বই দু'একখানা নিলে হয়, ফিলম করছে নতুন ধরনের। 'সিমেণ্ট' আর ফিলমের নতুন বইটা নেওয়া যাক। ছোটবাবু এপিকটেটাস, সেনেকা, মনটেন, আর গ্যেটের নির্যাস এনে টেবিলে রাখলেন— মরোক্কো চামড়ার চমৎকার বাঁধান, মোড়া যায়। বই-এর পাতার ও চামড়ার গন্ধ ও স্পর্শ খগেনবাবুকে অভিভূত করত। ছোটখাট্ট বই, রং-বেরঙের বাঁধাই, পকেটের মধ্যে আপত্তি না জানিয়ে চলে যায়, গায়ে হাত বোলাতে ইচ্ছা করে, ছুঁলে গা শির শির ক'রে ওঠে, কাঁটা দেয়। প্রত্যেক অক্ষর সুস্পষ্ট, ভুল নেই কোথাও। মাথার বালিশের পাশে চুপটি করে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে, খোলো খুলবে, না খোলো মুখ বন্ধই রইল, কোন মান নেই, অভিমান নেই, আদর-কাড়ান নেই। সাবিত্রী ঘুমুত পাশ ফিরে, বেশ দেখাত টেবল ল্যাম্পের আলোয়; শোবার সময় চুল আঁচড়ে ঢিলে খোঁপা বাঁধত, মুখে দিত হাইড্রোজেন পেরকসাইড আর গ্লিসারিন, শুত কুঁকড়ে সঙ্কুচিত হয়ে, আলগোছে, বিছানায় দাগ পর্যন্ত পড়ত না, হালকা ছিল, এই বটিচেল্লির অঙ্কিত মেয়ের মতন, যারা সব হাওয়ায় উড়ছে ওপর দিকে, মাটিতে পা দিচ্ছে যেন করুণা করে, যারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাজ করবার কোন সুযোগই দেয় না। তা নয়, যত সব নিতম্বিনীর দল! সাধে কি গৌড়ীয় রীতি হীনরুচির পরিচায়ক! উর্ধ্বগতি না হলে আত্মার সদ্গতি হয় না। রমলা দেবী কি ক'রে নিজেকে হালকা রাখলেন কে জানে! নিশ্চয়ই গরম জলে লেবু ভিনিগার খান, মিষ্টি খান না। তাইত, তাঁর জন্য কি আনান যায়! স্যাণ্ডউইচ করলে মন্দ হয় না। একবার রমলা দেবী চীনেবাদামের স্যাণ্ডউইচ ক'রে পাঠিয়েছিলেন, চমৎকার লেগেছিল, পরের দিন সাবিত্রী করতে যায়, হয়নি। অনুকরণ! সাবিত্রী ছিল উৎসবমূর্তি, মন্দিরাভ্যন্তরে যে মূর্তি বিরাজ করত সেটি রমলা দেবীর।

খগেনবাবুর নির্বাচিত বইগুলি একজন কর্মচারী প্যাকেটে বেঁধে দিলেন। সেটি নিয়ে, খাতায় সই ক'রে খগেনবাবু বেরিয়ে এলেন। বাইরে রোদ্দুর

ঝাঁ ঝাঁ করছে। কলেজ স্কোয়ারের ঘড়িতে তিনটে। ন্যাশন্যাল হোটেলে স্যাণ্ডউইচের অর্ডার দিয়ে, মনোহারি দোকানে এক টিন বিলিতী বিস্কুট ও মাখন কিনলেন— দ্বারিকের দোকান থেকে ভাল সিঙ্গাড়া আনালেই চলবে। তাড়াতাড়ি বাড়িতে প্রবেশ করেই মুকুন্দকে বল্লেন, 'যাও মুকুন্দ, এখনি দ্বারিক ঘোষের দোকান থেকে আট খানা সিঙ্গাড়া, আট খানা খাস্তা কচুরী ও আধসেরটাক ঝুরিভাজা কী ডালমুট নিয়ে এস। যাও দেরি কোরো না— কাশী যাওয়াই ঠিক। তোমার খুড়ো কোথায় গেলেন? তাঁকে চা-এর যোগাড় করতে বল। বাসে যাও, বাসে এস, দেরি কোরো না, চারটের মধ্যে আনা চাই। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যাঃ।' মুকুন্দ চলে যাবার পর ঠাকুরকে স্টোভ ধরাতে বললেন। তাও ত বটে! শরবত কে করবে? অর্ডার দেওয়া হল না! 'ঠাকুর, এক কাজ করতে পার? গোলদিঘির ধারে ভাল শরবতের দোকান থেকে ঘোলের শরবত নিয়ে এস, বড় কাঁচের জাগ্‌টা খুঁজে নিয়ে যাও।'

'বাবু, নিজেই করব? খানিকটা দই নিয়ে আসি, নিচে কল রয়েছে, ওপর থেকে ভ্যানিলা কী অন্য কিছু সেণ্ট দেবেন। দেখুন না, আমার হাতে খেয়ে, আমাদের সেজবাবু আর কারুর হাতে....'

'আচ্ছা তাই নিয়ে এস!'

'কিছু বিলিতী খাবার করব?'

'দেশী বিলিতীর দরকার নেই, মুকুন্দ আনতে গিয়েছে, তুমি জানো?'

'আপনাদের আশীর্বাদে....পাপমুখে আর কী বলব! সাধে কি বাবুরা পঁচিশ টাকা ক'রে দিতেন! আর স্ত্রীর জন্য পূজোর সময় শাড়ি....'

'ও সব কথা পরে হবে। চা-ই কর, দেখব কেমন কর।'

'কখন চাই বাবু।'

'চারটেয়।'

'বাংলা, না ইংরেজী? একটা যদি রান্নাঘরের জন্য টাইমপীস দেন।'

'এখন যাও!' ঠাকুর চলে গেল। পঁচিশ টাকা! ফাজিল! একেবারে অ্যামেরিকান! মুকুন্দ গলায় ছুরি দিতে পারে দেখছি, নিশ্চয়ই রফা হয়েছে! খগেনবাবু প্যাকেট খুললেন। প্রথমেই গ্যাসেট রয়েছে। সাধারণ মনের দুটি নিদর্শন তিনি দেখাচ্ছেন **the free expansion of his vital desires, and therefore, of his personality; and his radical ingratitude towards all that has made possible the case of his existence** জৈবিক কামনা-পূরণের অবাধ সুবিধা চাওয়া এবং অকৃতজ্ঞতাই হল আদুরে ছেলের মনোভাব। বাস্তবিক সাধারণ মানুষ বড় আব্দারে হয়েছে— চায় কি? রাস্তায়

কীর্তন গেয়ে বেড়াবে আর ভদ্রলোককে ফুটপাথে হাঁটতে দেবে না? ট্রামে ট্রেনে চড়ে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক বর্বরতার নিন্দা করবে? একটা অধ্যায় Noble life and Common life, or Effort and Inertia— These are the select men, the nobles, the only ones who are active and not merely reactive for whom life is a perpetual striving, an incessant course of training. Training = askesis. These are the ascetics— এই ত ঠিক! সাধনা করতেই হবে, স্রোতের বিপক্ষে সাঁতার কাটতেই হবে, নচেৎ গা ভাসান ভিড়ে, ফ্যাশানে— তাতে আভিজাত্য নষ্ট। এই গ্যাসেটই না স্পেনের নতুন দলের নেতা? লোকটা কি বলছে দেখতে হবে। personality না লিখে individuality লিখলে ভাল করতেন! দর্শনের অধ্যাপক লিখছেন সমাজতত্ব, ভালই হবে বইটা। স্পেনের একটা আভিজাত্যের দম্ভ আছে, ভারী অহঙ্কারী জাত। কথায় কথায় ছুরি চালায়। কিন্তু এদের আভিজাত্য য়ুরোপের নয়, আফ্রিকার। এ জাতের রক্তবিন্দুতে মরুভূমির ধূলিকণা প্রবেশ করেছে, এদেশের আবহাওয়াতে মিশেছে সাহারার আঁধি, মেজাজে এসেছে মূরের তেজ। ধাত পিত্তপ্রধান নয়, বায়ুপ্রধান। নিষ্ঠুর আত্মম্ভরী, এদের ভাল-বাসায় নিষ্ঠুরতার খাদ থাকে, এদের গাম্ভীর্যে রয়েছে একরোখামি। প্রত্যেক স্প্যানিয়ার্ড, ক্যাসটিলিয়ান একদম একাকী, ডন কুইকসটের মতন। আমরা হাসি তার সম্পর্কহীন, নিঃসংশ্রব স্বাতন্ত্র্য দেখে, কিন্তু স্প্যানিয়ার্ডের কাছে ডন একজন অতিমানব, মহাত্মা, প্রতিভূ। লোকে হাসে হাসুকগে, রমলা দেবী যেমন না বুঝে ঠাট্টা করেছিলেন। না বুঝে কি? বোধ হয় বুঝেছিলেন, তবু আত্মগোপনের প্রচেষ্টা, কেন? মেয়ে মানুষ বলে? মেয়েরা বড়ই গতানুগতিক, রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী, তাই ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারেন না। লোকে হাসুকগে, মেয়েরা যত পারেন আপত্তি করুন, কিন্তু ডন কুইকসটের জন্যই স্পেন এখনও টিকে আছে, বর্তমান স্পেনে অন্য কোন মহাত্মা নেই, এই কাল্পনিক বীরেরই পূজা এখন চলছে। একটু খ্যাপামী ভাল। মুকুন্দ যেন স্যাঙ্কো পাঞ্জা! কিন্তু····স্পেনের মেয়েদের কালো চোখ, কালো ভুরু, দাঁড়ায় কোমরে হাত দিয়ে, দেহের গঠন পুরুষ্টু, বেশি বাঁকা, অথচ যেন মিলিটারি মেয়ে, নির্লজ্জ।····মোটে সাড়ে তিনটে···· ঘড়িতে দম দেওয়া হয়নি যথাসময়ে— যায় মন্থরগতিতে— ডন কুইকসটের ঘোড়ার মতন, স্যাঙ্কো পাঞ্জার মতন। ডন রোগা ছিলেন, তিনি হাঁটতেন কেমন? অত আস্তে চলা পোষায় না····নতুন ঘড়ি কিনতে হবে। মুকুন্দকে নিয়ে যেতেই হবে— চিন্তামণিকে নিয়ে যাওয়াও যায় না— রমলা দেবীর চাকর— বনবে না। কিন্তু মুকুন্দ সত্যি গায়ে পড়া। ওর কাছে কোথায় খেয়েছি, কেন খাইনি কৈফিয়ত

দিতে হবে! ছাই দিতে হবে! যা হুকুম করব তাই করতে হবে, আব্দারে হয়ে উঠেছেন, ভাবছেন, মা আর নেই, বাড়ির গিন্নী হয়েছেন, পঁচিশ টাকার বামুন এসেছেন! ঠাকুরটা ফাজিল!

'বাবু দই এনেছি, একটু সেন্ট দিতে পারেন।'

খগেনবাবু উঠে কাঁচের আলমারি থেকে ফলের নির্যাস ও চা-এর ভাল বাসন বার করলেন। 'শরবত আনলে নিজেরাই গন্ধ দিয়ে নেবো'খন। এখন যাও, মুকুন্দ আসে নি?'

'আজ্ঞে না, আসতে একটু দেরি হবেই।'

এতক্ষণেও চারটে বাজে নি! ততক্ষণ বই ঘাঁটা যাক।

গলির মোড়ে মোটরের হর্ন বাজল। খগেনবাবু নিচে গেলেন। এই হর্ন শুনে নামতে গিয়ে একদিন সাবিত্রী হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়েই গিয়েছিল, গোপিকা, কৃষ্ণের বাঁশি, লেসবিয়ান লভ···কত কী মন্তব্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন। গাড়ি এসে গলির সামনে থামল। সামনে চিন্তামণি। খগেনবাবু দরজা খুলে দিলেন। রমলা দেবী হাসিমুখে বললেন, 'আগেই এলাম, এ বাড়িতে আমি—'

'তা আর কি করা যায় বলুন··· মানুষে।'

রমলা দেবী ওপরে এলেন, ওঠবার সময় পায়ের গোড়ালির ওপর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল, খগেনবাবু চোখ ফিরিয়ে ঠাকুরকে ইশারা করলেন জল চড়াতে— দেখতে পেলেন চিন্তামণি তোয়ালে ঢাকা বড় একটা কাচের পাত্র নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকছে।

'এই নিন কুশানটা।'

'দুপুরে ঘুমুলেন?'

'না।'

ঘরে দু'জন, না তিনজন? দু'জনে যখন বাক্যালাপ করে তখন অনুপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তির দেহহীন অস্তিত্ব বাক্যবিন্যাসের ব্যাকরণ হয়ে ওঠে। কেবল মৌখিক ভাষারই নয়, অব্যক্ত সম্বন্ধের গোপন রীতিও সেই অনস্তিত্বের দ্বারা নিরূপিত হয়। খগেনবাবু ও রমলা দেবীর মধ্যে বাক্যহীন ব্যবধান জীবন্ত স্মৃতির দ্বারা ভরে গেল। খগেনবাবুর অস্বস্তি হচ্ছিল, রমলা দেবী নীরবে বসে রইলেন।

'সুজনবাবু এলেন না?'

'না।'

'কাজ আছে নিশ্চয়?'

'দেখা হয়নি, আসেনি।'

'এখানে কতবার এসেছেন···'

রমলা দেবী চোখ উঁচু করলেন, তাঁর দৃষ্টি খগেনবাবুর চোখ পর্যন্ত উঠল না।

'বসতে অসুবিধে হচ্ছে ?'

'মোটেই না।'

'চা দিতে বলি ?'

'থাক।'

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর রমলা দেবী প্রশ্ন করলেন, 'ঘর পরিষ্কার হয়নি ?'

'মুকুন্দ নিশ্চয়ই করেছে, খুব কাজ করছে, ওকে নিয়ে যেতেই হবে।'

'কবে যাওয়া ঠিক করলেন ?'

'এখনও ঠিক করিনি, কবে যাই বলুন দেখি ?'

'যেদিন আপনার সুবিধে হয়।'

'রোজই সুবিধে।'

'দিনক্ষণ মানেন না বুঝি ?'

'পাঁজি পুঁথি মানি না, তবে মনকে যাবার জন্য তৈরি, উন্মুখ করতে হয় এখনও ; ভীষণ কুঁড়ে আমি।'

'আপনি ত তৈরি।'

'হাঁ অনেকটা, তবে কাশীতে গিয়ে মাসীমাকে বিরক্ত করতে মন চাচ্ছে না, কাশীতে বড় ভিড়।'

'দ্বীপ আর কোথায় পাচ্ছেন ?'

'সেখানেও ক্রাইডে জুটবে।'

'জুটিয়ে নিজেই নিয়ে যাচ্ছেন।'

'নিজেরই দরকারে। সুজন এলেন না কেন ?'

'বল্লুম ত দেখা হয়নি। চিন্তামণিকে আনতে পাঠাব ? একটা চিঠি লিখে দিন।'

'ভারি অন্যায় হয়ে গিয়েছে চিঠি দেওয়া কিংবা নিজে যাওয়াই উচিত ছিল, ঠিকানা জানি না, আপনার হাতে দিলে অবশ্য হত।'

'অন্যায় হয় নি।'

'হাসলেন কেন ?'

'কই, হাসিনি ত ?'

'তা হলে ঠাট্টা করলেন।'

'কি ঠাট্টা ?'

'আপনি বোধ হয় ভাবছেন, আমি একলা থাকতে পারি না, অতএব সামাজিক ; ভদ্রতা জানি না, অতএব অ-সামাজিক। তা হলে একলা থাকার চেষ্টা বৃথা....নয় ?'

'ওসব কথা মনেও ওঠে নি।'

'মনে ওঠেনি, কিন্তু নিচের স্তরে রয়েছে।'

'আপনি বড় বেশি তলিয়ে দেখেন।'

'প্রবাহ অন্তঃশীলা, ওপরে বুদ্‌বুদ, তারই নাম ভাষা, হাসি, চাউনি।'

'ওপরে বালি।'

'তাও হয়, যেমন ফল্গু নদী।'

'কিন্তু আমি অত গভীর নই।'

'সে আমি বুঝি।'

'বুঝুন, কিন্তু ভুল বুঝবেন না।'

'তাতেই যদি সন্তোষ পাই তাই বুঝব।'

'বেশ।'

'তবু আপনি বেশ বল্লেন, সাবিত্রী তর্ক চালাত।'

রমলা দেবী খগেনবাবুর দিকে চাইতে তিনি কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন, 'সন্তোষ পাওয়া নিয়ে কথা।'

'সাধনায় সন্তোষ আছে?'

'আছে, নিশ্চয়ই আছে।'

'সাধনা মানে কি?'

'অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক করার নামই সাধনা। আজকের সাধনা কালকের অভ্যাস।'

'কী জানি! কষ্টটুকু থেকেই যায়।'

'সংহত অবস্থা কি কৃত্রিম অবস্থা?'

'জানি না!'

'বলুন না! আমি জানি আপনি জানেন, তবু কেন বলেন না? বলুন।'

'অভ্যাস হয়ে গেলে সহজ, না হওয়া পর্যন্ত কৃত্রিম। কিন্তু রাস্তার শেষ নেই যে।'

'আপনি কি ভাবেন যে আমাদের সকলের কেবল চলতেই হবে, কোথাও কখনও নিঃশ্বাস ফেলবার বিশ্রামের স্থান নেই?'

'তাই মনে হয়, বিশ্রামের লোভে ও শ্রান্তিতে মন ফাঁকি দিতে শেখে, আপনি বিদ্বান্ বলুন না।'

'অনুরোধ করছি অপমান করবেন না! এখানে বিদ্যে থই পায় না। বিদ্যার অতিরিক্ত কিছু আছে কিনা তাও জানি না। শুনেছি মেয়েদের বোধি আছে এবং সেটা বুদ্ধির ওপর। আমি তারই সন্ধানী— সন্দেহ করি যে আপনার মধ্যে

বোধির সন্ধান পাব। অনুগ্রহ ক'রে অসঙ্কোচে মনের ভাব ব্যক্ত করুন। অত লজ্জা কিসের! মেয়েরা গম্ভীর কথাবার্তা কইতে পারে না, কিংবা তাদের কওয়া উচিত নয় এ ধারনা প্রচার করতে ব্যগ্র কেন? আপনি বলুন,কখনও কোথাও কি শান্তি নেই, চলতেই হবে আমাদের?'

'সকলের বেলা কি হয় জানি না।'

'বেশ মেয়েদের বেলায় কি হয় বলুন।'

'মেয়েদের? ভাগ্য তাদের হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে— তাই পট পরিবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে, কাল যে ছিল কিশোরী আজ সে হল নববধূ, কালকের নববধূ আজকের···মা। তারপর বিধবা, পিতামহী, অনাবশ্যক, জঞ্জাল। আমরাই সত্যকারের বায়োস্কোপ দেখি, আমাদের সংস্কার সাজান নয়, অভিজ্ঞতা দিয়ে মালা গাঁথার সময় আমাদের নেই, সুবিধে নেই। আমাদের স্মৃতিশক্তির সুখ্যাতি করেন অনেকে, কিন্তু আমাদের স্মৃতিশক্তি নেই, তাই আমাদের আক্ষেপ নেই।'

'বিশ্বাস হয় না।'

'আছে তবে অন্য ধরনের।'

'কি রকম?'

'বিধাতা চুলের মুঠি ধরে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি থামলেন, ক্লান্তিতে, আমরা তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁরই জন্য জল এনে দিলাম, তাঁকে বীজন করতে লাগলাম, তাইতেই কত সুখ, ভাবলাম এইত সুখের জীবন— কিন্তু আবার টান শুরু হল।'

'বিধাতা টানছেন?'

'ভাগ্য-বিধাতা।'

'কে?'

রমলা দেবী চোখ নামিয়ে নিলেন। যেন বিষাদের প্রতিমূর্তি, সমগ্র বিশ্বের দুঃখ তাঁর সকল অঙ্গে ছায়াপাত করেছে। Saint Gaudens-এর সেই ছবি।

'ভাগ্য-বিধাতা মানুষের তৈরি। না তৈরি করলেই হল।'

'তৈরি করতেই হয়।'

'কেন? কি প্রয়োজন আছে? এতটা না ভাবলেই চলে।'

'আপনার মুখে না ভাবার উপদেশ শোভা পায় না।'

'সব সময় একই মত প্রকাশ করবার বাধ্যবাধকতা মানি না; যা মনে হচ্ছে তাই বলছি। আমার মনে হয়, আপনারা বিধানকেও মূর্তিমান করতে চান, তাই ভাগ্য-বিধাতার প্রয়োজন আপনাদের। মানুষ না হলে চলে না আপনাদের, তাই বিধাতাও মানুষ হয়ে কাজ করেন।'

'তাই হবে।'

'আমি নিয়ম মানতে প্রস্তুত, নিয়ম-কর্তা মানতে প্রস্তুত নই।'

'আমি নিয়ম জানি না, নিয়তির উপলক্ষকে চিনতে পারি।'

'তা হলে একলা থাকেন কেন?' প্রশ্ন করেই খগেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। সিগারেট ধরিয়ে উত্তরের প্রতীক্ষায় আবার বসলেন। রমলা দেবীর ঠোঁট কাঁপছে দেখে বল্লেন, 'থাক, বলবেন না।'

'সময় হলে বলব।'

'সময় যদি না আসে?'

'এলে বলব।'

'একলা থাকা কষ্টকর, অসাধ্য?'

'হাঁ, আপনার পক্ষে।'

'একবার নিজেকে সন্ধান করবার সুবিধা দিন। আমি চেষ্টা করি— অনুমতি দিন— কাশী যাই?'

'যান।'

'দু'জনেই নীরব রইলেন, চমক ভাঙল সদর-দরজা খোলবার আওয়াজে, নিশ্চয় মুকুন্দ, 'মুকুন্দ'।

'বাবু যাই!' মুকুন্দ ঘরে এল খাবার চুবড়ি হাতে নিয়ে।

'আশ্চর্য!'

'গরম গরম ভাজিয়ে নিয়ে এলাম, বড় ভিড় তাই দেরি হল।'

'যাও, ঠাকুরকে চা ও খাবার আনতে বল!' ঠাকুর পিরিচের ওপর দু' গেলাস ঘোলের শরবত নিয়ে এল। রমলা দেবী একটি গেলাস নিলেন, খগেনবাবু নিলেন না।

'একটু পরে— আধঘণ্টা পরে চা নিয়ে এস ত ঠাকুর।' ঠাকুর চলে গেল।

'এখনি চা আনতে বলব?'

'না, চা না খেলে নয়?'

'আমি খাব, সঙ্গ দেবেন। একটা কথা মনে উঠেছে।'

রমলা দেবী চাইলেন।

'সাবিত্রীর মৃত্যুতে আপনি বড় একলা হলেন বলে আমার দুঃখ হচ্ছে, সান্ত্বনা এই যে আপনার অভ্যাস আছে।'

'আপনার অভ্যাস আছে?'

'মনে মনে নয়, প্রাণে?'

'জানি না।'

'আমরা কেউই বোধ হয় জানি না।'

'তবে জানতেই হবে।

'আপনার গলা শুকিয়ে আসছে, চা দিতে বলি?'

'বলুন।'

রমলা দেবী বারান্দা থেকে চা দিতে বললেন। চিন্তামণি চা-এর কেৎলি ও খাবার নিয়ে এল। পেয়ালা ও পিরিচ সাজিয়ে রমলা দেবী চা ঢাললেন, খাবার রাখলেন। খগেনবাবু স্যাণ্ডউইচ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ আবার আনলেন কেন? বাড়ির?'

'ছিল নষ্ট হয়ে যেত?'

'ভালই করেছেন। বিসকুট নিন, সিঙ্গাড়া খাবেন না?'

'একখানা নিয়েছি, আর নেবো না, চা ঢালি?'

'একটু পরে, ফিকে চা ভাল লাগে না। সুজন এলে ভাল হত।'

'কেন?'

'সুজনকে আমার ভাল লেগেছে।'

'মনে মনে একলা কি রকম?'

'যারই মন আছে সেই একাকী; ভিড়ের কোন মন নেই।'

'সাধারণের সঙ্গে মেলা মেশা যে না করেছে তার মন কোথায়? মন নিয়ে জন্মায় কেউ? ভিড়ের মন হয়ত নেই, কিন্তু ভীষণ শক্তি আছে, একবার বিপক্ষাচরণ করলেই হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়।'

'সাধারণ আমার অভিব্যক্তির উপকরণ মাত্র।'

'উপকরণের চেয়ে বেশি, সেই প্রভু আমার দাস।'

'তা হলে সমাজ শাসন মেনে চলেন না কেন?'

'যতদিন ও যতদূর পেরেছি মেনেছি; তারপর....'

'কি?'

'তারপর...সেটা 'মানাই নয়; বাধ্য করে মানান, স্বেচ্ছায় নয়, ইচ্ছার বিপক্ষেও নয়। জলের মধ্যে মাছের মতন....আমি বলতে পারছি না?'

'বলতে চাইছেন না, না বলতে পারছেন না?'

'আপনি ত জানেন।'

'কিছুই জানি না।'

'জিজ্ঞাসা করুন, উত্তর থাকে, উত্তর দিতে পারি, দেব।'

'আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্য আছে।'

'হুঁ।'

'তিনি কোথায়?'

'জানি না।'

'একটা কথা না জিজ্ঞাসা ক'রে থাকতে পারছি না, বড়ই অভদ্রতা কিন্তু....'

'না আমি কিছু মনে করবো না।'

'মনোমালিন্য ঘুচবে না?'

'না!'

'তাহলে, আর তাঁর কৃপায়.. ?'

'তাঁর পয়সায়? তাঁর পয়সায় নয়!'

'কার?'

'আমার বিধবা মা তাঁর সম্পত্তি খুইয়ে আমার সদ্গতি করেন, অতএব সেই অর্থের ফলভোগে আমার অধিকার আছে।'

'ফলভোগই বটে! কিন্তু....'

'এর মধ্যে কিন্তু নেই।'

'প্রায় সব বড়লোকেরই সার্থকতার মূলে আছে অন্যের সম্পত্তি।'

'অতএব সেটা ন্যায়! অন্যায় পুরাতন হলে ন্যায়ে পরিণত হয় কি?'

'সহনীয় হয়।'

'পাত্রভেদে।'

'বাঙালী মেয়েদের সহ্যগুণ অসীম, আমাদের মা মাসীদের দেখলেই বোঝা যায়।'

'সেই মা-ই সহ্য করতে পারেন নি।'

'আপনার মা?'

'আমার মা মৃত্যুশয্যায় বলেন, "তোকে বিক্রী করেছি মা"। মার মুখে ক্ষমাপ্রার্থনার অনুচ্চারিত কাতরতা ফুটে উঠেছিল মনে পড়ে!'

'ওঃ, অথচ মেয়েদের অতীত নেই!'

'এতদিন ছিল না।'

'মনে করিয়ে দিলাম সে জন্য দুঃখিত! কিন্তু স্বাধীন হবার অমন সুবিধা ক'জনে পায়?'

'সুবিধা কোথায়?'

'আপনার অর্থের অভাব ছিল না, আর কাউকে মানুষ করবার দায়িত্ব ছিল না, ছেলেপুলে থাকলে কী হত বলা যায় না, হয়নি তাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছেন ও পেরেছেন।'

'বেঁচে থাকলেও আমি যা হোক ক'রে নিজে মানুষ করতাম।'

'আপনার বুঝি....'

'হয়েছিল।'

'ছেলে?'

'হুঁ।'

'অল্প বয়সেই বুঝি মারা যায়?'

'হুঁ।'

'কি অসুখ?'

'অযত্ন।'

'আপনার কাছে অযত্ন?'

'পরের ছেলে।'

'আর হয়নি?'

রমলা দেবীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, চিবুকের মাংসপেশী দৃঢ় হল, দৃষ্টি স্থির, শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধ, খগেনবাবু তাঁর এই মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। না আমি আর জানতে চাই না।'

'তাঁর বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার কর্তব্য পালন করতাম যদি না…'

'বলবেন না বুঝেছি…'

'সহজেই বোঝেন দেখছি…অথচ সাবিত্রীকে বোঝেন নি··কী অদ্ভুত প্রকৃতির আপনারা!'

'বুঝেছি।'

'বোঝেন নি। কর্তব্য পালনের অনুরোধ নয়, হুকুম, জুলুম··· তার ওপর, কী নির্মল বংশ। সকালে খোকা মারা গেল, সন্ধ্যায় পাশের বাড়ি চলে যাই। কনট্র্যাক্টর গিন্নি বললেন, "দিদি কাঁদ, কাঁদলে দুঃখ যাবে"····অথচ, অথচ, তারই হাতে খোকা হয়! চলে আসছি, এমন সময় লণ্ঠন হাতে নিজে হাজির····ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আর কনট্র্যাক্টারের গিন্নী— তাঁদের ইচ্ছা কখনও পৃথক হতে পারে! যখন দুজনেই আবার নিষ্ঠাপরায়ণ হিন্দু! প্রশ্ন উঠল, "সম্পত্তি ভোগ করবে কে?" উত্তর দিলাম "কার সম্পত্তি কে ভোগ করবে? যে ভোগ করবার আশায় জন্মাবে সে বাঁচবে না— কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না, নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করাও উচিত নয়, অন্যের স্পর্শে সে সম্পত্তি বিষাক্ত হয়েছে, বাবার মুখের রক্ত ওঠা টাকা····অন্যে ভোগ ক'রে সে টাকা অচল হয়েছে"····কিন্তু সমাজ আমার বিপক্ষে····যাক সে সব কথা··· অতীত নেই····সেই থেকে আমি এখানে···· একলা····কী ভীষণ দুর্যোগ ছিল সেই রাতে, পাড়াগাঁয়ের অন্ধকার রাতে অঝোর ঝরে বৃষ্টি পড়ছে····সেই রাতটা আমার পক্ষে বিভীষিকা····কোথায় ছিলাম মনে নেই····আমার কিছুই মনে নেই, মনে থাকেও না··।'

অনেকক্ষণ পরে খগেনবাবু ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি জানতাম না, তাই ভুল বুঝেছি।'

রমলাদেবী হাসলেন, মুখের কাঠিন্য লোপ পেল, সহজভাবেই বললেন, 'কিন্তু আপনাকে আমি ভুল বুঝি-নি।'

'না জেনে যদি ভুল বুঝেই থাকেন, তাতে অন্যায় কি?'

'আপনার একলা থাকার ইচ্ছার কারণ হল এই, যতটা সহানুভূতি আপনি সাবিত্রীর কাছে প্রত্যাশা করেছিলেন ততটা দিতে পারে নি····অতএব ভাবছেন—'

'কি ভাবছি?'

'এইবার নিজে বলুন।'

'বলতে পারি পাদপূরণ হিসাবে— অতএব আমি ভাবছি কোথাও সহানুভূতি পাওয়া যায় না, অতএব দরকার নেই, অতএব আমি একলাই থাকব। কচি ছেলের আব্দার বলছেন ত?

'একটু তাই বটে।'

'সাবিত্রী আমাকে তাই ক'রে ফেলেছিল, আমাকে পুরুষ করতে পারেনি।'

'আপনি তাকে কি করেছিলেন?'

'আমি তাকে সব করতে চেয়েছিলাম।'

'কেবল দাবিই করেছিলেন।'

'দাবির জোরেই দাবি সত্য হয়।'

'হয় না, হয় না, হয় না। কার ওপর দাবি করেছেন দেখবেন না? এ কী অত্যাচার! সাবিত্রী কোন স্তরের ছিল দেখলেন না, সে দাবি পূরণ করতে পারবে কিনা বুঝলেন না, তবু বলছেন আপনি তাকে সব করতে চেয়েছিলেন? আপনি সাবিত্রীকে মানুষ হিসেবেই দেখেননি, দেখেছেন আপনার সুখবৃদ্ধির উপায় হিসাবে।'

'ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন! অত পুরুষ-বিদ্বেষ আপনার মত স্নেহশীলা মহিলার উপযুক্ত নয়!'

'ইচ্ছে ক'রে দিইনি। সম্পত্তির লোভ আর সুখের লোভ সমশ্রেণীর, অতএব সব পুরুষই সমগোত্রের! তবে আপনার স্বকীয়তা আছে বলেই বাইরের কোন বস্তু আপনার চোখে পড়ে না— আর অন্যের ও সব বালাই নেই— তারা কেবল স্বার্থপর সমাজ-বিধিকে কাজে লাগায়।'

'কি ভাবে মানুষকে একান্ত ক'রে দেখা যায়?'

'একলা থেকে নয় এইটুকু জানি, তার বেশি নয়। নিজেই ভেবে দেখুন না।'

'এখানে ভাবতে পারছি না।'

'কাশী যান দিন কয়েকের জন্য।'

'যদি সেখানে পথ না পাই ?'

'তখন উপায় আছে। কোলকাতা ফিরে আসবেন, ভাবনা ছেড়ে-দেবেন, কেবল মানুষ হবেন, অন্য সাধারণের মত নয়, সেটা চেষ্টা করলেও হতে পারবেন না, তবে সকলে যেমন....'

'সকলে যেমন কি করে ?'

'জানি না। জীবন-ধারণ করে।'

'জীবন-ধারণ জীবেরই শোভা পায়, মানুষ জীবের অতিরিক্ত। আগে ভেবে দেখব, কোন কুলকিনারা না পাই, তখনও ভাবনা হবে **felt thoughts**— গুণের তফাত অনেক ; অন্যধরনেরই বোধ হয়। চিন্তার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস।'

'চিন্তার ওপর আমার অগাধ অবিশ্বাস। অভিজ্ঞতার বদলে, জীবনের পরিবর্তে চিন্তা করা হল সমগ্রতার বদলে অংশকে গ্রহণ করা। এ ভুল করতে আর পারব না— আমার সব কিছু যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।'

'স্ত্রীলোক বলে, কিংবা চিন্তা করেন নি বলে।'

'তাই হবে....কই চাবি দিন, ট্রাঙ্কটা গুছিয়ে দিই।'

খগেনবাবু রমলা দেবীকে চাবির গোছা দিলেন। আস্তে আস্তে রমলা দেবী পাশের ঘরে উঠে গেলেন। চিন্তামণি চায়ের বাসন নিয়ে গেল— সামনের বাড়ির বেণে বৌ তখন ছাদে উঠেছেন....পাশের ঘরে ঠুং ঠুং, চুড়ির আওয়াজ হল, খগেনবাবু পাউইসের পাতা ওলটাচ্ছেন....ভাল লাগল না— কেবল বই....মনের যথার্থ পরিচয় বই-এর পৃষ্ঠায় ফোটে না....ফোটে মুখোমুখি....ওর জীবনে অনেক কিছু ঘটেছে....তাঁর জীবন বিচিত্র নয়.... বেচারি....এক একটা মেয়েকে দেখলে মনে হয় ভারি শক্ত,, ভেতর তাদের ফোঁপরা, দম্ভের জোরে দাঁড়িয়ে থাকে.... বেচারিরা....বাইরেটা কত কঠিন, কত উগ্র, কত ঝাঁজ, ফোঁস ফোঁস করছে সাপ যখন চলে যায় তখন শব্দ নেই, ফণা ধরলেই ফোঁস, ফণা ধরে আত্মরক্ষায়, কিংবা কোমরে লাঠি পড়লে...তখন কী ভীষণ শব্দ। কিসের শব্দ পাশের ঘরে....খগেন-বাবু পা টিপে টিপে দরজার পাশে দাঁড়ালেন.... রমলা দেবী ট্রাঙ্কের ওপর মাথা রেখে বসে আছেন....আস্তে আস্তে ফিরে এলেন। 'হ্যাঁলা, মা কি আর স্বামীর ঘর করবে না ?'....'কে জানে ভাই, মেয়ের ঢং দেখে বাঁচি না'....মক্ষিরাণী কেঁদেছিল ....মেয়েরা কেন কাঁদে ? বেচারীরা....বেটাছেলেরা কাঁদে না ? খগেনবাবু পাইপে তামাক ভরে বারান্দায় এলেন। নিচে ভাঁড়ার দরজায় চিন্তামণি, ভেতরে

যেতে দেয়নি মুকুন্দ,— ভারি হিংসুটে···বোঝে না···মানুষের মন কত বিচিত্র···· তাই ভুল বোঝাবুঝি। নিচের কলতলায় মুখ হাত পা ধুয়ে খগেনবাবু ওপরে এলেন, ঘরে আলো জ্বলছে··· রমলা দেবী মাটিতে পিছন ফিরে বসে আপন মনে ট্রাঙ্ক গোচাচ্ছেন···লক্ষ্মীটি····।

'ভাবছি কাশী যাব না।'

'না, যান।'

'চিঠি যদি লিখি?'

'উত্তর দেবো তবে অভ্যাস নেই।'

'যদি ইচ্ছে হয় দেবেন।'

রমলা দেবী চলে যাবার পর খগেনবাবু মুকুন্দকে ডেকে বললেন, 'আজ আমার খাবার করতে হবে না, যা আছে তাই ঠাকুরকে একটা থালায় নিয়ে আসতে বল।' ঠাকুর খাবার রেখে চলে গেল।

মুকুন্দ বল্লে, 'বাবু এত খাবার নষ্ট হল, হোটেল থেকে রুটি দিয়ে গেল; কি করব?' 'নিজেরা খেও, না হয় সকালে মেথরানীকে দিয়ে দিও।'

সাবিত্রী তাই দিত, রমলা দেবীও বললেন, 'স্যাণ্ডউইচ নষ্ট হত।' অপ্রয়োজনীয়কে ভদ্রভাবে বহিষ্কৃত করার নামই মেয়েদের সুচারুরূপে সংসার চালান, আর পুরুষের পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতটুকু ততটুকুই ভদ্রতার পরিসর। চিন্তা মেয়েদের পক্ষে অতিরিক্ত, তাই চিন্তার প্রতি অত তাঁদের অশ্রদ্ধা। রমলা দেবীর কথাবার্তা শুনলে মনে হয় না যে চিন্তা করেন না। সাবিত্রী ভাবতই না, কাজ করতে পারত। কাজ ভালই করত, অন্তত বাক্স গুছোত ভাল। রমলা দেবী নিশ্চয়ই আরো ভাল করে গুছিয়েছেন। কাশী যেতে বল্লেন আজ, অথচ কাল যেন মনে হল এইখানেই থাকি ইচ্ছেটা। মনের কথা বোঝা যায় না। খগেনবাবু টেবল-ল্যাম্পের টেবলটা টেনে সোফার কাছে আনলেন। পাইপ নিভে গিয়েছিল, ছুরি দিয়ে সাফ করে ফুঁ দিলেন, শিস দেবার মতন আওয়াজ হল, নতুন তামাক ভরলেন, তামাক শুকিয়ে গেছে, এক টুকরো আলু টিনে রাখলে হত, শীতকাল ভিন্ন পাইপ চলে না। পাইপ রেখে গ্যাসেটের পাতা ওলটাতে লাগলেন····মামুলি কথা···· স্বভাব হল সেই বস্তু যেটি আপনা থেকে পাওয়া গিয়েছে, স্বোপার্জিত নয়। কিন্তু মানুষের মতন মানুষ অন্যের দান গ্রহণ করে না, সে সৃষ্টি করে, নিজের কর্তব্য নিজে নির্ধারিত করে, সেই অনুসারে জীবনধারণ করে, তাই হয়ে ওঠে স্বভাবের চরিত্রের ছক। অতএব কালস্রোতের বিপক্ষে সাঁতার কাটতেই হবে; স্রোত জনসাধারণের, যারা ভিক্ষার ধনে জীবন চালায়। নিজের রোজগারেই বড়লোক।

রমলা দেবীর সম্পত্তি তাঁর নিজের, 'তার মধ্যে কিন্তু নেই,' সাবিত্রীর সম্পত্তি তার স্বামীর। এই কি স্বাভাবিক? এই স্বাভাবিকতা হল আদিমতা; আদিম যুগে জঙ্গল ছিল, এখনও সেই জঙ্গল সভ্যতাকে গ্রাস করবার জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, অস্ট্রেলিয়ার 'বুশ' এর মত। জনসাধারণ সেই অস্ট্রেলিয়ান বড় বড় কাঁটাগাছের ঝোপ। খগেনবাবু একবার তরাই-এর জঙ্গলে গিয়েছিলেন, গাছ-লতা-পাতা-গুল্মের নৃশংস আত্মপ্রসার দেখে তাঁর দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, একটি গাছ একলা নেই, তাকে জড়িয়ে পিশে মারছে পঞ্চাশটা আগাছা, তলায় শেওলা পচা পাতা, গায়ে লতাগুল্ম, সব ভিজে, যত ভিজে, তত নূতন জীবন! কিন্তু আগাছার মাথার ফুল, সাবিত্রী ছিল সেই বুনো অর্কিডের ফুল, রমলা দেবী কাঁটা গাছের ফুল। ক্যাকটাসের ফুল হয়···এইবার মনে হয়েছে, সাবিত্রী একদিন রমলা দেবীর যে শাড়িটা পরে এসেছিল তার রঙ শৌখিন ক্যাকটাস ফুলের মতন টকটকে লাল। রমলা দেবীর মনে অনেক কাঁটা, মনে না গায়ে? ভেতরের কাঁটা না বনের কাঁটা বিঁধেছে! নিজে টেনে খুলে ফেলেন নি, ব্যথারও বিলাস আছে, তিনি ব্যথাটা পোষণ করেই এসেছেন, মেয়েরা যেমন বেড়াল পোষে! খগেনবাবু পাইপ মুখে নিলেন····নিশ্চয় তাই। অনেক কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা! লোকে না বুঝে দুর্নাম করে বোধ হয়, দুর্নাম তিনি শোনেননি অবশ্য। কিন্তু সুনাম যদি কারুর প্রাপ্য হয়ত রমলা দেবীর; খাঁটি বিলিতী মেয়ে, অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, বিদ্যাসাগরের মত ভুল ক'রে এদেশে জন্মেছে। একলা থাকে বেশ করে। কিন্তু কতদিন থাকবেন? নিজেই বল্লেন একলা থাকা কষ্টকর, স্বাভাবিক হওয়াই ভাল। তবুও রয়েছেন এতদিন এই যথেষ্ট! ওঃ সেইজন্যই ভাল লাগত না, স্বভাবের সঙ্গে যে লড়াই করে তাকে ভাল লাগতে পারে না, যেমন বিশ্রী লাগে কিশোর কিশোরীকে যখন তারা শৈশবাবস্থার পিরাণ ফ্রক ছাড়িয়ে যায়। ক্লাসে এক একটা ছেলে থাকে যার প্রত্যেক ব্যবহার সহজ, এমন কি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া পর্যন্ত, তার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই, বেশ মিষ্ট স্বভাব, সকলকেই আকর্ষণ করে। সুজনের মত? সহজ শক্তি কিন্তু সহজেই নিঃশেষিত হয়। আর এক একটা ছেলে থাকে যার ব্যবহারে কোন সামঞ্জস্য নেই, একবার হল ফার্স্ট, পরের বার ফেল, যার প্রকৃতি অশান্ত বুনো, বেশিরভাগ লোকে তাকে পছন্দ করে না, কিন্তু জনকয়েকের কাছে সে অতিশয় প্রিয়। এই ধরনের ছেলেও খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু শক্তিহ্রাসের জন্য নয়, শক্তির অপব্যবহারে, অনুকূল প্রতিবেশের অভাবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেরাই দ্বিজ, প্রথম শ্রেণীর ছেলেরা একবারই জন্মায়, বোধ হয় একঘায়েই মরে! কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কর্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটি ভুল। লড়াই যখন চলেছে তখনকার

অবস্থা বিশ্রী জয়ের গৌরবেই মানুষের শ্রী ফুটে ওঠে। সে অনেক পরে—ইতিমধ্যে This arid, barren, dry, dull, dreary cactus land, Waste Land… ….মনে নেই….Good night, good night, good night, মেয়েদের স্মৃতি নেই—ঠিক বলেছে রমলা, প্রকৃতির আবার স্মৃতি কি? স্মৃতি থাকে যদি ভাব থাকে, প্রকৃতির আবার emotion কি? রমলা দেবীর প্রাণে ব্যথা আছে—না হলে কাঁদছিল কেন? বেচারি—প্রকৃতির কিন্তু ইতিহাস আছে, রমলারও আছে, নচেৎ কী ভুলতে চায়? কিন্তু রমলা দেবীকে মেয়েমানুষ ভাবতে পারা যায় না, পায়ের গোছ….শ্বেত-পাথরে কোঁদা হাতির শুঁড়। রমলা দেবীকে স্মরণ করলে কোন কুভাবই মনে আসে না—কুভাব আবার কি? তবে কু-স্থ একটা আছে। বন্ধুত্বের মধ্যে কু-স্থ নেই, তার মধ্যে আছে নিয়তির লীলা। নিয়তি কোথায় নিয়ে যায় কেউ জানে না। বল্লে, নিয়তি মেয়েদের হিড়হিড় ক'রে নিয়ে যাচ্ছে—হতে পারে না। নিয়তি আর স্মৃতি জন্মশত্রু, স্মৃতির ওপরই সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, নিয়তি দুর্নিবার, তাকে জয় করতে হয় জ্ঞান দিয়ে। জ্ঞান আর স্মৃতি বিরোধী শক্তি। ও চিন্তায় বিশ্বাস করে না। বাঁচবে কেবল স্মৃতি নিয়ে! প্রকৃতি চিন্তা করে না, কেবল সে বাঁচে, চিন্তা করে পুরুষ। রমলা হয়ত বলবে, পুরুষকারের দ্বারাই নিয়তিকে বশ করা যায়, চিন্তার দ্বারা যায় না। কিন্তু পুরুষকার পুরুষের ধর্ম, ব্যক্তির ধর্ম। পুরুষকারের তাৎপর্য জ্ঞান, চিন্তা দিয়ে প্রতিবেশকে অতিক্রম করা। মেয়েরা চিন্তা করতে জানে না, তারা চিন্তার বিষয়।

সাংখ্যটা পড়তে হবে, কালই কেনা চাই, কার সংস্করণ ভাল? দোকানের ছোটবাবু বলে দেবেন। ইংরেজীতে পড়া হবে না, বরঞ্চ বাংলায় পড়লে মূল রসের খানিকটা পাওয়া যায়। এমন হয়েছে, যে ইংরেজী ভাষাতেই যেন বেশি বোঝা যায়। বাস্তবিক তা যায় না। চেষ্টা করে পড়তে হবে। পুরুষকার অর্থে ইচ্ছাশক্তি নয়। কর্মীরাই কি এ সংসারের একমাত্র পুরুষ? মেয়েরা ও মেয়েলি পুরুষে তাই মনে করে, তাই নভেলে কর্ম অর্থাৎ গল্প চান। কর্ম করা মানেই নিয়তিকে স্বীকার করা, নিয়তি আছে বলেই না কর্ম! তা ছাড়া, সভ্যজগতে শ্রমবিভাগের জন্য কর্মের অবসর নেই, ভূগোলে নতুন জগত নেই যে জয় করবে, গৌরীশৃঙ্গ চড়া যায় না, সমুদ্রের তলা থেকে সোনার তাল উদ্ধার করাও যায় না—যন্ত্রে কাজ করে দিচ্ছে। নিরীহ ব্যক্তির পক্ষে নতুন জগৎ হল চিন্তাক্ষেত্র। এই গরমে কাজ করাও অসম্ভব। ছোটখাট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যতটুকু কর্মের প্রয়োজন ততটুকু কর্ম করতেই হবে—কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনের উদ্দেশ্য হল নিষ্কাম চিন্তা। আইনস্টাইনের সঙ্গে কর্মের কি সম্বন্ধ?

চিন্তাই চিন্তার একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র বিচারদণ্ড। জীবনটা ডিটেকটিভের গল্প নয় যে আদর্শ-উদ্দেশ্যকে প্রকৃত আসামীর মতন খুঁজে বার করতেই হবে। কর্মীরা সব দাম্ভিক, অতএব তাদের কার্যাবলীও নাটকীয়। সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়ত কোন সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসের negative capability থাকবে; তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটনা ঘটুক, অমনি খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেঙে যায়, ঘটনাটি তেমনি বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই বল pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়। জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, কখনও আসে জোয়ার, কখনও ভাঁটা, কখনও বা বান ডাকে, বন্যা আসে, চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘুর্ণি, কোথাও বা আবর্ত, এই ত জীবন। মোহানা কোথায়? এরই প্রতিচ্ছবি ঠিক না, এরই বিচার ও মূল্য নির্ধারণই আর্টিস্টের কাজ— অভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতার তাৎপর্য গ্রহণ ও প্রকাশ। কিন্তু প্রধান কথা স্রোত চলেছে— কুলকুল তার ধ্বনি, কুলকুল করে কোথায় ভেসে যাচ্ছে কে জানে? তীরে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, ঝাঁপিয়ে পড়তে লোভ হয়, বড় বড় গাছ সেই স্রোতের টানে মাটির সংস্রব ছাড়ে, মহারথী তারই টানে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, লোকে নিন্দে করে, আদত কথা, মিথ্যার মাটি ধুয়ে যায়। কেবল শোনা যায় কুলকুল শব্দ কুল কুল কুল····কুল—

পাঁচ

হাতমুখ ধুয়ে চা খেতে খগেনবাবুর দেরি হল, কাল রাতে খাওয়া হয়নি, একখানা সিঙ্গাড়া খেলেন। সাংখ্যতত্ত্বের বই কিছু কিনতে হবে। খগেনবাবু বই-এর দোকানে এলেন। ছোটবাবু হরিহর আরণ্যকের সাংখ্যতত্ত্ব ও খানকয়েক উপনিষদ বেছে দিলেন। দোকান তখনও খোলেনি, অর্থাৎ বিক্রি শুরু হয়নি। ততক্ষণ কি করা যায়? বই ঘাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। রমলা দেবী ঠিকই বলেছিলেন বই-এর কথা খাঁটি নয়— বোধ হয় তিনি বলেননি, সেটা তাঁরই মনের খবর, যেই বলুক সেই তাঁকে বোঝে। পিছনে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছেন বোধ হল, গায়ে ফরসা পাঞ্জাবি, আস্তিনের ইস্ত্রি ভাঙেনি, কাপড়ের কোঁচা সুসজ্জিত, বাদামী রঙ-এর এলবার্ট স্লিপার, কিন্তু ঝকঝকে নয়। পোষাকে উগ্রতা নেই, ভদ্রতা আছে। ভদ্রলোক জামা কাপড় পড়তে জানেন, সব সাদা কেবল

জুতোটাই রঙিন, তাও উজ্জ্বল নয়। কোন বড়লোকের ভাগ্নে হবে, বড়লোকের ছেলের মাসতুতো ভাইও হতে পারে। জুলপিতে চশমার দাগ রয়েছে, চশমা নেই, পড়াশুনার অভ্যাস আছে। সাহসভরে চাইতেই ভদ্রলোকের মুখে পূর্ব পরিচয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

খগেনবাবু বল্লেন, 'এই যে আপনি!'

ভদ্রলোক হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'বই দেখতে এসেছি, নতুন কিছু এল কি না!'

'কি ধরনের?'

'অমনি যা-তা!'

'তবু?'

'আপনিই বলুন না কি দেখি?'

'আপনি ত....'

'পাশই করেছি!'

ছোটবাবু বল্লেন, 'সুজনবাবু আপনার মতই বই ভালবাসেন, খুব পড়েন সব বিষয়েই আগ্রহ।'

'তা হলে ভদ্রলোক বলুন! শুনেছি বটে।'

ছোটবাবু খবর দিলেন সুজনবাবুর লাইব্রেরির কথা। দেখার আগ্রহ প্রকাশ করাতে সুজন অপ্রস্তুতে পড়ে বল্লেন, 'তাকে লাইব্রেরি বলেনা। নিজে দেখলেই বুঝবেন।'

'চলুন না যাই।'

'এখনি যাবেন?'

'আপনার বই দেখা হল না।'

'পরে হবে'খন।'

'একটু ঘুরে গেলে হয় না?'

'বেশত, তাই চলুন।'

বই-এর প্যাকেট না নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লেন।

'কোথায় যাওয়া যায়?'

'চলুন না, রমলাদির বাড়ি।'

'এইত কাল সারাদিন ছিলাম! কাল এলেন না কেন?'

'কাল একটা কাজ ছিল।'

'কি কাজ?'

'কাল বিজনের সঙ্গে তার ক্লাবে গিয়েছিলাম।'

'কোন ক্লাবে ?'

'সে কি একটা ? তবে সবই টেনিসের, বেলা তিনটের সময় যে ক্লাবের মাঠে রোদ্দুর পড়ে না প্রথমে সেইখানে, তারপর সাড়ে পাঁচটার সময় যেখানে রোদ্দুর পড়ে, তাছাড়া···।'

'এ ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না কি ?'

'আছে বৈকি ! তারপর ভাল মার্কার, নতুন বল, খেলোয়াড়···।'

'খুব ভাল খেলেন বলুন।'

'এখন শিখছে।'

'ভীষণ গম্ভীর ভাবে শিখছেন তা হলে !

'পরে খেলবে ভাল, আপততু বল পরদাতেই বেশি যায়।'

'চিরকালই যাবে যদি এখন থেকে না অভ্যাস করেন।'

'বিজনের ধারণা অন্য, সে বলে আগে বল পরে বুদ্ধি !'

'অথচ খেলাকেই ব্রত করে নিয়েছে।'

'ব্রত করেনি, পড়াশুনাতেও ভাল। অথচ কেন ?'

'অত গম্ভীর ভাবে যে ব্রত পালন করে সে নিশ্চয়ই পিউরিটান, এবং পিউরিটানরা বড় হিসেবী লোক, নয় কি ? কোন পয়েণ্ট ছাড়তে চায় না, আশা করি প্রো হবেন না ?'

'না তার কোন প্রয়োজন নেই।' সুজনকে নীরব দেখে খগেনবাবু বল্লেন, 'আপনাকে রোজই তার খেলা দেখতে যেতে হয় ?'

'না। আমি কখনও কোন খেলা খেলিনি তাই খেলার মর্মগ্রহণ করতে পারি না। ম্যাচ দেখেছি; তবে সেটা পারিপাট্যের দিক থেকেই। প্র্যাকটিস দেখা আমার ভাল লাগে না। যদি কোন তরুণ কবিতা পাঠের সময় প এ র ফলা একার আর ম, প্রে-ম বানান ক'রে পড়েন, কিংবা কোন গায়ক গান না গেয়ে কী ক'রে গলা সেধেছেন শোনান তা হলে ভাল লাগে কি ? আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী, সাধনার ইতিহাস জানবার ফুরসৎ কোথায় বলুন ?'

'কেন ? সাজঘরের কোন স্থান নেই নাটকে ?'

'না।'

'পিয়াণ্ডেলো ?'

'তাঁর পদ্ধতি এখনও ধাতে বসেনি।'

'র‍্যাফেল, রেমব্রাণ্টের স্কেচগুলো ?

'ছবির চেয়ে তার দাম কম, তাঁদের ছবি দেখার পূর্বে তাঁদের বড় আঁকিয়ে জানি বলেই সেগুলোকে ভাল বলি।'

'আত্মকাহিনী কিংবা ধরুন বসওয়েলের লেখা জনসনের জীবনী, জয়েসকেও বড় মানতে হয়।'

'তার effect অন্য ধরনের, স্তূপের, মালার নয়। ওয়্যাবশপ আর দোকান এক জিনিস নয়। আর্ট ও ক্রাফটের পার্থক্য স্বীকার করি।'

'ঠিক বুঝি না। মরিস কিন্তু....'

'চলুন না, রমলাদির বৈঠকখানায় বসেই বুঝিয়ে দেবেন। তিনি এই সব কথা শুনতে খুব ভাল বাসেন।'

'বেশ, তাই হবে।' খগেনবাবু এক টিন সিগারেট ও একটা দেশলাই কিনলেন সুজন তাঁর হাত থেকে টিনটা নিয়ে নিজেই খুলে দিলে।

'খাওয়া হয় বুঝি ?'

'এক রকম না-ই—' খানিকক্ষণ পরে সুজন ধীরে ধীরে বল্লে, 'একটা কথা ছিল।'

'বলুন না, আপনার সামনে আমার সঙ্কোচ আর নেই, আপনারও থাকা উচিত নয়।'

'সেদিন ছেলেরা একটু অসভ্যতা করেছিল, সে জন্য....'

'না, না, মোটেই না, সে জন্য আমি দুঃখিত হইনি। তারা ত করবেই, ছেলে-মানুষে করেই থাকে— আর এমন কী আর করেছিল ?'

'চুপ ক'রে থাকলেই পারত।'

'তারা চুপ করে থাকবে কেন ? তারা যে উপকার কচ্ছিল! না সুজনবাবু আমি সত্যি কিছু মনে করিনি। কেন করব ? সকলেই কী বোঝে ? উপকার করাও ভালবাসি না, উপকৃত হতেও ভাল লাগে না।'

'তবু....'

রমলা দেবীর বাড়ি এসে শুনলেন যে তিনি মোটরে ক'রে দমদমায় কোন এক আত্মীয়ার বাড়ি গিয়েছেন। ফেরবার সময় খগেনবাবু বল্লেন, 'কই কাল ত কিছু শুনিনি !'

'হয়ত কারুর অসুখ বিসুখ করেছে হঠাৎ খবর এসেছে।'

'উনি বুঝি খুব সেবা করতে ভালবাসেন ?'

'সেবা করতে পারেন।'

কেবল সেবা আর সেবা— কার সেবা ? দুঃস্থ ও পীড়িতের— কিন্তু কী হয় সেবা করে ! কৃতজ্ঞতা কুড়িয়ে বেড়ান হয় অবশ্য। এইটাই ওঁদের দুর্বলতা। দুঃস্থ ও পীড়িতের গোপনতার একটা প্রয়োজন থাকতে পারে কজন বোঝে ? সমাজের উপকার, হাসপাতাল, সেবা-সমিতি, সাধারণ প্রার্থনা এ সব ক'রে

ঘোমটা খোলা— যেমন বিবাহের রাত্রে বাসর ঘরে জোর ক'রে প্রবেশ করে বরযাত্রীরা নববধূর ঘোমটা খোলে। তাদের হল মজা। কিন্তু মেয়েটির হল লজ্জা। এরি ফলে নববধূর স্বাভাবিক কমনীয়তায় রূঢ় আঘাত পায়, তার সরম টোটে; তার স্বর হয়ে ওঠে কর্কশ, গতি চঞ্চল, স্বভাব চপল, ভাষা অমার্জিত। সমাজ সেবার মধ্যে এই ধরনের অভদ্রতা বর্তমান। একলা লজ্জা ভাঙতে লজ্জা আসে, সকলে মিলে লজ্জা ভাঙায় আর সঙ্কোচ থাকে না, দুঃস্থের প্রতি সম্ভ্রম-বোধের দায়িত্ব ঘুচে যায়। সেবা-ধর্ম যতই বৈজ্ঞানিক ততই কার্যকরী, কিন্তু ঠিক ততটাই নৈর্ব্যক্তিক ও মানুষের পক্ষে অসম্মান-সূচক। সুজন কি সেই অসম্মানের জন্য ক্ষমা চাইছে?

'আচ্ছা সুজনবাবু, আপনাদের দলে কী অসভ্যতা হয়েছিল মনে হয়? মৃতের প্রতি সম্মান দেখায়নি?'

'আপনার প্রতি।'

'মৃতের প্রতি নয় কি?'

'তাও বটে, কিন্তু প্রথমত আপনার প্রতি।'

'পরের উপকার ক'রে কি হয়?'

'শক্তি সঞ্চয়।'

'আপনি বুঝি অ্যাডলারের শিষ্য?'

'এখনও গুরু কাড়িনি।'

'অর্থাৎ অনেক গুরু?'

'বোধ হয় তাই।'

রমলা দেবী বোধ হয় প্রভুত্ব খাটাতে ভালবাসেন, অমন সপ্রতিভ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠ স্বভাব দেখলেই ঐ ধারণা হয়। মনের জোর আছে, নিজেকে ভালবাসেন, ভালবাসেন শক্তিমতী হতে, ভক্তি তাঁর ধাতে নেই, বৃন্দাবনের গোপিকা নয়, মথুরার মহেশ্বরী। কোথায় যেন স্বভাবে খামখেয়াল আছে,…কিংবা হয়ত জোর ক'রে নিজেকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। দমদমা চলে যাওয়ার অর্থ হল তাঁকে আজই কাশী যেতে আজ্ঞা করা। বেশ তাই ভাল, তা ছাড়া উপায় কি? কোন দাবি নেই— কী দাবি? স্ত্রীর বন্ধু? স্ত্রীর ওপরই দাবি থাকে না ত আবার স্ত্রীর বন্ধুর ওপর! বন্ধুর ওপর থাকতে পারে— কিন্তু বন্ধুত্ব কি? 'চলুন, আপনার লাইব্রেরি দেখিগে।'

'সেই ভাল।'

'তখন 'তবু' বল্লেন কেন?'

'অন্য সময় হবে!'

'না, এখুনি, জুড়িয়ে গেলে কি প্রশ্নের কি উত্তর দেব জানিনা।'

'চলুন, বাড়ি যাই।'

কলেজ স্ট্রীট থেকে একটি গলি পূর্বদিকে গিয়েছে, তারই মধ্যে বিজন-সুজনদের বাড়ি। বাড়িটা বেশ বড়, গেটের এক পাশে দারোয়ানদের ছোট্ট ঘর, অন্য পাশে গ্যারাজ। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দা, তারই কোনে একটি সুসজ্জিত 'হল', ডাইনে বাঁয়ে আরো দুটি বৈঠকখানা, ডাইনের ঘরটি বই-এ ভর্তি, তারই পিছনে, ভেতরের বাঁধান উঠানের দিকের ঘরটি সুজনের। পর্দার ফাঁক দিয়ে দু-চারটে টবে সাজান পাতাবাহার এবং গোল লোহার সিঁড়ির খানিকটা চোখে পড়ে। অঙ্গনের সিমেন্ট কেটে একটা 'ম্যারীশাল নীল' তোলা হয়েছে গোল সিঁড়িকে বেষ্টন করিয়ে। পরিপাটি উঠোন দেখে মনে হয় যে বাড়িতে কোন মহিলা নেই। সুজনের ঘরটি পড়বার ও শোবার। একটি কোনে লোহার খাটের ওপর ক্যামেল হেয়ারের কম্বল বিছানো— পাশে ছোট টেবলে পড়বার আলো, কোনে কাঠের আসনে কুঁজো, তার মাথায় কাচের গেলাস। পুলী লাগান একটা বাতি টেনে শিয়রের কাছে আনা হয়েছে। পড়বার টেবলে বই, রিভলভিং সেলফেও বই। বৈঠকখানায় যাবার দরজার ফাঁকে বড় আলমারি বই-এ ভর্তি। কোনে চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স, ওপরে আরশি। টেবলের ওপর অবনীন্দ্রনাথের আঁকা যুবাবয়সের রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। টেবলের ওপর বড় একখণ্ড কাচ, পাশেই লম্বা কাচের নলে জল পোরা। খগেনবাবু রিভলভিং কেসের পাশে চেয়ার টেনে বসলেন। সুজন জিজ্ঞাসা করলে, 'চা খাবেন।'

'বেলা হয়ে গিয়েছে!'

'একটু বসুন, বিজনকে ডাকছি।'

'তাকে আর বিরক্ত করে লাভ কী?'

'সে খুব খুশী হবে, আমি আসছি।'

খগেনবাবু একলা বসে বই দেখতে লাগলেন। ছেলেটির রুচি একমুখী নয়— নানা রকমের বই; বেশির ভাগ মনোবিজ্ঞানের, তা ছাড়া নতুন পদার্থ-বিজ্ঞানের সরল ব্যাখ্যা, সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং বিশেষ ক'রে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ-নিরূপণ সংক্রান্ত একাধিক বই ও প্রবন্ধ। সব বইগুলিই আধুনিক ও নতুন লেখকদের—একটিও পুরাতন লেখকদের নয়। আজকালকার ছেলেরা বই সম্বন্ধে বই পড়ে, পরাশ্রিত বই, তাই পরগাছা মন তাদের। এই সব সংক্ষিপ্তসার গণমনকে তুষ্ট করবার জন্যই সরল ভাষায় লেখা হয়, তাতে মনের আভিজাত্য বজায় থাকে না। খগেন-বাবু এই ধরনের বই পছন্দ করতেন না— বলতেন, অ্যামেরিক্যানিজম সভ্যতার রিপু বিশেষ। ডিমক্রেসী মনের একাগ্রচিত্ততা ভঙ্গ করে, মনকেই অস্বীকার করে,

তার পরিবর্তে হট্টমনের পূজা করে, অথচ ব্যক্তিরই মন আছে, সমূহের ও বালাই নেই। প্রমাণ দিতেন ইতিহাস থেকে; যেমন টিউটন জাতির গ্রাম্য ও কৌল সভ্যতা গ্রীক ও রোমানদের পৌর ও নাগরিক ব্যক্তিপ্রধান সভ্যতাকে বিধ্বস্ত করেছিল, তবু সেটি লোপ পায়নি, গ্রীক ও রোমানদের অভিজাত ব্যক্তিপ্রাণ বৈদগ্ধ্য আরবদের কৃপায় রক্ষা পেল, এবং পেল বলেই আইন কানুন এবং রোমীয় খৃস্টান ধর্মের দ্বারা য়ুরোপে এখন উত্তমরূপে ধৃত রয়েছে, তার মন এখনও জীবন্ত, ভারতবর্ষীয় মনের মতন নির্জীব নয়। খগেনবাবু বলতেন মধ্য যুগের কৃতিত্ব এই ব্যক্তির মনকে বাঁচিয়ে রাখা। আজ সভ্যতার দুর্দিন এসেছে, নতুন অসভ্যতার উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, কুলের নাম হয়েছে জন-গণ, সেই জনগণমনঅধিনায়কের ক্ষমতা অসীম। নতুন দেবতার হাতে মস্ত মোটা কলম, তাই দিয়ে বিংশ শতাব্দীর সার্থকতার দেবতা একই বার্তা একই মন্তব্য লিখে যাচ্ছেন। এই ঠাকুরের মুখে হাসি নেই, আছে গাম্ভীর্য। ইনি টেল-এল কবীরের কেরানী নয়, গ্রামের সুদখোর বেনে, লাল খাতায় যে সর্বদাই কি লিখে যায়, আর লোকের হয় সর্বনাশ তার অজানিতে। এই যুগে উৎপাতের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য কী ষড়যন্ত্র করা যায়? ভিড় ঠেকিয়ে রাখতেই হবে, নিজেকে সামলাতেই হবে। বিপদ কি একটা? কোথা দিয়ে শত্রু প্রবেশ করে স্বকীয়তার মূল উচ্ছেদ করে কে জানে? ভিড় আর স্ত্রীলোক একই বস্তু, দুটোই স্বাতন্ত্র্য-বিরোধী। রমলা দেবী দমদমা চলে গিয়ে পুরুষোচিত, অর্থাৎ সত্যকারের ভাল মেয়ের উপযুক্ত ব্যবহারই করেছেন। খগেনবাবু Outline of Art-এর ছবি দেখতে লাগলেন।

শ্বেত পাথরের থালায় ফল, সন্দেশ ও গেলাসে জল নিয়ে সুজন ঘরে প্রবেশ করল। খগেনবাবু বললেন 'এ আবার কেন? আমি কিছু খাই না।' থালা ও গেলাস টেবলের উপরই রইল। খগেনবাবুকে কেউ খেতে অনুরোধ করলে অসন্তুষ্ট হতেন। তাঁর মনে হত যে খাবার দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে। খগেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি প্রশ্ন মনে এসেছিল?'

'প্রশ্ন? এখন মনে নেই। একটা কি?'

'বলুন না, প্রশ্ন মনে হয় অনেক, কিন্তু বাস্তবিকই একটা!'

'ঐ কথাটা বুঝতে দেরি লাগে না কি?'

'অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, বয়সের উপর নয়!'

'অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে কি সকলে?'

'অভিজ্ঞতার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয় বটে, সেজন্য অবসর চাই....Dread the passage of JESUS for does not return....অভিজ্ঞতা অর্জন করব বলে ছুটে বেড়ালে আসে না, আবার না ডাকলে আসে। রবীন্দ্রনাথ এ খবর জানেন,

বহুবার দিয়েছেন। কর্মের উপর আমার কোন আস্থা নেই। চীন জাপানের ধ্যানী সম্প্রদায় অবসরই চাইতেন, চারধারের আগাছা তুলে ফেলে এক নিভৃত পরিষ্কৃত কেন্দ্রে আত্মস্থ হতেন। কাচের উপর ময়লা থাকলে আলো প্রতিফলিত হয় না।'

'সে ত হল চিত্তশুদ্ধি।'

'যাই নাম দিন— অবসর চাই।'

'কিছু খাবেন না? ফল, কোন অসুখ করবে না।'

'না, আমায় অনুরোধ করবেন না·······অবসর মানে কুঁড়েমি নয়, মন খুব সক্রিয় থাকে তখন, অবসরের মধ্যেই মন অভিজ্ঞ হয়।'

'বাইরের আগাছা পোড়াবেন কি ক'রে? How will you burn the bush? গোলমালের হাত থেকে অব্যাহতি কি ভাবে পাবেন?'

'সাধনার দ্বারা।'

'যদি তার মধ্যে কোনটা রঙিন কিংবা সুগন্ধি ফুল দেয়, যদি কলরবে কোন বাণী গুপ্ত থাকে?'

'ঝোপের মধ্যে বাণী। Voice in Wilderness? অত বাছলে চলে না, দেখুন, সুজনবাবু,অত খাতির করা যায় না, কবে কোন ফুল দেখবো, কবে কোন বাণী শুনতে পাব— এ সব ভাবলে চলে?'

'কেন?'

'সুনিশ্চিতের জন্য অনিশ্চিতকে ত্যাগ করতেই হবে। আপনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকছে কেমন ক'রে?'

'ব্যক্তিই ত একমাত্র অনিশ্চিত বস্তু, গড়পড়তা জিনিসটা অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত।'

খগেনবাবু গালে হাত দিয়ে ভেবে বললেন, 'আপনি যা বলেছেন তার উত্তর আছে, এখন ঠিক ভেবে পাচ্ছি না— উত্তর বোধ হয় এই ধরনের হবে খানিকটা— সমাজের বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তির বৈচিত্র্য ফুটে উঠতে পারছে না গড়পড়তার চাপে, প্রত্যেকে যখন পৃথক সত্তা অর্জন করবে তখনও গড়পড়তা বস্তুটি থাকবে, তবে প্রভু হিসাবে নয়, এবং তার স্তরও হবে উন্নত।'

'ইতিমধ্যে?'

'ইতিমধ্যে অস্বীকার।'

'বাধা রয়েছে যথেষ্ট।'

'বাধা অতিক্রম করার নামই সাধনা— সেটা নিজের কাজ, পরের দ্বারা হয় না, কেননা পরই হল সমাজ নামক শত্রুর গুপ্তচর। সেই জন্য উপকার করতেও চাই

না, উপকৃত হতেও আত্মসম্মানে আঘাত পড়ে। সেই জন্য সেবা সমিতি, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, আশ্রম— কোন কিছুই ভাল লাগে না। মানুষ 'অক্ষম' তাই না। উপকারের প্রয়োজন? যতই উপকারের মাত্রা বাড়বে ততই অক্ষমতা ক্রমবর্ধমান হবে। আমি স্বাধীন ব্যবসার পক্ষপাতী, infant industry argument এ-ক্ষেত্রে অচল।'

'অনেকটা ছাড়তে হয়।'

'তা হোক, রঙিন বুনো ফুলের ক্ষতিপূরণ হয় ভেতরে পদ্ম পেয়ে।'

সুজন চুপ ক'রে বসে রইল, খগেনবাবু খানিক পরে বললেন, 'আমার একটি প্রশ্ন আছে, উত্তর দিন। কি উপায়ে আপনি দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আনবেন? গ্রীক সভ্যতার রেশ টানলে রোমানরা, তাকে সমৃদ্ধ করলে আরবরা, টিউটনিক জাতির কৌলিক অনুষ্ঠান তার সর্বনাশ করত যদি টিউটন জাতি প্রটেস্ট্যাণ্ট না হত। আর এই প্রোটেস্ট্যাণ্টিজমের দৌলতেই বিজ্ঞান, দু'-এর সমাবেশে যান্ত্রিক সভ্যতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, অর্থাৎ লিবারেলিজম। আমাদের দেশে কি হবে? য়ুরোপের অন্য সুবিধা ছিল— তার ছিল ক্যাথলিক চার্চ। আমাদের সমাজবন্ধন আর শক্ত নেই। রাষ্ট্র ভারতবর্ষে নেই, আছে শাসন-পদ্ধতি, সেটা না হয় বদলে গেল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই— ধরুন আমাদের ঐতিহ্যে মানুষকে একান্ত ক'রে দেখার অভ্যাস ছিল, বর্তমানে যে সব নতুন দল বাঁধা হচ্ছে তাদের বিধি ও অনুশাসনের চাপে মানুষকে একান্ত ক'রে দেখা হচ্ছে না, অথচ দল না বেঁধে কোন উপায় নেই, এখন এ-যুগে কি উপায়ে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখবেন!'

'কোন কোন দলের উল্লেখ করছেন? আমাদের ইতিহাসে কি প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে সমর্থন করা হয়েছে? সমাজের কল্যাণসাধনে ব্যক্তির কল্যাণসাধন বরাবরই সম্ভব ছিল।'

'প্রথমে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিই। গোড়ায় বলেছি, ধরুন ছিল। যোগ-সাধনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যটি আনুমানিক সত্য অর্থাৎ hypothesis, সেটা খাঁটি খবর নাও হতে পারে। হিন্দু সমাজ বরাবরই মানুষের ওপর অত্যাচার করে আসেনি— তার প্রমাণ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই পর্যায় দুটি। ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য পর্যায়ে সমগ্রের প্রভুত্ব খাটত, কিন্তু অন্য দুটিতে নয়। তখন ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা সমগ্রের উপকার করাই ছিল সাধনার উদ্দেশ্য। এখন অবশ্য সবটাই গার্হস্থ্য। যদিও আমার ইতিহাস ভুল হয়, তবুও আদর্শ হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সাধনার উপায় আলোচনা করা চলে। আদর্শটা বড় এবং ঐ আদর্শ এখন নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্বীকার করতেই হবে, কারণ আমাদের সমাজ নির্জীব, তার সাধারণ স্তর নিচু, তাকে উন্নীত করবার একমাত্র উপায় সমাজের প্রত্যেককে বড় করার সুযোগ

দেওয়া। দেবেন কি উপায়ে? দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমি অনুষ্ঠানের নামোল্লেখ করছি। কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের চাকরি, বৃত্তি, হিন্দুসভা ইত্যাদি। তা ছাড়া নব্যগোষ্ঠী ত বটেই।'

'নব্য পরিবার?'

'সেখানে স্বামীর উপর স্ত্রী অত্যাচার করে, স্ত্রী না করুন, স্ত্রীর বন্ধুরা করেন। অবস্থা ভাল বলেই নিকট আত্মীয়স্বজন দূরে চলে যান, কিন্তু দূরসম্পর্কের আত্মীয়েরা, বন্ধুরা, মধুমক্ষিকার মতনই আকৃষ্ট হন। মধুচক্রের অনুশাসন কি জানেন ত? একেবারে জার্মান-পসন্দ্ বৈজ্ঞানিক⋯অথচ তাও চাই, খুব চাই⋯একটা পদ্ধতি চাই, নচেৎ সাধনার অর্থ থাকে না।'

'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটা লোকের গোপন সাধনার কি উপকারে আসবে?'

'বৈজ্ঞানিক মনোভাব—অর্থাৎ কোন বাইরের শাসন না মানার প্রবৃত্তি, নিজের মার্জিত বুদ্ধি অনুসারে নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা; ল্যাবরেটরিতে কলকব্জা নাড়াচাড়া বিজ্ঞান নয়। প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করা, ইতিহাসকে মানা, অভিজ্ঞতাসুলভ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক মনোভাব। আরবদের অভ্যাস ছিল তাই। যাকে iuductive Intellect বলতে পারেন আমি তাই চাই।'

'সেটা কি হিন্দুদের মধ্যে পেলেন না?'

'হিন্দুদের মধ্যে নেই, হিন্দু ধর্মে আছে খানিকটা, যদিও গুরু ও বেদ মানাতে নেই। মনে হয়, হিন্দুদর্শনে আছে, সেই জন্যই ভাবছি বেদান্ত, সাংখ্য পড়ব।'

'নব্য হিন্দুয়ানী প্রবর্তন করতে চান?'

'চেষ্টা করে দেখব। মুসলমানেরা যদি আরব সভ্যতার প্রতি বেশি শ্রদ্ধাবান হত, তা হলে ভারতবর্ষের কাজ সহজ হয়।'

'বিজ্ঞান-শিক্ষা?'

'সেটা সঙ্গে সঙ্গে চলবে। সংস্কৃত, আরবি ও বিজ্ঞান পড়লে দেশের স্তর উঁচু হবে!' সুজন হেসে ফেল্লে। খগেনবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'হাসুন আর যাই করুন, কংগ্রেস-ফংগ্রেসে কাজ হবে না। এর বেশি আর জানি না।'

'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেশি হলে যান্ত্রিক সভ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে আসতে বাধ্য।'

'ততদিনে নতুন সমাজ যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিবন্ধক হবে। values-এর পরিবর্তনে সব সম্ভব হয়!'

'সে ত এক প্রকার ধর্মত্যাগ।'

'ধর্মত্যাগ ও নতুন ধর্ম গ্রহণ—আমি চাই conversion'—বলেই খগেনবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল, 'দেখুন যত বড় ভাব দিয়ে আরম্ভ করি না কেন,

সিদ্ধান্ত সব ছোট্ট হয়ে যায়।'

'ছোটতে লজ্জা কিসের?'

'না লজ্জা আর কি? তবে দাম্ভিকতায় ঘা লাগে।'

'বিজনকে ডাকছি— বিজন— বিজন···'

বিজন ঘরে প্রবেশ করল, বলিষ্ঠ যুবক, বয়সের পক্ষে অযথা দীর্ঘ। খগেনবাবুকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। সুজন বিজনকে বসতে ইঙ্গিত করলে। খগেনবাবু নীরবে সিগারেট খাচ্ছেন দেখে বিজন উঠে চলে গেল, পাশের ঘর থেকে একটা থ্রী কাসলস্ সিগারেটের নতুন টিন ও লাইটার খগেনবাবুর সামনে রাখলে, খগেনবাবুর হাতের সিগারেট শেষ হবার সময় পুনরায় উঠে গিয়ে একটি ছাই রাখার পাত্র আনলে ও নতুন টিন খুলে দিলে।····কেতাদুরস্ত ছেলে, বড়লোকের বংশধর, তাই রমলা দেবী ঘাটে যেতে দেন নি একে····'বিজন ভাল খেলে, ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস পড়ে।' বিজন বল্লে, 'কৈ কিছু খেলেন না?'

'ওঁর শরীর ভাল নয়, খাওয়া উচিত নয়— বিজন তুমি নিজেই খগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা কর না অবনীবাবুর ছবি কিসে ভাল?' বিজন চুপ করে বসে রইল দেখে সুজন বল্লে, 'অবনীবাবু এই ধরনের প্রতিকৃতি আঁকা ছেড়ে দিলেন কেন?' রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির ওপর চোখ রেখে খগেনবাবু বললেন, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, অবনীবাবু যখন ঐ ধরনের ছবি আঁকতেন তখন নিজের ধর্ম বোঝেন নি। অনুকরণ করতেন চমৎকার, এখন সৃষ্টি করেন।' বিজন মুচকি মুচকি হাসছে দেখে সুজন তাকে খেতে অনুরোধ করলে, কিন্তু বিজন ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল। খগেনবাবু বিজনকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের বুঝি এঁদের ছবি ভালো লাগে না?' 'না, আমি পুরোনো দলের।'

'আপনার দল পুরোনো নয়, আর্টের ইতিহাসে আপনার দলটি নাবালক। সিমাবো, জিয়টোর পূর্বে প্রকৃতির অনুকরণ করাকে লোকে আর্ট বলত না, তাঁদের পরেও বাইজ্যানটাইন আর্ট-ও জীবিত ছিল, এখন আবার সেই ধারাকে পুনর্জীবিত করবার চেষ্টা চলছে। তা ছাড়া, পশ্চিম য়ুরোপ সমগ্র য়ুরোপ নয়, য়ুরোপ সমগ্র বিশ্ব নয়, আর তিনশ' বছরে সময় ফুরিয়ে যায় নি।'

সু: 'তা নয় ঠিক, বিজনের আপত্তি নতুন দলের ছবির রুগ্ন দেহে। নিজে ভাল টেনিস খেলে কিনা!'

খ: 'তা হলে ওঁর হেলেন উইলস, লাংলার ছবি দেখা কিংবা সুইডিশ ড্রিলের ফোটো দেখাই ভাল।'

সু: 'আমিও বলি বিজনকে, ওঁদের অঙ্কিত মহিলা তোমার ভাবী পত্নীর ফোটো না হলেই হল।'

বিজন উঠে পড়ল দেখে খগেনবাবু হাসলেন। দাঁড়িয়ে উঠে উমার সহিত বিজন বল্লে, 'যা দেখছি, তা আঁকব না।'

খ: 'আপনি দেখছেনই না, দেখার অভ্যাস করা চাই।'

বি: 'কি ভাবে অভ্যাস করব? চোখ বুজে, ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে?'

খ: 'চোখ বুজে দেখতে হয়, নচেৎ বাজে জিনিসের সমগ্রতা চোখকে আচ্ছন্ন করে; সুষুপ্তির অবস্থাই আর্টের পক্ষে সব চেয়ে ভাল, কেন না, জেগে থাকলে অন্য ইন্দ্রিয় ধ্যানচ্যুত করে। দুঃস্বপ্ন নয়।'

সু: 'নতুন ছবি দেখে মনে হয় কিন্তু যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি— এমনি অদ্ভুত!'

খ: 'দুঃস্বপ্ন হয় গরহজমে। য়ুরোপ নতুন খাবার পেয়েছে অনেকদিন উপবাসের পর, তাই বেশি খেয়ে ফেলেছে। সত্যকারের আর্টিস্টের হজম শক্তিতে কোন দোষ নেই।'

বি: 'দোষ চোখেই। চোখ বুজলে সরষের ফুলই দেখি। আপনি কি ভাবেন যে বড় বড় লেখকরা চোখ বুজে পৃথিবী দেখেছেন?'

খ: 'আপনি কাকে বড় বলেন?'

বি: 'এই ধরুন চিত্রকরের মধ্যে রেণী, কিংবা গ্রয়েজ, লেখকদের মধ্যে এচ. জি. ওয়েলস্।'

খ: 'নাবালকের চিত্রকর ও সাহিত্যিক।'

বিজনের মুখ লাল হয়ে উঠল····

বি: 'আপনার মতে কে বড় শুনতে পেলে আমার বড় উপকার হয়।'

খ: 'রবীন্দ্রনাথ পড়েন?'

বি: 'না।'

খ: 'কেন?'

বি: 'জোর নেই লেখায়।'

খ: 'তা বটে, হাতে গুল নেই।'··· বিজন উঠে দাঁড়াল।

বি: 'ওয়েলস্ বড় নয় কেন?'

খ: ভারি অস্থির, নিতান্তই প্রগলভ, সর্বসাধারনের তুষ্টিসাধন করে, চোখ টেনে বড় ক'রে চায়, তাই অত বাজে জিনিস চোখে এসে পড়ে, সেই জন্য তাঁর সব বিষয়েই মন্তব্য করা চাই। স্থির নয়, শান্ত নয়, এ যুগেরই লেখক, সর্বযুগের অন্তর দিয়ে যে ধারা প্রবাহিত হয় তার সন্ধান তিনি পান নি। বর্তমান যুগের পিতা যেমন ছেলের বন্ধু হতে চায়, তার সঙ্গে বেশি কথা কয়, উপহার দিয়ে দিয়ে তার স্নেহ প্রমাণ করতে ব্যগ্র হয় স্নেহের মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলে, ছেলেকে উন্নত করবার জন্য যেন প্রাণপাত করছে দেখাতে ব্যগ্র হয়, ওয়েলস্ সেই ধরনের

সর্বসাধারণের বন্ধুপিতা।'

বি : 'তাতে ক্ষতি হয় না, লাভই হয়।'

খ : 'ক্ষতি ভীষণ, ছেলে আব্দারে হয়ে ওঠে।'

বি : 'কী করা উচিত ছেলেকে ?'

খ : 'আত্মীয়কে দূরে রাখলেই আত্মার মঙ্গল, নিজের এবং আত্মীয়ের।'

বি : 'ছেলে উচ্ছন্ন যাবে না ?'

খ : 'যায় যাক গে'··· খগেনবাবু সিগারেট ধরালেন।

সু : 'তিনিও কিন্তু একীকরণের বিপক্ষে।'

খ : 'মুখে তাই বলেন, বাস্তবিক তা নয়, নচেৎ নতুন ব্যবসায়ী বড়লোক দিয়ে জগৎ চালাতে চান ? তারা ঐ একীকরণের সাহায্যেই বড় হয়েছেন।'

সু : 'কিন্তু স্বাধীনতার একটা সীমা থাকা চাইত ?'

খ : 'সীমা ? নিজের চারপাশে যে যতটুকু অবসর তৈরি করতে পারে, সেই-টুকুই তার স্বাধীন কর্মক্ষেত্র।'

সু : 'তা ছাড়াও···'

খ : 'তা ছাড়া নয়, তারপর বলুন। তারপর, তারপর, বোধ হয় নিজের অতিরিক্ত কোন শক্তি কিংবা নিয়তির বাধ্যতা ইচ্ছা ক'রে, জেনে শুনে স্বীকার করার নামই স্বাধীনতা, অন্তত তাইতেই জগতের মঙ্গল ও পরিপূর্ণতা। পিতার মৃত্যুর প্রার্থনা করছি না, তবে যে ছেলে পিতার অধিকারের হেতু আবিষ্কার করে সেই ছেলে ভাল ছেলে ; আবিষ্কারের পর যে বাধ্যতা আসে তাইতেই সংসারের শান্তি।'

সু : 'হেগেল, কার্ল মার্কসের ঐ ধরনের স্বাধীনতার অর্থ আজ রাশিয়ায় নিরর্থক হয়েছে শুনতে পাই।'

খ : 'ইতিমধ্যে তাই হয়েছে, কিন্তু গর্কির মতন লোক বলেছেন যে রাশিয়ায় ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ শুরু হয়েছে।'

সু : 'সেখানে কিন্তু দলের প্রভুত্ব।'

খ : 'জানি, কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন। তা ছাড়া, দলের কার্যাবলীর সমালোচনা দলের সভ্যদের এতই রূঢ় যে অনেকের মতে তাতে ক্ষতি হচ্ছে।'

সু : 'উদ্দেশ্য অনুসারেই তা হলে কার্যাবলী বিচার করতে হয়।'

খ : 'উদ্দেশ্য অসাধারণের। অসাধারণের পক্ষে বনবাস চাই, প্রথম অবস্থাতে, লেনিনের জীবনী পড়ুন— তাঁর বনবাস জীবনের প্রথমাংশে, যেমন হিন্দুদের শেষাংশে। লোকটা কত ভেবেছিল'! সাইবিরিয়া, সুইজারল্যাণ্ডে বসে— বই-ই লিখেছেন কত। দেখুন সুজনবাবু, মানুষের একটা অবস্থা আসে যখন নিজেকে

সরিয়ে রাখতেই হয়। বড় লোকে কখনও জনসাধারণের নিকটাত্মীয় হতেই পারে না। এই বনবাস আত্মরক্ষার জন্য, আত্মোন্নতির জন্য, পরের স্বাধীনতা অন্যের সঙ্গে মৈত্রী কী সাম্যের জন্য নয়! আত্মরক্ষা কথাটির অপপ্রয়োগ হয়েছে, আসল কথা আত্মজ্ঞান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ স্ব-রাট্ হওয়া। অন্তরে ভুয়ো, আর মুখে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী! ওসব ধরতাই বুলি, কথার কথা, মন ভুলানো যাদুমন্ত্র! বিজন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা কথার কথা।'

খ: 'আজ্ঞে হাঁ, ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক থেকে মুখস্থ বিদ্যার লালাক্ষরণ মাত্র। প্রকৃতির মধ্যে সাম্য নেই, আত্মোন্নতির কে কোন ধাপে রয়েছে তার ওপর সাম্য নির্ভর করছে। স্বাধীনতা বহিঃপ্রকৃতিতে নেই, জড় আমাদের টুঁটি চেপে মারছে ....জড়ের দৌরাত্ম্যে, জড়ের dictatorship-এ প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।'

বি: 'আর মৈত্রী?'

খঃ 'মৈত্রী, মৈত্রী,....ঠিক জানিনা।'

বি: 'আপনি আবার জানেন না! সুজন বিজনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল।'

খ: 'না, সত্যই ঠিক জানি না....আমি জানি না....তর্ক করবার জন্য তর্ক করি না, জেতবার জন্যও নয়, তাই বলছি, জানি না....মানুষ ভীষণ একলা, তবে সঙ্গী চায়....আমার বড় দেরি হচ্ছে, যাই।' খগেনবাবু বেরিয়ে এলেন— গেটের কাছে সুজনকে বল্লেন, 'চলুন না বই-এর দোকান পর্যন্ত, এতক্ষণ বই বিক্রির সময় হয়েছে।' পথে সুজন জিজ্ঞাসা করলে 'মৈত্রী মানে কি?'

'মৈত্রীর মানে জানি না— বন্ধুত্ব বুঝি, সেও একজনের সঙ্গে অন্যজনের সম্বন্ধ, সকলের সঙ্গে একের নয়, সকলেরও নয়। বোধ হয় দেহের ব্যাপার কিছু।'

'সঙ্কীর্ণ স্থানে অনেক লোক একত্র থাকার দরুণ ব্যক্তির দৈহিক প্র ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়, সেই জন্য, ঠিক কী পদ্ধতিতে এখনও জানা যায় নি, মানুষ জনতার মধ্যে নিজের বুদ্ধিসুদ্ধি, স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে— আপনি কি তাই বলছেন!'

'দেহতত্ত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না বোধ হয়। বন্ধুত্ব হল খানিকটা আকাঙ্ক্ষা, প্রতীক্ষা, অসম্পূর্ণতাবোধ। লোকে ধরতে পারেনি মৈত্রীটা কী বস্তু। লোকে জানে প্রেমকে, কিন্তু মৈত্রী আরো ব্যাপক। এক রকম খিদে বলতে পারেন। হাঁ, দেহগতও বটে খানিকটা। মাটির জন্য যে খিদের পরিচয় পাওয়া যায় বট-গাছের নতুন ঝুরিতে, বন্ধুত্ব সেই রকমের, নচেৎ বটগাছ টলমল করে ঝড়ে, উলটে যায় সহজে। রমলা দেবীর সঙ্গে ঐ কথাই হচ্ছিল। আচ্ছা....বিজন আপনার কে?'

'ভাই।'

'আপনার ?'

'না।'

'আত্মীয় ?'

'মামাতো ভাই।'

'বাপের এক ছেলে ?'

'হাঁ, মামীমা নেই।'

'তাই ...'

'বিজন চমৎকার ছেলে, প্রাণ আছে, খুব উদার হৃদয়, একদিন নিয়ে যাব আপনার কাছে।'

'বুদ্ধি কেমন ?'

'বেশ বুদ্ধিমান— যেমন খেলায় তেমনি পড়াশুনোয়, অল্প পড়েই পরীক্ষায় ভাল করে। কথা কয়ে দেখবেন।'

'বিজন আমার বিপরীতধর্মী। আমি কাশী যাচ্ছি।'

'কাশী ? কবে ?'

'ঠিক নেই। কাশী থেকে অন্যত্র কোথাও যাব বোধ হয়, কোলকাতার ভিড় ভাল লাগছে না।'

'সেখানে আত্মীয় আছেন বুঝি ?'

'হাঁ, মাসীমা আছেন তবে আত্মীয়েরই বা দরকার কি ? সুজন, মৈত্রীতে বিশ্বাস কর ?'

'জানি না।'

'কি মনে হয় ?'

'মৈত্রী মানে Catalysis— সম্বন্ধ স্থাপন করিয়ে দেওয়া— স্বল্পক্ষণের জন্য নিজে বদলে গিয়ে।'

'কিন্তু পুনরায় নিজেতে ফিরে আসা চাই।'

'তা ত বটেই।'

'আপনি আমার মতের দেখছি। অর্থাৎ ঘটকালি করা ?'

খগেনবাবু হঠাৎ সুজনের কাঁধে হাত রাখলেন, 'ঘটক ঠাকুর হলেন কবে থেকে ? এত অল্প বয়সেই হতে হয়েছে।'

'স্বভাবে ছিল।'

'স্বভাব না ভাগ্য ? অবশ্য একই কথা।'

'আপনি মৈত্রী মানেন ?'

'পরে জেনে বলব।'

'কবে ?'

'কাশী থেকে জানাব।'

'লিখবেন ? আমার খুব ভাল লাগবে আপনার চিঠি পেতে; কবে যাচ্ছেন ?'

'আজই ভাবছি।'

'আজই !'

'কি জন্য আর থাকব !'

'রমলাদি জানেন আজ যাচ্ছেন ?'

'তিনিই যাবার সুবিধা করে দিলেন···পুরোহিতের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে··· জানেন নিশ্চয়। আর মতামতের প্রয়োজনই বা কি !'

'না, তাই বলছি।'

'চিঠির জবাব দেবেন ত ?'

'আগে লিখুন, তার পর। স্টেশনে যাব ?'

'না।'

বই-এর দোকানে লোকজন; প্যাকেট নিয়ে খগেনবাবু বাড়ি এলেন! মুকুন্দ, মুকুন্দ, আজ সন্ধ্যার ট্রেনেই কাশী যেতে হবে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নে। গুছিয়ে নাও নিজের জিনিসপত্র, ঠাকুরকে খাবার দিতে বল, সেও যাবে। আত্মীয়কে তোমার খবর দাও, বাড়ি আগলাবে। চাবিগুলো কোথায় রে ?'

ছয়

মাননীয়াসু,

আমি প্রায় এক সপ্তাহ কাশী এসেছি। এখনও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারিনি, সেই জন্য আপনাকে পত্র দেওয়া হয়নি। আজ সকালে অবসর পেয়েছি; তাই আপনাকে চিঠি লিখছি।

আসবার দিন সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাই। শুনলাম আপনি দমদমা গিয়েছেন। একটু নিরাশ হয়েছিলাম। আপনার আত্মীয়া কেমন আছেন ? সুজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল, বড় ভাল লাগল। তার প্রকৃতিতে যে ভারসাম্য আছে সেটি স্থাণু পদার্থের নয়, চলিষ্ণু জীবের। ভাবছি পূর্বে আলাপ হয়নি কেন ? আপনি ঠিকই বলেছিলেন, নিজেকে সরিয়ে রাখতে সে ভালবাসে, সেই জন্য তার অনুগ্র উপস্থিতিতে বিরোধের সমন্বয় হয়। বিজন

প্রাণময় জগতের অধিবাসী, এখনও অপরিণত। সে ভাবে তার আছে স্থির সিদ্ধান্তে আসবার যৌবনসুলভ দৈব অধিকার।

কাশীতে কেমন আছি? কাশীতে ধুলো আর ভিড়, ভিড় আর ধুলো, কাশীর ট্রেনে ভিড়, তার বেঞ্চিতে ধুলো। ভিড়ে মুকুন্দ হারিয়ে গিয়েছিল, অনেক কষ্টে উদ্ধার করি। স্টেশন দেখলাম, 'ব্যস'। কোথায় টঙ্গা চড়ে পশ্চিমে এসেছি অনুভব করব, না সেই কোলকাতার যানবাহন! কী যাচ্ছেতাই স্টেশন! মনকে ছোট ও সঙ্কীর্ণ ক'রে দেয়। ওপারে যাবার পুলের আচ্ছাদন ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। বোধ হয় এদেশের কর্তারা ভাবেন যে পবিত্র স্থানের প্রবেশদ্বার ঐ রূপই হওয়া উচিত; এবং সংসারের চাপে মন কুব্জ, ন্যুব্জ, সঙ্কুচিত না হলে ভগবানের দিকে মন যায় না, ভক্তিরসে মন আপ্লুত হয় না। রস ত পরে আসবে কিন্তু ইতিমধ্যে রাস্তার ধুলো ও রুক্ষতায় মনের আর্দ্রতা শুকিয়ে ঝুনো হয়ে যাচ্ছে যে! রাস্তার দুধারে গাছের পাতা সবুজ নয়, কাশীবাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পক্ককেশের অনুরূপ। কিন্তু একটা জিনিস ভারী তাজা ও ঝকঝকে; পানের দোকানের পিতলের বাসন ও রঙ-বেরঙের ফুকো গোলা ও শিশি। দিনের বেলায়ও দোকানের বাহার খোলে। কিন্তু এত ভোগের চিহ্ন! কাশী এসে মানত ক'রে বাবা বিশ্বনাথকে কেউ পান দিয়ে গিয়েছে শোনা যায় নি। কাশীর পানের চেয়ে বাঙালী পরিবারের বাংলা পান সাজা ঢের ভাল। ছাঁচি পান খেতে পারি না।

শহরে প্রবেশ করবার এত খারাপ রাস্তা সভ্য জগতে কল্পনা করা যায় না, আরো খারাপ হয়েছে সারাতে গিয়ে। সংস্কারের অবস্থা কি সর্বক্ষেত্রেই এই রকম? যদি তাই হয়, তা হলে কয়েকদিনের মধ্যে আপনার কাছে মুখ দেখাতে পারব মনে হয় না। কিংবা হয়ত কাশীর প্রতি অবিচার করছি। কাশী আরম্ভ হয় মোগলসরাই থেকে, আর সব চেয়ে বেশি উপভোগ করা যায় রেলের পুল থেকে। ঘাটে দাঁড়িয়ে এই পুলকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু পুল থেকেই কাশীর সঙ্গে ভালবাসা হয়, প্রথম দর্শনেই। কোন স্থানে দাঁড়িয়ে দেখা হচ্ছে তার ওপর সৌন্দর্যানুভূতি নির্ভর করে না কি? কিন্তু উপভোগের সময় স্থানের কথা মনে থাকে না।

মানুষ ভারী অকৃতজ্ঞ, নয় কি? নচেৎ কাশী চলে আসি? মাসীমা একরকম ভালই আছেন বলতে হবে। কিন্তু একেবারে বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছেন, সে শ্রী আর নেই। এক কালে মাসীমার রূপ ছিল, কিন্তু এখন দেখলে দুঃখ হয়। লাবণ্য পুঁছে গেছে, জড়তা আশ্রয় করেছে, শুখিয়ে গিয়েছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে মাসীমার চোখের সে জ্যোতি নেই, মরা মাছের মতন চোখ, একটা বুড়োটে চশমা পরেন সুতো বেঁধে। তাঁকে নতুন চশমা পরতে, অন্তত ফ্রেমটাও বদলাতে

বল্লাম, রাজি হলেন না। কিন্তু তাইতেই সেলাই করছেন, যখনই সময় পান তখনই পাড়ার কারুর না কারুর নাতিপুতির জন্য কাঁথা তৈরি করছেন। কাঁথা, পেনী ফ্রক নয়, বলেন নতুন কাট ছাট বুঝতে পারেন না, তাঁদের সময় ছিল এক জামা ও দোলাই, পরাতে বিড়ম্বনা হত না, এখন কোথা দিয়ে মাথা গলাতে হবে তাই মাথায় আসে না। মাসীমা পরের জন্য বরাবর সর্বত্যাগী হতে পারতেন, কিন্তু এই বয়সে, কাশী বসে, সময় অসময়, পরের জন্য কাঁথা সেলাই! এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। কাঁথা শুনলেই মনে হয় বৎসরে বৎসরে নিয়মিত সন্তানপ্রসব, শিশুমৃত্যু, অনশন, অনটন। কাঁথা আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি, ভারতবর্ষের সমগ্র দৈন্য ঐ কাঁথার প্রতি সেলাই-এ গাঁথা। অয়েলক্লথও জঘন্য। সস্তায় তোয়ালে পাওয়া যায় না?

কাল দুপুরে, দুপুর নয়, বেলা আড়াইটে তিনটে হবে, মাসীমা দ্বাদশ মন্দির সদলবলে প্রদক্ষিণ ক'রে স্নান ক'রে, স্বপাকে খেতেই বেলা দু'টো, কিছুতেই বামনী রাখবেন না, দেখি, মাসীমা রোয়াকে বসে খুব মন দিয়ে স্থচে রাঙা স্থতো পরিয়ে কাঁথার ফোঁড় তুলেছেন। মনে হল যেন নিয়তি, মুখে কোন প্রকার ভাব নেই, আছে মাত্র একাগ্রতা, নীরবে নিজের কাজই ক'রে যাচ্ছেন, কোন শব্দ নেই, প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। চিত্রের বিষয়। মনে হল, ভারতবর্ষে যতগুলো অপ্রয়োজনীয় শিশু মরে ততগুলি লাল স্থতোর ফোঁড়। শিশুদের পিতামাতার বিবাহে নিয়তি আপত্তি করেনি কেন? বিবাহ ঘটিয়ে, জন্মের স্থযোগ দিয়ে, মৃত্যুকে বরণ করা— এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! বড় ভয় হল, মাসীমা চেয়ে দেখলেন, কিছুই বল্লেন না, নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন, স্থচের মুখে রক্তমাখা স্থতো। ভারী একলা মনে হল— মাসীমার জীবনে আমি অপ্রয়োজনীয় শিশু। মাসীমা আছেন— ভালমন্দের অতীতে বর্তমান। অপ্রয়োজনীয়কে বর্জন করবার নামই কি সাধনা? ভূত ছাড়াবার মন্ত্র মাসীমার কাছে শিখতে হবে।

আমার খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্ট হচ্ছে না মুকুন্দ খুবই যত্ন করছে— তবে ডাকলে পাওয়া যায় না, কেবলই মাসীমার সঙ্গে মন্দির দেখে বেড়াচ্ছে। বেড়াকগে! আমার কাজই বা কি! মুকুন্দ অনেকদিন পরে অবসর পেলে। বামনটা ভাল, কাশীতে অনেক তরকারি পাওয়া যায়, শুনলাম শীতকালে বেগুন উঠবে— পাঁচ সের পর্যন্ত ওজনে! লোকটা রাঁধে চমৎকার। আপনি নেবেন ওকে? কুড়ি টাকায় রাজি হয়েছে।

নিজের কথায় সাত কাহন। আপনি কেমন আছেন, কি করছেন, কি ভাবছেন জানালে আমাকে কৃতজ্ঞ করা ছাড়া নিজের প্রতিজ্ঞা পালনও হবে।

ইতি—খগেন্দ্রনাথ

পুঃ চিন্তামণিকে একবার আমার বাসায় পাঠিয়ে দেবেন, বইগুলোতে উই ধরল কিনা দেখতে। কিছু নিমপাতা ছেড়ে দিলে মন্দ হয় না। যে চিঠিগুলো এসেছে এইখানেই পাঠিয়ে দেবেন। পোস্ট অফিসে লিখে দিচ্ছি এবার থেকে এইখানে পাঠাতে। সুজনকে বলবেন পরে তাকে লিখব। আমার লাইব্রেরী থেকে সে বই নিতে পারে। আমার সিগারের বাক্স টেবিলে আছে, নষ্ট হয়ে যাবে, সিগারগুলো বই-এর তাকে ছড়িয়ে রাখলে পোকা ধরবে না। —খঃ

মান্যবরেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। যথাসময় উত্তর দিতে পারিনি বলে ক্ষমা করবেন। আপনার যাবার দিন সকালে নানা কারণে বাড়িতে উপস্থিত থাকতে পারিনি। আত্মীয়ার এমন কিছু হয়নি, তিনি ভালই আছেন। আপনার চিঠিপত্র ডাকযোগে পাঠাচ্ছি। মুকুন্দের লোক যথাসম্ভব বাড়ি রক্ষা করছে, কিন্তু ওপরের ঘর চাবিবন্ধ থাকার দরুন পরিষ্কার হচ্ছে না। চাবি পেলে মধ্যে মধ্যে চিন্তামণি গিয়ে ঝাঁট দিয়ে আসবে— নিজে গিয়ে বইগুলি সাজিয়ে রাখব। তবে আমার সাজানো কি আপনার মনোমত হবে? শুনেছি আপনি অন্য কারুর বই কিংবা টেবল সাজিয়ে দেওয়া পছন্দ করেন না।

এখানকার খবর ভাল। বিজন ভাল আছে, সে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সুজনকে আপনি ভাল বলেছেন খবরটি দিতে তাকে বড় ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু লোভ সংবরণ করেছি। বাস্তবিকই সুজন খুব ভাল। তবে কেন ভাল আগে বুঝতে পারিনি। তার মনে অনেক প্রশ্নই ওঠে, কিন্তু সে কোথা থেকে যেন আপনা হতেই উত্তর পায়। সুজন বিজনের পিসতুতো ভাই. ছেলেবেলা থেকেই মামার কাছে মানুষ, পিতৃমাতৃহীন, তার বাবা সন্ন্যাসী হয়ে যান শুনেছি, তার মাকে আমি দেখেছি, গোরার আনন্দময়ী মা। সুজনের মামা সুজনকে বড় ভালবাসেন। বিজনই বাড়ির কর্তা, তার পরামর্শেই সংসার চলে, বিজনের মা নেই কিন্তু সুজনের জন্য শৃঙ্খলার অভাব নেই। বিজনের বাবা বিজনকে সুজনের হাতে সঁপে দিয়েছেন, প্রায়ই তাঁকে মফস্বলে থাকতে হয়। বিজনের বাবা আমার বাবার বাল্যবন্ধু— সুজনকে আমি এইটুকু জানি। আমার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু নিজে মানে না, জ্ঞানে বৃদ্ধ। তারও দুঃখ যে আপনার সঙ্গে তার ইতিপূর্বে পরিচয় হয়নি। এখন সে কী একটা লিখছে, তাই ব্যস্ত। তবে প্রায়ই এখানে আসে, আপনার কথা খুবই কয়।

বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের দুই বোন বেরিয়েছে, পড়েছেন? কেমন লাগল আমাকে যদি লেখেন তা হলে আমার উপকার হয়। সেই ভাবে আমি বুঝতে

চেষ্টা করব। মাসীমার শরীর ভাল নয় জেনে দুঃখিত হলাম। এই বয়সে মানুষের মতিগতি ধর্মের দিকে যাওয়াই স্বাভাবিক। মুকুন্দ আপনাকে যত্ন করছে ও ঠাকুর ভাল রাঁধছে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। কাশীর ঘাটে যখন বেড়াতে যান ভাবি, সানাই শুনতে বড় ইচ্ছে হয়। গান ভালবাসি, কিন্তু ভাল করে শিখিনি, পরতৃপ্তির জন্য শেখান হয়েছিল, পরতৃপ্তির জন্য গেয়েছি। কিন্তু আর শেখা হবে না।

মাসীমার শরীরটা যদি এতই খারাপ হয় তা হলে একটা নিজের জন্য বাড়ি নিন না, লোকজনও সঙ্গে আছে। বলেন ত চিন্তামণিকে পাঠিয়ে দিই? অধিক আর কি লিখব? কোন প্রয়োজন হলে নিঃসঙ্কোচে লিখবেন, পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো।

ইতি— রমলা

মাননীয়াসু,

আপনার চিঠি পেয়েই লিখতে বসেছি, ভাবছি আজ আর বেড়াতে যাব না। গিয়ে কি হবে বলুন? সেই সব পেনসন ভোগী বৃদ্ধ বৃদ্ধার দল। তবে ঘাট আমাকে টানে, তার অসমতা, তার সনাতনত্ব, তার বৈচিত্র্য, তার অ-পার্থিব ইঙ্গিত আমাকে স্বপ্নালোকে নিয়ে যায়। ঘাটের ওপর সময়ের ছাপ, সভ্যতার পলি পড়েছে, তার ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে বিরক্ত সন্ন্যাসী নয়, বিংশ শতাব্দীর বিরক্তিকর স্বাস্থ্যান্বেষী বৃদ্ধ, বিতাড়িত বৃদ্ধা। মা অনেকক্ষণ মারা গিয়েছে, কচি ছেলে মরা মার কোলে শুয়ে দুধ খাচ্ছে। কি রকম গা ছম ছম ক'রে ওঠে না? এই ঘাটের ওপর যে 'ইতর' জনমানব নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্ত মনে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তারা ইতিহাসের দান সম্বন্ধে সচেতন নয়। তারা অতীতের উত্তরাধিকারী, কিন্তু কি রকম জানেন? অন্য উপমা দিচ্ছি, কারণ এঁদের শিশুর সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়, ঘুণধরা, টোল খাওয়া, আড়ষ্ট স্বভাব শিশুর নয় নিশ্চয়। পোষ্যপুত্রের মতনই এঁরা অন্তঃসারশূন্য, পোষ্যপুত্র যেমন সম্পত্তি অর্জনের সাধনা ও ইতিহাস সম্বন্ধে উদাসীন, এবং উদাসীন বলেই সম্পত্তি রক্ষা ও তার চেয়ে দরকারী কাজ সম্পত্তি-বৃদ্ধি সম্বন্ধে দায়িত্বজ্ঞানী হয় না, কাশীর ঘাটবিহারীরাও তেমনি। ইচ্ছে করে এদেরকে বলি, 'ওরে তোরা জানিস, কি ক'রে বুদ্ধদেব এইখানে প্রাণহীন ও প্রাণনাশী যাগযজ্ঞের বিপক্ষে মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াতে বলেছিলেন? তোরা জানিস বুদ্ধদেবের ভাষা? সে ভাষা সংস্কৃত নয়, অন্তরের প্রকৃতি ভিন্ন ধরনেরই, সে অন্তর মহাকাব্য শুনতে তৎপর, উৎসুক, উন্মুখ। তারপর এই কাশীতে এলেন শঙ্কর হিন্দুধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে। কী অদ্ভুত এই লোকটি। আর্যভূমি আর দাক্ষিণাত্যের পার্থক্য ঘুচে গেল, এখন গভর্নমেন্টের বড় চাকুরি অধিকার ক'রে মাদ্রাজীরা যেমন ভারতবর্ষের

ঐক্য প্রচার করছেন তেমন ভাবে নয়, কেবল তেজ ও দুঃসাহসের জোরে। শঙ্করের মত অসীম সাহস কার? নেলসনের নাটকী সাহসের কথা শুনে হাসি পায়। জ্ঞানের সীমা নেই— উভয়-ভারতী ও রাজা অমরকের গল্প সত্য নয়— জলছে যেন একটা শিখা। তারপর কাশী মরেও মরেনি— মধ্যযুগের সব মহাত্মারই পদধূলি পড়েছে এই কাশীতে, এখানে এসে সকলেই কৃতার্থ হয়েছেন। বেণীমাধবের ধ্বজা ভেঙ্গে কেন আওরঙ্গজেবের মসজিদ হয় বলুন? ঘাটের ভিড় দোষ দেবে আওরঙ্গজেবকে! কিন্তু তাঁর দোষে ধ্বজা ভাঙ্গেনি, তাঁর গুণে চূড়া উঠেছিল। লোকটাকে আমার বড় ভাল লাগে— তার মধ্যে নিষ্ঠা ছিল, একাগ্রতা ছিল,— যা ভাল বুঝত তাই করবার সাহস ছিল— আমার মত দুর্বল ছিল না। মানবেন না? কিন্তু চিঠি লিখতেন চমৎকার! সে যাই হোক, এই কাশীতে মধুসূদন সরস্বতী নামে এক মহাপণ্ডিত বাঙালী থাকতেন— তখনও বাংলা দেশ ভারতবর্ষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যোগান দেবার ভার নিয়েছিল। ইনি বুদ্ধি দিয়ে হিন্দুধর্মকে বাঁচাতে চান। আমি এঁকে টমাস অ্যাকোয়াইনাসের সঙ্গে তুলনা করি। তারপর সেদিন পর্যন্ত দয়ানন্দ, ভাস্করানন্দ এবং আমি যাঁকে সব চেয়ে শ্রদ্ধা করি— সেই তৈলঙ্গ স্বামী কাশীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তৈলঙ্গ স্বামীই এ যুগের একমাত্র বৈদান্তিক! বেদান্তের চরম পরিণতি তাঁতেই পাই— **reductio ad absurdum**! অত স্থির, অত ঘন, অত গাঢ় চরিত্র কোথাও দেখি নি। কর্মবীর নন, মৌনী— দুটো ভিন্ন থাকের চরিত্র— অবতার নন, যোগী। জনসাধারণ অবতার চায়; আমি চাই যোগীকে। যোগী অবতারের চেয়ে বড়, কর্ম লয় পেয়েছে যোগীতে, সেই জন্য যোগী নেমে এসে অবতার হন। যদি সন্ন্যাসী হতাম তা হলে তৈলঙ্গ স্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়েই হতাম— যদি তিনি দীক্ষা দিতেন। এখনও কাশীতে হয়ত দু'একজন সাধু আছেন— তাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়া শক্ত। কিন্তু এই জনতার মধ্যে আসবারই বা কি প্রয়োজন তাঁদের? হিমালয় কি লোকারণ্য হয়েছে?, এলেনই যদি দেখা দেন না কেন? দেখা দিন আর নাই দিন, কাশীতেই হিন্দুসভ্যতার ধারাবাহিকতা অটুট আছে— তবে খুঁজতে হয়, যেমন আমি খুঁজছি। ইংরেজী সভ্যতা, দর্শন ও খবরের কাগজ একে ছুঁতে পারেনি। ধারাটি হল আত্মোপলব্ধির, যার উপায় বই পড়া নয়, সংস্কার ত্যাগ করা, সন্ন্যাসী হওয়া, অর্থাৎ নিঃসঙ্গ অন্তর্দৃষ্টির সাধনা। আমি বুদ্ধি দিয়ে এই অবস্থায় পৌঁছবার দুরাশা পোষণ করি। যেমন লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি পৌঁছেছিলেন। প্রমাণ তার নোটবুকে। বইটা আমার ঘরে বাঁ দিকের শেলফের ওপর তাকে আছে, তারই পাশে ভ্যালেরীর বইটা আছে নেবেন, খুব ভাল লাগবে, আমি কী বলছি বিশদ ক'রে তাইতে লেখা আছে। পড়বেন কিন্তু— চাবি

পাঠাচ্ছি দিয়াশলাই-এর বাক্সে— দুই বোনের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাবেন না। দুই বোন পড়িনি, পড়ব বই-এর আকারে প্রকাশিত হলে। খাপছাড়া ক'রে পড়তে ইচ্ছে হয় না— চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়। রবিবাবুর লেখা কখনও ইচ্ছাপূরণ হিসাবে পড়বেন না। রবিঠাকুরের লেখা পড়বার সময় যদি কেউ টুঁ শব্দ করে আমার তাকে মারতে ইচ্ছে হয়। একবার আমি ঘরে বাইরে পড়ছি, বইটা আমার এত ভাল লাগে যে কাউকে পড়তে পর্যন্ত অনুরোধ করি না— পাছে ফাজলামি ক'রে দোষ দেখায়— সাবিত্রী ঘরে এসে বল্লে, 'আচ্ছা, আমি যদি মক্ষির মত অন্য কাউকে ভালবাসতাম, তুমি কি করতে?' শুনেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, ঘর থেকে বইখানি হাতে নিয়ে বেরিয়ে চলে যাই— একেবারে শিবপুর। একবার ভার মজা হয়েছিল— একজন বড় লোকের বাড়ি বৌভাত উপলক্ষে গান বাজনা হচ্ছে, ওস্তাদ হাম্বীরের চৌতাল— 'ক্রোরা বরখা' গাইছেন, এমন সময় এক 'ফড়ে' এসে জোড় হাত ক'রে বল্লেন, 'এইবার আজ্ঞা হয় উঠতে, লুচি জুড়িয়ে যাচ্ছে।' শুনেই ওস্তাদজী কাঁধ থেকে তানপুরা এত জোরে মাটিতে রাখলেন যে লাউটা গেল ভেঙ্গে। মেয়েরা ঐ রকম। তারা এমনি সব বোকা প্রশ্ন ও আব্দার করে। তারা যখন নভেল পড়ে তখন ইচ্ছাপূরণের জন্য চরিত্রের সঙ্গে নিজেদেরকে মিলিত করে। অবশ্য দুপুরবেলা ঘুম আনবার জন্যও নভেল পড়া পরিচিত ঔষধ বলে স্বীকৃত হয়েছে। প্রথমটাই বেশি সত্য, প্রমাণ এই যে পাঠিকারা নভেলে এমন সব ঘটনার বর্ণনার প্রত্যাশা করেন যেগুলি তাঁদের জীবনে ঘটেনি, অথচ তাঁদের বিশ্বাস ও ইচ্ছা যে সবই ঘটতে পারত। একটু অস্বাভাবিক রকমের কিছু ঘটনা তাঁরা সহ্য করতেই পারেন না। তাঁরা পূর্বপরিচিত চরিত্র ও ভাবের ভাবময়ী বর্ণনা কিংবা অল্পদূরপরাহত অথচ তাঁদেরই জীবনে খানিকটা সম্ভাব্য ঘটনার বিবৃতিই পছন্দ করেন। তাঁদের নভেল পড়ার অর্থ হল নভেলিস্টের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙা, নভেলের চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবন চালান, অত্যন্ত রোমাঞ্চকরভাবে। পাঠিকা, পাঠিকা কেন, অনেকই পুরুষই, বিশেষত বিবাহিত পুরুষ পাঠকই এই প্রকারের পরাশ্রিত জীব। বিক্রি করবার জন্য লেখকেরাও মেয়েলী মনোভাবকে রঞ্জন ক'রে থাকেন। যাঁরা লেখেন না, তাঁরা বলেন, 'আচ্ছা বেচারিরা রান্নাঘরেই সারাদিন থাকে, ছেলেপুলে মানুষ করতেই সময় চলে যায়, কী করবে। আমি বলতে পারি কী করা উচিত। এঁদের পালে-পার্বনে শাড়ি ও গহনা দেওয়া এবং মাসে একবার দুবার সিনেমা ও থিয়েটার দেখতে নিয়ে যাওয়াই ভাল। আবার অনেক সাহিত্য সমালোচক বলেন, 'নভেলের চরিত্র সম্বন্ধে মেয়েদের জ্ঞান পুরুষের চেয়ে বেশি সেই জন্য নাক-উঁচু নভেল এরা পছন্দ করেন না, আর ভালই করেন, কারণ নভেলে গল্পাংশই প্রধান, মজা দেখুন, এঁরা উচ কপালে নন, অথচ জীবনে রোমাঞ্চকর

ঘটনা ঘটুক প্রত্যাশা করেন, জীবনে না ঘটলে নভেলিস্ট কোথা থেকে আঁকবেন বলুন? মেয়েদের এই প্রকার চরিত্রজ্ঞান, এবং সমালোচকবৃন্দের এই প্রকার সমালোচনাকে আমি সন্দেহের চক্ষে দেখি। একে মেরে ফেলা হয় কেন? এর সঙ্গে ওর বিবাহ না হলেই হত, কিংবা হলে কি হত?—এই সব প্রশ্ন যে সব সমালোচক ও পাঠক তোলেন, তাঁরা সাবিত্রীর সমগোত্রের। মেয়েরা যেমন—আপনি নন— পরান্নভোগী হয়েও বলে, 'আমার গাড়ি, আমার বাড়ি, আমার চাকর, আমার সব'— এই শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা-সমালোচকও তাই। এঁদের নিজেদের জীবন নেই, তাই নভেলের চরিত্রে আত্মনিবেদন ক'রে দেন, যেখানে দিতে পারে না, সেইখানেই বলেন লেখার দোষ। পরান্নভোজী কৃমির দল। করেন পরের ধনে পোদ্দারী! নিজেদের জীবন যদি থাকত তবে বুঝতেন পরেরও অন্য ধরনের জীবন সম্ভব এবং আছে। নিজের জীবন না থাকলে, তা না জানলে, পরের জীবন বোঝা যায় না, লেখা যায় না।

গানেও তাই হয়! গান-বাজনা শুনে বড় লোকদের পোলাও হজম হয়, তাই খাবার পর তাঁরা রেকর্ড, রেডিও নেহাত ভদ্রলোক হলে, ওস্তাদ বাঈ-এর গান শোনেন। গান শুনে মরা ছেলে কিংবা বিলেতপ্রবাসী প্রেমিকের কথা স্মরণ হতে দেখেননি? প্রথমটা সহ্য করতে পারি, কারণ নিজেরই লিভার খারাপ, কিন্তু দ্বিতীয়টি পারি না— বিলেত যাইনি বলে কি? একজন কথক রামায়ণ পাঠ করছিলেন, জানকীর দুঃখে শ্রোতারা কেঁদে আকুল, শ্রোতার মধ্যে একজন মুসলমান প্রজা ছিল, সেও কান্না শুরু করলে। জমিদার জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কাঁদছিস কেন? তুই রামায়ণের কি জানিস? জানকীর দুঃখ তুই কি বুঝিস? প্রজা বল্লে, 'বাবু ওদের জানি না, কিন্তু কথক ঠাকুরের মাথা নাড়া দেখে আমার সেই পুরানো রামছাগলের কথা মনে হচ্ছে— ওর মটরুরে··· কোথায় গেলিরে বাপ!' কথক ঠাকুরের দাড়ি ছিল। মেয়েদের গান শোনা ও গাওয়া ঐ প্রকারের, সাহিত্যচর্চাও তাই, অনেক পুরুষদেরও। এ বিষয়ে দেশে স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে সাম্য আছে— অন্তত এই কারণে দেশের মেয়েরা পুরুষদের মতন ভোটের অধিকারী'।

এই দেখুন, কত লম্বা লেকচার দিলাম— অধ্যাপক না হয়েও! কেন জিজ্ঞাসা করলেন? আমাকে জানেন ত! আপনার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে হয়— কতদিন যেন কারুর মনের পরিচয় পাইনি। তাই এত কথা লিখলাম। আমি চাই সাহিত্য আলোচনায় গীতার নিষ্কাম-ধর্ম প্রয়োগ করতে। কারণ জীবনের সেইটাই বড় কথা, এবং আর্ট ও জীবন যুক্ত।

আপনি আমার সঙ্গে থাকলে সানাই-এর সুর কেন ভাল লাগছে বোঝাতে পারতাম না, সুরের নামই বলে দিতাম— তাতে কোন তৃপ্তি হত না। নাম

জেনেই যে তৃপ্তি আসে সেটি সৌন্দর্যানুভূতির আনন্দ নয়, পূর্বপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতের চকিত আনন্দ। গান কেন ভাল লাগছে বুঝতে ও বোঝাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। বোঝাবার জন্য কি পোড়াবার প্রয়োজন জানি না—বোধ হয় সাহিত্য-প্রীতি। শুদ্ধতা অর্জন ও উপভোগের জন্য চাই burning of the bush. মনের ওপর ভাষার আধিপত্য না সরালে সংগীতের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। অথচ সেই কথিত ভাষা ভিন্ন অন্য কি উপায় আছে বোঝাবার? স্বীকার করি সেটা ব্যাখ্যার পক্ষে খুব উপযুক্ত নয়, সে জন্য সুরের ভাষারই প্রয়োজন, অতএব সুরকে অব্যক্ত বলে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তবে এইটুকু বলতে পারি যে আপনার পাশে থেকে সানাই শুনলে সুর বেশি উপভোগ করতাম—আপনি— আপনার কথা জানি না।

দেখুন একটা কথা আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয়— আমরা বুঝি বাক্য দিয়ে, সেই জন্য প্রথমে ভাষায় প্রকাশ করা এবং বোঝা একবস্তু হয়ে ওঠে, অথচ প্রকাশের ভাষা একাধিক হতে পারে, অসভ্য জাতির অঙ্গসঞ্চালন থেকে সুরের রেশ পর্যন্ত। তার চেয়েও বিপদ আসে যখন ভাষাকেই সত্তা বিবেচনা করি। এর চেয়ে ভুল আর নেই। লোকে এতদূর পর্যন্ত বলতে শুরু করেছে যে যেটি প্রকাশিত হতে পারে মাত্র তারই আছে সত্তা। আমার কিন্তু সন্দেহ উঠেছে। বাক্যে সব ধরা পড়ে না— এবং সত্তা এবং প্রকাশ এক বস্তু নয়। অনেকটা আইসবার্গের মতন, ভাষা কেবল ওপরের ভাসমান ও দৃশ্যমান অংশটুকু। চার-ভাগের তিনভাগ থাকে নেপথ্যে। তাকে প্রকাশ করতে হয় সমগ্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে। সমগ্র এই কারণে যে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে তৎসদৃশ ভাষাতিরিক্ত অবচেতনা ও উর্ধ্বচেতনা রয়েছে। ঠিক লোকের পাশে বসে গান বাজনা শুনলে অমনি বোঝা যায়, ব্যাখ্যার প্রয়োজনই হয় না।

কত বিপরীত মনোভাবের পরিচয় দিলাম। হোকগে। পরীক্ষা দিচ্ছি না, চিঠি লিখছি। চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই হাসবেন, মনে মনে বলবেন, 'ইনি আবার মৌনী হবেন। একবার উসকে দিলেই হল, অমনি রক্তপুঁজের স্রোত বইছে। ইনি আবার একলা থাকবেন, যিনি ছোট্ট চিঠির উত্তরে মহাভারত লেখেন।' কিন্তু সে জন্যও দায়ী আপনি। আপনি দেখছি তপোভঙ্গ করতে পারেন।

বই কষ্ট করে গোছাতে হবে না, চিন্তামণি মধ্যে মধ্যে গিয়ে ঝাঁট দিয়ে এলেই চলবে। চিন্তামণি এলে আপনার চলবে কি ক'রে?

সুজনকে লিখব দু'দিন পরে। আমার বক্তব্য হল— গানই বলুন, মানুষই বলুন, আর সাহিত্যই বলুন, শুদ্ধভাবে গতি ও রূপটা লক্ষ্য করতে হয়, তারপর ব্যবহার যা হয় হোক— পরে, পূর্বে নয়। পূর্বের ব্যবহার কেবল অভ্যাস, সংস্কার,

পুথি-পড়া মুখস্থ বিদ্যা। শুদ্ধভাবে দেখার অর্থ— বস্তুর সত্তা বোঝা— যেটি যা ঠিক তাইটি বোঝা—বোঝা নিজের সমগ্রতা দিয়ে। তা হলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপায় ঠিক ক'রে নেবে। আমার উপায়ের প্রথম স্তর হল অবান্তর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। আপনার উপায় কি ?

ছোট চিঠি দিলেন কেন ? হাত বুঝি ব্যথা করে ?

ইতি— খগেন্দ্র

পুঃ আলাদা বাড়ির খোঁজ নিতে হবে দেখছি। মাসীমার কষ্ট হচ্ছে— অভ্যাস নেই অনেক দিন কী না।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

চিঠি ও চাবি পেয়েছি। চিন্তামণিকে সঙ্গে নিয়ে সুজন বই পরিষ্কার ক'রে এসেছে।

আপনি যখন পৃথক বাড়ি নেবেন ঠিকই করেছেন তখন আমার কিছু বলবার নেই। আমার কেবল ভয় হচ্ছে নতুন বাড়িতে আপনার কষ্ট হবে। বাড়িটা স্বাস্থ্যকর ত ? শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবেন। আপনি অবান্তরকে দূরে রাখলেও অবান্তর ছুটে আসে।

আপনার চিঠির উত্তর দেবার সামর্থ্য নেই। সুজন বলছিল সব চিঠিরই জবাব যে দিতে হয় তাও নয়। আমি বিদুষী নই, যেমন পড়তে হয় পড়েছি। আমাদের বেলা শিক্ষার সঙ্গে জীবনের একটি মাত্র মুহূর্তের সংশ্রব— সারাজীবনের সংশ্রব নেই। সেই অভাববোধেই নভেল পড়া, গান শোনা। নভেল পড়বার সময় কি মনে হয় বিশ্লেষণ ক'রে দেখিনি— কিন্তু আপনার চিঠি পাবার পর চিন্তা ক'রে দেখলাম, আমরা নভেল পড়ি নিজেদের জন্য, আমাদের অপুকৃষ্ট জীবনকে রসাল করবার জন্য। নভেলই আমাদের জীবনের খোরাক। আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না, তবে আমার পরিচিতার মধ্যে অনেকেরই জীবনের সন্ধিস্থলে নভেলের নায়ক-নায়িকা উপস্থিত হয়ে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন জানি। নভেল পড়ে একাধিক মেয়ের জীবনধারা পরিবর্তিত হয়েছে। তবে কেউ পড়েন ভাল বই, কেউ বা শিক্ষা সুবিধার অভাবে বটতলার। সুজন বলছিল— ইচ্ছাপূরণ ব্যাপারটাই যে খারাপ তা নয়, সদিচ্ছাপূরণের দোষ কোথায় ?

গান শুনলে আমার সুর-ব্যতীত অন্য অ-বাস্তব আনন্দ আসে— তাকে তাড়াতে পারি না। আনন্দের মাত্রা কমাতে আমার মায়া হয়— যে কারণেই হোক মাত্রা বাড়ুক না কেন ? আপনি যাকে শুদ্ধভাব বলেছেন সেটি ধারণা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু আপনার চিঠি বোঝবার চেষ্টা করছি, পারছি না, কেবল ভেসে উঠছে আপনারই ভাষা, যেন আপনি মুখে বলছেন, আর আমি শুনছি। কথা কইবার সময় আপনার সর্বাঙ্গ চিন্তা করে উজ্জ্বল হয়, মুখে অন্যভাব আসে। দেহটা আপনার তখন কোথায় কার সঙ্গে মিশে যায়, যে স্থান আপনার দেহ অধিকার করেছিল সেখানে থাকে কেবল দীপ্তি।

আপনি স্ত্রীজাতিকে অত ঘৃণা করেন জানতাম না। তারা আপনার কি করেছে? আপনার মত কে বুদ্ধিমান হবে? ক'জন পুরুষেই বা হতে পারে? এই চিঠিটা লিখে আমার ভারী লজ্জা হচ্ছে,কিন্তু এর বেশি ভাল যে লিখতে জানি না। ইচ্ছে করে আবার ছোট হয়ে যাই, আবার নতুন ক'রে শিখি। কিন্তু সে হবার নয়।

আপনার নতুন বাড়ির ঠিকানা পাঠাবেন। ভালই করেছেন নতুন বাড়ি নিয়ে। শরীরের যত্ন করবেন। চিঠির প্রত্যাশায় রইলাম।

রমলা

পুঃ বিজনের টাইফয়েড হয়েছে— সুজন খুব সেবা করছে, তার মামা বিদেশে। নার্স রাখা হয়েছে, আমাকে মাঝে মাঝে যেতে হয়। অতি অবশ্য দুধ ও জল ফুটিয়ে, ছেঁকে, কর্পূর দিয়ে খাবেন। নিজে দেখে নেবেন, মুকুন্দকে বলে হবে না, সে বাসি জল খাওয়াবে আর বলবে গরম জল খাওয়াচ্ছি। তার চেয়ে এক ডজন সোডা কিনে রাখবেন— সোডাভাঙ্গার কল পাওয়া যায় নিশ্চয় কাশীতে। সামান্য অসুখ বিসুখ করলেও কলকাতায় চলে আসবেন। মাসীমাকে এই বয়সে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়!

পুঃ হাত ব্যথা করে না, শক্তিহীন। সুজনকে লিখলেন না?

রমা

•

রমা দেবী,

আমি স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করি না। তাঁদের কাছে আমি বেশি প্রত্যাশা করি, পাইনা তাই ক্ষোভ হয়। ক্ষোভে রাগ, রাগে ঘৃণা। তা ছাড়া, স্ত্রীজাতি বলে কিছু নেই, স্ত্রীবিশেষ থাকতে পারে।

আজ ভারী ব্যস্ত, নতুন চুণকাম করতে দেরি হল— আজই উঠে যাচ্ছি। মাসীমা যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন! সকাল থেকে কাঁদছেন—ভয় হচ্ছে সন্ন্যাসী হয়ে যাব। কাল পরশু একটু সৎসঙ্গ করেছিলাম, কোথা থেকে টের পেয়েছেন। কথক ঠাকুরের সঙ্গ নয়, একজন সত্যকার সাধু। তাঁর কথা পরে লিখব।

আপনার চিঠি আমার ভাল লাগে। সোডা কিনব, কিন্তু বড় দম ক'রে শব্দ

হয়। একবার বোতল ফেলে ভীষণ কাণ্ড হয়, সেই থেকে কেমন ত্রাস হয়েছে। জল ফুটিয়ে কর্পূর দিয়ে খাচ্ছি!

বিজনের বাড়ি যাবেন, কিন্তু ইতিপূর্বে ইনজেকসন নিলে হয় না? বিলি ভ্যাকসিন খাওয়াই ভাল, নচেৎ হাতে বড় ব্যথা হয়, জ্বরও হয়— একেই অত ছোট্ট চিঠি। সুজন ছাড়া বিজনের অন্য কোন আত্মীয় নেই কি? বিজনের বাবাকে তার করে দিন। এই রকম দেশী অভ্যাস আমার বড় খারাপ লাগে— পরিচিত ও আত্মীয়ের দ্বারা নার্সের কাজ করিয়ে নেওয়া। সাহেবরা এ বিষয়ে খুব ভাল— একেবারে বৈজ্ঞানিক— নিজেরাই হাসপাতালে চলে যায়, বীজাণু ছড়ায় না। আচ্ছা, আসি এখন? বাইরে টঙ্গা এসেছে। শুদ্ধ ভাব অর্জন করা শক্ত। কাল সাধু মহারাজ বলেছিলেন গুরু ভিন্ন উপায় নেই। ইতি— খগেন্দ্র

পুঃ সত্যি আমার কথা শুনতে ভাল লাগে? না সামাজিক ভদ্রতা করছেন? আপনি এখন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল হয়েছেন, কিন্তু তিনিও লম্বা চিঠি লিখতেন।

খঃ

পূজনীয়েষু,

এ কদিন কোন সময় পাই নি— কাল চোদ্দ দিন কেটেছে, কোন উপসর্গ নেই! জ্বর কম। খাওয়া দাওয়া কেমন হচ্ছে? জল ছেঁকে নিতে হয়। শরীর ক্লান্ত। গুরু ভিন্ন উপায় নেই? বোধ হয় সত্য। রমা

রমা দেবী,

এই মাত্র আপনার কয়েক ছত্র চিঠি পেলাম। শরীর খারাপ হয়নি ত? ভাবনা হচ্ছে, পত্রপাঠ চিঠি লিখবেন কেমন আছেন। কাশী মোটেই ভাল লাগছে না। শরীরটা মস মস করছে, বোধহয় একটু জ্বর হবে। অ্যামন-কুইনিন খেয়েছি, ওতে আমার ভারী উপকার হয়। আপনি যদি জ্বর ক'রে বসেন তা হলেই বিপদ। যদি আমাকে অসুখ ক'রে কোলকাতায় যেতে হয় তখন দেখবে কে? কী স্বার্থপর আমি!

খগেন্দ্র

পুঃ না হয় পত্রের উত্তরে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দেবেন। পরের সেবা আপনাদের নেশা। টেলিগ্রামের প্রয়োজন নেই যদি পত্রপাঠ উত্তর দেন। ভাবনা হচ্ছে।

খঃ

আপনার জ্বর শুনে টেলিগ্রাম করা উচিত ছিল, কিন্তু নানা ভেবে চিন্তে করলাম না—আপনার বারণও ছিল।

এ চিঠিটা দেবার ইচ্ছা ছিল না। পড়ে ছিঁড়ে ফেলবেন। আপনি আমার শরীরের জন্য ভাববেন না, আমারই কাছে তার কোন মূল্য নেই।

আপনি একবার শ্মশানে বুড়ো বটগাছ-ঠেশ-দেওয়া ভাঙ্গা মূর্তির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন মনে পড়ে? উপমা উপযুক্ত হয়েছিল। একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে—আপনি কি জানতেন, গভীর রাতে এই বুড়ো বটগাছের সঙ্গে এই ভাঙ্গা-মূর্তির কি কথা হয়? ভরা দুপুরে যখন লাল মাঠের ওপর শুখনো হাওয়া চলে তখন তার মুখের পাথুরে হাসি মুখর হয়ে কোন দিগন্তে ভেসে যায়? আর যখন শব-যাত্রীর সমাগম হয় সেই বটের ছায়াতলে তখন কি জানেন তার চোখের অবস্থা? সেই উষর ভূমিতে আর রোদ্দুর নেই, তার ওপর নেবেছে ঘোর অমাবস্যা।

কিছুই আমার ভাল লাগছে না, বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। নিজেকে ফাঁকি দিতে পারছি না। এইত সেদিন অন্য ছিলাম—আমার সংযম ছিল। সুজন আসে—আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে,—সাবিত্রীও ভালবাসত, আপনার ভাগ্য ভাল। এ চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবেন। আমার ভয় করছে—কি হয়ে গেলাম। আপনাকে নিচু করব না, করব না, করব না। আপনি কোলকাতায় আসবেন না।

রমা

আমি কাশী ছেড়ে যাচ্ছি। বিশেষ প্রয়োজনেই যেতে হচ্ছে। প্রয়োজন কি জানাবার জন্য খানকয়েক কাগজ পাঠালাম, ভিন্ন মোড়কে। আবোল-তাবোল যা মনে এসেছে তাই লিখেছি, নিজের কাছে লজ্জা কি? একবার লিখেছিলেন আমার কথা শুনতে ভাল লাগে, এগুলি প্রাণের মনের গোপন কথা। এদের সঙ্গে আমার জীবনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। পৃথিবীর দেহে যেমন ওষধি জন্মায়, আপনার প্রাণ থেকে যেমন স্নেহ ঝরে, তেমনি এই ভাবগুলি আমার সমগ্র প্রাণ মনের সহজ ক্ষরণ। মস্তিষ্কের উল্লেখ করলাম না—কারণ শুষ্ক মস্তিষ্কের একাধিপত্য সহ্য করতে পারছি না। মন-প্রাণ দেহের অতিরিক্ত কিনা তাও জানিনা। একজন পুরুষের চেতনার ইতিহাস, কল্পনার স্রোত, কিংবা অনুভূত চিন্তা, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের felt thoughts হিসাবে কাগজগুলো পড়বেন। আমার ডায়েরির তারিখ নেই—আমার চেতনা অভিব্যক্তির পাঁজি বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমতীর চেতনার ইতিহাসে।

ইতি

খগেন্দ্র

রমা দেবী,

অনেক দিন পূর্বেই এই চিঠিটা পাঠাবার ইচ্ছা ছিল। আপনার শেষ চিঠি পাবার পূর্বে আমার মনে বিস্তর সন্দেহ উঠেছিল। আমার মত যেন ওলট পালট হয়ে গেল। চিঠির জবাব আমি প্রত্যাশা করি না। কোথায় থাকব নিজেই জানি না, কতদিন থাকব তারও স্থিরতা নেই। মন বড়ই বিক্ষুব্ধ হয়েছে। দিন কয়েকের জন্য কোথা থেকে ঘুরে আসি, একজন সাধু আমার বন্ধু হয়েছেন, আধুনিক সাধু, অর্থাৎ ভ্রমণ-বিলাসী, জিয়লজিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও চাকরি পান নি। শান্তি না পাই চলে আসব। কিন্তু আসব কোথায়? দিন কয়েক পরে একবার কাশী আসব, কাশী ত্যাগ করলেও কাশী আসতে হবে, বাড়ি, মুকুন্দ ও আসবাবপত্রের জন্য।

আপনি বিপরীতধর্মী নন ত? সুজনকে জিজ্ঞাসা করবেন। পুরুষসিদ্ধিই একমাত্র শুদ্ধ প্রচেষ্টা। শুদ্ধ না হলে সিদ্ধি হয় না, শুদ্ধি ও সিদ্ধিই একই প্রক্রিয়া। আপনি গুণবতী প্রকৃতিস্বরূপা— আমি আপনার অতিরিক্ত হতে চাই।

আমাকে পরীক্ষা করতে দিন। যেদিন উত্তীর্ণ হব, পুরুষ হব, সেই দিন নিজেই আপনার দ্বারে উপস্থিত হব, তখন আপনি কি হবেন? প্রকৃতি শুদ্ধা হয়ে নারী হয়— সামান্য হয়ে ওঠে বিশেষ। তবে কি উপায়ে আমি জানি না, নিজেই পন্থা আবিষ্কার করুন। ততদিন পৃথক। অসম্পূর্ণতার ডালি উপহার দিতে অনিচ্ছুক— পুরুষের কর্তব্য নয়, ব্যক্তির অধিকার নেই। আপন পায়ে হেঁটে যাব আপনার কাছে— চৌদোলায় নয়। না, আপনি আসবেন?

ক্ষমা করবেন। ভগবান মানি না— প্রমাণাভাবাৎ নয়, প্রয়োজনাভাবাৎ। তাই প্রার্থনা করতে পারি না। তবু বলি শুদ্ধ হয়ে শান্তি পান। আপনার শুদ্ধি আপনার হাতে। আত্মা এক নয়, বহু। ফুজিয়ামার ছবি দেখেছেন? কেমন নিরালম্ব! হিন্দু বিবাহের আদর্শ কি বলুন ত?

খগেন্দ্রনাথ

সাত

রমলা দেবী শেষ চিঠিটা পড়লেন। আয়না টেবলের ওপর মোড়কটা ছিল। চিঠির কয়েক ছত্র আত্মগ্লানির মতন ঘুরে ফিরে মনে আসছিল— কাশী ছেড়ে যাচ্ছি, চিঠির জবাব প্রত্যাশা করি না, কোথায় থাকব নিজেই জানি না, কতদিন থাকব তার স্থিরতা নেই। হাত কাঁপছিল, গলা আটকে গেল, রমলা দেবী বিছানায় বসে পড়লেন। শিশুরাই সন্ন্যাসী হতে চায়, সন্ন্যাসী হলে সাংসারিক নাম-ধাম কিছুই

থাকে না— সন্ন্যাস এক বিরাট শূন্যতা ; ভিক্ষে করতে হয়, বিশ্রাম নেই, সারাদিন পায়ে হাঁটা, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই— নিজের চাবির ঠিকানা থাকে না, সোডার বোতল খোলার শব্দে ভয় হয়···পারবে না, পারবে না। আমি পায়ে হেঁটে যাব আপনার কাছে···সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে··· য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে ছেলেরা আবৃত্তি করছে রবীন্দ্রনাথের অভিসার···নগরের নটী চলে অভিসারে যৌবন মদে মত্তা···যৌবন না ভাঙ্গা মূর্তি। রমলা দেবী বিছানা থেকে ধড়-মড় ক'রে উঠে পড়লেন— আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়ল, মোড়কটা তুলে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলেন। এখন পড়া হবে না, গভীর রাতে, যখন মাত্র দুজন, রূঢ় ও কুতূহলী দিনের আলো যখন বড় বড় চোখ মেলে অসভ্যের মতন চেয়ে থাকবে না। পায়ে কাঁটা ফুটলে সূচের ভয়ে যেমন অনেকে কাঁটা পুষে রাখে তেমনি রমলা দেবী ব্যথাকে ভয়ের দ্বারা স্থগিত রাখলেন। মোড়কটি খোলবার প্রবল ইচ্ছা হল। মুখে পাউডার দিয়ে, সামনের চুল গুছিয়ে চিন্তামণিকে গাড়ি আনতে বল্লেন। গলায় স্কার্ফ জড়ালেন— ইসাডোরা ডানকান মোটর চড়ে বেড়াতে যান, যাবার সময় ঝিকে বলে যান যে আর ফিরবেন না— সেই গাড়িতে স্কার্ফ জড়িয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। 'চিন্তামণি, আজ খাব না, তোমরা খেয়ে নিও, বিজনবাবুর বাড়ি চল।' কেবল খাওয়া আর খাওয়া, রাস্তার দুপাশে খাবারের দোকান, দোকানে খাওয়া ভালগার ব্যাপার, বড় বড় বাড়ি, আকাশ আর মানুষের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে, মোটরের ভিড়ে পায়ে হাটা বন্ধ হল, অভাব কমিয়ে বেশ আনন্দে থাকা চলে। পুরুষে পারে না, কষ্ট হয়, পা টনটন করে, ঠাণ্ডা লাগে, সর্দি হয়, চোখ করকর করে। চা-এর দোকানে 'গোকুলচন্দ্র' গানটা বাজছিল— 'যোগিনী হইয়ে যাব সেই দেশে', কোন দেশে ? সেখানে পথে ধুলো, গাছের পাতা সবুজ নয়, নিরুদ্দেশ। বিজনদের গলির মুখে গাড়ি থামতে রমলা দেবী ড্রাইভারকে সেখানে থাকতে বলে নিজে নেমে পড়লেন।

সুজনকে তার ঘরে না পেয়ে রমলা দেবী বিজনের ঘরে গেলেন। সে এখনও শুয়ে। জর ছেড়েছে এই সেদিন। পূর্বদিকের ঘর, নানা রকমের খেলা জেতার চিহ্ন বর্তমান, ছবিগুলো সব টেনিস খেলোয়াড়ের— টিলডেন, কোশে, বোরোট্রা, লাকস্ট লাংলার। সব ছবিই ভঙ্গির, টিলডেনের গড়ন বিশ্রী, লম্বা লম্বা হাত পা, মুখটাও তাই, সামঞ্জস্যের অভাব, মাস্টারনীর মতন।

'বিজন, তোমার টিলডেন মোটেই সুশ্রী নন।'

'তোমাদের কেবল ঐ এক আছে, কে সুশ্রী, আর কে বিশ্রী।'

'আমরা মুখে বলি, তোমরা কাজে দেখাও— নির্বাচন ক'রে।'

'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।'

'খেলেই ঐ রকম চেহারা— বিশেষজ্ঞের মতন।'

'কিন্তু রমাদি, আমি হ'তে চাই বোরোট্রা— তার মতন খেলতে, তার মত হাসতে, যেদিন পারব সেদিন সত্যি মানবজন্ম সার্থক হবে। কী ফুর্তি লোকটার, যেন elan vital রূপ নিয়েছে, আম্পায়ার পয়েন্ট দিলে, নিলেনা, ছাথ, কেমন বেরে ক্যাপে মানিয়েছে— সমগ্র ফ্রান্স তার দিকে চেয়ে আছে, জ্রক্ষেপ নেই, যেন ব্যাণ্ডমানের ভাই! রমাদি, একেই বলে যৌবন, একেই বলে প্রাণশক্তি। তা নয়, এদেশের লোকেরা যেন ঝিমুচ্ছে, আফিম খেয়ে খেলছে। কেবল পয়েন্ট পাবার চেষ্টা, লব্ আর লব্. সেলিমের মত খেলতে চাই না, অত বুদ্ধি চাইনা আমি। আফিম দেশ থেকে তুলে দিতে হবে— আমাদের ছেলেরা টেনিস কোর্টে নামে যেন ঘুম থেকে উঠেছেন। যেমন ছেলে দেশের, তেমনি মেয়ে,— লীলা কত ছোট্ট দেখেছ? তুমিও যেন কী হয়ে যাচ্ছ।'

'কিন্তু কোশে?'

'কোশের কথাই আলাদা— ও হল জিনিয়াস— না হলে সার্ভিস লাইনে দাঁড়িয়ে কেউ সিংগল্স খেলে, সেইখান থেকে হাফ ভলিতে ড্রাইভ করে! ও একটা কল, অদ্ভুত কল, ভূতে পাওয়া কল, রোবো।'

'ওর খেলাই ভাল লেগেছিল সাউথ ক্লাবে।'

'ওঃ সে খেলা খেলাই নয়, কার সঙ্গে খেলবে? বেলে খেলা, কিন্তু তুমি যে বলছিলে অষ্টিনের খেলা আরো ভাল লাগে? ইতিমধ্যে মত বদলেছে তা হলে? অষ্টিনের কচি মুখ দেখে বুঝি মায়া হয়েছিল তখন? এখন সে মায়া কোথা গেল?'

'ভূতে পাওয়া লোকের খেলা ভাল লাগে, ছেলে মানুষের খেলা ভাল লাগে না! আচ্ছা, লাংলা কেন অত লাফায়? তোমার জেনী বেশ মরাল গমনে চলে।'

'আবার ঠাট্টা। কেবল ঐ কথা! অন্য কথা কইতেই জাননা তোমরা? ফের যদি জেনীর নাম কর তাহলে আর— দেখবে মজা! আর খেতে ইচ্ছে হবে না।'

'বিজন, তোরা আজকাল হয়েছিস কি? মেয়েদের অত ঘৃণা করতে শিখলি কবে থেকে? অথচ····'

'যেদিন থেকে ভালবাসতে শিখেছি····তোমাকে, তোমাকে।'

'তা বোঝা গিয়েছে কত দরদ ভাই-এর।'

'কিসে বুঝলে?'

'অসুখের মধ্যে যার নাম করছিলে তার মধ্যে র-ও নেই মা-ও নেই।'

'আবার! মাথা ধরবে।'

'ভালই হবে, দাদা ও দিদির আদর খাবে— কাকাবাবুকে ভাবিয়ে তুলবে—

ম্যাচ খেলাও আর হবে না।'

'আচ্ছা, রমাদি, ম্যাচ খেলা হবেনা?'

'হবে তাডাতাডি সেরে নাও।'

'আমার গায়ে জোর এসেছে, রোজ যদি বেডাতে পাই তাহলে তাডাতাড়ি সেরে যাব। আজ সন্ধ্যাবেলা নিয়ে যাবে ত?'

'সন্ধ্যাবেলা পারব না, এখনি চলনা, ঘুরে আসি। থাক, রোদ লাগবে।'

'না লাগবে না, আজ দু'সপ্তাহ জ্বর ছেড়েছে, তবু রোদ লাগবে। আমি কি ননীর পুতুল যে গলে যাব? অত শীগ্‌গির আমাদের মাথা ধরেনা। এখুনি যাব। চল আমার র‍্যাকেট দুটো ষ্ট্রিং করতে নিয়ে যাই, দেশী র‍্যাকেটে আর জীবনে খেলব না, ষ্ট্রিং করতে গেলেই বেঁকে যায়। তোমরা যাই বল বিলিতী র‍্যাকেটের ও দোষ নেই; স্বরাজ পেলেও আমি বিলিতী র‍্যাকেটে খেলব। তার মেজাজই আলাদা, তাতে বল পডলে লাফিয়ে ছুটে যায় আপনা হতে, দেশী র‍্যাকেট ও গাটের দোষ ঐখানে— ঠ্যালা মারলে তবে বল ছুটবে।'

'যে রকম বিলিতী জিনিসের গুণ গাইছিস তাতে বিলেত গেলে মেম বিয়ে ক'রে আনবি। এখানে থাকলে আংলো-ইণ্ডিয়ানই জুটবে।'

'বেশ ত ফিরিঙ্গীতে অত ভয় হয় যদি, বলছি ত, বাবাকে বুঝিয়ে বিলেত-পাঠাওনা, এই বেলা যাওয়াই ভাল, ছেলেবেলা থেকে পডলে, খেলতে পেলেই ত ভাল হবে। আচ্ছা ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স ও ব্লেজার পরব?'

'এখন? লোকে হাসবে না? আচ্ছা পর, এই বয়সেই তোদের মানায়।'

'টেনিসের পোশাকই সব চেয়ে ভাল, গলা খোলা শার্ট, সাদা ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স, সবুজ কার্পেটের মত ঘাস— কালো লোকদেরও সুন্দর দেখায়।'

'সব লোকে পরে না কেন বলতে পারিস?'

'তা বুঝি জান না? এ যে কৌপীনের দেশ, সকলেই হবু-সন্ন্যাসী। তা ছাডা সকলে কি টেনিস খেলতে পারে? টিলডেন বলেছেন, ক্ষমতাটা ঈশ্বরদত্ত, অবশ্য অভ্যাস চাই, ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস না করলে চলে না। এ দেশে কি করে ভাল খেলা সম্ভব বল? কেবল পডা, জোর আড্ডা দেওয়া আর লম্বা চওডা কথা কওয়া; ভাল ছেলের মানেই তাই, যে খেলে না, বই পড়ে আর মুখস্থ বিদ্যে আওড়াতে পারে। দেশের সর্বনাশ হল এদের জন্য।'

'যাবে ত চল, গাড়িটা মোড়ে আছে, ডাকি।'

'না ডাকতে হবে না, ওটুকু হাঁটতে পারব।'

'পারবে? হাঁটাই ভাল, ব্লেজার পরা ছেলের সঙ্গে আমার হাঁটতে ভালই লাগে। ব্লেজারটা পরে নাও, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।'

'এই বয়েসে রোদ্দুর লাগবে। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, উলটো-পালটা কথা কইছ।'

মোটর যখন কলেজ স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছে তখন একটা দোকানের সামনে রমলা দেবী গাড়ি থামাতে বল্লেন। ইকমিক্ কুকারের দোকান, রমলা দেবী একটি ছোট্ট কুকার কিনে গাড়িতে বসলেন। বিজন জিজ্ঞাসা করল, 'এ আবার কি খেয়াল রমাদি, আমাকে রোগী বানিয়ে ছাড়বে দেখছি— আমার কুকারের রান্না পানসে লাগে।'

'তোমার জন্য নয় মশাই, অনেকের পানসে খেতে ভাল লাগে।'

'তাঁরা আলোচাল ঘি ও নিরামিষে অভ্যস্ত, মহাপুরুষ সব। খাব না।'

'খেয়ো না।'

'কাকে পাঠাবে ?'

'আমার কে আছে যাকে পাঠাব ?'

'কি জানি কোন ভাগ্যবান পাবে। তোমার ছেলেমানুষী বুঝতে আমার দেরি আছে। চল গঙ্গার ধারে যাই।'

গাড়ি চলল গঙ্গার দিকে। বহুবাজারের জনস্রোত পশ্চিম দিকে, ট্রামে ও পদব্রজে চলেছেন সব লালদিঘীর অফিস ভরাতে, চেয়ারের পিঠে কোট ঝোলাতে, অন্নের সংস্থান করতে। জনস্রোত আবার পাঁচটার পর থেকে পূর্ব দিকে ফিরবে। মানুষের জোয়ার ভাঁটা। ফেরবার সময় মুখে রোদ্দুর লাগে না এই যা, নচেৎ জঘন্য এই ভিড়ের টান। মুখে রোদ্দুর লাগলে এই সব মুখে কালসিটে পড়ত। গৌরবর্ণ যাঁরা তাঁরা তামাটে হতেন, সন্ন্যাসীদের মতন। জনস্রোতের প্রত্যেকেই কেমন সংসারী, পকেটে টিনের কৌটায় খাবার ও পান গৃহিনীরা ভরে দিয়েছেন, ফেরবার সময় সকলেই স্ত্রীপুত্রের জন্য কিছু না কিছু কিনে নিয়ে যাবেন। মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকা।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর মোড়ে রমলা দেবী বল্লেন, 'বিজন, একটা কাজ মনে পড়ে গেল, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তুমি গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে এস।' স্বরটা এতই দৃঢ় যে বিজন আপত্তি করলে না। গাড়ি ফিরে রমলা দেবীকে নামিয়ে দিলে।

'রমাদি তোমার অসুখ করছে ?'

'না।'

'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে।'

'বড় গরম, বেলা হয়ে গিয়েছে, অফিসের লোকজন যাচ্ছিল দেখলে না ?'

'তাতে আর কি হয়েছে ? আমিও বাড়ি ফিরি।'

'তাই ফের, ব্লেজার পরে কষ্ট হচ্ছেনা ?'

'না, কেন ?'

'তোর গায়ে ব্লেজার দেখে আমার গরম হচ্ছে। এ দেশে খালি গায়ে চলে।

বিকেলে এস, গাড়ি পাঠিয়ে দেব।'

'তুমিই এস না ?'

'বাড়ি থেকে বেরুতে ইচ্ছে করছে না।' গাড়ি বিজনকে পৌঁছাতে গেল।

শোবার ঘরে বরাবর গিয়ে রমলা দেবী বিছানার ওপর শুয়ে পড়লেন। পাখাটায় হাওয়া হয় না, মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল, মেন্থপিপের কোণ রগে ও কপালে ঘসতে লাগলেন, কপাল থেকে সিঁথিতে, ধীরে থেকে জোরে; সিঁথির ধারে খুব ছোট্ট ছোট্ট চুল, আঙুল দিয়ে বড় চুলে বিলি কাটতে লাগলেন। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, চোখ বুজে এল ঝাঁজে, ডান হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন, শাড়িটা দেহকে সম্পূর্ণ আবৃত করছে না মনে হওয়াতে বাঁ হাত দিয়ে ঠিক করে নিলেন। ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারটা বাজল— মিষ্টি আওয়াজ, পর পর তিন পর্দায় বাঁধা, গির্জার ঘণ্টার মতন। ঘড়িটা বিবাহের যৌতুক, বিজনের বাবার। ডান হাত দিয়ে সিঁথিটা ঘষতে লাগলেন। মন্দিরে আরতির সময় শাঁখ ঘণ্টা কাঁসর ঝাঁঝর বাজে, ছেলেবেলা মন্দ লাগত না, এখন মাথা ধরে, তবে মন্দ লাগে না। কবি লিখেছেন, জাপানী মন্দিরের বাদ্যে শব্দের আভিজাত্য আছে, একলাই অবকাশকে পূর্ণ করে, সাহায্যের ভিখারী নয়, শুদ্ধ স্বর। জাপানের ফুজিয়ামার মতন। ও! তাই লিখেছে! ছবিটা পরিচিত, চীনে হোটেলে দেখেছেন, সমগ্র নিসর্গকে উচ্চ মস্তকে একাকী জয় ক'রে আছে— বাকী সব অবসর। ফুজিয়ামা ভাল, না গৌরীশৃঙ্গ, কাঞ্চনজঙ্ঘা? আত্মীয়পরিবৃত হয়েই যাদের গৌরব? খগেন-বাবুর আদর্শ ফুজিয়ামা, তাঁর বিশ্বাস মানুষ পৃথক হয়ে জন্মায়, মানুষে-মানুষে সম্প্রীতি দূরত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল মানুষ কেন? সুজন বলছিল বিজ্ঞানের মতে অণু-পরমাণুর মধ্যেও দূরপনেয় অবসর। তবু পরমাণু মিলে অণু হচ্ছে ত! যদি সত্য হয়, তা হলে কি কষ্ট এই অনুভূতিতে, সারা জগৎ কাঁদছে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে, দূরত্ব ভাঙতে, কিন্তু পারছে না। এ কি বিরোধ! ইচ্ছার সঙ্গে নিয়মের। কিন্তু মিলতেই হবে— না হলে সমাজে বিবাহ হয় কেন? কি লিখেছেন 'হিন্দু বিবাহের আদর্শ কি বলুন ত?' বিবাহের আর আদর্শ কি? ও ত আদেশ, হিন্দু-বিবাহ বলে পৃথক কিছু আছে না কি? কে জানে! যেখানে মিলনের কোন আকাঙ্ক্ষাই নেই, মিলন অসম্ভব, তার নামই হিন্দু-বিবাহ।

ইকমিক কুকারের ভাতে ফ্যান, মাগো সে ফ্যান গলান গেল না, অথচ সব মেয়েরাই পারে, ডাল ভাতে ড্যালা হয়ে গিয়েছে— ডাল ভিজিয়ে বোধ হয় ভাতে

দিতে হয়। একেবারে অকর্মার ধাড়ি। কী খেয়াল গেল। ছেলেমানুষী। হোকগে—বেশ না হয় ছেলেমানুষী করা গেল— অত পারা যায় না। কিন্তু খাওয়াও যায় না। 'চিন্তামণি এগুলো নিয়ে যাও, ফেলে দাওগে।' চিন্তামণি নিয়ে গেল, রমলা দেবী দু'খানা বিস্কুটে মার্মালেড মাখিয়ে খেলেন— কমলালেবুর রং, সন্ন্যাসীদের আলখাল্লার মতন। বড় ইচ্ছা হচ্ছিল মোড়কটা খুলতে। কিন্তু ভয় হল পাছে লেখা থাকে, পাছে লেখা থাকে আর আসবে না, কাশীতেও না, পাছে লেখা থাকে সেই তার উন্নতির অন্তরায়। দরকার নেই খুলে, রাত্রে পড়তে হবে, যখন সব নিস্তব্ধ। বিজন আসবে বিকেলে। ড্রাইভারকে ডেকে তিনটের সময় বিজনকে আনতে হুকুম করলেন আর চিন্তামণিকে বল্লেন সাড়ে তিনটেয় চা-এর সরঞ্জাম রাখতে। দরজা বন্ধ ক'রে, সবুজ মেজের ওপর শুয়ে পড়লেন।

ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে আসবার পরই বিজনের আওয়াজ পেলেন, 'রমাদি, সুজনদাকে ধরে এনেছি।'

'তোমরা বোসো, আসছি।' বেশ পরিবর্তন ক'রে রমলা দেবী বসবার ঘরে এলেন। বিজন সুজন উঠে দাঁড়াল, রমলা দেবী হাসিমুখে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

বি: 'রমাদি, এখন তুমি কেমন আছ? যে রকম গম্ভীর হয়ে আধ-রাস্তা থেকে বাড়ি ফিরলে তাতে ভয় হয়ে গেল বুঝিবা অসুখ করেছে।'

র: 'কোন দিন অসুখ করতে দেখেছ?'

বি: 'আমারও কোন দিন অসুখ করতে দেখেছ?'

র: 'তোমাতে আমাতে অনেক তফাত।'

বি: 'তুমি সেবা করলে, আর আমি সেবা খেলাম— এই যা তফাত।'

র: 'প্রতিশোধ নিও।'

সু: 'যদি আপনার অসুখ হয় বিজন বড়ই কৃতজ্ঞ হবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেয়ে!'

বি: 'না ঠাট্টা নয়, বলনা রমাদি, তোমার শরীর খারাপ হয়নি ত?'

র: 'না গো বাবু নয়— দেখছিস না কেমন হৃষ্টপুষ্ট?'

সু: 'চেহারা দেখে মনের অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে শক্ত।'

র: 'আমার ভুল হয়েছিল, মনোবৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কথা কইছি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার মানসিক অবস্থা মঙ্গল।'

সু: 'মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না।'

র: 'ঘুম থেকে উঠলে অনেককে ঐ রকম খারাপ দেখায়। বেশ তর্ক করতে শিখেছ ত সুজন।'

বি : 'শিখবে না, গুরু কে!'

র : 'গুরু কে?'

বি : 'জান না বুঝি!'

সু : 'মনের খবর যখন পাওয়া যায় না তখন দৈহিক ইঙ্গিতের আশ্রয় খুঁজি, দৈহিক প্রক্রিয়ার সন্ধান যখন পাই না, তখন মানসিক বিশ্লেষণের সুবিধা চাই। দেহ ও মন বিচ্ছিন্ন নয়, বোঝবার জন্য যখন যা সুবিধা।'

বি : 'সুজনদা, খগেনবাবুর মত হেঁয়ালি করে তর্ক কোরো না, চা খেতে এসেছ, গল্প কর, চা খাও।'

র : 'বিজন, টেনিস খেলিস বুদ্ধির জোরে, না দেহের জোরে ও মনের জোরে?'

বি : 'আমি তোমাদের সঙ্গে টেনিস আলোচনা করব না, জীবনে তোমরা র‍্যাকেট ধরনি টেনিসের মর্ম কি বুঝবে? কোথায় গিয়ে তর্ক পৌছবে আমার জানা আছে, মেয়েরা তর্ক ঠেলে তোলে সেই প্রেমের কোঠায়। তোমরা তর্ক করতেই জান না।'

র : 'এটা বুঝি নিজের কথা!'

বি : 'বই-এর মুখস্থ বুলি খগেনবাবু ও তাঁর শিষ্য সুজনদার মত আওড়ানর অভ্যাস আমার নেই। আমি সাধারণ মানুষ, খাই দাই, খেলাধুলা করি, ওয়েলস্ পড়ি, বাঁশি বাজাই, টেনিস খেলি— ব্যস। নিশ্চয়ই নিজের কথা। তুমি শুনেছ এ-সব কথা ইতিপূর্বে?'

র : 'না।'

বি : 'যে রকম ভাবে 'না' বল্লে তাতে মনে হয় হাঁ-ই বলা হল। তোমাদের হাঁ-ই না, আর না-ই হল হাঁ, মাদ্রাজীদের ঘাড় নাড়ার মতন। একবার কি হয়েছিল জান রমাদি! সাউথ ক্লাবে মাদ্রাজীরা খেলতে এসেছিল, চা-এ নিমন্ত্রণ করি। জিজ্ঞাসা করলাম, চা দেবো? কৃষ্ণস্বামী ঘাড় নাড়লে, আমি চা দিলাম না, সকলেই ঘাড় নাড়লে, আমি মহা অপ্রস্তুত, শরবত পাই কোথায়? লেমনেড আনলাম, প্রথম একজন বল্লেন, 'লেমনেড খাব না, চা খাব— তারপর আর একজন তারপর আরো একজন, চা দিলাম, লেমনেডগুলো 'বয়'রা খেলে। তখন বুঝলাম হাঁ মানে না, না মানে হাঁ।'

সু : 'সেই থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে মেয়েদের হাঁ মানে না, না মানে হাঁ। লজিকটা প্রত্যেক ছেলের পড়া উচিত, নচেৎ কথাবার্তার মধ্যে বালসুলভ চপলতা এসে পড়ে। অমৃতম্ খাবার লোভ নেই। রমলাদি, চা আনতে বলুন।'

র : 'সু, তোমার বাড়াবাড়ি। ও কি মন্দ বলছে?'

সু : 'রমলাদি, কেন কাঁদাচ্ছেন ওকে ? আবার জ্বর আসবে।'

বি : 'গ্যাখ সুজনদা, প্রতিজ্ঞা না রাখতে পার ভদ্রতা রাখ।'

সু : 'মাপ কর ভাই, তোমাকে জ্বালাতন না করার প্রতিজ্ঞা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম, আমার স্মৃতিশক্তি কমে আসছে।'

বি : 'আরো বাজে বই পড়! কোন নতুন আইডিয়া মাথায় আসবে না— মাথা খারাপ হয়ে যাবে— খগেনবাবুর মতন।'

র : 'সেই জন্য বুঝি পড়িস না ?'

বি : 'জীবনটাকেই বড় ক'রে দেখা আমার অভ্যাস।'

সু : 'জীবন! অভ্যাস!'

বি : 'ধর্ম।'

সু : 'ধর্ম!'

বি : 'যাই বল, জীবনটা আইডিয়া নিয়ে খেলা নয়, তার চেয়ে ঢের কঠিন কাজ।'

সু : 'টেনিস খেলার মতন!'

র : 'চুপ কর না, বলতে দাওনা ওকে।'

সু : 'চুপ করলাম, একদম চিত্তরহিত!'

বি : 'সুজনদা, অমন গম্ভীর হোয়ো না, সহ্য করতে পারি না', চোখ কোঁচকাতেও শিখেছ দেখছি।

সু : 'এক রমাদির আদর খাওয়া ছাড়া আর কি সহ্য করতে পার ?'

র : 'হাঁরে বিজন, আইডিয়া নিয়ে খেলা নয় কেনরে ? আর এক টুকরো চিনি নে।'

বি : 'আচ্ছা দাও, বলছি। কি জান, বই-এর পাতা উল্টে গেলাম, ইচ্ছে হল বন্ধ ক'রে দিলাম, ব্যস চলে গেল আইডিয়া, আবার খুললাম— এল, আবার বন্ধ করলাম, ফিরে গেল ; কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলে কোন ঘটনা বন্ধ করতে পার ? পার না, চলেছে ত চলেইছে, যেন একটা— একটা....'

সু : 'লং র‍্যালী।'

বি : 'কথা কওয়া আমার চলে না তোমাদের সঙ্গে।'

সু : 'অন্তত ভাষার বৈচিত্র্য না অর্জন করা পর্যন্ত।'

বি : 'তোমার গুরুও ত কথা কইতে কইতে আটকে যান— লাফিয়ে যান— Cataract of Lodor-এর মত!'

সু : 'এই ত বিজন বেশ সাহিত্যিক হয়ে উঠেছে! রমাদি ভুল বুঝো না ওকে— ও কবিতাটির আবৃত্তি শুনেছে ইনষ্টিটিউটে। তা হলে বিজন, তোমার মত

হল বই আর আইডিয়া একই বস্তু ?'

বি : 'তুমিই তা হলে কথা কও।'

র : 'সেই ভাল। স্বজন তোমার কি মত ?'

স্ব : 'জীবন সম্বন্ধে আমার কোন মতামত নেই, বিজনের সম্বন্ধে আমার মতামত আছে, সেটা এতই সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় যে তাকে বিশ্বাস বলতে কুণ্ঠিত হব না। আমার বিশ্বাস এইরূপ, জীবনকে সাউথ ক্লাবের বেড়ার বাইরে টেনে না আনলে সেই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ অর্বাচীনতার নামান্তর। অত বড় বিষয়ে কথাবার্তা কইবার ওর অধিকার আছে স্বীকার করি না। এও বলতে রাজি যে জীবন সম্বন্ধে ওর মতামত গড়ে ওঠেনি, কারণ, বেচারি সুযোগ পায় নি। ওর জীবন এখন টেনিস কোর্টের চুনের সমান্তরাল রেখার মধ্যে আবদ্ধ।'

বি : 'দাদার অনেক সুযোগ হয়েছে জানি।'

র : 'বলই না স্বজন।'

স্ব : 'আমি বিনয়ী। আপনি বলুন।'

র : 'আমি অজ্ঞ, সত্যই জানি না। দুটো কালো পর্দার মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ। এইবার তোমরা চা খাও। আজ নিজে ভাই কিছু তৈরি করতে পারিনি।'

'বি : 'ঐ গ্যাখ। শরীর নিশ্চয় খারাপ হয়েছে। তুমি ঢাকতে গেলে পারবে কেন আমার কাছে।'

স্ব : 'মেয়েরা মনের কথা বিজনের কাছে গোপন রাখতে পারেন না। ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। স্ত্রীজাতির মনের কথা ঢাকবার চেষ্টা হল ঢাকনা উত্তোলন করার নিমন্ত্রণ মাত্র— এই হল বিজনের মত।'

বি : 'আমার মতামত কী তোমাকে প্রকাশ করতে হবে না।'

স্ব : 'ভুল বিচার করলে। প্রকাশ নয়, স্বপ্রকাশ।'

বি : 'সাহিত্যিক মশাই থামুন, কেবল কথার প্যাঁচ, খগেনবাবুর শিষ্য বটে! কি ক'রে হলে ? তবু যদি বেশি আলাপ থাকত!, মহাভারতের একলব্য বিংশ-শতাব্দীতে জন্মেছেন!'

স্ব : 'রমাদি, বিজন শিশুদের মহাভারত পড়েছে।'

চিন্তামণি চা ও খাবার নিয়ে এল। বিজনকে খানকয়েক বিস্কুট ও ফল দিয়ে রমলা দেবী বাকি খাবার স্বজনের সামনে রাখলেন।

স্ব : 'নিজে কিছু খাবেন না ?'

র : 'না দেরিতে খেয়েছি। বিজন, চুপ করলে কেন ? তোমার কথা শুনতে আমার ভাল লাগে।'

স্ব : 'বাস্তবিক রমলাদি ওর প্রাণময়তা সকলকে আচ্ছন্ন করে। কথাই হল ওর

প্রাণ। কথার মধ্যে একটু অন্য কিছু মেশানো থাকলে মন্দ হত না। বলা বাহুল্য আমি একটু ঘি-এর পক্ষপাতী।'

বি: 'খগেনবাবুর মতন বুদ্ধিতে আমার কাজ নেই সুজনদা। কচকচানি প্যাঁচ কাটা আমার ধাতে বসে না। রস সব শুকিয়ে গেছে ভদ্রলোকের। যার স্ত্রী মরেছে মাত্র দুদিন আগে— মাপ কোরো তোমরা— সে কী করে তর্ক করে। বলবে তোমরা, চিন্তা যাঁরা করেন তাঁদের স্বভাবই ঐ। ও রকম thoughtful লোকের সংস্পর্শে নদীও শুথিয়ে যায়, সাবিত্রীদি ত কোন ছার। তোমরা কিছু মনে কোরো না, তোমাদের হিরোকে আমি নিন্দা করছি বলে। কিন্তু ও কী রকম চিন্তা, যার তাপে সব মুসড়ে পড়ে, নিজের রস, ভাবগুলো পর্যন্ত?'

সু: 'চা দেব?'

বি: 'না সুজনদা, তুমি বল। না হয় রমাদি তুমিই বল।'

সু: 'আমি বলছি। খগেনবাবুর চিন্তাগুলি সব এগিয়ে চলেছে, জীবনের সঙ্গে তিনি সমগ্রভাবে চিন্তা করেন, দেহ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে, চিন্তাব্যবসায়ীর মতন নয়। মস্তিষ্ক তাঁর সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত।'

বি: 'অত বাজে কথা কন কেন?'

সু: 'তোমার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে, তাঁর নিজের পক্ষে নয়। নিজে তাঁকে কতটা বোঝ এইটাই তোমার প্রশ্ন যদি হয়, তা হলে তার উত্তর সহজ— তোমার নিজের স্তরের ওপরেই সেটা নির্ভর করবে। আর তিনি কি প্রকৃতির যদি বোধ করতে চাও, তা হলে উত্তর একটু কঠিন হবে।'

বি: 'ধন্যবাদ। বুঝে কাজ নেই। চা খেতে এসেছি চা-ই খাই, তর্ক করব না। চুপ করলাম।'

র: 'কটা বাজল?'

বি: 'এখন যেতে বলছ?'

র: 'না।'

বি: 'ছ্যাখ সুজনদা আমি তোমার মত শত উপদেশেও ঐ রকম অ-স্বাভাবিক ও আত্মম্ভরী হতে পারব না।'

র: 'একটু পরে ফল দেব?'

বি: 'পারব না— মানুষের মধ্যে রস থাকা চাই, শুষ্ক কাষ্ঠ উনুনের প্রয়োজন। আমার মনে হয় খগেনবাবু কখনও সাবিত্রীদির সঙ্গে প্রাণ খুলে হাসেন নি, সর্বদাই তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছেন। সর্বসাধারণকে তিনি দেখতে পারেন না— কেন না তাতে তাঁর দাম্ভিকতায় আঘাত পড়ে, ভাবেন, "হ্যাঁ! আমার সঙ্গে ওদের একমত! তার চেয়ে উল্টো কথা বলি।"

র : 'চা?'

বি : 'দাও। ভাবছ, কবে দেখলাম। এই সেদিন আলাপ হয়েছিল।'

র : 'কবে?'

স্ব : 'আপনি যে দিন দমদমা যান সেই দিন সকালে। সন্ধ্যায় কাশী চলে গেলেন।'

বি : 'একদিন গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক কারুর যে মতামত আছে, কী থাকতে পারে বিশ্বাস করতে চান না। যে বই বলি ভাল লাগে, অমনি লেকচার দিয়ে প্রমাণ করেন বইটা খারাপ, যেই বলি নতুন ধরনের ছবি ভাল লাগে না, অমনি— সে সব কথা মনে নেই, যেই বল্লাম ডিমক্রেসী, অমনি বল্লেন, আব্দারে ছেলে, যেই স্বাধীনতার কথা উঠল, অমনি বল্লেন, নিজের অতিরিক্ত কোন শক্তির বাধ্যতা স্বীকার করাই জগতের পক্ষে মঙ্গল, যেই সাম্য— অমনি, সাম্য নেই। আর মৈত্রীর বেলা তুমি রমাদি যদি একবার তাঁর মুখ দেখতে তা হলে না-হেসে থাকতে পারতে না— তর্ক, বুদ্ধি সব লোপ পেল— বল্লেন, মানুষ একলা, তবে চায় বন্ধুত্ব, একেবারে আমতা-আমতা····এ লোকের ঐ রকম হবে না ত কার হবে? বেঁচে থাকলে ভদ্রমহিলা পাগল হয়ে যেতেন। আমার তাঁকে বড় ভাল লাগত— এত লক্ষীটি ধরনের! ভদ্রলোক বুঝি কাশী গেলেন! স্বজনদার তাঁকে বড় ভাল লাগে, রমাদি।'

র : 'তাই নাকি ভাই? স্বজন ভারী দুষ্টু ছেলে, খুব বকে দেব ওকে।'

বি : 'তোমার বকা আমি জানি— এই ধমকে এই মাপ চাওয়া— তাতে ছেলে খারাপ হয়।'

র : 'ঠিক বলেছ বিজন— তাতে ছেলে আব্দেরে হয়। বিজন, আচ্ছা বিজন যে একলা থাকতে চায় সে বুঝি খারাপ লোক?'

বি : 'নিশ্চয়ই, সে লোক স্বার্থপর, দাম্ভিক। এ জগতে মানুষ একলা থাকতে পারে না, মানুষ একলা থাকার জন্য জন্মায়নি। জগতে পার্টনার চাই।'

স্ব : 'Mixed-এ। বিজন খুব ভাল Mixed Doubles খেলতে পারে বুঝি জানেন না? পার্টনার সার্ভিসে ভুল করলেও বলে My fault! আর যদি ওর মিষ্টি sorry শোনেন তা হলে····অসম্ভব একেবারে সামলানো নিজেকে।'

বি : 'আর বুঝি singles পারি না? এবার দেখ, আদত খেলা ঐ!'

স্ব : 'ছিঃ ছিঃ বিজন, ওখেলা খেলা না, এ জগতে কেউই singles খেলবার জন্য জন্মায়নি, যে খেলে সে স্বার্থপর, আত্মম্ভরী অতএব খারাপ খেলোয়াড়।'

বি : 'ঐ খানেই ভুল করলে, singles-এতেও অন্য একজনের সঙ্গে খেলতে

হয়, তবে সে নেটের উলটো দিকে থাকে। কখনও খেলনি, জানবে কোত্থেকে?'

র: 'এ কোর্টে একলা ত?'

বি: 'কৈ সুজনদা, একেবারে চুপ, উত্তর দাও।'

সু: 'সময় পাচ্ছি নে? উত্তর দেওয়া অসম্ভব, অতএব অন্যায়; চল বেড়াতে যাই।'

বি: 'রমাদিও চল, র‍্যাকেট সকালে আনা হয় নি।'

সু: 'তোমরা যাও।'

র: 'সুজনের কোথাও দরকার আছে না কি?'

সু: 'না, অমনি, থাক।'

বি: 'বলই না বাপু, ভারি গুজগুজে লোক। একেবারে খগেনবাবুর হাতঝাড়া আশীর্বাদ পেয়েছ।'

র: 'কেন তখন থেকে বাজে কথা কইছ, বিজন?···কি দরকার আছে সুজন তোমার?'

সু: 'বই-এর দোকানে, পরে হবে। চল বিজন, আগে টেনিসের দোকানেই যাই। তোর ঠাণ্ডা লাগবে না ত?'

বি: 'লাগে লাগুক গে।'

সু: 'মাফলার আন নি কেন? চল বাড়ি থেকে নিয়ে যাই। আচ্ছা, গিয়ে কাজ নেই, কোটের কলারটা উলটে নে। সত্যি, তোর আবার ম্যাচ খেলতে হবে, মাদ্রাজী ও পাঞ্জাবীদের হারাতে পারবি ত?'

বি: 'না পারব না।'

র: 'চল।'

···বিজন তাড়াতাড়ি নেমে সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসল দেখে সুজন জিজ্ঞাসা করলে, 'ওখানে কেন?'

'এখানেই ভাল, এঞ্জিনের তাপ পাওয়া যায়, হাওয়া লাগে না। তোমরা দু'জন ভেতরেই বোসো না।' গাড়ি টেনিসের দোকানের সামনে এল। 'তোমাদের কষ্ট ক'রে নামতে হবে না' বলে বিজন একাই দোকানে গেল। রমলা দেবী সুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে টেনিসের বই পাওয়া যায়? বেশ তা হলে ওকে একটা singles খেলার বই কিনে দাও গে।'

'ও নেবে না, এখন।'

'তবে কাল কিনে দিও।'

'তাই ভাল।'

'তার চেয়ে চল এখনি যাই, তোমারও দরকার আছে ত?'

'পরে হবে।'

'এখনি চল না যাই। কি বই?'

'খগেনবাবু খান কয়েক বই পড়তে লিখেছেন।'

টেনিস ব্যাট তৈরি হয়নি, বিজন দোকান থেকে ফিরে এসে বাড়ি যেতে চাইলে। রমলা দেবী সম্মতি দিলেন। সুজনও বাড়ির সামনে এসে পড়ল, 'রমাদি নামবেন?'

বিজন: 'আসা হোক না?'

র: 'এখন আসা হবে না। সু, কাল আসবে?'

বিজন চলে গেল দেখে রমলা দেবী বললেন, 'এস, কেমন? লক্ষ্মীটি।'

আট

রাত হয়েছে। চা-পার্টির সামান্য অবশিষ্ট কিছু মুখে দিয়ে রমলা দেবী শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। কথা কইতেই হয়, না হলে সামাজিকতা রক্ষা হয় না, সামাজিকতা বজায় রাখতেই হয়, নচেৎ একলা সারাক্ষণ থাকা যায় না। বিজন আর সুজন ভিন্ন প্রকৃতির, সুজনের সঙ্গে খগেনবাবুর কোথায় মিল আছে যেন, চিঠি লিখেছে···ভাল, ভাল,··· সুজন ভাল, কম কথা কয়, জীবনকে বুঝতে চেষ্টা করে। বিজনকে খোঁচানো উচিত হয়নি, ছেলেমানুষ, জীবনকে খেলা মনে করে, কিন্তু যারা বুঝেছে যে খেলা নয়, খেলা ছাড়া অন্য কাজ রয়েছে তারা খগেনবাবুর মতনই ব্যবহার করবে। মানুষের ধর্ম বুঝে তার সমালোচনা করা উচিত। বিজনের প্রাণ ছুটেছে অবাধ গতিতে, কোন বাধা নেই তার স্রোতের মুখে, তাই সে অনর্গল কথা কয়। খগেনবাবুর জীবনে বাধা পড়েছে অনেক, নিজের তৈরি বাধা হলে কী হয়। বাধা ত বটে, তাই তিনিও অনর্গল কথা কন। তবে ধ্বনি ভিন্ন প্রকারের, বিজনের হল তরাই-এর নদীর, খগেনবাবুর হল পাগলা ঝোরার। বাধা তাঁর অন্তরের, বাইরের নয় অন্তরের বাধাই বড়। পুরুষের কী মেয়েদের বাধা কি কেবল সমাজের অজ্ঞতার? সাধারণত তাই। মন ভোলানো কথা মেয়েদের সেই জন্য কইতেই হয়— কিন্তু বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না— বিজনকে ধমকানো উচিত। রমলা দেবীর মনে খানিকটা শান্তি এল। ড্রয়ার থেকে মোড়কটি বার করলেন। একটি ছোট্ট কাঁচি দিয়ে সুতো ও বাইরের কাগজ কেটে টেবিলের ওপর গুছিয়ে তুলে রাখলেন। সুজনকে কি লিখেছেন?

কাশীর রাতে নিস্তব্ধতা নেই। লোকেরা নিশাচর। দিনে ধর্ম, রাতে ভোগ। শহরের অস্ফুট ও অব্যক্ত সুর কানে আসছে। ছেলে বয়সে একবার পাড়াগাঁয়ে যাই, দুপুর বেলা মাঠে পালিয়ে গিয়েছিলাম, খোলা ধূ ধূ করছে মাঠ, ফসল বোনা হয়েছে, মাটি পরিষ্কার ও নরম ; তার ওপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হল, শুয়ে পড়লাম, বোধ হয় ঘুম এসেছিল। তন্দ্রাবস্থায় মনে হল মাটির ভেতর থেকে কলরব উঠছে, 'জায়গা ছাড় সরে যাও, ফুটতে দাও।' আমি লাফিয়ে উঠে পালিয়ে যাই— সে আজ কতদিনের কথা! কাশীর অঙ্কুরিত বাসনা আলোর কপট ধর্মকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আমার যৌবনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হল, কলরবের রেশ লেগেছে আমার মনে। বহু সাধনার মিথ্যা ভার আজ এই যাদুমন্ত্রে লঘু হয়ে গেল। আমার বাসনা হল উন্মুখ। কাশীর রাতের ভোগস্পৃহা আমাকে আক্রমণ করেছে। দিনের সাধনা, রাতের বাসনা, দিনের আদর্শ, রাতের বাস্তব, আলোর বুদ্ধি, তমিস্রার দেহ— এই কি চিরন্তন বিরোধ? বিরোধের অতিরিক্ত কি কিছুই নেই? সামঞ্জস্য কি কেবল সাহিত্যের ভাষা? এই দোলাতেই কি দুলব সারাক্ষণ? সাধনা, আদর্শ, বুদ্ধির অত্যাচারে চিত্ত আমার জর্জরিত।

সাবিত্রী চেয়েছিল সামঞ্জস্য। আমার অন্তরে বিরোধ ছিল, তাকে সেই বিরোধের ক্লেশ ভোগ করতে আমন্ত্রণ করেছিলাম। কেন সে বুঝবে? তার ইতিহাস তারই। আমার আদর্শে তাকে গড়তে চাই নি, রমলা দেবী ভুল বুঝেছেন। বিরোধ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না, তাই তাকে বলেছিলাম, 'ওগো, একটু ভাগ নেবে? হুকুম করেছিলাম সম্ভবত। সে ভাগ নিলে না। বাইরের বিরোধের বিপক্ষে সে আমাকে নিশ্চয় সাহায্য করত। কিন্তু সে বিরোধ ভয়ঙ্কর নয়, যুদ্ধের ভান মাত্র। রমলা দেবী আমার অন্তরের বিপ্লব বুঝেছেন। তারও হৃদয় আগ্নেয়গিরির মতন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, কত নিরীহ; মুখ থেকে কেবল মাঝে মাঝে গরম ধোঁয়াই নির্গত হয়, তাতে আশ্রিত ব্যক্তির আতঙ্ক হয় না, বরঞ্চ উৎসাহ আসে। আমি ধোঁয়া দেখে বিরক্ত হতাম। কিন্তু আজ আমি বুঝেছি। মনে ও দেহে কম্পন ধরেছে। রমলা দেবী আমার সহধর্মী। আমি তাইতেই সন্তুষ্ট।

রমলা দেবী হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইলেন···এইত, এইত সব বোঝে, ঠিক বোঝে, নির্ভুল। সহধর্মী যে সেইত সহধর্মিণী— কেন অসম্ভব, একবার সুবিধা আসুক! আশ্রয়? মিলবে না? খুব মিলবে।

ডায়েরির পাতা আবার পড়তে লাগলেন।

নিজের মনের কথা প্রকাশ করবার ভাষা নেই, ভাবও বেশ সাজানো নয়, তবুও লিখতে বসি। যদি সাহিত্যিক হতাম সমালোচকে বলত, লেখ কেন? কিন্তু রমলা দেবীকে বলেছি, ডায়েরি লিখব, চিঠি লিখব না। তা ছাড়া অন্তরের ভাবগুলি আজ আমাকে বড়ই পীড়িত করছে, লিখলে খানিকটা শান্তি পাব। লেখা আমার পক্ষে আত্মসংস্কার, সাধনা, সোয়াস্তি। মনটা বড়ই ভারী ঠেকছে। আজ আমার জীবনের সব চিন্তা নিতান্ত নিরর্থক মনে হচ্ছে। যেন সময় কাটবার জন্যই সব কিছু করেছি, পড়েছি, ভেবেছি। যেমন রমলা দেবী ভদ্রতা রক্ষার জন্যই হেসেছেন, সেজেছেন, উপকার করেছেন। কিন্তু আজ আমার তাগিদ এসেছে। মনের কি প্রকার গঠন হলে মানসিক ক্রিয়াকলাপ আপনা থেকেই অর্থযুক্ত হয়? আপনা থেকেই হয় কি? বোধ হয়, না। সম্বন্ধেই অর্থের উৎপত্তি। সম্বন্ধ নিজের সঙ্গে হয় না। একের মধ্যে আবার সম্বন্ধ কি? প্রতিজ্ঞাপ্রমেয় নিয়ে যে সম্বন্ধ তার অর্থ তারই কাছে যার সে-সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম না করলে চলছে না। আমার সমগ্রতার, আমার চাহিদার সম্পর্কেই সম্বন্ধ অর্থে ও তাৎপর্যে ভরে ওঠে। কেবল আমার কি? এক তরফা-সম্বন্ধ নেই, থাকলেও সে এক প্রকার দৌরাত্ম্য। এতদিন আমার ধর্ম কী ছিল? মনগড়া একটা ধর্ম আমার ছিল নিশ্চয়ই, যদিও তার রূপ আমার কাছে প্রকট হয়নি। ধর্মের প্রয়োজন আমি চিরকালই মেনে এসেছি। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান, সমাজকৃত নিয়মাবলীই স্বীকার করিনি। ভূতের ভয় থেকে যে ভগবৎবিশ্বাস তৈরি হয় তারও কোন প্রয়োজন হয়নি। ভাবতাম—আমি যেকালে বিচিত্র, আমার অভিজ্ঞতা যেকালে পর পর চলে আসছে, তখন সে বৈচিত্র্যের একটা মূলগত ঐক্য ও সূত্র থাকবেই থাকবে। অভিজ্ঞতার অন্তরে কিছু পাইনি বোধ হয়, তবু বুদ্ধির দ্বারা একটা ঐক্য সৃষ্টি করতে, একটি মালা সাজাতে গিয়েছি। অন্তরের সূত্র খুঁজে পাইনি, তাই বিশ্বাস ক'রে এসেছি বুদ্ধির সূত্রে, তাকেই ধর্ম ভেবে এসেছি। যেটা ধারণ করে সেই ধর্ম; আমার সুতোয় সাবিত্রীকে বাঁধতে যাই, তাই সে বাঁধা পড়ল না, সুতো ছিল পলকা, ছিঁড়ে গেল। ভালই হল, রজ্জুতে সর্পভ্রম মায়ামাত্র; মায়া আমার গিয়েছে। কিন্তু জীবনের কোন কাজেই স্থিরসত্য ধারণাশক্তির চিহ্ন পাচ্ছি না হঠাৎ বড়লোকের বাড়ির নতুন বৌ-এর গায়ের গহনার মতনই আমার অভিজ্ঞতা আমাকে অসুন্দর ক'রে তুলেছে, আমার দেহকে গুরু করেছে। রমলা দেবীর অলঙ্কার রমলাকে সুন্দর করে, তার দেহ কেন এত লঘু এতদিনে বুঝেছি, না খেয়ে নয়, সুন্দর সামঞ্জস্যে। রমলার ধর্ম আছে, তার অভিজ্ঞতা উত্তমরূপেই ধৃত, তার পদক্ষেপ লঘু। অধার্মিকেরাই স্থূল হয়।

এমন সময় নিজের অতিরিক্তকে যদি জানতাম তা হলে পরিচিতের সম্পর্কে এসে আমার ভার লাঘব হত, আমার জীবন অর্থপূর্ণ হত।

প্রেমে পড়লে এ-লোক কি করত? এই সব বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা মালায় গ্রথিত হত। রূপ থাকত, গন্ধ থাকত, প্রত্যেকটি ফুলের গন্ধে মনপ্রাণ পুলকিত হত, লাভের ওপর মালার রূপে মোহিত হত, ধারণ করে সুন্দর হত। এ-লোক ভালবেসে জীবনকে বাংলা দেশের মন্দির ক'রে তুলত। ভারতীয় ললিতকলায় লতায়িত চম্পক-অঙ্গুলিকে অবলম্বন ক'রে অন্তরের সৌন্দর্য যেমন বিচ্ছুরিত হয় এবং অনন্ত সৌন্দর্যের ইঙ্গিত হয়, তেমনি তাকে আশ্রয় ক'রে দৈনন্দিন জীবনের ব্যাহতশক্তি অন্তরের শক্তির আভাস দিত। এ-ব্যক্তি তাকে আপন করত প্রথমে, তারপর তাকে ছেড়ে দিত। তাকে অধীনে এনে স্বাধীন করত। স্বাধীন করত নিজের চেয়ে বড় ক'রে— আদর্শের বাইরে রেখে। এখন বুঝতে পেরেছি আদর্শ অনুযায়ী ভালবাসা পাপ, তাতে অন্যের জীবনকে অপমান করা হয় নিজের স্বার্থের জন্য, নিজেরও স্বার্থসিদ্ধি হয় না। সে আমার আদর্শকে অতিক্রম করবে— তবেই তাকে নিষ্কামভাবে— সে যা তাই হিসাবে পাব। আদর্শের কাঠামোতে মূর্তি গড়া একপ্রকারের কাম। সাবিত্রীর সম্পর্ক নঙর্থক, রমলা দেবীর সম্পর্ক সদর্থক? আমার জীবন শুদ্ধ হোক।

সে আমার আদর্শকে অতিক্রম করবে, উঁচু হয়ে নয়, সে যা তাই হবে। আদর্শের মাপকাঠিতে সাবিত্রী কতটা নিচু তারই প্রমাণ খুঁজে এসেছি, পেয়ে এসেছি। মাপকাঠি ছিল বলেই না সুযোগ পেতাম। সাবিত্রীকে বড় করতে গিয়েছিলাম ভালবেসে নয়, মাপকাঠি দিয়ে। মাপকাঠি দিয়ে মাপাই যায়, দীঘল করা যায় না। সাবিত্রীকে সার্থক করতে পারিনি— আমার আপশোস রাখবার জায়গা নেই।

বেদান্ত মানতে ইচ্ছা হয় না। সাধুজীর উপদেশ, বই পড়া সব ব্যর্থ হল। আমার প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না।

ব্রহ্মই আছেন, আর কেউ ও কিছু নেই। আত্মা কোথায় গেল? বৈদান্তিক সাধু বল্লেন, 'সোঽহংজ্ঞানী হও, তবেই তোমার আত্মার সার্থকতা।' কিন্তু অন্যের আত্মা কোথায় যাবে? তাকেও ঐ উপদেশ? এই সোঽহংজ্ঞানটি কি? অহংজ্ঞান লোপ পাওয়ান, এবং…তারপর অব্যক্ত। চিত্রকর গাছের ওপর আলো পড়েছে আঁকবেন— তাঁকে করতে হবে নানা প্রকৃতির সবুজের সমাবেশ— এই হল তাঁর সমস্যা। এখন আলোকতত্ত্বের অধ্যাপক এসে তাঁকে বল্লেন, 'সব সবুজই এক শ্রেণীর, সব রং-ই এক জাতির কম্পন, কারণ সবুজ, লাল, আলো উত্তাপ সবই

কম্পন।' হয়ত খুব খাঁটি কথা— কিন্তু এই জ্ঞানার্জনের ফলে চিত্রকরের ছবি কি স্বতঃই অঙ্কিত হয়ে যায়? ফিকে সবুজ কি আপনা থেকে সোনালী-সবুজের কোলে এসে শুয়ে পড়ে? মানুষের সম্বন্ধস্থাপন যার সমস্যা— বেদান্তচর্চাই যার উদ্দেশ্য নয়, যে জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে চাই, তার পক্ষে সোঽহংজ্ঞানী হওয়া একেবারে অসম্ভব। সম্বন্ধ ছেদ ক'রে সম্বন্ধস্থাপন করা অসম্ভব। সম্বন্ধকে মায়া কী সংস্কার বলে সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। কোন আর্টিস্টই বেদান্ত গ্রহণ করতে পারে না। আর্টের প্রাণ হল সম্বন্ধস্থাপন। বেদান্তের দ্বারা আমার সাহায্য হবে না।

তার চেয়ে সাংখ্য সন্তোষজনক। বেদান্তকে সাহসের চূড়ান্ত মনে করতাম, কিন্তু মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া কি একপ্রকার কাপুরুষতা নয়? বেদান্তের ভিত্তি অস্বীকারে, তার পদ্ধতি নেতিবিচারে; অস্বীকারে সাহস কম, নেতিবিচারে বুদ্ধির সৃজনী শক্তির প্রয়োগ কম। স্বীকারে, ইতি-বিচারে, সাহসের প্রয়োগ বেশি। স্বীকার করলেই বহুপুরুষ মানতে হয়। সাবিত্রীকে মানিনি— তার পক্ষে আমি ছিলাম বৈদান্তিক— আমার সোঽহংজ্ঞান ছিল স্বার্থপরতার নামান্তর, ছিলাম আমি egoist। কবি লিখেছেন 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।' আমি ভাবি— নেতিবিচারে, অস্বীকারে যে মুক্তি সে মুক্তি আমার নয়। বৈরাগ্য-সাধনের প্রয়োজন আছে, চিত্তশুদ্ধিতে। এই আমার ধর্ম।

সাবিত্রী আর নেই, অতএব তার সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি? সে এখন স্মৃতি— আমার স্মৃতি— নিজের সঙ্গে প্রেম করতে রাজি নই।

এবার যাকে ভালবাসব তার বিশেষ অস্তিত্ব আমি গ্রাহ্য করব। প্রথমেই গ্রাহ্য করব তার কাছে কিছু দাবি না ক'রে। দাবি করলেই নিজের করে নেওয়া হল। দাবি না ক'রে ভালবাসব। আমার ভালবাসার জোরেই সে নিজে থেকে পূর্ণ হবে। যতই পৃথক ক'রে ভালবাসব ততই সে আরো ভাল হয়ে যাবে, তার নাগাল পাব না, সে আমার আদর্শকে অতিক্রম করবে, নচেৎ— আদর্শবাদ ধাপ্পিকতায় মনভোলানো ছড়া মাত্র। শেকসপীয়র আঁকলেন হ্যামলেটের চরিত্র। কোন্ মন্ত্রবলে প্রথম দৃশ্যেই সে জীবন্ত হয়ে উঠল, তারপর, তার ওপর শেকসপীয়রের কোন হাত রইল না, হ্যামলেট চলে গেল তার স্রষ্টার নাগালের বাইরে। কোন্ অনন্ত মুহূর্তে পুরুষ-স্ত্রীর মিলনে ভিন্ন সৃষ্টি হল, স্ত্রী মা হয়ে তাকে প্রাণ দিলে, প্রসূত হয়ে প্রাণী ভিন্ন হল, কিন্তু তখনও সে প্রসূতির আশ্রিত। শিশু বড় হয়ে ভিন্ন মানুষ হল, ব্যক্তিত্ব অর্জন করলে। তখন কি এই যুবকের সমগ্র সত্তাকে সেই মুহূর্তের ক্ষণিক মিলনের মধ্যে আবদ্ধ করা যায়? সে যে তখন পিতামাতার সম্বন্ধের চেয়েও বৃহৎ। হাইড্রোজেনের দুই পরমাণু অক্সিজেনের একটির সঙ্গে মিশে জলবিন্দু, সেই

জলবিন্দুর সমষ্টিতে মেঘ, তার ওপর আলো কপাতে রামধনু, মেঘ থেকে বারিপাত, বারিপাতে ধরিত্রী শস্য-শ্যামলা। কোথায় পড়ে রইল পরমাণুর মিলন। এমনি ক'রে ভালবেসে আমার প্রেমাস্পদকে নতুনতর ক'রে তুলব। আমার প্রেম তার পরিণতির স্তর হবে, আমার সার্থকতা তার উন্নতির সোপান হবে? ভালবাসায় আমার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হল না, মমত্ব-বোধ লোপ পেল না, সমৃদ্ধতর হল। স্থাণু নয়, চলিষ্ণু ভালবাসা, যেমন এই হল আমার পুরুষসিদ্ধি।

রমলা দেবী বার বার পাতা কয়টি পড়লেন। তাঁর সর্বশরীর অবনত হল। এ কী লিখছেন! এতে লজ্জা দেওয়া হয়। সাবিত্রীর প্রতি খগেনবাবু কোন অন্যায় করেছেন রমলা দেবী মুখ ফুটে কাউকে কখন বলেন নি ত! হয়ত, ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে। কে গুরু! কে শিক্ষা দিয়েছে? আমার বিশেষ অস্তিত্ব কিছুই নেই, সবটাই আমার ছায়া। আমি অতিরিক্ত হতে চাই না— চাই না, চাই না। একলা থাকতে বড় ভয় করছে, গা শিউরে উঠছে। শিশু যেমন মা-এর কোল ছাড়া থাকতে হলে হাত পা গুটিয়ে মুড়ি দিয়ে চোখ বুজে শোয়, রমলা দেবীও তেমনি বিছানার চাদর তুলে নিজেকে আবৃত করলেন, হাফ ধরল, গা হাত পা ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল, গলা শুখিয়ে গেল। চাদরের মধ্যে শুয়ে ডায়েরির পাতাগুলি বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। বড় ভয় করছে, আশ্রয় চাই, আশ্রয় নেই, প্রশস্ত বুকের মধ্যে নীড় বাঁধা হল না, সেই সেদিন স্নানের ঘর থেকে বেরোবার সময় বুকটা চওড়া দেখাচ্ছিল, গেঞ্জি না দিলেই হত। গা'টা কেমন করে ওঠে ভাবতে গেলে, কিন্তু ভয় যায় কমে, সর্বাঙ্গ যায় শিথিল হয়ে, হাঁফ লাগে, তৃষ্ণা বাড়ে। রমলা দেবী চাদর থেকে মুখ বার করলেন, ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেলেন— কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, পুঁছতে ইচ্ছে হল না, হাত বাড়িয়ে শিয়রের জানালা দিলেন খুলে, হাওয়া, শীতল হাওয়া এল ঘরের মধ্যে। শীতল মধুর আহ্বান এই জানালার। ডায়েরির পাতা মুঠোর মধ্যে নিয়ে জানালার ধারে এসে বসলেন। রাস্তার লোক চলাচল থামেনি, তবে ভিড় নেই, মাঝে মোটরের হর্নের ভীষণ কর্কশ শব্দ নীরব অনুভূতিকে বিদীর্ণ ক'রে চলে যাচ্ছে··· হুঙ্কার যাচ্ছে সরে সরে, পিছনের নিস্তব্ধতা দ্রুতভাবে সেই ফাঁক ভরে দিচ্ছে, জাহাজ চলার পর জলের ত্রিকোণ অবসরপূরণের মত··· দূরে, অন্ধকারের মধ্যে একটা নারকেল গাছ···না ছায়া? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে হয়, খানিক দূরে ছাতের ওপর একজন লোক পায়চারি করছে, ঐ বাড়িতে অসুখ হয়েছে একটি মেয়ের, আজ রাতেই শেষ হয়ে যাবে···সুখ পেল না···আরও দূরে তেতলা বাড়িটার তিন চারটে ঘরে আলো জ্বলছে, মেস বাড়ির ছেলেরা পড়ছে,···ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে,

কপালে হাওয়া লেগে সোয়াস্তি হল। রমলা দেবী জানালা থেকে নেমে বসে ডায়েরির নতুন পাতা পড়তে লাগলেন।

বই পড়তে ভাল লাগছে না। পাতা উলটে যাচ্ছি, কী ভীষণ নেশা মানুষের। আমি বই পড়ি কেন? একলা থাকতে পারি না বলে? রমলা পার্টিতে যায়, অন্যের সেবাশুশ্রূষা করে, বাড়িতে যুবকের দলকে নিমন্ত্রণ করে, একলা থাকতে পারে না বলে। আমিও লোকের সঙ্গে মিশতে পারি না, তাই লোকের লেখা পড়ি। একই কথা। লেখা ও মুখের ভাষা একই বস্তু, লেখা কেবল দ্বিতীয়বারের ছাঁকা ভাষা মাত্র। এই যে ডায়েরি লিখছি, এও নিজের মনের সঙ্গে আলাপ এক প্রকারের। রমলা বলেছিল, 'একবার দেখিয়ে দিন না কী করে একলা থাকতে হয়।' চিঠি আমি আর লিখব না।

সামাজিক হাসির অন্তরালে কান্না রয়েছে। রমলা বাক্স গোছাতে বসে কাঁদছিল— কার জন্যে? সাবিত্রীর জন্য, না নিজের জন্য? নিজের জন্য এবং সাবিত্রীর জন্য। মানুষ কাজ করে একটা কারণে কি?···কিন্তু পাথরের মূর্তি কাঁদে যখন শ্মশানের হাওয়া খোলা ধূধূ করা মাঠের মধ্যে হুহু ক'রে বইতে থাকে। কী ভীষণ শূন্যতা ওর বুকে!

আমার এক বোন একবার তার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বলেছিল। তার স্বামী মহা পণ্ডিত, পড়বার সময় তার স্বামীর মুখে দিব্যভাবের আর্বিভাব হত, সেই ভাবটি লক্ষ করবার জন্য সে পর্দার আড়ালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করত, লক্ষ ক'রে সে গৃহকর্মে চলে যেত। সাবিত্রী কখনও অমন অপেক্ষা করেনি, রমলা কখনও করেছে না কি? আমি কিন্তু ভাবি— আজ যদি আমাকে গোপনে লক্ষ করবার কোন লোক থাকত, তা হলে হয়ত আমারও মুখে কোন অজানা লোকের আলোকসম্পাত হত। বিশ্বরশ্মির দ্বারা বিকীর্ণ শক্তির আপেক্ষিক ক্ষতিপূরণ হয় শুনেছি। কার কালো চোখের চাহনি আমার খরচের বিপক্ষে জমার হিসাব বাড়াবে? এমন ভিখারি মন নিয়ে কতদিন চালাব? কার গোপন চাহনির অপেক্ষায় নিজেকে নিঃশেষ করব? এই চিরন্তন প্রতীক্ষার শেষ কোথায়?

রমলা কাঁদে টের পেয়েছি। তার অনেক দুঃখ। কিন্তু অন্যেও যে একলা ঘরে খাঁচায় পোরা হায়নার মত ঘুরে বেড়ায় সে কী জানে? বোধ হয় জানে। এ-সম্ভাবনাই কী তার মনে উদয় হয়ে তার হৃদয়কে স্নেহসিক্ত করে। জানি না। যে শূন্যতার বুকের মাঝে বাসা বাঁধতে চেষ্টা করি সেটা কেবল অট্টহেসে আমাকে বিদ্রূপ করে। আশ্রয়বিহীন পাখির মতন ঝড়ের মুখে ভেসে বেড়িয়ে আমি ক্লান্ত হয়েছি। আজ আমার সকল অঙ্গ বিকল, মন কাজ করছে না, বুদ্ধি নিষ্প্রভ, চোখ

নিস্তেজ, জড়ের মত শিথিল হয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। অন্যের কাছে আমার এই অবস্থা কচি ছেলের নষ্টামির মতন মনে হবে। হোক গে। স্বীকার করছি— নিজেকে নিষ্ক্রিয় ক'রে কারুর স্নেহের পাত্র, কারুর চাহনির বস্তু, কারুর মধুর ব্যগ্রতার বিষয়ে পরিণত করতে ইচ্ছে হচ্ছে— সাবিত্রী যেমন নির্জীব নিস্পন্দ হয়ে ফুলশয্যার রাত্রে গৃহীত হবার জন্য অপেক্ষা করেছিল।

দুঃখ আসে বনের মাঝে সন্ধ্যার মতন, ধীরে, গোপন সঞ্চারে— আমার প্রিয়ার মত তার নম্রগতি; দুঃখ নামে করুণার মতন, আবার প্রিয়ার মত বিষাদমাখা স্মিতহাস্যময়ী মুখটি নিয়ে, দুঃখ আচ্ছন্ন করে আমার প্রিয়ার চোখে অশ্রুকণার মতন। যমুনার কালো জলে ডুবে যাবার যে আনন্দ গোপিকাকে আবিষ্ট করে, আজ আমার মন সেই আনন্দে ভরে উঠেছে। দুঃখ রূপান্তরিত হল। তীব্র অনুভূতি নেই, আছে প্রবৃত্তিশূন্যতা। এতে শান্তি আছে, কী নেই, তার কোন অনুভব নেই, আছে কেবল বিস্তারিত সাধারণ অনুভূতি, যেটি ব্যক্তিসম্পর্করহিত বলেই অনির্দিষ্ট, কিন্তু অনির্দিষ্ট হলেও সত্য। কোন সূত্রের চারধারে এই সাধারণ অনুভূতি দানা বাঁধল? না···জানতে চাই না, ভয় করে, বিশেষের চেয়ে সাধারণ সুখময়, শান্তিদায়ক। দানা বাঁধলেই কামনা তীব্র হবে, আমার চিন্তা কেন্দ্রীভূত হবে, আমার গঠন বিন্যস্ত হবে, আমি কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত হব। তখন তাকে সেই তীব্রতার মধ্যে এনে, সেই বিন্যাসের মধ্যে এনে বিপর্যস্ত করব, তার সম্পূর্ণতা ও বিভিন্নতাকে ক্ষুণ্ণ করব। এ আমি চাই না, কিছুতেই চাই না। সাবিত্রীর শান্তি কেউ যেন না ভোগ করে। চিরকাল ভাসমান অবস্থায় যদি নাই থাকতে পারি, তবে যেন ডুবে যায় অতল তলে···।

আজ আমার জন্মদিন। এতদিনের হিসাবনিকাশ করা উচিত। কিন্তু ঔচিত্য জ্ঞান আমার নেই— আমার কাছে এতগুলো বৎসরের কোন মূল্য নেই। কালের ভাগ করা আমার ভাল লাগে না। কালবিভাগ সুবিধার জন্য। সুবিধাকে সুবিধা বিবেচনা করলেই তার প্রভাব কেটে যায়। জীবনটা চাকরি নয় যে পাঁচটা বাজবার জন্য, শনিবারের জন্য প্রাণ উৎসুক হয়ে উঠবে। ভাগ্যিস চাকরি করতে হয় নি। মৃত্যু সম্বন্ধে এত বেশি চিন্তিত নই যে মিনিটে ষাট মিনিট বেগে জীবন ছুটবে ভেবে প্রত্যেক মুহূর্তকে আঁকড়ে কামড়ে ধরে থাকব। এই ত সাবিত্রী মরে গেল, সত্য কথা বলতে কী— আমার জীবনের কি ভীষণ পরিবর্তন হল? কিছুই না— সূর্য রোজই উঠছে, রোজই অস্ত যাচ্ছে, কাশী চলে এলাম, এই মাত্র, এখানে মাসীমার পরিবর্তন লক্ষ করলাম, এইমাত্র, সাবিত্রী বেঁচে থাকলেও মাসীমা বৃদ্ধা হতেন। সাবিত্রীর মৃত্যুতে পৃথিবীর ব্যাস বেঁকে যায় নি। আমার ইচ্ছাশক্তিও এত প্রবল নয় যে জীবনের প্রত্যেক পল বিপলের মধ্যে একটা না একটা কর্তব্য

পুরে দিয়ে সময়কে ভারী ও তার গতিকে রুদ্ধ করব। যাত্রাপথে লাগেজ বওয়া বোকামি। শরীর ও মন বড়ই অবসন্ন ঠেকছে।

আমার জীবনের ক্ষণগুলি রঙ্গমঞ্চের নর্তকীর মত লঘুপদে নাচে, ক্যাকাসে তাদের রং, পাউডার মাখা তাদের মুখ, রাত্রি জাগরণে, অত্যাচারে, চিত্তশূন্যতায় তাদের চোখের কোলে কালিমা পড়েছে, কৃত্রিম তাদের আভা, তাদের নিজস্ব নেই, নৃত্যশিক্ষকের আদেশ অনুসারে ছক তৈরি করাই তাদের চরম সার্থকতা। এই আকস্মিকের ছক তৈরি করার নামই জীবন, আমার জীবন। তার মধ্যে রূপের ঐক্য নেই, মালার সাতত্য নেই, সুরের অবিচ্ছিন্নতা নেই। ঘটনাবলীর মধ্যে ফাঁকটাই আমার আজ চোখে পড়েছে। বই-এর প্রত্যেক পাতার সেলাই-এর গর্তটাই আমার কাছে আজ প্রধান।

আমার এই মনোভাব আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বলে আশ্বস্ত হতে পারছি কৈ? আমার মনে দুটি বিপরীত ভাব একসঙ্গে কাজ করে, একটির গতি বিচ্ছিন্নতার দিকে, অন্যের গতি সম্পূর্ণতা ও ঐক্যের দিকে ঝোঁকে। কিছুতেই তাদের মেলাতে পারছি না। বুদ্ধি দিয়ে হয়ত খানিকটা পারি— যদি এই polarisation কেই নিয়ম বলে গ্রহণ করি। কিন্তু সে গ্রহণ করা দায়ে পড়ে; আমাদের অজ্ঞানতা ও অক্ষমতাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা বুদ্ধির জুয়াচুরি ও কাপুরুষতা। যদি বলি বাঙ্‌ময় জগতের ধর্ম এক, আর প্রাণময় জগতের ধর্ম ভিন্ন, তা হলে কেবল বাক্যই বলা হয়, দ্বন্দ্ব ঘুচল না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য যদি পৃথকীকরণ হয় তা হলে বিরোধের অবসান তার সাহায্যে সাধিত হবার ভরসা নেই। কিন্তু বিরোধের দোটানায় আমার সকল শান্তি ঘুচে গিয়েছে।

আমার বিরোধটা কি? সাবিত্রী আমাকে সঙ্কুচিত ক'রে আনছিল, সে চাইত যে আমি কেবল স্বামী হয়েই থাকি, স্বামিত্বেই যেন আমি নিঃশেষিত হই। তা ছাড়া সমাজও তাকে সাহায্য করছিল। সাবিত্রী ও সমাজ আমাকে পিষে সামাজিক স্বামী ক'রে তুলেছিল। দুই চাপের মাঝখানে আমি কমঠবৃত্তি অবলম্বন করলাম, আত্মরক্ষায় সচেতন হলাম। আমার অর্থকষ্ট ছিল না বলে সমাজকে অন্তত অবহেলা করতে পেরেছি, বিশেষ কোন শারীরিক কষ্টভোগ করতে হয় নি। সাবিত্রীর তাগিদ ও চাহিদা থেকে উদ্ধার পেতাম বই-এর পাতায়। কর্মপ্রবৃত্তি অবরুদ্ধ হলে মানুষ বুদ্ধিজীবী হয়। কিন্তু এধারে যে মানুষ ভুলতে চায় নিজেকে— নিজের সম্বন্ধে সর্বক্ষণ সচেতন থাকা হ্যামলেটিয়ানা, সুস্থতার চিহ্ন সেটা মোটেই নয়। লরেন্স ঠিকই বলেছেন। ঐ ছাখ, আবার লরেন্স! কিন্তু তা ছাড়া উপায় কি! একধারে সংসার, অন্যধারে সমাজ, দু'এর মধ্যে কি? আশ্রম। সাবিত্রী ও রমলার মধ্যে সন্ন্যাসগ্রহণ?

বিরোধ অবসানের আশায় যদি মানুষ আশ্রমবাসী হয় তা হলেও সে ভুল করে। আজ সকালে আমার এক অভিজ্ঞতা লাভ হল। সাধুজীর ভক্তদের মধ্যে দুটো দল, কেউ বলেন তিনি স্বয়ং ভগবান, কেউ বলেন অবতার। পাদোদক নিয়েই কেবল দলাদলি নেই দেখলাম। তা ছাড়া, সাধুজী এবং ভক্তরা আমার কাছে একটু বেশি মাত্রার চাঁদা প্রত্যাশা করেন। সাধুজী বলেন, বই পড়ে কি হবে? সাহেবেরা কিছুই জানে না। অথচ নিজে কিছুই পড়েন নি। আমার বড় সুখ্যাতি করেন, আমার সেবাধর্মের প্রয়োজন নেই, আমি তার অনেক ওপরে, যে-বস্তু ইতিপূর্বে কেউ লক্ষ করেনি তিনি তাই আমাকে দেখেছেন, কপালে রাজটিকা, চোখে জ্যোতি। নতুন ভদ্রলোক দেখলেই বলেন যে আমি মস্ত জমিদার ও বিদ্বান। ভারী খারাপ লাগে, টান পড়ে আমার গোটা কয়েক শেকড়ে। বিরোধ এখানেও। এ হল না—আর একটা আশ্রম দেখলে মন্দ হয় না। তাও পছন্দ না হয় বেরিয়ে পড়ব।

এই সেদিন মনে হল শান্তির সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু সাহসভরে শান্তি গ্রহণ করতে পারলাম না। সাহসের অভাবই হল আমার প্রধান বিপত্তি, ভয়ই আমার প্রধান রিপু। সেই জন্য মনে হয় আমার চরিত্রে কোথায় যেন পিউরিট্যানিজমের আমেজ রয়েছে। কোন কাজকে নিষ্কাম ভাবে দেখতে পারি না, সব কাজকে আত্মোন্নতির ধাপ হিসেবে দেখি। আঁদ্রে জিদের gratuitous act-এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা আমার পক্ষে শক্ত— কিন্তু এটাও তাঁর নিজের গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়া। ভয় করি সমাজকে— সেটা যদি-বা পিতৃপুরুষের কৃপায় কাটিয়ে উঠলাম, অমনি অনাগতের ভয় এসে জুড়ে বসল। এর নামই নিজেকে ভয়, সাবিত্রী একাই ভীতু ছিল না, তাকেই বা দোষ দিই কেন? অনাগতের ভয়কে জয় করা যায় না— এই জন্যই বোধ হয় রমলা দেবী ভাবেন যে আমি একলা থাকতে পারব না। এক এক সময় তাঁর কথায়, আচরণে মাতৃত্বের ভাব যে ফুটে ওঠে সেটা বোধ হয় আমার ভীরু স্বভাব বুঝেই।

জীবনের ভয় বড় ভয়, মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। প্রেমে যে বিরোধের অবসান সে অবসান আমার নয়।

একটা দিন-রাত শেষ হয়েছে। কালকের সঙ্গে আজকের কি তফাত? কিছুই নয়। নায়ক-নায়িকার মনে দুঃখ এসেছে, অমনি সূর্য চন্দ্র তারকা পাণ্ডুর হয়ে গেল। সব কবিতা। মাথা খুঁড়ে মর, প্রকৃতির দুর্নিবারতা প্রতিহত হবে না। পদার্থ-বিজ্ঞানের নতুন নতুন বই পড়লাম, বৈজ্ঞানিকের বিশ্ব নিয়তির দ্বারা পরিচালিত। জনকয়েক অনিশ্চিত-বিধি নিয়ে মাতামাতি করছিলেন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক গায়ে জল ঢেলে দিলেন, আমার প্রাণটা অন্তত ঠাণ্ডা হল। জীববিজ্ঞানের

নতুন বই পড়লাম— কোন recessive trait-ই দূর করা যায় না দেখলাম। যাবে না কেন, চল্লিশ হাজার বছর পরে যাবে। কী আশ্চর্য! সন্ন্যাসীরাও ঐ সব বই ঘাঁটেন, কিন্তু অদ্ভুত তাঁদের মনের গঠন, সব তথ্যই যেন তাঁদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করছে। অথচ একটাও করছে না। করুক না। করুক আর নাই করুক, এটা ঠিক যে পুরুষকার নিয়তিকে কিছুতেই খণ্ডন করতে পারছে না। অখণ্ডনীয়তাকেই যদি গোড়া থেকে নিয়তি বলা হয়, তা হলেই 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' বলা চলে। কিন্তু প্রকৃতি আর নিয়তি ঠিক এক বস্তু কি? সাংখ্য এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করছে কি? বুঝতে পারলাম না। আমার দ্বারা সাংখ্যের সাধনা বোধ হয় অসম্ভব। বর্তমান সভ্যতার অকৃতজ্ঞ সন্তান হব কী ক'রে। কিন্তু দুঃখই বা হচ্ছে কেন? ভেবেছিলাম সাংখ্যই বৈজ্ঞানিকদের প্রকৃত দর্শন। সাধুজীকে বল্লাম, আমার দ্বারা ও কাজ হবে না। তিনি বল্লেন, হবে।

প্রকৃতির অনিবার্যতা মেনেও শান্তি পাওয়া যায় না। জ্ঞানের দ্বারা নিয়তিকে জয় করা যায় অনেকে বলেন— কিন্তু এ জয়ের পর মানুষ কি বেঁচে থাকে? এ যে আস্কুলামে পাইরাসের জয়! আমার অশান্তি বেড়েই চলেছে! শান্তি কোথায় মোর তরে হায়! কিন্তু বীণা বাজাবার জন্যও অশান্তির আঘাতকে বরণ করতে চাই না। বীণা যে শোনে তার হয়ত তৃপ্তি আসে, কিন্তু এখানে আমিই যে বীণা। ভীরু বীণা খোলের মধ্যে লুকিয়ে থাক্‌ জড়ের মতন। তাও রাখতে পারি না।

সাধনার মাত্র তিনটি উপায় আছে— ধর্ম, বিজ্ঞান, আর্ট। প্রাণবাদীরা বলেন জীবনটাই সাধনা। অর্থাৎ তাঁদের মতে— প্রেম। কিন্তু প্রেমের পরিণতি জীবনের পরিণতিতে, অর্থাৎ মৃত্যুতে। বাকি থাকে, ধ্যান, আত্মস্থ হওয়া, খৃস্টান মিস্টিকদের মতে contemplation, meditation নয়। আমি তাকেই ধর্ম বলি। দর্শনালোচনা কথার মার প্যাঁচ।

ধর্ম সাধনা হল না, বিজ্ঞানের সোয়াস্তি নেই, প্রেম নেই···সেই বিবাহিত জীবন ত? আর না। অনেকে পরামর্শ দিচ্ছেন জীবনটাকেই আর্ট ক'রে তুলতে। ড্যানানৎসিওর মতন হব নাকি! শুনেছি এ কাজটি নাকি ভারী শক্ত, তাজমহল রচনা করার চেয়েও কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। সব বাজে কথা!

আর্টের উপাদান জড়, রং তুলি অক্ষর স্বর পাথর কাগজ কলম এবং মন, যেটি সাধারণ গুণ। জীবনের উপাদান ঘটনা, তাকে মন নিজ বশে আনবে কি ক'রে? ঘটনার নিজের অস্তিত্ব আছে, ইতিহাস আছে। কৈ আমি কি রমলা দেবীর মনে সুখ আনতে পারি, তাঁর সে-রাত্রির ইতিহাস পুঁছে দিতে পারি? ঘটনা স্থির নয়, ধরতে গেলেই গত। ভবিষ্যতের ওপরও হাত নেই। আর বর্তমান! পিচ্ছিল, specious, নেই বল্লেই চলে। এ উপাদান নিয়ে আর্ট হয় না। ঘটনাকে নির্বাচন

করা চলে না, গায়ে পড়ে সে তার নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করবেই করবে, কাশীর ঘাটে স্বাস্থ্যান্বেষীর মতন। জীবনকে আর্ট ক'রে তুলব ভেবে মৃত্যুকে বাদ দেওয়া যায় কি? রমলার ছেলে কেন মরে গেল? আবার, মৃত্যুকে সুন্দর ক'রে তুলব ভেবে জীবনকে তাচ্ছিল্য করা যায় কি? সাবিত্রীর স্মৃতি পূজা ক'রে আমার জীবনকে অবাস্তব স্বপ্নে পরিণত করতে পারি না। সব ঘটনাই জীবনের ওপর দাগ কেটে যায়, সেই দাগগুলিই organic memory, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাদের বাচ-বিচার নেই। স্মরণশক্তি যার প্রবল, স্নায়ু যার জীবন্ত, মস্তিষ্ক যার শ্রীক্ষেত্র, তার কি হবে? রমলা বলেছিলেন মেয়েদের স্মরণশক্তি নেই। ভুল, না থাকলে সে স্বামীর ঘর করতে পারত, কিন্তু পারল না, স্মরণশক্তি আছে বৈকি? আমার আছে? নেই, নচেৎ সাবিত্রীর মৃত্যুর পর অন্য দশ জনে যেরূপ ব্যবহার করে সেরূপ করিনি ত! হয়ত, অন্য দশ জনের চেয়ে বেশি পরিমাণে আছে, তাই কাতর হই নি।

আমার জীবনের ঘটনারূপী উপাদান গোরাদের মতন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সজ্জিত নয়, ভারী এলোমেলো, এ ওর ঘাড়ে পড়ছে। এমন কি এক সমতলেও দাঁড়িয়ে নেই, নড়ে বেড়াচ্ছে এ প্লেন থেকে ও প্লেনে, অনেক সময় দুই ক্ষেত্রেই রয়েছে, কখনও ব্যবহারের প্লেন, কখনও চিন্তার, কখনও বা— কার? আত্মার? জানি না। নাম দিতে ভয় হয়। এই জীবন। তাকে কি ক'রে, কার আদেশে সাজাব। এ কী অধ্যাপকের লেকচার নোট যে পর পর জল করে বুঝিয়ে বলাই তার চরম সার্থকতা।

এমন মানুষ আছেন যাঁদের স্বভাবই হল একরোখা। তাঁদের স্বভাবে মাত্র একটা প্রবৃত্তি সজোরে ফুটে ওঠে। এই জোরের জন্য তাঁদের অনেক অভিজ্ঞতা বাদ পড়ে। যেগুলি প্রধান প্রবৃত্তির অনুকূল সেগুলি তার দাসত্ব করে, তারই হুকুমে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে তারই হুকুমে নির্বাচিত হয়। এই রকম একরোখা-ঝুঁকি মানুষ অনেকে আছেন— বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক, ভট্টাচার্য মহাশয়রা। আমার সাধুজী ঐ ধরনের, পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাকে সাংখ্যতত্ত্বের খপ্পরে তাঁর ফেলা চাই। অবশ্য এই সব ধর্ম-গোঁড়া, বিশেষজ্ঞ, দাবাখেলোয়ার প্রভৃতি জীবের প্রয়োজন আছে এ পৃথিবীতে। সবই তাঁদের সিস্টেম, এবং সিস্টেম না হলে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশঙ্কাও বেড়ে চলেছে যে! ঐ প্রকার অদ্ভুত জীবের জীবনকে আর্ট বলা চলে কি? এই পিউরিট্যানের দল আবার জীবন ছাড়া অন্য আর্টের ভীষণ শত্রু।

যে মানুষ ঠুলিপরা বলদের মতন একই কেন্দ্রের চারপাশে জাবর কাটতে কাটতে ঘুমুতে ঘুমুতে, ঘুরতে পারে, তাকে আমি মানুষ বলি না। জন্তুর গন্তব্য এক, অতএব গতিও সেই গন্তব্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমার গন্তব্যের কোন ঠিকানা

নেই, মানুষের গন্তব্য একাধিক, একটি টানছে এধারে, অন্যটি টানছে ওধারে, বিপরীত দিকে, মধ্যে মধ্যে দিকনির্ণয়ই হয় না। এই শত শত টানের মধ্যে গোটাকয়েক অন্যের চেয়ে প্রবল, কেবল এই মাত্র চোখে পড়ে। যে ঘোড়া হাঁকায়, বলদ চালায় সে ইচ্ছা ক'রে তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আকর্ষণ থেকে তার চালিত জীবকে রক্ষা করে। একরোখা লোকের প্রবলতম প্রবৃত্তি এইভাবে চালকের কাজ করে, তার সঙ্গে ঘোড়া ও বলদের পার্থক্য কম। আমার গুরু আমাকে বলদে পরিণত করতে চাইছেন, চোখে ঠুলি পরিয়েছেন, নিশ্চয়ই নিজের স্বার্থ আছে— শিষ্যের দল বাড়ানো। তাঁর সাংখ্যতত্ত্বের সাহায্যে অনেক তৈল সংগ্রহ হবে।

তাঁরই বা দোষ কী? আমিই বা কী করেছিলাম! আমিও সাবিত্রীর চোখে আমার আদর্শের ঠুলি পরিয়েছিলাম— স্বার্থেরই জন্য। তবে, জানতাম না, জেনে-শুনে করিনি। আমার অন্যায় হয়েছিল।

রামপ্রসাদ বলেছেন— আমরা সকলেই বলদ আর জগন্মাতা কলু বিশেষ। এ তুলনা একালের কবিতায় অচল— এইটাই তার একমাত্র দোষ নয়। তুলনাটি সত্য, একরোখা পিউরিটানের পক্ষে, এই তার প্রধান গলদ। কিন্তু জগতে অন্য ধরনের মানুষ আছে, তাদের সংখ্যাই বেশি। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি আগ্রহ একদেশদর্শী নয়, সর্বতোমুখী। গ্যাসেট বিশেষজ্ঞদের অসভ্য বলছেন, তাঁর মতে এঁরাই সভ্যতার অন্তরায়। আজকালকার যুগে অসাধারণ ব্যক্তিরা হলেন বৈজ্ঞানিক, তাঁরা নিয়তিবাদী, তাঁদেরও গোটাকয়েক অবান্তর খেয়াল থাকে, ছয়টি রিপুর মধ্যে একটা না একটা ত থাকেই, তা ছাড়া হয় ভূতে না হয় ভগবানে বিশ্বাস রয়েছে। যে স্টেশনে যত বড় তার সাইডিং তত বেশি। তাঁরা কি ভাবে সব শক্তিকে, সব আকর্ষণকে, সব আগ্রহকে সংযত করে আর্ট ক'রে তুলবেন? তাঁদেরও একটা উদ্দেশ্য বলবতী থাকেই থাকে, কিন্তু অন্যগুলির সঙ্গে সেটির সমান সম্বন্ধ নেই বল্লেই হয়। নচেৎ মহা মহারথী বিশেষজ্ঞরা নিজেদের বহির্ভূত বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে গেলেই একেবারে ছেলেমানুষী ক'রে ফেলেন কেন? তাঁদের জীবনও অত ছন্নছাড়া হয় কেন? অথচ তাঁদের বলাও চাই, জীবনধারণ করাও চাই! আর্টে সামঞ্জস্যেরই প্রয়োজন, আগ্রহাতিশয্যের নয়।

আর্টে কি হয়? নভেলে একটা মূলসূত্র, এবং তারই চারপাশে অনেক ছেঁড়া সুতো থাকে। কিন্তু প্রধান অংশের চারপাশে থেকেই তাদের সার্থকতা। আধুনিক নাটকেও তাই— অবশ্য আগেকার নাটকে ছেঁড়া সুতোর স্থান ছিল না। কারণ জীবন তখন অত বিচিত্র হয়ে ওঠে নি। আমাদের সংগীতেও তাই। কাল সন্ধ্যায় সানাই-এ চমৎকার পূরবী বাজছিল, সেটি পুরিয়া-ধানেশ্রী হয়ে যাচ্ছিল। রমলা

দেবী থাকলে বুঝিয়ে দিতাম যে সবই শ্রী'র ঘরে, পূরবী অঙ্গের— অর্থাৎ সকলেরই মধ্যে আছে কোমল রি, তীব্র মধ্যম, কোমল ধৈবত, আর বাকি স্বর শুদ্ধ— তবু পকড়ের জন্য, আরোহীর জন্য রূপের পার্থক্য ঘটেছে। কীর্তন কাওয়াল, হার্মনি-প্রধান, সুরপদ্ধতিতেও তাই। মূল থীমের চার পাশে ছোট ছোট phrase ঘোরে ফেরে। আগে প্রধান অ-প্রধানের মধ্যেকার সম্বন্ধ ছিল ব্রাহ্মণ-শূদ্রের, রাজা-প্রজার মত স্থির ও পূর্ব হতেই নিয়ন্ত্রিত, তারই নাম unity of action। কিন্তু এ যুগের জীবন বিচিত্র, সমৃদ্ধ, তাই unity-র আজ কোন খাতির নেই। Counter point-এর মত প্রধান অ-প্রধান জুড়ে যেতে পারে, এখানকার আর্টে সুতো জড়িয়ে গেলে সর্বনাশ হয় না, সমালোচকও বিচলিত হন না। সবটা মিলে একটা অখণ্ড কিছু উপভোগ্য হলেই হল, যেমন Joyce-এর Ulysses-এ হয়েছে। ব্রাদার্স ক্যারামজভকে কেউ খারাপ নভেল বলতে পারে? জনসাধারণের উপদ্রবের তাৎপর্য এই। অপ্রধানের প্রয়োজন আছে।

অখণ্ড প্রকাণ্ড না হলেও চলে, তবে সুন্দর হওয়া চাই। তাই কি? সৌন্দর্য-সৃষ্টিই আর্টের পরম উদ্দেশ্য কে বল্লে? যদি তাই হয় তা হলে এই নতুন জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্যকে অবলম্বন করে সুন্দরের নতুন অর্থও ধারণা করতে হবে।

রাশিয়ান ফিলম-রাজ্যে নতুন পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। প্রথমে নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির অনেকগুলি একই মনোভাবব্যঞ্জক ছবি তোলা হয়, তারপর ডিরেক্টার বাহাদুর তার মধ্যে থেকে সব চেয়ে উপযুক্ত ছবিটি বেছে নেন। এইটুকু ছাড়া বাকি সব কাজই জনগণের। সিনেমাতে পর পর ছবি সাজান থাকে, কিন্তু তার পিছনে থাকে এই montage। আর্টিস্টের মন সম্বন্ধ স্থাপন না ক'রে থাকতেই পারে না, রমলা ঠিক বুঝেছেন— সম্বন্ধ চাই। নচেৎ জীবনটা জীবনই হবে না। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ হতে চাই, কার্বনের চার হাতই জোড়া চাই আমার।

অ-প্রধান সম্বন্ধে অচেতন কিংবা নিরাগ্রহ হওয়া চলে কি? চিত্রেও অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তরের প্রকাশ সম্ভব, সেই জন্য হয়ত বড় ছবি কিংবা ফ্রেস্কোই বর্তমান সভ্যতার উপযুক্ত। অজন্তার গুহাগাত্রে নেই কী? বনের, সাপ, পাখি, নাচগান, মানুষ, দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, সব চলেছে, কিছুই বাদ পড়ে নি— অথচ এঁকেছিলেন আশ্রমবাসী অবিবাহিত ভিক্ষু সম্প্রদায়। কেবল ভগবান বুদ্ধের জীবন-কাহিনী চিত্রিত করলেই পারতেন ত। তা করেন নি— কারণ তখন জীবন ছিল।

টিনটরেটোর ক্রুসিফিকেশনে নেই কী। অথচ সেটি জ্যামিতির কোন চিত্রের মতনই শুষ্ক কঠিন প্রাণহীন আড়ষ্ট নয়। কম্পোজিশন রয়েছে— কিন্তু চিত্রকর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন না। যীশু ক্রুশে ঝুলেছেন। তবুও জীবন থামে

নি! নিম্নাংশে বিস্তর লোকের ভিড়, তাদের কাছে ঘটনাটি তাৎপর্যে গুরু নয়, নিতান্তই সাধারণ, এমন কি তাদের মধ্যে অনেকে কর্তব্যের খাতিরেই এসেছে, তারা কাজই ক'রে যাচ্ছে, কাজও সব ছোট ছোট, মানুষ লটকাবার ছোটখাট কাজ। অত বড় ছবিতে কত না লোক, কিন্তু যীশুর জন্য তাদের মুখে কিংবা ভঙ্গিতে কোন দরদের চিহ্ন নেই। সাধারণ মানুষ যেমন হয় চিত্রকর তাদের তেমন এঁকেছেন— তাদের মুখের ভাবও সাধারণ। এই সত্যকার জীবনের প্রতীক। অ-প্রধান প্রধানের সম্বন্ধ নেই— অ-প্রধান, অ-প্রধান হয়েই প্রয়োজনীয়।

ক্রুসিফিকেশন নিয়ে অনেকেই গল্প লিখেছেন। দুটি গল্প এখন স্মরণ হচ্ছে। একটির নাম দাঁত কনকনানি— লেখক বোধহয় স্ট্রাইণ্ডবার্গ, কি আঁদ্রিভ, দ্বিতীয়টি জুডিয়ার লাটসাহেব— লেখক আনতোল ফ্রাঁন্স, আমার প্রিয়। প্রথমটিতে লেখক দেখিয়েছেন যে দাঁত কনকনানির কাছে যীশুর মৃত্যুও তুচ্ছ। দ্বিতীয় গল্পটি পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গল্প—তার শেষাংশে অনেকে সিনিসিজমের গন্ধ পেয়েছেন। পন্টিয়াস তাঁর বন্ধু ল্যামিয়ার সঙ্গে জুডিয়ার পুরানো কথা কইছেন, মেরী ম্যাডলিনের কামোত্তেজক মূর্তি বন্ধুর স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে, তিনি পন্টিয়াসকে কথার ছলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, জীসাস বলে একটা লোক ছিল, তার দলে ঐ মেয়েটি ভিড়েছিল···সে লোকটা কোথায়?' পন্টিয়াস ভ্রূ কোঁচকালেন, স্মরণ করবার জন্য হাতটা কপালে ঠেকালেন, অনেক চেষ্টার পর ধীরে ধীরে বল্লেন, 'জীসাস, জীসাস,— ন্যাজারেথের জীসাস— কই, মনে পড়ছে না ত?' এই-খানেই গল্পের শেষ। বর্তমান সভ্যতার আদি ও শ্রেষ্ঠ ঘটনার তাৎপর্য এতই ছোট একটি স্ত্রীলোকের স্মৃতির তুলনায়। শেষাংশের অন্য একটি গূঢ় অর্থ রয়েছে। যে ঘটনাটি বর্তমান সভ্যতার তুলনায় অত মূল্যবান সেটি রোমান খৃস্টপূর্ব সভ্যতার কাছে কতই তুচ্ছ। আনাতোল ফ্রাঁন্স এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন।

গল্প দুটির টেকনিক হল এই— মূল্যবিচারের আপেক্ষিকতা প্রমাণের জন্য অপ্রধানের চোখ দিয়ে প্রধানের প্রাধান্য কমিয়ে দেওয়া। এই পদ্ধতির ফলে কিন্তু রসিক ব্যক্তির কাছে প্রাধান্যটুকুই ধরা পড়ে, কারণ আনাতোল ফ্রাঁন্সের সমগ্র গল্পটি পড়তে পড়তে রোমান সভ্যতার বিরাট ঐশ্বর্য ও বৈদগ্ধ্যে মন অভিভূত হয়ে পড়ে, এবং শেষে খৃস্টের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধাও বোঝা যায়, পাঠকেরও শ্রদ্ধা বাড়ে। একজন ব্যক্তি যে-শক্তির জোরে অত বড় সভ্যতাকে গ্রাস করতে সক্ষম হয়েছিল সেই শক্তির কথা ভাবতে ভাবতে তার প্রতি শ্রদ্ধায় মন প্রাণ অবনত হয়। মূল্য-নির্ধারণের এও একটি সংকার পদ্ধতি— আর্টিস্টের কাছে। আধারের দিক থেকে তাৎপর্য বুঝতে হয়। লিখনভঙ্গির সাহায্যে ক্ষুদ্র আধার কিংবা

উপহাস বৃহৎ তত্ত্ব বহন করতে পারে। অবশ্য আধারটির এবং উপহাসটির double reflection দেবার ক্ষমতা দেখান চাই। ছোট বড়র এই সম্বন্ধ, প্রয়োজন অপ্রয়োজনের এই সমাবেশ স্থাপিত ও সাধিত হতে পারে তখনই যখন লেখক ঘটনা পারম্পর্যের বাইরে দাঁড়াতে পারেন। সাধারণ মানুষের কাছে বর্তমান বড়ই পিচ্ছিল, দোটানার মধ্যে পড়লে স্থিরবুদ্ধি রাখা বড়ই মুস্কিল। আর্টিস্টের নিরাগ্রহ অবস্থা সাধনালব্ধ। সাধারণ মানুষের কাছে নিরাগ্রহতা negative capability, ঔৎসুক্যবিহীনতা ইচ্ছাকৃত জড়তারই নামান্তর। অতএব আর্টের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অর্থও যা ধর্মের কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষার অর্থও তাই। ধর্মের নিষ্কাম সাধনা আর্টের নিরাগ্রহ উপহাস।

সম্বন্ধ, অর্থাৎ বড় ছোটর, প্রয়োজনীয় অ-প্রয়োজনীয়ের আত্মীয়তার স্বরূপ না নির্ণয় করতে পারলে সাধনার কোন অর্থই থাকে না। আমি সেই অর্থ আবিষ্কার করতে ব্যস্ত। এক এক সময় সন্দেহ হচ্ছে আর্টেই অর্থের সন্ধান পাব? মনস্থির করতে পারছি না। টিনটরেটোর ছবিটা আজ ভাল করে দেখলাম— কাল কি লিখেছি আবার পড়লাম। একটা নতুন কথা মনে উঠছে।

বেশ বুঝতে পারছি যে টিনটরেটোর অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল— দর্শকবৃন্দের দৃষ্টির সামনে ছবিখানি রেখেই তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। ছবিতে আপামর-সাধারণের ওপর এক স্বর্গীয় আলো পড়েছে, গতি দেখে মনে হয় যেন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে এক স্বর্গীয় মলয় বইছে, হাওয়া আসছে ওপর থেকে। সমগ্র দৃশ্যটা যেন আলো ও হাওয়ায় ভাসছে। ছবির নিম্নাংশই পার্থিব দৈনন্দিন ঘটনার পটভূমি। এই মুক্ত হাওয়া ও আলোর যথাযথ প্রয়োগ ব্যতীত অন্য হিসাবে ছবিটা দেখলে দম বন্ধ হয়ে আসে। আনতোল ফ্রাঁন্সের গল্পেও ঐ রকম খোলা হাওয়া ও আলোর সন্ধান পেয়েছি। এই স্বর্গীয় আলো-হাওয়ায় নিম্নাংশের ছোটখাট অ-সম্বন্ধ ঘটনা-বেশকে জীবন্ত করছে। এইখানেই আর্টিস্টের নিরপেক্ষতা। খৃস্টান মিস্টিক একেই গ্রেস্ বলেন টিনটরেটোর ছবিটায়, আনতোল ফ্রাঁন্সের গল্পের আলোক-সম্পাতে, হাওয়ার খেলায় যেমন ছোট-বড় প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, বিশেষ ও যুক্ত ঘটনা একত্র সমাবিষ্ট হয়েছে, তেমনি হয়ত ভগবানের অনুকম্পায় কোন ব্যক্তি অথবা ভক্তের জীবনের ঘটনাবলী সুসজ্জিত সুসম্বন্ধ ও অর্থপূর্ণ হতে পারে। তখন বনফুল হয়ে ওঠে মালা।

টিনটরেটো ছিলেন ধার্মিক ও খৃস্টান, আনতোল ফ্রাঁন্স ল্যাটিন সভ্যতা এবং ক্যাথলিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। আমার শিক্ষাদীক্ষা ভিন্ন। ওপর থেকে কৃপাবৃষ্টি চাতকেই প্রত্যাশা করে। তার চেয়ে যে গুণ পনটিয়াস পাইলেটের চরিত্রে

ফুটে উঠেছে তাইতেই আমি মুগ্ধ। খৃস্ট জন্মাবার সময় গ্রীক দর্শন ও পূর্বাঞ্চলের প্রভাবে রোমান সভ্যতার কাঠিন্য মোলায়েম ও মৃদু হয়ে আসছিল। আগেকার রুক্ষতা নতুন সভ্যতার পালিশে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মাত্র। ভেতরে ঋজুতা রইল, বাইরে এল ভদ্রতা, চারপাশে আলো, বাতাস, ওপরে মুক্ত আকাশ, আপনাতেই সম্পূর্ণ। এই উজ্জ্বল কঠিন আবরণ ভেদ করার ক্ষমতা কোন ধর্মের ছিল না। রোমান সভ্যতার নিজের মধ্যে দুর্বলতা না এলে খৃস্টান ধর্মের প্রসার অন্য দিকে হোত। এই সন্ধিক্ষণে গ্রীক, রোমান ও পূর্বাঞ্চলের সভ্যতার সংযোগে যে সংস্কৃতির সৃষ্টি হল তারই চরম বিকাশ ঐ পনটিয়াসে। আমার ঐ চরিত্র বড় ভাল লাগে। এই হল সত্যকারের grace। সুষ্ঠুতা, শালীনতা, মাধুর্য, আলোর প্রতি উন্মুখতা, আকাশে বাতাসে ধন্য হবার ব্যাকুলতা, ভবিষ্যতের ক্রমপর্যায়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা— এই সমাবেশ সৃষ্ট মন যে আলো বিকিরণ করে তার দীপ্তি তীব্র নয়। রমলা কী এই আলো আমার মুখে দেখেছেন? আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের শিখা দেখাতে চাই না। আমি তাপ চাই না, আলো চাই না, বিরোধ চাই না, সেই আলোতে প্রতিফলিত হতে চাই— তবেই আমার আর্টের সাধনা সফল হবে, আমার জীবনে সুচারু সামঞ্জস্য ফুটে উঠবে। আমার সাংখ্য বেদান্ত পড়া মিথ্যে। আমি নিতান্তই এ যুগের মানুষ। আমার ভেতর দিয়ে সমগ্র সভ্যতার সমন্বয় হোক— আমি সমগ্র ইতিহাসের সৃষ্টি। আর্টের কাছে আমি সত্যিই ঋণী।

এই মাত্র এক ব্যাপার ঘটল। খেয়ে দেয়ে শুয়েছি, হাতে গ্রন্থ রয়েছে, চোখের সামনে রমলা এসে হাজির, চোখের কোনে জল, অনুভব করতে পারলাম অশ্রুর তাপ, চেঁচিয়ে বল্লাম, 'পুড়ে যাবে যে! জ্বালা করছে না?' কলের পুতুলে যেমন ঘাড় নাড়ে সে তেমনি ঘাড় নাড়তে লাগল, 'আর থামেই না, ভয় হতে লাগল মুখ ফুটে বলতে গেলাম, থাম, থামেই না, বড় কষ্ট হচ্ছিল, হাত জোড় করতে গেলাম, হাত উঠল না—কতক্ষণ এই চলল! সন্দেহ হল হয়ত রমলা মারা গেছে এবং তার আত্মা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে··· কিন্তু সন্দেহের উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে মনে উঠল— তার আত্মা আমার সঙ্গেই বা দেখা করতে আসবে কেন? আমি তার কে? তারপর হঠাৎ দেখি রমলা কালো হয়ে গেছে, কষ্টিপাথরের মতন কালো— হাতটা তার ভেঙ্গে গেল, তার পর গেল একটা পা, দেহ তার হেলে গেল, ঝুঁকে পড়ল খাটের ওপর, সামলে নিলে অন্য পা দিয়ে, বেশ দেখতে পেলাম! চোখ তুলে দেখলাম অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা, ভারী দুঃখ হল, মূর্তিটা যাতে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার না হয়ে যায় সেজন্য বিছানা থেকে উঠে সাহায্য করতে গেলাম, পারলাম না, মূর্তিটা পড়ে গেল সশব্দে, ভাঙ্গেনি, আঃ, দেখতে

পেলাম ট্রাঙ্কের ধারে পড়ে রয়েছে, নিজের মনে হল দুঃস্বপ্ন দেখছি, ইচ্ছাশক্তির জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম— শব্দ কানে এল গোঙানির মতন …মুকুন্দ বাবু-বাবু বলে ঠেলতে লাগল, বল্লে ঘুমন্ত স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি কিন্তু নিশ্চয় জানি ঘুমোইনি— কেননা চোখ আমার খোলাই ছিল। ব্যাপার এই, পাশের টেবলের ওপর হাত পড়েছিল, বাতিদান থেকে বাতি গলে হাতে পড়েছে, হাত সরাতে গিয়ে ছোট টেবলটা উলটে পড়েছে। যখন মুকুন্দের ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ছি তখনও হাতের ওপর মোম শক্ত হয় নি। অথচ মনে হয়েছিল যেন রমলা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সত্যকারের কয়েক সেকেণ্ড স্বপ্নের কতক্ষণ।

ভাবতাম, বর্তমান নেই, ভাবতাম সূর্য ওঠে আর নামে, এইটাই সত্য, ভাবতাম সময় চলে একদমে, এক কদমে, তার ব্যতিক্রম নেই। তা নয় বোধ হয়। মহাকালকেই নিয়তি বলে এসেছি, তার হাত থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা বিফলই হয়েছে। আজ, এখন মনে হচ্ছে, কালের মধ্যে নিয়ম নেই, কারণ কাল কী বস্তু আমরা জানি না, জানি কেবল পারম্পর্য, দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, বীজ হতে গাছ, গাছ থেকে ফুলফল, ফুলফল থেকে শুকিয়ে বীজ, সভ্যতার উত্থান পতন, ঋতুর পরিবর্তন— মাত্র এইটুকুই আমরা দেখে এসেছি, ধারাবাহিকতাতেই আমরা অভ্যস্ত, অতএব তাকেই দুর্নিবার ভেবেছি।

এ যেন একটা সমতল ক্ষেত্রের গতি। কিন্তু এই সমতাকে ভাঙা যায়, মানুষ প্রায়ই ভাঙছে অসম করছে, যেমন স্বপ্নে হল। জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষে ভাঙছে নানা উপায়ে। প্রথম উপায় স্মৃতি। স্মৃতিই নিয়তির প্রধান শত্রু। রমলা বল্লে, স্মৃতি তার নেই। তার নেই হয়ত, সেই জন্য বোধ হয় তার ধারণা যে নিয়তি তাকে হিঁচড়হিঁচড় করে টেনে নিয়ে যায়। না না, স্মৃতি তার আছে… সেই কাল-রাত্রির স্মৃতির জোরেই সে কালস্রোতের বিপক্ষে লড়ছে, সেই জন্যই তার দেহশ্রী অটুট রয়েছে, বয়স তার রুদ্ধ।

কিন্তু স্মৃতি নানা রকমের— এক হল জড় করা, পাশের বাড়ির ছেলেটা যেমন রাস্তা থেকে ছেঁড়া কাগজ কাপড় কুড়িয়ে বাক্সে তুলে রাখত, সাবিত্রী যেমন সর্বদাই তার ছেলেবেলার ঘটনার উল্লেখ করত। আর এক রকমের স্মৃতি, যেমন প্রুস্তের; এই প্রকার স্মৃতি নির্বাচন করতে করতে একটা অর্থপূর্ণ সমগ্রতা সৃজন ক'রে; নির্বাচনের মূলে থাকে অর্থ-সংগতি— ধারাবাহিকতার সঙ্গে এর কোন সংস্রব নেই, স্রোতের সঙ্গে তুলনা হয় না, হয় গানের সঙ্গে, টানা-পোড়েনের সঙ্গে— সেই ছেলে বয়সে মা এসে ঘুমোবার আগে চুমু খাবে কি খাবে না তার আশঙ্কার বর্ণনা— তারপর দু'তিন হাজার পাতা পরে, ফুটপাতের ওপর এক পা দিয়ে অন্য পা রাস্তায় রেখে সেই আশঙ্কার স্মৃতি ফুটিয়ে তোলা। এটা প্রুস্তের আঙ্গিক।

কালাতিপাতের অনিবার্যতা থেকে রক্ষা পাবার অন্য উপায় আছে— যেমন ছোট্ট খাট্ট দৈনন্দিন কর্তব্য দিয়ে প্রত্যেক মুহূর্তকে ভরিয়ে দেওয়া। একেই অনেকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান বলেছেন। কিন্তু নিছক কর্মীর পক্ষেই ভরিয়ে দেওয়া সম্ভব। অনিবার্য কি এত সহজেই পরিহার্য! জন্তুরাই নিছক কর্মী।"

প্রুস্তের মতন বাইরের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছি— তাঁর মতন আমারও শরীর খারাপ, অন্তত রমলার তাই ধারণা। স্বভাবেও মেলে— আদুরে-পানায়। বার্গসঁ-এর Time and free will-এর এক স্থানে লেখা আছে যে মিষ্টিক অবস্থায় সময়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু মিষ্টিসিজমের সাধনায় নিজেকে ভেঙ্গে গড়তে হয়, তা আমি পারবো না।

কালের পারম্পর্য ভেঙ্গে নিয়তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার অন্য উপায় খুঁজে পেলাম স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকে। বুঝলাম সময়ের হার এক নয়, কদম এক নয়, কখনও সময় চলে দ্রুত পদক্ষেপে, কখনও ধীরে, কখনও গতি তার রুদ্ধ। গতির হার বাড়ায় কমায় ভাবগুচ্ছ, আগ্রহ ঔৎসুক্য, যাকে ভালবাসি তার জন্য যখন প্রতীক্ষা করি তখন মনে হয় সময় যেন আর কাটতে চায় না, যখন সে এসে হাজির হয় তখন মনে হয় সময় কোথা দিয়ে চলে গেল। সময় ধুনে চলবে না ঠায়ে চলবে নির্ভর করে আমার আগ্রহের ওপর। এখন যদি আমার অন্তরের মনোমত ভাবের তোড়া বাঁধা যায়, তা হলে নিয়তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

ভাবগুচ্ছ সময়ের নতুন সংখ্যা, unit তৈরি করে। নতুন টিন খুলে তামাক পাইপে ভরে টান দিচ্ছি— ধোঁয়া গোল হয়ে আসছে, এই মুহূর্তটাই আমার কাছে অনন্ত— বাইরের সময়, ঘড়ির সময় এখন দম বন্ধ হয়ে পড়ে আছে—যেন মড়া; ভূমিকম্পের সময় সব দেয়ালে-ঘড়ি যেমন আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায়। লরেন্স ঠিক বুঝেছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দৈহিক মিলনের তুলনা করা হয়েছে— তান্ত্রিকদের মতও অনেকটা ঐ ধরনের।

কিন্তু যে যাই বলুক— দৈহিক সুখ নীচুস্তরের! দেহকে ঘৃণা করি না, কিন্তু ঐ প্রকারের ক্ষণিক সুখের দ্বারা মহাকালের গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব নয়। একধারে দেহ, অন্যধারে ব্রহ্মজ্ঞান ও তুরীয় অবস্থা, মধ্যে হয় কর্তব্য, না হয় আর্ট ও বিজ্ঞান। কর্তব্যবুদ্ধি মনের বৈশ্যবৃত্তি, বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নয়, সুবিধাজনক পদ্ধতি মাত্র, অনুভবের অনুকল্প মাত্র। কর্তব্যে আমার কিসের প্রয়োজন? আমি সামাজিক নই। কার ওপর কর্তব্য? আমার সমাজ নেই। নিজের ওপর কর্তব্যকে কর্তব্য বলে না। তা ছাড়া সমাজও যদি থাকে, তবু স্বরাট না হলে পরের ওপর কর্তব্য কিংবা দশের উপকার করব কি ক'রে? আগে গোটা মানুষ হই, তার পর সব হবে। রমলা বলে একলা থাকতে কষ্ট হয়। কেন হবে? সৃষ্টি করলে কষ্ট হয় না।

অবশ্য বৈদান্তিকের মতন নিরালম্ব হওয়া যায় না। সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই-ই চাই। ভুল লিখলাম, সম্বন্ধ স্থাপন নয়, সম্বন্ধ সৃষ্টি, নতুনক্ষেত্র। তাতে পুরানো মানুষ বাদ পড়ে, কিন্তু নতুন মানুষ তৈরি হয়। আর্টেও বস্তুসত্তাকে প্রথমে মেরে ফেলতে হয় তার পর নতুন সত্তা গড়ে তুলতে হয়। নিজের জীবনের ঘটনা থেকে যে নভেল লেখে সে বড় জোর একটা নভেল লিখতে পারে— কিন্তু সে আর্টিস্ট হতে পারে না। বিজ্ঞানের সীমা নিয়ে এতদিন ভুল ভেবে এসেছি। বিজ্ঞানেও যে নেতিবিচার, অর্থাৎ isolation আছে সেটার উদ্দেশ্য নতুন সৃষ্টি ভাবলেই চলে। এ-ক্ষেত্রে নতুনের সঙ্গে পুরাতনের সম্বন্ধটিও সাদৃশ্যমূলক। তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়, legend-এর সঙ্গে legend এর। স্বপ্ন সবই। সম্বন্ধই সত্তা। আর সেই ভাঙা গড়ার নামই জীবন।

আজ বড় ঘুম পেয়েছে।

এই কী জীবন ?··জানি না, জানি না কি করতে হয় ? বুদ্ধির মুখে শতেক উনুনের ছাই পড়ুক। বুভুক্ষু উপবাসক্লিষ্ট হৃদয়ের প্রতিশোধের চাপ আমার কৃত্রিম শুষ্কবুদ্ধি সহ্য করতে না পেরে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। জগতের সামনে বুদ্ধির এই অভিনয়, মিথ্যাভাষণ, মিথ্যা-আচরণ আর সহ্য করতে পারি না। মেকিবুদ্ধির ফেরি করতে প্রাণ আর চাইছে না। আজ, এই গভীর রাতে, নিজের কাছে আমার সত্য মূর্তি প্রকট হচ্ছে। স্থির দেখতে পাচ্ছি না····দূর আকাশে বিদ্যুতের মতন চমকে উঠল ·· চোখ বড় জ্বালা করছে।

যার সংস্পর্শে আমার এই অনুভূতি হল তাকে ধন্যবাদ। শুধু ধন্যবাদ নয়, আরো কিছু তাকে দিতে চাই— তার সামনে আমার এই মূর্তি ধরতে চাই— তোমার সৃষ্টি স্বচক্ষে দ্যাখ, মা যেমন নবজাত শিশুকে সগৌরবে শিশুর পিতার সামনে ধরে। তোমার সৃষ্টির দ্বারা তোমার পূজা হোক— আমার লজ্জা অন্তর্হিত হোক আমার অভিমান অপসৃত হোক— আনন্দ আসুক।

সে কী অন্তরালে আমার সত্যমূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবার জন্য প্রতীক্ষা করে না ? সে কী আমার অন্তরের মিথ্যার সঙ্গে যুঝছি দেখেছে ? আমার অন্তরের শূন্য-পিঞ্জরে ডানার নিষ্ফল ঝাপটা শুনে তার চোখ কি ছলছলিয়ে ওঠে না ?

তবে কি তার চেয়ে তার সৃষ্টিই মহৎ ? সে চলে রাজকুমারীর মত, তার দৃষ্টিতে ফুল ফোটে, তার চরণক্ষেপে ধূলা সার্থক হয়ে ওঠে, তার স্নেহকটাক্ষে হৃদয়কোরক উন্মুক্ত হয়— কিন্তু সবই কি তার অজ্ঞাতে, অনিচ্ছায় ? কী অকৃতজ্ঞ। যার চিত্ত তার কৃপায় আজ পুষ্পিত হয়ে উঠল তাকেই ভোলা ? সবই তোমার সৃষ্টি, তবে কেন এত অমনোযোগ। নিষ্ঠুর বলি ?

নিজেকে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ মনে হচ্ছে। কিন্তু লজ্জাই বা কেন, কিসে?

সম্বন্ধ সৃষ্টিই যদি জীবন হয় তা হলে আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রইল না ত! সমবেত জীবনকে অগ্রাহ্য ক'রে এসেছি, অগ্রাহ্য কেন ঘৃণাই করেছি। একত্র সৃষ্টি করার আনন্দেই যে জীবন পুষ্ট হয় বুঝি নি। সম্বন্ধেই আনন্দ। নার্সিসাসের মত নিজের মুখই দেখে এসেছি; কর্মের সোনার কাঠিতে অন্তর জেগে ওঠে, শুষ্ক চিন্তাধারায় জেগে ওঠে না। জানথ আত্মানম—কিন্তু

Know thyself! I? And what's that for my pay?

Why, if I know myself I'd ran away.

যতটা বাইরের জগৎকে জেনে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় ঠিক ততটাই উদ্ঘাটিত হয় তার নিজত্ব, ততটাই স্পষ্ট হয় তার নতুনত্ব। আজ আশ্রমে সেবা ক'রে এই বুঝলাম।

নাত্মানমবসাদয়েৎ— এই হল রাশিয়ার মূলমন্ত্র। গ্লাডকভ্-এর সিমেন্ট বড় ভাল লাগল।

নিজের ওপর বিশ্বাস আনবার জন্য কর্ম চাই, দৈনন্দিন কর্ম। ভেবেছিলাম কালই গ্রামে যাবো ফাউস্টের মতন চাষ করতে নয়, মহামারী লেগেছে সেবা করতে। আশ্রমকর্তা বারণ করলেন, আমার কোন শিক্ষা নেই। দিন কয়েকের জন্য কাশী ত্যাগ করতে হবে। নিষ্কর্মা, সম্বন্ধচ্যুত, চিন্তাময় জীবন ভাল লাগছে না। এখানে থাকতে পারছি না। কোথাও ঘুরে আসি

অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, ট্যাক্সির হুঙ্কারও শোনা যাচ্ছে না। রমলা দেবীর মনটা স্থির ও শান্ত হয়ে এল। আশ্রমকর্তা ভালই করেছেন তাঁকে গ্রামে যেতে না দিয়ে। কেবল চিন্তাই করে এসেছেন, যেন অশরীরী আইডিয়া! দেহ ওর নেই। কিন্তু আইডিয়া নিয়ে কি করবেন? সেবা থেকেই যে জানে সে কী কখনও সেবা করতে পারে— যার যা কাজ! কোলকাতায় ওঁকে আনতেই হবে— তার পর নিজের বাড়িতে বসে যা ইচ্ছা হয় করুন— কিছুই পারেন না— একটা প্রোফেসারি জুটেই যাবে·· বিকেলে বিজনের সঙ্গে টেনিস খেলুন! আর আমাকে যদি এতই ভয়, আমি কোনো বিরক্ত করব না— দেখব মুখের আলো···· কৃতজ্ঞ কেন? আমি কিছুই উপকার করিনি····করিনি····ঐ রকম উড়ে বেড়ান স্বভাবই ওদের·· অথচ কাউকে না হলে চলবে না··· আমি থাকব দূরে দূরে। দূরে দূরে থাকতে কষ্ট হবে, ওঁরই হবে, কাছে আসতে চাইবেন·· তখন তখনকার কথা তখন····

রমলা দেবী আলো নিভিয়ে দিলেন। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে···কোন শব্দ নেই···তবু মাথা জ্বালা করছে।

নয়

ভোর বেলাতেই রমলা দেবীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। শহর ইতিমধ্যেই বেশ জাগ্রত, রিকশওয়ালা ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে, মাছের ভার নিয়ে কুলি যাচ্ছে, তার পিছনে মেছুনি ছুটছে, বাসগুলো জোরে চলেছে, দূরে স্টেশনে এঞ্জিনের বাঁশি, শহরের শব্দ জট পাকিয়ে গেল বলে। রাতে ভাল ঘুম হয়নি, শরীর উত্তপ্ত, স্নানের ঘরে গিয়ে রমলা দেবী কানের পাশে ও মাথায় জল দিলেন। কান ও মাথা দিয়ে তাপ বেরুতে লাগল। হেয়ার লোশন মাথায় দিলেন, চোখ জ্বালা করছিল, গোলাপজল দিতে ইচ্ছে হল না। বিছানা ঝেড়ে তার ওপর ছিটের চাদর ঢাকা দিলেন। হাতঘড়িতে তখনও ছ'টা বাজেনি, মনে হল ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কানের কাছে ধরে দেখলেন যে চলছে, দম দিলেন, কুরকুর শব্দ বেশ শুনতে লাগে। ঘড়িটা চমৎকার, সপ্তাহে এক মিনিটের ব্যতিক্রম হয় না, আজকাল পরা হয় না, সময়ের তার আর কিসের প্রয়োজন? ভদ্রতা রক্ষার তার আর কোনো দরকার নেই, সময় কাটছে কি না দেখবার জন্যই ঘড়ি, সময় আপনি কাটে। সুজন কখন আসবে কে জানে? তার কথার দাম আছে। বিজনকে কড়া কথা শোনান ঠিক হয়েছে। ছেলে ভাল, দেখলে সুখ হয়, কথা কয় অনর্গল, ধার নেই— ভার আছে। সুজনের চরিত্রে গাম্ভীর্য এসেছে, বিজনের এখনও আসেনি, কখনও আসবে না, টেনিস খেলেই বেশ কাটাবে— তার পর বিয়ে থা করে সংসারী হবে— একলা থাকা তার হবে না। সুজন একলা থাকতে পারবে, তার দানা বেঁধেছে। কেনই বা মানুষ একলা থাকবে— একপায়ে সারসের মতন চঞ্চু গুঁজে নিদ্রা যাওয়া মানুষের স্বভাব নয়— কেন? পায়ের তলায় খাল বিল, না পচা পুকুর? সারসগুলো ভারী মজার দেখতে— মাছের লোভে ধার্মিক সাজে···না, সেগুলো বক। খগেনবাবুর চরিত্রে লোভ নেই, কপটতা নেই,··· বিজন বলছিল আছে আত্মম্ভরিতা ও অহঙ্কার। বেশ, তাই ভাল। পুরুষ মানুষে মিন মিনে হলে ঘেন্না ধরে। বিজন ছেলেমানুষ, বোঝে না— খগেনবাবু অন্তর্মুখী বাইরের সব ব্যাপারকে মাথার মধ্যে এনে যাচাই করতে চান, ঘটনা হয়ে যায় আইডিয়া, আইডিয়ার রীতি অনুসারে বাইরের জীবনটাকে সাজাতে চান—বাধে

বিরোধ। অহঙ্কারী ব্যক্তি নিজেকে ভালবাসে, উনি নিজের ভাবনা ভাবতে ভালবাসেন। বিজন তাঁকে ভুল বুঝেছে, সুজন ঠিক চিনেছে। একবার যে দেখেছে সে শ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারে না। সুজনকে বড ভালবাসতে ইচ্ছে হয়, বিজনের মত ছেলেমানুষ নয়। সুজন খুব শ্রদ্ধাবান· মেয়েরা বোধ হয় শ্রদ্ধার উপরন্তু কিছু নিতে চায়। ওঁর কৃতজ্ঞতা কে চায়? আগে রোগীর সেবা ক'রে আত্মতৃপ্তি আসত— কই বিজনের অসুখে সে ভাব এল না ত! সব যেন ওলটপালট হয়ে গিয়েছে·। অসুখ হয় নি ত? ভগবান করুন, যেন সেবার কোন প্রয়োজনই না হয়। সন্ন্যাসী ঠিক বুঝেছেন— সেবার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়— কিছু জানে না। কিন্তু সেবা করতে মন্দ লাগবে না, ও বাড়িতে থাকা হবে না, মুকুন্দ মেরে ফেলবে— এখানে সুজনের মেডিক্যাল কলেজের বন্ধুরা আসবে সাহায্য করবে— রাত জাগতে তাদের কষ্ট হবে না।

সুজন সাতটার পূর্বেই এসে হাজির হল। ড্রয়িংরুমে চা খেতে খেতে রমলা দেবী প্রশ্ন করলেন, 'বিজনের শরীর কেমন?'

'শরীর ভাল, মন খারাপ।'

'বড বাড়াবাড়ি করেছিল কাল।'

'এই সেদিন অসুখ থেকে উঠেছে।'

'না, অসুখে কি মন বিকৃত হয়? এখনও মন তৈরি হয়নি।'

'না হোক, প্রাণের প্রাচুর্য আছে।'

'তার সঙ্গে শ্রদ্ধা থাকলে মন্দ হত না।'

'এখনও ছেলেমানুষ, বয়স হয়নি, যার যা নেই তার জন্য আক্ষেপ করে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।'

'ঠিক বলেছ।'

'আপনি ত বিজনকে খুব ভালবাসেন জানি— অত সেবা করলেন।'

'তাকে খুব বল—অনেককেই সেবা করতাম।'

'ওর বেলা একটু পার্থক্য ছিল। আপনি যেন যমের হাত থেকে লড়াই করে ওকে ছিনিয়ে আনলেন। আপনার সেবার মধ্যে একটা কোথায় একটা ভীষণ জোর ও দাবি ছিল। সেবা করতে ভাল লাগে না?'

'দাবি করতে, জোড় ফলাতে আর ইচ্ছে হয় না। ছাখ সুজন, আমার 'মধ্যে' বলে কোন বস্তু নেই।'

'আছে, জানেন না।'

'জান্‌তি পারি না।'

'সত্যি বলছি, আছে।'

'বল।'

'ভাল ক'রে বলতে পারি না— খগেনবাবু থাকলে বলে দিতেন।'

'তুমি তাঁকে চেনো?'

'ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। কাশী যাবার দিন সকালে বই-এর দোকান থেকে আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন। আত্মসন্ধানী, এযুগে ঐ টাইপ বিরল, তাই তাঁর প্রয়োজন বেশি।'

'কিন্তু সন্ধানের পর পৌছান চাই ত।'

'না হয় নাই গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হলেন, না হয় নাই কিছু পেলেন— সন্ধানটাই বড় তাঁর কাছে।'

'সকলের কাছে নয়।'

'তিনি সকল নন। এখন তিনি কাশীতে না?'

'কাশীতেই কি থাকবেন? এধার ওধার যেতেও পারেন।'

'কবে আসবেন?'

'জানি না।'

'লেখেন নি?'

'কই ওসব কথা কিছুই লেখেন নি।'

'কেমন আছেন?'

'কি করে জানব। ভালই নিশ্চয়…কেন?' সুজন খানিকক্ষণ একদৃষ্টে রমলা দেবীর চোখের পানে চেয়ে রইল, রমলা দেবী ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিলেন। আর এক পেয়ালা চা দিয়ে তিনি উঠে গেলেন। যখন রমলা দেবী আবার ঘরে এলেন তখন তাঁর হাতে কাগজের তাডা। সেই তাডাটি যেন চোখে পডেনি সুজনকে এমন ব্যবহার করতে হল। রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুজন, পাইপ খাও না? বেশ দেখায় গন্ধটা ভাল লাগে।'

'মনের দুঃখে পাইপ খাব।'

'সুজন, পডবে?'

'এখন, এখানে?'

'বুঝিয়ে দাও— বুঝতে পারছিনা যে', রমলা দেবী ডায়েরির খানকয়েক পাতা তুলে রাখলেন।

সুজন পডতে লাগল— পাতার পর পাতা, পর পর নয়, এলোমেলো, অগোছাল, রমলা দেবী পিছনে দাঁডিয়ে সঙ্গে পডতে লাগলেন। পডা শেষ হবার পর সুজন মুখ তুলে চাইলে। রমলা দেবী বল্লেন, 'আরো কয়েক পাতা আছে।'

'থাক।'

'বুঝিয়ে দাও।'

'আমি কি বলব রমাদি?'

'বল না ভাই, তুমি তাঁকে বোঝ, আমি যে বুঝতে পারছি না।'

'ধর্ম হল না, বিজ্ঞানে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, আর্টে তাঁর মুক্তি হবে— এই বিশ্বাস করেন।'

'সম্বন্ধ নিয়ে কি লিখেছেন?'

'একা থাকা যায় না, সম্বন্ধ সৃষ্টি করতে চান।'

'সৃষ্টি মানে কি?'

'স্থাপন হল স্থিতির, সৃষ্টি পরিণতির। নতুন হলে সৃষ্টি হয়।'

'আর্ট মানে ছবি দেখা গান শোনা?'

'ঠিক তা নয়, যে আলো আর্টের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয় উনি সেই আলো চাইছেন।'

'কার আলো? আর্টিস্টের মনের?'

'আর্টিস্ট যখন রচনা করে তখনকার আলো নয়, তখন শুনেছি আলোর চেয়ে ধোঁয়া ও আগুনের তাপই বেশি থাকে। ভেতরকার যে আলোয় পূর্ণ রচনা দীপ্ত হয়ে ওঠে উনি সেই আলোর কাঙাল। বাজে জিনিস পুড়ে যাবার পর যেমন কয়লা জলজল করে, সাদা রং ধরে, incandescent হয়, উনি বোধ হয় নিজে তাই হতে চান। আর্টিস্ট, জীবনের আর্টিস্ট, অভিজ্ঞতাগুলি উপাদান, উপকরণ। কি মনে হয়?'

'আমি কি করে জানব? আমার শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই।'

'দীক্ষা হয়েছে।'

'হাঁ....উনি বোধ হয় আধ্যাত্মিক কিছু চান।'

'কিন্তু এত কষ্ট কিসের?'

'এ যে Burning of the bush! কষ্ট হবে না।'

'আমি সহ্য করতে পারি না, কারুর কষ্ট।'

'লিখুন না, চলে আসতে।'

'ঠিকানা জানি না।'

'তাঁর মাসীমা হয়ত জানেন।'

'কাশীতে হয়ত নেই।'

'ঠিকানা বার করা শক্ত নয়। কাশীতে গিয়ে খোঁজ করলেই হয়। যাবো?'

'না, গিয়ে কাজ নেই— তোমার কষ্ট হবে।'

'কষ্ট হবে না। আমারও তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করছে। ভদ্রলোকের বই পড়া সার্থক। তাঁকে আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। দেখা হলে ধরে আনবো।'

'তিনি আসবেন না।'

'আপনার জন্যেও না?' সুজন গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অপ্রস্তুতে পড়ে কথার মোড় ঘোড়াতে গেল—

'আপনি সাবিত্রীর অত বন্ধু ছিলেন, বন্ধুত্বের খাতিরও আছে ত?'

'খাতির আবার কিসের? তাঁর এককালে ধারণা ছিল যে আমিই সাবিত্রীকে নষ্ট করেছি। কিন্তু সত্যি বলছি, আমার দোষ ছিল না, আমি কখনও কুপরামর্শ দিই নি, আমি তাকে ভালবাসতেই শিখিয়েছিলাম— কী বলতে কী বলেছি, সে কি বুঝতে কী বুঝেছ, আমি চেয়েছিলাম সে যেন স্বামীকে ভালোবাসে, নিজে সুখী হয়। তা সে পারল না। এর বেশি আমি ভাই কিছুই চাই নি। তোমার কাছে বলছি— স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার ঘৃণা ধরে গিয়েছিল, সেই ঘৃণার বশে আমি হয়ত অন্যায় করে ফেলেছি— কিন্তু আমার হৃদয় যে কাঁটায় ভর্তি, আমি কি করব বল? সাবিত্রীকে শেখাবার মধ্যে আমার প্রতিশোধ প্রবৃত্তি হয়ত মিশে গিয়েছিল। উনি দেখলেন আমার সেই প্রবৃত্তিটা, কিন্তু আমার অন্তরে কি ছিল আমিই জানি?'

'জানিয়ে দিতে নেই কি?'

'আমার বুঝি আত্মমর্যাদা নেই! কেন বোঝাব? সে বুঝতে পারে না, যার অত বুদ্ধি।'

'বুদ্ধি এ বিষয়ে হয়ত নেই।'

'হয়ত কেন, নিশ্চয় নেই। আমি জানি। শিশু, একেবারে শিশু, সোডার বোতল খুলতে জানে না, শব্দে ভয় হয়। অসুখ করলে কি হবে? ঐ ত মুকুন্দ!'

'আত্মমর্যাদা জ্ঞান একটু কমিয়ে ফেল্লে তাঁর উপকার হয়।'

'এখন আর নেই।'

'তবে আমার সঙ্গে 'কাশী চলুন না কেন?'

'কাশী! কার জন্য? কেন?'

'এই ধরুন নিজের স্বাস্থ্যের জন্য। বিজনের অসুখ এখন সেরেছে— এবার আপনি না পড়েন ভয় করে।'

'আমার দেহের ওপর কোন মায়া নেই। কোথায় উঠব, কার সঙ্গে যাব। একলা গিয়ে যেখানে-সেখানে থাকা যায় না।'

'কেন? আমারও শরীরটা ভাল নয়, বিজনের বন্দোবস্ত করছি, আমার এক আত্মীয় আছেন— সেখানে উঠলে তাঁদের কষ্ট হবে না।'

'হয়ত সেখানে নেই।'

'বেশত, অনিশ্চিতের পিছনে ছুটতে ভালই লাগবে। সবই কি নিশ্চিত, হাতের আমলকী?'

'কি জন্যে যাব? আমাকে কোন প্রয়োজন নেই। আমি কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র। সে পাত্রের দূরে থাকাই ভাল, অন্তত তাতে ক্ষতি হয় না।'

'প্রয়োজন আছে। আপনাকে ভিন্ন....'

কথা বন্ধ হয়ে গেল খানিকের জন্য।

'তুমি খেয়ে যাও।'

'না, কাশী যাবার যোগাড় করিগে— বিজন একলা থাকবে। একটা তার করে দিই?'

'উনি বোধ হয় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন।'

'বেশি দিন তিনি বাইরে থাকতে পারবেন না।'

'তুমি তাঁকে জান না।'

'নিশ্চয়ই জানি না, কিন্তু কেমন যেন মনে লাগছে যে অল্পদিনের মধ্যে কাশী ফিরে আসবেন, যদি কোথাও গিয়ে থাকেন। কাশী দেখাটাও অন্তত হবে, মন্দ কী?'

'ধর দেখা হল, তার পর?'

'পরের কথা পরে।'

'বিরোধ কাটবে?'

'অন্তরের বিরোধ কাটবে— কিন্তু....'

'কিন্তু কি?'

'বাইরের বিরোধ কাটবে কি? সমাজ....'

'তা হলে যেতে বলছ কেন?'

'জেনে শুনে যাওয়াই ভাল, তবে তাঁর পক্ষে তাঁর অন্তরের বিরোধ সমন্বিত হলেই যথেষ্ট হল না কি? আপনার যথাসাধ্য ততটুকু করা চাই।'

'তুমি এত শিখলে কোত্থেকে— এই বয়সে?'

'দিদি বলে ডাকি বলেই কী নাবালক? এধারে বয়সের গাছ পাথর নেই যে!'

'আচ্ছা এবার থেকে আমিই না হয় দাদা বলে ডাকব।'

'মানহানি হবে না। তা হলে দাদার কথা শুনুন।'

'শুনুন বলতে নেই ছোট বোনকে, 'শোন' বলতে হয়।'

'আমার কথা শুনুন।'

'শোন।'

'শুনুন, কাশী চলুন।'

'যাব না।'

'কেন ?'

'যে কারণে তুমি 'তুমি' বলছ না— আপন করতে জানা চাই।'

'ঐ কারণটার কথাই উল্লেখ করেছিলাম। ঐটাই বাইরের বিরোধ। আপন করার মানে বুঝি তুমি বলা? তাকে পরিপূর্ণ করেই আপনার সার্থকতা— এই হল আপন করা। কৃতজ্ঞ পর্যন্ত হতে দেবার অবকাশ যেন সে না পায়।'

'নিষ্ঠুর! আচ্ছা, সু, কাউকে আপন করা যায় ঐভাবে ?'

'চেষ্টা করেই দেখুন না। একমাত্র সাধনা কি বুদ্ধিরই ? ভাবের সাধনা নেই বুঝি। তিনি বুদ্ধির দিক থেকে সাধনা করুন, আপনি করুন অন্য দিক দিয়ে। মিলবেন একই জায়গায়।'

'তুমি আপন করেছ ?'

'কেন রমাদি, তুমি বিজন কী আমার আপন নও ?'

রমলা দেবীর চোখে জল এল, 'আচ্ছা তাই যাব, কিন্তু যদি আপন না হয় ?'

'আপন সম্পত্তি হবে না— না হয়েও আপন হবে— তিনি হবেন তখন তোমার সৃষ্টি।'

'তুমিই তাঁর কথা বুঝেছ, আমি বুঝিনি। বিদুষী নই।'

'বিদ্যের কথা কোথায় পেলেন ? যেই মন এবং প্রাণ দিয়ে দেখবে সেই বুঝবে, প্রত্যেকেই বোধগম্য— অবশ্য যদি ইচ্ছে না হয়, তা হলে অন্য কথা।'

'যদি আপন না করে ?'

'তবু আপন হবে।'

'পারব ?'

'নিশ্চয়ই পারবেন, তবে বড় কষ্ট। কিন্তু আপনি বলতে হবে, পারবেন ত ?'

রমলা দেবী আনতমুখে বসে রইলেন····'কাশী যাব না।'

'এইটুকুই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা— তিনি এত কষ্ট করছেন নিজেকে বাঁধতে, আর আপনি পারবেন না ?'

'শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু শ্রদ্ধাই দিতে চাই না।'

'সবই না হয় দেবেন— চলুন।'

রমলা দেবী হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন— 'কি বলছ, সুজন।'

'তা হলে, আপনি— চিরকালই আপনি।'

'আমি যাব না।'

'আমার অনুরোধ, তাঁর জন্য!'

'আমি মেয়েমানুষ নই?'

'বুঝিয়ে দেবেন চলুন— মেয়েদের ভালবাসা কি ধরনের? তাদের আপন করার পদ্ধতি অন্য রকমেরই— তাদের মানে, তাদের মধ্যে ভালোদের।'

'অর্থাৎ তাদের মধ্যে অস্বাভাবিকদের।'

'ভদ্রতা মানেই তাই। স্বভাব মানে বুঝি যেটা অধোমুখী? ঊর্ধ্বমুখী স্বভাব বুঝি স্বভাব নয়। দুইই প্রকৃতিতে আছে।'

'যদি না পারি? ভরসা দিচ্ছ ত?'

'আমি ভরসা দেবার কে— রমাদি? সাবধান করে দিতে পারি। কাল বিকেল পাঁচটার সময় আসছি— তৈরি থাকবেন।' রমলা দেবী চুপ ক'রে বসে রইলেন।

দশ

হাওড়া স্টেশনে যখন তাঁরা পৌঁছলেন তখন গাড়ি ছাড়বার বিলম্ব আছে।

'ইন্টার ক্লাসের দু'খানা সিঙ্গল কিনো।'

'পারবেন না, ভিড়ে কষ্ট হবে।'

'কষ্ট হবে না, তোমার গাড়িতে যাব।'

'মেয়েদের গাড়িতে ভিড় কম।'

'মেয়েদের গাড়ি বড় নোংরা, তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাব।'

'সুজন যখন টিকিট কিনতে গেল তখন রমলা দেবী হুইলারের স্টল থেকে একটা স্ট্রাণ্ড ও লেডিজ জার্নাল এবং এক শিশি জেনাসপিরিন কিনলেন। পাশেই একটি রেলওয়ে ফিরিঙ্গী কর্মচারী বায়স্কোপের পত্রিকা দেখছিল। রমলা দেবী একটু সরে দাঁড়ালেন, লোকটি আবার কাছে এল— তিনি কাগজ কিনে সরে এলেন, লোকটি ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে লাগল। সুজন টিকিট কিনে ফিরে আসতেই রমলা দেবী প্ল্যাটফর্মের মধ্যে যেতে চাইলেন— কিন্তু গেট তখনও খোলা হয়নি। প্ল্যাটফর্মের আলো জ্বলে উঠল। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটি অল্পবয়সী মেয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এলেন। মেয়েটির কোলে শিশু, 'কখন গেট খুলবে বলতে পারেন?'

'ঠিক জানি না।'

শিশুটি কেঁদে উঠল— গেট খুলে গেল। প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ধীরে ধীরে পিছু হটে

গাড়ি প্রবেশ করছে।

'রমাদি, মেয়েদের গাড়িতে উঠুন না।'

'তোমাদের গাড়ি খালি।'

'এখনই ভরে যাবে।'

'ভিড় হলে চলে আসব।'

ভদ্রলোক স্ত্রীলোকটিকে ইণ্টার ক্লাসের মেয়ে-গাড়িতে তুলে দিলেন। ওঠবার সময় বালতি থেকে দুধের ঘটিটা সশব্দে পড়ে গেল 'অকর্মার ধাড়ি, এখন দুধ পাবে কোথায়? গেলাবে কি?' ট্রেন গেল ভরে— সুজন আবার রমলা দেবীকে মেয়ে গাড়িতে যাবার অনুরোধ করলে।

'তুমি দেখে এস, ওখানে ভিড় আছে কিনা।'

সুজন নেমে গেল। রমলা দেবীর পাশে একটি সাত আট বছরের ছেলে এসে বসল— তার পিতা স্টেশনে পায়চারি করছেন— ছেলেটি হঠাৎ পকেট থেকে ছুরি বার ক'রে দাঁত দিয়ে খুললে, তারপর এধার ওধার দেখে জুতোর তলায় শান দিলে, খানিক পরে আবার চারধার দেখে বিছানা বাঁধা দড়ির ওপর ধার পরীক্ষা করতে লাগল— রমলা দেবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পরীক্ষার ফল জানা হল না। গাড়িটার সামনে সেই ফিরিঙ্গী যুবক বেড়াচ্ছিল, অন্য সীটের এক ভদ্রলোক তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন।

সুজন ফিরে এসে বল্লে, 'গাড়িতে কোন ভিড় নেই, যান না, মহিলাটি বড় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন— বাচ্চা ভীষণ চেঁচাচ্ছে, ভদ্রলোকটি ভীষণ বকছেন....'

সামনের সীটের ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন— 'যান না, যান না, মেয়েদের গাড়িতেই ভাল— বেশ ফ্রী হবেন, হাত পা মেলে বসতে পাবেন, এখানে অসুবিধে হবে আপনাদের।'

রমলা দেবী এণ্ডির চাদরটা জড়িয়ে নিলেন। গাড়ি ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়ল। রমলা দেবী সুজনকে বল্লেন, 'এইবার যাও, সারারাত বসে থাকতে হবে। খাবার কখন খাবে।'

'বর্ধমানে। এরি মধ্যে খোকাকে আপন করেছেন?'

'খুকি বড় নখ্‌খি মেয়ে।'

সুজন চলে গেল— আবার ম্যাগাজিন দুটো ও কুঁজো নিয়ে ছুটে এল।

'ও নিয়ে কি করব?'

'লেডিজ জার্নালটা রাখুন।'

'তুমিই দেখ, কাজ রয়েছে এখানে। ব্যাণ্ডেলে কেলনারের দোকান থেকে পোয়াটাক তাজা দুধ এন।'

মহিলাটি বলে উঠলেন—'ওরা মোছলমান— হিন্দুদের দোকানে·····না দরকার নেই।'

'আচ্ছা, খানিকটা জল ও একটা হরলিক দিয়ে যেও, টিফিনক্যারিয়ার থেকে পেয়ালাপিরিচ আর চামচেটা দিও— ক্যারিয়ারটাই দিয়ে যেও, এখন নয়, যাও, গাড়ি ছাড়ল।'

গার্ড সাহেবের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে হাতের সবুজ নিশান উড়ল। হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে গাড়ি ছাড়ল, খুকি ঘুমিয়েছে।

ব্যাণ্ডেলে সুজন গরম জল, হরলিকের নতুন কৌটা ও খাবারের বাক্স এনে দিয়ে নিজের কামরায় চলে গেল। মহিলাটি হরলিক খুকিকে খাওয়ালেন না, বিকেলে দুধ খাইয়ে এনেছেন এবং সারাক্ষণই খাচ্ছে— বর্ধমানেই নেমে যাবেন। বর্ধমানে গাড়ি খালি হল— মহিলাটি হরলিকের কৌটা নিলেন না, 'দরকার নেই, বিলিতী ওষুধ খাওয়ালে খুকির অসুখ করবে, উনি রাগ করবেন।'

সুজন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে খাবার খেয়ে নিলে। কুঁজো থেকে জল ঢালার সময় বাঁশি বাজল। রমলা দেবী নামতে দিলেন না— 'কেউ কিছু বলবে না, গাড়িতে আমি একলা, তা ছাড়া নিয়মও আছে, কেউ এলে নেমে যেও।' অগত্যা সুজনকে বসতে হল। রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা সুজন, আপনি ছাড়া তুমি বলতে নেই কেন?'

'একটু দূরে দূরে থাকতে হয়, দূরে দূরে রাখতে হয়, নচেৎ চোখে পড়ে না। দূরে রাখাই আর্টিস্টের সাধনা।'

'তাতে যে প্রাণে ধরে না।'

'তা হলে তুমি বলবেন।'

'তুমি আমাকে তুমি বল।'

সুজন অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসু নয়নে বসে রইল। রমলা দেবী বাইরে চোখ ফেরালেন। অগণিত তারা, ঐ দূরে কালো ছোট্ট পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আরো দূরে মাঠের বুক চিরে আগুন বেরুচ্ছে, কয়লার খনি। রমলা দেবীর হাতটা সুজনের গায়ে ঠেকল, 'বলনা সু।'

'কেন?'

'বড় ইচ্ছে করছে কেউ আমাকে আপন ভাবুক।'

'কেউ?'

'ধর তুমি।'

'আমি কেন?'

'তুমি ওঁর শিষ্য, বিজন বলেছে, তাইত তুমি অত সহজে আমাকে চিনেছ।'

'ও।'

'ও কেন ?' প্রশ্নের উত্তর এল না....রমলা দেবী চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

'তুমি বল্লে কি হয় জানেন ?'

'কি ?'

'এই যে নিজেই বল্লেন।'

'কি বল্লাম ?'

'আপন হয়ে যায়। আমি ত আপনার খুবই আপন, আপনার কত স্নেহ পেয়েছি।'

'তা নয়— কী জানি।'

গাড়ির বেগ বেশ মন্দ হয়েছে। সুজন দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, 'এইবার নামতে হবে, গোলমাল করবে নাহলে।'

'বোসো না।'

'কোনো ভয় নেই, ঠিক পাশের গাড়িতেই আছি, ডাকলেই পাবেন, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন।'

'তুমিও ঘুমিও —জায়গা পেলে।'

গাড়ি থামবার পূর্বেই সুজন নেমে পড়ল। ছোট্ট স্টেশন, নিচু প্ল্যাটফর্মে সুজন দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে রমলা দেবী বল্লেন 'উঠেই পড় না সুজন।'

'না রমলাদি, ডাকবেন না অমন ক'রে. আমার ঘুম পেয়েছে।'

'আমার যে ঘুম পায়নি— ভাল লাগছে না।'

'ঘুমুতে চেষ্টা করুন।'

ছাড়বার বাঁশি না বেজেই গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। গাড়ি যখন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ছে তখন সুজন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রমলা দেবীর মুখ দেখতে পেলে, বাইরে চেয়ে আছেন। নিজের মুখে হাত আড়াল ক'রে একটু আস্তে বল্লে— 'রমলাদি, "তুমি" বোলো না, "আপনি" বোলো, প্রাণ না ভরলেও। ঘুম না এলে এই চিঠি প'ড়ো।'

রমলা দেবী হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন। হাতে ক'রে বসে থাকবার পর খাম খুলে চিঠিটা পড়তে লাগলেন।

সুজনবাবু,

কেবল প্রতিজ্ঞা পালন করেছি ভাবলে আমার ওপর অন্যায় করা হবে। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় স্বল্প, তবু যেন মনে হয় কয়েক ছত্র লিখলে শান্তি পাব। আপনার সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টা কথা কয়েছি, কিন্তু তাই আমার পক্ষে

যথেষ্ট। সেদিন আপনাকে আমার বক্তব্য বোঝাতে পারি নি। আপনারও প্রশ্ন করা হল না, আমারও উত্তর দেওয়া হল না। যা মনে আসছে লিখে যাচ্ছি এরই মধ্যে হয়ত উত্তর পাবেন। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা প্রশ্নের আধিক্যই আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে, যদিও জিজ্ঞাসার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে চিন্তাস্রোতকে বন্ধ করব না। মৈত্রী আমার কাছে এতদিন ছিল কথার কথা। রমলা দেবীকে বন্ধু হতে বলেছিলাম— তিনি রাগ করেই উঠে চলে যান। এতদিন যিনি সম্বন্ধহীন, নিরালম্ব হয়ে দিন কাটিয়েছেন তাঁকে আমি কি না দিতে গেলাম মনঃকল্পিত গুণ-বাচক শব্দ! শব্দ নিয়ে তিনি কি করবেন? তাই বুদ্ধিমতীর মতন প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বুঝলেন যে আমার মৈত্রী অর্থহীন। তাই আমি লজ্জিত। তখন বুঝি নি। এখন বুঝেছি। মন আমার কচি লাউ ডগার মতন ছোট ছোট তন্তু দিয়ে ওপরে উঠতে চায়। লতাতন্তু কাটলে লতাই যায় মরে। আমার লতা যাচ্ছিল মরে, আপনাদের যত্নে আমার কচি পাতা বেরিয়েছিল, আমি হয়েছিলাম সজীব— কিন্তু এখানে আপনারা নেই, কাকে আশ্রয় করে বাঁচব?

অর্থাৎ আমি এখন মৈত্রীর অর্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি। নিরালম্ব হয়ে থাকা যায় না— আমি পারলাম না। কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা ঠিক নয়। আপনি বলেছিলেন, মৈত্রী মানে ঘটকালী করা, catalysis। হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে সত্য নয়। অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনকার্যে নিজেকে নিঃশেষিত করতে পারি না। আমি কেবল সম্বন্ধের যোগ-সমষ্টি নই ক্যাটালিসিসের পরিবর্তন মাত্র অসম্পূর্ণ গুণাত্মক। আমার মিলনে মিলনকর্তা আছে, সেটি আমি নিজে। নিজেকে মিলনের জন্য উপযুক্ত করা চাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে মিলন ঘটিয়ে আপনি তৃপ্তি পেতে পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণ হতে পারেন কি? মিলন করতে গেলেই দেখবেন নিজেই মিলিত হচ্ছেন, কিন্তু সেটা নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি— কাব্য জগৎ থেকে। সমালোচকেরা বলেন, শ্রেষ্ঠ কবিতার চিহ্ন তার স্বতঃস্ফূর্তি, অর্থাৎ পাঠক নিজের ইচ্ছা শক্তি না খাটিয়ে সেই কবিতা থেকে রসানুভব করতে যদি পারেন তবেই সেটা ভাল কবিতা হবে। কিন্তু লেখকের কথা ভাবুন— তাঁর লেখবার সময় কি নিজের শক্তি খরচ হয় না? লোকে ভাবে— 'কবির মনে ভাব এল, ভাষার সঙ্গে মিলন হল চিন্তার, অমনি কবিতা লেখা হয়ে গেল। যে কবিতা লেখে সেই কবি— সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনও এই রসচক্রের মধ্যে বাসা বাঁধলে— গড়ে উঠল মধুচক্র। যেন একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত বিনা আয়াসে রচিত হল।' তা হয় না, হয় না, অতি সহজে মিলন হয় না। জনসাধারণের কাছে মৈত্রীর অর্থ বৃত্তের মধ্যকার আন্তরিক সম্বন্ধটুকু। কিন্তু তাঁরা কি দেখেন যে আন্তরিক সম্বন্ধস্থাপনে কত কষ্ট পেতে হয়— একটা লাইন মেলাতে কত রাত

জাগতে হয়। জীবনটা কি বটতলার নভেল? মিলের জন্য, মিলনের জন্যও সাধনার প্রয়োজন।

ঘটক ঠাকুরের পরিবারবর্গ আছে শুনেছি। আপনার পরিবারবর্গ বিজন, রমলা দেবী— আপনি মামার ভাগ্নে, বিজনের পিসতুতো ভাই, স্নেহের পাত্র, হয়ত ভিখারি তাই রমলা দেবীর বন্ধু। কিন্তু এই সম্বন্ধস্থাপনে কি আপনার কোন কিছু ত্যাগ করতে হয়নি, সবই কি সহজে সম্পন্ন হয়েছিল? কার্বনের তিন হাত বাঁধা, চতুর্থটি না বাঁধা পড়া পর্যন্ত আপনি অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণতার সন্ধানের নামই মৈত্রী সাধনা। কবির ভাষায় creative unity— যেটি মনুষ্যত্বের একমাত্র তাৎপর্য। তা হলে, বাঁধা না পড়ে কি উপায় নেই? স্বাধীনতার অর্থ কি? অর্থ ঠিক কি জানি না, কেন না স্বাধীন হই নি। তবে স্বাধীনতার প্রয়োজন কি বলতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্য, প্রবৃত্তি ও ভাবগুলি নানা কারণে কর্মে পরিণত হতে পারে না, অথচ পরিণত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। তর্কবুদ্ধির শান্তি সঙ্গতি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। কর্মে পরিণত হবার সুযোগ চাই, নচেৎ অশান্তি। এই হল স্বাধীনতার প্রয়োজন।

এই প্রকার বাধাবিপত্তি বিঘ্ন প্রপঞ্চের অতিরিক্ত একপ্রকার স্বাধীনতা আছে। যেদিন কোন ব্যক্তির অনুভূতি জন্মাবে যে এই বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যে একটি সনাতন শাশ্বত সত্তা আছে, এবং সেই সত্তায় তদ্‌গত হলেই তার জীবনের সার্থকতা, সেই মুহূর্তে সে হবে স্বাধীন, স্বরাট। সঙ্গে সঙ্গে শান্তি, কারণ তখন আর বিরোধ রইল না। এই অনুভূতিতে বাইরের বাধা রইল না, যে-সব বাধা উদ্দেশ্যকে পরিণত হতে না দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করছিল। এই প্রকার অনুভূতি স্বপ্রমাণিত। অন্তরের বাধাও এখানে লোপ পেল, সত্যোপলব্ধির তাগিদও মিটল, বুদ্ধির বাধাও ঘুচল।

শাশ্বত সত্য আছে,কি নেই প্রশ্ন উঠছে না। না থাকলেও অনুভূতি সম্ভব— মানুষের Universal-এর দিকের প্রগতিটাও এক প্রকার প্রবৃত্তি। নভেলিস্টরা সেটা ধরেন না।....আমি সব রকম অনুভূতির অস্তিত্ব ও প্রয়োজন মানি না। মাত্র ঐটুকু অনুভূতির প্রয়োজন স্বীকার করি— না ক'রে উপায় নেই— অতএব তার অস্তিত্ব আছে। এ ছাড়া ঐ প্রকার অবস্থার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় কিসে? জ্যোতির্বিদ ঐ উপায় প্রথমে অবলম্বন করার পর যন্ত্র দিয়ে নতুন তারা আবিষ্কার করেছেন।

কিন্তু আমার সমস্যা, মাত্র স্বীকার করা নয়, অর্জন করা, অস্থায়ীকে স্থায়ী করা, পরকে আপন করা, বাহিরকে অন্তরে আনা, প্রয়োজনকে অস্তিত্বে পরিণত করা।

কিন্তু আমার যে বাধা অনেক। মৈত্রী-সাধনের ফলে বাধা ঘুচবে? ধরুন আবার যদি কোলকাতায় ফিরি, কিংবা আপনারা যদি এখানে আসেন, তা হলে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার অনুভূতি দৃঢ় হবে? আমার শান্তি আসবে? আমি অসম্পূর্ণ, তাই অশান্ত।

আজ বিশেষ ক'রে আমার প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। শান্তি আর সম্পূর্ণতা কি এক বস্তু? আপনিই উত্তর দিন না? আচ্ছা, রমলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করবেন— তাঁর কাছে আমার উত্তর বন্ধক আছে। বন্ধকটা ছাড়িয়ে নেবেন।

আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হবার স্বপক্ষে একটা যুক্তি আছে।

মৈত্রী-স্থাপনে ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না, এটা জনতায় আত্মবিসর্জন নয়— সেই জন্য বৈচিত্র্যও বজায় থাকে। ভিড় আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু বন্ধুত্ব কি চাইলেই পাওয়া যায়? পূর্বে লিখেছি— পাওয়া যায় না। তবে তখনকার চাওয়া আর এখনকার চাওয়া এক নয়।

তখন পাইনি বলে আমি কাশী চলে আসি। এখনও আমি অসম্পূর্ণ, তবে অন্য ধরনের—কারণ আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাই আজ আপনাদের এখানে আসতে লিখছি। যদি সুবিধা হয় অবশ্য।

শাশ্বত অতিশয় কনকনে ঠাণ্ডা, কষ্টিপাথরের মূর্তির মতন মনে হয়। পিগ্‌-ম্যালিয়নের গল্প মনে আছে? এই মূর্তিকে কে প্রাণবন্ত করবে? আমার ধ্যানে যে জীবনদান সম্ভব সে জীবন ক্ষণস্থায়ী। পাথরের অন্তর থেকেও কম্পন আসা চাই, রোদ্যাঁর ভাস্কর্যের মতন।

দেখুন, প্রকৃতি পুরুষের সৃষ্টি নয়। দুইই অনাদি ও অনন্ত। অতএব তাদের সম্বন্ধও অনাদি ও অনন্ত। তবু প্রকৃতি দেবীর প্রথম কম্পনের কথা কল্পনা করতে ভালোলাগে— গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বনানীর মধ্যে বনদেবতার একটি নিঃশ্বাসে পাতা-শিহরণের মতন। জাগরণ নয়, শিহরণ। জাগরণ সকলে সহ্য করতে পারে না, আমি পারব না। জাগ্রত অবস্থা বড়ই স্পষ্ট, বড়ই খোলাখুলি— ইন্দ্রিয় তখন অতিশয় ক্রিয়াশীল।

আমি চাই সুষুপ্তি— তামসিক তন্দ্রা নয়, রাজসিক জাগরণ নয়। সেখানে সব আছে— নির্যাসের অবস্থায় ঠিক নির্যাসও নয়, কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ— অন্ধ হয়ে নয়, বাইরের চোখ বুজে, তৃতীয় নেত্র খুলে। লোকে ভাবছে ঘুমুচ্ছে!

শিবঠাকুরকে আমার বড় ভাল লাগে। রবিবাবুরও লাগে। বিশ্বনাথরূপে নয়, রুদ্ররূপে নয়, হরপার্বতী রূপে। নন্দলালবাবুর ছবিটা আমার বড় প্রিয়, great, great, great!

ঐ ছবিটা কি মৈত্রী সাধনের প্রতিমূর্তি নয়? কিন্তু নন্দী ভৃঙ্গী ওখানে নেই।

আছে ? অন্তরালে ?

ইতি

খগেন্দ্রনাথ

পুঃ রমলা দেবী কেমন আছেন ? তাঁর জন্য কখনও কখনও মন ব্যস্ত হয়। তাঁর কাছে রোজ যাবেন। উত্তর জেনে লিখে পাঠাবেন।

ইণ্টার ক্লাসের ক্ষীণ আলোতে রমলা দেবী চিঠিটা পড়লেন— ক্রমেই আলো ক্ষীণ হয়ে এল, হাত স্থির থাকছে না, চিঠির লাইনগুলো নড়ছে— লেখার ওপর পর্দা পড়ে আছে···চক্‌চকে পর্দা, অভ্রের মত— গাড়িটা বড়ই দুলছে, হাতটা নড়িয়ে দিচ্ছে— সুজন তাই অত বোঝে····এঞ্জিনটা বড় হুসহুস শব্দ করছে···বোধ হয় গাড়িটা ওপরে উঠছে— চড়াই বুঝি।

আবর্ত

হরিদ্বারের আশ্রমে এসেই খগেনবাবুর জ্বর রীতিমত ফুটল। লছমনঝোলা থেকে ফেরবার পথে একজন বাঙালী সাধুর প্রতিষ্ঠিত আতুরালয়ে আধ আউন্স অ্যামন কুইনিন গলাধঃকরণ করে সামলে যান, কিন্তু তারপর মোটর বাস্-এর ঝাঁকুনি এবং যাত্রীদের কণ্ঠের কোলাহল ও গায়ের দুর্গন্ধে তিনি রীতিমত কাতর হয়ে পড়েন। টলতে টলতে আশ্রমে পৌঁছেই শয্যা নিলেন। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা আর হাড়ভাঙ্গা কাঁপুনি নিয়ে জ্বর বাড়ল—বর্ষা শেষের বাংলা-জ্বর পাহাড়তলিতে বায়ুপরিবর্তনে এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে, লোকালয় তার চিরপরিচিত, ভাদ্র মাসের পচা গরম, জলীয় বাষ্পের সঙ্গে উত্তাপ মেশানো, মশকের দল সোনার বাংলার মহিমা করতে করতে উত্তেজিত এবং গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে। পাহাড়ী হাওয়ায় জ্বরের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে এইটুকুই যা পার্থক্য।

একজন অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার আশ্রমের রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। অ্যালোপাথি কেন সব ওষুধেই তিনি বীতশ্রদ্ধ। গরম জলে একটা আস্ত লেবুর রস গুলে খাবার পর ভুটিয়া কম্বলে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শোবার ব্যবস্থা দিলেন। জ্বর পাহাড়ে বেশি দিন থাকে না শুনেও খগেনবাবু আশ্বস্ত হতে পারলেন না। ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর খগেনবাবু ব্রহ্মচারীকে ডেকে ইংরেজীতে বল্লেন, 'দেরাদুনের সিভিল সার্জেনকে এখনই তার করো, মোটরে চলে আসবে। বিজ্ঞানে অবিশ্বাসী ডাক্তার বৃদ্ধা অসতী গৃহিণীর মতন। যার পয়সায় এতদিন ভরণপোষণ হোলো তার প্রতি একটা কর্তব্য থাকাটাই কর্তব্য। যে স্বামীর পয়সায় খায়নি, পরেনি, তার কথা স্বতন্ত্র। যখন চাকরি করতেন তখন কী কর্মকর্তা এঁর ন্যাচুরপ্যাথি বরদাস্ত করত? কখনই না। তার চেয়ে সিভিল সার্জেনের চিকিৎসা ভাল।' রোগীর উত্তেজনা দেখে ব্রহ্মচারী মাথায় ভিজে কাপরের টুকরো রাখল। 'ও-ডি-কোলন এক শিশি আনান, বাজারে পাওয়া যাবে না? জলটল বাজে জিনিস,

একটি মাত্র গুণ বীজাণু বহন করা, টাইফয়েড, কলেরা, আর কত কী'র। আপনাদের বিশুদ্ধ গঙ্গাজলের অদ্ভুত গুণাবলি আমি মানি না। তার চেয়ে কলের জলই ভাল, আরো ভাল ও-ডি-কোলন। যার যাতে উপকার হয় সে নিজে বোঝে, ডাক্তারেও বোঝে না, সন্ন্যাসীও বোঝে না। সকলের বাত এক নয়। 'আদিম প্রকৃতি' মিথ্যা কথা, অর্জিত অভ্যাসটাই প্রকৃতি, নচেৎ আপনি ব্রহ্মচারী কেন? বিয়ে থা করে ঘরকন্না করবেন কোথায়, আর এ সব কী! রোগীর সেবা, সকালে বিকালে পুজো-আচ্চা সব খাতে বসে? 'ধুত্তোর' বলতে ইচ্ছে হয় না। সভ্যতাটা প্রায় দশ হাজার বছরের, সেটাই প্রাথমিক— তারই তৈরি ডাক্তারি, তারই সৃষ্টি সমাজ, সমাজেরই দশকর্ম-বিধান, সমাজ রক্ষার জন্যই বিবাহ। হয় বিবাহ, না হয় মাত্র একত্র বসবাস— তাও, তাও পৃথক হওয়ার চেয়ে সমাজের পক্ষে হিতকর। ডাকুন আপনাদের মহারাজকে!'

ব্রহ্মচারী খগেনবাবুকে শান্ত করবার চেষ্টায় বিফল হয়ে আশ্রম-কর্তাকে ডেকে আনলেন। তাঁর আগমনে রোগীর উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল, খাড়া হয়ে বিছানায় বসে খগেনবাবু বলতে লাগলেন, 'অনুগ্রহ করে 'বৎস' বলে ডাকবেন না, বাছুরের কথা মনে হয়, ভ্যা ভ্যা করে ডাকছি যেন! শুনুন গোটাকয়েক সাফ কথা। জীবনের এ কটা দিন নষ্ট করেছি, স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে, টাকা উড়ে গিয়েছে তাতে দুঃখ নেই, আপশোষ এই যে নিজেকে ঠকিয়েছি। বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করি, কারণ বিজ্ঞান পরকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু খাতে বসাতে প্রথমে পারিনি, এখনও ভয় পাই, তবু নাস্তি গতিরন্যথা ভেবে সাধনা করতে হবে— তুকতাকে চলবে না। আপনারা সব তুকতাক ও তাবিজের কারবারী। আপনাদের কাজই হোল সিজোফ্রেনয়েড সৃষ্টি করা, বিশ্বাসীদের মনের খোরাক যোগান। কিন্তু আমি ছাড়া আর একজন রয়েছে যে! তার দাবি মেটাবেন কি করে?'

মহারাজের মুখে হাসি ফুটে উঠল— 'কে সে? তিনিও না হয় আশ্রমবাসী হোন।'

'একজন কেন, দশজনও হতে পারেন। একজন নয়, দশজনও নয়, আমি ও আমরা ছাড়া বাইরের প্রত্যেকে, যারা ধাতুগত আশ্রমবাসী নয়; তাদের আশ্রমে ঢোকাবেন? আশ্রমে আর সংসারে তফাৎ রইল কোথায়?'

'আশ্রম হল আদর্শ সংসার।'

'তাই বটে! আপনাদের জমিদারীর আয় কত এ বৎসরে! অন্তত বিশ হাজার টাকা, তা ছাড়া খুচরো চাঁদাও আছে। সেই চাঁদা ফেরৎ চাই না— তবে, অনুগ্রহ করে সিভিল সার্জনকে ডাকুন, আমিই তাঁর টাকা দেব, তার পর সেরে উঠে চলে যাব, আর আসব না। ভুটিয়া কম্বলে হিমালয়-ভ্রমণ চলে, এখানে চাই

ক্যামেলহেয়ারের কম্বল। নিয়ে যান, কাউকে দিয়ে দিন। নিজেকে পরের থেকে গুটিয়ে রাখতে পারি না আর। আলগোছে জীবনযাত্রা নিতান্ত কৃত্রিম। আমার নতুন অধ্যায় শুরু হোল।'

সকালে জ্বরের বহর দেখে সিভিল সার্জনকে ডাকতে হোল। ডাক্তার সাহেব চলে যাবার পর খগেনবাবু ব্রহ্মচারীকে বল্লেন যে তিনি ব্রোমাইড খাবেন না কিছুতেই, অতএব প্রেস্‌ক্রিপশন মত ওষুধ আনা যেন না হয়, তাঁর মস্তিষ্কের বিকার হয় নি, দেহের ওপর প্রভুত্ব তাঁর হয়ত চলে গিয়েছে, কিন্তু মাথা তাঁর নিজের। 'ছাখ, ব্রহ্মচারী, তোমার ডাক নাম কি? তোমার মা তোমাকে কি বলে ডাকতেন? তোমার দাদা-দিদিরা? ভুলু...ছাখ ভুলু, সব বিশ্বাস খোয়ালেও নিজের মাথার ওপর বিশ্বাস হারিয়ো না, মারা পড়বে।'

'একজন না একজনের ওপর আস্থা রাখতেই হয়, আপনার বিজ্ঞান, ডাক্তার, আমাদের গুরু, গুরুই ব্রহ্ম।'

'ভুলু, আমি বিজ্ঞানও মানি না, সব সমান করে দেয়, তবে তোমাদের মন্তরের চেয়ে ভাল। আমি ব্রোমাইড খাবনা...সাপের মাথায় লাঠি পড়ল কিন্তু মরল না, ডিউক অব মন্‌মাথের গলায় কটা চোপ পড়ে মনে আছে? সে বুঝি অন্য ভদ্রলোক যে বলেছিল দাড়িটা কি দোষ করলে? মাথায় একটু ও-ডি-কোলোন দাও, ইতিহাসের ঘটনাগুলো ঠিক মনে থাকছে না, ভুলে যাচ্ছি কেবল; ন্যাকড়া দিও না, ভারী ঠেকছে...বড় ভাড়ী এই বোঝা, অবান্তরের স্তূপ, প্রয়োজনীয়কে চাপা দেয়, কি চায় মানুষে বুঝতে দেয় না। কত জ্বর হে? নিশ্চয় চার হয়েছে। বড় ভাল লাগছে আমার। ভাল চিমনি কি করে জান? কাঁচা কয়লার ধোঁয়া পর্যন্ত হজম করে ফেলে। নতুন চিমনি পারে না, তখন ধোঁয়া যাবে উড়ে, খুব উঁচুতে, ঊর্ধ্বে, তোমাদের ভগবানের কাছে। তিনি থাকেন কৈলাসে, কয়লার ধোঁয়া তাই যায় না। থাকতেন কোলকাতায়, বুঝতেন সব মানুষে পয়সার অভাবে ভাল চিমনি তৈরি করতে পারে না তাদের রান্নাঘরে। তোমাদের ভগবান গ্রামবাসী, গ্রামে বসে সুদ কষছেন। রাগ হোলো, ভুলু? কিন্তু সত্য কথা, তিনি শহুরে নন, ভিড় সহ্য করতে পারেন না, তাই পালান মহাপ্রস্থানে। ধুলো, ঘাম, ধোঁয়া, ভিড় নিয়ে সংসার, তারই প্রয়োজনে তাঁর আবিষ্কার, অস্তিত্ব এবং পরিপূর্ণতা। অথচ আশ্রম করছ তোমরা শহরের দুহাজার মাইল দূরে। যাও ফিরে সব গ্রামে, সেখানে পচাপুকুরে পাট পচে, শহরে, যেখানে আস্তাকুঁড়ের খোশা কুড়িয়ে মায়েরা ছেলেদের খাওয়ায়। পূজা করতে হয়ত সেখানে...এখানে আমি থাকব না।'

'আপনি সুস্থ হলেই দেশে যাবেন।'

'দেশ? দেশ ঠিক আমার নেই, আমি কোলকাতার ভদ্রলোক, আমার

আত্মীয়-স্বজন বড় বেশি কেউ নেই। যাঁরা আছেন তাঁরা ব্যস্ত হবেন।'

'তাঁদের টেলিগ্রাম করব ?'

'কী হবে।' খগেন বাবু পাশ ফিরে মুড়ি দিয়ে শুলেন। 'ভুলু, অন্য কম্বল আন।' ব্রহ্মচারী মহারাজের কাছ থেকে দুটি নরম বিলিতী কম্বল এনে রোগীর সর্বাঙ্গে ঢেকে দিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় জ্বর বাড়ল, খগেনবাবু কেবল জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, আমার মাথায় কি হলো ? ব্রহ্মচারী লুকিয়ে ব্রোমাইড খাইয়েছিলেন। খানিকটা অঘোরে নিদ্রার পর রাত প্রায় তিনটের সময় খগেনবাবু জেগে উঠলেন। গলা শুখিয়ে গেছে, মাথার দিকের জানলা বন্ধ, উঠে জল খাবার ও জানলা খুলে দেবার ইচ্ছা হলো ; কিন্তু বুকের ওপর হাতটা পাথরের মতন ভারী ঠেকল, গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না, পাও নাড়তে পারলেন না, মাথাটা যেন লোহার ফুটবল, নিতান্ত অলস ও নিষ্কর্মা, বুক যেন ধসে গিয়েছে, নিচে নেমে যাচ্ছেন, গভীর খাতের মধ্যে, পিছল ঢালু, আঁকড়াবার জন্য গাছপালার শিকড় পর্যন্ত নেই, নিতান্ত অসহায় অবস্থায় জুল্ জুল্ করে চেয়ে থাকা, নিরাসক্ত মমতাহীন আশাশূন্য মতিহীন গতি, প্রাকৃতিক মাধ্যাকর্ষণে লীন হয়ে গেছে বুদ্ধির উত্তুঙ্গ দাম্ভিকতা…নিমজ্জনই জীবন · জীবনের শেষ… কপালে স্বেদ-বিন্দু ফুটে ওঠে কেন ? ভয়ে ? জ্বর ছাড়বে ? বড় তৃষ্ণা পায়, জিব পর্যন্ত নড়ে না… বহু উদ্যমে খাত থেকে শব্দ উঠে আসে… 'শুনছ ভুলু, জল দাও।' ব্রহ্মচারী শুনতে পায় না। ঘুমুক বেচারি, জনসেবায় কাতর, আত্মসংযমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, যেন জাপানী থালা-বাগানের বট, উপবাস করান হয়েছে, তলায় নুড়ি আর ফণী-মনসার গাছ…ফুকো কাচ, ফুকো মানুষ, মিথ্যা দ্যুতি, ধার করা আলো, অন্ধকারে মিশে যাক, ঘুমুক, বেচারি ঘুমুক।

সাবিত্রী ঘুমুতো দেহটা গুটিয়ে, কুণ্ডলি পাকিয়ে ; সঙ্কুচিত হয়েই কাটিয়ে দিলে তার ছোট্ট জীবনটুকু, বিছানার একপাশে রাত্রে, আর গ্রীষ্মকালের দুপুরে মাটি ভিজে গামছায় মুছে ঘরের একটি গোপনতম কোনে, ট্রাঙ্কের আড়ালে, আলমারির পাশে ; একদিন বলেছিল, ওগো, তুমি টেবিলে বসে পড়, আর আমি টেবিলের তলায় ঘুমুব…কী মধুর লেগেছিল তখন…কিন্তু সেও এক রকম মাথায়-হাঁটা সম্পত্তিজ্ঞান, পরে নিজমূর্তি ধারণ করেছিল। তবু এক রকম ছিল, রাতে তেষ্টা পেলে জল দিত। কেনই বা আত্মঘাতী হ'ল ? নিশ্চয়ই মনে বুঝেছিল যে রমলাই তার জিনিস কেড়ে নেবে…কিংবা বুঝেছিল যে তার স্বামী মনে মনে অন্যাকে, রমলাকেই চায়… বুঝেছিল ভাষার পিছনকার রক্ত দিয়ে। যখন বিষ খাচ্ছে তখনও কি একবার চুপি চুপি মুখ দিয়ে সে-রক্তের ঝলক বেরোয় নি, একবার চুপি চুপি বলে ওঠেনি যে—না, পারেনি, নিশ্চয়ই পারেনি, বেচারির গলা

কাঠ হয়ে গিয়েছিল, হাত ওঠেনি শিশি তুলতে মুখে, জিভ নড়েনি স্বীকার করতে যে তার স্বামী রমলার, তার নয়। স্বীকার করা বড় শক্ত, সত্যকে স্বীকার মানে নবজন্ম, তার মানে পুরাতনের মৃত্যু। কোথায় জন্মেছে আবার কে জানে? এবার নতুন সত্যে সে যেন জন্মগ্রহণ করে। স্বীকারে বিরোধের অবসান, শান্তি, মিথ্যার মৃত্যু, দ্বিজত্ব লাভ।

রমলা দেবী, না, স্বীকার করা যাক, রমা, রমার মধ্যে পুরুষালি ভাব আছে, সে যা অনুভব করেছে তা মনের কাছে গোপন করে নি, মুখ ফুটে অন্তত নিজের কাছে বলেছে, ডেকেছে বিছানায় শুয়ে 'ওগো এস'— তাই সে সৎ, আচারে সতী, তাই সমাজ তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য, নতুন সমাজ, এই মাখন-তোলা বাজারের দুগ্ধপোষ্য সমাজ নয়। রমলা স্বীকার করেছে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে, জেনেছে নিজের ধর্মকে, তাই তার ব্যবহার রাজকীয়, ক্লিওপ্যাট্রার মতন 'রয়াল'। সে চাইছে জোর করে, নদীর খাত চায় যেমন ঝরনাকে··· জারসোপা জলপ্রপাতের মতন হাজার ফুট নিচে এক ধারায় লাফিয়ে পড়া, ঠোকর খেতে খেতে খুঁড়িয়ে চলা নয়, মনে কোন দ্বিধা নেই, সংযমের বালাই নেই, ধর্মের, সংস্কারের শিলাখণ্ড তার পথ রোধ করে না।

তাঁর নিজের মন হরিদ্বারের পরবর্তী জাহ্নবীর মতন, ঢালু জমিতে তার বহতা। গোড়া পর্যন্ত প্রায় নৌবাহ—ভরা নৌকা, বিদ্যার সংস্কারের ধর্মবুদ্ধির সাধনার চিত্তশুদ্ধির বোঝাই করা গাধাবোট। গুণ টেনে ওপরে ওঠান হয়েছে, এবার স্রোতের টানে ভেসে আসছে, গুণ গেল ছিঁড়ে, হালে পানি পায় না, সর্বনাশ! গলা ওঠে শুখিয়ে। হরিদ্বারের গঙ্গার স্রোতে খল খল শব্দ হয়, অ্যানিকাটের জলে স্রোত নেই, শব্দও নেই। তারপর নির্ঝরিণী স্রোতস্বিনীতে পরিণত হ'ল— তার তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নয়, সে প্রতিবাদ করে না, কেবল বলে না, মা, না। নেতিধর্ম জীবনের অপমান। এই স্রোতস্বিনীতে জোয়ার আসে সমুদ্র যখন দম্ভের সহিত আপন রাজ্য বিস্তার করে। রমা কি জোয়ার আনবে? কবে?

মস্তিষ্ক অবশ হয়ে আসছে, আবেশ দেহের অন্য অঙ্গকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে, পাকস্থলী গুলিয়ে ওঠে, ওষুধ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে চায়। খগেনবাবু চেঁচিয়ে জল চান। ব্রহ্মচারী উঠে জল দেন, কপালে হাত দিয়ে জ্বরের উত্তাপ দেখেন। জ্বর কমে নি। খগেনবাবুর চিন্তাসূত্র জট পাকিয়ে যায়, অন্তঃস্থলী ওলটপালট হয়, যেন রুপী-বাঁদরী ঘাঘরা পরে কেবলই ডিগবাজি খাচ্ছে।

গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে মহারাজের কথাবার্তা শুনে। তিনি বলেছিলেন, 'বৎস, তোমার অবিশ্বাস তেজিয়ানের, তাই এত মূল্যবান, তোমার সত্যবাদিতা আমাকে মুগ্ধ করে, আশ্রমের পক্ষে তোমার সততা অমূল্য, আজ যদি তোমার আদর্শ

ভারতবর্ষের আশ্রমে আশ্রমে।....'ভারতবর্ষ=আশ্রমের জ্যামিতিক শ্রেণী; ভারতবাসী=আশ্রমবাসীর ভিড়, আশ্রমের কর্তারা মিলে সেভিয়েটতন্ত্রানুযায়ী এক মহাকর্তা নির্বাচন করলেন, তিনিই মহারাজ। সমীকরণটি চমৎকার। শাঁসালো শিষ্যের প্রতি গুরুর বিশেষ কৃপা, তাঁর আপত্তি সততার লক্ষণ, তাঁর প্রত্যেক ব্যবহারই সৎ। আর খোরপোশি গরীব শিষ্য রোজ রবিবারে ঝাণ্ডা নিয়ে পচা কমলালেবু রং-এর আলখাল্লা পরে ভাঙ্গা হারমনিয়মের সঙ্গে 'একেবার তোরা মা বলিয়ে ডাক'-এর সুরে ছন্দহীন গান গাইতে গাইতে হ্যাণ্ডবিল বিলোতে বিলোতে ভিক্ষা করে বেড়াক, আর পিতৃমাতৃহীন গরীব শিষ্যরা রান্নাঘরে বেলা চারটে পর্যন্ত হাঁড়ি ঠেলুক। সুন্দর ব্যবস্থা। খাঁটি ভারতীয় অনুষ্ঠান।

অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে সন্ধ্যাবেলায় বক্তৃতা শুনে। হিন্দু দর্শনের সঙ্গে য়ুরোপীয়ান ফিলজফির মূলগত পার্থক্যের ওজস্বিনী বক্তৃতা; আমাদের হোলো আর্ট, ওদের সায়েন্স, আমাদের অনুভূতি, ওদের বিচারবুদ্ধি, আমাদের হোলো আত্মজ্ঞান, ওদের কথার কচকচি, আমাদের আত্মা, ওদের দেহ....মহরাজ, মহারাজ আমাদের অধীনতা, ওদের আধিপত্য, আমাদের দৌর্বল্য, ওদের বীর্য, আমাদের ম্যালেরিয়া, ওদের এভারেস্ট জয় করবার জন্য প্রতি বৎসরের শোভাযাত্রা।

একটু বেশি উঁচুতে উঠলে মাথা ঘোরে, পেট গুলিয়ে ওঠে, বেশি নিচুতে নামলেও তাই, সমুদ্রের লোনা জল ভেতরে যায়। বেশি উঁচু আর বেশি নিচুতে থাকার ফল কি একই? কোথায় যেন পার্থক্য রয়েছে। কেদারনাথের কাছ বরাবর চটিতে শুয়ে একরাত্রে তাঁর কামনা সহস্র ফণাবিশিষ্ট বাসুকীর মতন খিদের চোটে জেগে উঠল—খাদ্য তার যতেক রমণী....বায়ুভুকেরও ব্যাঙ চাই মধ্যে মধ্যে—সংযম গেল টুটে, নগ্ন-বক্ষ তুষারাবৃত চূড়া-যুগলের আভাসে ইঙ্গিতে। কী দুর্নিবার, অথচ কত স্বাভাবিক, সভ্যতার গণ্ডীর বহির্ভূত এই উচ্চ গিরিশ্রেণী অদীক্ষিত মানবপ্রকৃতির পক্ষে। চেতনার বিক্ষেপ নেই, জীবনের উত্তাপ নেই, ভিড়ের গন্ধ ও ধূলো নেই, বিক্ষোভের গুরুত্ব নেই এই পার্বত্য শান্তি ও সত্যে, হিমালয়ের নির্মল হাল্‌কা হাওয়ায়। গল্প মনে পড়ে; গল্প না সত্য? একটি য়ুরোপীয়ান মহিলা টাট্টুর পিঠে চড়ে অদৃশ্য হোলো, ল্যাজ ধরে চলেছে পথপ্রদর্শক, যেন ঈগল-পাখি সূর্যের আলোকে মিশে যায়, তারা কোথাও না কোথাও তাঁবু গাড়বে, রাতে মেয়েটির শীত করবে, ঠক ঠক করে কাঁপবে, তখন ঐ শেরপাই হবে মানুষ ও প্রকৃতি এই দুটি আদিমতার যথার্থ সেতু। মনে পড়ে সে রাতের কথা, কিন্তু নিতান্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে। সে রাতে রমলাকে প্রয়োজন হয়েছিল। বোধ হয় রমলারও। তাই হয়, মনের বেতার-বার্তায় মিলন ঘটে। আজ কিন্তু রমলার চেহারা অন্যরূপে ফুটে ওঠে।

লাল ডগ্‌ডগে শাড়িতে ফ্ল্যামিঙ্গো, ময়ূরকণ্ঠীতে মাছরাঙা, নীলকণ্ঠ; নীল শাড়িতে কস্‌মস, কমলা রঙের শাড়িতে পাড় নেই, যেন ভিক্ষুণী; চীনে কালির মোটা পাড়, যেন তারই ভুরু ও তারার রঙে ছোপান; হলদে রঙের পাড় আর শ্বেতশুভ্র জমিনে চলন্ত শিউলি ফুল। বড় ঢ্যাঙা দেখায় স্কার্ফ পরলে, মূর্তিমতী য়ুক্যালিপ্‌টাস। এক দিন জর্জেটের ওপর লেস ঝলমলায়, যেন আমলকী ডালের পাতায় লাগে ঝিরঝিরে হাওয়া। চোখের পালকে জলের ছিটে লেগেছে।

রমলা ফুঁপিয়ে কাঁদে সাবিত্রীর ঘরে, তারই চাবি নিয়ে বাক্স গোছাতে বসে, চুড়ি ও চাবির আওয়াজ কানে আসে, ছোট্ট সেতারের তরফের তারে ঝংকারের মতন। রমলা গলির মোড়ে ডাস্টবিনের পচাগন্ধ সহ্য করতে না পেরে নাকে কাপড় দিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে, সাবিত্রীও তাই নাকে রুমাল দিতে শিখেছিল।

সাবিত্রী নকল-রমলা, ভেক রাজকুমারী। ভেক না হলে ভিখ মেলে না। কিন্তু ধরা পড়ল, তাই ভিখারী চলে গেল।

সেদিনকার এক ঘটনা মনে পড়ে। আশ্রমের সামনে মোটর-বাস হাজির, হুড়মুড় করে জনকয়েক পূর্ববঙ্গীয় ভদ্রলোক নেমে সরাসরি মহারাজের ঘরে এসে তাকে বল্লে, যে তাদের কুলবধূ নিস্তারিণী দেবী পালিয়ে এসে এই আশ্রমে স্থান পেয়েছে, তার একমাত্র কন্যা মা মা করে কেঁদে আকুল এবং নিস্তারিণী যদি তৎক্ষণাৎ তাদের সঙ্গে বাড়ি না ফেরে, তবে তার স্বামী পুনরায় বিবাহ করবে। নিস্তারিণী দেবী, আশ্রমের ভগিনী চন্দ্রাবলী, একজন পাচিকা। খগেনবাবু তাঁর ইতিহাস জানতেন না, মহারাজ তাঁকে ডেকে পাঠানোর পর ব্যাপারটা আন্দাজ করলেন। লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী বৌ-এর মতন এক হাত ঘোমটা টেনে উপস্থিত। মহারাজ তাকে প্রশ্ন করলেন যে সে ভদ্রলোকদের চেনে কি না। উত্তর এল নিচু গলায় যে সে জানে, তারই দেওর, ননদাইরা।

'তুমি যেতে চাও ফিরে?'

ভগিনী চন্দ্রাবলী মহারাজের চোখের দিকে তাইল····মহারাজের দৃষ্টি কঠিন ··· মন্ত্রমুগ্ধের মত ভগিনী উত্তর দিল যে সে যাবে না।

মহারাজ বল্লেন, 'এখন ইনি সাবালিকা।' ভদ্রলোকেরা পুলিশে খবর দেবার ভয় দেখিয়ে চলে গেল। দু-তিন দিন পরে ঘাটে নিস্তারিণী দেবী ওরফে ভগিনী চন্দ্রাবলী স্নান করতে যায়, সঙ্গে আর একজন বৃদ্ধা ছিলেন, ফেরবার পথে আত্মীয়রা নিস্তারিণীকে জোর করে ট্যাকসিতে তুলে উধাও। বৃদ্ধা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেন মহারাজকে, তিনি দুর্বৃত্তদের পিছনে হুলিয়া ছাড়বেন বলেন। খগেনবাবু সেদিন মহারাজকে বেশ দু'কথা শোনান আশ্রমের বিপক্ষে। পূর্বসঞ্চিত আপত্তি-

গুলি প্রাণ খুলে খরচ করে আশ্বস্ত হন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আকাশে জ্যৈষ্ঠশেষের মেঘের মতন ধীরে ধীরে আশ্রমের বিপক্ষে তাঁর আপত্তিগুলি জমে উঠেছিল, বর্ষণ হয় নি— সেদিন হল আষাঢ়ের ধারার মতন। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণটাই সত্য সম্বন্ধ, মরুভূমি বৃষ্টি চায়, তাই বালিও সৎ, বৃষ্টিও সৎ; বৃষ্টি না হওয়াটাই অসৎ। জোর করে চাওয়াটাই সৎ; অভদ্র ভিক্ষা এবং কৃপা দুইই অসৎ। আশ্রম মানবপ্রকৃতির আকাঙ্ক্ষাকে ভয় করে, তাই যুবকদের ব্রহ্মচারী থাকতে হয়। তারও বেশি পাপ সমাজের চাহিদাকে ভয় করা। সমাজের দোষ আছে, কিন্তু তাই বলে পালিয়ে আসবে। খগেনবাবুর মনে পড়ে তিনি নিজেই তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীকে উন্নত করতে যান এবং রমলার কাছে থেকে পালিয়ে এলেন, অন্যের পৃথক সত্তা স্বীকার করবার ভয়ে। নিজের প্রতি ঘৃণা শত মুখ হয়ে ফেরে আশ্রমের বিপক্ষে। ভুলুর প্রতি, ভগিনী চন্দ্রাবলীর প্রতি, তাদের সম্বন্ধের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে এই আশ্রম।

এই ব্রহ্মচারীকে খাবার সময় নিস্তারিণী পাখার হাওয়া করছে দেখে মহারাজ তিরস্কার করেন। দুজনের দেখাসাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ হয়, তবু নিস্তারিণী ভুলুকে না খাইয়ে নিজে খেত না। সেটা মহারাজের চোখে পড়েনি, খগেনবাবুর চোখে পড়ে। খগেনবাবু বুঝলেন যে দুজনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। একদিন বলেও-ছিলেন,'ব্রহ্মচারী যদি কোনও কারণে তোমাদের আশ্রমবাস অসম্ভব হয় তবে চলে এস। আমার সমাজে তোমাদেরই প্রয়োজন, সেখানে সস্ত্রিয়ম্ ধর্ম্মমাচরেৎ। অ-সামাজিক পাপে আশ্রমই আশ্রয় দেয়, অনাশ্রমিক ব্যবহারের পাপে আমার, আমাদের সমাজ তোমাকে আশ্রয় দেবে।' ব্রহ্মচারী তখন চোখ নিচু করে থাকে।

কিন্তু যেদিন ভগিনী চন্দ্রাবলী অদৃশ্য হল, সেদিন বিকেলে ভীমগোদার নিচে একটা বড় পাথরের ওপর বসে ব্রহ্মচারীর চোখে খগেনবাবু জল দেখলেন। নিস্তারিণীর সঙ্গে যে বৃদ্ধাটি স্নানে যান, যিনি এসে দুর্ঘটনার সংবাদ দেন, তাঁকে গোপনে জেরা করে ব্রহ্মচারী বুঝেছে যে সে স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছে। কাপড় দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হয় নি, জোর-জবরদস্তি, ধ্বস্তাধ্বস্তি করে গাড়িতে তুলতে হয় নি, কেবল চোখ ছলছল করেছিল— ঘরণী গৃহিণী মেয়ে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় যতটুকু ছলছলে চোখ দেখানো ন্যায্য বিবেচনা করে।····সব ভেক। বৃদ্ধা কিন্তু মহারাজকে বলেছিলেন অন্য কথা— ভগিনী যেতে চায়নি, তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে গেছে, মাথা গেল ফেটে, রক্তগঙ্গা, মাগো! খগেনবাবু ব্রহ্মচারীর মুখে সত্য বিবরণ শুনেই উঠে পড়েন, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ঘরের দরজায় খিল দেন। ভেক নয়, দুর্বল মস্তিষ্ক মেয়েটির। গৃহত্যাগ করলি যদি,

আর ফিরিস নি, এলিই বা কেন আশ্রমে, ভুলুকে খাবার সময় পাখার বাতাস করারই বা কি প্রয়োজন ছিল ? মেয়েরা যখন যার তখন তার। রমলা কি তাই ? বুকটা কেঁপে ওঠে, হাত পা ঠাণ্ডা হয়। না, না, রমলা ভিন্ন ধরনের, ওরকম ছিল সাবিত্রী। সে তার স্বামীকে ভালবাসত বহুসম্ভব স্বামীর একটি হিসেবে। রমলা তারই বন্ধু, কিন্তু সেই সে রাত্রে, তার শিশুপুত্রের মৃত্যুর রাত্রে সে এল কণ্ট্রাক্টর গৃহিনীর বাড়ি পালিয়ে, স্বামী এলেন খুঁজতে, বাড়ি নিয়ে যেতে লণ্ঠন নিয়ে, সঙ্গে চাপরাশির হাতে মোটা লাঠি নিশ্চয়ই ছিল, নিয়ে গিয়ে স্বামীত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। রমলা এল চলে কোলকাতায়, সেই থেকে একলা, বুড়ো বটগাছ-তলায় ভাঙ্গা দেবী মূর্তির মতন, ফুজিয়ামার মতন একাকী, নিঃসঙ্গ, নির্ভীক। সেই ত উপযুক্ত ব্যবহার। গেলনা সে আশ্রমে, নিজের পায়ে দাঁড়াল, পথ খুঁজল সজ্ঞানে, সেইত ঠিক— নচেৎ নিস্তারিণী, ভগিনী চন্দ্রাবলী আবার কুঞ্জে প্রবেশ করলেন, শ্রীরাধার কুঞ্জ থেকে ভোরবেলায় হয়ত কৃষ্ণ ফিরবেন, তখন তিনি ঘুম থেকে উঠে তাকেই বীজন করবেন। ঘৃণা হয় নারী-শক্তির অপমানে। নারী জাগ্রত হোক। রমলা জাগ্রত ? খগেনবাবু বিছানা থেকে উঠে বসতে চেষ্টা করেন।

গা ঘিন্ ঘিন্ করে নিস্তারিণী দেবীর ক্লীব আচরণে।

লক্ষ্ণৌ-এর খোলা চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু স্বাভাবিক পরিবেষ্টনেই থাকে। লম্বা ঘাসের মধ্যে পুকুর কাটা, তাতে জল, ঝোপের মধ্যে বাঘের ঘর। বাঘ যথেচ্ছা বিচরণ করতে পারে, কোন কষ্টই তাকে দেওয়া হয় না, অন্তত কর্তারা ভাবেন যে তার পাওয়া উচিত নয়। হরিদ্বারের পথে খগেনবাবু লক্ষ্ণৌ-এ রইলেন একবেলা। সারা শহর বিচলিত, ঘর থেকে বাঘ বেরিয়ে পড়েছে, য়ুক্যালিপ্টাস বাগানে বসে রয়েছে, ভয়ে কাছে কেউ ঘেঁসতে পারছে না, ডেপুটি কমিশনার সাহেব এলেন প্রকাণ্ড খাঁচা নিয়ে, সামনে খাঁচা, পিছনে সাহেব, আর খাঁচার ওপরে বাঘের প্রহরী। বাঘ থাবা গেড়ে বসে রইল, ওপর থেকে প্রহরী একটা খুব লম্বা ও শক্ত দড়ির শেষে ফাঁস তৈরি করে ছুঁড়ে, দ্বিতীয় চেষ্টাতেই, বাঘের গলার পরিয়ে দলে, ফাঁস গেল আটকে, আর সাহেব 'কাম্ কাম্' বলে ডাকতে লাগলেন। খাঁচার ওপর থেকে প্রহরী দরজাটি টেনে তুললে, বাঘ সুড় সুড় করে ঢুকে পড়ল। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। সেই বাঘের আবার সঙ্গী হল, তারা ঝগড়া করলে, একটা ঝগড়া করে মরে গেল, অন্যটা উপোস করে আত্মঘাতী হল। পলাতকটা বাঘ না বাঘিনী প্রকাশ নেই। ভারতবর্ষের বাঘিনীগুলোও ঐ নিস্তারিণী দেবীর মতন খাঁচায় যেতে সর্বদাই প্রস্তুত, সাহেবকেও ভয় করে। খাঁচায় ফিরবে, অথচ ঝগড়া করে মরবে। তার চেয়ে ছেড়ে দিলেই হয় বনে, কেন এই বন্ধ করা! চিড়িয়াখানার

স্বাভাবিকতা আর আশ্রমের স্বাধীনতা একই বস্তু।

শীতল হাওয়া খগেনবাবুর গা স্পর্শ করে। সূর্য উঠেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, পাহাড়ের মতন মেঘ ও মেঘের মতন পাহাড়ের অন্তরালে। ধীরে ধীরে হাওয়া আসে। ব্রহ্মচারী ঘরে নেই, জানালা খুলে দিয়ে নেমে গিয়েছে। কটা বাজল কে জানে? এতক্ষণ বোধহয় সে সাধারণ-পূজায় বসেছে। দল বেঁধে পূজা হয়, উপাসনা হয়, কিন্তু প্রার্থনা হয় না। প্রার্থনার আবশ্যকও নেই। ছিঃ, করুণা নামবে ওপর থেকে শিশিরের মতন! নিজের শক্তি কোথায় যাবে? কি করবে? অথচ একা এই বিছানাতেই পাশ ফেরা যায় না, পরের সাহায্য চাই, এতই দুর্বল মনে হয়। ওষুধে কি ব্রোমাইড দিয়েছে? বারণ করেছিলেন ত দিতে। বড় দুর্বল এই দেহটা। সাবিত্রীকে পুড়িয়ে এসে চোখ কর্‌কর্‌ করছিল, রমলা দেবী গোলাপ-জল চোখে ঢাল্লেন, পরের ক'টা দিনের সজীবতা তারই সাহচর্যে। আরো দুর্বল এই মনটা, নচেৎ চিঠিগুলো লেখবার, ডায়েরি রমলাকে পাঠিয়ে দুর্বলতা প্রকাশের কোনো হেতুই ছিল না। কতদিন দুর্বলতা আর জ্বর থাকবে কে জানে! খগেনবাবু নিজের কপালে হাত দিয়ে অনুভব করলেন স্বেদবিন্দু। জ্বর ছেড়েছে। ধন্য এই হিমালয়। কত সবল!

নমস্কার এই হিমালয়কে, তার গাছপালাকে, তার লতাগুল্মকে, তার শীতল নীরবতাকে, বুদ্ধিজীবীর দাম্ভিক আধিপত্যের বাইরে থাকার, তার আত্মরমণের উপাদানে পরিণত না হওয়ার কঠিন শান্ত অপরাজেয় সাহসকে। গঙ্গার কলধ্বনি কানে আসে। গঙ্গা মানুষের অধীন। ঐ দেখা যায় লক্‌গেট, অ্যানিকাট গঙ্গা নিচে নামল, কোলকাতার চল্লিশ মাইল পূর্ব থেকেই মা-গঙ্গা স্কচম্যানের হেসীয়ানের থলিতে ঢুকে পড়লেন। ভারতের সব গেছে, বাকি আছে এই হিমালয়, আর তার আকাশ, বিশেষ করে, রাতের আকাশ। নীল তার বিরাটত্ব, আরো ঘন নীল তার ওপরকার বিস্তীর্ণ আকাশে, দু-এ মিলে হিমালয়। হালকা হাওয়াই তার প্রাণ, উজ্জ্বল তারাগুলোই তার চোখ, তার পাখিগুলো দেশী সুর, বাউল ভাটিয়াল কাজরীরই টান দেয়, তার রাতের মৌনতায় তানপুরোর জুড়ীর আর মৃদঙ্গের আওয়াজ শোনা যায়। হিমালয় মানুষছাড়া, ব্যক্তিসম্পর্করহিত।। হ্যামলেটকে ইংলণ্ডে না পাঠিয়ে হিমালয়ে পাঠালেই হোত, কমত তার দম্ভ, ওফেলিয়াও মরত না···সাবিত্রী ভাল করেনি। হিমালয় হ্যামলেটকে বিনয়ী করত। ব্যক্তিতন্ত্রবাদের প্রথম ও শেষ পুরুষ হ্যামলেট, তারই সন্তান-সন্ততি রাশিয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বসবাস করছে, এখন ও-দেশে তার বংশ লোপ পেয়েছে, চীন দেশে আর ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলা দেশে তার গোষ্ঠীবর্গ চা-এর দোকানে আড্ডা দেয়। মাসিকের পাতা ভরায়, নভেল ও কবিতা লেখে, নিষ্ফল

দুঃসাহসিকতা দেখায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কিন্তু আগ্রহাতিশয্যেই নিঃশেষিত হয়। কথা, আর কথা, বাক্‌সর্বস্বের দল, নিজের নিজস্বটুকুই তাদের সমগ্র বিশ্ব। আত্মম্ভরিতার লক্ষণ তাদের আত্মবিশ্লেষণ। খগেনবাবুর নিজের মধ্যেই হ্যামলে-টিয়ানা। কিন্তু এরাই পথপ্রদর্শক, স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ এদের চেষ্টাতেই হয়। কেন এরা মহাপ্রস্থানে আসে না? আত্মসর্বস্বতা ঘুচে যাবে মহাপ্রস্থানের পথে, বিনয় শিখবে হিমালয়ের কাছে। বিনয় মানে আপনকে ছাড়া, পরকে স্বীকার করা, তার অস্তিত্বকে বরণ করা। বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যের সত্তাকে শ্রদ্ধার ফলেই ব্যক্তি পুরুষ হয়। হ্যামলেটের শ্রদ্ধা ছিল না, তাঁর নিজেরও ছিল না, নইলে সাবিত্রী মরবে কেন? সাবিত্রীকে উন্নত করতে তিনিই বা যাবেন কেন? রমলার কাছ থেকে কেনই বা পালিয়ে যাবেন পনের হাজার ফুট ওপরে? নিষ্ক্রমণটাই সব চেয়ে বড় অহঙ্কার। আশ্রমবাসীদেরও শ্রদ্ধা নেই মানুষ ও সমাজের ওপর, থাকলে মানুষকে উন্নত করতে তাঁরা সচেষ্ট হতেন না। দোষে-গুণে মানুষ, দশে মিলে সমাজ। আশ্রম থাক সমাজের বুকের মধ্যে, আর না হয় বনের মধ্যে। তখন কিন্তু তার জনহিতকর উদ্দেশ্য পোষণ ও বিজ্ঞাপন না করাই শোভন।

বিনয় চাই, শ্রদ্ধা চাই। বস্তুসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকার দরুণই না রামায়ণের হনুমান, বানরসেনা, রাক্ষসবৃন্দ বীভৎস হয়নি। কবির ভাষায়, তারা যেন জলের মধ্যে ব্যাঙ। রাশিয়ান নভেলের পাগলগুলোও স্বাভাবিক, ভারত-সমাজের বর্তমান অবস্থাতে খগেনবাবুর নিজের উত্তেজনা যেমন ধরনের। হিমালয়ের মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই। পাহাড়তলিরই মাটি ফাটে। তাই হিমালয় বিনয়ী করে। হিমালয়ের ভিতরকার যে কোন একটা পাহাড়কে সহযাত্রীদের একজনও যদি গন্ধমাদন বলেন তখনই তাই বিশ্বাস হবে। পাহারের নামকরণ শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ। কতদিন ধরে সেই নামের আশ্রয়ে শ্রদ্ধার স্তূপ গড়ে উঠেছে, তাকে অবিশ্বাস করা অসম্ভব। নামোচ্চারণের পর বিনয়ের সঙ্গে দেখলেই মনে হবে গন্ধমাদন তার নাম হওয়া উচিত ছিল, তার প্রতি লতাগুল্মকে মনে হবে ওষধি বনস্পতি, তার প্রতি খাঁজকে মনে হবে ঋষির উপযুক্ত বাসস্থান।

পাহাড়তলির এই আশ্রমের কথা ভাবতেই খগেনবাবুর মন বিষিয়ে ওঠে। মনে হয় যেন প্রাসাদের গায়ে ঘুঁটে শুখুচ্ছে। হিমালয়ের বিপুলতায় আশ্রম যেন প্রক্ষিপ্ত, গীতার নিষ্কামধর্ম যেমন মহাভারতের স্বাভাবিক ক্ষাত্রধর্মে প্রক্ষিপ্ত, যেমন প্রকৃতির ওপর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পরমাত্মা প্রক্ষিপ্ত। হরিদ্বারের আশ্রমটি যেন ত্রিয়ানন, সুরের ওস্তাদী আর তালের বাটোয়ারা, জ্যামিতিক চিত্র, যান্ত্রিক স্থাপত্য। এত গরব সমাজ সহ্য করবে না। এত গরব সাবিত্রী সহ্য করেনি,

রমলাও করবে না, খগেনবাবুর নিজের ক্ষতি হবে। পুরুষসিদ্ধি পৌরুষ, আত্মম্ভরিতা নয়। খগেনবাবু মনঃস্থ করেন আশ্রম পরিত্যাগ করতে।

রমলা এখন নিশ্চয় কোলকাতায়, মির্জাপুর স্ট্রীটের কোনের গলিতে, কিংবা অন্য কোথাও চলে গেছে, আপন গৌরবে। কিংবা হয়ত সেও অপেক্ষা করছে তাঁরই জন্য, কাংড়া-চিত্রের অভিমানিনীর মতন। সুজন, বিজন এখন কোথায়? নিশ্চয় তারা সন্ধ্যাবেলায় তাদের রমলাদির বাড়িতে আড্ডা জমায়। সেখানে ছেলে-ছোকরার সমাগম হয়, যৌবন উপছে পড়ে তাদের ভাবভঙ্গিতে, কথা-বার্তায়, বিজনের টেনিস খেলাতে। সুজন অল্প বয়সেই গম্ভীর, বাপমামরা ছেলে, পরের অন্নে প্রতিপালিত, বিজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সন্তান, মাতৃহারা, বাপের আদুরে ছেলে। বেশ স্বাস্থ্য তাদের।

স্বাস্থ্যচিন্তার সঙ্গেই খগেনবাবুর কোলকাতায় যাবার ইচ্ছা হয়।

তবু বাধা ওঠে, কিসের? ভয়? সংযম? আশ্রমবাসের সুফল? এখন কোলকাতা যাওয়া হবে না। মাসীমা থাকেন কাশীতে, সেইখানেই ভগ্নস্বাস্থ্যের উদ্ধার হবে, মাসীমার আদরযত্নে।

জ্বর ছাড়ল খগেনবাবুর, শরীর এখনও দুর্বল। কিন্তু ইচ্ছা এখন স্বচ্ছ হয়েছে। মহারাজকে বল্লেন যে তিনি পরশুই হরিদ্বার ত্যাগ করবেন। 'তোমার জন্য আশ্রমের দ্বার সদা উন্মুক্ত থাকবে।'

'আমি কিন্তু আর আসব না। সমাজে ফিরে যাব, দেখি যদি থাকতে পারি, যদি তারা থাকতে দেয়।' আশ্রমকর্তা গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

দুদিন পরে সকালের ট্রেনে খগেনবাবু রওনা হলেন এলাহাবাদের দিকে, লক্ষ্ণৌ হয়ে যাবেন, তারপর বিন্ধ্যাচল, চুণার, পথে কাশীতে মাসীমাকে দেখে গেলে হয়, কতদিন খোঁজ খবর নেওয়া হয় নি। প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে খগেন বাবু বল্লেন, 'ভুলু, তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে। যদি দরকার পড়ে তোমরাও আমার খোঁজ নিও। ঠিকানা পাওয়া শক্ত হবে না, এবার।'

ব্রহ্মচারী ফিরতি পথে গঙ্গার ঘাটে ছাতার তলায় সারা সকালটাই কাটিয়ে দিল। ঘাটের মন্দির-গাত্রে ছবিগুলি কী বীভৎস, অস্বাভাবিক রকমের বড়, কুৎসিত, কিন্তু গঙ্গা শব্দ করতে করতে সমতলের দিকেই ছোটে। দূরে দেখা যায় বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া, যেন বরের রাংতা মোড়া টোপরটি।

দুই

কাশীর একটি তেতলা বাড়ির একতলায় দুটি পরিবার মিলে মিশে থাকে। দোতলায় রমলা দেবী একলা থাকেন, তেতলায় বৃদ্ধ গৃহকর্তা ও প্রৌঢ়া গৃহিণী। সুজন রমলা দেবীকে কাশী আনবার এক দিনের মধ্যেই বাড়ি ঠিক করেছে, তার আত্মীয় অক্ষয় এঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে; পরের দিন সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র, খাট, লণ্ঠন প্রভৃতি কিনে আনলে। আপাতত একমাসের বাড়িভাড়া অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। নিচের তলার বৌটি পাচিকা ঠিক করেছেন। ওপরতলার গৃহিণী রমলা দেবীর তত্ত্বাবধান করবেন শুনে সুজন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে কাশী শহর দেখে বেড়ালে। আত্মীয় অক্ষয়ের নানা কাজ, সে সর্বদাই ব্যস্ত। তাই সুজন সময় পেলেই একলা যায়, এধার, ওধার, কখনও রমলা দেবীকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে বসে থাকে। তাঁকে পৌঁছে দেবার পরও সে তাঁর বাড়ি বসে খানিকক্ষণ গল্প করে। নীরবতা যখন অসহ্য হয় তখন সুজন বাড়ি ফেরে।

সন্ধ্যার পূর্বেই সুজনের আসবার কথা। এধারে সন্ধ্যা নামে। রমলা দেবী মুখহাত ধুয়েছেন, কিন্তু বেশ পরিবর্তন করেন নি। কি প্রয়োজন? যদি সুজন ঘাটে বেড়াতে নিয়ে যায় তখন না হয় শাড়ি বদলান যাবে। দোতলার কলে জল আসে না, একটি ছোট ঘরে ঝি দু'বালতি জল রেখেছিল, তার বেশি দরকার হয় নি। নিচের তলার ছোট বৌটি ফর্সা শাড়ি ও কাচপোকার টিপ পরেছে, সন্ধ্যারতি দেখতে যাবে। অন্য পরিবারের বৌটি রুটি সেঁকে ঢাকা দিয়ে রাখলে, সেও এবার সাজবে, সেজে স্বামীকে আঁচলে বেঁধে যাবে বায়োস্কোপে, রাতের শো'তে বোধ হয়। এরা সন্ধ্যার সময় খেয়ে নেয়, সকালের রান্না তরকারি থাকে, তোলা উনুনে গুঁড়ো কয়লা দিয়ে আগুন রাখে, তাইতে খাবার গরম করে নেয়। শনিবার মাংস হয়েছিল, তার সঙ্গে লাল আটার রুটি, প্রত্যেকটি ফোলা থাকে, ঘি মাখান হয় না। গোছানি মেয়েরা, লক্ষ্মী বৌ সব, স্বল্পে সন্তুষ্ট। কারুর আবার কিছুতেই মনঃপুত হয় না, খাঁই বেশি, তাই সাজ-সরঞ্জামের ঘটা, ফালতোর আধিপত্য, দশের দাসত্ব। ছেঁটে ফেল এই জড়ের আগাছাগুলোকে।

সুজন এখনও আসেনি। আলো ঢলে পড়েছে পাশের বাড়ির ছোট্ট ছাদে, এইবার তারা উঠবে—একটি তারা, তার পর দুটি, তিনটি, তারপর অগণিত, একসঙ্গে, তখন আর চাওয়া যাবে না আকাশের দিকে—এখনও তার দেরি আছে। এইবার সানাই বেজে উঠবে, বেশ শোনা যাবে এখান থেকেই। গান শিখেছিলেন। পরের তাগিদে গান শেখায় ঘেন্না ধরে। তবু ভাল লাগে গান,

দূর থেকে ভেসে আসে যে সুর তাতে আশ মেটে না, যে বাজাচ্ছে তাকে দেখা যায় না। মানুষ বাদ দিয়ে যে গান তাতে মন হয় উদাস। চোখের সামনে রাখাতে বেশি সুখ, তৃপ্তি বেঁধে ফেলায়, চোখের শক্ত পালক দিয়ে। সুজন এল।

'এত দেরি করলে যে।'

'প্রয়োজন ছিল।'

'নিশ্চয়ই, অবশ্য। দয়া করে কৈফিয়ৎ দিওনা। অনুশোচনা একটি উৎকৃষ্ট মনোভাব।'

'অনুশোচনা!'

'হাঁ, আমাকে কাশী আনার জন্য। হাসছ কেন?'

'চল রমাদি, বেড়াতে যাই। দেরি কোরো না।'

'না, তা করব কেন। সে-কাজ তোমাদের। কিন্তু, কি হবে গিয়ে?'

'ঘাটে বসবে না?'

'সেজন্য আসিনি।'

'তবু, চলই না, ভাল লাগতে পারে। কত লোক বেড়ায়।'

'যদি না ভাল লাগে রাগ কোরোনা যেন। করবে না জানি। বেশ, এখনই আসছি। কাশী এসে সিগারেট খেতে শিখেছ, তাই খাও ততক্ষণ।'

'ওটা তীর্থযাত্রীর বদভ্যাস, সময় কাটান চাই ত?'

'রমলা দেবী সুজনের সঙ্গে ঘাটে এলেন। দশাশ্বমেধের ঘাটে ভ্রাম্যমাণের ভিড় দেখে একটু দূরে, নদীর কিনারায়, শেষ ধাপে বসলেন। নৌকা বেয়ে একদল যুবক চলে গেল, পিছনে আর একটি নৌকা, বাচ্ খেলা হচ্ছে বোধ হয়। বাঙালী ছেলে পশ্চিমে এসেও নদী চায়, যুবকেরা সাঁতার কাটে, নৌকা চালায়, বৃদ্ধারা স্নান করে, রক্তের সাড়ায়।

'সুজন, সাঁতার জান?'

'জানি।'

'কাটবে?'

'কাপড় গামছা আনি নি। তুমি জান রমাদি?

'নাইতেও জানি না। ডুব দিতে পারি না হাঁপ লাগার ভয়ে।'

'এবার শেখ।'

না, এ বয়সে হবে না। তার চেয়ে ধারে বসে থাকা নিরাপদ, নয়?'

'তাতে মনস্তুষ্টি হবে না; না নাইলে শুদ্ধ হয় না, অবগাহন চাই।'

'অনেকেই ধারে বসে পূজো করে।'

'সেটা ধাতে নেই।'

'ধাতে কোনটাই বা কার থাকে।'

সানাই বেজে উঠল, প্রথমে মোটা স্থর; একটানা, তৈলধারাবৎ, চামড়ার যন্ত্রের আওয়াজ এল, তারপর শুরু হোলো।

রমলা দেবী প্রশ্ন করলেন, 'কি স্থর এটা?'

'রাজপুরীতে বাজায়, বাঁশির।'

'না।'

'স্থরের নাম জানি না রমাদি। কি হবে জেনে নামটুকু।'

'শোন।'

নদীর ওপাশের বালুখণ্ডে তখনও অন্ধকার নামে নি। ভরা নদী সবটা তায় খেয়ে ফেলেনি, কাশগুচ্ছের বন দেখা যায়, কাকচক্ষুর মতন আকাশের রঙ। স্থরের প্রথম ধ্বনিতে এক ঝাঁক পাখি আকাশে উড়ল, দূরের নৌকার আলো ফুটল, ঘাটবিহারীদের কোলাহলে মুহূর্তের জন্য ছেদ পড়ল··· গলা আটকে ধরেছে কে এসে, কান্না চাপতে গেলে যেমন হয়। পাখিরা ওপরে উঠে সারি বেঁধেছে তীরের ফলার মতন, ঘাটের আলোয় মালা গাঁথছে, আকাশে তারার মেলা। লোকজন আবার প্রাণ পেয়ে হাঁটতে শুরু করলে। স্থর তখন পঞ্চম ছাড়িয়ে ওপরে ওঠবার জন্য উন্মুখ, ঘরগুলি পূর্বেকার মতন স্থির নয়, অধীর হয়েছে, চোখের জল বুঝি বা গড়িয়ে পড়ল। পাশে কে একজন গলা মেলাতে চেষ্টা করছে সানাই-এর সঙ্গে।

স্থজন বিরক্ত হয়ে চাপা গলায় বলে উঠল, 'অসম্ভব। অসহ্য এই অনুকরণের ইচ্ছা, অন্যের সাথে মেলাবার প্রাণপণ প্রয়াস।'

'তা হোক, আমার ভাল লাগে। উপযুক্ত শিষ্য তুমিই।'

একজন ভদ্রলোক বলছেন, এর জন্য চিত্তরঞ্জনই দায়ী, প্যাক্ট করতে যাওয়া কেন?···হুঁ।

স্থর তখন ওপর সপ্তকে উঠেছে। হঠাৎ সানাই-এর আওয়াজ চিরে গেল, একজন ছোকরা হেসে উঠল, অন্যজন জিজ্ঞাসা করলে, 'কি স্থর জানিস? মুলতান। আজ নিশ্চয়ই বুড়ো বাজাচ্ছে না।' 'কেয়া রাগজ্ঞান! মুলতান বুঝি বেলা পাঁচটার পর বাজায়? ছটায় পূরবী, তারপর পুরিয়া— যার যা সময়। মাস্টারমশাই সেদিন আখড়ায় বলে দিলেন না! এরই মধ্যে ভুলেছিস?' এরা কাশীর ছেলে, থিয়েটারের সখী সাজে, দন্ত্য-স উচ্চারণ করে ইংরেজী এস্‌-এর মতন— ফয়জাবাদ, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী পর্যন্ত ভাড়া খাটে বাঙ্গালীর পূজা-সংক্রান্ত বারোয়ারী-অভিনয়ের জন্য, তাল-দুরস্ত, গলাভাঙ্গা।

স্থজন রমলা দেবীকে উঠতে অনুরোধ করলে। কিন্তু রমলা দেবী অসম্মতি

প্রকাশ করলেন, 'বাড়ি গিয়ে কী হবে!' খানিকক্ষণ নীরব থেকে বল্লেন, 'সুজন তোমার সঙ্গে গান বাজনা শোনা যায় না দেখছি। ভাল না লাগলেও চুপ করে থাকাটাই ভদ্রতা।'

'না, আমার ভাল লাগে বলেই অধীর হই। অবশ্য বুঝি না গান বাজনা, কিছুই জানি না।'

'আমিও তথৈবচ। আমিও অধীর হই, তবে মুখ বুজে থাকতে হয় আমাদের। অধীর হলে চলে না জানি, কিন্তু পারি কৈ?'

'যে জন্য আসা হোলো তার কিছুই করে উঠতে পারছি না।'

রমলা দেবী অন্য দিকে চোখ ফেরালেন। সুজন বললে, 'কাল রামকৃষ্ণ আশ্রমে খোঁজ নিয়েছিলাম। ওঁরা চেনেন না। আজ তোমাকে বাড়ি পৌঁছে অন্য দু-এক জায়গায় যাব।'

'যদি না পাও খবর দিয়ে যেও।'

'পেলে দিয়ে যাব।'

'যত রাত্রেই হোক ··· ।'

'আগে পাই। কিছুই আশা নেই। ঘোরাঘুরির কসুর করছি না। ঠিক বুঝি না ব্যাপারটা। ডায়েরি পড়ে মনে হয় এক কথা, ব্যবহারে বিপরীত। শিরা উপশিরা মাংসপেশী ওঁর নিজের বসে নয়, নয় কি?'

'হয়ত তোমার বোঝবার দরকার নেই। আচ্ছা থাক, রাতে আর আমাকে খবর দিতে হবে না। বাড়ি গিয়ে বাকি কাজটা, যেটা, অসমাপ্ত রেখে এসেছিলে সেটা করে ফেল। কেমন? সেই ভালো, নয়? রাগ করছি না, হাসি পাচ্ছে। কাশী এলাম বেড়াতে তোমার তাড়ায়, আর।'

'নিশ্চয়ই!'

'তা ছাড়া আমি নিজে এসেছি নাকি? মনে করে দেখ, তুমিই বল্লে কাশীতে তোমার আত্মীয় থাকে, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।'

'নিশ্চয়ই!'

'নিশ্চয়ই নয়? তুমি আনলে, ট্রেনে কত উপদেশ দিলে····' রমলা দেবী খিল-খিল করে হেসে উঠলেন।

'দোষ স্বীকার করছি।'

'দোষ নয়, তাই বলছি। তোমার ওপর কত বিশ্বাস, নির্ভর····না হলে উপদেশ শুনি? সেই যে গাড়িতে কত উপদেশ দিলে।'

'সব না পারেন, তার মধ্যে যেটা পছন্দ হয় বেছে নেবেন। আপাতত উঠুন। আমার সঙ্গে কোনো, গান শুনে, সুখ নেই।'

'আমাকে কি করতে হবে ? তুমি বড় বিরক্ত হয়েছ। মাসীমার বাড়ি খোঁজ নেওয়া হয়েছে ? হয়ত, সেখানেই অসুখ করে পড়ে আছেন, আর মুকুন্দর সেবা চলছে।'

'মাসীমার ঠিকানা পাব কি করে ?'

'তুমি পুরুষ না মেয়ে ?'

'আচ্ছা, আবার দেখছি চেষ্টা করে।'

'কেবল চেষ্টাই চলছে, চেষ্টাই চলেছে, রবার্ট ব্রুস।'

সুজন ও রমলা দেবী উঠে পড়লেন।

'চল সুজন, বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখি গে····সেখানে অনেকে যায়, যত সব গিন্নীরা।'

'তাই ভাল।'

বিশ্বেশ্বরের গলি, স্বর্গের মতন সরু, মোড়ে চা ও সরবতের, ভেতরে পিতল কাঁসা, পান-জরদা, পেঁড়া ও রেশমের দোকান, দোকানীদের পুরুষ্টু চেহারা, গিলে করা আদ্ধির জামা, মুখে বাংলা বুলি, ভাঙ্গাভাঙ্গা····মহিলারা শাড়ি কিনছেন ষাঁড় ঠেলে, মাড়োয়ারি ও ক্ষেত্রী মহিলাদের রঙ বেরঙের শাড়ি, কনুই পর্যন্ত সোনা-রূপায় ভারী চুড়ি বালা, পায়ে মস্ত মল, নাকে ফাঁদি নথ, তাতে হীরে মুক্তা ঝোলে, একটি হাত ঘোমটা ফাঁক করে ধরে আছে, অন্য হাতটি দুলছে, ভারী চলন; মাদ্রাজীর দলের কালো চেহারা, মালকোঁচা-মারা, হাঁটুর ওপর পর্যন্ত শাড়ি উঠেছে, এ ওর কোমর ধরে এগিয়ে চলেছে, কোলে খোকা; রেশমের দোকানের মালিক সব বাঙ্গালী, প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, টেরিকাটা····হলিউডের ভাবী অভিনেতা।

রমলা দেবী বল্লেন, 'সুজন, কিছু পেঁড়া কেন, রাতে খাবে।'

'আপনি একটা ভাল রঙিন শাড়ি কিনুন।'

'পরে কিনব, যখন তুমি সংসারী হবে। .পেঁড়া কেন ত আগে।'

একজন দেকানী হাঁক দিলে, 'এই যে মাইজী, আসুন এধারে, বিশ্বনাথের পেঁড়া, অনেকদিন দর্শন পাইনি যে।'

এক টাকার পেঁড়া কেনা হোল, অন্য দোকানে। সুজন বল্লে, 'বইবে কে ?' দোকানদার সমস্যা পূরণ করে দিলে, 'আচ্ছা বাবুজি, আনেকো বকৎ লিয়ে যাবেন।' সুজন কৃতজ্ঞ হোলো, 'সেই ভাল। এবার শাড়ি কেনা হোক্।'

'তর সইছে না ? আগে পুতুল কিনে দিই খোকাবাবুকে। তোমার আজ কি হয়েছে বলত ?'

'আমার ? কিছুই হয় নি। কি হবে। কি হতে পারে ?'

'চল এগিয়ে।'

মন্দিরের মধ্যে ভিড়, সকলে ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘণ্টা বাজাচ্ছে, ভীষণ কলরোল, দীপের আলোর বহুলতা, বিজলীবাতি মন্দিরে। একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে রমলা দেবী সুজনের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। সুজনের হাতে ঠোঙা, মুখে বিরক্তির চিহ্ন। রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাল লাগছে না বইতে?'

'না। ঠোঙা নয়, ভিড়। কেন লোকের ভাল লাগে বুঝি না। চিনতে পারলেন, মাসীমাকে?'

'কি করে পারব?'

'চেহারার মিল অনুমান করে?'

রমলা দেবী ভ্রূকুটি করলেন। গলির মোড়ে এসে রমলা দেবী বল্লেন, 'আগে ভিড় ভাল লাগত বুঝি?'

'না। তবে তখন ভাবতাম দশে মিলে সমাজ, সমাজে জন্মেছি, তার ঋণ পরিশোধ চাই।'

রমলা দেবী স্বপ্নাবিষ্টের মতন বল্লেন, 'এত ভেবে পার্টিতে যেতে?'

'আমি! পার্টিতে! খাবার নিন···আপনার কথা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। রাতে কি খান?'

'রাতে? খাই না, যা পাই তাই খাই।'

সুজনের কণ্ঠে মাধুর্য পরিস্ফুট হোলো····'তবে খাবার কিনলে কেন রমা দি?'

'নিচের তলার বৌদের দেব। ছোট বৌটি কি বলছিল জান? ও-ছেলেটি কে দিদি? আমি বলেছি, আমার দেওর।'

'সত্যি কথা কইতে শিখেছ দেখছি। কাশীর মাহাত্ম্য আজও তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। চল, বাড়ি পৌঁছে বেরুব।'

রমলা দেবীর মুখ বিবর্ণ হল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই বিষাদের যবনিকা অপসৃত হল। সুজনের লক্ষে বাদ পড়ল না আলোছায়ার সেই হোলিখেলা। কেন এই বিষাদ? রমাদি বাড়ি ফিরতে চায় না, ভয় পায়, খালি বাড়ি, অন্ধকার বাড়ি, স্মৃতির টুকরোগুলি চামচিকের আকার নিয়ে ঘোরে, কেবল ঘোরে, পাখ্‌নার পতপতানি বুকের পরতে পরতে বেজে ওঠে, রমাদি ভয় পায়, আর চায়, কেবল চায়, শুধু চেয়ে থাকে, অন্ধকারের সাথে মিশে গিয়ে····'রমাদি, বাড়ির সব আলো জেলে বোসো।'

'ফিরে আসবে? নিচের তলার ছোট বৌটি খুশী হবে।' সুজন রমলা দেবীকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সদর রাস্তা ধরলে। ছোট বৌ-এর কাছে দেওর পরিচয় দিয়েছেন তা হলে দিদি, রমা-দি বলা চলবে না অথচ, নিচের তলার ছোট

বৌ ঘোমটা ঢেকে লুকিয়ে থাকে তার কৌতূহল কেন ? স্বভাব তার সম্পর্ক টেনে বার করা। ফুটপাথের ওপর সুজন উঠল, দুটো একা রাস্তার ওপর মোড় ফিরছে। কী সঙ্কীর্ণ ওদের মন। ওদেরই বা দোষ কি। সন্দেহই ত মেয়েদের সমাজের ওপর প্রতিশোধ। কিংবা হয়ত কেবল জানতেই চেয়েছে। দেখতে কেমন কে জানে।

সুজন রুমাল দিয়ে মুখ মুছলে, ঘাম হচ্ছিল। চৌরাহাতে একাওয়ালারা হাঁকছে। এক ধারে পানের দোকান, একজন দাঁড়িয়ে কি দেখছে, চেনা মনে হোলো, মুকুন্দ, 'মুকুন্দ।'

মুকুন্দ মাথা নিচু করে প্রণাম করলে। কিন্তু তার চোখে পরিচয়ের চিহ্ন নেই। 'কি হে। তুমি এখানে কোত্থেকে ? তোমার বাবু কোথায় ?'

'আজ্ঞে, রাতে ভাল দেখতে পাই না, রাস্তার আলোগুলো যেন পিদ্দিম, তাই চিনতে পারিনি, মাপ করবেন।'

'এখানে কি করেছিলে ?'

'গিন্নী মন্দিরে ঢুকেছেন, তাই দাঁড়িয়ে আছি।'

'এখানে কোন্ মন্দিরে।'

'কে জানে বাপু আর পারি না, সব জিনিসের সীমে আছে।'

'তোমার বাবু কেমন আছেন ? কোথায় ?'

'বাবু গিয়েছেন ঘুরতে ঠাকুরদের সঙ্গে। কেমন আছেন জানিনা।'

'কবে আসবেন। খবর জান ?'

'বাবুর মাসীমারে শুধোবেন।'

'মুকুন্দ, পান খাও না'

'না বাবু, দেখছিলাম কেমন করে সাজে। খোট্টাদের পানে বড় ঝাল। বাংলা দেশের মতন মিষ্টি নয়। খয়ের বড় তেতো বাবু, খাবেন না। ঐ দোকানটায় কোলকাত্তার খয়ের পাওয়া যায়। এনে দিই ? কিন্তু মাসীমা যে এইখানে দাঁড়াতে বলে গেছেন, বুড়ো মানুষ আমাকে খুঁজে না পেয়ে একলা বাড়ি গিয়ে হাজির হবেন, আর আমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকব যে।'

'না, না, আমিই না হয় এনে দিচ্ছি তোমার জন্য।'

'আমার কী অকল্যাণ করতে চান ? এই যে ঠাকরুণ এসেছেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, পা ধরে গেল, এত রাত পর্যন্ত টহল না দিলে চলে না। বাবু বলেছেন সঙ্গে থাকতে, তাই। এই বাবুটি আমাদের বাবুর খোঁজ নিচ্ছিলেন।'

'কে বাবা ? খগেন কবে আসবে জান ?'

'না, আমিই ত মুকুন্দর কাছে খোঁজ করছিলাম।'

'তুমি কি আমাদের কাশীর ছেলে ?'

'না। খগেনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় কোলকাতা থেকে।'

'তুমি বুঝি এখানে হাওয়া বদলাতে এসেছ ?'

'অমনি, কোলকাতার জলহাওয়া ভাল নয়, একটা না একটা লেগেই আছে।'

'আরতি দেখেছ ?'

'দেখলাম।'

'ভাল লাগে না বুঝি ? আচ্ছা, এখন আসি, খগেনের খবর পাও ত' আমাকে দিও।'

'আমিই যে আপনার কাছে চাইছি।'

'আমি কি ছাই চিঠি পাই। সেই একখানা পোস্টকার্ড কবে এসেছে, তারপর চুপ চাপ, আমি কেবল ব্যস্ত হয়ে মরি। এ কি জ্বালা, আমি এলাম এখানে নিশ্চিন্ত হতে, এখানেও সেই হাঁকোচ পাঁকোচ, এখানে ছুটছি, ওখানে ছুটছি, কেউ খবর জানে না। তুমি যদি পাও....'

'নিশ্চয়, তখনই গিয়ে দিয়ে আসব। চলুন আপনার বাড়ি দেখে আসি, আপনি একলা যাবেন কেন ?'

মুকুন্দ বলে উঠল, 'না, না, বাবু, আমি রয়েছি, আপনার শ্রম করতে হবে না।'

'মুকুন্দ তুই থাম। একটু যদি বুদ্ধি থাকত ত আমার এই বয়সে ছুটোছুটি হোতো না। চল বাবা কাছেই বাসা।'

দরজার সামনে এসে বৃদ্ধা বল্লেন, 'খবর পেলে দিও বাবা।'

যাবার সময় সুজনকে মুকুন্দ প্রণাম করে বল্লে, 'সকাল দুটোর পর আর পাঁচটার মধ্যে আর সন্ধ্যা আটটার পর এলেই পাবেন। গিন্নী দুপুরে ঘুমোন না, আমারও ছুটি নেই, রাতে সেই ন'টার পর আমার ছুটি। দরজায় মুকুন্দ মুকুন্দ বলে কড়া নাড়লেই আমি বেরিয়ে আসব। এখন আসুন গে।'

সুজন যখন রমলা দেবীর বাড়ির দিকে ফিরলে তখন প্রায় নটা বাজে। কাশীর রাস্তার চোখ খোলা। বিজলী বাতি মিট্ মিট্ করছে, পোকাগুলো কেবলই ঘোরে, কিন্তু তাদের পরিধি স্থির মনে হয়। পোকার বিস্তৃত কোণ এড়িয়ে পথিক রাস্তায় নামে, একাও তার পাশ কাটিয়ে যায়....চৌরাহার চঞ্চলতা বাড়ে....ছাতহীন একা অর্জুনের রথের মতন, ঘোড়ার মাথায় পালক, গলায় লাল ফিতে ও পেতলের ঘণ্টা বাঁধা, পা মুড়ে বসে বেনারসের বাবুরা হাওয়া খেতে বেরোন, গিলে করা আদ্দির কুর্তা, গলায় ফুলের মালা— টকির সামনে লোক

জমে গান শুনতে, চার আনা টিকিট-ঘরের সামনে লোক ধরে না, তাদের সোরগোলে কানপাতা যায় না, জানালা বন্ধ হয়ে গেল, আর বিক্রি হবে না। আজ রমাদির মন খারাপ, কিন্তু এক দিনেই কি সন্ধান মেলে? জোর করে তাঁকে আনা উচিত হয়নি···জোর! তাঁরই ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল, কেবল মুখ ফুটে বলেননি···তবে, আগে নিজে কাশী এলেই হোতো। তবে মৈত্রীর অর্থই হলো সমন্বয় সাধন, রমাদি কষ্ট পাচ্ছিলেন, খগেনবাবুও অসম্পূর্ণতা ও অশান্তির উল্লেখ করেছিলেন তাঁর ডায়েরিতে। ওঁদের মিলনই স্বাভাবিক। দুর্নিবার গতিতে এই দুটি প্রকৃতি পরস্পরের দিকে ছুটেছে, রুখবে কে? মানুষের কাজই প্রকৃতির নিয়ম বুঝে তাকে সাহায্য করা, তবেই পরিশ্রম ও বন্ধুত্ব সার্থক। খগেন বাবু লিখেছিলেন যে তাঁর জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে। কিসের পরিবর্তন? বিযুক্ত হবার প্রয়াসের প্রয়োজনই বা কি ছিল? পারলেন না অবশেষে, গোড়া থেকেই বোঝা উচিত ছিল বিযুক্ত হওয়া যায় না এখানে। আর একটা ল্যাম্প-পোস্ট, আবার পোকা···দেওয়ালি পোকা বৃত্তের মধ্যে প্রত্যেক, দূর থেকে অবিশেষ সাধারণের ঐক্য। দূরত্বের ওপর একত্ববোধ নির্ভর করে? হয়ত পোকাগুলো এক জাতের বলেই। অন্য পোকা এলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়, তখন বৃত্তবোধও যায় ভেঙ্গে। মুকুন্দের সঙ্গে ভাগ্যিস দেখা হোলো! বড় শহরেই দেখা হয় আচমকা। আচমকা আর কি! পূর্বেই ব্যগ্রতা ছিল, আকস্মিক পরিচয় সেই ধারারই পরিশেষ। এখন না দেখা হলেও পরে হোতো, মধ্যকার সময়টুকু অন্তর্হিত হয়েছে ভাবলেই চলে। কোনো বিষয়ের চিন্তায় তন্ময় হয়ে রয়েছেন অধ্যাপক, সমস্যার কূল কিনারা মিলছে না, লাইব্রেরীতে অবান্তর বই ঘাঁটছেন, পাতাই ওলটাচ্ছেন, চোখে পড়ল হঠাৎ কয়েকটি ছত্র, যাতে বন্ধগলির মুখ গেল খুলে। অধ্যাপক ধন্যবাদ দিলেন দৈবকে—কিন্তু বইখানি অবান্তর ছিল না, অন্যমনস্কভাবে প্রয়োজনীয় বই-এরই পাতা দেখছিলেন। সব ঠিক; কিন্তু রমাদির প্রয়োজনে মুকুন্দ তার সামনে আসে কি করে? রমাদিকে বোধ হয় খবরটুকু না দেওয়াই ভাল, জেগে বসে থাকবেন। মাসীমাও ব্যগ্র কিন্তু··· না, বেশ সপ্রতিভ···সোজা কথাবার্তা, রমাদির বাড়ির নিচের তলায় ছোট বৌটির মতন তাঁর কৌতূহল নেই। বোধ হয় বয়সের গুণে।

সুজন বরাবর ওপর তলায় উঠছে এমন সময় রমলা দেবীর ঘর থেকে স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ এল···বৌটি নিশ্চয়ই কথা কইছে, রমাদি খাবার দিচ্ছেন। তেতলা থেকে মোটা ভাঙ্গা গলায় প্রশ্ন এল, 'এত রাত্রে কেগা বাছা?' রমলা দেবী ঘরের বাইরে এসে বল্লেন, 'সুজন, একটু বাইরে দাঁড়াও··· তুমি ভাই বসবে? কর্তাটির ফেরবার সময় হোলো, আর এখন তোমাকে রাখা যাবে না।' চাপা গলায় উত্তর শোনা গেল, 'অনেক রাত হয়েছে যাই দিদি, উনি এখনই ক্লাব থেকে ফিরবেন, কাল

খাব।' বৌটি নিতান্ত জড়সড় হয়ে নিচে গেল। আবার তেতলা থেকে প্রশ্ন এল, 'কে গা বাছা?' রমলা দেবী একটু জোরে বল্লেন, 'কেউ নয়। এস সুজন।' রমলা দেবী শব্দ করে দরজা বন্ধ করলেন। সুজন থতমত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে রমলা দেবী তাকে বসতে হুকুম করলেন।

'খাবার ভাগ হচ্ছিল বুঝি?'

'হাঁ, আর তোমার কথাই। দেওরটিকে সামলান দায় হোলো দেখি।'

'এবার থেকে আপনি বলব? আগেকার মতন?'

'কেন? বৌদিকে সকলেই তুমি বলে।' সুজন একটু হাসল।

'হাসছ যে। তুমি আমাকে একটি পরিষ্কার উত্তর দেবে? তোমার অনুশোচনা হচ্ছে আমাকে কাশীতে এনে?'

'না।'

'তবে তোমার কি মনে হচ্ছে বল আমাকে। ছাখ সুজন এখানে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না। তুমি যদি মন খুলে না কথা কও, তবে,....আমাকে আনলে কেন কাশীতে?'

'ছোট বৌটি কি বলছিলেন?'

'ঠাট্টা রাখ। কেন আমাকে আনলে, যদি না....'

'যদি না...কি?....আচ্ছা রমাদি, খগেনবাবুর সঙ্গে যদি না দেখা হয় কি করবে ঠিক করেছ?'

'ফিরে যাব।'

'তা জানি, কিন্তু তার পর? মনকে বাঁধতে পারবে?'

অনেকক্ষণ রমলা দেবী নীরবে বসে রইলেন।

'কৈ উত্তর দাও?'

'কাল বলব।'

'আর যদি পাও?'

'তুমি আমাকে খেলাচ্ছ?'

'না, গম্ভীরভাবে প্রশ্নটি করছি। ভেবে চিন্তে পরশু না হয় দিও।'

'আচ্ছা, বোসো, এখনই দিচ্ছি। তুমি সহ্য করতে পারবে?'

'পারব মনে হয়।'

'দেখা হলে, আমি তাকে নিজের করব, মানব না।'

শান্ত, সুস্পষ্ট, পাথরে কোঁদা ভাষা, দান্তে-এর উপযুক্ত; ব-উচ্চারণে কেবল ঠোঁট জোড়া লাগল, নচেৎ সমগ্র শরীর থেকে যেন অনাহত ধ্বনি নির্গত হচ্ছে, চোখের তারা চক্ চক্ করে, শীঘ্রই তার আর্দ্রতা যায় শুকিয়ে। পরে পলক পড়ল

ছ'তিনবার, চোখের কোনে তবু জল এলনা এক ফোঁটা। রমলা দেবী পুনরায় বল্লেন, 'ভাবছ সুজন, তোমার সদুপদেশ এত শীঘ্র জলাঞ্জলি দিলাম কোন্ প্রাণে? কিন্তু প্রাণ আমার নেই, বড় ফাঁকা মনে হচ্ছে। সন্ধ্যায় সানাই-এর সুর বলাকা হয়ে উড়ে গেল, আধখানা চাঁদের মতন নদীর ওপারে, কাশ বন ছাড়িয়ে, এপারের লোক কি তাকে ধরে রাখতে পারলে? তুমি পাশে বসে রইলে, অপরিচিতের মতন। আমার শূন্যতা জমাট বাঁধল না, রূপ নিলে না! আমার স্মৃতি আশ্রয়হীনের মতন ঘুরে বেড়াতে লাগল মর্ত্য থেকে দেবলোকে যাবার গোলক-ধাঁধায়। কিন্তু আমি প্রেতাত্মার মতন ঘুরে বেড়াতে নারাজ। আমি জন্মাতে চাই, এই দেহেই। আমার এই শরীরেই চলবে। এখনও আমার গায়ে জোর আছে, দেখবে?' রমলা দেবী সুজনের হাত থেকে দিয়াশালাই-এর বাক্সটা কেড়ে নিয়ে মুঠোর এক চাপে মড় মড় করে ভেঙ্গে দিলেন। সুজন নির্বাক হয়ে বসে রইল।

'তুমি সুজন, বোধ হয়, আমার উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলে না? বল?'

'না।'

'তা হলে তুমি কোলকাতা ফিরে যাও। চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলো দিয়ে ফেল, তার পর কোনো কলেজে সেঁধিও।....লক্ষীটি ভাই, মাফ কর। আমার যেন মাথা খারাপ হয়েছে....এই ছোট্ট বৌটিকে দেখে। ওর কী স্বাস্থ্য। স্বামীকে রাত ন'টার আগে ফিরিয়ে আনে। বলে কি জান? সাধ্যি কী! থাকুন দেখি একবার ন'টার পর! মজাটি টের পাবেন না! অথচ, অথচ তোমার বেলাতেও আগ্রহ। ওর যেন কী একটা উপ্‌ছে পড়ছে, তাই স্বামীকেও সব দিয়েও বাকি থাকে। কি সেটা বলত সুজন? কেন আমার তা থাকবে না? নয় কেন? আমার কী অন্যায়টা হয়েছে? বঞ্চিত হব কোন দোষে? তুমি কেন বলবে দূরে রাখতে, আপনি বলতে? আমি তোমার কথা শুনব না। দেখা হলেই প্রথমে তুমি বলব....না হলে, পরে বলতে পারব না... ভারী হয়ে একেবারে। 'আপনি' বলবে না ছাই।....কিছু মনে কোরো না ভাই, সুখের সংসার দেখলে জলে খাক্ হই....আমার কি বেশি দোষ?'

'না। তুমি রমাদি নিজের ওপর অবিচার করছ। ওটা নিতান্ত স্বাভাবিক।'

রমলা দেবী অধীর হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লেন, 'বড় বড় কথা কোয়ো না....'

'কেন? আমার মুখে মানায় না বলে?'

'না, তুমি বুঝলে না বলে। মানুষ স্বভাবকে দায়ী করে না। থাক্....'

'থাক্ কেন?' আমি অবশ্য খগেনবাবু নই।'

'তা নও। যার ধর্ম তারে সাজে। তুমি চুপ কর— কিছু বোঝো না।'

'আমি বোধ হয় তাঁকে ধরতে পেরেছি। খগেনবাবু আত্মসন্ধানী। ভেতরে

তিনি মানুষ অর্থাৎ ধার্মিক। ধর্ম অবশ্য মানব-ধর্ম।'

'না, না, আমি জানি। মানুষকে ভালবাসলে সে পালাবে কেন, সুজন? ধর্ম তার, ভয় করা।'

'এতদিনে এই বুঝলে?'

'ভুল বুঝেছি। সংশোধন করবার উপায়, সুবিধা কোথায় পেলাম বল ভাই···যেন তোমার কথাই ঠিক হয়।'

'আচ্ছা, এবার বল, দেখা না হলে কি করবে?'

'সে দেখব তখন। তোমাকে বলব কেন? তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়।'

'আমার? না, পায়নি। অত নিশ্চয় হয়ো না।'

দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে বাড়ির মালিক-গৃহিণী প্রবেশ করলেন। রমলা দেবী সোজা দাঁড়িয়ে উঠলেন। সুজন অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে রইল। বৃদ্ধা চলে গেলেন, দরজাটা খোলা রেখে।

সুজন বল্লে, 'আমার এখানে রাতে আসা চলবে না।'

'কেন?'

'এটা কোলকাতা নয়, কাশী, তীর্থস্থান, পাছে গৃহের অকল্যাণ হয়।'

'ভয় পাও যদি, এস না।'

'দিনে আসব, এখন চললাম।'

সুজনের বলা হল না যে মুকুন্দর সঙ্গে দেখা ও মাসীমার বাড়ি চেনা হয়েছে। কোথা থেকে বাধা সৃষ্টি করলে ঐ সংস্কারের প্রতিমূর্তি, ঐ প্রবীণা প্রথাটি। বিপত্তি জমিয়েছিল অনধিকার চর্চার উল্লেখ, প্রতীক্ষার আক্ষেপ, নৈরাশ্যের বিক্ষোভ। রমলা দেবী আজ নিজের চাহিদায় সজ্ঞান। কে আশা করেছিল নুয়ে পড়া মানুষটি সোজা হয়ে দাঁড়াবে! এই ত কোলকাতায় ছিল নম্রতা, ভদ্রতা, আপন ভুলে পরের চিন্তা! এ কি হল! এই ক'দিন যে অপেক্ষা করতে পারে না সে কী করে সামনে রেখে নিজেকে সামলাবে! কোথায় যেন ভব্যতার অভাব ঘটল, সংযম টুটল, সভ্যতার আবরণ খসল! খগেনবাবু নেবে যাবেন, তলিয়ে যাবেন স্রোতের টানে, প্রবৃত্তির ভাঁটার টানে, জোয়ারের চেয়ে যার জোর বেশি। হয়ত বা রমলাদির জীবনে স্রোত এল। খগেনবাবুকে টেনে ফেলবে মেলস্ট্রমের গর্তে। সে আবর্তে সোনার তরী ডুবে যায়, অন্তঃসার-শূন্য পিপেই ভাসে। খগেনবাবু পারবেন ওপরে ভেসে আসতে? তিনি কী শক্তি সঞ্চয় করেছেন অন্তরের খাদ ফেলে দিয়ে, উজার করে? কে তাঁকে রক্ষা করবে প্রকৃতির এই উদ্দামতা থেকে? ভেঙ্গে চুরে খান হয়ে যাবেন। রমলা দেবীর নতুন রূপ— স্বভাব পুরাতন, প্রকৃতির উন্মোচন। তবু যেন চোখে ঠুলি দেওয়া। কেন রমলা দেবী এতদিন একলা থাকতে পেরেছেন

স্থজন আজ বুঝলে। তার এই সত্য-রূপকে স্থজনের ভাল লাগে, সে তাকে ভয় করে।

তিন

স্থজনের ঘুম ভাঙল পরের দিন একটু দেরিতে। অক্ষয় এঞ্জিনিয়ার সকালেই রোঁদে বেরিয়ে গেছে। কাজের লোক এই অক্ষয়, হাতকাটা সার্ট ও খাকি সর্টস্ পরে সারাদিনকর্তব্য করে, অতিথিকে যত্ন করতে পারে না বলে প্রায়ই তার কাছে ক্ষমা চায়। নিয়মিত সময় নেই খাবার দাবার, রাতে বাড়ি ফিরতে দেরি করে, তাতে স্থজনের স্থবিধা হয়। কিন্তু অক্ষয়কে স্বাস্থ্যের জন্য নিয়ম পালন করবার অনুরোধ না করাটা অভদ্রতা। স্থজন যত উপদেশ দেয় ততই যেন অক্ষয়ের অনিয়ম বাড়ে, পরিশ্রমে ক্লান্তি আসে না, কর্মবীরের সঙ্গে বাক্যবীরের, বস্তুতান্ত্রিকের সঙ্গে আদর্শবাদীর পার্থক্য ঘোষিত হয়।

বাইরে রোদ খট্ খট্ করছে, রাত্রে ঘুম হয়নি ভাল, স্থজনের দেহে তখনও জড়তা রয়েছে। চাকর বিছানার পাশে চা ও টোস্ট এনে দিলে। কত পরিবর্তন হয়েছে এই ক'দিনের মধ্যে! কোলকাতায় আগে সে ভোরবেলা উঠে নিজে চা তৈরি করত, বিজনকে দিত, তার পাশে বসে গল্প করত। আজকাল সে অলস হয়েছে, তার যৌবনকালীন অধ্যবসায়ের ও নিয়মানুবর্তিতার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে আলস্যকে সমর্থন করে সামাজিক ইতিহাসে অবকাশের প্রয়োজন আবিষ্কার করে। চিরকাল যে ঘড়ি ধরে চলেছে, এখন কাশীতে এসে সে ঘড়িকে নির্বাসন দিতে চায়, রমলা দেবীর সঙ্গে সন্ধ্যা থেকে গল্প ক'রে অনেক রাত পর্যন্ত সময় কাটাতে চায়। তার মনে সন্দেহ ওঠে যে হয়ত বা বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করে সে নিজেকে অনেক কিছু উপভোগ্য বস্তু থেকে বঞ্চিত করেছে। স্থজন সিগারেট খেতে শিখেছে— কেন সে খাবে, না ভেবে।

হাত মুখ ধুতে বেলা সাড়ে আটটা বাজল। কাপড় জামা বদলে স্থজন বেরুতে যাবে এমন সময় খুকি এসে হাজির। খুকি অক্ষয়ের একটি মাত্র সন্তান, বয়স চার বছর, মা নেই, অক্ষয়ের পিসির কাছে মানুষ। পিসি কয়েকদিন হোলো দেশে খাজনা আদায় করতে গিয়েছেন, তাই খুকি বাড়ির পুরানো বাঙ্গালী ঝি-এর তত্ত্বাবধানে থাকে, স্থজনের সঙ্গে গল্প করে। ভাষা বয়সের তুলনায় স্পষ্ট হলেও সব ক্ষেত্রে নয়। একটু বেশি রোগা, নানাপ্রকার বিদেশী ফুড খাওয়া

সত্বেও। এরই মধ্যে বিনুনি ঝোলে মাথার দুপাশে, গায়ে দোকানের তৈরি ফ্রক্।

'কি গো আজ যে রাজরানী!'

'রাজরানী নই, আমার নাম দীপা, ভাল নাম সুজাতা দেবী।'

'এত প্রাতঃকালে সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

ঘরের দরজার পাশে ঝি ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বল্লে, 'এই পাশের বাড়ি গেছনু। আজ আপনি কি খাবেন? মাংস আনব?'

'শরীরটা ভাল নয়। আমরা বাংলা দেশের বাঙ্গালী, মাংস রোজ সহ্য হয় না। ভাতই কোরো, আর এক বাটি চা করতে বল।'

'আমিই করে দিচ্ছি। মহারাজ বাজারে গেছে, চাপরাশিও নেই। এখনই আনছি। খুকি একটু গল্প কর, বিরক্ত করিসনে বাপু।'

ঝি চলে গেল চা করতে।

'কৈগো দীপা, আজ বন্ধুর সঙ্গে কি গল্প করলে?'

'আজ? এই বলছি,···মোড়ের মাথায় পুতুল এসেছে কিনা···নতুন পুতুল—চোখ এমনি করে চায় আর বোজে। চায় আর বোজে, চায় আর বোজে, ছিল্কের জুতো···'

'তা হলে সে ত মানুষ দেখছি, দীপা।'

'না গো না, মানুষ নয়, জ্বালাতন কোরোনা, পুতুল। আমি কিনব। ঠাকুমা যাবার সময় টাকা দিয়ে গেছে, বাবার কাছে আছে। বাবা এলে চাইব, তোমার কাছে নেবনা, বাবা মানা করেছে, চুরি করা হয়, বাবা বকবে।'

'বেশ, বিকেলে কিন 'খন। কি গল্প করলে?'

'গল্প? বলছি। কাকাবাবু, তুমি একটা গল্প বল না?'

'কিসের!'

'রাজা-রানীর।' সুজন আরম্ভ করল, দীপাকে বিছানায় তুলে নিয়ে।

'এক ছিল এক দেশের রাজা, আর এক ছিল আরেক দেশের রানী রাজারও খোকা নেই, রানীরও খুকি নেই। কী করে। মনের দুঃখে রাজা মশাই বই পড়ে হাসিখুশি, খোকার দপ্তর, রানী আর কী করে? রান্নাবান্না করে, ঘরদোর ঝাঁট দেয়, আর রাজা মশাইয়ের অফিসের কাগজে লাল নীল পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকে, কখনও বাঘ, কখনও মানুষ, বাঘের হাঁ-টা ভাল হয় না, কিন্তু মানুষের মুখটা ঠিক যেন রাজা মশাইয়ের মতন, ইয়া গোঁফ, নাকটি ঠিক মনের মতন হয় না। ছেলেপুলে নেই কী করবে বল?'

'রাজা শিকারে যায় না?'

'আরে তাই ত যায়! হাসিখুশি পড়ে কতদিন কাটান যায় বল? রাজা

ভাবেন শিকারে যাই। রাজা শিকারে চললেন, লোক লস্কর, হাতি ঘোড়া, তীর ধনুক…'

'বন্দুক? গুড়ুম!'

'বন্দুক তখন ছিল না। তীর ধনুক, আর বল্লম, আর তলোয়ার। এক বনের ধারে তাঁবু গাড়া হোলো বিকেল বেলা। সামনে নদী, পদ্ম ফুল ফুটে আছে, রাজহাঁস চরছে…'

'প্যাক্, প্যাক্! প্যাক্!'

'ঠিক প্যাক্ নয়, খ্যাক্ খ্যাক্…'

'সে ত ওদের বাড়ির খুকি করে!'

'রাজহাঁসেও করে। তারপর, সন্ধ্যা হোলো, গরম পড়েছে, রাজা নদীর ধারে বেড়াচ্ছেন, এমন সময়, চমৎকার গান শুনতে পেলেন…'

'ঝাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে এসেছি ভুলে…আমি শুনেছি।'

'না, ও গান নয়, গান আর বাজনা…'

'নাচ নয়? ঝুমুর, ঝুমুর, কলের গানে যেমন নাচে?'

'না, রাজা তখন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, যেন দূর থেকে আসছে, আসছে, আসছে, ঐ এলো। রাজা দেখেন কী! একটা রূপোর নৌকা, তার মাথাটা হাঙরের মতন দেখতে…হাঁ, হাঁ, ঠিক ঐ রকম মুখটা, আর নয়, আর নয় ঠোঁট চিরে যাবে। তারপর দেখেন কী! নৌকার উপর ঘর, ঘরের ছাদে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে বসে রয়েছে, আর গান গাইছে, হাতে সেতার, পিড়িং পিড়িং করে বাজে যেটা সেইটে। রাজা ভাবলেন, কোথায় এলাম! একি স্বর্গ!'

'মা যেখানে গিয়েছে?'

'হাঁ, বটে, কিন্তু সে রকম ঠিক নয়। রাজার মনে যেন হচ্ছে—স্বর্গ। তারপর, রাজার সঙ্গে মেয়েটির চোখাচোখি হয়ে গেল…'

'এইরে, আমি জানিরে! বলব, বলব?' তারপর রাজার সঙ্গে রানীর বিয়ে হয়ে গেল। ঠিক বলেছি কিনা বল? এইবার পয়সা দাও… পুতুলটা কিনব।'

সুজনের গল্প গেল ভেঙ্গে। ঝি চা ও সামান্য খাবার নিয়ে এল একটা ডিশে। চা পানের সময় খুকির দৃষ্টি অনুসরণ করে সুজন পিরিচে কয়েক চামচ চা ঢাললে। ফুঁ দিয়ে নিজেই ঠাণ্ডা করে খুকি এক চুমুকেই চা খেলে, ঝিএর মানা শুনলে না। ঝি খুকিকে নিয়ে চলে গেল।

ডাক-পিওন চিঠি ছুঁড়ে দিলে জানালা দিয়ে। কোলকাতার ছাপ, হাতের লেখা বিজনের। তাড়াতাড়ি সুজন খামটা ছিঁড়ে চিঠি পড়লে।

বিজন লিখছে:

সুজনদা, তুমি যাবার পরই হার্ড কোর্টসের খেলা শুরু হয়। এবার কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠেছিলাম। শেষ সেট্‌-এ ৫।৩ গেম্‌ লীড্‌, ফর্টি-ফিফ্‌টিন, এমন সময় পিছলে পড়ে যাই। তারপর কী হয়ে গেল যেন— ৭।৫এ হেরে গেলাম। ডবল্‌সে সেমি ফাইন্যালে যাই, স্টেটস্‌ম্যান আমার সম্বন্ধে কী লিখেছে আশা করি পড়েছ। মিক্‌স্‌ড্‌ ডাবল্‌স্‌এ কাপ্‌ পেয়েছি। ওরা বলে, আমি নাকি বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মিক্‌স্‌ড ডাবল্‌স্‌ খেলোয়াড়! কিন্তু আমার দুরাশা সিংগল্‌সে। রমাদি হাসছেন, বেশ বুঝতে পারছি। সে যাই হোক, আমার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে টের পাচ্ছি, তুমিও পেয়েছ নিশ্চয়। এখন নিজের ওপর বিশ্বাস এসেছে, কোর্টে দাঁড়িয়েই মনে হয় হারিয়ে দেব, বিপক্ষের যত বড় নামই হোক না কেন বেশ চালাকি শিখেছি। আগে তার দোষ দেখে নিই। প্রায় সব মিঞাই ব্যাকহ্যাণ্ডে গঙ্গারাম! আর ওভার হেড! এক সাহানী ও কৃষ্ণস্বামী ছাড়া কারুর ও-বালাই নেই। তাই আজকাল কেবল বিপক্ষের বাঁয়ে বল পাঠাই, আর না হয় লব্‌। ড্রপ্‌ শট্‌ আমার কেমন হয় জান, তাই একটু একটু করে নেট্‌এর কাছে না এনে, তারপর টুক্‌ করে মাথার ওপরে ডীপ্‌ লব্‌— ব্যস!

তাই বলছি, ঠিক এখন যখন আমার উন্নতি হচ্ছে, নিজের ওপর যখন বিশ্বাস জন্মেছে, তখন কোচ্‌এর কাছে মাসখানেক ট্রেনিং না নিলে দেখছি চলছে না। খবরের কাগজেও তাই লিখেছে। তুমি বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটু লিখবে, তোমার কথা তাঁর কাছে বেদবাক্য। আর আমি যেন হরিজন, বাবার কাছে। যেন ভুলোনা লিখতে। আমি লিখতে পারব না। যাকগে, আর টেনিসের কথা নয়, তোমার কোনো ইন্‌টারেস্টই নেই, তুমি, তোমরা যেন কী হয়েছ, কাশী গিয়ে। ধর্ম করছ? উচ্ছন্ন যাবে বলে দিলাম। দেশের সর্বনাশ হয়েছে ঐ করে।

এক মজার ব্যাপার ঘটেছে। তুমি শীঘ্রই কোলকাতা চলে এস। যদি না আস আফশোষ হবে শেষে। ইতি

বিজন

পুঃ কাউকে যদি না বল প্রতিজ্ঞা কর, তবে পরের চিঠিতে লিখতে পারি। একটু আভাস দিচ্ছি, নচেৎ রমাদি-তে আর তোমাতে আমার পার্টনার নিয়ে ঠাট্টা ও হাসাহাসি করবে। আমি সোশিয়ালিস্ট হয়েছি। এইবার দেখ! খগেনবাবুর ব্যক্তিবাদ নয়— অন্য জিনিস। শুনলাম ভদ্রলোক নাকি আশ্রমে সেঁধিয়েছেনে। জানতাম তাঁর দৌড় ঐ আশ্রম পর্যন্ত। আশ্রম হোলো আফিম ও গুলির আড্ডা। আশ্রমবাসের অর্থই হোলো স্বার্থপরতা। এ-যুগে মেটিরিয়ালিস্ট না হলে চলবে না। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছে করছে। আমি দু'একটা মিটিংএ যোগ

দিয়েছি, এলবার্ট হলে। যদি থাকতে! তুমিও সোশিয়ালিস্ট না হয়ে থাকতে পারতে না।

আমাদের গাড়িখানার কল বিগড়েছে, বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থার মতন। ভাবছি সারাব না! আমার কোনো অধিকার নেই ভোগ করবার যখন চারধারের লোক খেতে পাচ্ছে না।

রমাদি আমাকে ভুলে গেছে। আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

তাঁকে কোনো চিঠি দেবো না। তাঁকে বোলো যে তাঁর সম্বন্ধে জানবার আমারও কোনো আগ্রহ নেই।

বিজন

পুঃ পুঃ তুমি যত শীঘ্র পার চলে এস। বাবাকে টেনিস্ কোচের কথা লিখতে যেন ভুল না হয়। রমলাদির গাড়িটা গ্যারেজে পড়ে রয়েছে, এঞ্জিন খারাপ হবে, টায়ারও যাবে। নিতে পারি কি দরকার হলে? আমাকে মধ্যে মধ্যে খিদিরপুর যেতে হয়। আমি ড্রাইভ না হয় নাই করলাম।

বিজন

গোটা গোটা ছাঁদা অক্ষর বিজনের, এখনও যেন দাগা বুলুচ্ছে। কিন্তু হস্তলিপির সরলরেখায় তার অপরিণত সরলতার সাক্ষ্য দেয়। আগে কখনও বিজন কমা, ফুলস্টপ দিত না, নতুন দিতে শিখেছে, ছেদগুলো যেন উগ্র মনে হয়। আত্মপ্রচারের ভেতর দিয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জন করছে। আগে নিজস্ব আছে স্বীকার করুক, তারপর সন্ধান চলবে। খগেনবাবুকে বিজনের ভাল লাগে না যে তার কারণ বিজন এখনও নিম্নস্তরের। সময়ের স্তর, স্বভাবের নয়। অপরিণত যে ব্যক্তি সে কখনও পরিণতির পন্থার দুর্গমতা কল্পনা করতে পারে না, সংশয়ীর বিরোধকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। অথচ সংশয়, বিরোধ, এই জীবন। সকলকেই খগেনবাবুর রাস্তার পথিক হতে হবে। এই হোলো মানবের আদিম অভিশাপ। মানুষকে সভ্য হতেই হবে। সভ্যতা বনাম দ্বিধা, তাকে পাশ কাটিয়ে চলবে কে? হয় সে অবসর-প্রাপ্ত বৈষ্ণব রায়বাহাদুর, না হয়, অক্ষয়।

নীলকণ্ঠ না হয়ে বাঁচা যায় না। সুজনের নিজের মনে আগে একটা সামঞ্জস্য ছিল, এখন যেন বিচ্যুতি ঘটেছে। বিজন এত অল্প বয়সে, আত্মসন্ধানী হবার পূর্বেই, তার প্রয়োজন ঘটবার আগেই কেন সোশিয়ালিস্ট হোলো? এ যেন বাঙ্গালী মেয়েদের কালচার, দ্বিতীয় ভাগের পরই রবীন্দ্রনাথ। ইজমে বিশ্বাস পরাশ্রয়ের পরাকাষ্ঠা।

সোশিয়ালিজমের নামে নামে কেমন একটা আতঙ্ক আসে, অজানা অনিশ্চিতের ভয়। আবার একটা মোহও আছে। সোশিয়ালিস্ট হোক গরীব

গৃহস্থের সন্তান, যাদের বুকে অর্থবৈষম্য বিঁধেছে। মনে মনে যারা স্নব, যারা সমাজের উর্ধ্বতম শিখরে আরোহণ করতে চায়, তারা যখন ভাবে অর্থ নেই বলেই পাচ্ছে না তখনই তারা পরাভবের ব্যাখ্যা করতে সাম্যবাদের আশ্রয় নেয়। বিজন স্নব নয়, টেনিস খেললেই স্নব হয় না, পয়সার তার অভাব নেই, সে আদুরে ছেলে। সোশিয়ালিজম্ শোভা পায় সৃজনের নিজের, তার মতন অবস্থার লোকের। বৈষম্য রয়েছে সর্বত্র, কিন্তু বৈষম্যবোধ আসে নিম্নশ্রেণীর যারা দলিত পিষ্ট, যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খেতে হয়। বিজনের সোশিয়ালিজম বড়লোকের ছেলের খামখেয়াল। এও একপ্রকার রোমান্টিসিজম। অবশ্য, প্রেমে পড়ার ফ্যাশান উঠে গেলে মন্দ হয় না।

বেলা বারোটা বেজে গেল, অক্ষয় তখনও ফেরেনি। ঝি খুকিকে খাইয়ে দিয়েছে, এবার সে ঘুমোতে যাবে। সৃজন স্নানাদি শেষ করে খাবার চাইলে মহারাজের কাছে। খাবার পর বিশ্রাম করতে মন সরল না। খগেনবাবুর খোঁজ পাওয়া না গেলেও মাসীমার সঙ্গে দেখা হয়েছে খবরটুকু রমলাদিকে জানান হয়নি, সেজন্য মনটায় খচ্ করে উঠল। কিন্তু আবার মনে হোলো, দিয়েই বা কী হবে। রমলাদি তাঁকে পেলে আপন করবেন বলেছেন। অদূর সর্বনাশের ছায়াপাত হয় সৃজনের মনে। তার চেয়ে খগেনবাবু মাসীমার কাছে থাকুন— সেই ভাল। মুকুন্দ বলেছে মাসীমা দুটোর আগে ফেরেন না।

সৃজন যখন মাসীমার বাড়ি পৌঁছল তখন প্রায় দুটো বাজে; কড়া নাড়তে মুকুন্দ বেরিয়ে এসে তাকে ছায়ায় অপেক্ষা করতে বললে, ঠাকুরুণ আহারে বসেছেন, এখনই উঠলেন বলে, তারপর মুকুন্দ খেতে যাবে, ইতিমধ্যে, বাড়িতে বসবার ঘর না থাকার জন্য সে সঙ্কুচিত। তীর্থের অকিঞ্চনতা, কাশী ও কোলকাতার পার্থক্য সম্বন্ধে সৃজন পুরোদস্তুর সজ্ঞান জেনেও মুকুন্দর লজ্জা গেল না। কোলকাতার অনেক দোষ, লোকগুলো নাক সিঁটকে হাঁটে, মোটর চড়ে কাদা ছিটতে ছিটতে যায়, মাল বোঝাই মোটরগাড়ি বলা নেই কওয়া নেই হুমড়ি খেয়ে ঘাড়ের ওপর পড়ে, দুধে জল, খাবার দামও বেশি, তরকারিপত্তর, মাছ, বিশেষত গঙ্গার ইলিশ টাটকা মেলে না, কিন্তু হাজার বার মুকুন্দ বলবে, ভদ্দরলোকের খাতির করা যায় সেখানে, ইচ্ছে হয়, দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে সিঙ্গাড়া কচুরি আনান; এক মিনিটে চপ কাটলেট গরম গরম এখানেও পাওয়া যায়, কিন্তু মুখে দেওয়া যায় না— ধুলো আর পাঁটির মাংস। ক্ষীর ভাল— বলে কি না 'খোয়া'! কিন্তু ক্ষীর খেয়ে খেয়ে কাশীর খোট্টাদের মতন ভুঁড়ো হবে কে! একার ঠেলায় পথ হাঁটা যায় না— হাঁকাচ্ছেন ত একা, ভাবছেন রথ! তবু যদি মোটর হোত! আর এত বিধবাও আছে! এধারে দেখুন, খালি হাত, ওধারে চান, থান কাপড়, তার ওপর

মালা আর কুঁড়োজালি····সারাদিন সব চর্কির মতন ঘুরছে। ষাঁড়গুলো যেন 'ক্যার' করে না কাউকে, দোকানে থেকে ফল তুলে খাচ্ছে, তাদের মাথায় আবার সিঁদুর, গায়ে গোল গোল চুনে হলুদের ছোপ, লোকে আবার কুঁদো ষাঁড়কে নমস্কার করে। বেশি করে ঐ বিধবার দল। আর ঘটি করে রাস্তার দুপারের বটতলার নোড়ানুড়ির মাথায় জল ঢালা। কাশী এলে কারুর মাথার ঠিক থাকে না— যেন ধর্মের বড়বাজার। হিন্দু ধর্মের বিপক্ষে মুকুন্দ মন্তব্য প্রকাশ করে মহাপাতকী হতে চায় না, কিন্তু ষাঁড়হীন, বিধবাশূন্য, নুড়িবিহীন কোলকাতাতেই যে ধর্ম করা শ্রেয় সে বিষয়ে তার তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

'দেখুন না বাবু, আমাদের বাবু কোলকাতা থাকলে কী অমন হতেন, না আপনারা হতে দিতেন? কেবল সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সঙ্গে ঘোরা ফেরা। মাসীমা এধারে অধীর হয়ে উঠেছেন। এবার ত নিরুদ্দেশ! ঐ শরীরে সহ্য হবে কত! বাবুর আমার চা নেই, সিগারেট নেই, খবরের কাগজ, বিলেতি ডাক, বইপড়া ঘুচে গেছে। কথাবার্তা বন্ধ, আমাকে বকেন না পর্যন্ত। আচ্ছা বাবু, আপনাকে মেমসাহেবের বাড়ি দেখেছি, না?'

'কোন মেমসাহেব মুকুন্দ?'

'ঐ যে, আপনাদের চিন্তামণির মেমসাহেব গো!'

'চিন্তামণির মেমসাহেব!'

'যিনি গো বাবুকে খুব যত্ন করলেন, তখন!'

'ওঃ হাঁ হাঁ, সেইখানেই দেখেছ নিশ্চয়।'

মাসীমা বেরিয়ে এলেন, কিন্তু এক চটকা দেখে না চিনতে পারার দরুণ সুজনকে খগেনবাবুর বন্ধু হিসাবে আবার পরিচয় দিতে হোলো।

'কৈ বাবা, কিছু খবর পেলে?'

'এখনও পাই নি। আপনার কাছ থেকে খবর নিয়ে সন্ধান করব।' বৃদ্ধার আদেশে সুজন তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে। এক গেলাস মিছরি-পানা সেবন ও মুখশুদ্ধির পর খগেনবাবু কাশীবাসের বিবরণ যা জানা গেল তা এই— খগেনবাবু কাশী এসে প্রথম প্রথম রোজই প্রায় মাসীমার সঙ্গে দেখা করতেন, ইচ্ছেটা ছিল যে মাসীমা তাঁর বাড়ি ছেড়ে ছেলের কাছেই থাকেন, কিন্তু সংসারে পুনরায় জড়িয়ে পড়ায় বৃদ্ধার ভীষণ আপত্তি ছিল। তবু খগেনবাবু প্রায়ই এসে শুক্তো আর সজনে ডাঁটার ছেঁচকি খেতেন। মাস দু'এক পরেই তাঁর আসা কমে গেল। মুকুন্দর কাছে শুনলেন সাধুসঙ্গ চলছে। কিছুদিন পরে খগেনবাবু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বেড়িয়ে পড়েন। মাসখানেক পরে 'মুখখানি আম্‌সী করে ফিরে আসে, চোখের কোল বসে গিয়েছে' বলতে বলতে বলতে বৃদ্ধার চোখ চক্‌ চক্‌ করে উঠল।

আবার কয়েক সপ্তাহ বেশ লক্ষ্মী হয়ে রইল তারপর আজ কতদিন হোলো দেখা নেই, চিঠিপত্রও নেই; মুকুন্দ মাসীমার কাছেই থাকে। মুকুন্দ বলে, 'ঠাকরুণ বিয়ের কথা পেড়েছিলেন, মুখের সামনে হেসে উড়িয়ে দিলেন, রাগ করবার জো নেইত, কিন্তু বাড়ি গিয়ে আমার উপর হানা দিতে লাগলেন। সে সব কী বুক বেঁধান কথা! তিনি নাকি ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনলে আমার বাহুচাল্যি থাকবে না, মুড়ুলি করতে পারব না, আর যদি বিয়েই করেন তবে এমন মেমসাহেব দেখেই করবেন যে আমাকে জব্দে রাখবে।' মাসীমা তাকে ধমক দিলেন। মাসীমা হাই তুলছেন দেখে সুজন চলে এল।

বাড়ি এসে সুজন হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ল। মাথা ধরেছিল রৌদ্রে ঘুরে। একটু বিশ্রাম নিলে মন্দ হয় না। অক্ষয় বাইরের পোশাক পরে সুজনের ঘরে এল। 'দুপুর বেলা কোথায় ঘুরতে যাও হে সুজন? এখানকার রোদ্দুরটা বড় খারাপ। সন্ধ্যার আগে না বেরোনই ভাল। আমাদের কথা ছেড়ে দাও, একেবারে সান্‌প্রুফ, ওয়াটার-প্রুফ। তোমাদের সইবে না। আচ্ছা, একটু বিশ্রাম কর, তারপর চা খেয়ে বেড়াতে যেও। আজ আমার ফিরতে রাত হবে একটু বেশি। নেমন্তন্ন সেরে আসব, যেতেই হবে, ছাড়বে না কিছুতেই, মস্ত কন্‌ট্র্যাক্টর, প্রায় দশ লক্ষ টাকার কাজ করে আমাদের। লোকটা বেশ ফুর্তি দিতে জানে হে! নাতির মাথা মুড়োন, কী ঐ রকম একটা কিছু। আচ্ছা শোও এখন। চেয়ে চিন্তে নিও। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, ঐ যে তোমাদের শাস্ত্রে বলে, নিজেই নিজের যত্ন কোরো আমাকে অফিসের কাজ সেরে যেতে হবে।' অক্ষয় মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিশ্রামের পরও মাথা ছাড়ল না। চা খেয়ে খদ্দরের চাদর নিয়ে সুজন গঙ্গার ঘাটের দিকে চলল। সোনালী আলো পড়েছে নদীর ওপর, সন্ধ্যা তখনও হয় নি। ঘাটে একজন অল্প পরিচিতের সঙ্গে দু'চারটি কথা বিনিময় করে সে অহল্যা-বাইএর মন্দিরের নিচে বসে পড়ল। এ ত মন্দির নয়, প্রাসাদ-দুর্গ। ধর্মের জোরে মারহাট্টার ক্ষাত্রবীর্য কাশীর গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত এসে আত্মসম্বরণ করেছে। এ স্থাপত্যে আত্মনিবেদন নেই, আছে নিজের শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, অভ্রভেদী দম্ভ। মীরার মত বৈষ্ণবী ছিলেন না অহল্যাবাই, বাঙ্গালীও নয়, অথচ হিন্দু। হিন্দুত্বের এই দিকটা রাজপুতানা কী মধ্যভারত ভিন্ন অন্য কোনো প্রদেশে চোখে পড়ে না। চারধারে ধূ ধূ করছে মরুভূমি, কিংবা লালমাটি ঢেউ খেলতে খেলতে দিগন্তে প্রসারিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে হাজার ফুট উঁচু আর মাইল খানেক লম্বা এক পাহাড়, সেই পাহাড়টার বুকে এক কেল্লা, তারই পায়ের কাছে শহর বলতে যা কিছু, ভেতরে সরু পাথরকাটা রাস্তা, সশস্ত্র প্রহরী-রক্ষিত সরু উঁচু ফাটক, আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে অন্দরে প্রবেশ করেন রাজপরিবার। সেখানে কি আছে কে

জানে? আছে বীরত্ব আর গুপ্ত ষড়যন্ত্র, আছে আত্মসম্মান আর কৃতঘ্নতা, বড়-ছোটর যৌথ পরিবার। ওপরে ওঠ, সূর্যাস্ত দেখবে থরের ওপারে, পাহাড় সবুজ হয়েছে বর্ষার প্রারম্ভে, দূরে আর একটা পাহাড় দেখা যায়, ওপরে এক জায়গীর-দারের কেল্লা, ভীষণ লড়াই হয়েছিল ওরই পাদদেশে। তখন ভারত ছিল স্বাধীন।

না, অহল্যা দেবীর মন্দিরে ধর্ম নেই, আছে, তার চেয়েও বড়, আত্মপ্রতিষ্ঠা।

সুজন বেশিক্ষণ অহল্যা দেবীর মন্দিরের আশ্রয়ে বসতে পারলে না। অত ভারী বাড়ির কাছে বসলে হাঁপ ধরে। সন্ধ্যা অজানিতে আত্মগোপন করেছে। এসেছে অন্ধকার। সুজন ঘাট থেকে ফিরছে এমন সময় রমলা দেবীর সঙ্গে দেখা। বাড়িতে না পেয়ে তিনি ঘাটে সরাসরি চলে এসেছেন দেখা হবার আশায়। মুখে চোখে কিসের ব্যস্ততা।

একটু পাশে নিয়ে গিয়ে রমলা দেবী বল্লেন, 'সুজন, তুমি আমাকে আজই, এখনই অন্য বাড়িতে নিয়ে যাও, আমি কিছুতে ওখানে থাকতে পারব না। বিকেলে আসনি কেন? বসেছিলাম কতক্ষণ ধরে।'

সুজন কেবল অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

'সুজন, উত্তর দাও, আসনি কেন? আমাকে বাড়িঅলি অপমান করেছে, আমাকে নিয়ে খারাপ ইঙ্গিত করেছে। ঐ ছোট্ট খুদে বৌটার মন কী নিচু, জঘন্য, ছিঃ··· মেয়েজাতেরই ওপর আমার অশ্রদ্ধা এসেছে····আমি পারব না থাকতে, তুমি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চল। যাবে কি না বল? চুপ করে কি দেখছ? আমার অপমান দেখবে? পুরুষ মানুষ না তুমি? না, খগেনবাবুর শিষ্য?'

'কি করছেন, রমাদি! রাস্তার লোকে····'

'রাস্তার লোক রাস্তার ডাস্টবিনএ পচে মরুক, কুকুরে খাক তাদের·······তুমি আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে চল।'

'চলুন এখান থেকে।'

রাস্তায় সুজন রমলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'মাসীমার বাড়ি যেতে আপত্তি উঠবে কি?'

'যেখানে হোক। মাসীমার বাড়ি? মাসীমার বাড়ি? মাসীমার বাড়ি জান? এসেছেন ফিরে?'

'না, মাসীমার বাড়ির ঠিকানাটুকু।'

'বলনি কেন?'

'এই কাল টের পেয়েছি। বলব কী করে! তুমি যা করছ ক'দিন থেকে তাতে আমার বড় ভয় হয়েছে।'

'ভয়! কেন, আমি কি করেছি? তুমি কেন ভয় পেলে ভাই? তুমি না

সুজন ? তোমার কাছে স্বাভাবিক ব্যবহার করব না ত কার কাছে করব ? আচ্ছা, এই ভদ্রমহিলা হলাম।' রমলা দেবী হেসে উঠলেন।

'রমাদি, তোমার পায়ে ধরছি, একটু ঠাণ্ডা হও। আমার বড়, সত্যি বলছি, বড় ভয় করছে।'

'রমলা দেবীর মুখের ওপর দিয়ে কে যেন শীতল হাত বুলিয়ে দিলে, চমক লাগল, একবার মাত্র পলক পড়ল, তারপর পাথরের মত শান্ত কঠিন। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর প্রস্তরমূর্তি কথা কইলে— 'সুজন, ভয় হয়েছিল কেন ?'

'উন্মুক্ত প্রকৃতি কখনও দেখিনি।'

'তাইতে ?'

'তার চেয়ে ভয়াবহ আর কী আছে ? অবশ্য, আমার কাছে। আমি যে নিতান্ত সভ্য জীব, অভ্যাস হোলো আমার মাটি, সেটা টললে মাথা ঘুরে যায়। আমি আবরণে অভ্যস্ত।'

'ছাই, ছাই, মাটি নয়। ভাব মাটি, তার তলায় ছাই আছে, তাও নেই, ফাঁকা, ভুয়ো।'

'যাই বল। তুমি বড় অপ্রত্যাশিত ব্যবহার করছ এ ক'দিন।'

'তোমার কাছে অপ্রত্যাশিত ত ? জানি তোমার প্রত্যাশা। "লক্ষ্মী মায়ের লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী ঘরের বৌ।" ছোট বৌটির মতন, কেমন। ঐটুকু পুঁচকে মেয়ে কী ইঙ্গিত করেছে শুনবে ? তোমার সঙ্গে আমি চলে এসেছি···দেওরের সঙ্গে কুমি··ঐ ব্যবহার আমার নয় বলে অপ্রত্যাশিত! আর তাইতে ভয়!'

'ছেড়ে দাও ওসব কথা। ঐটুকু····'

'ঐটুকু মেয়ে! অথচ স্বামীকে এঁটুলির মতন আঁকড়ে ধরে আছে··· কেবল কী ঐ মেয়েটি! বাড়ির গিন্নী পর্যন্ত বলে, আমাকে কাশীর বাড়িঅলি পেয়েছ ? আমার বাড়িতে তোমাদের রাসনীলে চলবে না··· আমার ব্যবহার অপ্রত্যাশিত! আর তাইতে তোমার ভয়! চমৎকার!'

'বেশ, কালই আমি অন্য বাড়ি দেখব····ওখানে থাকা হতে পারে না। কিন্তু, আজ আমি এখন কোথায় খুঁজব ?'

'তোমার আত্মীয়ের বাড়ি ?'

'তাঁর স্ত্রী নেই জানই ত। তাঁর পিসীমাও দেশে গেছেন।'

'আমি বাইরের ঘরে শোব।'

'আমি সেইখানে শুই। কী করে সম্ভব বুঝে দেখ, রমাদি! অস্থির হলে চলে কি ? আজ যা করে হোক রাতটা কাটিয়ে দাও।'

'তবে মাসীমার বাড়ি নিয়ে চল।'

'সেখানে মাত্র একটি ঘর।'

'তুমি দেখেছ? কবে গেলে? জেনেও আমাকে বলনি।'

'আজ দুপুরে দেখলাম। কি বলে পরিচয় দেব?'

'বলবে, তোমার আত্মীয়।'

'সে হয় না—অসম্ভব! আমিই তাঁকে চিনি না ভাল করে। আমিই তাঁর কে!'

'যদি খগেনবাবুকে সত্যি ভালবাসেন, তবে তুমি তাঁর সব। আমাকেও ঠাঁই দেবেন এক রাত্রের জন্য।'

'কি বলব?'

'বোলো, সাবিত্রীর দূর সম্পর্কের বোন····যা হয় তাঁর বৌমার আত্মীয়াকে এই বিপদে ফেলে দেবেন না তিনি, আমি জানি। কালই আমি চলে আসব, অন্য বাড়িতে। ও বাড়ির মুখ দেখব না।'

'আচ্ছা, তাই চল। মনে হয় না···যাকৃগে। একবার তোমার বাড়িটা ঘুরে যাব, তুমি কোথাও দাঁড়িও, ভেতরে না যাও।'

'আচ্ছা, চাবি নাও। কোন কথা বলতে পারবে না ওদের সঙ্গে। ব্যাখ্যা কোরো না।'

সুজন রমলা দেবীর বাড়ি প্রবেশ করে সোজাসুজি ওপর তলায় চলে গেল। কর্তা বসে তামাক খাচ্ছেন। বৃথা বাক্যব্যয় না করে সুজন তাঁকে সাফ বলে দিলে যে রমলা দেবী আর এ বাড়িতে থাকবেন না। বাড়িভাড়া অগ্রিম দেওয়া ছিল। কর্তা পনের দিনের নোটিশ চাইলেন। সুজন কালই আরো পনের দিনের ভাড়া দিয়ে যাবে প্রতিশ্রুতি দিলে। জিনিসপত্র যেমন ঘরে সাজান আছে তেমনই থাকবে, যতদিন না নিয়ে যাওয়া হয়। গৃহিণী ঘোমটার আড়াল থেকেই বল্লেন, 'এ বাড়ি আপনাদের সুবিধে হবে না আগেই জানতাম। আমার গুচ্ছির খরচ কপালে ছিল কেবল।' দোতলার সব ঘর ভেতর থেকে বন্ধ করে একটি দরজায় তালা লাগিয়ে সুজন নেমে এল।

রমলা দেবী অন্ধকার একটি কোনে গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সুজনের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল।

'রমাদি, তুমি বরঞ্চ আপাতত আমার ওখানেই চল। আমার ঘরে বোসো, কেউ নেই, আমি শীঘ্রই মাসীমার সঙ্গে দেখা করে আসছি।'

'সেই ভাল। তোমাকে কষ্ট দেবো না।'

'কষ্ট নয়, কষ্ট আর কি!'

সুজনের কণ্ঠে দুর্বলতার লক্ষ করে রমলা দেবী হঠাৎ জলে উঠে বলেন, 'তুমি

কী ভাব, কাশী শহরে একরাত্রি থাকবার আমার স্থান নেই ? কোনো নাটমন্দিরে সারারাত কাটিয়ে দেব।'

'চুপ কর। তুমি বসবে চল। তারপর কী হয় দেখছি।'

সুজন রমলা দেবীকে নিজের ঘরে বসিয়ে দরজা বাইরে থেকে সন্তর্পণে বন্ধ করে মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

চার

'মুকুন্দ, মুকুন্দ, মুকুন্দ! আমি একবার মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে চাই এখনই।'

'বাবুর খবর পেয়েছেন?'

মাসীমা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে সুজন দরজা ঠেলে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলে।

'এই যে মাসীমা!'

'এত রাত্তিরে!'

'না, খগেনবাবুর কোন খোঁজ পাইনি, কিন্তু আমি একটু বিপদে পড়েছি। আপনি যখন খগেনবাবুর মাসীমা, তখন আমারও আপনাকে উদ্ধার করতেই হবে। এক রাত্রির জন্য আমার এক আত্মীয়াকে আপনার ঘরে স্থান দিতে হবে। তিনি বাড়ি খুঁজে পাচ্ছেন না, কালই সকালে অন্যত্র নিয়ে যাব। কোন কষ্ট হবে না তাঁর, এই মেজেতেই মাদুর পেতে শোবেন, সঙ্গে লটবহর নেই। চমৎকার মাদুর! কোথায় পেলেন মাসীমা? যেন শীতলপাটি! মাসীমা, আমি তাঁকে নিয়ে আসি?'

'এখনই! সে কি করে হয় বাবা! তুমি খগেনের বন্ধু বলছ, তাই আমি কিছু বলতে পারি না, কিন্তু কাশীতে অনেক ব্যাপার ঘটে কিনা, তাই বলছি। কিছু মনে কোরো না, মেয়েটি বাড়ি থেকে চলে আসেনি ত? স্বদেশী মেয়ে?'

'না মাসীমা, স্বদেশী মেয়ে মোটেই নয়। ওসব হলে আমিই বা আনব কেন?'

'তবে নিশ্চয় ঝগড়া করে এসেছে। কিংবা···বাবা, তাকে বিধবা আশ্রমে পাঠিয়ে দাও।'

'না, না, ও-সব কিছু নয়। উনি খগেনবাবুর স্ত্রীর বন্ধু, একরকম আত্মীয়ারই সামিল। খগেনবাবুর সঙ্গে সেই সূত্রে খুব পরিচয়।'

মুকুন্দ বলে উঠল, 'মেম সাহেব এসেছেন বাবু? সেই যে গো, যার কথা

বলেছি, জুতো পরেন, মোটর চড়েন, ইংরেজী বলেন....'

মুকুন্দ ও মাসীমার দৃষ্টি বিনিময় লক্ষ করে সুজন বললে, 'তুই থাম, মুকুন্দ। মাসীমা? আপনার কষ্ট হলে না হয় থাক, অন্য বন্দোবস্ত করচি। এত রাত্তিরে এই যা।'

'না, আমার কষ্ট হবে না। তাঁরই কষ্ট হবে, তিনি পারবেন না।'

'তিনি' শব্দটির উচ্চারণে সুজনের মনে হোলো যেন বহু ইঙ্গিত রয়েছে, মুকুন্দ যেন মাসীমাকে সতর্ক করে দিয়েছে। মনে হোলো যেন কোন বহু পুরাতন সাবধান স্বার্থ-বন্ধনে দুটি প্রাণী একত্রিত হয়েছে। অলক্ষ শত্রুর গন্ধে পশুর দলই শ্রেণীবদ্ধ হয়ে নিরীহতা বর্জন করে, প্রথমে চঞ্চল, পরে তুষ্ণীভূত। কিন্তু মানুষের আচরণ একটু ভিন্ন হওয়া চাই। মাসীমা ও মুকুন্দ মনুষ্যত্ব খুইয়ে এক হোলো। জড়ের ঐক্যে, পাশবিক ঐক্যের কাঠিন্যে যেন মাথা ঠুকে যায়। আহত হয়ে সুজন রমলা দেবীর কাছে ফিরে এল।

'কি হোল সুজন? মাসীমা রাজী হলেন না? জানতাম। আমি তোমার ঘরেই শোব। তোমার আত্মীয় আসবেন, কী বলবে তাঁকে তৈরি কর এখন থেকে।'

'তাঁকে যা ঘটেছে তাই বলব। গৃহকর্ত্রী অপমান করেছে।'

'তিনিই বাড়ি ঠিক করলেন, আর তাঁকেই বলবে?'

'তা ভিন্ন উপায় কী?'

নিতান্ত অবান্তর মন্তব্য প্রকাশের মতন রমলা দেবী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, 'বলবার কোনো প্রয়োজন আছে?'

'তুমি কী বলছ রমাদি!'

'বেশ, বেশ, তাই ভাল, যা ইচ্ছে তোমার তাই বোলো। কী বলবে শিখে নাও— আমি খারাপ মেয়ে, কারুর সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারি না। অত ভয় কিসের সুজন? লোকে তোমাকে নিন্দে করবে রাত্রে যদি তোমার ঘরে আমাকে কেউ দেখে? বেশ, তুমি না হয় অন্য ঘরে শোও গে। আমি এই তোমার খাটে গা ঢাললাম.......পার ত হাত ধরে টেনে তোল, তাড়িয়ে দাও।' রমা দেবী হেসে উঠলেন, হাসতে হাসতে সুজনের চোখে চোখ রেখে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন, ডান হাত মাথার নিচে, ওপর হাতের তলা চিতি সাপের পেটের মতন সাদা.......দেহের রেখায় ঢেউ লেগেছে.......'সুজন, এ-বিছানায় তোমার বৌ কিছুতেই শোবে না.......বাবা গো...কি খাট মা! ব্রহ্মচারীর খাট! ইটের পাঁজায় মানুষ শোয়? তোমার কম্বলগুলো কোথায়? বসবে না? অত দাঁড়িয়ে থেকো না। খাবে না? যাও ভেতরে, নয়ত ঘরেই খাবার নিয়ে আসবে মহা-

রাজীন্। যাও, যাবার সময় না হয় দরজা ভেজিয়ে দিও। তোমার আত্মীয় কী তোমার সঙ্গে গল্প করেন রাত্রে?'

সুজন ভাঙ্গা গলায় উত্তর দিলে, 'না।'

'তবে দেরি কোরো না,⋯যাও, খাবার খেয়ে এস। পেঁড়া কিছু নিয়ে এলেই হোতো, পড়ে আছে। আমি কিছু খাব না।'

সুজন দরজা বন্ধ করে ভেতরে গেল। 'ঝি, আমি কিছু খাব না। যা আছে এখনই আমার হাতে দাও।' ঝি একটা থালায় ফলের কুচি ও দুটি সন্দেশ গুছিয়ে দিলে, আর এক বাটি দুধ। 'রাতে খিদে পেলে খাব। আমার কুঁজোয় জল আছে, আর দিতে হবে না। দীপা ঘুমিয়েছে?'

'খুকি খুঁৎ খুঁৎ করছে বাবু। যা দরকার হয় চেয়ে নেবেন।'

'আচ্ছা। তুমি দীপার কাছে যাও। চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। এই বয়সে রাত জাগা ভাল নয়। দরকার পড়লে নিজে নেবো।'

সুজন থালা ও দুধের বাটি হাতে নিয়ে ঘরে এল। ঘর অন্ধকার। সন্তর্পণে চুপি চুপি কথাবার্তা হয় দুজনের মধ্যে।

'সুজন, এস, এইখানে।'

'আলো জ্বালো, হাতে থালা বাটি, পড়ে যাব।'

রমলা দেবী আলো জ্বাললেন, তাঁর চোখের পলক ঘন ঘন পড়ে, সুজন সুদৃঢ় হস্তে থালা ও বাটি এনে টেবিলের ওপর রাখে।

'আমার মাথা ধরেছে সুজন, আলো সহ্য হচ্ছে না। আমার জন্য এনেছ? লক্ষীটি⋯আমরা দুজনেই খাব, তুমি আগে নাও⋯বেশ লাগবে, কেমন?'

'না, আমি খাব না। রাতে তুমি খাও আজকাল?'

'না।'

'বেশ, খেয়ো না। জোর নেই।'

রমলা দেবী বিছানা থেকে উঠে চেয়ারে এসে বসলেন, সুজন অন্য একটি হাতলবিহীন লোহার চেয়ারে বসলেন।

'সুজন, আরাম কেদারায় শুয়ে পড়। শোবে না?⋯আচ্ছা, আমি শুয়ে পড়ি। তুমি না হয় এইটাতে বোসো, গদি আছে⋯। কত রাত কে জানে? তোমার আত্মীয় আসেন নি? কখন আসবেন?'

'এলেন বলে। কেন?'

রমলা দেবী হেসে ফেল্লেন, 'আচ্ছা গো আচ্ছা, অত চেঁচিয়ে কথা কয়ে সাধু সাজতে হবে না⋯।'

'আমি বেড়িয়ে যাচ্ছি।'

'তার চেয়ে আমিই যাই— কেমন ?'

'যা ইচ্ছে।'

'আমি যাব না। ঐখানে বসে থাক। চুপ করতে জান না, কথা, আর কথা কেবল কথা··· থাক নীরবে।'

নীরবে সঙ্গোপনে···মোটর থামাবার আওয়াজ হোলো, গ্যারেজের চাবি বন্ধ হোলো····'কি হে স্বজন, শুয়ে পড়েছ ? বড় খাটিয়েছে আজ, বুঝেছ হে। রাতে পোড়ো না বাবা, সোনামুখে কালি পড়বে, বুঝেছ····' অক্ষয় খট খট করে ওপরে চলে গেল।

'যার কেহ নাই তুমি আছ তার····ঘুমোও স্বজন, সোনামুখে কালি পড়বে বাবা।' রমলা দেবীর মুখে হাসি ঝলকে ওঠে।

অনেক রাত হয়েছে, কুলপী বরফ হেঁকে চলে গেল, দূরে শেষ ডাকের জন্য স্বজন অপেক্ষা করে··· শহরের কোলাহল থামল বরফ্-এর হসন্তে, কোলকাতায় বরোপ উচ্চারণ করে ভাঙ্গাগলায় মেদিনীপুরের লোকেরা, ও-কার বেশ গোলগাল মোমের পুতুলের গালের মতন····রমলা দেবীর চিবুক সুদৃঢ়, বিষম চতুর্ভুজ। স্বজন চোখ ফিরিয়ে নিলে। এবার থিতিয়েছে, নগরে নিশীথিনী নামল, ঘরের ছেলে ঘরে এল, মুখর কলরব মূক মুহূর্তে মিশল। রমলা দেবী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আলো নিভিয়ে দিই ? আমি ইজি চেয়ারেই শোব, তুমি বিছানায়।···· তোমার শালটা দেবে ? কেমন শীত শীত করছে।' যন্ত্রের মতন স্বজন আজ্ঞা বহন করে, আলো নেভায় না, রমলা দেবীও ওঠেন না, বলেন, 'তোমার আত্মীয়টি কেমন লোক, স্বজন ?'

'কেন ?'

'না, তাই বলছি, গলার আওয়াজটা কেমন কেমন একটু জড়ানো মনে হোলো। বেচারি····একলা থাকে, কোন দোষ নেই। ঘরে যদি আসতেন।' ওপরের ঘর থেকে আবৃত্তির সুরে কে যেন বলছে,— যার কেহ নাই তুমি আছ তার। রমলা দেবী হঠাৎ শিউরে উঠলেন··· ছেদ পড়ে গেল।

রমলা দেবী ইজি চেয়ারে শাল জড়িয়ে শুয়েছেন, লাল শাল, কোনের কল্কা বুকের ওপর, বাঁ হাতে চোখ ঢাকা, নিচের ঠোঁট দেখা যাচ্ছে, সামান্য একটু মোটা, গলার হার একপাশে ঝুলে পড়েছে, কালো লকেট দোলে স্বস্তিকা; বুক ওঠে নামে, অতি ধীরে; নিরীক্ষণ করলে চোখে পড়ে, একটা চুল গালের ওপর শুয়েছে। লাল শাল, আলোয় মনে হয় কমলা লেবুর রং, রেখা ও ঘনতার আদেশ-পালনের সুযোগে কৃতজ্ঞ হয়ে দেহের ওপর লুটিয়ে পড়েছে, ছুটো পা-ই একটা হাতলের ওপর, শালে মোড়া; গোড়ালির একটুখানি দেখা যায়, গিনিপিগ····ফাটা

দাগ রয়েছে····। একটু জোরে শিষ্ টেনে রমলা দেবী অন্য পাশে ঘাড় ফেরালেন ঘুমন্ত ভুলটি জেগে উঠল, জাগন্ত ভুল ঘুমুল। সুজন একটি সিগারেট নিয়ে জানালার বাইরে হাত বার করে দেশলাই জ্বালাতে চেষ্টা করলে, দেশী, ধরল না, দুটি, তিনটে··· কিছুই পারে না সে····রমলা দেবীকে বোঝে না, মাসীমাকে মনে হয় যেন বোঝে, দেশী গিন্নী, কিছুতেই এঁকে আমল দিতে পারেন না মাসীমা, আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ, স্বার্থে, অধিকারে ঘা পড়েছে। কী যে হবে। জানালার পাশে সুজন দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, যা হয় হবে— কিছুই ভাবতে ইচ্ছে হয় না, মনের কাজ বন্ধ। আকাশে বাতাসে কোনো চঞ্চলতা নেই। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এল। রাস্তার আলো সম্মুখের বাড়ির কাচের জানলায় প্রতিহত হয়ে ঘরের মধ্যে আসতে চায়, কিন্তু ঘরের আলো বাধা দেয় তার প্রবেশে, তার প্রকাশে। সিগারেট ধরান হয় নি, দেশলাই জ্বাললে শব্দ হবে····ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। ঘুমোন, গভীর শান্তি আসুক ওঁর মনে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে, পা টিপে এসে সুজন সন্তর্পণে সুইচ্ বন্ধ করলে, শব্দ হোলো না····অন্ধকার····সুজন খাটে বসল····সত্যই শক্ত····জাপানীরা কাঠের বালিশ মাথায় দেয়, দেহকে তারা বশে এনেছে, দেহের আবার চাহিদা কি? তার নেই, খগেনবাবুর নেই····রমলা দেবীর? সুজন জানে না, যে শুয়ে আছে সে রমাদি নয়, রমলা দেবী। তুহীনতরঙ্গস্রোত, পাইথন্····। খগেনবাবু কাশী এলেই রমলা দেবী গ্রাস করে ফেলবেন, গ্রাসের পূর্বে আদর-যত্নের লালা ক্ষরণ হবে····তখন? তখন আর কি! সুজনের নিজের মনোভাব হওয়া চাই বৈজ্ঞানিকের— তখন খগেনবাবুর গ্রস্ত হওয়াটাই তথ্য হবে, ভালমন্দের বিচারক সে নয়। তখন রমাদিকে পাওয়া যাবে না, এই। মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে তবু। বিজন কী ভাববে? নিশ্চয়ই চটবে। সে আধুনিক হতে চাইছে, তার রমাদিকে যদি খগেনবাবু স্ত্রীভাবেও গ্রহণ করেন, তবু বিজনের থাকা উচিত নয়। রমলা দেবীর স্বামী মোকদ্দমা করবেন? হিন্দু-বিবাহে মুক্তি নেই— বন্ধন তার আমরণ। কী হবে? কালবোশেখীর আগমনের মতন ভবিষ্যৎ থম্ থম্ করে।

"দিনের সাধনা, রাতের বাসনা····" কার লেখা? খগেনবাবুর রমলা দেবীকে লেখা চিঠিতে আছে····বাকিটা কি? মনে পড়ছে না। "রাতের বাসনা" কেন লিখলেন? কিসের বাসনা? বাসনা ত তীব্র হবে? তা নয়, বাসনা বোধ হয় একটা সাধারণ ইচ্ছা মাত্র, বিদেহী, হাওয়ার মতন সর্বত্র ছড়ান, অস্তিত্বের অপ্রমাণে অচেতন, নিশ্চেষ্ট। সামান্য একটু চাঞ্চল্য থাকে বা। খগেনবাবুর দেহ কি ছিল না? কখনও কি মেদ মজ্জা রক্ত মাংস তাঁকে বিরক্ত, পীড়িত করে নি? 'বাসনা' লিখলেন কেন? 'সাধনা'র সঙ্গে মিলের খাতিরে? সাধারণ কবিদের মতন? বাকি লাইনটা মনে আসছে না— অস্বোয়াস্তি হয়। ডায়েরিতে আছে, চিঠিতে

নয়। ডায়েরিতে রচনা-ভঙ্গিতে কোনো সাহিত্যিক কৃত্রিমতা ছিল বলে ত মনে হয়নি···সহজ ছিল তার গতি, কালো ফিঙের মতন, সব লাইনটা মনে পড়লে বোঝা যেত, 'রাতের বাসনা' সাহিত্যিক বাসনা, না সত্যকারের। রমা দেবীর নিশ্চয় মনে আছে, কতবার পড়েছেন। নিঃশ্বাস পড়ল জোরে— ফোঁস করে, দীর্ঘশ্বাসে কী বেদনা ব্যক্ত হয়? কি চাওয়ার প্রকাশ হয়? সমাজের সঙ্গে যুদ্ধপর্বের এই ত শুরু। হয়ত বা মাসীমাকে রাজী করান যেত, মুকুন্দটা মাটি করলে। নিশ্চয়ই মাসীমার কাছে যা-তা বলেছে, মুকুন্দ পছন্দ করত না রমা দেবীকে, তাঁর কেতাদুরস্ত বেয়ারা চিন্তামণিকে। খুবই স্বাভাবিক কিন্তু···

'সুজন।'

'কি? কষ্ট হচ্ছে?'

'না। তুমি ঘুমোবে না?'

'ঘুম আসছে না।'

'ঘুম কখনও আসে!' শব্দে কতদিনের সঞ্চিত বেদনা, সহানুভূতির কত মধুর প্রতিদান।

'এই বার শোব যে। তুমি না হয় এই খাটে ছড়িয়ে শোও। কম্বল পেতে দিই?'

'না, তোমার বিছানায় শোব না। পরে, পরে তোমার কষ্ট হবে।'

'কেন?'

'বোকা ছেলে।'

সুজন অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর বলে, 'খগেনবাবু কী একবার লিখেছিলেন তোমার মনে আছে? গোড়ার কথা— দিনের সাধনা, রাতের বাসনা— তার পর?'

'দিনের আদর্শ, রাতের বাস্তব, আলোর বুদ্ধি, তমিস্রার দেহ, এই কি চিরন্তন বিরোধ?' কী মনে হচ্ছে?'

'তোমার স্মরণশক্তিকে নমস্কার জানাই।'

'কেন? কি কারণে তোমার মনে হলো?'

'ভেসে এল, অকারণে।'

'কি ভাবছিলে?'

'অমনি। ভাবব বলে কেউ ভাবে?'

'লাইনটার অর্থের সঙ্গে তোমার মন নিশ্চয়ই একসুরে বাঁধা ছিল।'

'হবে। অর্থ কি?'

'অর্থ এই··· না বলব না। তুমি ভয় পাবে।' রমলা দেবী উঠে বসলেন।

'বল।'

'বলব? অর্থ— তাঁর আমাকে প্রয়োজন।'

'জানি।'

'জান না। যে-ভাবে জান সে-ভাবে নয়।'

'কিন্তু রমাদি....'

'কিন্তু কি? কিন্তু নেই।'

'তাঁর ক্ষতি হবে।'

'বেনে—ধার্মিক হলে কবে থেকে? ন', ক্ষতি হবে না, তাঁর বিরোধ ঘুচবে। বেশিক্ষণ দোলায় দুললে গা গুলিয়ে ওঠে।' সুজন আলো জাললে।

রমলা দেবী সোজা হয়ে চেয়ারে বসেন। হাই ওঠে, তিনটি আঙুল দিয়ে মুখ ঢাকেন, চমৎকার লাগে নিজেরই কাছে, গোড়াটি মোটা, ডগাটি সরু হয়ে এসেছে। রমলা দেবী নিজের আঙুল দেখেন, লালচে মনে হয়, আগুনের শিখাত্রয়ী....। সুজন চোখ নামিয়ে নেয়।

'সুজন আমার আঙুল কেমন?'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি হবে? যাঁর উত্তরে তুমি খুশী হবে তাঁকে প্রশ্ন কোরো।'

রমলা দেবী গা এলিয়ে দেন, সুজন অন্য দিকে চায়।

কোতোয়ালির ঘণ্টায় দুটো বাজল। সুজন বল্লে, 'দুটো'।

'দু'টো।'

'কত রকমেরই না আছে!'

'কি?'

'কত রকমের ঘণ্টা কাশীতে শোনা যায়। তোমার ভাল লাগে না রমাদি?'

'আমি সুর ধরতে পারি না, কিন্তু ঘণ্টা শুনে বুঝতে পারি কোন মন্দিরের।'

'ঘণ্টাধ্বনি যবনিকা তোলে না, নামায়।'

'সুজন, শোও। আলো নিবিয়ে দিই, এদিকের জানলা খুলি, আর কেউ দেখতে পাবে না আমাকে।' রমলা দেবী হঠাৎ উঠে আলো নিভিয়ে দিলেন। 'শুয়ে পড়। কোনো ভয় নেই। মাত্র অস্বাভাবিক। এস, স্বাভাবিক করে দিই।' অন্ধকারে রমলা দেবীর আগমন অনুভূত হয়, তাঁর হাত সুজনের গা স্পর্শ করে— 'এই যে ভাই, শোও তুমি।' হঠাৎ সুজনের গালে হাত দিয়ে সেই হাতে চুমু খান, একটু শব্দ হয়।

'আলো জালো, আলো বলছি।' বলেই সুজন ধড়মড় করে গিয়ে নিজে আলো জালে, রমলা দেবীর দিকে চাইতে পারে না, জানালার ধারে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে

থাকে। রমলা দেবী ইজি চেয়ারে এলিয়ে পড়েন, আরামের জন্য শাড়ির গিঁঠ আল্‌গা করেন।

'সুজন, শোবে না?' কোন উত্তর আসে না।

'সুজন, শোন। আমি আর পারছি না। তুমি কবে, কবে ওঁকে আনবে বল? আমি—আমি তোমাকে চাই না,...তুমি তাঁকে ভালবাস তাই তুমি আমার আপন। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।'

'এস, গল্প কর। তুমি তাঁকে কবে প্রথম দেখলে?'

'আমার মনে নেই। তুমি বল।'

'আমি? গানের আসরে। একজন নামজাদা গায়িকার গান হচ্ছিল। আমার ভাল লাগছিল না। অথচ কোলকাতার সমাজ তাকে নিয়ে পাগল। সকলের কেমন লাগছিল জানি না, তবে মেয়েরা সব দুলছিল, পুরুষে মাথা নাড়ছিল, জুতো ঠুকে তাল দিচ্ছিল। আর, থামবার পর কী প্রশংসা কী হাততালি! কেবল, উনি বসেছিলেন একটি সোফায়, মুখ বুজে। বুঝলাম, ভাল লাগেনি। হঠাৎ, আমার দিকে চাইলেন। আমি অনেকক্ষণ দেখছিলাম। চোখোচোখি হোলো। মনে হলো, আমরা আলাদা।'

'দুজনের একই জিনিস ভাল লাগলে শুনেছি ঐ সব হয়। এ দেখছি না ভাল লাগার বন্ধন!'

'তারপর, সাবিত্রীর সঙ্গে আলাপ করি।'

'নিজে?'

'সেধে।'

'তাঁর তোমাকে কেমন লাগত?'

'কার?'

'খগেনবাবুর?'

'বোধ হয়, ভালই লাগত। না হলে, চটতেন কেন সাবিত্রীর ওপর, আমার সঙ্গে মিশলে? সে ত আত্মরক্ষা।'

'আর তাঁকে আত্মরক্ষা করতে দেবে না?'

'না।' নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বিজলী বাতি চমকে উঠল, বিদ্যুতের চাপ কমেছে। সুজন পায়ে ছোট চাপড় মেরে বল্লে, 'এখানে একটু বেশি মশা।'

'অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে পাবে না।'

'তোমাকেই কামড়াবে।'

'তুমি মুড়ি দাও। দাঁড়াও, ভাল করে ঢেকে দিচ্ছি।'

একটা চাদরে সুজনের দেহ আবৃত করতে করতে রমলা দেবী বল্লেন, 'সুজন, তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়। তুমি আমাকে বাধা দিওনা, লক্ষীটি।' রমলা দেবীর ঠোঁট সুজনের রগে ঠেকল....'লক্ষীটি, মণিটি, ঘুমোও, আমিও ঘুমুই, কেমন? আমার কোন কষ্ট হবে না ইজি চেয়ারে, অনুমতি দাও।'

'যাও।' খট্ করে সুইচ বন্ধ হোলো।

বিছানায় শুয়ে সুজন আপন গালে হাত দেয়। সারা মুখ তার গরম ঠেকে, কান যেন পুড়ে যাচ্ছে, চারপাশে আগুনের হল্‌কা। সিল্কের মতন মসৃণ, একটু পুরু। এক দৃষ্টিতে সে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে রূপগ্রহণ করে। প্রথমে অনির্দিষ্ট ভ্রূণাকার....পরে, দেওয়ালের চুণকাম খসে গেল, কত কাল্পনিক জীব রূপ নিলে, আদিমযুগের জানোয়ার, দীর্ঘাকৃতি, বলবান, ভারী, মোটা, পুরু....চলৎশক্তিহীন ম্যাস্টাডন, ম্যামথ, লম্বা দাঁতঅলা বাঘ। কোথায় অদৃশ্য হোলো। গাছের ওপর বানরের দল লাফালাফি দাপাদাপি করে। গরম যায় কমে। ছাত থেকে বানর ঝোলে, লম্বা ল্যাজ দুলিয়ে, ধপাস করে পড়বে বুকের ওপর....এইবার, এইবার। সুজন ধরমড় করে উঠে বসল। একটা মানুষের মতন জানোয়ার এল— কোমর ভেঙ্গে হাঁটে, কপাল আর মাথা এক, কী মোটা ভুরু, কী ভীষণ ঝোলা চিবুক, কী পুরু ঠোঁট। চোখের ওপর লম্বা হাতের তালু কার্নিশ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূরের কী একটা দেখে, অন্য হাতে মস্ত একটা পাথর। পাথর ছুঁড়ল, একটি মেয়ে বেরিয়ে এল গুহা থেকে, ঝাঁকড়া তার চুল, বিজ্ঞাপনের ছবির মত বাঁকা পায়ে দাঁড়ায়। একই রকমের রেখাভঙ্গি, কোন বদল হয় নি, তিলমাত্রও না, অপরিবর্তনীয়তার প্রতিমূর্তি, না আছে অভিব্যক্তি, না আছে অগ্রস্থতি, না আছে প্রগতি— কেবল শাড়ি, ব্লাউজ, আর জুতো, দুচারটে গহনা, সব ভাসাভাসা ওপরকার....শক্তি জমাট বেঁধে রইল জড়ের আকার পরিগ্রহ ক'রে। তাই, জীবন যাবে আসবে, থাকবে কেবল সঞ্চিত শক্তি জড়পিণ্ড, তারই প্রভাবে জীবন রুদ্ধ হবে। খগেনবাবুর পরিণতি নেই, অসম্ভব।

রমলা দেবী ঘুমুচ্ছেন কি না সুজনের জানবার বাসনা হয়। জড়, তাই নির্জীবের মতন ঘুম, শ্বাসপ্রশ্বাসরহিত, নিঃশব্দ, নীরবে, সঙ্গোপনে, অব্যর্থ সন্ধানে সুজন আসে আরাম কেদারার পাশে। জীবনের কোন প্রমাণ বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গায়িত হয় না। সুজন সচকিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে।

একটি হাত এসে সুজনের হাত ধরলে, 'বল বল, আমাকে তাড়িয়ে দেবে না। এইখানে বোস, হাতলের ওপর।' হাতের ওপর হাত বুলিয়ে চলে, কাশফুলের হালকা পরশ।

'কষ্ট হচ্ছে সুজন?'

সুজন চেয়ারের হাতলের ওপর প্রস্তরমূর্তির মতন বসে থাকে, জিভ আসে শুকিয়ে, চোখ জ্বলে। রমলা দেবীর একটি হাত তুলে সুজন আঙুলগুলি আপন চোখে বোলায়, তারপর ঠোঁটে, তারপর হঠাৎ হাতের তেলো বুকে চেপে ধরে··· তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে যায়। 'আমি তোমাকে চাই না,·· তুমি তাকে ভালবাস তাই তুমি আমার আপন'···বুকটা মুচড়ে যায় কেন? এই ত' স্বাভাবিক, এইত' গ্রহণ করে এসেছে, এই গ্রহণ করতে হবে। মা এর মুখ মনে পড়ে না কিছুতেই।

"ভোর ভৈ"— সানাই বেজে ওঠে, অতি কোমল রেখাব, শুদ্ধ গান্ধারে স্থায়ী হয় না, একেবারে মধ্যমে আশ্রয় নেয়, তারপর মধ্যম থেকে মীড় টেনে অতি কোমল রেখাবে অবরোহণ করে···স্বরে স্থিত হতে প্রাণ চায় না, ওঠে পঞ্চমে, আবার মীড় দিয়ে অতিকোমল রেখাব···মধ্যকার গান্ধারের প্রয়োজন নেই, অথচ আছে, মধ্যম ও রেখাবের সম্বন্ধের জন্য যতটুকু। কত পরে কোমল ধৈবত, কী মধুর! যেন অতি কোমল রেখাবের দোসর···লাগল বুঝি কোমল নিখাদ··· না, না, লাগেনি, ফিরে এল মধ্যমে। ভোর ভৈঁ···সব ক্লান্তি অপসৃত হয় ঐ মীড়ে, স্বরের পৃথক অস্তিত্ব নেই, তার সত্তা ভৈঁরোর আশ্রয়ে, সমগ্রের কৃপায়। প্রাণ উর্ধ্বমুখী হয় পঞ্চমের পর থেকে, কোমল ধৈবতেই, তীরের মতন ছোটে শুদ্ধ নিখাদে। সত্বগুণের আধার এই সুর, ঋষির উদাত্ত-কণ্ঠ-নিঃসৃত, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দান··· জয় জয় শম্ভু বিশ্বনাথ···কাশীর মন্দিরে ভোর বেলা ভৈঁরো বাজে সানাইএ···হে নিদ্রালু কামপিষ্ট, বিক্ষুব্ধচিত্ত সংসারী, শোন— উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্যি- বোধত···।

'ওঠ ওঠ রমাদি, কাশীর প্রভাত— সুপ্রভাত— বেদমন্ত্র শুনবে চল। উপ- নয়নে যা উচ্চারণ করেছিলাম···'

'বিবাহ বাসরে যা বুঝিনি।'

'এবার বুঝবে, বুঝে উচ্চারণ করবে।'

'বাধা দেবে না।'

'না।'

অন্ধকার ঘোলাটে হয়ে এল, কালো রঙে খানিকটা সাদা কে মিশিয়েছে যেন। জোয়ার ভাঁটার মধ্যকালীন নিথরতা, মৃত্যুর জড়তা নয়, সৃষ্টি-স্পন্দনের পূর্বকার সন্দিগ্ধতা, ক্রমিক বিবর্তনের আবর্তে নিমজ্জিত হবার আশঙ্কায় রুদ্ধগতি প্রাণের আবেগ। কালস্রোতের আহ্বানে উদ্বিগ্ন এই ব্রাহ্মমুহূর্ত। এখন ধ্যানে বসলে যুক্ত হওয়া অসম্ভব সুজনের পক্ষে। তাই দিনানুদৈনিক কার্যাবলীর স্মরণ হয়। সুজন অলসকণ্ঠে বলে, 'বিজন চিঠি লিখেছে।'

'কি?'

'তোমার মোটরটা ব্যবহার করতে চায়।'

'লিখে দাও। নিজে যেন না চালায়। পরে নিজেই লিখব তাকে। আর কিছু লিখেছে?'

'ম্যাচ জিতেছে।'

'জিতুক। আর কি?'

'নতুন খেয়ালে পেয়েছে।'

'কি খেয়াল।'

'লিখেছে সে সোশিয়ালিজমে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।'

'গোলমালে পড়বে না ত?'

'আমারও তাই ভয় হয়। নিজেকে সামলাতে পারবেনা, অভ্যাস নেই।'

'কতদিন সামলে রাখবে? এই যে বল্লে বাধা দেবে না।'

'সে তোমাকে।'

'তার বেলায়ও বাধা দিও না।'

'মাপ কর, সে আমি পারব না। মামাকে খুলে লিখি। না হয় এখানেই চলে আসুক।'

'এখানে! কোথায়? কার কাছে? কাশী পালিয়ে আসবার সময় হয়নি।'

'তোমার কি তাকে দেখতে ইচ্ছে হয় না?'

'দেখতে? কি প্রয়োজন?'

'চোখে ঠুলি দিয়েছ তুমি। বোধ হয়, তাই হয়। না, রমাদি, সে এখানে আসুক।'

'আসুন, আসুক তবে। কিন্তু আমার কাছে থাকতে পারবে না।'

'কেন?'

'ভাল লাগবে না, কারুরই।'

'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

'সুজন, আমাকে বাইরে নিয়ে যাবে না? চল ঘাটে যাই। বাড়ি খুঁজবে না?'

'একটু বোসো। এখনও ফরসা হয়নি।'

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রমলা দেবীকে নিয়ে সুজন ঘাটের দিকে চলল। 'তুমি বসো এখানে। আশা করি ফিরতে আমার দেরি হবে না।' ঘাটে বসিয়ে রেখে সুজন বাড়ি খুঁজতে গেল।

পাঁচ

বাসা বদলাতে দু'দিন গেল। দিনের বেলা সারা কাশী ঘুরে ক্লান্ত হয়ে রমলা দেবীকে রাতের জন্য সেই পুরানো বাড়িতেই থাকতে হল। এবার একটি পৃথক বাড়ি পাওয়া গিয়েছে। রমলা দেবী সুজনকে তাঁর সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সুজনের আপত্তি স্বল্প কথায় উচ্চারিত হলেও তার গুরুত্বের দাবির জোরে সেটি অতি সহজেই মঞ্জুর হোলো। রমলা দেবী বলেছিলেন, 'সেই ভাল সুজন। তুমি সমাজকে অবহেলা করতে পার না, তোমার সে স্বভাব নয়।' সুজন উত্তর দেয়, 'তাও বটে, তা ছাড়া তুমি ত আমাকে চাও না বলেছ।' 'কবে?' বলে জিজ্ঞাসুনয়নে রমা দেবী খানিকক্ষণ চেয়ে থাকেন, তারপর স্মরণ হয়েছে পাছে সুজন বুঝতে পারে ভেবে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেন। 'সেই ভাল, সুজন।' সুজন বিকেলে ক্লান্ত মনে অক্ষয়ের বৈঠকখানায় ফিরে আসে। টেবিলের ওপর বিজনের চিঠিটা চোখে পড়ল। পুনরায় পড়বার পর সুজন চিঠি লিখতে বসলে। টেবিলের ওপর গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তিকে কৃত্রিম মনে হয়।

বিজন,

তোমার চিঠির উত্তর যথাসময়ে দিতে পারিনি বলে লজ্জিত। তোমার রমলাদি নতুন বাড়িতে উঠে গেলেন, পুরানো বাড়িতে অসুবিধা হচ্ছিল। এখনকার বাড়িও ভাল নয়, তবে কাশীর পক্ষে এবং একলা মানুষের পক্ষে একরকম চলনসই। সেই সব হাঙ্গামায় ব্যস্ত ছিলাম। আমি অক্ষয়ের সঙ্গেই আছি। উনি বলছিলেন সঙ্গে থাকতে, কিন্তু আমি ভাবি,— কেন। প্রয়োজন পড়লে আমি ত কাছেই রয়েছি। প্রয়োজনের সীমা জানাটাই আমার সহজে আসে, কারণ সেটা আমার স্বভাব। তোমার স্বভাব ছাপিয়ে পড়া— আমার আবার ভিন্ন ধরনের। যার যা শিক্ষা। কি বল?

সেই জন্যই ত তোমার টেনিস খেলায় উন্নতি শুনে উল্লসিত হলাম। মিক্স্‌ড ডাব্‌লসের খেলায় তুমি অদ্বিতীয় হবে এই আমাদের ভবিষ্যৎ-বাণী ছিল। তার সফলতায় অন্তত আমার আনন্দ যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে নিজগুণে মার্জনা কোরো।

তুমি সোশিয়ালিস্ট হয়েছ লিখেছ। সংবাদটি চমকপ্রদ নয় লিখলে আশা করি ক্ষুণ্ণ হবে না। দীনদুঃখীর জন্য কাতর হওয়ার রীতি ভারতীয় রাজবংশে সুপ্রচলিত ছিল। ভগবান তথাগত রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, জরা, মৃত্যু, শোক তিনি নিজের জীবনে ভোগ করেন নি, তবু, স্রেফ্‌ পরের জন্য, স্ত্রীপুত্র দাস

দাসী ও অন্যান্য বিভব ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন। তোমার মধ্যে ঘরছাড়া একটা পাগল জন্মলাভ করেছে, সেইটাই বিংশ শতাব্দীর বোধিসত্ত্ব, অতএব ভারতীয় পরিশীলনের ধারা তোমার মধ্যে প্রবাহিত। যখন আকর্ষণ নেই, তখন মহানিষ্ক্রমণই সহজতম পন্থা। নয় কি? তবে তোমার আছে টেনিস— যেটি ভগবান বুদ্ধের ছিল না। তাই মনে হয়, বুদ্ধের অপেক্ষা তোমার বাধা-বিপত্তি বেশি।

অন্য পার্থক্যও আছে, অবশ্য তাইতেই তোমার কৃতিত্ব। তিনি বহু আশ্রম ও সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠাতা, অন্তত আশ্রমবাসের জনপ্রিয়তা তাঁরই দৃষ্টান্তে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তুমি আশ্রমবিমুখ ও ধর্ম-বিদ্বেষী। তুমি ধর্মকে আফিম এবং আশ্রমকে (গুলির বোধ হয়, আফিম ও গুলি একই বস্তু, তবে আড্ডা জমে গুলির প্রসাদে) আড্ডা ভাব। অনেক হিন্দু দার্শনিক বৌদ্ধ ধর্মকে জড়বাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছেন, শুনি, তবু যেন মনে হয়, তোমার মতে যে-জড়বাদ সোশিয়ালিজমের প্রাণবস্তু, যা বিহনে সোনার ভারতের মুখে আজ এত কালি পড়েছে, তার সঙ্গে নির্বাণ-ধর্মের জড়বাদের কোনো আন্তরিক মিল নেই। বৌদ্ধ ধর্মের পিছনে ছিল যাচঞা, তন্‌হা, ইচ্ছাকে ধ্বংস করবার প্রবৃত্তি, তোমার নবধর্মের তাগিদ হল শ্রেণীগত ইচ্ছাকে ক্রমবর্ধমান করবার সমবেত প্রচেষ্টা। বৌদ্ধধর্ম মানবমনকে ইহজগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তোমার ধর্ম, ধর্ম কথাটির প্রয়োগে ক্ষুব্ধ হোয়ো না, এই জগতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। মাটির পৃথিবীটাই হল তোমার ধর্মের একমাত্র ভূমিকা। আমাদের আজ বৌদ্ধধর্মের ভূতে পেয়েছে, আমরা হলাম শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাই হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারিয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আগ্রহ প্রকাশকেই শিক্ষার নিদর্শন ভাবি। সাহেবরাও তাই ভাবেন যে। হিন্দুরা যে বড় বিরক্ত করে ওঁদেরকে।

কিন্তু আদত কারণ হল— টেবিলের ওপর একটা বুদ্ধের মৃন্ময় মূর্তি রয়েছে। সারনাথের সেই গুপ্তবংশের বিখ্যাত মূর্তিটি। এর সুখ্যাতি সর্বমুখে। কিন্তু, বিজন, এ মূর্তি বড় বেশি মিষ্টি, ভদ্র, যেন ড্রয়িংরুমের শোভা বৃদ্ধিরই জন্য, মনে হয় যেন চারপাশে আমেরিকান মহিলা ভিড় জমিয়েছে, এবং বাণী চাইছে, তিনিও দিচ্ছেন। তার চেয়ে কঠিন পুরাতন মূর্তির শক্তি আছে। সাবিত্রী দেবীর চেয়ে রমলা দেবীকে তোমার ভাল লাগে না?

তবু যেন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সোশিয়ালিজমের কোথায় মিল রয়েছে। তথাগত এবং মার্কস-লেনিনের পূজায়, প্রচার-ধর্মে, সঙ্ঘবদ্ধ ও নির্বাচিত একটি বিশেষ শ্রমণ ও শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বকল্যাণের গুরুভার বহনে, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধতায় দুটি ধর্মের ঐক্য আমার চোখে পড়ে। একাধিক বোধিসত্ত্বও তোমাদের রাশিয়ায়

জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের পুজা-অর্চনা জোরেই চলছে। সর্বপ্রকার সংস্কার থেকে বিমুক্ত হবার প্রয়াসে নতুন সংস্কার সৃষ্টিকেও একটি সাধারণ গুণ হিসেবে ধরতে পার। কোনোটিতেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বালাই নেই, সঙ্ঘের চাপে, তোমাদের পার্টির চাপে খগেনবাবুর মতন লোক নাস্তানাবুদ হতে বাধ্য। তোমার খগেন্দ্রভীতি অতিশয় স্বাভাবিক। ভারতবাসী সোশিয়ালিজমকে এখনও পুরাতন ভারতেরই দান, কিংবা বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বলছে না কেন ভেবে পাই না।

একটি প্রশ্নের অনুমতি দেবে? সঙ্ঘে ভিক্ষুণী প্রবেশে বুদ্ধদেবের ভীষণ আপত্তি ছিল। অবশ্য তবু তাঁরা গৃহীতা হন। তোমাদের সোশিয়ালিজমে কামিনীর স্থান কোথায় ও কতটুকু? সব স্থানটাই কী কাঞ্চন অধিকার করেছে? ফ্রয়েড় বেচারির কি অবস্থা? তোমাদের সর্দার যদি কখনও প্রেমে পড়েন তবে কী তাঁর অন্তর দশা হবে?

তোমার সঙ্গে নানা বিষয়ে তর্ক করতে ইচ্ছে করছে। তর্ককে তুমি ঘৃণা কর। তবু বিশ্বাস হয় যে খগেনবাবুর অভাবে এখানকার অক্ষয় এঞ্জিনিয়ারের ও ওখানকার তোমাদের কর্মপ্রবণতা আমার বুদ্ধিকে জাগর রাখতে পারবে। কর্ম-রহিত চিন্তা তোমাদের মতে অশুদ্ধ, নয়? আমার কোনো কর্ম নেই এখানে।

রমলা দেবী তাঁর গাড়ি ব্যবহার করতে তোমাকে অনুমতি দিচ্ছেন। তাঁর খবর বোধ হয় তাঁরই কাছে শোনাই সঙ্গত। তিনি দিব্যি আছেন। যদি দেশের কাজ করবার পর কিছু সময় পাও— বিকেলে টেনিস খেলে— তবে দীর্ঘপত্র দিও। আমি মামাকে চিঠি দিচ্ছি কোচ্-এর বন্দোবস্ত করতে। কোচিংএ আমার বিশ্বাস বাড়ছে।

কেমন আছ?

সুজন

পুঃ তুমি এখানে এলে মন্দ হয় না, অন্তত শুক্রবার রওনা হয়ে আবার সোমবার পৌঁছতে পার কোলকাতায়, যদি আমাদের বুর্জোয়া-সঙ্গ না ভাল লাগে।

সুঃ

তাড়াতাড়ি চিঠিটা খামে পুরে সুজন বেরিয়ে আসছে এমন সময় দীপা এসে হাজির। দীপা গম্ভীর মুখে টেবিলের পাশে দাঁড়াল, ভুরু কুঁচকে কী দেখলে, তখনই ছুটে চলে গেল। সুজন বেরুল, চিঠিটা নিকটের ডাক-বাক্সে দেওয়া হল না, পরেরটায় দিলে হবে, তার চেয়ে ভাল সেই ছোট ডাকঘরের বাক্সে, রমা দেবীর নতুন বাড়ির কাছে, সেই ভাল, রাস্তার চিঠি কখন যাবে তার ঠিক নেই। একটা ইট পড়ে আছে, সুজনের পায়ে লাগল। হাসি আসে মনে করে যে সে যন্ত্রের মতন চলেছে, থান ইটটা চোখে পড়েনি। কেউ দেখে নি বাঁচোয়া। পথিক

যখন কলার খোসায় পিছলে ধরাশায়ী হয় তখন রাস্তার লোকে হাসে কেন? নিজেরা পড়েনি বলে? নিষ্কাম-ধর্মের জোরে? বেশি বুদ্ধিমান বলে? তাই যদি হয় তবে হাসি হতো বাঁকা, কিন্তু দর্শকবৃন্দ হো হো করে হাসে। তা নয়। অন্যমনস্ক ব্যক্তি যখন পিছলে পড়ে তখন সে হয় জড়, অন্যে তখন মানুষ। একটা মাত্র প্রবৃত্তি কিংবা উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হওয়া মানুষের ধর্ম নয়, যন্ত্রের কর্ম। আজ বড় বড় জাতি যন্ত্রের মতন চালিত হচ্ছে। চলেছে সকলে চোখে ঠুলি দেওয়া বলদের মতন, ঘানিতে ঘুরছে; হাসি পায় ওদের গাম্ভীর্যে। সুজন নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করল, কোনো একমুখী প্রবৃত্তি নিজের অন্তরে আবিষ্কার করতে পারলে না। খগেনবাবু হলে নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করতেন। রমাদির প্রবৃত্তি, তাঁর প্রতীক্ষা, তাঁকে একাগ্র করেছে। নাঃ, রমলা দেবীর বাড়ি যাওয়া হবে না—কী প্রয়োজন। সুজন পোস্ট অফিসের লাল বাক্সে চিঠি ছাড়লে। রমলা দেবী খগেনবাবুকে আপন করবেন বল্লেন। এখন খগেনবাবুর কর্তব্য কাশী না আসা। পরীক্ষা তাঁর চলুক আরো কিছুদিন। ভদ্রলোক দুর্বলচিত্ত। আত্মসন্ধানী বটে, কিন্তু আত্মজ্ঞানী হন নি। উচিত তাঁর— কি উচিত অন্যের কে জানে। বিজনের চিঠির উত্তরে বিদ্রূপ আছে···দুঃখ হবে তার। হোক্ একটু দুঃখ···কত পোড় খেতে হয় মানুষকে। সুজন হাঁটতে হাঁটতে মাসীমার বাড়ির মোড়ে পৌঁচেছে। বৃদ্ধা কি অপ্রস্তুতে পড়েছেন অনুরোধ রক্ষা করতে না পেরে? বৃদ্ধা বাড়ি আছেন।

'এস বাবা, এই খাটেই বোসো। খগেনের চিঠি এসেছে—আসছে সপ্তাহে আসবে লিখছে। মুকুন্দ ঘর দোর পরিষ্কার করতে গেল।'

'আসছেন নাকি? কোথায় থাকবেন?'

বৃদ্ধা খগেনবাবুর বাড়ির ঠিকানা বলতে পারলেন না, পাড়া বলে দিলেন। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলেন:

'সেই মেয়েটির কি হোলো?'

'কোনো গোলমাল হয় নি, বাড়ি পেয়েছেন।'

'সে-রাত্রে?'

'এক আত্মীয়ের বাড়ি।'

'তোমার কে হন?'

'আত্মীয়া, জানা-শোনা খুব। আপনার বৌমার খুব বন্ধু ছিলেন।'

'মুকুন্দ যাকে মেম সাহেব বলে তাকে তুমি চেন?'

সুজন হেসে উঠল, বৃদ্ধা চেয়ে রইলেন····

'ওঃ····মুকুন্দকে ত জানেন, মাসীমা! যে মেয়ে জুতো পরে সেই সেই ওর কাছে মেমসাহেব। মুকুন্দ বুঝি পছন্দ করে না তাঁকে? মুকুন্দটা একটা আস্ত ভূত!'

'খগেনকে ভালবাসে।'

'কে? নিশ্চয়ই···তা জানি মাসীমা, ও যে আপনার চাকর।'

'আজকালকার হালচাল জানে না অবশ্য'।

'তা না জানুকগে।' পুরানো চাল ভাতে বাড়ে। খগেনবাবু কতদিন থাকবেন কিছু লিখেছেন?'

'লিখেছে তো মাসখানেক থাকবে, তবে তার যা মর্জি হবে সে তাই করবে।'

'অত মর্জিমাফিক কাজ করাও ভাল নয়। আপনি তাঁর কাছে থাকুন না? তিনি আপনার সঙ্গে ভালই থাকবেন।'

'না বাবা, আমাকে আর কেন? যদি ছেড়েই এলাম এতদূর, তবে আবার জড়ান কেন?'

'সে হয় না, মাসীমা। আপনার বয়স হচ্ছে।'

'আমার! আমি খুব শক্ত আছি, তোমাদের চেয়েও। অসুখ করলে সেবাশ্রমে মেয়েদের হাসপাতালে যাব। ম'লে মণিকর্ণিকায় তিন টাকা চার আনা খরচ করে ওঁরাই যে হোক পাঠিয়ে দেবেন। মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধ আমার কাউকে করতে হবে না, সে-সব আমি বন্দোবস্ত করে রেখেছি।'

'কি যে বলছেন মাসীমা! আপনার বাঁচবার নিতান্ত প্রয়োজন আছে। বয়স ত বেশি হয় নি!'

'অনেক হয়েছে, বাবা। খগেন এলে তুমি মধ্যে মধ্যে এস।'

বৃদ্ধার চিবুক নামল দেখে সুজন বল্লে, 'আচ্ছা, এখন আমি যাই! এখনও রোদ্দুর রয়েছে। এক গেলাস জল দিন না মাসীমা।'

জলের গেলাস হাতে নিয়ে সুজন প্রশ্ন করলে—

'মাসীমার কতদিন কাশীবাস হোলো?'

'দশ বছরের ওপর।'

'এতদিন! আমি আপনাকে কলকাতায় কখনও দেখিনি খগেনবাবুর বাড়িতে।'

'যখন খগেন আমার কাছে থাকত তখন বোধ হয় তোমার সঙ্গে আলাপ হয় নি। তখন যারা আসত তারা এখন কোথায় গেল কে জনে!'

'যে-যার ধান্দায় ঘুরছে। আমার পরিচয় অল্প দিনের, এখন বোধ-হয় মাত্র বছর খানেক সবে হয়েছে।'

'তাই হবে। তুমি অনেক ছোট তার চেয়ে। কি করে আলাপ হোলো!'

'নেহাৎ ছোট নই মাসীমা। মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। আচ্ছা, আপনার একলা থাকতে কষ্ট হয় না?'

'কষ্ট কিসের ?'

'এই আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে ?'

'তাঁরাই ছেড়েছেন। ঐ খগেনটুকুই আছে। তাও আর কৈ বল!'

'ঐটুকু ছাড়াই ত শক্ত! শেষের বাঁধনই কঠিন।'

'মায়া কি কাটতে চায়! জোর করে কাটাতে হয়।'

'যা বলেছেন মাসীমা! কিন্তু সে-জোরই বা ক'জনের থাকে! আমি ত দেখছি, আমাদের দেশের মেয়েরা কেবল গিন্নী হতে চায়, আর গিন্নী হলেই নিজে জড়িয়ে পড়ে, পরকেও জড়ায় সংসারে···কি যে সুখ পায়! শেষে নাতিপুতির বিয়ে না দিয়ে মরতে চান না।'

'যার যা স্বভাব। খগেনের বিয়ের পর ঘর-সংসার পাতিয়ে দিয়ে চলে এলাম। চোখের সামনে ঐ ব্যাপার ঘটেনি আমার বহু পুণ্যে। আর নয়! এখন একটু নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

'আমরা দিলে ত!'

বৃদ্ধা হাসলেন, দৃষ্টি উদাসই রইল।

'আচ্ছা, মাসীমা, খগেনবাবুর বিবাহের জন্য আবার নাকি আপনি ব্যস্ত হয়েছিলেন ?'

'না। মুকুন্দ বলেছে বুঝি! ওর ধারণা বিয়ে-থা করলেই খগেন ঘরমুখো হবে, আর বিবাগী হবে না। তোমার বিবাহ হয়েছে ?'

'না।'

'তোমার মা নেই ?'

'মাও নেই বাবাও নেই। ও-সব চুকিয়ে দিয়েছি ছেলেবেলায়।'

'মেসে থাকো ?'

'আমার মামা আমাকে মানুষ করেছেন।'

'মামীমা আছেন ?'

'না। সেও ঘুচে গিয়েছে অনেক দিন। থাকবার মধ্যে আছে আমার ছোট্ট মামাতো ভাই, এই মাত্র উনিশ কুড়ি বছরের।'

'তাই।'

'তাই কি মাসীমা ?'

'কে দেখাশুনা করে ?'

'মাসীমা আপনার দেখাশুনার প্রয়োজন নেই, আর আমি পুরুষ মানুষ আমার আছে! বেশ বন্দোবস্ত যা হোক!'

'তোমাদেরই এই বয়সে দরকার। মুকুন্দ কি যে ছাই গোছালে জানি না!'

সুজন জল খেয়ে বল্লে, 'যাব আমি? ঠিকানা?'

'জানি না। ওই যা হয় করে আসবে, তারপর বকুনি খাবে। ওর কপাল!'

'কপাল কেবল নয়, বুদ্ধিরও একটু দোষ আছে।'

'সেবা করবার জন্য বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না।'

'খগেনবাবুর মতন মানুষের সেবার জন্য বুদ্ধি চাই।'

'কারুর জন্যেই নয়। ইচ্ছে থাকলেই বুদ্ধি খোলে।'

'আপনাদের কালে খুলত হয়ত, আজকাল কেবল নিজের ইচ্ছায় খোলে না।'

'তার মানে এখন ইচ্ছের জোর নেই। দেখছ না, যত ইচ্ছের জোর কমছে ততই বাড়ছে দাসদাসী, তাদের মাইনে, মেয়েদের সাজসজ্জা? ছেলেকে এ-ওষুধ ও-ওষুধ, এ-ডাক্তার, ও-ডাক্তার, গরম জল ভিন্ন খাওয়ায় না মায়েরা। ফলে সারছে ত খুব! সব ক'টা চিররুগ্ন! সেবা হবে না কেন? খুব হয়। কিন্তু সেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের চেহারা সব দড়ি পাকাচ্ছে, তখন লেয়াও বিলেত ফেরৎ ছোকরা ডাক্তার। পেটের ছবি তোলো, হাওয়া বদলাও!'

'ঠিক তাই কি, মাসীমা? আমি অবশ্য জানি না··· ইচ্ছে কমেনি মোটেই মাসীমা, বেড়েছে, আমার মতে।'

'আমি যা দেখেছি তাই বলছি। মেয়েরা আজকাল সেবা করতে চায় না তাই পারে না। চায় সেবা আর আদর খেতে।'

'স্বামীকেও চাও না?'

'জানি না বাপু, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা কি ধরনের।···আমি বুড়ো মানুষ, আমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি? খগেন এলে কোরো। মুকুন্দটা এখনও এল না। এসে যে বাবু কি খাবেন, কোন পথ্যির ফরমাস হবে বিশ্বনাথই জানেন! বেলা চলে পড়ল এধারে।'

সুজন নমস্কার করে বেরিয়ে এল।

চৌরাস্তার ঠিক মধ্যখানে মাটি খোঁড়া হয়েছে, তার চার ধারে দড়ি দিয়ে ঘেরা। জলের নল মেরামত হচ্ছে। পাশেই অক্ষয় এঞ্জিনিয়ার দাঁড়িয়ে, মুখে পাইপ, খাকি সর্টস্ পরা।

'এখনও রোদ্দুর পড়েনি, কোথায় বেরিয়েছিলে? দাঁড়াও, মোটরে চল, সন্ধ্যায় কোনো কাজ নেই, তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব। এই উল্লু···এই শূয়ার, তুমসে কেয়া কহা? দেড় ইঞ্চ লাগানে কহা নেই? বেহুদা গাঁওয়ার। ব্যাটাদের নিয়ে কাজ চলে না— ওধারে আবার কমিশনারের রিপোর্ট আছে। যাক্ মিউনিসি-প্যালিটি উঠে। মরুকগে! আর পারি না, চল। আবার স্বরাজ চাইছে! এই সব অপদার্থ লোক নিয়ে দেশ চালাবে! বুঝেছ সুজন, একজন ইংরেজ কুলি এদের

দশটার সামিল। আবার, আবার উল্টো বসিয়েছিস্। এই....'অক্ষয় গর্তের মধ্যে নেমে পড়ল। নলের ছেঁদা দিয়ে শাণিত তীরের মত জল বেরুচ্ছে, সাদা ও শক্ত। সুজন পুরানো বইয়ের দোকানে ছেঁড়া ফিজিক্সের বইএ একটা ছবি দেখেছিল— ঐ রকম ফোয়ারার মুখে তলোয়ার ভেঙ্গে যাচ্ছে। অথচ জল। রুদ্ধগতি একাগ্রতায় লৌহ-ইস্পাত চুরমার হয়, খগেনবাবু ত কোন ছার। জল লাগল অক্ষয়ের মুখে, জামা কাপড়ে, জুতো কাদায় বসে গেল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই জলের তোড় বন্ধ হোলো। সুজনের হাত ধরে অক্ষয় উঠল রাস্তায়। 'লেও, মাট্টি ভরো। লাল বাত্তি রাখ্না। সাম্ তক্ হোনা চাহিয়ে, নেহি ত ঠোক্কর খাওগে। ইয়াদ রাখ্খো লাল বাত্তিকা। চল সুজন, নিজে হাতে নাতে করলেও ব্যাটাদের আক্কেল হয় না— এমন পাঁটাও নিয়ে কাজ করতে হয়। চল, আজ তোমাকে ভাল গান শোনাবো। যাবে ত? না, গুড্ বয়?'

'গান? আমি বুঝি না। আমার সঙ্গে শুনলে তোমার ভাল লাগবে কি? আগে বাড়ি চল, জামাকাপড় ছাড়, কাপড়জামা ভিজেছে। মোটরে ভিজে কাপড়ে যেতে ঠাণ্ডা লাগবে না?'

'আমরা তোমাদের মতন কবি মানুষ নই যে ফুলের গন্ধে মুচ্ছো যাব। জল কাদা নিয়েই আমাদের ঘরকন্না। তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যে সব অপদার্থ লোক নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয় সে তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। কেবল জুতোর তলায় রাখ, তবে ব্যাটারা জব্দ হয়ে কাজ দেবে— এমন বিশ্রী।'

'সত্যি, ভারি বিশ্রী। কিন্তু না হলেও যে চলবে না।'

'কি না হলে? ওদের না হলে? তবেই মা আমার গঙ্গা পেয়েছেন।'

একজন কুলি একটুকরো কাপড় দিয়ে অক্ষয়ের জুতো মুছিয়ে দিলে। কুলির দল সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল·· ···'সেলাম সাহেব·······সে সে সে লালাম····'

'লেকেন্ কাম হোনা চাহিয়ে, নেহি ত জরমানা হো জায়গা।'

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর।'

সুজন অক্ষয়ের গাড়িতে উঠল, সামনের সীটে সুজন, পিছনে চাপরাশি।

'অক্ষয় তোমার কুলিরা ধর্মঘট করে না?'

'বেটারা করতে গিয়েছিল এক কংগ্রেসওয়ালারা পাল্লায় পড়ে। ওধারে দু'শ কুলি গ্রাম থেকে এসে হাজির। তখন বাছাধনেরা ফিরতে পথ পায় না। খাওয়াবে কে? ধর্মঘট করবে না ছাই।'

'এদেশে বাঙ্গালীদের ওপর মনোভাব কেমন?'

'সে আর বোলো না। সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। না হলেও চলে না, অথচ হিংসেয় জলে মরে।

'কতদিন বাঙ্গালীর আধিপত্য এ-অঞ্চলে চলবে? একা মালব্যজীর বিদ্যালয় থেকেই হাজার হাজার ছেলে বেরুচ্ছে। তারা কি খাবে?

'জানি, বেশি দিন চলবে না। ভারী অকৃতজ্ঞ এ দেশের লোকেরা। এমন নেমকহারাম!'

'যেমন সাহেবরা বাঙ্গালী-হিন্দুদের বলে, নয়?'

'সে-কথা যদি তোলো তবে চুপ করাই ভাল। দ্যাখ না, রাস্তা হাঁটতে জানে না, ঠিক লাফাতে লাফাতে গাড়ির সামনে আসবেই আসবে। সাফ্ বাৎ এই— ভারতবর্ষের যেমন ইংরেজ, এ-অঞ্চলে তেমনই বাঙ্গালী।'

'আমরা যেমন স্বরাজ চাইছি ওরা তেমনই যদি প্রাদেশিক স্বরাজ চায়?'

'আমরাও যেমন পাচ্ছি ওরাও তেমনই পাবে। আমরাও যেমন উপযুক্ত, ওরাও তেমনই উপযুক্ত!'

'তবু চেষ্টার ত্রুটি হবে না। উপযোগিতার বিচারক কে?'

'চেষ্টা! কোথায় চেষ্টা? বিচারক এই মুখ্খুরা!'

'যদি শিক্ষিত হয়?'

'ততদিনে আরেকটা ভূমিকম্প হবে। কাশীতে ও-সব বালাই নেই এই যা বিপদ। আমার বিশ্বাস— আমি বাপু ইতিহাস পড়িনি— কিন্তু বলছি আমার স্থির বিশ্বাস যে বাঙ্গালী ইম্পিরিয়ালিস্টের জাত। সেদিন একটা কাগজে দেখে-ছিলাম যে বাঙ্গালীরা সর্বত্র, তিব্বত, জাপান, সিংহল, জাভা, বলি, সুমাত্রায় সর্বত্র উপনিবেশ গেড়েছিল। সে তেজ ও ক্ষমতা এখনও আছে আমাদের।'

'থাকলেই ভাল', বলে সুজন মুখ ফিরিয়ে নিলে। ভিড় ফুঁড়ে মোটর চল্‌ছে। এই অত্যাচার, এই দম্ভ কতকাল সাধারণ লোকে, কতদিন এই দেশের লোকে সইবে? বাঙ্গালী এসেছে এদেশে পরের তাঁবেদার হয়ে, ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। তারাই প্রথম ইংরেজী শিখে হোলো কেরানী। অন্যের প্রাধান্য স্বীকার করতে ও প্রচার করতে তাদের বাধে নি। বাঙ্গালীর পূর্বতন কোনো সংস্কার ছিল না, এই মুক্তিই হোলো তাদের সুবিধা, গ্রহণ ও সামঞ্জস্য-বিধান তাই তারা সহজেই করলে। আরো কিছু তারা শিখে নিলে— কেরানীগিরির সঙ্গে সঙ্গে তাও ছড়ালে তারা। বাহাদুরী ঐটুকু, কিন্তু সে মূলধন ভাঙিয়ে কতদিন খাবে? এখন অন্য প্রদেশের লোকে ইংরেজী শিখেছে, তারা হোলো উকিল, ডাক্তার, কেরানী। এই মধ্য-শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসতে বাধ্য। যতই বাঙ্গালী হটে যাচ্ছে ততই বাড়ছে তাদের গুমোর। বাঙ্গালীকে সমঝে চলতে হবে, নতুবা নতুন রাস্তা খুঁজতে হবে। কে আগে কে পিছে ইংরেজী শিখেছে এ নিয়ে গরব শোভা পায় ছেলেমানুষদের মধ্যে, বুড়োদের মধ্যে অচল। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ নেই

প্রবাসে। স্বদেশেও নেই। কোন শ্রেণীর নেই ?

উচ্চপদকেই বা কতকাল মানুষে খাতির করবে ? দানধ্যান, সাহেবিয়ানা ও মোটরের মহিমায় কতদিন নিম্নশ্রেণী আচ্ছন্ন থাকবে ? দুদিনেই যাবে খসে। সর্বত্র পচ্ ধরেছে; নোনা লেগেছে।

এই রাস্তার কুলিরা এখনও অভিভূত রয়েছে, এঞ্জিনিয়ার সাহেবের সাহেবিয়ানায়, কর্মতৎপরতায়, তার উচ্চশিক্ষায়। কিন্তু দুদিন পরে ? যোগ্যতা, এফিশিয়েন্সি সেটা কষ্টিপাথর, মাত্র চাকরি পাওয়ার। কিন্তু চাওয়ার ? চাইছে সকলে, আরো চাইবে পরে। অধিকার, সমবেত অধিকার, সচেতন অধিকার ও চাহিদা। রমা দেবী কেমন জোরে চাইছেন, দেখলে ভয় হয়, কিন্তু তাইতেই কাজ হবে। তবু সে চাওয়া একার। এ পৃথিবীতে শক্তির জয়, তাই মানুষে মানুষের সম্বন্ধনির্ভর করে শক্তির বাঁটোয়ারায়। গরীব দুঃখীকে আহা বলা নয়, চোখের দু ফোঁটা জল নয় তাদের জন্য। থুতুতে চিঁড়ে ভেজে না। আগে আসুক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার জ্ঞান, তার পর আসুক অধিকার অর্জন ও ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ফুটবে কর্মকুশলতা, যোগ্যতা। জলে না নেমে সাঁতার কাটা যায় না। ঘাটে প্রবেশ নিষেধ লেখা, অথচ সাঁতার জানে না বলে ঘৃণা ! যোগ্যতা বড়মানুষদের আবিষ্কার, আধিপত্য রক্ষার ফন্দি, অন্যকে বঞ্চিত করবার কৌশল ! সুজন সীটে নড়ে বসল। সোনা মুখে কালি পড়বে চমৎকার রসিকতা !

তবে কি শক্তিমন্ত্রের প্রয়োজন ? আর মন্ত্র নয়, তন্ত্র ঢুকবে ! চাই শক্তি-অর্জন, দেশের মেকি সোশিয়ালিস্টরা মন্ত্রই আওড়াচ্ছেন। কিন্তু কোথা থেকে শক্তি আসবে ? কামের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে। মেয়েরা শক্তি, তাই রমলা দেবী খগেনবাবুকে মুগ্ধ করেছেন। খগেনবাবু কী ভাবে রমা দেবীকে চেয়েছিলেন, রমা দেবীর মতে, তিনি নিজেই বুঝতে পারেন নি,তাই তাঁর অত বুদ্ধির কারচুপি। এবার রমা দেবী ভাল করেই বুঝিয়ে দেবেন। মানুষের মধ্যে অন্য কোনো শক্তি যদি থাকে, তার বল যদি কামের চেয়েও বেশি হয়, তবেই মানুষ রক্ষা পেতে পারে। আত্মজ্ঞানের স্পৃহার সে-জোর নেই মনে হয়। তন্ত্রসাধনায় কাম বিজিত হয়, কিন্তু তার প্রক্রিয়ার প্রথমে আছে ভোগ। খগেনবাবুর একবার ভোগ শুরু হলে তিনি আর বাঁচবেন না। তার চেয়ে তাঁর দূরে থাকাই ভাল, তার চেয়ে রমলা দেবীর চাওয়ার কষ্টও ভাল, অক্ষয়ের কর্মঠ কাঠিন্যও ভাল। সুজন অক্ষয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লে :

'কোথায় গান ?'

'স্থানটি কুস্থান। অর্থাৎ, ভদ্র ব্যবহার পাবে। শোনই না, কাশী এলে, ভাল চীজ দেখবে না শুনবে না, কোলকাতা ফিরে কি কৈফিয়ৎ দেবে ?'

সুজন চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। অক্ষয় রাস্তায় লোকজনের ও একার ওপর চোখ রেখে বল্লে, 'ঠাট্টা করছিলাম। কি ঠাওরাও? একেবারে ব'কে গেছি, নয়?'

'তুমি যাও।' গাড়ি বাড়ি পৌঁছল।

দীপা ছুটে এসে বাবার কোলে উঠল। অক্ষয় গাল ঘসে দিলে তার গালে।

'কি শক্ত বাবা, লাগছে যে। ছেড়ে দাও, দাও বলছি।'

'তোর বরের যদি দাড়ি থাকে?'

'ছিঁড়ে দেব না।'

সুজন চমকে উঠে ইংরেজীতে বল্লে, 'কি শিক্ষাই দিচ্ছ।'

'ভোকেশন্যাল ট্রেনিং বাবা, সাহিত্যিক ডিগ্রীধারীরা বুঝবে না। কপোল-কল্পনা নয়, কপোল-বিজ্ঞান একেবারে, পুরুষের কপোলে দাড়ি গজায়, না কামালে মেয়েদের কপোল ছড়ে যায়, তাই কামান উচিত, রোজ সন্ধ্যায়। কিন্তু সময়ের অভাব, কষ্ট, পয়সা খরচ নাপিত রাখতে, তাই প্রথম থেকেই শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি বুঝি বিশ্বাস করনা যে দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে শিক্ষার দোষে? কেবল কবিতা আর ইতিহাস। আমিও কবিতাটা আস্টা লিখতাম ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে। তারপর শিবপুরে র‍্যাদা ঘসে, হাতুড়ি পিটে সব প্লেন্ হয়ে গেল। দুদিন পরে মেয়ে যাবে শ্বশুর বাড়ি....'

দীপা বলে উঠল, 'সঙ্গে যাবে কে? বাড়িতে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।'

'একটু ভুল বলেছিস খুকি। কেউ সঙ্গে যাবে না। বাড়িতে হুলো নেই সেখানেই আছে। কোনো ভয় নেই, খুব মাছ খেতে দিবি, বুঝলি? মাছ রাঁধতে শেখ খুকি— তোর ইস্কুলে গিয়ে কাজ নেই, খুকি আমার পুতুল খেলবে, আর রান্না করবে....'

'বাবা, আমি তত্ত্ব পাঠাব।'

'নিশ্চয়ই, ফর্দ তৈরি কর।'

'আমার একটা ঘড়া চাই, আর পুতুল।'

'কিসের ঘড়া রে?'

'পেতলের।'

'বেটির মেজাজ আছে? বেশ, কালই কেনা হবে। সুজন কাল মনে করিয়ে দিও হে।'

অক্ষয় সেরোয়ানী ও চুড়িদার পড়ে বেরিয়ে এল, মাথায় গোল টুপি। 'কি হে, যাবে না কি?'

'না যাব না।'

'থাক, তোমার গিয়ে কাজ নেই।'

'চল না, খুকিকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।'

'খুকিকে! না থাক্, ঠাণ্ডা লাগবে। কাশীতে এ-সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে। তুমি বুঝতেই পারবে না, এ-অঞ্চলের হিমকে বিশ্বাস করতে নেই, তুমি জান না, তুমি নিজে যখন বেরুবে তখন একটা গরম কিছু জড়িয়ে নিও। ফ্ল্যানেল বড় ভাল জিনিস— লু চলছে, তবু আমাদের কাজ করতে হয়, তখন যদি ফ্ল্যানেল পর, আর কোনো ভয় নেই, আবার শীত যখন পড়েছে, তখন আর ত কথাই নেই। তবে বিলেতী ফ্ল্যানেল পোরো, এখানে কখনও ঠাণ্ডা লাগাবে না। বলে, তাত সয় ত বাত সয় না। যাও খুকু, ঝির সঙ্গে গল্প করগে। কালই পেতলের ঘড়া আসবে। ঠাণ্ডা লাগাবি নি, বুঝলি?' দীপা চলে গেল। সুজন বল্লে, 'দীপার ওভারকোট নিলেই চলত না কি?' অক্ষয় প্রগল্‌ভভাবে উত্তর দিলে:

'না, না, ও-সব ফ্যাশান ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস করানো ভাল নয়। ওভার-কোটেও ঠাণ্ডা আট্‌কায় না, কোথা থেকে যে ঠাণ্ডা লাগে বোঝবার জো'টি নেই। ওর মা রোজ আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবার বায়না করত। একটা ফার্ দেওয়া লম্বা কোট কিনে দিলাম। তাতে শানাল না। তার পর মোটর চাইলে। কিন্তু মাইনে ছিল কম, ধুত্তোর বলে ধারেই কিনে ফেল্লাম। সেইতেই ত এলাওয়েন্স বাড়িয়ে দিলে, চাকরির উন্নতি হোলো। এ-দেশে চাল বাড়িয়ে যাও, মাইনেও বাড়বে। মোটর চড়লেই ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করত, গলায় ব্যথা হোতো। একদিন রাত দুটো করলে নবমীর রাতে থিয়েটার দেখে ফিরতে, তার পরের দিনই জ্বর, বল্লে, "ওভারকোট ছিল, তবু কি করব জ্বর হলে? আমার দোষ না কি! বারে!" আর তখন কি করব? সেই যে নিউমোনিয়া হোলো⋯না, না, ও-সব বদভ্যাস মেয়েদের⋯তুমি জান না, ওভারকোটে শীত আটকায় না। আচ্ছা, তুমি না হয় ওর সঙ্গেই গল্প গুজোব করো, সেও ভাল লাগবে না, তার চেয়ে ঘাটে ঘুরে এস, অনেক চীজ্ চোখে পড়বে। আজ রাতে একটু গল্পগুজোব করা যাবে, কি বল?'

'কখন ফিরছ?'

'একজন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কংগ্রেসের চাকরি যেন কেউ না করে! খোশামোদে আর ঘুষ! যখন মর্জি হবেন তিনি ফিরবেন।'

'ও, তা হলে গান শোনা হবে না তোমার?'

'কি করে হবে বল ভাই! যে-সব কথা তুললে! তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম। বেশি লেখাপড়া করলে লোকে ঠাট্টা ধরতে পারে না!'

এই হোলো রিয়ালিস্ট। কড়াপাকের মধ্যে নরমপুর ; লজ্জা ঢাকবার আবরণ মাত্র। খানদানী ইংরেজের বাড়ির করিডোরে লোহার মুখোশ ও বর্ম পরে বল্লম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছোট ছেলেদের দুঃস্বপ্নের খোরাক যোগাতে। খগেনবাবুর মুখোশ বুদ্ধিবাদ, হাঁপিয়ে উঠলেন তাই, অন্তঃসারশূন্যতার জন্য একটানেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, মুখোশ গেল টুটে, তার পর দে ছুট্। আবার নতুন কী মুখোশ পরবেন কে জানে। কেবল মুখোশ পরিবর্তনই চলছে। রমলা দেবীর মুখোশ ছিল আধুনিক সমাজের ভদ্রতা, খসে গেল খগেনবাবুর এক হ্যাঁচকা টানে। প্রকাশিত হোলে দুর্নিবার প্রবৃত্তির আবরণহীন মূর্তি।

ঘরের ভেতর চোখে পড়ে না স্পষ্টভাবে কোন কিছু, কিন্তু সবই রয়েছে অভ্যাস মত। আকাশে এখনও আলোর রেশ টানা। সন্ধিক্ষণ একটি বিশেষ মুহূর্ত, অনন্ত প্রবাহ থেকে চ্যুত। তার নিজের সত্তা আছে, কিন্তু অন্তরে সচেতনতার অধৈর্য নেই, দৈহিক মিলনের চরমক্ষণসম, ভাস্কর্য-ঘন নিশ্চলতা, নির্বাত-প্রদীপবৎ স্থিরশিখা, শান্ত কোমল মধুক্ষণ। পুরাতনের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের প্রতীক্ষাবিহীন এই সান্ধ্য-মুহূর্তে বর্তমান সকল অভিজ্ঞতাকে গ্রথিত করে বিশ্বের গোপন কথাটি জেনে নেয়। যার বর্তমান স্থির সেই মানুষই সম্পূর্ণ। বর্তমানকে স্থায়ী করা যায় কি ভাবে? স্থায়ী করার নামই যোগ-সাধনা।

সম্বিৎ ফিরে আসে রোমাঞ্চের সঙ্গে। গালে কে যেন হাত বুলিয়ে দিলে। রাত্রির অভিজ্ঞতা এমন আর কি অদ্ভুত। এমন আর কি অস্বাভাবিক। 'এস স্বাভাবিক করে দিই।' সুজনের বুকটা মুচড়ে যায়। অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়ে একটা চাদর নিয়ে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ক্লান্ত হয়, পোস্ট অফিসের সামনে হাজির হয়েছে দেখে হঠাৎ ইচ্ছে হয় বিজনকে টেলিগ্রাম করতে। বিজন আসুক, এসে রক্ষা করুক, সকলকে, অক্ষয়কে, খগেনকে, তার রমাদিকে। তার সে-শক্তি আছে। আসুক সে। ওঃ....তাই উনি চান না যে বিজন আসে....ওঃ তাই! ভয়ে, পাছে বাধা ওঠে। সুজন পোস্ট অফিসের মধ্যে ঢুকে একটা এক্স্প্রেস্ তার করলে, 'চলে এস, প্রয়োজন আছে তোমার উপস্থিতির।'

ঘরে ফিরে সুজন অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বড় কঠিন। আরাম কেদারায় ব'সে অপেক্ষা করে বিজনের আসার। বিজনের ওপর অনেক আশা তার। কেন চিঠিতে ঠাট্টা প্রবেশ করল? মনের ওপর কি কোনো হাত নেই মানুষের?

ছয়

বিজন দুদিন পরে বেলা সাড়ে ন'টায় এসে উপস্থিত। সঙ্গে মাত্র একটি সুটকেশ, একটি কুশান্‌ ও গরম গরম জল রাখবার বোতল। টঙ্গা থেকে নামতেই সুজন টের পেয়ে নিজের হাতে সুটকেশটি নিয়ে বিজনকে ভেতরে আনলে।

বিজন বল্লে, 'সুজনদা, তার পেয়েই চলে এলাম। কোনো অসুখবিসুখ করে নি ত? রমাদি কেমন আছে?'

'সকলেই ভাল আছেন। তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করছিল।'

'তা আমি আগেই ভেবেছি। অসুখ করলে আমাকে ডাকবে কেন? আমারই অসুখ করলে তোমরা আসবে।'

সুজনের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল দেখে বিজন অপ্রস্তুতে পড়ে বল্লে, 'দেখতে ইচ্ছে করছিল, না ছাই! শুকনো দেশে এসেও বাঙ্গালী যে রোমান্টিক সেই রোমান্টিক! তোমার চিঠি আমার মোটে ভাল লাগেনি কিন্তু।'

সুজন কপালে হাত ঠেকিয়ে হতাশার ভান দেখালে।

'তোমার চিঠি রওনা হবার ঠিক আগে পেলাম। বৌদ্ধধর্ম-টর্ম বুঝি না, সুজনদা। তুমি অবস্থা নিয়ে খোঁটা দিলে কেন? আচ্ছা, সে হবে'খন। রমাদি কোথায়?'

'বাসা নিয়ে বড় গোলমাল চলেছে। আপাতত একটা ছোট বাড়িতে আছেন। তুমি এসেছ, শীঘ্রই ভদ্র বাড়ি সন্ধান করতে হবে।'

'এখন আমি কোথায় থাকব, বা রে! ছোট বাড়িতে আমার কোনো কষ্ট হবে না।'

'আপাতত এইখানেই থাক। অক্ষয় আমাদের আত্মীয়। অবশ্য, এই বাড়িটাও বড় নয়।'

'কেন? আমি সব জায়গায় থাকতে পারি। এ ত বেশ ঘর!'

'তুলনায় অবশ্য। ভাব দেখি বিজন এক এক পটিতে কতগুলো কুঁড়ে ঘর, তার মধ্যে দশ বারো জন লোক, মায় বাছুর বক্‌রিটা পর্যন্ত!'

'ও-রকম ঠাট্টা বই পড়ে সকলেই করতে পারে, দেখতে যদি নিজের চোখে— টিটেগড় কাঁকিনাড়ায়, খিদিরপুরে। ঘর দশ ফুট বাই আট ফুট, ছ জন মানুষ, স্বামীস্ত্রী এক জোড়া, বড় ছেলে, বিবাহিতা মেয়ে, জামাই গেছে জেলে মাতলামি ও মারপিট করে একজনের সঙ্গে, সে- লোকটা নাকি মেয়েটার সঙ্গে ভাব করছিল, দুটো বাচ্ছা, তাদের বুড়ো আঙুল আফিম মাখিয়ে চোষায় যাতে সারাক্ষণ ঘুমিয়ে

থাকে, মাকে বিরক্ত না করে কাজে— তার ওপর আবার একটা ছাগলীও তার বাচ্চা, সেই দুধ খায়, আবার বেচে।'

'কে অস্বীকার করছে। মুখ হাত পা ধুয়ে নাও।'

সুজন বিজনকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল, ঝিকে খাবার তৈরি করতে বলে। দীপা উঁকি মেরে পালাল। সুজন তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর ফর্সা চাদর পেতে, টেবিল সাজিয়ে রাখলে। বিজন স্নানের ঘর থেকে সুটকেশ খুলে কাপড় চোপড় বার করতে বসল। 'একটা গরম কিছু বার কর। পুলওভার আননি? শাল এনেছ? আমারটা নাও। এখনকার জন্য বলছি না, সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা পড়ে। টেনিসের কাপড় আননি কেন? টেনিস চলছে কেমন? মামাকে চিঠি লিখব লিখব করে লেখা হয় নি।'

'লিখতে হবে না। এ-সীজ্‌নটা খেলব না। কেমন ভাল লাগছে না।'

'শরীর খারাপ নয় আশা করি। অভ্যাসটা রাখ, নইলে ওঠবার মুখে ছেড়ে দিলে ঝুলে যাবে খেলা।'

'শরীর খুব ভাল। সে জন্য নয়, কেমন যেন মন চাইছে না।'

'মনের আবার কি হল?'

'তোমায় ত লিখেছিলাম, উত্তরে কেবল বিদ্রূপই করলে।'

'তুই একটা আস্ত পাগল।'

'না সুজনদা, মনে হয় আমার কোনো অধিকার নেই। সাউথ ক্লাবের সবুজ ঘাস, তার ওপর দুধের মতন সাদা বল, ফেনার মতন ফ্লানেল ট্রাউজার্স আর খেলার সার্ট দেখলে আমার কষ্ট হয়। আমার টেনিস খেলে বাবুয়ানা করা উচিত নয়।'

'অধিকার নেই, না, উচিত কেন?'

'যাই বল। তফাৎ করছ কেন?'

'অধিকার মানে জোর জবরদস্তি করে কেড়ে নেওয়া— বোধ হয়,রমাদিকে জিজ্ঞাসা কোরো।'

'চল তাঁর কাছে যাই।'

'আগে কিছু খেয়ে নাও।'

'তাঁর ওখানেই চা খাব'খন।'

ঝি চা ও খাবার নিয়ে এল, গরম জিলিপী দেখে বিজন লোভ সম্বরণ করতে পারল না।

'সুজনদা, এখানে কোলকাতার জিলিপী পাওয়া যায়?'

'এখানে অনেক বাঙালী থাকে কিনা, তাই। ফিরিওয়ালারা বাঙালী 'মিঠাই'

ও 'কলকাত্তিয়া কেলা' বলে হেঁকে যায়। এদেশের জিলিপী খুব বড়, নাম 'জিলেয়বী', আমাদের অমৃতী গোছের। বিজন, মনে আছে ফিরিঙ্গীরা কেমন জিলিপী ভালবাসে? তোমার রুচিটা একটু সাহেবী ধরনের।'

'তুমি জান না, কুলিদের ছেলেমেয়েগুলোকে জিলিপী দিলে লাফিয়ে কোলে আসে। চল রমাদির বাড়ি যাই।'

'বিকেলের দিকে যাওয়া যাবে। তা হলে, তোমার টেনিস খেলায় বিবেকের আপত্তি?'

'যাই বল, এবার খেলব না, ধরই না বিবেকের দংশন, আপত্তিটা কি?'

'বিবেক মানতেই কেমন খচ্‌ খচ্‌ করে।'

'তোমার সাহেবরা আজকাল মানছেন না বুঝি, না খগেনবাবুর আধুনিকতম মত?'

'খগেনবাবু এখানে থাকেন না।'

'ভদ্রলোক কি করছেন আজকাল?'

'ভ্রাম্যমাণ, পর্যটক বলতে পার।'

'স্বামীজী! ঐরে! হিঁদুয়ানীর রোগে ধরেছে!'

'এখানে আসবেন শুনছি।'

'কবে? তার আগেই পালাতে হবে।'

'তাঁর আসা পর্যন্ত না হয় থাক। রমলাদি একলা।'

'কেন তুমি আছ ত!'

'আমি! আমি আর কত সঙ্গ দেব?' বলেই সুজন মুখ ফিরিয়ে নিলে।

বিজনের মুখে আশ্চর্যের চিহ্ন ফুটে উঠল। সুজন তাই দেখে বিজনকে স্নান করবে কিনা প্রশ্ন করলে। বিজনের চুলে কয়লা জমেছে তার গরম জলে সাবান দিয়ে স্নানের প্রয়োজন। সে হাত, মুখ ও মাথা ধুয়েছিল, তাই আবার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বিজন বল্লে, 'ব্যাক-ব্রাশই ভাল, হাঙ্গামা নেই, একটু য়্যাঙ্গোরা মাখলেই সারাদিন চুল ঠিক থাকে। রাত্রে খিদিরপুর থেকে এসে স্নান করি সেই সুবিধে।'

'তা বেশ কর। তাদের সামনে একটা আদর্শ চাই ত! তা ছাড়া, রাত্রে স্নানের কত সুবিধা, ঘুম হয়।'

'ঘুমের কোনো কষ্ট হয় না।'

'এখনও হল না! এই বয়সেই শুরু হয়। এত ভাবো, অথচ সুনিদ্রা হয়, আশ্চর্য লাগে কেমন।'

'আজকাল ঠাট্টাটা তোমার বেশ আসছে দেখছি? তোমার চিঠিটা আমার

মোটে ভাল লাগে নি, যদি না তার করতে এমন কড়া চিঠি পেতে, দেখতে তখন কেমন মজা। আর একটু চা খেলে মন্দ হয় না।'

'এখন খেয়ো না। ভাত খেয়ে ঘুমোও। ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুর জন্যে যদি চিঠিটা ভাল না লেগে থাকে তবে সেটি জানবার বাসনা আছে।'

'কি জানি কেন মনে হল, যেন বিনিয়ে বিনিয়ে লিখেছ। ও-রকম আমার পোষায় না, মনে এক, মুখে এক। বৌদ্ধধর্ম-টর্ম বুঝি না, অতএব তার সঙ্গে সোশিয়ালিজমের সম্বন্ধ কতটুকু তাও জানি না। তুমি খগেনবাবুর মতন লম্বা লেক্‌চার দিলেও আমি যে ইডিয়ট সেই ইডিয়টই থাকব। তুমি খগেনবাবুর মতনই একটি বুর্জোয়া। কেবল প্রশ্ন আর সমস্যা, সমস্যা আর প্রশ্ন। সোজাকে শক্ত করাতে কি আনন্দ পাও? দোষ দিচ্ছি না তোমাদের। যে সোশিয়ালিস্ট সে কখনও রাগ করবে না, কারুরই ওপর। কারণ সে বুঝবে— বোঝা মানেই মাপ করা— তোমরা একটি বিশেষ যুগের ধনোৎপাদন-পদ্ধতি থেকে উৎপন্ন এবং তারই শেষ ফসল। সে-যুগের, সে-পদ্ধতির এককালে অনেক কিছু দেবার ছিল, আমরা লাভবান হয়েছি। কিন্তু এখন তার দেবার বেশি কিছু নেই, যেমন, আসতে আসতে কাশীর পথে লালমাটি দেখলাম, একটা ঘাস পর্যন্ত নেই, অথচ গরু চরছে, কি যে খাচ্ছে সেই জানে। এখন নতুন যুগ এসেছে, নতুন পদ্ধতি এসেছে, তার ফলে সমাজ-শক্তির নতুন ভাগ হওয়া চাই, তাই হতে বাধ্য। কিন্তু ইতিহাসের এই স্বাভাবিক গতিকে বাধা দিচ্ছে পুরাতনের জের। স্বীকার করবারও সাহস নেই, তাই শক্ত শক্ত কথা দিয়ে সমস্যা তৈরি কর। তোমরা এই মোটা কথাটি জান না, তাই তোমাদের ওপর রাগ নেই, দয়া হয় কেবল, আর বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। যত বেশি সোজা জিনিস বুঝবে ততই কথা বাড়বে। তোমরা কিছুই দেখবে না চোখ খুলে, আর বলবে, চিন্তা করছি।'

'চোখ খুলতে আমি সদাই প্রস্তুত।'

'মোটেই নও। খরগোস, একদম্‌।'

'ওরে নারে না, চোখ খুলেছে।'

'তবে ঝুলে পড়।'

'চোখ খুলেই থাকব। ঝোলা হবে না, ধাতে নেই।'

'তা হয় না। কাজ না করলে চোখ খোলে না। কাজ করা আর ভাবা আলাদা নয়। জানি, বিশ্বাস হবে না, যতক্ষণ খগেনবাবু ইংরেজী বই থেকে বচন উদ্ধার করে থাবড়ে না দেন।'

'আমাকে বুঝি খগেনবাবুর শিষ্য ভাবিস?'

'শিষ্য কেবল। রেকর্ড, হিজ মাস্টার্স ভয়েস।'

সুজনের মুখটা সিটিয়ে গেল, কিন্তু সংযত হয়ে বল্লে, 'এইখানে তুই খাঁটি সোশিয়ালিস্ট। তাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা একেবারে বাজে নয়।'

'তোমরা দুজনেই বুর্জোয়া।'

'তা জানি না, তবে চিন্তার সাহসের সঙ্গে বোধ হয় আর্থিক অবস্থার যোগ আছে।'

'না, না, সে কথা নয়। ছাখ না, খগেনবাবু, তিনি ত চাকরি করেন না, কিন্তু তাঁর যে দাস মনোভাব আমি জোর গলায় বলব।'

সুজন একটু চুপ করে থেকে বল্লে, 'রমাদির সম্মুখে ওসব আলোচনা নাই করলে।'

'কেন ভয় নাকি। নিশ্চয় বলব।'

'তোমার সৎসাহস উপভোগ্য।'

অক্ষয় ঘরে এল। অক্ষয় প্রথমে বিজনকে চিনতে পারেনি, কিন্তু পরিচয়ের পর সে উল্লসিত হোলো। তার পিতার জন্য সে আজ যা কিছু তা হয়েছে, তাঁর মতন সদাশয়, আপনভোলা লোক অক্ষয় জন্মে দেখেনি। ভাগ্যিস, আজ সে সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছে, মন তার যেন বলেছিল বাড়িতে তার কী একটা প্রয়োজন রয়েছে। বিজনকে সুজন খাতির করেছে নিশ্চয়, বাড়ি তার নয়, সুজনেরই, অতএব বিজনেরই, কোনো সঙ্কোচ যেন সে না করে, যখন যা দরকার তখনই সে যেন হুকুম করে। মহারাজ, ঝি, আর্দালিকে ডেকে সে বলে দিলে যেন তারা সদা সর্বদা মজুদ থাকে সাহেবের হুকুম তামিলের জন্য। বিজনের বাবার প্রতি সে কৃতজ্ঞ, তাঁর কর্মদক্ষতাই তার আদর্শ। তাঁর ওপরওয়ালা এক বড় সাহেব তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার সাহেব হওয়াই উচিত ছিল।' মেজাজ যেন মাটির, অথচ কাজ একটুকরো পড়ে থাকবার জো নেই, এধারে রাশভারী কেমন। সামনে দাঁড়াক দেখি কেউ। হাঁ, ওকেই বলে সাহেব।'

বিজন হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি বুঝি....'

কিন্তু মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অক্ষয় জোর গলায় প্রতিবাদ জানালে, 'না, সে মানতেই হবে। ইংরেজদের চরিত্রে এমন একটি দৃঢ়তা ও এফিশিয়েনসি পাওয়া যায় যেটা অন্য কোনো জাতে দুর্লভ। হাজারবার মানব যে ইংরেজ বড়, তাদের কাছে বাঙালীদের অনেক শেখবার আছে।'

বিজন গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'সব স্বাধীন জাতিরাই কাজ করে, সে কাজ ভাল হয়।'

'অমনটি হয় না। হাঁ, জার্মানরা পারে বটে, কিন্তু তাদের গুণ অর্জন করবার সুযোগ আমাদের নেই। ভগবান যা দিয়েছেন তাইতেই আমি কৃতজ্ঞ, আর সন্তুষ্ট।'

'কৃতজ্ঞ।'

'নিশ্চয়ই। যার গ্র্যাটিচ্যুড্ নেই সে কী একটা মানুষ। আপনার বাবা যদি আমার উপকারটি না করতেন তা হলে আজ আমি ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতাম।'

সুজন বল্লে: 'সে কথা বোলোনা অক্ষয়, তুমি বড় হতেই।'

'তা ঠিক বলা যায় না। অন্তত দেরি হোতো। আমরা কৃতজ্ঞ হতে বাধ্য। ইংরেজ না এলে কি হোতো ভাব দেখি। এ চালাকি নয়, মানতেই হবে ভগবানের নিয়মকে।'

বিজন পায়চারি করছে দেখে অক্ষয় খাবার জোগাড় করতে গেল। সুজনের তাগিদে খাবার ইতিপূর্বেই তৈরি হয়েছিল। অক্ষয় নিজ হাতে আসন ও জলের গেলাস রেখে সুজনকে স্নান করতে পাঠালে।

'আজ আপনি এসেছেন, ছুটি নিই, দিই ব্যাটাদের লিখে, মাথা ধরেছে। আর পারি না মশাই খেটে খেটে। চলুন আপনাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসা যাক।'

অক্ষয় একটা কাগজে ছুটির দরখাস্ত লিখছে দেখে বিজন আপত্তি জানালে। তার আপত্তির ভাষা একটু জোরালো শুনে অক্ষয় আর লিখলে না। অক্ষয় ভেতরে গিয়ে ঝিকে চাপা গলায় হুকুম করলে সে যেন দীপাকে ওপরতলায় নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, যদি না ঘুমোয়, তবে যেন পাশের বাড়ি নিয়ে যায়, যেন একটু বিরক্ত না করে। দীপা অপ্রস্তুতে পড়ে পুতুল খেলা বন্ধ করলে।

'ও কে জানিস দীপা? তোর কাকা। একদম অসভ্যতা করিস নি বুঝলি?'

সুজন স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েছে শুনে অক্ষয় তাড়াতাড়ি নেমে এল। খাওয়ার সময় আতিথ্যের ত্রুটি মার্জনা করে যতদিন ভাল লাগে ততদিন তার বাড়ি থাকতে বিজনকে অক্ষয় পুনরায় অনুরোধ করলে। খাবার পর অক্ষয় অনিচ্ছা প্রকাশ করতে করতে কাজে বেরুল।

'চল সুজনদা, রমাদির বাড়ি যাই।'

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। পথে সুজন বিজনকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার চিঠিতে একটা প্রশ্ন ছিল, তার উত্তর কি।'

'কোনটা?'

'ঐ প্রেমটা? তোমাদের সমাজে ওর কিছু কি স্থান আছে?'

'তা জানি না। এখন থেকে কি করে বলব? জ্যোতিষী নই। তবে একটি কথা জানি, তোমাদের প্রেম-স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, ও-সব বুর্জোয়া। কোথায় স্বামী-স্ত্রী সুখে ঘরকন্না করছে, দেখেছ? কেন সকলে অসুখী জান? এ বলে "তুমি আমার", ও বলে "তুমি আমার"। বেশ মিষ্ট লাগে, কবিতা লেখা চলে। কিন্তু তার মানে কি? মানে, তুমি আমার ঝি, আর না হয় তুমি আমার খানসামা বেয়ারা।

চাকর-প্রভুর সম্বন্ধকে গিলটি করে সোনা বলে কতদিন চালাবে? আগে দোঁহা-হুঁহু, তার পরে হাহা-হুহু, এ ওকে গিলছে, ও একে গিলছে।'

একটু অপ্রস্তুতে পড়ে বিজন ঢোক গিলে আবার বল্লে, 'আচ্ছা, সোজা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্যাপারটাকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখতে হবে, সুজনদা। চাষ-বাসের যুগে স্ত্রীর একটা আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। ঘরেও কাজ করছে, আবার মাঠের কাজও করছে। কিন্তু নিজের কোনো আয় নেই, কর্তা টাকা দিত না। কর্তা যত বেশি তাকে বলদের মতন ঘরে বাইরে খাটায় ততই গিন্নীর খাতির বাড়ে। কিন্তু পয়সা দেবার বেলায় ঢুঢু, সেটি চলছে না! অবশ্য রক্ষণাবেক্ষণও করতেন কর্তা। কিন্তু কলকব্জার যুগে স্ত্রীজাতটা নিজে রোজগার করছে, এবং আরো করবে। সে এখন দাসী নয়। স্বামীরও দাবি সেজন্য কমতে বাধ্য, স্ত্রীও স্বামীকে আঁচলের চাবি করে ঝুলোতে পারবে না; স্ত্রীজাতি আর অবলা নয়,—কে বলে মা তুমি অবলে!' বিজন নিজেই হো হো করে হেসে উঠল····

'সে একটা ভীষণ মজার ব্যাপার, দারুণ কাণ্ড, সুজনদা।'

বিজনের হাসি আর থামে না, সেই অবস্থাতেই দুজন রমলা দেবীর বাড়ি পৌঁছল।

সিঁড়ির ওপরে রমা দেবী দাঁড়িয়েছিলেন, বোধ হয় দুজনের পদশব্দ শুনে কারা আসছে দেখতে এসেছিলেন। তিনি হাত ধরে বিজনকে ওপরের ঘরে আনলেন।

'রমাদি স্বর্গের সিঁড়ি যদি এমনি হয় তবে আমি মর্ত্যেই যেন চিরকাল থাকি। এক একটা বাড়ি যেন কেল্লা! এই সব বাড়িতে থেকেই তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে, পরিষ্কার দেখছি। কি হোয়েছে তোমার? রং ফ্যাকাশে হয়েছে, চোখের কোনের চামড়া কুঁচকেছে। চল কোলকাতায়, সেখানে তোমাকে আমার খুব দরকার, সে তুমি না হলে আর কেউ পারবে না। ছোট্ট ছোট্ট কাল্‌কাসুন্দী মেয়েদের কর্ম নয়।'

রমলা দেবী অজানিতে চোখের কোনে হাত দিলেন, যতদূর পারা যায় তারা দুটি পাশে এনে দেখতে চেষ্টা করলেন কোথায় ও কতটুকু ত্বকের মসৃণতা নষ্ট হয়েছে। বিজন তাই লক্ষ করে আবার হো হো করে হেসে উঠল।

সুজন ব্যাখ্যা করলে, 'সে ভারী মজার কথা!'

'কেমন আছ, বিজন? কাশী আসছ খবর পাইনি কেন? এখানে খেলা আছে?'

'সুজন তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, 'কেন, খেলা ছাড়া বিজনের অন্য কোনো কাজ থাকতে পারে না? বিজনের এখন কত কিছু দেখতে হয়। সত্যি বলছি, ঠাট্টা নয়। বিজন এসেছে এখানে মিশনারি হিসেবে।'

রমলা দেবী হাসছেন দেখে সুজন বল্লে, 'নিশ্চয়ই। বিজন আমাদের সকলেরই ধর্ম পরিবর্তনের জন্য এসেছে। ওর নতুন সমাজে আমাদের মতন পাষণ্ড ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীর স্থান দেওয়া চলবে কি না পরীক্ষা করাটাও ওর আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে পুনর্গঠিত করার দুরভিসন্ধিও গোপনে সে পোষণ করছে মনে করা অসঙ্গত হবে না। আমাদের দেখতে আসার মতন রোমাণ্টিক কিংবা বুর্জোয়া মনোভাব ওর নেই।'

রমলা দেবী হেসে ফেল্লেন, কিন্তু বিজন গম্ভীর হয়ে রইল।

'বিজন আমি তোমাকে শরবত পর্যন্ত দিতে পারছি না।'

'সেজন্য ব্যস্ত হওয়াটাও বিজন প্রত্যাশা করে না। পছন্দ করে কি না ঠিক জানি না।'

বিজন স্থিরদৃষ্টিতে সুজনের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে রমলা দেবীর অস্বস্তি হোলো, কিন্তু সুজন যেন নিশ্চিন্ত। রমলা দেবীর ভদ্রতায় কোনের মেঘ সারা আকাশ ছড়ায় না। তিনি কোলকাতার টেনিসের পার্টনারের কথা তোলেন, কিন্তু বিজন কোনো কথাই যেন গায়ে মাখে না। মন তার ভারী ঠেকে, সুজনদার বিদ্রূপে, রমলা দেবীর অন্তঃসারশূন্য ভদ্রতায়। হঠাৎ মুখে এক পশলা বিরক্তি নামে অক্ষয়ের মতামত স্মরণ করে; তবু সেটা স্বাভাবিক মনে হয় এই কৃত্রিমতার অবকাশে। রমলা দেবী শোবার ঘর থেকে একটা ছোট কুশান এনে বিজনের পিঠে গুঁজে দিলেন। বিজন আরামে ঠেস দিয়ে বসল। সুজন চোখ নামালে। মেঘ যখন আকাশের একদিকে কাতারে কাতারে সারবন্দী হয়েছে, তখন বাকি আকাশ অকস্মাৎ স্বচ্ছ হয়ে যায়, নীলে কাচা ধোপদোরস্ত কাপড়ের মতন একটু যেন অতিরিক্ত শুভ্র, পাখিরা টের পায়, ঝাঁকে ঝাঁকে কাক চিলের দল কুলায়ে ফেরে, হালকা তাদের গতি, প্রমথ চৌধুরীর 'ফরমায়েসী গল্পের' মতন, হাওয়ার মুখে ওড়ে, লাট খায়, আবার ফেরে, বর্ষণের পূর্বে নীড়ে চলে যায়।

সুজন গলা খাঁকারি দিয়ে বল্লে, 'আমার চিঠিতে বিজন বিরক্ত হয়েছে।'

'অন্যায় লেখ কেন সুজন?'

'প্রশ্ন করেছিলাম।'

'কি?'

'লিখেছিলাম, তোমাদের সর্দার যদি প্রেমে পড়েন? বিজনের মতে প্রেম, সাহিত্য একপ্রকার ভাববিলাস মাত্র, ওর নতুন ভাষায়, বুর্জোয়া-বৃত্তি। আমি ভাবি, যদি বিজনদের সর্দার প্রেমে পড়েন তবে কি হবে? সমস্যাটি মনে উঠেছে চার অধ্যায় পড়বার পর।'

'আমাদের ও-ছাড়া অনেক কর্তব্য আছে। যদি প্রেমে পড়েন তবে চক্ষে দেখব, একবার, দু'বার, জোর তিনবার ক্ষমা, তার পর ভোট আউট। তবে বৌ নিয়ে যদি জয়মাকালী বলে ঝুলে পড়েন তবে না হয়....'

'জয়মাকালী।'

'দু'বার তিনবার ক্ষমা করবে....। সুজন, জয়মাকালীতে আপত্তি কোরো না।'

'ওদের সবই জয়মাকালী, ধরতাই বুলি।'

'সে থাক। আচ্ছা, বিজন, তোমার বিশ্বাস হয় মেয়েরা পারবে?'

'পারবে বোধ করি....আবার ওদের দেখলে মনে হয় উঁহুঁ পারবে না। অন্তকে উচ্ছন্ন দিলে এলিটা। পোড়ারমুখী বলতে ইচ্ছে হয়। কেবল লম্বা চওড়া কথার ঝুড়ি। সকলে অবশ্য তা নয়।'

'তা কি করে হবে ভাই। ভাঁড়ার ঘরে যাওনি, নইলে দেখতে, ধামি ধামা ঝোড়া সবই আছে।'

'যতই থাক না কেন, সকলেই নাকের ডগার দিকে চায়, তুমিও যেমন চাইলে রমাদি। আরে বাপু, নিজের চোখ দিয়ে কখনও চোখের চার ধারের চামড়া কুঁচকেছে কিনা দেখা যায়? সকলে নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে সুড়ুক করে দেখে নেয়। আমি কিন্তু ধরে ফেলি।'

রমা দেবী উপদেশ দিলেন, 'আর ধরো না।' সুজন রমলা দেবীকে আশ্বাস দিলে, 'এখনও বিজনের পর্যবেক্ষণশীলতা সুপ্রসিদ্ধ নয় নচেৎ....'

'এবার আমার চোখ খুলেছে, সুজনদা, তোমার আর রমাদির অবর্তমানে। সর্দি হলেও গলাবন্ধ পরি না বাবাঃ, তোমরা দুটিতে মিলে আমাকে খোকা করে রেখেছিলে। এখন আমার চোখে তোমাদের দেওয়া ঠুলি নেই। বেশ ঝাড়া হাত পা খুব ধরে ফেলি আজকাল।' বিজন বলতে বলতে হাসতে লাগল।

'বিজন একটু বিশ্রাম করবে না? কাল ট্রেনে ঘুম হয় নি নিশ্চয়।'

'বিজনের ঘুম হয়।'

রমা দেবী ঘাড় বেঁকিয়ে সুজনকে বল্লেন, 'তুমি না হয় একটু বিশ্রাম কর।'

সুজন হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিলে।

'আজকাল সুজনদা, বেশ দিবানিদ্রা হচ্ছে বুঝি? আমার বেলা যত পাপ। আমি আজকাল দুপুর বেলা ঘুরে বেড়াই। রোদ্দুর, বৃষ্টি গ্রাহ্য করি না। বেশ মজা পাওয়া যায়, মধ্যে মধ্যে।'

কি মজারে বিজন?'

'তোমরা ঠাট্টা করবে নিশ্চয়, বিশেষত সুজনদা। কিন্তু কেয়ার করি না। ভয় কিসের? আমি কিছুই করিনি। সেদিন ভারী মজা হয়েছিল এখনও

চলছে। আচ্ছা বলছি, কিন্তু কোনো অর্থ বার করতে পারবে না, বলে দিলাম।'

সুজন ও রমাদেবীর প্রতিশ্রুতি পাবার পর বিজন বলে চলল: 'আমাদের সঙ্গে দু চারজন মেয়ে কর্মী আছেন। তাঁরা সপ্তাহে দু তিনবার পালা করে খিদিরপুর অঞ্চলে যান। তাঁদের ওপর মজুরীন্‌দের শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সকলেই অবশ্য পাশ করা মেয়ে নন, যেমন হয়, জোর ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন। আমাদের কর্তাদের বিশ্বাস যে মেয়ে কর্মীদের দ্বারা খুব ভাল কাজ হওয়া উচিত, কারণ তাঁরা "শক্তিস্বরূপিণী"। ভাষাটা যে ভদ্রলোকের তিনি এককালে সন্ন্যাসী ছিলেন, তাই এখনও সকলে তাঁকে স্বামীজি বলে। হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষত তন্ত্রটা তাঁর ঠোটস্থ। তাই তাঁর ধারণা যে মেয়েরা খুব মনোযোগ সহকারে কর্তব্য পালন করছেন। আমরা, ব্যাটাছেলেরা যে ক'দিন যাই সে ক'দিন ওঁরা অফিসের কাজ করেন। আমাদের নিয়ম ভারী কড়া। একদিন ভাবলাম, কিছুই হচ্ছে না কোনো দিকে, দেখেই আসি না ওঁরা কী করেন। মনে আমার স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কোনো প্রকার কুসংস্কার নেই। তাই গেলাম, ভরদুপ্‌পুর বেলায়। আমি একটা খাপরার ঘরে কথা কইছি, ঠিক পাশের ঘরেই শুনতে পেলাম বাঙ্গালী মেয়ের ভাঙা হিন্দী। খাঁটি বাঙ্গালী, কারণ বাঙ্গাল টান রয়েছে। সে কী অদ্ভুত উচ্চারণ আর ভাষা! শুনলাম কী জান? শুনলাম চুড়ির কথা চলছে পুরোদমে, তার নক্‌সা, ডায়মণ্ড কাটা বুঝলে না, তাই বাঙ্গালী মেয়েটি বল্লে, বরফি বলিস, তোর আদমী সমঝে যায়েগা। সে সব কত কী গয়না জানিও না, হাঁসোলি, বেসর পরতে মানা করছে সেই মেয়েটা। দশ মিনিট ধরে শুনে গেলাম, ভাবছি এইবার নিশ্চয় সোনা-রপ্তানি, কিংবা স্বর্ণমানের সরল ব্যাখ্যা শুনব। ভাগ্য আমার কখনই সুপ্রসন্ন নয় ছেলেবেলা থেকে, তাই চুড়ির পর চলল বাগেরহাট, ঢাকেশ্বরী মাদ্রাজী; গুজরাটী, আমেদাবাদী....কি বল দেখি সুজনদা? ঠিক বলেছ....ও সব শাড়ি, ভুগোল নয়। খুব শিখেছ ত! তখনও আশায় বুক বেঁধে আমি ভাবছি এইবার কি করে ধনিক-সম্প্রদায় কাপড়ের কল থেকে টাকা লুটছে মেয়েটি শেখাবে। কোথায় কী! কাকস্য পরিবেদনা। চুড়ির নক্‌সার পর শাড়ির পাড়....তার পর বিয়ে থা, বাচ্ছা-কাচ্ছা। মজুরীন্‌ বল্লে, এত বড় ধাড়ি মেয়ে অথচ বিয়ে হয় নি, তার ও-বয়সে দুটো বাচ্ছা হয়েছে, গিয়েছ, তাই আদমী আর একটা সাদি করতে চায়। আমার ও-সব সাবজেক্ট নয়, ধুত্তোর মেয়েরা....চলে এলাম চটে।'

খিদিরপুরের মোড়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, দেখি একটা মেয়ে খদ্দরের শাড়ি পরে ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে। বেশ বুঝলাম উনিই। আমি ও-ধারে চাইনি, আমার মুখ তখন অন্য ধারে, গা আমার তখন রিশ রিশ করছে, ওপরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর....এমন সময় শুনতে পেলাম, 'আপনার নাম বিজনবাবু।'

'হ্যাঁ'।

'ছাতা আনেন নি কেন?'

'বেশ করেছি।' তার দিকে চেয়ে জবাব দিই নি, তেমন পাওনি আমাকে কিন্তু সন্দেহ হোলো মেয়েটা হাসছে।'

'আপনি এসপ্ল্যানেডে যাবেন ত?'

'হুঁ' বলেই ট্র্যামে উঠলাম। দুপুর বেলাকার সস্তা ভাড়ার জন্য ট্র্যামে খুব ভিড়। যেই একটি ভদ্রলোক পুলের কাছে নেমে গেল অমনি বসে পড়লাম। পাশের ভদ্রলোকটিও যেই নামা, অমনি সটাং মেয়েটা আমার পাশে। তারপর ট্র্যাম চলছে, হঠাৎ আমার জুতোর ওপর এক খোঁচা, ছাতার, সত্যি বলছি হঠাৎ নয়, ইচ্ছে করে। আমি তখন কী করি। সমস্ত ট্র্যামশুদ্ধ লোকের সামনে চটতেও পারি না, তাই একটু হেসে ফেল্লাম, কিন্তু লেগেছিল খুব। মেয়েটাও নির্লজ্জের মত হেসে বল্লে, 'এবার থেকে ছাতা নিয়ে দুপুর বেলা বেরোবেন।' আমি ধন্যবাদ জানিয়ে গড়ের মাঠ দেখতে লাগলাম। এসপ্ল্যানেডে নেমে এত তেষ্টা পেল যে কী বলব। ভাবছি হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর ওপরে গিয়ে একটু আইসক্রীম খাই। মেয়েটির মুখ তখন আম্‌সি, একে বসন্তের দাগ, তায় কুচকুচে রঙ, তার ওপর খদ্দরের মোটা শাড়ি, ভদ্রতারক্ষার জন্য বল্লাম, 'চলুন আইসক্রীম খাওয়া যাক'।

'আমি আইসক্রীম খাই না।'

'সোডা ফাউন্‌টেনে কোন্ খাবেন।' বুঝলাম, কোন্ কাকে বলে জানে না।

'আচ্ছা, ডাব।'

'না।'

'আপনি কি খান?'

'বরফ, কাঁচা বরফ।'

'সুজনদা, কাঁচা কথাটি যে ভাবে উচ্চারণ করলেন তাইতে মনে হলো যে তিনি কাঁচা বরফ নয়, কাঁচা মাথা খান। আঃ··· শোন না তোমরা। আমি বল্লাম বাড়ি গিয়ে যা ইচ্ছে খাবেন রাস্তায় কাঁচা বরফ খেলে কলেরা হবে।'

'তখন সেবা করতে ডাকা হবে না মশাইকে।' বলে নিচের ঠোঁটটা উল্টে দিলে।'

'আমি সেই মুখের ওপরই জবাব দিলাম, 'ডাকলেই যাচ্ছি যেন। আপনি ত খুব শিক্ষা দেন ওদের। কাজের নামে শাড়ি চুড়ির গল্প করা।'

'ওরা শুনতে চায়।'

'ওরা চায়, না আপনি চান?'

'ওরাই জিজ্ঞাসা করে।'

'কি প্রশ্ন করে তাও শুনেছি।'

'আপনার ত আজকে পালা ছিল না, কী করতে গিয়েছিলেন? নিয়ম জানেন?'

'নিয়মটিয়ম জানি না। আমি স্বামীজিকে রিপোর্ট করব।'

'আমিও করব। লুকিয়ে শোনা থেকে লাগানো পর্যন্ত সবটাই পুরুষোচিত।'

ওধারে ট্র্যাম এসে গেল, আলিপুরের উকিলের ভিড় ভাঙছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম, এবার ভিন্ন সীটে। বউবাজারের মোড়ের কাছে একবার চেয়ে দেখলাম, ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে আছে···খুব ভয় পেয়েছে নিশ্চয়। আমি কিন্তু রিপোর্ট করতাম না, ঠাট্টা করেছিলাম। মেয়েটা আমি দেখছি কী রকমে বুঝতে পেরে জোর করেই যেন ঘাড় বেঁকিয়ে রইল। সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা ছোকরা যাচ্ছিল— ছোট লোকের মত হাঁ করে দেখতে দেখতে। তখন যাবেন কোথায়? বাধ্য হয়ে সেই ঘাড় ফেরাতে হোলো— ভাবটা, রক্ষা কর। ভাবটা ঐ, কিন্তু ভঙ্গিটি যদি দেখতে! কেবল নাকের ডগা দেখছে। যেন কত লক্ষ্মী। অথচ ইনিই দশ মিনিট আগে কাঁচা মাথা বরফের মতন চিবিয়ে খেতে চেয়েছিলেন। ঐ সব নাকের ডগা দেখা মেয়েদের নিয়ে সোশিয়ালিজম হয়! ও-সব ১৯০৫ সালে চলত! এখন দেখছি, ওদের বাদ দিতে হবে। তোমার দ্বারা রমাদি হতে পারত, কিন্তু তুমিও কেন নিজের মুখটা চোখ বেঁকিয়ে দেখে নিলে? বল।'

'রমা দেবী আস্তে বল্লেন, 'তা হলে আমি বাদ!'

'তাই ত বিজন ভাবছে। কিন্তু বিজন···'

রমা দেবী মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লেন, 'কিন্তু আর কি! তোমার মতে বিজন ভালই করেছে, সংযমী ছেলে।'

বিজন এই প্রকার মন্তব্যে হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার কি উচিত ছিল? তার ছাতা নেওয়া? কিন্তু তারপর কোথায় দাঁড়াত ভেবেছ?'

'তা হলে দাঁড়ায় নি কিছু? বাঁচলাম! যা ভয় পাইয়েছিলে! তুমি যে বল্লে, এখনও চলছে।'

'চলছে মানে, খারাপ নয়। কথাবার্তা বন্ধ।'

'তবু চলছে!'

'রাগারাগি চলছে, তার মানেই চলছে, এটুকুও বোঝাতে হবে আমাকে।'

রমা দেবী মন্তব্য করলেন, 'তুমি বড় নিষ্ঠুর, বিজন।'

'না রমাদি, আমি রিপোর্ট করিনি। কিন্তু সে এমন ব্যবহার করছে যাতে মনে হয়, যেন আমারই দোষ। আমি বাবা ও-সবের ভেতর নেই। সোজাসুজি এস, হাঁ, বুঝি, কিন্তু ও সব কী! নিষ্ঠুরটি কেন হলাম।'

সুজন বল্লে, 'রমাদি, সোশিয়ালিস্টদের নিষ্ঠুর না হলে চলে না। যাদের ভাঙতে হবে তাদের কখনও সেন্টিমেন্টাল হলে চলে না।'

বিজন অস্থির হয়ে হাত মুখ ধুতে চাইলে। বিজনকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে রমা দেবী ঘরে এসে সুজনকে প্রশ্ন করলেন। 'কেন এনেছ ওকে এখানে?'

'যদি তোমার ভাল লাগে?'

'সে-জন্য তোমার অত ভাবতে হবে না, কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার কোন দরকার নেই। তা নয়, তুমি এনেছ অন্য মতলবে।'

'মতলব! যা ভাববে তাই ঠিক।'

'কতদিন রাখবে মনস্থ করেছ?'

'ওর যতদিন ইচ্ছে। আমার প্রয়োজন নেই খবরটুকু বার বার না দিলেই পারেন, কারণ নিজের কাছেই সেটা পুরাতন, বহু পুরাতন।'

'ভুল বোঝবার ক্ষমতার শেষ নেই তোমার। ওরই কষ্ট হবে।'

'নিজেকে অন্তত ঠকাবেন না। ওর কষ্ট হবে কি না ঐ বুঝবে, এখন ওর বয়স হয়েছে।'

বিজন ঘরে প্রবেশ করে বললে, 'জলটা খুব ঠাণ্ডা ত! তোমাদের আবার কি হল!'

রমা দেবী বল্লেন, 'কিছুই না। এ বাড়িতে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হবে সুজন বলছিল। তুমি সুজনের সঙ্গেই থাক না হয়।'

বড় বড় চোখে বিজন সুজনের দিকে চেয়ে বল্লে, 'আমি রিটার্ন টিকিট কিনেছি। তুমি কি চাও সুজনদা আমি আজিই চলে যাই?'

'না। তুমি····'

'আর তুমি, রমাদি?'

'আমি! যেন আমার ইচ্ছেয় সব হচ্ছে!'

'তার মানে তোমারও তাই। তোমাদের কি হয়েছে বল ত? যেন থমথম্ করছে। তোমাদের ঠিক বুঝতে পারছি না।'

রমা দেবী চমক ভেঙ্গে বল্লেন, 'কিছুই হয় নি, কেবল বয়স হয়েছে এই যা।'

'রাগ করলে ত চামড়া কুঁচকেছে বলে! তোমার কি সুজনদা?'

'যে একলা তার বয়স একটু জোর কদমে চলে। আমি জন্ম থেকেই বুড়ো, জানিসনে তুই?'

বিজন উত্তেজিত হয়ে বললে, 'কেবল হেঁয়ালি আর ঠাট্টাই শিখেছ— বোধ হয় ভাব কালচারের চিহ্ন। ও-সব কালচার বুর্জোয়াদের। তোমাদের ব্যাধি ধরেছে। খগেনবাবুর ইগোয়িজম তোমাদের ধরেছে, সর্বনাশ করবে। থাকগে

অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কাশী দেখে কাল কোলকাতায় যাব। চল সুজনদা। রমাদি তুমি আর আজ থেকে বোলো না, এখনও সংসার গোছাও নি।'

সাত

রাস্তার ধনুকের টানা ছিলের মতন টনটনে হাওয়া বইছে, ধুলো উড়ছে, সবই যেন শুকনো। বাড়িগুলোর ছায়া বেশ ঠাণ্ডা কিন্তু রৌদ্রদীপ্ত অংশে তাপ প্রায় অসহ্য। অথচ আলো ঢিমে, আগত সন্ধ্যার আবছায়ায় আচ্ছন্ন। পাশাপাশি থেকেও তাপ ও শৈত্যের এত পার্থক্য, কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ করে মিঠে দীপ্তি। হাওয়ার মুখে সুজন বিজন বাড়ি ফিরল। বৈঠকখানায় দীপা খেলছিল, নতুন লোক দেখে পালাল বটে, আবার উঁকি দিলে বার কয়েক। কেউ ডাকল না দেখে ঝিকে দরজার আড়াল থেকে খেলনাগুলো ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে বল্লে। ঝি আসতে সুজন চা'র যোগাড় করতে বল্লে। সুজন নিজের খাটে গা এলিয়ে শুল বটে, কিন্তু 'শক্ত' বলে উঠে পড়ল। 'বিজন, এই চেয়ারটায় বোসো, আমার রোদ্দুর লাগছে।'

সুজন আরাম কেদারায় চোখে হাত ঢেকে শুয়েছে এমন সময় চা এল, সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়ও হাজির। দু'মিনিট অপেক্ষা করতে বলে অক্ষয় জামা কাপড় ছেড়ে ঘরে এল, একটু যেন বেশি সেজেছে।

'দেখুন, আপনাকে নাম ধরেই ডাকি, বয়সে অনেক ছোট।'

'নিশ্চয় বলবেন। আমাকে কেউ আপনি বলে না, চরিত্রে আমার কোথাও দোষ আছে।'

সুজন জিজ্ঞাসা করলে, 'অক্ষয় তোমার কাজ শেষ হোলো যে এরি মধ্যে! তাড়াতাড়ি চলে এলে বুঝি?'

'আমাদের আবার শেষ! সেই মরবার সময়।'

'কিন্তু সাহেবদের দেখ ত! কাজও করে, আবার ছুটিও নেয়, উপভোগও করতে জানে।'

'কিন্তু ওদের মধ্যে সাধারণের লেভেল কত উঁচু। সেই ত দেখলে রাস্তার মাঝ মধ্যিখান খোঁড়া হয়েছে, পই পই করে বলে এলাম রাতেই কাজ করা চাই। একবার দেখে এস— যে কে সেই। এই রকম লোক নিয়ে যাদের চালাতে হয় তাদের ছুটি মণিকর্ণিকার ঘাটে। কোনো প্রকার ইনিশিয়েটিভ্ নেওয়া এদেশের

লোকের কোষ্ঠিতে নেই। ইংরেজদের ঘাড়ে দোষ চাপালেই দেশ স্বাধীন হবে না। আশা করি, বিজনবাবু তুমি দুঃখিত হবে না, ছেলে ছোক্‌রারা এমন ভীষণ স্বদেশী যে একটু কিছু কেউ নিজেদের সমালোচনা করেছে কি ফোঁস করে উঠেছে।'

'না, আমি ইংরেজের দোষ দিই না।'

'আশ্চর্য কিন্তু! কোনো ছেলের মুখে শুনিনি ও-কথা। তোমার বাবাও দিতেন না।'

'আপনি বোধ হয় অনেক দিন পশ্চিমাঞ্চলে?'

'তা অনেক দিন হয়ে গেল বৈ কি! তুমি স্বীকার কর না আমাদের মজ্জাগত দুর্বলতার?'

'মজ্জাগত দুর্বলতার? দুর্বলতা মানি, কিন্তু মজ্জাগত নয়, সমাজের সিস্‌টেমের দোষ।'

'তার মানে?'

'মানে এই; আমাদের দোষ কেবল আমাদের দেশের নয়, সব দেশের গরীবদেরই। চরিত্রগত দোষটা কারণ নয়, ফল। বড়লোকেরা মজাসে শুষেছে, তাই পড়ে আছে ছিবড়ে, আর আপনি সেই ছিবড়েটুকুই দেখছেন। যে শুষছে সেটি অক্টোপাস— তার অনেক হাত, রোঁয়ার ফাঁকে ফাঁকে শোষবার ফন্দি। তবে, বেশি দিন আর নয়।'

'দুর্বলতা থাকবে না! কখন যাবে?'

'তা জানি না, তবে কোন্ সমাজে থাকবে না কল্পনা করা যায়; তবে সে কাজ আমার নয়। আমি কেবল জানি এ-সমাজে এ মনোভাব নিয়ে দুর্বলতা কখনও যাবে না।'

'তা মানি, মনে প্রাণে বুঝি ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন। তবে সকলে ত পারে না, একজনের মতানুসারে চলতেই হবে। দশে মিলে তর্ক হয়, কিন্তু আর কিছু হয় না। সকলে মিলে যখনই কাজ করতে যায় তখনই সেটা পণ্ড হবেই হবে। পৃথিবীর সর্বত্রই ডিক্টেটরশিপ্‌ চলেছে, কোথাও বাদ নেই। কংগ্রেসেই ভাখ না কেন— যেই ঝগড়া বাধল অমনি ডিক্টেটর। ডেমক্রেসির কাল ফুরিয়েছে।'

সুজন বল্লে, 'বিজন বলতে পারে যে ডেমক্রেসি একটি নাম নয়, তাকে অন্যান্য ক্ষেত্রে এখনও ট্রায়েল দেওয়া হয় নি, আর সেই সব ক্ষেত্রগুলিই অত্যন্ত প্রাথমিক।'

'ধন্যবাদ! বোধ হয় নিজেই উত্তর দিতে পারি। তোমরা বোধ হয় ডেমক্রেসিতে বিশ্বাস কর না। নাম কেন ডেমক্রেসি?'

'আমি বলছি বিজনবাবু। ডেমক্রেসি বলতে এই বুঝি, ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন করার পর যে-দল ভারী হবে সেই দলই শাসক-সম্প্রদায়। তাদের ব্যবস্থা লোকের ভাল না লাগলে অন্য দল রাজ্য চালাক। কিন্তু কোনো দলই পারছে না, দেখছ ত? ভোটের দ্বারা মাথা গোণা যায়, মাথার ঘিলু মাপা যায় না।'

'আমি একটু অন্য ভাবে দেখি।'

'এর মধ্যে দু'ভাব নেই। সব দেশই ডেমক্রেসি ত্যাগ করছে না কি? খবরের কাগজ পড় না?'

'পড়ি, যখন সময় পাই। ডেমক্রেসি পূর্বে কখনও কোথাও আসেনি, অতএব পরিত্যাগের কথাই উঠছে না। ব্যাপারখানা ভোটের নয়, টাকাকড়ি সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার, এই ইতিহাস বলছে।'

'আজকাল বুঝি ইতিহাস সকলকে পড়তে হয় ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্যন্ত? আমি মেকানিকস্ নিই।'

সুজন এতক্ষণ পাশের টেবলে পেতলের বাক্সটি নাড়ছিল, হঠাৎ উল্টে ছাই পড়ে গেল। টেবল ঝাড়তে ঝাড়তে সুজন বল্লে, 'যতই ঝুটো হোক এই পলিটিক্যাল ডেমক্রেসিটা, তবু তার কৃপায় মানুষ খানিকটা স্বাধীন হয়েছে, এবং অন্তত শাসনপদ্ধতিটা আবিষ্কৃত হয়েছে।'

বিজনের উত্তেজনা ফুটে উঠল, 'স্বাধীনতা! এর নাম স্বাধীনতা! পরের সর্বনাশ করার স্বাধীনতা কেবল! এধারে স্বাধীনতা, অন্য ধারে সাম্রাজ্য বাড়ছে! চমৎকার নিয়ম! শাসন? কিসের জন্য শাসন? আমরা ভোগ দখল করছি, সেইটা রক্ষা যাতে হয়। কিন্তু আমাদের কী অধিকার? সাধারণ লোকে তাদের নিজের স্বার্থ আমাদের চেয়ে বেশি জানে। অত উপকার না হয় নাই করলাম।'

'হাতে নাতে যদি কাজ করতে তবে বুঝতে ভাই চালাবার লোকের কিংবা পদ্ধতির দরকার কিনা। সুজন নিজে দেখেছে। একবার আমার সঙ্গে রোঁদে চল, যদি তারপরও যদি তোমার থিওরি টিঁকে থাকে তবে আমার কান কেটো। দেখিয়ে দেবার লোক চাই— এই প্রকৃতির নিয়ম। নিয়মটি ভারী মজার জিনিস, চাপা দিয়ে রাখা যায় না, খারাপ ঘা-এর মতন বেরিয়ে পড়বেই, নেহাৎ না হয় আয়ডোফর্মের গন্ধেও। তুমি বুঝি সোশিয়ালিস্ট? সেদিন খবরের কাগজে পড়ছিলাম রাশিয়ার বিবাহ সম্বন্ধে অদ্ভুত খবর। ওসব ল্যাঠা সে দেশে উঠে গেছে। তোমরাও এদেশে তুলে দেবে বোধ হয়?'

সুজন সংযত ভাবে উত্তর দিলে 'বাঁধাবাঁধি কিছু কমতে বাধ্য।'

'আমিও তাই বলি ভাই। বেটাছেলেদের মনই বহু-বিবাহের দিকে, মেয়েরা

যেমন একঘেয়ে জীবন চালাতে পারে আমরা তেমন পারি না— এই মোদ্দা কথাটা না মেনে সকলে থিওরি করছে। অবশ্য, টাকা নেই যাদের তাদের বহু-বিবাহ অচল— কিন্তু···সে যাই হোক, সমাজটাকে ত দেখতে হবে, হঠাৎ ভাঙা চলবে না। ভাঙাটা সোজা, গড়াই শক্ত— এঞ্জিনিয়ারি করে এ জ্ঞানটুকু সঞ্চয় করেছি। তোমরা তৈরি হয়ে নাও।'

অক্ষয় বিজনকে কলের ঘরে পৌঁছে এসে সুজনকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার আজ হোলো কি সুজন? একেবারে গম্ভীর যে! ছেলেটি অকালপক্ক, একটা বিয়ে দিতে বল ওর বাবাকে। একে ঘি-দুধ খাওয়া শরীর, তার উপর বিগড়োচ্ছে। যত সব ছোট লোকদের নম্বর বাড়ছে, আরো যারা সমাজের মেরুদণ্ড, যাদের জোরে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তারা বিয়ে থা' করছে না। খাবার ভাবনা নেই যাদের তাদের বিশ বছরেই বেঁধে ফেলা ভাল।'

সুজন ধীরে ধীরে বল্লে, 'ওর বোধ হয় ইচ্ছে নেই।'

'হাঁ হাঁ ও-সব জানি। রাশিয়ার খবর পড়ে ছোকরার মাথা ঘুরে গেছে। ছোট জাতের মতন পরের বৌ নিয়ে টানাটানি ছোকরা বয়সে মন্দ লাগে না যখন নিজের স্ত্রী নেই, তার পর আঁতে ঘা পড়লেই বাবাজিদের মত যায় উলটে। ও-সবের অর্থ ই হোলো, দেরি সইছে না।'

'আমি ওকে জানি।'

'তুমি ওকেই জান, মানুষের সাধারণ স্বভাব জান না! যুবা বয়সে কামটাই পাৎলা হয়ে যৌন সম্বন্ধে সাম্যবাদের আকার নেয়— তেমাদের ফ্রয়েড ঠিকই বলে, খবরের কাগজে পড়েছি।'

বিজন ঘরে এসে প্রশ্ন করলে, 'ফ্রয়েড কি বলে অক্ষয়বাবু?'

এই বিবাহের কথাই হচ্ছিল। একটা বিবাহাদি দাও দাদাটির, ওর তর সইছে না, রোজ যে কোথায় সকাল সন্ধ্যায় বেরোন।'

'কি ননসেন্স বকছ, অক্ষয়!'

বিজন তীব্র স্বরে উত্তর দিলে, 'ননসেন্স কেন? তুমি বিবাহ করতেই জন্মেছ। তুমি— আর তোমার গুরুদেব।'

'কি হে সুজন গুরু কেড়েছ নাকি? আমি ভাবি অন্য কিছু বা! তাই বলি, রোজ সন্ধ্যের ঝোঁকে সুজন কেন একলা বেড়াতে যায়! গুরু, না, আমাদের এক মিউনিসিপাল কমিশনার সাহেব যা করতেন, গুরুর দোহাই দিয়ে অস্থানে কু-স্থানে গমন? একদিন কমিশনার-গিন্নী বলেন, তিনিও মন্ত্র নেবেন, শেষে একটা ভেড়ুয়াকে গুরু সাজিয়ে আচ্ছা করে খাওয়া দাওয়া করা গেল সকলে মিলে!'

দীপা এল, সঙ্গে ঝি, একথালা খাবার নিয়ে।

'নাও হে নাও, তোমরা খাও, বন্দোবস্তটা দেখলে, চা-এর নাম গন্ধ নেই! বাড়ির গিন্নী না থাকলে যা হয়! যাও····জলদি চা আনতে বল।' চা এল। সুজন হাত নেড়ে অসম্মতি জানালে, বিজনকে কিছু খেতেই হোলো। অক্ষয় মোটর বা'র করে ঘরে এল।

'তৈরি? কেন যাবে না সুজন, শুনি?'

'আমি ততক্ষণ দীপার সঙ্গে একটু গল্প করি।'

'উচ্ছন্ন দিয়ো না মেয়েটাকে আদর করে··· ওহো, বুঝেছি, কেন আজ বাবু এত গম্ভীর। বাধা পড়েছে আজ। বিজন এসেছে, আমিও সকাল সকাল ফিরেছি। একদিন নিয়েই চল না তার কাছে— হুলো বাড়াব না বলছি, কথা দিচ্ছি। তোমরা সব আধুনিক, আমরা একটু সেকেলে, ভাষাজ্ঞান নেই, কিন্তু আমরা ছিনিয়ে নিই না। একলা একলাই, বেশ বাবা! এর নাম সাধারণতন্ত্র, দেখছ ত বিজন, তোমার দাদার কাণ্ডটা!'

সুজন দীপাকে বাইরে নিয়ে ঝির হাতে সমর্পণ করলে। খানিক পরে অক্ষয় বিজনকে নিয়ে মোটরে বেরিয়ে পড়ল।

সুজনের সর্বাঙ্গে শ্রান্তি আশ্রয় করেছে, কত যুগ যুগান্তরের অবসাদ, নির্মোকমুক্তির পর সরীসৃপের ক্লান্তি, আবেগশূন্যতা। মুখে তার হাসি লেগে থাকে, বালবিধবার মুখে দেবরের বরানুগমনের ক্ষণের মতন। অন্ধকারে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর চঞ্চলতা আসে। সুজন বেরিয়ে পরে। রাস্তার মোড়ে এসে দেখে ভিড়, অতিক্রম করে ঘুরতে ঘুরতে রমলা দেবীর বাড়ি সে কড়া নাড়লে। অক্ষয়ের মতনই সব লোক— তবু, তবু কি আবেগ থাকবে না? রমলা দেবী নিজে দরজা খুলে দিলেন।

'তুমি? কেন এলে?'

'অমনি।'

'বিজন?'

'অক্ষয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে।'

'তাই বুঝি এলে?'

'কেন, আসি না অন্যদিন?'

রমাদেবী হাসলেন, বললেন, 'তোমাকে বোধ হয় তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

'বিজন আসবে শীঘ্রই।'

'একটা প্রশ্ন করব উত্তর দেবে? ওকে আনলে কেন?'

সুজনের উত্তর না পাওয়াতে রমলা দেবী বল্লেন, 'জানি আনিয়েছ।'

'তোমার একলা ভাল লাগছিল না।'

'তা নয়। তোমার ভাল লাগছিল না। সত্য নয়?'

'আমার? আমার ভাল লাগা না লাগাতে কী আসে যায়?'

'যায় গো যায় বাবু।'

'না যায় না— একেবারে যায় না, জানি না, কেন বলছ!'

'যায়।'

'আমারও বয়স হচ্ছে।' রমলা দেবী সুজনের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বল্লেন, 'আমাকে মাপ কর ভাই।'

'মাপ আবার কি। তোমার স্বভাব।'

'অপমান কোরো না, কোরো না, তোমার হাতে ধরে বলছি। তুমি বোঝ না আমার কি হয়! দেখো তখন, আমি আর কাউকে ঠকাব না। আমি ত তোমাকে বলেছি।'

'তুমি আমাকে বলেছ যে তুমি আমাকে চাও না।'

রমলা দেবী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। কূপের মধ্য থেকে যেন স্বর নির্গত হোলো, 'কী ভাবে ক্ষতিপূরণ চাও?'

'কিছুই চাই না।'

'ফল মানুষের হাতে নয়।'

'সেই ভেবে কাজ করা উচিত। সেটাও হাতের বাইরে বোধ হয়।'

রমলা দেবী হঠাৎ উঠে দুপ্‌ দুপ্‌ করে নেমে গেলেন, আবার এসে ঘরে বেড়াতে লাগলেন।

'কে?'

'কেউ নয়। কিন্তু কে কড়া নাড়ল মনে হোলো না তোমার?'

রমলা দেবীর শঙ্কিত কণ্ঠের স্বরে সুজনের চমক ভাঙ্গল। ছুটে এসে রমা দেবী সুজনের হাত দুটি ধরে বল্লেন, 'অ ভাই, বড্ড কড়া নাড়ে যে।'

রমলা দেবী সুস্থ হবার পর সুজন তাঁকে বল্লে, 'তিনি এলেই চলে যাব। কোনো বাধা দেব না, কেন দেব? কোনো অধিকার নেই। বিজন....'

'ওকে পাঠিয়ে দাও। ওর সামনে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। ওকে আমি বাড়িতে রাখতে পর্যন্ত পারছি না। কোলকাতা যাক চলে।'

'রাত্রে এখানে কে শোয়?'

'মহারাজিন। না, না, তোমাকে আসতে হবে না, তুমি এস না।'

মহারাজিনের আওয়াজ শোনা যেতে সুজন নিচে নেমে দরজা খুলে দিলে। সেইখান থেকেই চেঁচিয়ে বল্লে, 'এখন আমি যাচ্ছি। বিজন ফিরবে এখনই।'

মহারাজিন ভেতরের ছিটকানি বন্ধ করে দিলে। সুজনের দেহ ও মন হঠাৎ হাল্‌কা হয়।

পূজোর বাজার বসেছে। মোড়ের দোকানে পুতুল রয়েছে, এইটাই বোধ হয় দীপা চেয়েছিল।

'দীপা তোমার জন্য পুতুল এনেছি।' ঘরে কেউ নেই দেখে দীপা ছুটে সুজনের কাছে এল। পুতুল দেখে তার চোখের তারা দুটো চক্ চক্ করে উঠে। বড় পুতুল, তাকে কোমরে বসিয়ে দীপা আদর করতে লাগল— টেবিলে খাবার থালা তখনও পড়ে আছে, দীপার চোখ মধ্যে মধ্যে পড়ে তার ওপর।

'দুষ্টু মেয়ে, এইমাত্র দুধ খেলি, আবার খিদে! নিশ্চয় দুষ্টু খিদে, আবার খেলে অসুখ করবে।'

'না, করবে না দীপা! যার ঘরে ছিল সে খাওয়ায় নি। ছোটদের একটু একটু করে ঘন ঘন খাওয়াতে হয়। সেই কখন ওর দাদাবাবু আসবেন।'

'দাদাবাবু কে!'

'তোমার বাবা।'

'বাবা সেই আমি ঘুমোলে ফিরবে।'

'তাই ত বলছি একটু খাওয়াও।'

'না, বাজারের কচুরি খায় না।'

'না, গো না, তেলে ভাজা নয়, উৎকৃষ্ট বিবেকানন্দ ঘি-এ ভাজা। কোনো অসুখ করবে না।'

দীপা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছোট্ট হাতটি বাড়ায়, সুজন একটা কচুরি তার হাতে গুঁজে দেয়। দীপা পুতুলকে বলে, 'নাও খাও, হাড় জ্বালিও না।'

'অ দীপা তোমার মেয়ে খুব লক্ষী— তার মা না খেলে খাবে না— নাও নাও— মেয়েদের জন্য কত সইতেই না হয় মাদের! সেই সকাল থেকে অন্য ছেলেমেয়ের পাট করছ, বিকেলে সাজালে গোছালে— নিজের দিকে দেখছ না। শরীরে কালি মেড়ে দেবে। তখন নতুন বাবুটি বলবেন— ওমা, কাদের মেয়ে গো, এত রোগা, এত কালো দেখতে!'

দীপা জিজ্ঞাসা করে, 'বাবু কবে যাবে?'

'শীগ্‌গির, তুমি খাও।'

'আর পারি না বাপু', বলে দীপা কচুরি নিয়ে পুতুলের পা ধরে ছুটে পালায়। ঝি এসে শুধোয়, 'বাবুরা, কখন খাবেন?'

'বাবুরা যখন আসবেন। খুকিকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িও।'

ঝি মুখ বিকৃত করে চলে যায়, সুজন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

অন্ধকারের ওজন আছে, তার ভার পড়ে সুজনের মনে। অন্ধকার ঘন হয় চাদরের অভ্যন্তরে···অত অন্ধও মেয়েরা হতে পারে! অন্ধ নয়, কেবল একজনের জন্য চোখ দুটো খোলা, বড়, কালো, চকচকে, সে আসে না বলে কাতর হয়, সে আসছে বলে ভয়ার্ত হয়, তার প্রতীক্ষায় তারা দুটি ঠিকরে পরে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভোরের বেলা আর্দ্র হয় পালকগুলো। সুজনের গায়ে চাদর ভারী ঠেকে, হাঁটু দুটি উঁচু হয়ে থাকে, আভরণ নয়, আবরণ মাত্র। হাঁপ লাগে, দম বন্ধ হয় আগতপ্রায়ের আশঙ্কায়। খাটের তক্তা কনুইএর হাড়ে লাগে। নিষ্ঠুর মনে হয়। কবেকার আদিম ছুতোর মিস্ত্রী হাতুড়ে যন্ত্র দিয়ে শালকাঠ চিরে, জোড়া দিয়ে খাট তৈরি করেছে, দেহবিজ্ঞান তার জানা ছিল না। মানুষের দেহের আরাম বেড়েছে, খাট সেই পুরাতন, তাই নিষ্ঠুর মনে হয়। বিজনের প্রকৃতি তক্তার মতন সোজা কাটা, সমাজের কোন বেড়েছে, তাই লাগে, নিষ্ঠুর হচ্ছে সে। রমলা দেবীর এক দৃষ্টি, দু'পাশের জগৎ লুপ্ত। অর্জুন কেবল চোখই দেখেছিলেন অন্যেরা দেখলে পাখি, গাছপালা আরো কত কি! তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এল। সর্বনাশ করে এই রকমের একচোখামি। উদ্দেশ্যসাধনের ব্রতীরা সমাজের ক্ষতি করে, অন্যকে অসুখী করে, নিজেরা অসুখী হয়। অথচ এই রমাদিরই চোখ ছিল কত খোলা। খগেনবাবু ঠুলি পরিয়েছেন তাঁর চোখে। এত একাগ্রতা অন্ধত্বের সামিল। বিজন ও রমলা দেবী দুজনেই রূঢ়, তাদের গণ্ডগুলো শক্ত! কেন করবে না ঠাট্টা সে! বোঝাতে যাবে কেন লোককে যে সে কেন ঠাট্টা করছে! যে বাতিল পড়ল তার অন্য উপায় থাকতে পারে? এ ত নিজকে সরিয়ে নেওয়ার ফল নয়, এ যে নির্বাসিতের আত্মসম্মান।

রাত সাড়ে ন'টায় অক্ষয় বিজনকে নিয়ে বাড়ি ফিরল! খাওয়া দাওয়া সমাপ্ত হোলো সাড়ে দশটায়। কথাবার্তা বিশেষ জমল না। সুজনের চোখে ক্লান্তির আমেজ, বিজনের মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য, অক্ষয়ের আতিথ্যে উচ্ছ্বাসের হ্রাস-প্রাপ্তি, এই তিনের সহযোগে কথাবার্তা অচল হয়। অক্ষয় দু একবার রোঁদে যাবার উল্লেখ করলে— সে বিজনকে দেখিয়ে এনেছে, ভারতবাসীর কর্মদক্ষতায় দেউলিয়া হবার জলন্ত দৃষ্টান্ত সেই রাস্তার মধ্যেকার লালবাতিটাকে— কিন্তু সুজনের ক্ষরদৃষ্টিতে তার সংকল্প গেল নিবে। বৈঠকখানাতেই বিজনের শোবার ব্যবস্থা হোলো।

বিজন সুজনের খাটে শুতে যাচ্ছিল, সুজন সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'ওখানে নয়, ক্যাম্প খাটে শোও, না হলে আমারও ঘুম হবে না, তোমারও হবে না।' বিজন ক্যাম্পখাটে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর তখনও হয়নি, কৈশোর বয়ঃসন্ধির নিথরতা নয়, রমলা দেবীর মতন

যৌবনাতিক্রমের আত্মহত্যার মতন। বিজন পাশ ফিরে শুল, তারপর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত গতি গেল ভেঙে। বোধ হয় বিজন জেগেছে। সুজন বিজনের পাশে এসে দাঁড়াল........অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে।

বিজন স্পষ্ট কণ্ঠেই প্রশ্ন করলে, 'তার করার কি প্রয়োজন ছিল?'

'কারণ বলেছি।'

'অন্য কারণ ছিল?'

'ছিল।'

'বলবে?'

'রমাদি।'

'তিনি চেয়েছিলেন আমি আসি? মনে হয় না।'

'না, আমিই ডেকেছিলাম, তাঁর জন্য।'

'তাঁর প্রয়োজন? ওঃ! তাঁর কখনও কাউকে প্রয়োজন ছিল না, এখনও নেই। তাঁর কাছে আমরা যেন— যেন আমরা সব বাজে।'

'তাই ঠিক অনেকটাই। তবু মনে হয়েছিল তুমি এলে ভাল হয়। হয়ত আমারই ভুল, তবু কেমন যেন মনে হল… ....নিয়ে এলাম এখানে, কিন্তু কৈ? কিছুই হোলো না।'

'কি আশা করেছিলে?'

সুজনের মুখ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে বিজন মাথাটা বালিশ থেকে তুলে হাতের ওপর রেখে বারে বারে প্রশ্ন করলে, 'একটা কথা বলবে? আমি তোমার চেয়ে ছোট, বয়সে, বুদ্ধিতে, আরো কত কী-তে। তোমার বুঝি রমাদিকে সুখী করতে খুব ইচ্ছে হয়, মানে, ভাল লাগে বুঝি?....ঠিক বল।'

'না।'

'সত্যি বল।'

'ওজন করে দেখি নি।'

'বল না।'

'বিচার করা যায় কি?'

বিজন বিছানায় উঠে বসে বল্লে, 'সুজনদা, আমার সঙ্গে আজই কোলকাতা চল।'

'কি যে বলিস। একলা এখন, খগেনবাবু এলে যাব— তাঁর কাছে সঁপে দিয়ে।'

কথাবার্তায় কমা, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদ টানতে টানতে সকাল হল। অক্ষয় আজ ভোরবেলা উঠে নিজ হাতে চা ও টোস্ট করে এনেছে। চা খাবার সময়

বিজন কোলকাতার ট্রেনের সময় জানতে চাইলে। অক্ষয়ের নিতান্ত প্রগল্ভ অনুরোধ সত্ত্বেও যখন বিজনের কাশী পরিত্যাগের সংকল্প গেল না তখন সুজন সন্ধ্যার গাড়িতে যাবার পরামর্শ দিলে।

'হাঁ, হাঁ, নেহাৎ তাই, সেই ভাল, কেমন? শীগ্‌গির বাড়ি ফিরছি। সুজন খুকিকে পুতুল কিনে দিয়েছ বুঝি? সে এখন পুতুলের বর চাইছে···হা, হা, হা··· আদর দিয়ে মেয়েটার মাথা খাচ্ছ! বড় কঠিন স্থান এই সংসারটা!'

বিজন জিজ্ঞাসা করলে, 'কঠিন, না কোমল?'

'ভেতরে কঠিন, বাইরে কোমল, বাইরে কঠিন ভেতরে কোমল হা হা হা।'

অক্ষয় পোশাক পরে মোটরে বেরুল।

'বিজন, একবার দেখা করবে না?'

'রমাদির সঙ্গে? নাঃ, আর সিঁড়ি ভাঙতে পারি না।'

'মনের মতন বাড়ি পাওয়া যায় না। কাল আবার খুঁজব।'

'ও-ঘরে ওঁর চলবে না। সিঁড়িটা নিচু কোরো। দোতলা বাড়িতে মেয়েদের খুব অসুবিধা হয় দেখছি। শুনেছি বোম্বাই সহরের 'চাউল' গুলোয় মেয়েদের জল তুলতে হয় নিচের রাস্তা থেকে পাঁচতলায়। এযুগে ও-ঘর খাপ খায় না।'

'বাংলো বাড়ির অন্যান্য অসুবিধাও আছে। ওঁকে জল তুলতে হবে না।'

'তবু, একতলা বাড়ি দেখ, রাস্তা থেকে ঘর, ঘর থেকে রাস্তায় যাতায়াত করা যায় যেখানে সহজে। ঘর সম্বন্ধে আমার ধারণা ভিন্ন রকমের। ঘর-বাড়ি মানে বাইরেরই একটুকরো। ঝড় বৃষ্টির জন্য আচ্ছাদন চাই, আবরণ নয়। আবরণ ভেদ করে আলো আসে না, হাওয়া ঢোকে না, লোকজন অতিথি-বন্ধু কেউ আসতে পারে না। তোমরা এখনও গুহার মধ্যে আছ, উপরন্তু বড় বড় ফাটক, আবার মোটা মোটা তালা লাগানো, সামনে গুর্খা পাহারা, যেন এক একটি কেল্লা। সেইজন্য সংসারও হয়েছে জেলখানা, পিঁজরাপোল, বন্দীর জন্য, খোঁড়া রুগ্ন অসুস্থ সম্বন্ধগুলোর জন্য। হালকা বাড়ি হবে, ভূমিকম্পে ভাঙবে না, কথায় কথায় লোকের সর্দি লাগবে না, রং ঘোলাটে হবে না, চামড়া কোঁচকাবে না। রমাদির সংসার নেই, অমন জাপানী বাড়িই ভাল। সংসার তাঁর থাকলে অন্য বাড়ি বন্দোবস্ত করতাম। বাড়ির সঙ্গে সমাজের নিকট সম্বন্ধ সুজনদা, আমি অনেক ভেবেছি।'

'তাঁর বাড়ি তাঁর অভিরুচিতেই হবে ত! চল না, বুঝিয়ে বলবে। ওঁর নিজের সুখ সম্বন্ধে আজকাল ওঁর মনে কোনো ভাবনাই ওঠে না। তা ছাড়া, কেই বা যাচ্ছে সেখানে দুদিন পরে! সে যা হয় হবে। চল একবার।'

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। পথে সুজন খগেনবাবুর মাসীমার কথা তুললে,

'বিজন যাবে তাঁকে দেখতে? অদ্ভুত প্রকৃতির মহিলা। পুরাতন সংস্কারের ওপর সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত। স্নেহের দাবি কত কম দেখলে বুঝবে লয়্যালটি কাকে বলে, আর দেখবে, অধিকারবিস্তারে ব্যগ্র না হয়েও কতটা ভালবাসা যায়। পুরোনো লোক।'

বিজন মুচকে হেসে মন্তব্য করলে, 'পূর্বেকার লোক সম্বন্ধে তোমার ধারণা নিতান্তই রোম্যান্টিক।'

'হতে পারে। কিন্তু একটা কিছু ছিল, যাতে তারা শান্তি পেত, এখন সেটা নেই। রমাদির স্বভাবই দেখ না কেন।'

'কোনো কালে কোথাও শান্তি ছিল না, সব ইতিহাসটাই দ্বন্দ্ব, বিরোধ, সেটা ক্রমেই ভীষণ হচ্ছে, তাই পরে লোকে ভাবে, ছিল বুঝি বা। খগেনবাবুকে তুমি বোধ হয় খুব আধুনিক ভাব, কিন্তু নিতান্ত মামুলি। ওঁর ঝাঁজ আক্রোশ সবই ব্যক্তিগত, খাপ খাওয়াতে পারছেন না বলে আবদার করছেন কচি ছেলের মতন।'

'আর ওঁর?'

'ওঁর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না।'

রমলা দেবীর বাড়ি যখন তারা পৌঁছল তখন বেলা ন'টা। স্নানাদি সম্পন্ন করে তিনি ডেক চেয়ারে বসেছিলেন, কোলের ওপর দুটি হাত রেখে। অভ্যর্থনা সূচিত হোলো চোখের বিস্ফারণে। ক্ষমাপ্রার্থীর সুরে সুজন বল্লে, 'কষ্ট হচ্ছে বাড়িটায়। কোনো বারান্দা নেই, সিঁড়িটাও ভীষণ উঁচু।'

'তা হোক। আমার জন্য আর ঘোরাঘুরি কোরো না। বিজন এসেছে।'

'আমি আজই চলে যাচ্ছি।'

'আজই? কেন? কাজ আছে বুঝি?'

'আছে।'

'এখানে যে কাজে এসেছিলে সেটি বুঝি হোলো না।'

'কাজটাজ ছিলও না, থাকলেও পারতাম না। সুজনদা ডাকলে, ভাবলাম দেখেই আসি। বাবাঃ।'

'কাল যেও।'

'এখানে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে ধর্মের চাপে নয়। কাশীকে মিছিমিছি লোকে দোষ দেয়। তোমরাই যেন কী হয়েছ! একটা কুলি মরছিল, ডাক্তার নিয়ে বস্তিতে ঢুকছি, অন্ধকার নোংরা গলি, অন্য একটা ঘরের কেরোসিনের ডিবে থেকে ঝুলমাখানো আলো পড়েছে রাস্তায়, মোড়ের মাথা থেকে কান খাড়া হয়ে উঠল, এই বুঝি শুনি কান্না, কিছুই শুনতে পেলাম না, ভয়ে কান মাথা বন্ধ হয়ে

গেল। এ যেন তাই— তার চেয়ে বুক ফাটিয়ে চেঁচানো ভাল। তোমরা, তোমরা যেন একটা কেন্দ্রের চারধারে ঘুরছ, কেউ এগুচ্ছ না ·· চর্কির মতন।'

রমলা দেবী অন্য ঘরে গেলেন। সুজন চুপ করে বসে রয়েছে দেখে বিজন জিজ্ঞাসা করলে দুপুরের ট্রেন আছে কিনা। বিকেলে আছে শুনে বিজন বাড়ি ফিরতে চাইলে। রমলা দেবী ঘরে এলেন এক গেলাস শরবৎ নিয়ে। বিজন না খেয়েই বাড়ি ফিরল।

অক্ষয় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এক সঙ্গে খেতে বসল। খাবার পর অক্ষয় বিজনকে বিশ্রাম করতে বলে এক হাঁড়ি খাবার নিয়ে এল, অন্য একটা বিস্কুটের টিনে লুচি, মাছ ভাজা, আলুসেদ্ধ, মরিচ পুরে দিতে আর্দালিকে হুকুম করলে। সুজন বিজনের সুটকেস গোছাতে গেল, কিন্তু প্রয়োজন হোলো না। বিজন একটু বিশ্রাম করতে চাইলে, তাই অক্ষয় দরজা ভেজিয়ে ওপরে গেল। দীপা দরজা ঠেলে উঁকি দিচ্ছে দেখে সুজন বাইরে এল····'বাবু বুঝি আজ চলে যাবে? তা হলে, আমার খুকির জন্য····।' 'নিশ্চয়ই, সে বিকেলে হবে····এখন যাও।' দুজনের চুপিচুপি কথাবার্তা হল। দীপা যাবার পর সুজন দরজায় ছিট্‌কিনি দিলে।

'সুজনদা····আমি ও-সব বুঝি না····তবু বলছি····তুমি চল····কিছু মনে কোরো না····তোমার পোষাবে না, সে তুমি পারবে না।'

'পরে যাব····উনি আসুন।'

'খগেনবাবু কবে আসবেন?'

'শীগ্‌গিরই।'

'রমাদি বুঝি তাঁকে খুব····'

'হুঁ।'

'তা বাসুন গে। তোমার আমার কী বল না। অ্যাঁ? আর খগেনবাবু?'

'জানি না, তবে তাই মনে হয়।'

'তবে ভালই হোলো। এলেই চলে এস··· আমি অপেক্ষা করব। ওঁদের যা হয় হোকগে সুজনদা····তুমি বাঁচ আগে····সেই স্বার্থত্যাগই করছ, তবে একজনের জন্য কেন? তোমাকে বলছি····আমি তোমার ছোট····ওদের হিস্ট্রি নেই····ঠাট্টা করো না, কিন্তু সত্যিই তাই ·· ওঁদেরকেও সেই আসতে হবে কোলকাতায়, সকলের কাছে। পালিয়ে বাঁচবেন কতদিন? সুখী হবেন না ওঁরা, সেই খেয়োখেয়ি হবে··· প্রপার্টি-সেন্স যাবে না ওঁদের। আসবে ত শীগ্‌গির? কথা দাও।'

সুজনের মুখে ম্লান হাসি ফুটল। তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে শান্ত গম্ভীর ও সুস্পষ্ট কণ্ঠে বিজন বললে, 'আচ্ছা যখন পার এস। যদি না আস····

আমি····তোমার····ভাই নই বলে দিলাম····'

বিকেলে চা খেয়ে অক্ষয়ের মোটরে সুজন বিজন স্টেশনে গেল। ফিরতি বেলায় অক্ষয় সুজনকে বাড়ি নামিয়ে দিয়ে কাজে বেরুল। দীপা ছুটে এল····সুজন লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল····'আজ পারছি না মা, কাল এনে দেব····এখন যাও।'

আট

খগেনবাবু কাশী ফিরেছেন। রং তামার মতন, দেহ শীর্ণ, ঠোঁট চাপা, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, বেশভূষার পারিপাট্য নেই, একটু ঢ্যাঙাই মনে হয়, মুখ ও হাত যেন ঝলসে গিয়েছে, চুল উস্‌কো খুস্‌কো, যেখানটায় টেরি কাটতেন সেখানে টাক পড়েছে, অঙ্গভঙ্গির ক্ষিপ্রতা কমেছে। কপালে তিনটি সরল সমান্তরাল রেখা সংযমের রাজদণ্ডরূপে দাঁড়িয়ে থাকে, তারই নিচে ক্ষণে ক্ষণে ভুরু দুটি গুটিয়ে যায়। কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এসেছে। মুকুন্দ খগেনবাবুকে দেখে সহজ হতে পারে না।

'চা করব?'

'না।'

'খাবার?'

'না।'

'এধারে মেম সাহেব এসে হাজির।'

খগেনবাবু চোখ তুলে চান। মুকুন্দ বলে, 'আমাদের কোলকাতার মেমসাহেব ····সঙ্গে সেই ছোকরা বাবুটি····মাসীমার বাড়ি প্রায় যান কিনা তাই চোখে পড়ে, নইলে আমার কী! কোথায় উঠেছেন, কবে এলেন, কবে যাবেন তাও জানি না···· আমার ওঁদের কথায় দরকার কী! মাসীমার বাড়ি নিশ্চয় বাবুটির সঙ্গে দেখা হবে··তখন····'

'তেতলার ঘর সাফ্ করা হয়েছে?'

'ঝাড় পোঁছ করে, তিন বালতি জল নিচে থেকে ঠেলে, তুলে, ঢেলে, ধুলো ঝেড়ে রেখেছি। কি ধুলো রে বাবা! বলে পশ্চিমের ধুলো! একটা এক্কা যা ধুলো ছড়ায় তা আমাদের কোলকাতায় হাজার হাওয়া গাড়িতে পারবে না। আর মাছি!···· ঠাকরুণ বড় ব্যস্ত হয়েছেন, যাবেন না? সেখানেই যোগাড় হবে'খন।'

হঠাৎ একটা ব্যথার ঝলক ওঠে মুখের পেশীতে। মুকুন্দ চলে গেল। খগেনবাবু চেয়ার ছেড়ে জানালার পাশে এলেন। পাশের বাড়ির ভাঙা জানালা চোখে পড়ে। তেতলার ঘরে গেলেন, ঘর পরিচ্ছন্ন, কিন্তু হাঁপ ধরল, ছাতে এসে পাঁচিলে

হাত রেখে দাঁড়ালেন। পড়ন্ত রোদে হেমন্তের আমেজ লেগেছে, বর্ণ তার উজ্জ্বল, মসৃণ তার ত্বক···রেশমের পরশ···না, না, না···বিপরীতটাই সাধনা···চুণারের কেল্লা নদীর বুক থেকে উঠেছে, রুক্ষ কিন্তু ঋজু···পশ্চিমে, বিন্ধ্যপর্বতমালা নিদ্রিত তিমিঙ্গিলের মতন···চুণারে একদিন মন বড়ই ব্যাকুল হয়··কাছেই 'বিরহী'···রামচন্দ্র গঙ্গা পার হলেন কাঁদতে কেঁদেতে, আজও তার ধ্বনিব্যঞ্জনা শোনা যায় কাজরীতে··ঝুলনের উৎসব চলেলে···গ্রামের যুবক-যুবতীরা দোলায় দোলে··ঝুলন ঝুলাতে এ মধুরাতে, সমবেত মণ্ডলী গান গায় পিলু, বারোঁয়া, শাউনী, কাহারোয়ার, হালকা ছন্দের উন্মাদনা···যৌবনমদে মত্তা···সেদিনকার মন হল ময়ূর, অসংযত নৃত্যশীল··· ।

চলে এলেন ঝুঁসিতে, গুহার মধ্যে সন্ন্যাসী, ওপারে কেল্লা, তবু সঙ্গমের ঝুঁসি ··· সরস্বতী কি সাবিত্রী ?···চলুন অযোধ্যা, সরযূ-তীরের অযোধ্যা···লক্ষ্ণৌ-এর কৈসারবাগ···ভোগের আগার···হরিদ্বার···তবু হরকি পিয়ারি···দূরে বরফ, তারই কোলে নরেন্দ্রনগর···লছমনঝোলা···গোমুখী···গঙ্গার স্রোত হিমালয় গুটিয়ে নিলে ··· কেন আবার কাশী আসা ?···হিন্দী মীরাবাঈ···সায়গাল···পাহাড়ী সান্যাল··· কি দেবী···নাম পড়া যায় না··বিজলী বাতির বিজ্ঞাপন নেবে জ্বলে ·টসের চা পান করুন···মুর্শিদাবাদের সিল্ক শাড়ি পড়েছে একটা বোকা মেয়ে···বেনারসের জর্দা···আত্মতাঞ্জন···মীরা স্নো···ডোঙ্গরের বালামৃত মা একটা মোটা ছেলেকে খাওয়াচ্ছে···ওটিন ক্রীম মেখে একটি মেয়ে আর্শিতে মুখ দেখছে··কেন এল সুজন ? ওঁ শান্তি ! স্বর্গ হতে শান্তি দেবী অবতীর্ণা হন মুখে ওটিন মেখে···ফ্যাল-ফ্যালে চোখ···কাজল মাখা চোখ কার ? রাস্তার ওপর মিঠাইওয়ালা ছেলে ঠেঙায়···মাসীমার হাতে কখনও মার খান নি···মাসীমা কেবল আদরই করত, তাই সাবিত্রীর পছন্দ হল না··· গেল মরে···। খগেনবাবু চিলকোঠায় ফিরলেন।

সন্ধ্যা এল, উপনয়নের সময় পুরোহিত বলে দেন ব্রহ্মচারীকে, যখন গায়ের রোঁয়া দেখা যাবে না তখনই সন্ধ্যাকৃত্যের সময়। খগেনবাবু আসন এনে জামা খুলে পদ্মাসনে বসলেন···রাজহংসরূপী আত্মার ধ্যান, দূরে সানাই বেজে উঠল···ওঁকারে গমক, মীড় সবই আছে···কে কবে একসঙ্গে গান শুনতে চেয়েছিল···গানের আসরে দেখা···তারপর সাবিত্রীর বন্ধুরূপে··ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন সাবিত্রীকে যজ্ঞসভায় আনতে সস্ত্রীক ধর্মাচরণের জন্য ; সাবিত্রী তখন গৃহকর্মে ব্যাপৃতা, ব্রহ্মা গেলেন চটে, ইন্দ্রকে হুকুম দিলেন অন্য একটি মেয়ে যোগাড় করতে, ইন্দ্র ধরে আনলেন এক গোপকন্যাকে, ব্রহ্মা রাগের বশে তাকেই বিবাহ করলেন, নাম তার গায়ত্রী। সন্ধ্যার গায়ত্রীরূপের ধারণা আসছে না···সাবিত্রীর বদলে গায়ত্রী···দুই বোন···দুই বন্ধু—শত্রু, মর্মান্তিক শত্রু— অথচ বুঝলে না বেচারি···

মাসীমাদের সময় ওসব ছিল না? কে জানে! মাসীমা অজাতশত্রু। হঠাৎ খগেনবাবু উঠে পড়ে মাসীমার বাড়ি চললেন। আজ আদর খাওয়া, কথা কওয়ার পালা....মাসীমাকে দেখতে ইচ্ছে হয়.... স্বজন থাকলে সুবিধাই হয়....ভদ্র ছেলে, শান্ত স্বভাবের....ভাল লাগে!

ঘরে প্রবেশ করে খগেনবাবু দেখলেন মাসীমা তখনও ফেরেন নি। মাসীমার বিছানায় শুতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু অভ্যাসের বশে কোনের মাদুর পেতে শুয়ে পড়লেন। অন্য কোনে রেড়ির তেলের প্রদীপ জলছে, পরিচ্ছন্ন সল্‌তে। সেই ছেলেবেলায় পড়বার ঘরে চোখ খারাপ হওয়ার ভয়ে মাসীমা প্রদীপ দিতেন, তার সামনে ঢুলে ঢুলে পড়া, ঘুম আসছে, মশা কামড়াচ্ছে, ঘাম ঝরছে, কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না, কেবল নিরর্থক আবৃত্তি, মন্ত্রপাঠের মতন। পড়তে পড়তে হঠাৎ কত আজে-বাজে কথা মনে আসত— সহপাঠীদের অত্যাচার, একটা ছেলেকে ভাল লাগত বড়, মুখটা ছিল কচি কচি, সরস্বতী পূজোর দিন যবের শীষ্ নিয়ে ভাব হয়, ইতিহাস সে সব চেয়ে মুখস্থ করতে পারত। যুবাবয়সের পুস্তকপাঠ বিজলী বাতির নিচে, টেবিলে বসে নয়, বিছানায় শুয়ে, পরীক্ষার পূর্বে গোলদীঘির ধারে ছাত্রের জটলা, কোন্ প্রশ্ন আসবে তারই জল্পনা, পরীক্ষকের প্রিয় প্রশ্নের সন্ধান— অন্য কোন চিন্তা নেই, বুদ্ধির অমন অপমান আর কি হতে পারে! পরীক্ষা পাসের পর পড়া, তারও কোনো সার্থকতা নেই, নেশার উত্তেজনা মাত্র, দেহের অবসাদ, মনের ক্লান্তি। তার চেয়ে ভাল এক টুকরো অভিজ্ঞতা— অখণ্ড তার অস্তিত্ব, জ্ঞান, অনুভব, আশা সকলকে গ্রন্থিত করে একটি তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্নতা। আর ভাল মাঠের মধ্যে রাত্রিবাস, গাছগুলো অন্ধকারের স্তূপাবলি, বৃত্তের যত অন্ধকার পরিধির রেখা ততই সুস্পষ্ট— বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় রচনার মতন। বিচুলির ওপর কম্বল পাতা, ওপরে তারার পার্শিয়ান কার্পেট, ফাঁকে ফাঁকে ঘন আসমানী নীল জমিন। গাছের একটি একটি অবিনীত ডাল আকাশ ও মাটির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। এমন আকাশ এ অঞ্চলের, এমন রাত এ-দেশের, তবু কেন লোকেরা একেশ্বরবাদী হয় না? দুপুরে ধুলো ওড়ে, রাতে হাওয়া চলে না, তখনই তারায় তারায় চুপি চুপি কথাবার্তা হয়, তখনই মাটির মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের মতন উদাসীন; শিশিরভেজা শিউলির মত শুভ্র হয় চিত্ত। কাশীর শব্দ হঠাৎ থেমে যায় ইন্দ্রিয় অর্গলবদ্ধ, আঁখি মুদ্রিত, সম্বিৎ লুপ্তপ্রায়, অন্দর থেকে কিসের উৎসার হয়, ধীরে ধীরে ওপরে ওঠে, সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগে।

ফোয়ারার তেজ কমে আসে, প্রবাহ শান্ত হয়। বিন্ধ্যাচলের বনে হরিণটা

ছুটছিল, হঠাৎ থেমে সন্ন্যাসীর দিকে চাইলে, যেন পাথরের মূর্তি দুটি। কী করুণা সে দৃষ্টিতে। বুদ্ধিমতীর কটাক্ষের চেয়ে মমতাময়ীর চাহনির মূল্য বেশি। বুদ্ধি চাই, কিন্তু তার চেয়ে মন বেশি চায় মমতা। রমলা দেবী এলেন কেন? মমত্ব কি মমতার রূপান্তর? তিনি যেকালে চিঠিগুলো পড়েছেন তখন দুর্বলতা তাঁর কাছে অবিদিত নেই। সে ত এক রকম স্বীকারই। তারপর এক যুগ অতীত হল, দেশভ্রমণ, সাধুসঙ্গ, কৃচ্ছ্রসাধন, ধ্যান ধারণা, শম দম কিছুই বাদ পড়েনি। তাই বোধ হয় একটু লজ্জা আসে। লজ্জাই বা কেন? কেন আবার? আবার কেন? বটতলার নভেলিস্টকে অনুকরণ করেই কি ভগবান মানুষের ভাগ্যবিধাতা?

'কখন এসেছিস বাবা? মাটিতে কেন? বিছানায় উঠে বোস। সন্দেশ আনতে গিয়েই পোড়া দেরি করলাম।'

'তার আর কি হয়েছে। কেমন আছ?'

'আমার আর থাকাথাকি। একটা চিঠি দিতেও পারতে।'

'চিঠি? কি হবে মাসীমা চিঠি দিয়ে, এক দুর্বলতা প্রকাশ করা ছাড়া? তবু দিলে হত— লজ্জা কি তোমার কাছে? এখান ওখান ঘুরছিলাম, সময় পাইনি। তবু দিলে হত তোমাকে, মনে হয়।'

'দুর্বলতা। কতদিন থাকবে এবার?'

'দেখি। কিছুই ঠিক নেই। মানুষের হাত আর কতটুকু?'

'তা বৈ কি। ইচ্ছে হয় থেকো, না হয় আবার বেরিয়ে পোড়ো।'

'মাসীমা, তোমার বুঝি আমাকে ধরে রাখতে ইচ্ছে করে না? মাসীমা, তোমাকে কেন কেউ কখনও বাঁধতে পারলে না?'

'মন চাইলেই বা কি করছি?'

'তোমার কোনো জোর নেই আমার ওপর? কখনও কি জোর ফলাবে না। একবার জোরে বল না?'

'জোর। একদিকের জোরে কি কাজ হয়?'

'আমার দিকে বুঝি নেই কিছু ভাব?'

'জ্বালাস নি। কিছু খাবি?'

'না। রাতে খাই না। মনে আছে মাসীমা, কেমন ধরাধরি করে দুধ খাওয়াতে? এক গেলাস দুধ খেতে কী নাস্তানাবুদই করতাম। সাত দিন দুধ খাব দশ টাকায়।'

'দুধ পেতিস? সাধুরা ত খুব ঘি দুধ খায়।'

'সে মহিষের, আমার কোনো কালে ভয়সা ঘি ভাল লাগে না। একবার তুমি

গাওয়া ঘি বলে চালিয়েছিলে মনে আছে? আমার এখনও গন্ধ লাগে।'

'গাওয়া ঘি মাখানো হাত-রুটি খাবি?'

'না, থাক।'

'কোলকাতা থেকে কারা এসেছেন, তোর আলাপী।'

'তাই নাকি।'

'ছেলেটির নাম সুজন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সুজনকে চিনি বৈকি। সে তোমার সন্ধান পেলে কি করে?'

'মুকুন্দ নিয়ে এসেছিল।'

'আচ্ছা মাসীমা, মুকুন্দটাকে নিয়ে কি করা যায় বল দেখি? কেমনতর যেন হয়ে গিয়েছে, কাজকর্মে মন নেই।'

'কবেই বা ছিল! কেন?'

'যেন, যেন আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাবটা।'

'যার যেমন স্বভাব! কোথায় আর যাবে বল্ এই বয়সে?'

'কত হল? কতদিন চাকরি করছে?'

'তুই তখন ছোট। তোর মা'র সময় ছিল না।'

'মা মারা যাবার পর তুমি যখন আমাকে নিলে?'

'ঐ সময়টা বরাবর, ঠিক মনে নেই।'

'মাসীমা, তোমার তারিখ মনে থাকে না কেন?'

'কিন্তু মোটামুটি ঘটনাগুলো মন থেকে যায় না।'

মাসীমার মন কোথায় উধাও হয়, খগেনবাবুর মন অনুসরণ ক'রে আদিম যুগে পৌছায়, যখন অসভ্য জাতিরা দড়িতে গাঁট দিয়ে গোণে, লাঠিতে দাগ কাটে কেউ বা, ঘন বনের মধ্যে হারিয়ে যাবার ভয়ে গাছের ডাল ভাঙতে ভাঙতে চলে। সেই ছিল বেশ। মেয়েরা এখনও তাই করে, মৃত্যুর স্মৃতি দিয়ে বৎসরের হিসাব করে,... আর কেবল বাঁচে। কর্মঠ পুরুষ সভ্যতা রচনা করলে, দিন গুণে ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড পল অনুপলে ভাগ করে। বিশ্বের কোনো কিছুকে মাপ থেকে মাফ করবে না, আলোর বছর কল্পনা করবে, টাকা, আনা, পাই, কড়া-ক্রান্তি, আবার ক্রোর যোগ দেবে বিয়োগ করবে গুণ করবে, কেবল সংখ্যাই বাড়াচ্ছে, তাই জীবনটা হিসেব করেই ফুরল। আদিম অসভ্য মেয়েরাই শান্ত....তাদের সময় জটপাকান সুতোর গুলি, তাই তাদের স্মৃতি নেই, শান্তি আছে....প্রোটোপ্লাজ্‌ম্। কাল-বিভাগেই রূপ ফোটে, ব্যগ্রতা আসে, প্রাণ ব্যাকুল হয়।

খগেনবাবু ফিরে এসে বল্লেন,— 'মেয়েরা যেন বে-হিসেবিই থাকে।'

'মেয়েরাই বড় হিসেবি হয় রে! নচেৎ সংসার চলে না।'

'না সে ধরনের মেয়ে বলছি না, যারা বিয়ের পরই গিন্নী হয়, আঁচলে চাবির গোছা ঝোলায়। অন্য মেয়ে....'

'মুকুন্দ যাকে মেম সাহেব বলে সে কে রে?'

'ও মুকুন্দ! একটি আস্ত গর্দভ! তুমি ছাড়া আর সকলেই ওর কাছে মেম। তুমিও যদি দু-একটা ইংরেজী বুলি ছাড় তবে তোমাকেও বাদ দেবে না। এবার ভাবছি, তার চেয়ে ওকেই কিছু কিছু ইংরেজী বুকনী শেখাব। তার চেষ্টা ও করেছিল, নিজের যতটা বিদ্যে ছিল তাই দিয়ে।....ত্মাখ মাসীমা, আমি ভেবে দেখলাম... ও না মরলে পারত। তাতে কার কোনো লাভ হল না। থাকলে হয়ত আমি অন্য রকমেরই হতাম। প্রথম প্রথম রাগতাম, এখন ভাবি, সবই সহ্য হয়ে যেত।....কেমন যেন মনে হয়। আমার কী অধিকার আছে সে যা তার থেকে পৃথক, আমার মতন, তাও নয়, আমার আদর্শের মতন হতে বাধ্য করাবার, তুমিই বল? আমি ভাবি, কারুরই অন্যের কাছে চাইবার দাবি নেই।'

'মেয়েরা কিন্তু না চেয়ে থাকতে পারে না, যদিও অবশ্য না চাওয়াটাই উচিত। কেন সেধে দুঃখ আনা?'

'মেয়ে-পুরুষ জানি না মাসীমা, তবে সকলকেই পারতে হবে, নচেৎ বড়ই অশান্তি! চাইতেই যদি হয় ভবিষ্যতের কাছে চাইব। আমি আশ্চর্য হই লোকে দিনের বেলা অধিকার বিস্তারে ব্যগ্র হয়ে রাতে একলা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয় কি করে? মন ছোট হয় না তাদের? মাসীমা তোমার নিশ্চয়ই ও বালাই নেই, ঘুম হয় নিশ্চয়?'

'এই বয়সে ঘুম হয় না।'

'যতটুকু ঘুমোবে ততটুকু গভীর হলেই চলবে। তোমাদের অনিদ্রার কারণ অন্য, পুরাতন কথাগুলো বড় একত্র চেঁচিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, নয়? আমার আজকাল রাতে উঠতে হয় না।'

'বেড়িয়ে বেড়িয়ে আর সিগারেট ছেড়ে দিয়ে তোর শরীর মন্দ নেই। একটু রোগা হয়েছিস।'

'ও সব বাজে কথা। দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ যতটা নিকট ভাবতাম ততটা নয়।'

'না রে না, খুবই নিকট। সম্বন্ধ আছেই আছে।'

'থাকে থাক্। আমি মানি না, মানব না....আচ্ছা আজ আমি যাই।'

'একটু বোস্। দুটো সন্দেশ খা।'

সন্দেশ ও জল খেয়ে খগেনবাবু বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় মুকুন্দ সুজনের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছে নজরে পড়ল।

সুজন নমস্কার করে বল্লে, 'মুকুন্দর কাছে শুনলাম আপনি আজ এসেছেন।'

মাসীমার যদি কিছু দরকার থাকে ভেবে মুকুন্দ বাড়ি এসেছে কৈফিয়ৎ দিলে, কিন্তু খগেনবাবুর ব্যবহারে তার কোনো প্রয়োজন নেই মনে হওয়াতে সে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

'সুজন, মাসীমার সঙ্গে দেখা করবে?'

'না, তেমন কিছু নয়। ওঁর কাছে আপনার খোঁজ নিই কি না, তাই। ভাল আছেন উনি নিশ্চয়। চলুন, আপনার ওখানেই। কোথায় বাসা?'

'কাছেই। কবে এলে?'

'এই দিন কয়েক হল।'

'কেমন আছ সব?'

'এমনই চলছে। আপনি?'

'ভাল। বিজন কি করছে?'

'সে ম্যাচ জিতেছে। চলুন, বলব তার কথা বাড়িতে। একটু বদলেছে।'

'ভাল।'

'অন্য রকমের।'

'কি?'

'রাস্তায় থাক্। রমাদি এখানে।'

কোনো কথা না কয়ে ছাদে এলেন।

'তোমার ঠাণ্ডা লাগবে না? হিম পড়তে শুরু হয়েছে। আমার? আমার আজ কাল সব সহ্য হয়। বিজনের খবর বল।'

'বিজন সোশিয়ালিস্ট হয়েছে?'

'মন্দ কি। একটা থিওরি চাই।'

'ওধারে টেনিসও চলছে।'

'ক্ষতি কি?'

'ও-সব কাজ কি পারবে? মুটে মজুরদের চেনা চাই, তবে ত তাদের দুঃখ বুঝবে, ঘোচাবে, তাদের হয়ে লড়বে।'

'শিখে নেবে।'

আলাপ ঢিলে হয়ে আসছে দেখে সুজন অপ্রস্তুতে পড়ল। খগেনবাবুর মনোভাব সে যেন বুঝতে পারলে না সুজন প্রত্যাশা করেছিল যে ধর্মবিশ্বাসী আশ্রমাভিমুখী হিন্দু খগেন্দ্রর মুখ থেকে শুনবে সোশিয়ালিজমের জড়াবাদের বিপক্ষে কড়া মন্তব্য। কিন্তু খগেনবাবুর নীরবতায় সে একটু নিরাশ হল রমলা দেবীর উপস্থিতি শুনে কুতূহলী হওয়া দূরে থাক, তিলমাত্র চাঞ্চল্য পর্যন্ত তিনি প্রকাশ

করলেন না। দেহের সংযম, না মন থেকে মুছে গিয়েছে? কিন্তু এই মানুষই চিঠিতে ধরা দিয়েছিলেন।

'রমাদিও বলছিলেন ও-সব খেয়াল।'

'খেয়াল হয় ত দুদিনেই যাবে। খেয়াল থেকেই কিন্তু অনেক কাজ শুরু হয়। সকলেই পূর্ণ হয়ে জন্মায় না।'

'তা ঠিক।'

'রমাদির মতন সকলে ত হতে পারে না। আপনার স্বভাব কিন্তু ভিন্ন মনে হয়। আপনি সর্বদাই চলেছেন।'

'বলা শক্ত।'

'ভিন্ন না হলে দেশভ্রমণের কি প্রয়োজন? ওটা ত মনের গতির সঙ্গে তাল রাখা।'

'কি জানি! খেয়ালও বলতে পার।'

'আপনার ছেলেবেলায় দেশবিদেশে ঘোরবার শখ ছিল?'

'যেমন সকলের থাকে। প্রবল নয়, তবে ছিল নিশ্চয়। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ে বেড়াতে ইচ্ছে হত মনে পড়ে।'

'সমতলবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সমুদ্র?'

'সমুদ্র নিয়ে স্বপ্ন গড়িনি। খুব ছেলেবেলায় লাইট-হাউসের কবিতা বোধ হয় পড়ে মনে হত দ্বীপে থাকব, চারধারে ঢেউ আছড়াচ্ছে, ঝড়ের হুঙ্কার শুনছি, আর আমি রয়েছি দ্বীপের ওপর পাহাড়ের চূড়ায় পাথরের বাড়িতে। ভারী সাবধান স্বপ্ন।'

'তার পর?'

'কলেজে পড়বার সময় পাহাড়। এভারেস্ট কিংবা কাঞ্চনজঙ্ঘা জয়ের বাসনা কখনও ওঠেনি। এই পাহাড়তলিতেই থাকব চিরকাল, পিছনে থাকবে নীরবে নীল পাহাড়, খুব দূরে সাদা বরফ মেঘের সঙ্গে মিশে থাকবে, কখনও কখনও হাওয়া বইলে দেখা দেবে। একটু ওপরে উঠলে বরফের পাহাড় দেখব, রোজ দেখতে চাইব না....কিন্তু থাকবে... আর সামনে থাকবে দূণের তরঙ্গ, রং মাখানো, অনেক রং, অনেক দূর পর্যন্ত। তার পর আর পাহাড়তলি আর ভালই লাগল না, নদী চাইলাম, খুব স্রোত থাকবে, জোয়ার ভাঁটা জোরে খেলবে। কিন্তু তাতেও অশান্তি....।'

'এখন?'

'এখন! এখন খোলা মাঠ আর ওপরে আকাশ। মেঘ সরে যাক, আমি ঠিক থাকি যেন, তারা ঘুরুক সারারাত, আমি যে গাছের তলায় সেই গাছের তলাতেই

থাকি শুয়ে। আকাশ আর মাঠ বেশ এদেশের, নয় ?'

'আমি আর দেখলাম কৈ ? কাশীতে বাড়ি আর সরু গলিই দেখছি। আপনার কখনও বাড়ি তৈরি করতে হচ্ছে হত না ? কি রকম বাড়ি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বিজনের ভারী মজার মত আছে। সে বলে বাড়ি হবে প্রকৃতির বিরামস্থান, তার মধ্যেকার কেল্লা নয়। বছর কয়েক আগে আমাকে ভূতে পায়। বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ অঞ্চলে বেড়াতে যেতাম, নূতন নূতন বাড়ি দেখলেই মনে হত বারান্দাটা এত ছোট করলে কেন, ঝুটো জালির কাজ ভেঙে ফেলা উচিত, সঁাচি গেটের অনুকরণ দেখলে গাত্রদাহ হত। সে-অঞ্চলের একটা বাড়িও মনোমত নয়। ভাবতাম, যদি বাড়ি করি তবে তার বারান্দা হবে চওড়া, তেতলায় ঘর একটি দোতলায় দুটি, একতলায় তিনটি, সিঁড়ি কিন্তু লুকানো। লাইব্রেরীতে গদিমোড়া আরাম-কেদারা, খোলা নিচু আলমারি, টেবিল ন্যাড়া, ল্যাম্প চৌকো। মাথার মধ্যে বাড়ির প্ল্যান ভন্ ভন্ করত। আপনার ঐ ধরনের পাগলামি ছিল না ?'

'আগে ছিল না, তবে বিজনের কথা শুনে মনে হয়....'

'করে ফেলুন। অনেক প্ল্যান আছে আমার।'

'পরের ডিজাইনে বাড়ি হয় না। ঘুরে ঘুরেই বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেব। তুমি কোথায় উঠেছ ?'

'এক আত্মীয়ের বাড়ি— এঞ্জিনিয়ার। খুব কর্মঠ লোক, সোশিয়ালিজমের ভীষণ বিরুদ্ধে।'

'ওঁরা তাই হন। ভাবেন, মুটে-মজুরদের নিয়ে কাজ করতে হয়, তাই ওদের সম্বন্ধে তাঁদেরই যা-কিছু বলবার যা-কিছু করবার একচেটে অধিকার আছে। লোহা লক্কর মধ্যে মধ্যে ছোঁন, তাই তাঁরা রিয়ালিস্ট, যেমন মাস্টার মশাইরা আইডিয়ালিস্ট।'

'কিন্তু অভিজ্ঞতা চাই ত ? বিজন সোশিয়ালিস্ট হয়েছে, তারও অভিজ্ঞতা নেই।'

'কিসের, কি ধরনের অভিজ্ঞতা ? অভিজ্ঞতার ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। আমাদের পণ্ডিত মশাই বলতেন, ভোরে উঠলেই যদি ভাল ছেলে হওয়া যেত তবে দাঁড়কাকেরা হত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, আর বই পড়লে যদি পণ্ডিত হওয়া যেত তবে প্রুফ রীডারের অমন দুর্দশা কেন ? সব ক'টা অভিজ্ঞতা যোগ করলেও সব সময় একটি পূর্ণ অভিজ্ঞতার গুরুত্ব ধরা পড়ে না। অন্য একটা কিছু চাই যার জোড়ে সমহিম হয়ে তাদের স্বরূপ ধরা দেবে। সোশিয়ালিজম মানে কেবল জড়বাদ নয়, শুধু ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও নয়, মাত্র শ্রেণীবিরোধ নয়, মজুরের প্রাধান্য নয়— সব মিলে একটা।'

'কি সেটা ?'

'সংজ্ঞা দেওয়া য'য় না। তবে কোন্ স্তরের বলা চলে। প্রথমত, নতুন স্তরের অভিজ্ঞতা, অবশ্য জনসাধারণের, তোমার আমার নয়। কি আশ্চর্য।'

'কি ?'

'সোশিয়ালিস্টরাও তা স্বীকার করে না। তারা ডায়ালেকৃটিক কপচাবে অথচ সোশিয়ালিজমটাই যে পূর্বতন অনেক মতামতের সিন্‌থেসিস তাও মানবে না। সব চেয়ে অন্যায় হল এই যে একজন সোশিয়ালিস্টের জীবনে, তার অন্তরে তার অভিজ্ঞতায় থিসিস অ্যান্টিথিসিসের বিরোধ চলছে, চলতে পারে সেটা পর্যন্ত স্বীকার করা হচ্ছে না। জীবনের প্রারম্ভে যার আদর্শ ছিল না সে কি করে আজ বস্তুতান্ত্রিক হবে ? দ্বন্দ্বের ফলেই ত জন্মাবে এই নতুন বিশ্বাস ? তা নয়, তুমি চাও বিজন সোশিয়ালিস্ট হয়েই জন্মাবে এবং আমরণ তাই থাকবে। ব্যাপারটা এই— যারা পূর্ণ হয়ে জন্মেছে তারা অনেক আগেই মরেছে, তারা কেন সোশিয়ালিস্ট হবে ? তাঁরা নিজের নিজের ঘর-সংসার দেখুন গে। সোশিয়ালিজম চলার ধর্ম, জীবন্তের জন্য, এ-যুগের ধর্ম এই অর্থে যে সেটি বর্তমানে অন্তর্নিহিত, এবং সেই সঙ্গে আগতপ্রায় নতুন সমাজ-রচনার ধৃতিতত্ত্ব।'

'আপনার মতটা বোধ হয় খৃস্টান সোশিয়ালিস্টের মতন ?'

'আমার ওটা মত নয়, মতি। কার মতন কেয়ার করি না। মতির মধ্যে গন্তব্য নেই, তাই রেল লাইন ধরে চলে না। মতিটা নিষ্কাম।'

'গীতার ধর্ম।'

'হাঁ। লজ্জা কি ? নিষ্কাম মানে অন্তরের কামনা নেই তা নয়। ফুটে ওঠবার ফুঁড়ে ছুটে বেরুবার তাগিদ প্রাণী মাত্রেরই আছে, গাছপালারও থাকে। তার হুকুম মানতে গেলে তার অস্তিত্ব স্বীকার করা চাই, তার প্রকৃতি বোঝা চাই, তার শক্তির পরিমাণ করতে হবে। ওধারে জড় বাধা দিচ্ছে, যতটা বাইরের বাধা ততটা অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাণ। এই বাধাবিপত্তির স্তর থেকে সমাজের কাজ আরম্ভ হবে। ভেতরে আর বাইরের আপোষেই সম্পত্তির সৃষ্টি। তাই সম্পত্তি শক্তি-মূর্তি। কত যুগের কত মানুষের শ্রম জমাট বেঁধেছে এক টুকরো জমিতে, একটা যন্ত্রে। তারই উৎসব-রূপ টাকাকড়ি। তাই সম্পত্তির মহিমা অত বেশি। যাদের আছে তারা ছাড়ে না, যাদের নেই অথচ প্রকাশের ব্যগ্রতা আছে তারা চায়। বিরোধ চলল চিরকাল। এই বিরোধই মনোভাব সৃষ্টি করে।'

'আমারও তাই বিশ্বাস, কিন্তু সোশিয়ালিস্টরা কি বিকশিত হবার আদিম কোনো মানসিক বৃত্তি মানে ? এক হিসাবে তাদের মতে সবই পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভর করছে। অবশ্য যদি কোনো প্রাথমিক বৃত্তি থাকেও তবু উৎপাদন

প্রক্রিয়ার চাপে তার এমন পরিবর্তন হতে বাধ্য যে তার স্বরূপ কিংবা অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হলে দোষ বর্তায় না।'

'সোশিয়ালিজমের সাইকলজি খাঁটি নয়, এইখানেই তার অকৃতকার্যতা। লোকে ভাবে, মনোভাব হয় আদিম প্রবৃত্তির, না হয় বাইরের প্রতিঘাতের তৈরি, সোশিয়ালিস্টরা পারিপার্শ্বিকবাদী। তবু মোদ্দা কথাটা ভুললে চলবে না যে পূর্বের সঙ্গে পরের, অন্তরের সঙ্গে বাইরের বিরোধই সকল গতির বেগ।'

'তবু ভাল, আপনি মানুষের মনকে বাদ দিচ্ছেন না। কত সামান্য কারণে মানুষের মন বদলায়! জড়বাদকে কিছুতেই নিতে পারি না, কোথায় যেন আটকায়!'

'নাম নিয়ে তর্ক ছাড়। জড়বাদের বদলে বিরোধটাকে বোঝ। কেন চলছে, কি ভাবে চলছে, পূর্বে কিরূপ ছিল, এখন কি হল? বিরোধ রয়েছে শক্তির বিভাগে বৈষম্য থাকার দরুন। এই নাটকীয় শোভাযাত্রায় চলছে জনগণ, কোনো দল হলধর, কোনো দল যন্ত্রী, কারা পিছিয়ে পড়ে, কারা বা এগিয়ে চলে, তারাই সকলকে টানে। কিন্তু অগ্রদূতেরা নিয়তির অধীন। শাস্ত্রের নিয়তি নয়, ইতিহাসের নিয়মের। নিয়তি বলতে বাধে, তাই নিয়মই বলি। ইতিহাসের নিয়ম মানুষের আবিষ্কার ও রচনা বলেই জেয় ও জ্ঞেয়। জ্ঞানের দ্বারা তার জয় ও প্রয়োগ সম্ভব। এইখানে সোশিয়ালিস্ট বুদ্ধিবাদী।'

'কিন্তু তার পর?'

'তারপর মানুষ হবে পুরুষ, পুরাতন দ্বন্দ্বের অবসানে। পূর্বে ব্যক্তি ছিল বন্দী পরাধীন, অপূর্ণ, শক্তিহীন। বিরোধ মানে কলহ নয়, বিরোধার্থে শক্তি-সঞ্চয়। কিন্তু মানুষের পূর্ণতার জন্যই, পুরুষ-সিদ্ধির জন্যই শক্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজন এ-টুকু মনে সর্বদাই রাখতে হয়।'

'আমাদের শাস্ত্র বলে নিজের মধ্যেই তার উৎস।'

'নিজ! নিজ? একটা ছোট আমি আছে, তাতে নেই। বড় আমি একাধিকের মধ্যে, বহুর অন্তরে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সীমা পার না হলে মিথ্যা-শক্তির মোহ কাটে না, প্রকৃত শক্তির মোহ কাটে না, প্রকৃত শক্তির আস্বাদ পাওয়া যায় না। একের মধ্যে সব শক্তি পুঁজি করা নেই সৃজন, আবার বাইরের বহুর মধ্যেও নেই, তারা ত জড়— এই দুই-এর মিলনে আছে। অন্যকে না পেলে আমি পূর্ণ হব কেমন করে! ফ্রয়েড ও মার্কসের সমন্বয় চাই।'

'বিজন কিন্তু অত ভেবে-চিন্তে সোশিয়ালিস্ট হয়নি। সে আপনার দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনলে ভড়কে যাবে।'

'তা যাক গে! কেন এত লোক সোশিয়ালিস্ট হচ্ছে বলতে পার? একটা

আকর্ষণ রয়েছে নিশ্চয়। ফ্যাশান অবশ্য অনেকে ওর কাছে, তবু খাঁটি জিনিসটা বাদ দেওয়া যায় কি? মানুষ ফুটতে চায়, পারে না, কারণ একলা ফোটা যায় না। নিরালম্বতা দাম্ভিকতার নামান্তর।'

'আপনি বন্ধুত্বে বিশ্বাসী ছিলেন পূর্বে।'

'এখনও আছি। সে যাই হোক, বিজনের শাঁসই হয়ত হয়নি এখনও, কেবলই জল, তবু ঝুনো নয়, এই পরম লাভ। ভুলুক সে নিজকে···মুটে মজুরদের মধ্যে গিয়ে হারাক সে নিজকে। নিজেকে ভোলার বড়ই দরকার। যে আপনাকে নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থেকেছে সেই জানে বহির্মুখীন হবার সার্থকতা আছে কিনা। তুমি বুঝবে না, তোমার ধর্ম পরাশ্রিত। সাধারণের মধ্যে আত্মবিলোপে আত্মার উন্নতি।'

'আপনি না হয় আত্মার উন্নতির জন্য, কিংবা আত্মসন্ধানী হয়ে সোশিয়ালিজমকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন, কিন্তু সর্বসাধারণকে স্বীকারই বা কে করছে, আর কেই বা আত্মসন্ধানী হচ্ছে! খানিকটা সচেতন না হলে বিজন তলিয়ে যাবে।'

'আত্মসচেতন আর আত্মজ্ঞান এক বস্তু নয়। বাপ-মার আদুরে একমাত্র ছেলের সঙ্গে বিবেকানন্দের পার্থক্য আছে। একের পরিণতিতে স্বার্থপর নিষ্ঠুরতা মাত্র। নিজকে হারিয়ে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করে। ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।'

'মেয়েরা যখন ভাসিয়ে দেয় সংসারের মধ্যে তখন তারা কি?'

'স্বার্থপর কারণ স্রোতের টান তাদের ক্ষেত্রে মাত্র সম্পত্তি-বোধ। তারা তখন নিয়তিকে জীবনের খাতে প্রবাহিত করাতে পারে না, তারা তখন খড়কুটো মাত্র। পুতুল তারা, মানুষ নয়, মেয়েমানুষ মাত্র। আসল কথা এই, ভাসব না বওয়াব? ভাসার মধ্যে বাহাদুরিটুকু দৈহিক, বহানোর মধ্যে কৃতিত্ব মনুষ্যত্বের, জ্ঞানের, পুরুষকারের। মেয়েরা নিজেরাই বলেন, নিয়তি তাঁদের চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়— ওটা হয়ত দুর্বলতার প্রতি করুণা উদ্রেক করবার ফিকির মাত্র।'

'আপনিই কিন্তু বিপরীত কথা বলতেন।'

'বলতাম আগে, এখন বলি না, ব্যস। বলা-বলিতে কী আসে যায়। আলোচনা নিষ্ফল, তর্কে বহু দূর। কাশীতে তোমরা কতদিন থাকছ? শরীর খারাপ বুঝি?'

'না তেমন কিছু নয়। ভালই আছেন?'

'তবে?'

'অমনি বেড়াতে আসা। রমাদির কোলকাতা ভাল লাগছিল না, তাই ভাবলাম একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাই। চলুন না?'

'অন্য একদিন যাওয়া যাবে।'

'বেশ, যেদিন সুবিধে হবে।'

'অসুবিধে কিছুই নেই, কোনদিনই।'

'আজ না হয় থাক। তিনিও জানেন না। রাতও হোল।'

'এই ত আটটা।'

'তবে চলুন।'

পথে যেতে যেতে সুজন খগেনবাবুকে খবর দিলে বিজন এসেছিল কাশীতে, কিন্তু দুদিনও থাকে নি।

'বলনি কেন?'

'আপনি লিখেছেলন সে আপনার বিপরীতধর্মী।'

'কেন থাকতে বলা হয়নি?'

'সে নিজেই চলে গেল। কি সব কাজ আছে।'

নয়

'কে? সুজন?'

বলেই রমা দেবী ডেক্-চেয়ার ছেড়ে উঠতে যান, সুজনের পিছনে খগেনবাবু·· একদৃষ্টে তিনি চেয়ে থাকেন। ধড় মড় করে উঠে পড়েন, পাশের টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়ান····আলো চিমে হয়, চোখ নেমে টেবিল-কভারের নক্সায় আশ্রয় নেয়। নমস্কার করা চাই বুঝি, হাত তুলে নমস্কার করেন, পরক্ষণেই টেবিলের ধারে হাত নামে। 'বসুন', শুনে আবার বসেন বাঁ-হাতে কাঠ ছুঁয়ে····বড় রোগা···· সুজন বুঝি কথা কয়····

'উনি আজই এলেন····নিয়ে এলাম।' মোটরের ঘড়ির কাঁটা শূন্যে দাঁড়ায় কাঁপতে কাঁপতে····এঞ্জিন থেমে গেলে মোটর হয় বোকা···ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায়।

'আপনি কাশী এলেন কবে?'

'তা প্রায় অনেক দিন। সুজন আনলে।'

'বিজন ভালই আছে শুনছিলাম।'

রমা দেবী সুজনের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'হাঁ তাই শুনছি।'

'আপনি?'

'অমনি। আপনি?'

'কেমন দেখছেন?'

'ভালই, একটু····রোগা।'

'রমাদি, আমাকে চা দেবে না বুঝি?'

'দিই'····রমলা দেবী পাশের ঘরে যান। স্টোভের চাপা শব্দ, পেয়ালা পিরিচ চামচের ঠুং ঠাং ঠং···আবার থেমে যায়, একটু যেন দেরি হয়, থালার ওপর কেৎলি পেয়ালা সাজিয়ে আনেন, দুটি পেয়ালা, যদি কেউ খায়, আটখানা বিস্কিট, যদি না বাধা থাকে····সন্ন্যাসীদের খেতে নেই কিছু, কিন্তু গায়ে সিল্কের আলখাল্লা নেই, মাথার কাপড় খুলে যায়, দেওয়া যায় না, হাত ভরা। সুজন এনেছে, না আনলেই পারত, নিজের যখন ইচ্ছে নেই। সময় এলে আপনি আসব, কিন্তু কিসের সময়? যখন দুর্বলতা ঝরেছে বসন্তের প্রারম্ভে পাকাপাতা ঝরার মতন? না বর্ষা-অন্তরে? গাছপালা বড় রোগা হয় তখন।

'আপনি?'

'দিন। অনেক দিন খাই নি।'

'বিস্কিট?'

'না।'

'একখানা!'

'আচ্ছা, দিন। মাসীমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'সুজন যায়। আমার সুযোগ হয়েও হোল না।'

সুজন জিজ্ঞাসা করলে, 'অনেক দিন পরে কাশী কেমন লাগছে?'

'কোলাহল বেশি।'

'তা একটু মনে হবেই। কোলকাতা থেকে এসে আমারই মনে হয়েছিল। সেখানে শব্দ আছে, কোলাহল নেই। এখানকার মেয়ে পুরুষে বড় চেঁচিয়ে কথা কয়, সেটা ট্রাম বাসের ঘড়ঘড়ানির চেয়ে অসহ্য, যন্ত্র ব'লে খানিকটা মাপ করা যায় তবু। আপনি পাহাড়ে বেড়িয়ে এলেন, তাই প্রথমটা বেশি বাজছে।'

'নাঃ, কষ্ট আর তেমন কি! বরঞ্চ, প্রথম প্রথম হিমালয়ের নীরবতাই যেন বুক চেপে ধরত···।' কথার অভ্যাস গিয়েছে, সংযমের ফলে বাক্য চিন্তার নিচের স্তরে ভাসে, সুজনের অনুনিবেশের ক্ষমতায় সেটি ওপর স্তরে উঠে আসতে চায়, সেখানে বরফ ভাসে। রূপ পায় না চিন্তা, তাই প্রেতাত্মার মতন উত্তর ঘুরে বেড়ায়····জড় নয় হিমালয়, নতুন সৃষ্টি, তাই তার বুকে এই পৃথিবীরই মাটি, ফাঁকে ফাঁকে, সেখানে থেকে গাছপালা জন্মাচ্ছে, ঝরনা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, শৈবালগুল্মের অন্তরালে কীটপতঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করছে, নানা রং-বেরঙের পাখি ডাকছে, আদিম

ও অফুরন্ত জীবন, এ ওকে মারছে, ও এর আশ্রয়ে বাড়ছে, প্রতিযোগ ও সহ-যোগের সহবাদে হিমালয়, যেমন যৌবন, একধারা নয়, বহুধারা। তার তুলনায় মহাপ্রস্থানই নীরস·····। সুজনের মনে চিন্তার রেশ লাগে, দোয়ার্কির কণ্ঠে সুরের মতন, তাই সে বলে—'অনেক স্থানে গাছপালা জন্মায় না শুনেছি।'

'আমি সেখানে যাই নি।'

'দশ বার হাজার ফুটের ওপরে শুনেছি সব পাথর?'

'তার ওপরে বরফ।'

'তুষারাবৃত হিমালয় শুনেছি ইতরজনকে দূরে রাখে?'

'হাঁ, সে এক প্রকার যুদ্ধ।'

'সেখানে নাকি অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বরফের মধ্যে বসবাস করেন?' খগেন-বাবুর মুখে অবিশ্বাসের হাসি লক্ষ করে সুজন আবার নিজেই বলে, 'অবশ্য যাঁরা বরফে থাকতে পারেন ও চান তাঁরা নিশ্চয় সাধু।'

'বেশি উঁচুতে মানুষের সব প্রবৃত্তিগুলো গলে খসে যায়। কোনো রকম ইচ্ছাই থাকে না, বাঁচবারও নয়।'

রমলা দেবীর হাতের কেৎলি থেকে খানিকটা গরম জল পড়ে গেল, ব্যগ্র হয়ে কোথাও পুড়েছে কিনা খগেনবাবু জিজ্ঞাসা করাতে রমলা দেবী হাসলেন। কিন্তু অসোয়াস্তির আবহাওয়া ঘুচল না। খগেনবাবু লক্ষ করলেন যে রমলা দেবীর ডান হাতের ওপরটা লাল হয়েছে। সেই ধারে চেয়ে রয়েছেন দেখে রমলা দেবী হাতটা আঁচলে ঢাকলেন।

'চা খাব না আর।'

রমলা দেবী চেয়ারে বসলেন।

'আমি অত ওপরে উঠিনি। একবার মাত্র·····তাও ঠিক বলা যায় না। চা জুড়িয়ে গেছে।'

রমলা দেবী পেয়ালার চা ফেলে তাতে নতুন চা ঢাললেন।

'একবার আমরা চলেছি একদল, সন্ধ্যায় এক চটিতে আশ্রয় পেলাম। আমার এক তত্ত্বজিজ্ঞাসু সঙ্গী চটিওয়ালাকে সাধুর বিষয় প্রশ্ন করছেন শুনে একজন কুলি বল্লে যে সে ঐ অঞ্চলের লোক, তার গ্রাম মাত্র মাইল খানেক দূরে, মাস কয়েক পূর্বে তার গ্রামের কাছে এক গুহার মধ্যে একজন সাধুবাবা এসে বাস করছিলেন। সে শুনেছে, তবে তিনি আছেন কিনা সে জানে না। একবার ছুটি পেলে খোঁজ নিতে পারে। আমার সঙ্গী তখনই যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, আমিও গেলাম। কুলিটার গ্রাম পর্যন্ত পথ রয়েছে। গ্রামে পৌঁছে দিয়েই সে উধাও। বোধ হয় দেখা করতে গেল। আমরা চটিতে ফিরলাম।'

সুজন প্রশ্ন করল, 'তবে দেখা হয় নি ?'

খগেনবাবু বল্লেন, 'পরের দিনও আমাদের সেখানে থাকতে হয় সঙ্গীর অসুস্থতার জন্য। কুলিটা সন্ধ্যার দিকে চটিতে ফিরল। তার বাড়ির খবর নিলাম। তার স্ত্রী আর ছোট্ট একটি ভাই আছে। সে যাক— খবর পেলাম যে গুহার মুখে গ্রামের লোক যে সব মিঠাই রাখে সেগুলো কেবলই জমছে। আমার কিন্তু মনে কেমন কৌতূহল হোল।'

'গেলেন না কেন ?'

'তখনও ঠিক ভোর হয়নি, বেরিয়ে পড়লাম হাতে টর্চ ও লাঠি নিয়ে। অনেক ঘুরতে ঘুরতে আমাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে সে বাড়ির দিকে চলে গেল। টর্চ জেলে দেখলাম গুহার মুখে শালপাতার ছড়াছড়ি। ভেতরে যেতে ইচ্ছেও হচ্ছিল, ভয় করছিল, এতদিন পরে আবার গুহায় কখনও ফেরা যায়! সাহসভরে ঢুকলাম, একরকম জোর করেই। ভিতরে প্রবেশ করার হাত পাঁচেক পরেই ডান দিকে একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে। হাঁটু গেড়ে যাওয়া চলে। একটা একটানা গোঙানি শব্দ কানে এল। লাঠির ফলাটা সুড়ঙ্গের মুখে ধরে আলো জাললাম। কি একটা রয়েছে যেন সন্দেহ হোল। শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। আর যেতে সাহস হোল না, সেখানে থাকতেও পারলাম না। সূর্য তখনও ওঠে নি— চুপি চুপি তাঁবুর লোকালয়ে ফিরলাম।'

'ব্যাপারটা কি ?'

'যোগীর ওঁকারও হতে পারে, কোনো আহত জানোয়ারের কাত্‌রানি হতে পারে।'

রমলা দেবী হেসে উঠলেন, সুজন অপ্রস্তুতে পড়ে চেয়ে রইল। রমলা দেবী আস্তে আস্তে মন্তব্য করলেন, 'তাঁবুও নিরাপদ নয়।'

'নিরাপদ তোমাদের একমাত্র রান্নাঘর, নেহাৎ না হয় নিজের বাড়ি। আচ্ছা রমাদি, তোমার কি রকম বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে ?'

'ইচ্ছে করে ? ভাবিনি।'

'বল না।'

'তুমি তৈরি কর, অতিথি হব।'

'আমার আর বাড়ি!'

রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আবার বেরোবেন ?'

'আবার ? এখনও ঠিক করিনি।'

সুজনের হঠাৎ মনে হল যে, সে রাত সাড়ে ন'টার শো'তে বায়োস্কোপে যাবে। 'একটু খেয়ে নিই গে। আপনি বসুন।'

'না, চল যাই।'

'কাল কোথায় কাজ আছে?'

'না, তেমন কই। আচ্ছা সুজন, তুমি যাও।'

সুজন চলে যাবার পর রমলা দেবী অন্য ঘরে গেলেন। যখন ফিরে এলেন তখন চুলের একটা গোছা ভিজে, আলো পড়ে চক্ চক্ করছে। খগেনবাবু চোখ নামিয়ে নিলেন। খানিকক্ষণ নীরবে বসে থাকবার পর খগেনবাবু বল্লেন, 'আমার চিঠিগুলো?'

'আছে।'

'আমাকে দিন।'

'না।'

'কেন?'

'জানেন না?'

'কয়েকটি দুর্বল মুহূর্তের উচ্ছ্বাস—'

'অন্যের দুর্বলতা দেখতে আমার ভাল লাগে।'

'নিতান্ত স্বার্থপর।'

'স্বার্থপর নই। নিজে দুর্বল হয়ে প্রতিদান দিন।'

'কিন্তু লগ্ন চলে যায়।'

'একটা মাত্র লগ্ন?'

'যেটা শুভ সেটা অদ্বিতীয়। ছোঁড়া তীর ফিরিয়ে আনা যায় না এই জানি।'

'যায়।'

'যায় না।'

'আমি বলছি, বলছি যায়, খুব যায়। লগ্ন যায় নি।'

'দেখা যাক।'

'সহজ ভাবে দেখতে পারবেন, না সাধু সন্ন্যাসীদের উপদেশের পরকলা পরে দেখবেন?'

'বোধ হয় পারব। কারণ নিজের ভুল বুঝেছি।'

'ভুল, আর ভুল! কিসের ভুল? এর নাম সহজ! কেউ ভুল করে না। সকলে সব সময় ঠিক কাজ করে। অত পাপের জ্ঞান কিসের?'

'ভুল করেছি চিঠি লিখে।'

'কোনো অন্যায় করেন নি। যা মনে এসেছে তাই করেছেন। সেটাই সততা।'

'যেটা ভাসে সেটাই কি প্রকাশ্য? না বাছাটাই খোকামি।'

'যেটা তলায় পড়ে থাকে সেটাই বুঝি মিথ্যে?'

'নির্বাচন করেননি জীবনে? যা খেয়াল হয়েছে তাই করেছেন।'

'আমি আর কি কবে করেছি? তবে····নয়ত···।'

'নয়ত কি?'

'নয়ত ঘরণী গৃহিণী হতাম।'

'সেই বা মন্দ কী হত!'

রমলা দেবীর কঠিন দৃষ্টিতে খগেনবাবুর মুখ বন্ধ হল।

তিনি উঠতে যাচ্ছেন দেখে রমা দেবী বল্লেন, 'বসুন। ভেবেছিলাম আজ কোনো কথা কইব না, কইতে পারব না কেবল শুনব— কিন্তু তা আপনি দেবেন না। বসুন। সিগারেট খান না? তা হোক, আনিয়ে দিই।'

সিগারেট এল। রমলা দেবী টিন নিজ হাতে খুলে সামনে রাখলেন। খগেনবাবু নিলেন না, প্রশ্ন করলেন, 'কি বলবেন?'

'কেন চলে গেলেন বলুন?'

'ও-সব কথা তুলবেন না। ভুলে যান আপনি, আমিও ভুলেছি। আমার কেমন তখন ওলটপালট হয়ে যায়।'

'অস্বাভাবিক নয় কিছু।'

'সেই সময় আপনার স্নেহ পেলাম··· মনে হোল— আর কেন সে-সব কথা?'

'চলে যেতে কষ্ট হল না?'

'কি মনে হয়? চিঠি পড়ে?'

'নিজের দুর্বলতা থেকে পালানো পুরুষের লক্ষণ?'

'আমার মধ্যে হয়ত সবটা পুরুষ নয়, যেমন হয়ত, এই ধরুন, আপনার মধ্যে সবটা স্ত্রী নয়। কিন্তু আমার শিক্ষাদীক্ষা স্বভাবের দিক থেকে অন্য কি গতি ছিল? কোলকাতায় থাকলে কি করতে কী করে ফেলতাম! আপনিও ত আত্মীয়ের অসুখের ছুতো করে চলে গেলেন!'

'আচ্ছা, আর যাব না।'

'এখন আর যাবার প্রয়োজন কী রইল! আমি এইখানেই কাশীতেই থাকব।'

'সে আপনার অভিরুচি, থুড়ি, অভিলাষ। উল্লসিত হলাম।'

খগেনবাবুর গম্ভীর মুখ লক্ষ করে হাল্‌কা সুরে রমা দেবী বল্লেন, 'সময় যেদিন আসবে সেদিন নিজেই আসবেন লিখেছিলেন, কিন্তু থাকবার কথা জানান নি কেন? আমি এখন কোথায় রাখি! মাথায় রাখলে উকুনে খাবে····আবার মাটিতে পিঁপড়ে!'

হাসির হিল্লোল দেহে পরিব্যাপ্ত হয়। খগেনবাবু হঠাৎ হাত জোড় করে বললেন, 'অনুরোধ করছি...'

'অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। নিজেকে অত ভয়।'

'নিজেকে নয়, নিজের দুর্বলতাকে।'

'সেও নিজের, অত্যন্ত নিজের, এত বেশি নিজের যে সে-ছাড়া আর কিছুই নেই। নিজেকে ঘৃণা করা আপনার শোভা পায় না। আপনি নিজেকে ছাড়া বোধ হয় আর কাউকে কখনও চোখ খুলে দেখেন নি, কারুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।'

'বোধ হয় সত্যি। কিন্তু প্রথম দিনই অপমান করতে মায়া হচ্ছে না?'

'মায়া! রসিকতা শিখেছেন আশ্রমে বুঝি?'

রমা দেবী খিল খিল করে হেসে উঠলেন, সে হাসি থামে না কিছুতে। খগেন-বাবু চোখ নিচু করে বল্লেন, 'যে দুর্বল তাকে আপনি অপমান করবেন না জানি।'

'আমার প্রতি অগাধ বিশ্বাস দেখছি! দুর্বলতা! দুর্বলতা নয় এ, নিছক ভয়।'

'তাও জানি।'

'যে ভয়কে ভয় বলে জানে সে কেবল বাঁচতে চায়, আর যে ভয় সত্বেও ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই বাঁচে। অপমান আমি করিনি আপনাকে। সকলেই বরঞ্চ আমাকে অপমান করতে উদ্‌গ্রীব। গায়ে মাখি না।' রমলা দেবী রাজহংসীর মতন গা থেকে যেন জল ঝেড়ে ফেল্লেন।

'অপমান কে করলে?'

'কে নয়! আপনিই সর্বপ্রথমে।'

'আপনাকে আমি বরাবর সম্মানই দেখিয়েছি। আপনার সম্মান রক্ষার জন্যই আমি চলে যাই। না হলে, কি হোত ভাবুন দেখি!'

'ভাবতে পারি না...আপনি বসুন, উঠবেন না। আমার সম্মান? নেই সমাজে, সেজন্য তাকে দোষ দিই না; কিন্তু— আপনি বসুন একটুখানি, আমি এলাম বলে।'

রমলা দেবী এলেন, চুল ভিজে, ব্লাউজের গলা ভিজে, শাড়ির আঁচল ভিজে লট পট করছে।

'আপনার রাত হোল, বাড়ি যান। মাসীমা আপনার জন্য বসে আছেন খাবার কোলে নিয়ে। তিনি আমাকে এক রাতের জন্য, মাত্র একটি রাতের জন্যও তাঁর ঘরে আশ্রয় দেন নি। আপনার মাসীমা হবার উপযুক্ত। থাক গে— আজ আমি আর কথা কইতে পারছি না, আমার মাথা ঘুরছে।'

'কাল আসতে পারি ?'

'মাসীমা ছেড়ে দিলে, এবং ইচ্ছে হোলে আসবেন।'

'আসব।'

'তা হলে একটু বসুন।' রমলা দেবী চারধার চেয়ে হঠাৎ খগেনবাবুর কাছে এসে বল্লেন, 'বসুন না ·· আপনাকে বকি····বড্ড ইচ্ছে করছে বকতে আপনাকে। এই নিন, সিগারেট খান, কেউ টের পাবে না, কাউকে বলে দেব না। ভাল লাগছে ·নেক দিন পরে ? জানি ভাল লাগবে। আমার কথাও মধ্যে মধ্যে শুনতে হয়— কেবল মাসীমারই কথা শুনবেন চিরকাল ! সাবিত্রী কেন মরেছে বুঝেছি। সে চেয়েছিল একজন পুরুষ, পেয়েছিল শিশু। স্বামীর বদলে ছেলে সব সময় ভাল লাগে কী ! বুঝেছেন ? বোঝেননি। বলছি, বসুন। ভয় নেই খেয়ে ফেলব না। কাশীর লোকগুলা এত দুষ্টু কেন বলুন ত ?'

'চঞ্চল না হয়ে যদি কথা কইতে পারেন তবে বসি।'

'এই দেখুন লক্ষ্মি হলাম। কাশীর লোকেরা ভাবে যে আমি পালিয়ে এসেছি। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ? আর যে সত্যি পালাল সে হোল সাধু— ভারি মজা, নয় ? আপনার মাসীমাও তাই ভাবেন।'

'আপনি তাঁকে জানেন ? এই শুনলাম পরিচয় হয় নি !'

'না চিনেও বলতে পারি। তিনি আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসেন কিনা, তাই সর্বদাই ভাবেন হারাই হারাই। ভয় হয়, মুকুন্দর মেমসায়েব তাঁর ছেলেকে চুরি করে পালাবে। কিন্তু চুরি করার বাসনা নেই।'

'মাসীমাকে তর্কের বাইরে রাখুন।'

'রাখা যে যাচ্ছে না ! তিনিই যে আপনার মুখে মুখোশ পরিয়েছেন। তাঁকে কি আপনার থেকে পৃথক ভাবা যায় !'

'আপনি শান্ত হোন আমার এই প্রার্থনা। আমাকে সাহায্য করুন। তবেই বুঝব যে আপনি আমার প্রকৃত মঙ্গল চান।'

রমলা দেবী মুখ কঠিন করে বল্লেন, 'আমার মঙ্গল-ভিন্ন আপনার মঙ্গল নেই।'

'কি করে জানলেন ?'

'গুরুর কৃপায় নয়, আপনার ও আমার মন বুঝি।'

'আমার মঙ্গল আমার হাতে, আমি এইটুকু জানি।'

'ও-জানাটাই আপনার একমাত্র ভুল।'

'বেশ। আমি যাই ?'

'ভয় পেলেন ? নিশ্চয় কাল আসবেন না ?'

'ভয় পাই নি বলতে পারি না। আপনাকে আমি অন্যভাবে দেখেছি, অন্যরূপে

ভেবেছি। তার পরিবর্তন হবে না কখনও এমন প্রত্যাশা করার মতন ধৃষ্টতা আমার নেই। হয়ত সে-রূপের মধ্যে এ-রূপের আভাস ছিল, আমার চোখে পড়েনি এই মাত্র। সকলের কি চোখে পড়ে! তাও যদি না হয়, তবু মানতে পারি যে আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা সব চরিত্রেই আছে। কিন্তু অভ্যাস বড় বাধা দেয়। এতদিন আমি অন্যভাবে ভেবেছি…'

'আমাকে ভেবেছেন! ধন্যবাদ! কী ভাবে, জানতে বড় সাধ হচ্ছে।'

'আজ আমি স্পষ্ট করে বলতে পারব না।…সর্বদাই মনে পড়ত— কিন্তু অশান্ত রূপে? কৈ? নয় ত! আপনার সংযম ও ভদ্রতাই আমার ভাল লাগত চিত্ত যখন বিক্ষুব্ধ হত তখন আপনাকে, আপনার সংযত মূর্তিকে কল্পনা করতাম। আপনার সাহস, আপনার নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমার বলসঞ্চার করত। কত আশ্রমেই না ঘুরলাম, কত মতই না যাচাই করলাম! আধুনিক, আধুনিকতর আধুনিকতম, পুরাতন, সনাতন, চিরন্তন… বোঝাই হল, ভিড়ই জমল। ভূরি ভূরি উপদেশ, চুলচেরা বিশ্লেষণ, কিছুতেই যখন শান্তি দিতে পারত না, তখন আপনি খানিকটা শান্তি দিতেন। আর…আর দিত পাহাড়, খোলা, মাঠ, পরিষ্কার আকাশ! বড় বড় গাছের মধ্যে অনুবিষ্ট হতাম, পাথরের অন্তরে গিয়ে পাথর হতাম। নক্ষত্রের ব্যবধান কী ঠাণ্ডা। দেখলে ঝরনার জলে স্নানের কাজ হয়… আপন চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাবার অমন উপায় আর নেই। আর…আর মিশতাম যার তার সঙ্গে, যারা কোনো শুষ্ক চিন্তা করে না, বেঁচে থাকে, সুখে দুঃখে জড়িয়ে, ভয়-ভাবনা যাদের কেবল দোলা দেয়, উপড়ে ফেলে না। ঠিক সহ-অনুভূতি নয়…গাছ-পালা, মানুষের ভেতরে, তলায়, মাংসের ওধারে, হাড়ের মজ্জায়, রক্তের কণায় প্রবেশ করা…আরেকটি হয়ে যাওয়া, আরো অনেক হয়ে যাওয়া… একই কথা…পারতাম না সব সময়…কিন্তু যখন পারতাম— না, না, ঠিক তখন নয়… তারপর, অনুভব হয় তার পরই… রক্ত মাথা থেকে নেমে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ত, মাংসপেশীগুলো আড়ষ্ট থাকত না, হাড়গুলো সহজে নড়ত। এই রকম কদিন হয়েছে… কিন্তু স্থায়ী রাখতে পারতাম না এই যা দুঃখ। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

খগেনবাবু নমস্কার করলেন রমলা দেবী প্রতি নমস্কার না করে ভয়ার্তনেত্রে চেয়ে রইলেন। ঘড়িতে দশটা বাজল। রমলা দেবী শান্ত হয়ে প্রতিবাদ করলেন, 'আমি কিন্তু কৃতজ্ঞতা চাই না।'

'আপনাকে আমি সত্য কথা বলছি। বহুবার মনে হোত…কিন্তু তাতে আমার শেষে বাধাই হোল। তাই ফিরে এলাম।'

'আমার বাধা ছিল না। আমি এসেছি নিজের খেয়ালে। উন্নতির নেশায় নয়।'

'নিয়তি কেন বাধ্যতে।'

'নিয়তি আর মানি না।'

'আমিও অন্ধ নিয়তিকে শ্রদ্ধা করি না। তবে, আমি তাকে ভাল করে বুঝতে চাই। এবার, বুদ্ধি দিয়ে নয়।'

'জলে না নেমে সাঁতার কাটা?'

'যখন না নেমে থাকতে পারব না তখন নামব। আপাতত, অবশ্যম্ভাবী নয়। আমাকে আরেকটিবার পরীক্ষা করতে সময় দিন। প্রত্যেকেরই পরিণতির সময় আছে। আমি এখানেই থাকব কিছু দিন, কাশী ছেড়ে যাব না। নিজেও সুখী হলাম না, অন্যকেও শান্তি দিতে পারিনি। যদি যাই, আপনার অনুমতি নিয়ে যাব।'

'আর কি পরীক্ষা করবেন? পরীক্ষার্থী হতে ভাল লাগে? অপমান বোধ হয় না?'

'হয় কিন্তু উপায় নেই। নিজেই পরীক্ষক এই যা বাঁচোয়া। পরে বলব। আপনি, আমার অনুরোধ, একটু সহজ হোন।'

'সহজ! আমাকে সহজ হোতে দেবে না এরা, আমি মেয়ে মানুষ— আমি বুঝতে পারি। আপনার মাসীমাই আপনাকে এখানে আসতে বাধা দেবেন, বারণ করবেন। আপনি স্নেহের খাতির রাখবেনই রাখবেন। আপনি যে নিতান্ত ভদ্র! তারপর মুকুন্দ····সুজন। সে কী করবে আমি কিছুই জানি না।'

'সুজন! কেন? সুজন ত চায় যে আমি আপনার সঙ্গে মেলামেশা করি।'

'তাইত তাইত! এখন কী করবে সেই জানে। সেও সংস্কারমুক্ত নয়।'

'কেন? কি করে জানলেন?'

'আমি জানি····। আমাকে ক্ষমা করুন। প্রথম দিনে কত বাচালতা করলাম··· কিন্তু আমি জানতাম না কিছুই····আমার যেন কি হয়েছিল। রোজ রোজ অমন ····একলা একলা বসে থাকা····'

'আচ্ছা আমি আসব। আজ যাই?····কেমন?'

খগেনবাবু বাড়ি ফিরলেন রাত এগারটায়। মুকুন্দ দরজা আগলে বসে আছে। কিছু খাবেন না শুনে দরজা ঝনাৎ করে ভেজিয়ে নিচে গেল।

দশ

খগেনবাবু পরের দিন সন্ধ্যায় রমলা দেবীর বাড়ি এলেন। সকালে মাসীমার সঙ্গে যা কথোপকথন হয় তাইতে বুঝেছিলেন যে তাঁর মন 'মেম-সাহেবের' সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করে। সন্দেহের রূপ সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু তার অস্তিত্বকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাঁর পালিত পুত্রের স্নেহের মাত্রাহ্রাসে তিনি নিরাগ্রহ, কিন্তু দিক্‌পরিবর্তন সম্বন্ধে উদাসীন নন। অভ্যস্ত আসক্তি তাঁর হৃদয়ের চারপাশে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করেছে। সকলেরই প্রাচীর থাকে, তার পাদদেশে পরিখা, শেওলাভরা মজা নদী বিষাক্ত বাষ্প উদ্‌গীরণ করে, কিন্তু অচলায়তনের অধিবাসীর অসহ্য নয়। মাসীমার চারপাশে জলই নেই। রমলা দেবীর হৃদয়'স্রোতস্বিনীর অন্তরে দ্বীপের মত। তাঁর অনুভূতিকে খগেনবাবু সত্য বলে স্বীকার করেন। তাঁকে গ্রহণ করার অর্থই হল মাসীমার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ। তবু, মাসীমার ওপর রাগ হয় না।

আজ রমলা দেবীর ঘরে টেবিল-ল্যাম্প, ঘনসবুজ কাচের আবরণ, তার ওপর ঘেরাটোপ, কোনে মুক্তার দুল ঝোলে। শেড্‌ বাঁকান, আলো পড়েছে রমা দেবীর মুখে ও গলায়। মুখের একটি পাশ দেখা যায়, অন্য গালে হাত রাখা, সোনার দু'গাছি প্লেন-চুরি চিক্ চিক্ করে। গলার হার লিকলিকে, শীতল স্বস্তিকা দোলায় নিদ্রিত, মা অন্যমনস্ক, তবু নিদ্রিত শিশুকে ধীরে ধীরে দোলা দেন। শঙ্খশুভ্র শাড়ি, ট্যানাগ্রার মূর্তির মতন সর্বাঙ্গে মোলায়েম ভাঁজ পড়ে, ঊরুর গঠন ফোটে, খালি ছোট্ট পা, শশকের মত শঙ্কিত।

শেড্‌ বাঁকাবার পর আলো পড়ল খগেনবাবুর মুখে। রমলা দেবী উঠে ঘেরাটোপ তুলে নিলেন।

খগেনবাবু বল্লেন, 'সুজন আসে নি। তাকে আনলাম না।'

'শেড্‌টা থাকবে।'

'দরকার নেই। দাঁড়ান, গরম, আমি তুলে দিচ্ছি।' কিন্তু রমলা দেবী নিজেই তুলে রাখলেন।

'আজ আপনি কেমন?'

'আমি। আপনি কেমন?' কালকের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা করুন। একটু চা করে দিই? থাকগে, খাবেন না। বসুন, আজ গল্প করুন। একটা গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে।'

'কিসের গল্প? ভূতের, সাপের, ডাকাতের, না দেশ-বিদেশের?'

'না, মানুষের।'

'মানুষের গল্প বলতেই এসেছি। মানুষের গল্প হয় তিন প্রকারের, প্রেমের, মৃত্যুর এবং সাধনার, অর্থাৎ জীবনের। কোনটা ?'

'মৃত্যু চাই না সাধনাও নয়, অত ভাবতেও পারি না।'

'শুনুন। একটি মেয়ে, একটা ছেলে, বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাত আছে, জীবন বিফল হল। গল্প শেষ।'

'অন্য রকমও হয়।'

'আপনি নতুন সাহিত্য পড়েন বুঝি ?'

'আচ্ছা আমি আরেকটি গল্প বলছি। একটি ছেলে, আর একটা মেয়ে। মেয়েরা চালাক হয় কিনা, তাই প্রথম থেকেই জানত যে ওকে না হলে তার চলবে না। ছেলেরা বোকা, তাই গোড়ায় জানত না, পরে যখন টের পেলে যে তারও না হলে চলবে না, তখন, ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।'

'কিন্তু ফিরে ত' এল। তারপর ?'

'তারপর ছেলেটি যা করবে তাই মেয়েটার ভাগ্যে আছে।'

খগেনবাবুর চিবুকের মাংসপেশী মুখে সঞ্চারিত হয়। রমলা দেবীর মুখে হাসি ছল্‌কে উঠতে চায়, তিনি ডান হাতের তালুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। রেখা অস্পষ্ট, তাই ডান হাত আলোর তলায় টেবিলের ওপর চিৎ করে রাখেন, রেখা সূক্ষ্ম, বড় স্টেশনের রেল-লাইনের মতন কাটাকুটি, বেসামাল হলেই দুর্ঘটনা ঘটবে, আঙুলের ডগা একটু ফোলা।

খানিকক্ষণ কৃত্রিম মনোযোগের সঙ্গে দেখবার পর চোখ না তুলে রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি হাত দেখতে জানেন ?'

'না।'

'তবে কী সাধু! নিশ্চয় জানেন, দেখবেন না তাই বলুন! চেষ্টা করুন পারবেন।'

খগেনবাবু রমলা দেবীর হাত নিজের হাতের ওপর তুললেন।

'এখনও রেখা ফোটে নি!'

'মুখে ফুটেছে, বিজন বলেছে। হাত দেখুন, পুরানো রেখা দেখেই বলুন না।'

'জীবনে নানা প্রকার, না, তা ত' দেখছি না····মাত্র, একবার আঘাত পেয়েছেন।'

'মাত্র একবার!'

'তাই দেখছি।'

'কপালে সুখ আছে ?'

'রেখা ফোটেনি। বুদ্ধিটা ভাল, হৃদয়বৃত্তিও উন্নত, স্বাবলম্বী।'

'না, গো না, ঠাকুর....' রমলা দেবী হাত ছাড়িয়ে নিলেন।

'আচ্ছা আমি দেখি।' রমলা দেবী খগেনবাবুর হাত পরীক্ষা করতে লাগলেন। 'অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই বলতে পারি। একে একে বলছি....অতীতে আদুরে ছেলে, ভবিষ্যতে অন্যের....'

'অন্যের? কার?'

'কার আবার? যেন জানেন না।'

'বর্তমানে?'

'ভবিষ্যৎ শুরু আজ থেকে। এই বর্তমান।'

'ভুল হল। বর্তমানে স্বাধীন, ভবিষ্যতে মনে করছি, সকলের।'

হাতটা জোরে সরিয়ে রমলা দেবী খগেনবাবুর চোখে চোখ রেখে বল্লেন, 'বর্তমান আমার অধিকারে। আচ্ছা সে-সব কথা থাক্। গল্প বলুন— ভাল লাগবে কি না জানি না। আচ্ছা থাক্....আমি বলছি। ভাল লাগবে না? তার চেয়ে দুজনে চুপ করে বসে থাকি, কেমন?'

অনেকক্ষণ দুজনে বসে থাকেন, খগেনবাবু গালে হাতে দিয়ে চোখ নামিয়ে, রমলা দেবী কোলের ওপর দুটি হাত জুড়ে খগেনবাবুর চোখে চোখ রেখে। চোখের পলক পড়েই না ··মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়, খগেনবাবুই চোখ নামিয়ে নেন। একাগ্রতায় রমলা দেবীর চোখের জল শুকিয়ে যায়। খগেনবাবুর চিত্ত অস্থির হয়, মুখে দ্বন্দ্বের সামান্য নিদর্শন ভেসে ওঠে, চিত্তের গোপন স্তর থেকে শক্তি আহরণ করতে চেষ্টা করেন, শক্তি আসে না বেরিয়ে, হতাশায় ব্যথিত হোন। তার লক্ষণ দেখে রমলা দেবীর একাগ্রতা বাড়ে। চিবুক সুদৃঢ় হয়। যেমন বলদেবের তনুত্যাগের সময় জঠর থেকে ফণী নির্গত হয়েছিল, তেমনই রমলা দেবীর অন্তরের বাসনা চোখের জ্যোতির আকারে বিচ্ছুরিত হয়। অন্তরালের যুদ্ধে দেহ অবান্তর। খগেনবাবুর হাত ভারী ঠেকে, লতিয়ে পড়ে। দেহকে মনের সাথে যুক্ত করতে যান, প্রয়াসে কপালে বলী পড়ে।

রমলা দেব ধীরে উঠে পিছন থেকে খগেনবাবুর কপালে হাত দিলেন। বলী তিনটি অদৃশ্য হল। রমলা দেবীর করতলে উষ্ণশ্বাস লাগে, 'চোখের পাতা অত শক্ত কেন? যেন তীর।'

'গন্ধ মাখা হয়েছে বুঝি?'

রমলা দেবী টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতরের শিশি বার করে খুলে ভুরুতে মাখিয়ে দিলেন, 'এইবার আশ্রম থেকে নির্বাসন। বিলাসী শিষ্যের স্থান নেই আশ্রমে। তখন কোথায় থাকা হবে?'

'সেই কথাই বলতে এসেছি। যে-ভিক্ষা চেয়েছিলাম তা মঞ্জুর হবে না?'

'না। আর আমি নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেব না, কিছুতে দেব না। সে হয় না।'

'শুনুন আমার কথা....'

'শুনব না, কান আমার ভোঁ ভোঁ করে। অন্য দিকটা বুঝি দেখতে নেই একেবারে!'

'অন্য দিকের কথাই বলব।'

'বলব, শুনব, কিন্তু মানব না।'

'মানলে ভাল হবে। আমার, আপনার....'

'ভাল আর ভাল! কিছুতে ভাল কারুর হয় না অমন অন্ধ হলে। মনকে ফাঁকি দিয়ে উপকার! মন চাইছে এক, আর বলছে অন্য। একে সত্য আচরণ বলে না। মিথ্যার ওপর আসন পাতা যায় না, সে-আসনে পূজা হয় না, যতই মন বিক্ষিপ্ত হয় ততই ভাবতে হয় ওপরে উঠছি। ও-সব মনের জোচ্চুরি, ছেলেখেলা। সোজা কথা এই, আমি কাউকে শঠ হতে দেব না। তাতেই সকলের কল্যাণ হবে। কি এতদিন করলেন যার শেষ এখনও হোল না? এমন কী ব্রত যার উদ্‌যাপনে এতদিন লাগে? এত নিজের পানে চাইবেন না— চাইবেন না, একলা সাধনা হয় না। পরকে অত ঘৃণা করতে নেই।'

'আমিও তাই ভাবি। সেইটাই আমার পরীক্ষা, ভিক্ষা, যাই বলুন। আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, মতামতে নয়, ভেতরে। ভেবেছিলাম, আপনার সামনে তার হিসেব-নিকেশ করব। অঙ্কের হিসেব নয়, তালিকা প্রস্তুত নয়, যেমন নীলামের সময় উকিল ও পেয়াদারা করে। খতেন-পড়েনও নয়। কী করতে চেয়েছিলাম তাও জানিনা। হয়ত, কেবল কথা কইতেই এসেছিলাম, মন উজাড় করে। এতদিন মনে মনে যা ভেবেছি তার প্রকাশ করার তাগিদ থাকবে না? ঘরের দোর-জানালা বন্ধ ছিল, বাবু গিয়েছিলেন প্রবাসে, আসবাবপত্রে আলো হাওয়া লাগে নি।'

'মুকুন্দ ঘর-দোর পরিষ্কার রেখেছে?'

'যথাসাধ্য করেছে। আপনি ঠিকই ধরেছেন, একলা সাধনা হয় না। তাই, আমি চাই শক্তি আহরণ করতে সর্বসাধারনের ভাণ্ডার থেকে, তাদের জীবনীশক্তি থেকে। এ-সব কী বলছি! আপনার ভাল লাগবে না জানি, এতদিন পরে দেখা হল, কেমন আছেন, কেমন ছিলেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, আপনিও পারলেন না, অথচ...কত যত্নই না আপনি করেছেন! কিন্তু স্বাভাবিক ভদ্র আচরণে কি হবে এখন? পারছি না, কী করব! যার যা স্বভাব, সেই

অনুসারেই ব্যবহার করা ভাল কেমন ?'

'আমিও পারিনি।'

'আপনি ঠিক বুঝছেন। পরের দিকে তাকাই নি। আমি এতদিন সকলকে অবহেলা করেছি, ঘৃণা করেছি, এক প্রকার আততায়ীর মত ব্যবহার করেছি। ভয় ছিল পাছে তারা আমার দুর্বলতা জানতে পেরে আমাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যায় তাদের স্তরে। তারা ছিল ইতর, অস্পৃশ্য। শুচিবাইয়ে পাগল হলাম। জন-মতের বিপরীত মতপোষণ, সর্বজনীন ব্যবহারের বিপক্ষাচরণকেই ভাবতাম ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ। তারা বোঝেনা সাহিত্য, গান, চিত্রকলা, বিজ্ঞান ; তাদের চিত্ত নেই, ভদ্রতা নেই, এই ছিল আমার ধারণা। বেশ ছিলাম বলতে পারি না। কিন্তু দাঁড়াবার স্থান চাই ত! আমার স্বাবলম্বন নিরালম্বতার নামান্তর হল। একদিন বুঝলাম, সাবিত্রীর আত্মহত্যাই আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে আমি একজন আত্মম্ভরী মানুষ ছাড়া অসাধারণ পুরুষ নই। আমার অহংজ্ঞান সর্বপ্রকার সাধনায় বাধা দিলে।'

'যা হবার তা হয়ে গেছে। নিজের স্বভাবকে ছাড়িয়ে ওঠা যায় না, উচিত নয়।'

'না, তা নয়। প্রকৃতিকে অতটা প্রাধান্য দিতে পারি নি। এতদিনকার কাজ বরবাদ হয়ে যাবে যে! সে হয় না।····স্বভাবকে ছাড়ানো যায় না— এ জ্ঞান যদি আসে তবে পরে আসুক। প্রথম থেকেই গ্রহণ করলে মানুষের সব প্রয়াসই বাদ পড়ে। কোন্‌টা স্বভাব তাই বুঝিনা। সেটা রক্তমাংসে আবদ্ধ, না যেটা সমবেত মানবের সামাজিক সৃষ্টি ? সেও প্রায় দশ হাজার বছর হতে চলল। অবশ্য তাও আমি মানতে পারি না। সেখানেও দেখি, সব আকাশে ঝুলছে, দেশের আর্ট গুহায় সেঁধোচ্ছে, গায়ক লুকোচ্ছেন ওস্তাদির আবডালে, সাহিত্য আত্মবিনাশ করছে ইচ্ছাপূরণে। আর বিজ্ঞান ? বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগার এক-একটি মর্গ, আপনি ত দেখেছেন। বৈজ্ঞানিক অঙ্ক কষছে, পাছে লোকে বুঝে ফেলে, না হয় বড়লোকের দাসত্ব করছে, আর না হয় ঝগড়াঝাটি। জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে মানুষ বাইরের ও অন্তরের প্রকৃতি সবে করায়ত্ব করছে, এমন সময় সমাজের সঙ্গে তার যোগ গেল ছিঁড়ে। সাধারণের কেন ছবি, গান, সাহিত্য ভাল লাগবে বলুন ? কেমন করে স্বামী-স্ত্রী সুখী হবে বলুন ? তাল রাখতে হবে সভ্যতার গতির সঙ্গে ··· নচেৎ মৃত্যু সুনিশ্চিত। ···আপনার কি মনে হয় ?

'আমাদের অত জানবার প্রয়োজন হয় না। সংসার চালাতে গেলে কিছু না জানলেও চলে। কেবল পরের মন যুগিয়ে চলার জন্য অত কিসের দরকার বলুন ?'

'একার সংসারে দরকার নেই। আমি অন্য কথা ভাবছি। জীবন আমার নয়,

কোনো মহারথীর নয়। জীবন সকলের⋯জীবন এই যুগের, যে-যুগ অতীতের উত্তরাধিকারী, সে-উত্তরাধিকারকে সক্রিয় মূলধনে পরিণত করতে যত্নবান, বর্তমানের সৃষ্টি-গরিমার সুযোগে সজ্ঞান ও মহীয়ান, ভবিষ্যৎ জীবনের সাহায্যকল্পে প্রতীক্ষারত। এতদিনে, অনেক কষ্টে বুঝলাম, তাই সাবিত্রীকে বুঝিনি, আপনাকেও নয়।⋯আমি তাই চাই সমাজের জীবনধারা বুঝতে। বই পড়ে হবে না। এটা আমার প্রয়োজন, নচেৎ আমি সম্পূর্ণ হব না। সম্পূর্ণ হবার প্রবৃত্তিটা দৈহিক প্রবৃত্তির মতনই জোরাল, দৈহিকও বোধ হয়। বিজনই ঠিক পথ নিলে। এই সুযোগই আমি চাইছি। জোর করে গ্রহণ করার শক্তি আমার নেই, তাই এরকম ভিক্ষাই করছি।'

রমলা দেবীর বুক কেঁপে উঠে। একবার কোলকাতার বাড়িতে ঘরের মধ্যে একটি সুন্দর লতা টবে রেখেছিলেন, জলসিঞ্চনের ও যত্নের কোনো ত্রুটি হয়নি, সকালে বিকেলে আলো-হাওয়া সেবন করাতেন। একবার দমদমায় মাত্র কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে যান— চিন্তামণি জল দিত— ফিরে এসে দেখেন, লতার একটি তন্তু জানালার পর্দার ওপরকার ফাঁক দিয়ে বাইরের উঁকি দিচ্ছে। তখনই তাকে বিদায় করেন। উর্ধ্বে ওঠার কী অদ্ভুত দুর্নিবার প্রবৃত্তি! পুরুষের অধ্যাত্ম-স্পৃহাকে কি সত্যই বাঁধা যায় না? নিশ্চয়ই যায়⋯রবীন্দ্রনাথ ভুল লিখেছেন, তিনি পুরুষ, স্ত্রীশক্তির পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেছেন।

'আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আপনি আমার চিঠি পড়েন নি? এই সব কথাই ছিল।'

'পড়েছি।'

'তবে প্রশ্ন করছেন?'

'এনে দেব?'

'না, না, আনতে হবে না।'

'লজ্জা করছে? আচ্ছা, আমি আনব না। যে-সাহায্য আমার কাছে চাইছেন তা আমি দেব না, তাতে মিথ্যা আশ্রয় পাবে।'

'আমি মিথ্যা কথা লিখি নি। আপনার মতে সত্য তবে কি?'

'সত্য? সত্য আমাকে চাওয়া। আমি জানি। আপনি জানেন না?'

'জানি কি জানি না তাও জানি না। তবে এককালে, কিছুদিন পূর্বেও, সেইটাই হয়ে উঠেছিল সত্য। একটা আস্ত পাহাড় কেটে মন্দির তৈরি হচ্ছিল⋯ কিন্তু কাজ বন্ধ হল। সেদিন আর নেই। আজ কে সে-মন্দির সম্পূর্ণ করবে? যারা জানত তারা হয়ত গত।'

'না মরেনি, বেঁচে আছে জানি। আপনি মেরে ফেলছিলেন।'

'তারা এখন অসভ্য বনবাসী। আমি শহুরে লোক, তাদের সঙ্গে আমার কোনো কারবার নেই। তার চেয়ে, না-চাওয়া, না-পাওয়াই ভাল। তৃষ্ণার সংস্কারই মায়া। এখন চাইলে অস্বাভাবিক হবে, পেলেও বিষাদ আসবে, আজ না হয় দুদিন পরে।'

রমলা দেবী খিল খিল করে হাসতে লাগলেন, 'আমাদেরও হার মানালেন হিসেবে,... এই বেলা কুলোর বড়ি, আচারের হাঁড়ি তুলে ফেলুন, বিষ্টি আসছে টপ্ টপ্ করে পড়ছে যে মাগো....' রমলা দেবী চেয়ার ছেড়ে ছুটে গেলেন দরজার দিকে, সর্বাঙ্গ দুলে উঠল। ফিরে এসে খগেনবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে সংযত হয়ে বল্লেন, 'পরীক্ষা আমি কখনও দিই নি, তাই তার মর্ম বুঝি না। অত তোড়-জোড়, অত অপেক্ষা, অত ওজন, অমন ব্যবসাবুদ্ধি আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। পরীক্ষা না হয় হল, তারপর? হয় পাশ, না হয় ফেল।...তারপর? পাশ করেও কাজ জোটে না। তখনকার বিষাদই ভয়ঙ্কর... তখন, শূন্য....কিছুই নেই স্বীকার করতেও পারা যাবে না। কি দরকার পরীক্ষার?'

খগেনবাবু নীরবই রইলেন। রমলা দেবীর মুখ দিয়ে কথা ভেসে এল, 'তখন থাকে কি? কি থাকবে? গোটাকয়েক আক্ষেপের ঝুড়ি আর স্মৃতির সিঁদুর চুবড়ি। তখন আমি থাকব না....না, সে কিছুতেই হয় না।'

'সময় চাইছি।' রমা দেবীর উত্তর প্রেতলোকে ঘুরে বেড়ায়— 'কতদিন প্রতীক্ষা করব! এতদিন ছিল সাবিত্রী, পরে এল আধ্যাত্মিক সাধনার সুদীর্ঘ অধ্যায়, মমতাহীন, অন্তহীন আদর্শের এ কী অত্যাচার? পরজন্ম মানি না, আমি হিন্দু নই, স্ত্রী, সামান্য মেয়ে।'

রমলা দেবীর মুখ থেকে একটি মাত্র বাক্য নিঃসৃত হয় .. 'আমাদের কাল নেই, সময় নেই।' খগেনবাবুর তরফের তারে ঝঙ্কার ওঠে, ঘরের কোনে ঘেরা-টোপের মধ্যে অবগুণ্ঠিতা বধূর মতন দিলরুবা ছিল, তারই তার ঝন ঝন করে উঠল, দ্যুলোকে বার্তা ছড়াল....প্যারিসের রাস্তায় অ্যালান পো বন্ধুর সঙ্গে হাঁটেন, কথোপকথন থেমে যায় অনেকক্ষণের জন্য, পো কথা শুরু করেন আবার, যেন কোনো কালে থেই হারায় নি, সময়ের স্রোত রুদ্ধ হয়নি ...হারায় না কোনো সুতো, ছেঁড়ে না কোনো তার, কেবল নেমে যায়, ওস্তাদের একটি মোচরে আবার সেগুলি তরফের তার হয়ে ওঠে, তাই নীরবেই কথা খোলে....নীরবতার অন্তরে বিনিময় সম্ভব, সামান্য ও বিশেষের বিনিময়, ও ভবিষ্যতের দান-প্রতিদান, অগ্র-স্তি ও অবস্থিতির বোঝাপড়া....বাদী-প্রতিবাদীর সম্পর্কে নয়, বন্ধুভাবে কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে চলা। খগেনবাবু চান সামান্যে অনুবিষ্ট হতে, রমলা দেবী নিজেকে সাধারণ ভাবেন। কিন্তু পার্থক্য আছে; জুড়ির এক তার বাঁধা, অন্যটি

মধ্যমে, তাই এখনও আঘাত শোনা যায়, মধ্যমের ব্যাকুলতায় খগেনবাবু ব্যথিত হন। তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'আমি কিন্তু আপনার কাছে অনেক প্রত্যাশা করি। আমি আপনাকে অন্যভাবে দেখেছি, আমি ত' বলেইছি।'

'মিনতি করছি, জোড় হাত করে। পায় পড়ব? তবে মন উঠবে? ভয় নেই, পা ছোঁব না। আমি যেমন তেমনই থাকতে চাই। আমাকে কারুর টেনে তুলতে হবে না। অত্যন্ত সাধারণ মেয়েকে খোশামোদ করে উচ্ছন্ন দেবেন না। এত, এত সাধারণ যে কী বলব! আপনার মাসীমাকে জিজ্ঞসা করবেন— তিনি জানেন, যেমন সাধারণ মেয়েরা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে আমি ঠিক তেমনিটি। সুজনকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে জেনেছে তার রমাদি কত সাধারণ। আগে ভাবত আমি বুঝি একটা কেও-কেটা, তাই ত' গাড়িতে অনেক উপদেশ দিলে 'তুমি' বলতে বারণ করলে, দূরে রাখতে উপদেশ দিলে। এখন সে টের পেয়েছে! যারা ইচ্ছে করে চোখ বুজিয়ে রাখে তারাই টের পায় না, পাবেও না। তারা নিজেকে ঠকাচ্ছে, বলে দিলাম, বলে দিলাম····'রমলা দেবী অশান্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সানাইয়ে বেহাগ বাজে। সংগীত কখনও না ভালবেসে থাকা যায়! এ যে 'প্রিয়বস্তু' নয়, সংগীত যে প্রাণের ভাষা। এতদিনকার মৌন সন্ন্যাসীর মুখ আজ খুলেছে। প্রথমে বাজে সুর, অতি ধীরে. ধীরে ক্রমে আকাশে বাতাসে ছড়াল, সরু তুলির নিষ্কম্প শায়িত রেখার ওপর আবার তুলি পড়ল যেন, রেখার রূপ ফুটে উঠল, চোখ কান ভরল, পিপাসা মিটল। কতক্ষণ নিশ্চলতা সহ্য হয়? নিম্নগতির ইংগিত পাওয়া যাবে, নিখাদে নামল একটু কেঁপে, স্থায়ী শুদ্ধ নিখাদ, চিরস্থায়ী নয়, তাই পঞ্চমে ডুব দিয়ে গান্ধারে ওঠে। তীব্র গান্ধার, আরোহীতে রেখাবের স্পর্শবর্জিত, মধ্যমের আত্মীয়। আত্মীয়তা বজায় রেখে সুর আবার গান্ধারে ফিরল। আর পারা যায় না, গান্ধারে মন বসে না, কান যেন পঞ্চমের শান্তি ভিক্ষা করে।

এখনও পঞ্চম এল না? কোমল মধ্যমের আক্ষেপে কড়ি মধ্যমের অনিশ্চিত আকুলতায় মন বিক্ষুব্ধ হয়, সুর ঘোরে কড়িমধ্যম ও মধ্যমের আবর্তে। মন চায় পঞ্চমের শান্তি।

পঞ্চম এল কিন্তু রইল না।

বেহাগের অস্থায়ী কৈশর, তার প্রসার নিখাদ-গান্ধারের আশ্রয়ে। সে আদি সুরে স্থিত হয় না, তার ঘর-বসতে মন ওঠে না ছোটাছুটি তার নিখাদ, গান্ধার, মধ্যম ও পঞ্চমের চার পাশে, দুষ্ট ছেলের মতন লুকোচুরি খেলা, সুরের বুড়ি ছুঁয়ে পালানো আবার দুই মধ্যমের সন্ধিক্ষণে ভয়, পাছে অজানা কেদারায় হারিয়ে

যায়। পঞ্চমের সোয়াস্তি ক্ষণস্থায়ী ?

চড়া সপ্তকের স্বরের জন্য ব্যগ্রতা আসে। স্বর ওপরের নিখাদে উঠেছে···আর ভয় নেই, সব স্বরকে টেনে তুলবে এই স্বর।

যৌবন চলে ক্ষিপ্রগতিতে, রাগ এখন উর্ধ্বমুখী, বিষণ্ণ আত্মকেন্দ্র নয়, তার ভরসা বেশি, আশা অনেক। স্বর ওপরের গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চমে লাগল, আবার ফিরল। আরোহী কি সেই পুরাতন ছকেরই পুনরাবৃত্তি ? বিবর্তন কোথায় ?

খগেনবাবু অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনেন কানের পাশে হাত রেখে, যেন তার উত্তরের ওপর জীবন নির্ভর করছে। স্বর নামছে মুদারায়, পরম্পরা বজায় রইল, কিন্তু···

এবারকার স্বরের ওজন ভিন্ন, তাই সুরের প্রকৃতিতে গভীরতা এসেছে। যৌবনাবশেষের প্রত্যাগমন, কৈশোরের খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফেরা নয়। শিশুর হাসি ও পরমহংসদেবের হাসি সমগুণাত্মক হতে পারে না। এ মিলন অন্য শ্রেণীর।

এ-সংগীতে ওঠা নামার সঞ্চারণেই সুরের গভীরতা, পার্শিয়ান ছবিতে একটি কি দুটি অতিরিক্ত রেখাতেই যেমন অন্য প্লেনের ইংগিত। পরম্পরার মধ্যেই মীড়, গমক, মূর্ছনা আশ সব অলঙ্কার ভরতে হবে। ওদের দেশে হার্মনি সম্ভব, তাদের বহুমুখী জীবন থেকে উদ্ভূত। ওরা চতুর্মুখ, তাই সমাজে সৃষ্টি, গানেও সৃষ্টি। সর্বসাধারণের জীবন ওদের কাছে অন্যভাবে সত্য। এদেশে পরম্পরার আরোহী-অবরোহী, বিস্তার, অলঙ্কার। তবে ? তবে !

রমলা দেবী ঘরে এলেন। বেহাগের খেলা সাঙ্গ হল। খগেনবাবুর মনে শান্তি আসে, চিরশুদ্ধির পর। স্থিরকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'সুজন কি বলেছিল ?'

রমাদেবী একদৃষ্টে চেয়ে থেকে উত্তর দেন, 'সে বলেছিল, রমাদি, তুমি বোলো না— দূরে রেখো।'

অনেকক্ষণ পরে খগেনবাবু চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কি ইচ্ছে করে ?'

রমলা দেবী আনত নেত্রে উত্তর দেন.'আমার ইচ্ছা। ও-সব ইচ্ছা হয় না, তবে আপনি আমাকে তুমি বলুন। আমি আপনার ইচ্ছামত, আপনিই বলব।'

'বেশ।'

'বলুন।'

'কি বলব ? সুজন আমার চিঠি ও ডায়েরি পড়েছে ?'

'পড়েছে। তাকে লেখা আপনার চিঠিও পড়েছি।'

'কী ভাবে কে জানে।'

'আমার ভাই-এর মতনই ছিল।'

'ছিল।'

'এখন বয়স হচ্ছে। পারবে না।'

'বুঝলাম না।'

'দরকার নেই। অধ্যাত্মজগতের খবর নয়।'

'সুজন খুব ভাল ছেলে।'

'ভাল মন্দ নেই, কোথাও, কেউ। সাধারণ ছেলে। যে সাধারণত্ব অন্যে গায়ের জোরে দাবি করে সেটা তার সহজাত, স্বাভাবিক।'

'তা অনেকটা ঠিক। জবরদস্তির কাজ বোধ হয় নয়। আজকাল আমি আগের চেয়ে সহজ হয়েছি। এখন, আমার তাই মনে হচ্ছে। কি মনে হয়—তোমার? সানাই-এ বেহাগ শুনছিলাম, আরোহীর তান নেওয়া সোজা, অবরোহীরই শক্ত। কিন্তু আরোহী-অবরোহী দুই-এ মিলেই রাগ সৃষ্টি হয়। বেশ লাগছিল। তুমি কোথায় ছিলে? থাকলে ভাল লাগত। শুনছিলে বুঝি? ....সহজ হই নি?'

'প্রমাণ পাই নি।'

'প্রমাণ দেব? সুরটা? আমাকে হয় ত বিকল করেছে। প্রমাণ চাই তোমার?'

খগেনবাবু এগিয়ে এসে রমলা দেবীর মুখ নিজের দুটি করতলের মধ্যে রেখে চোখের দিকে চেয়ে রইলেন, পাতা বোজা, সমগ্র মুখে, দেহে, নিঃশ্বাস রুদ্ধ ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

খগেনবাবু বল্লেন, 'কার পলক শক্ত দেখব?'

রমলা দেবীর কপালে ঘাম ফুটল, ঠোঁটে হাসির রেশ লাগল। খগেনবাবু দুটি আঙুল দিয়ে চোখের পাতা খোলেন, রমা দেবীর মুখ লাল হয়ে ওঠে।

'খুব কাল ত! ভাবতাম ছিপির রঙের মত!'

রমা দেবী মুখ ছাড়িয়ে আঁচলে মুখ ঢাকতে চেষ্টা করেন।

নিচের দরজায় কে কড়া নাড়ল।

নিঃশ্বাস ফেলে রমলা দেবী বল্লেন, 'মহারাজিন! সময় দিতে রাজি। কিন্তু কাশী ছেড়ে যাওয়া হবে না। আমার কী কষ্ট হয় না! কেবল নিজের সুখই কি দেখতে হয়। যা হবার এইখানে বসেই হোক, অন্য কোথাও যাওয়া হবে না, আমি পরিষ্কার বলে দিলাম।'

'আচ্ছা, যাব না, আপাতত।'

'বড্ড গান শুনতে ইচ্ছে করছে। আর বাজবে না সানাই? বাজুক না।'

'শুনতে চাও?'

'বড্ড চাই, এই সময়।'

'কার সঙ্গে? বল, তোমার সঙ্গে।'

'বেশ সুজন মরুক। তোমার সঙ্গে!'

'চল, ঘাটে যাই। এই কাপড়েই চল। খুব ভাল দেখাচ্ছে।'

'সত্যি? ছাই। ছাদে যাই এস। সেখান থেকে গঙ্গা দেখা যায়।'

'সত্যি ভাল দেখাচ্ছে। চল।'

দুজনে তেতলার ছাদে গেলেন। ক্বচিৎ কোথাও নৌকার ছাউনির মধ্যে আলো জ্বলছে। খুব দূরে বাঁকের মুখে নদীতীরের একটি প্রাসাদের আলো তারার মতন ঝক্ ঝক্ করে, কখনও নীল, কখনও সাদা, কখনও লাল।

'মাণ্ডুর রাতের কথা মনে হয়। যেখানে রূপমতী বাজবাহাদুরের জন্য অপেক্ষা করতেন, গান গাইতেন, বীণা বাজাতেন, সেই হাওয়া-মহলে দাঁড়িয়ে আমি মালোয়ার উপত্যকা দেখছি এক অন্ধকার রাতে। রূপমতীর জন্য বাজ্ নদী আনলেন হাজার ফুটের ওপরে। সেই নদীর ধারে একটি গ্রামে রূপমতী কিশোরী হন। আমি হলে ও-মহল তৈরি করতাম না।'

'কেন?'

'পিত্রালয়ের স্মৃতি প্রেমের অন্তরায়।'

'সেই নদীর ধারেই না বাজ্‌বাহাদুর রূপমতী সখীদের সঙ্গে বীণা বাজাচ্ছেন প্রথমে দেখতে পান? তারই খাতিরে নদীকে পাহাড়ে তোলা। সেই স্মৃতির মূল্য দিয়েছিলেন বলেই না লোকে এখনও বাজ্‌কে ভুলতে পারে নি!'

'কিন্তু বাজের একাধিক রূপ ছিল প্রমাণ হয়েছে। লোকটার আরেকটা নেশা ছিল, যুদ্ধ।'

'ও-সব মিথ্যা কথা। আজকের জন্য··· কেমন?'

'আরেকবার দেখেছি··'

'মনে রেখো না কোনো কথা, মনে রেখো না— স্মৃতির শাপ মহাশাপ··· বাঁচতে দেয় না। এস, বসে থাকি। বাজুক না সানাই একবার— বাজবে না?'

অনেক রাতে ফিরে এসে খগেনবাবু দেখলেন টেবিলের ওপর কাগজে লেখা রয়েছে, এসেছিলাম দশটার সময়, কাল সকালে আসব। সুজন'

এগার

সকালে অক্ষয় সুজনের বিছানায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। সুজন মুখ বুজে শুনে গেল। গল্পের বিষয় একজন নামজাদা শিক্ষিত সাধুর পতন। অক্ষয়ের মজা করে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বলার ভঙ্গিতে সুজনের হাসি পাচ্ছিল। খগেনবাবু সঙ্গে কাল দেখা হয়নি, অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে ছিলেন। সকালে দেখা করতে যাবার কথা না লিখে এলেই হত। সুজন একবার উঠতে গেল, কিন্তু অক্ষয় টেনে বসিয়ে দিয়ে বল্লে, 'কতদিন একত্র খাওয়া দাওয়া হয় নি, আজ ছুটি, বিকেলে একবার আমার ঘুরে এলেই চলবে।'

খাওয়া-দাওয়ার পর সুজন খগেনবাবুর বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। মোড়র মাথায় তেষ্টা পেল। সামনেই একটা শরবতের দোকান। পূর্ববঙ্গীয় একটি যুবক এক গেলাস আঙুরের শরবত দিলে। বসবার ঘরের কোনে পর্দা টাঙানো, তার আড়ালে শরবত তৈরি হয়। পূর্বে দোকানটা ডিস্‌পেন্‌সারি ছিল নিশ্চয়। ভেতর থেকে চাপা গলার আওয়াজ এল। পর্দার তলা দিয়ে গোড়ালি তোলা মেয়েলি জুতো দেখা যাচ্ছিল। সুজন চোখ ফিরিয়ে নিলে, ফিস্‌ ফিস্‌ কথা শুনবে না মনঃস্থ করলে। সন্দেহ হল যেন গোপন পরামর্শ চলছে, তাকে বাদ দিয়ে। টাকার চেঞ্জ নিয়ে কান বন্ধ করে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

খগেনবাবুর কাছে গিয়ে কী হবে! মাসীমার বাড়ি গেলে হয়।

মাসীমা বিশ্রাম করছেন। সুজন পা টিপে ঘরে ঢোকে। মাসীমার চোখ বোজা, কিন্তু তারা দুটির একটুখানি দেখা যায়, সাদা অংশটাই বেশি ; ঠিক সাদা নয়, ঘোলাটে। যেন শিবনেত্র, সমাধির নয়, মৃত্যুর। হাতের চামড়া লোল, কনুই-এর কাছে অত্যন্ত কোঁচকানো, হাজার কেঁচোর গাঁদি লেগেছে। গোড়ালি ফাটা, মুখ ফাটেনি, গালের হাড় দেখা যায় না, এখনও কচি। শোনের নুড়ির মতন সাদা চুল, কিন্তু একটি গোছের ডগা এখনও কোঁকড়ানো। পাশ ফেরবার সময় মাসীমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে এক গেলাস জল খেলেন।

'কখন এলে বাবা? ডাক নি কেন? তেষ্টা পায় নি? এত রোদ্দুরে কি বেরোতে আছে?'

'আপনি একটু জিরুচ্ছিলেন তাই আর বিরক্ত করিনি।'

'খগেন কোথায়?'

'আমার সঙ্গে আসেন নি। নিশ্চয়ই বাড়িতে।'

'মিছরির শরবত করে দেব?'

'না। মাসীমা আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। আপনাদের ছেলেবেলার কথা শুনতে বড় ইচ্ছে হয়। কখনও কারুর কাছে শুনিনি। আমার মাসীমাও ছিল না।'

মাসীমা সুজনের 'না' বোধ হয় শুনতে পান নি, মিছরিপানা ঢালা উবুড় করে দিলেন, সুজন এক চুমুকে খেয়ে ফেল্লে।

'মাসীমা আপনার ক'বছরে বিয়ে হয়?'

'ন-দশ বছরে।'

'বিয়ের ব্যাপার মনে আছে? বলুন না মাসীমা।'

'একটু মনে পড়ে। কে যেন ভোর বেলা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে, পাড়ার মেয়েরা জল সইতে গেল, আমারও যেতে ইচ্ছে করছিল, নিয়ে গেল না। উপোস করে খিধে পাচ্ছিল, ঠাকুর বল্লেন, খেতে নেই। আমাদের সময় রোশনচৌকি বাজত। বেশ লাগছিল। সন্ধ্যাবেলাতেই শাঁখ বেজে উঠল, পাড়ার মেয়েরা দোতলার বারান্দায় ছুটে গেল··· বর আসছে, বর আসছে রব উঠল, আমারও ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পা ভারী ঠেকল। তারপর মনে নেই···ভারী ঘুম এল··· ভোর রাতে লগ্ন ছিল।'

'শুভদৃষ্টি মনে পড়ে?'

'একটু একটু।'

'মাসীমা, তুমিই বলি, কেমন? তোমাদের মধ্যে, পরে, ঝগড়া হত না?'

'হত বৈকি। তবে ব্যোম ভোলানাথ মানুষ, বেশিক্ষণ রাগ রাখতে পারতেন না, আমিই মরতাম গুমরে গুমরে।'

'আচ্ছা, মাসীমা, কিছু মনে কোরো না, তুমি হিংসে করতে না?'

'হিংসে সকলেই করে।'

'তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি ছিল?'

'সবই ছিল। আমি আদরের বৌ ছিলাম।'

'তোমরা স্বামী ছাড়া আর কাউকে জানতে না, নয়?'

'জানব না কেন? আত্মীয়স্বজন সকলকেই জানতাম।'

'স্বামীকে নিয়ে পৃথক সংসার পাততে চাইতে না?'

'চাইবার সময় পেলে কী করতাম বলা যায় না। তখন বোধ হয়.আমরা ও-রকম সুখ চাইতাম না।'

'তোমরাই ছিলে ভাল। খগেনবাবুকে তুমিই মানুষ করেছ শুনি, তুমিই নাকি তাঁর বিয়ে দাও, তারপর কী করে ছেড়ে কাশী এলে ভেবে অবাক হই।'

'আমারও ত' ধর্মকর্ম আছে, না, পরের সংসারে চিরকাল থাকব, বাবা.?'

'খগেনবাবুকে মানুষ করলে, আর সে হল পর।'

'বড় হলে, বিয়ে দিলেই ভাবতে হয় পর। শক্ত জানি, কিন্তু পরকালের চিন্তা আমার হয়ে কে করবে ?'

'আমাদের ও-সব বালাই নেই, তাই বোধ হয় ছেড়ে দেওয়ায় আমাদের অত কষ্ট। কষ্ট নয় মাসীমা ? তোমার অবশ্য খগেনবাবুর ওপর ভালবাসা কমে নি, নিশ্চয়ই নয়, নচেৎ, অত উদ্বিগ্ন হও কেন ? আমি বুঝতে পারি।'

'তাই কখনও কমে! খাদটাই কমে, সোনাটাই বাড়ে।'

'আমি জানি না কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি। নিশ্চয়ই কমানো যায়। কী ভাবে যায় ঠিক বলা যায় না। এমন যদি হয়, সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল শরীরটা বেশ হাল্‌কা হাল্‌কা— বেশ হত তা হলে, নয় ?'

'রোজ দেখছ, রোজ রোজ সেবাযত্ন, মেলামেশা করছ, শেকল পড়ছে। অভ্যাস চলে যাক, শেকলে মরচে পড়বে, তার জোরও কমবে।'

'কিন্তু মরচে পড়লে বড় ভারী ঠেকে। অন্য উপায় আছে নিশ্চয়। নেই মাসীমা ? জান না ?'

'কি করে জানব বল। লেখাপড়া শিখিনি, কেউ শেখায় নি, শিখতেও চাই নি। তবে মনে হয়, কেবল ভেসে বেড়ালেই মায়া কাটানো যায় না, বরঞ্চ বাড়ে, যত শেওলা এসে জোটে। জোর করে কাটাতে হয়।'

'জোর চলে কি ? ভাসাটাই সহজ। সকলেই তাই সহজ উপায় নিতে চায়। কে আর অত ভাবে বল। তোমরাও ভাস মাসীমা, সংস্কারের স্রোতে। যেটা সহজ সেটাই ভাল।'

'কোনটা ভাল কোনটা মন্দ কে জানে বল। তবে গোটাকয়েক অভ্যাস গুরুজনেরা ভাল বলে এসেছেন, তাই তাদের বিচার না করেই ভাল বলি। তেমনই, লোকে বলে খারাপ অভ্যাস, আমারও বলে থাকি।'

'মাসীমা, বিধবাদের বিয়ে দেওয়া উচিত ?'

'আমার মুখ থেকে শুনে কি হবে।'

'তবু বলই না!'

'ছোট বেলা বিধবা হলে বড় যন্ত্রণা। যদি না পারে থাকতে কেউ তবে সে বিয়ে করুক। বিদ্যাসাগর মশাই-এর তাই মত ছিল।'

'না পারলেই যদি স্বাধীনতা পাবার অধিকারী হয় তবে যারা স্বামীর ঘর করতে পারে না, তারাও স্বামী ত্যাগ করুক। তার পর যা হয় হোক।'

'স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে কোথায় আসবে। বাপের বাড়ি ?'

'যাদের তিন কূলে কেউ নেই ?'

'তারা যেন ঝগড়া না করে।'

'স্বামী যদি যন্ত্রণা দেয়?'

'মেয়ে মানুষ কি করে খাবে?'

'যদি ধর রোজগার করতে জানে?'

'রোজগার করুক— কিন্তু....'

'কিন্তু কেন মাসীমা?

'সে মেয়ে আজ না হয় কাল বিয়ে করবেই। যে একবার স্বাদ পেয়েছে—'

'বাঘের মতন! ঠিক বলেছ মাসীমা। অথচ, অশিক্ষিতা মেয়েদের বেলা অমত করছ।'

'তাদের কাছে বিয়েটা মানুষের গা চাটা নয়, রক্ত খাওয়াও নয়।'

'মাসীমা, তুমি আজকালকার শিক্ষিতা মেয়েদের জান না।'

'না বাবা, মেমসায়েবদের চিনি না। মুকুন্দ যাকে মেমসায়েব বলে সে মেয়েটি কে?'

'তিনি? খগেনবাবুর বন্ধু।'

'সেদিন বল্লে, বৌমার আলাপী।'

'সেই থেকেই খগেনবাবুর সঙ্গে মেলামেশা।'

'বৌমা মারা গেল কি ওঁরই জন্যে?'

'না, না, মাসীমা, ও-সব ভুল। অবশ্য আমি কিছুই জানি না।'

'তার স্বভাবে ছিল হিংসে....যেমন সকলের থাকে....। ইনি কাশী এলেন কেন? স্বামী কোথায়?'

'আমি সঠিক জানি না। তবে, শুনেছি, লোকটি সুবিধের নয়।'

'মার-ধোর করে? অসচ্চরিত্র?'

'আমি জানি না।'

'সেদিন বল্লে তোমার আত্মীয়। ঝগড়া করে এসেছেন বুঝি? ওঁরই কথা বলছিলে এতক্ষণ?'

'ধরুন, ওঁরই কথা। ওঁর এখন কি করা উচিত?'

'ওঁর কাশী থেকে চলে যাওয়া উচিত। অন্য জায়গায় মাস্টারী করুন গে, অনেকেই অমন করছেন।'

'টাকার অভাব নেই।'

'তবে পয়সা নিয়ে ঝগড়া? নিজে বড়লোকের মেয়ে আর স্বামী বুঝি গরীব?'

'অতশত জানি না। টাকার দরকার নেই শুনেছি।'

'ছেলেপুলে নিশ্চয়ই নেই, থাকলে ভদ্রঘরের মেয়েরা চলে আসতে পারে না। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে, নইলে কপালে অশেষ দুঃখ আছে।'

'মাসীমা, উনি খুব ভাল মেয়ে।'

'যতই ভাল হন, দুঃখ আছে কপালে। ভালদেরও অব্যাহতি নেই।'

'আমারও তাই সন্দেহ হয়। দু'জনেরই কপালে দুঃখ।'

'দুজন কে? খগেন?'

'মাসীমা, আপনি কী বলছেন!'

'আমি ভুল বুঝেছি কি?'

'খগেনবাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন; আমি সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

সুজন উঠে পড়ল। মাসীমার চিবুক ঝুলল, এবার হাড় দেখা যায়, চোখের জ্যোতি মলিন হয়, অস্বচ্ছ ঘোলাটে আবরণ জীবনের সকল চিহ্নকে এক মুহূর্তে লুপ্ত করে। শীর্ণ, লোলচর্ম হাত দুটি কোলের ওপর ন্যস্ত, একটি সিবীল্, পাথর নয়, হাড় নয়, বহু পুরানো কাঠ, মাটির মধ্যে থেকেও ঠাঁট বজায় রেখেছে, সাবধানে ছোঁয়া চাই, নচেৎ ধূলিসাৎ হবে···চোখে পাতা নড়ল, তখন বিশ্বাস হয় এ মূর্তি গুঁড়ো হয়ে যাবে না অত সহজে।

সুজন খগেনবাবুকে এবারও বাড়ি পেল না। পাবে না যেন প্রত্যাশা করেছিল। তবু কেন বিরক্তি আসে? মুকুন্দ হাত নেড়ে বল্লে, 'কোথায় আর যাবেন! দেখুন গে ম্যামসায়েবের বাড়ি!' মুকুন্দর মন্তব্য শুনে সুজন অপ্রস্তুত হল, কিন্তু মুকুন্দর ভঙ্গিতে তার অপরাধ সম্বন্ধে সজ্ঞানতার কোনো চিহ্ন নেই। শান্ত-কণ্ঠে সুজন বল্লে, 'মুকুন্দ যত বুড়ো হচ্ছ ততই যেন কী হচ্ছে তোমার! তুমি কোলকাতায় ফিরে যাও।'

'যেতে পারলেই বাঁচি, কিন্তু কোন চুলোয় যাব! ঠাকরুণকে দেখবে কে!'

কথা কইবার ও ঝাঁজ প্রকাশের সুবিধা পেয়ে মুকুন্দ আপ্যায়িত করে সুজনকে দোতলায় নিয়ে গেল। 'বসুন কখন ফিরবেন জানি না। বাবাঃ— দম্ আটকে মরব এবার। ঠাকরুণকে যদি না দেখতে হত, তবে কোন্···'

'এতদিন তিনি কি তোমার তদারকেই ছিলেন?'

'তা বলছি না। অমন পাপিষ্ঠ আমি নই। বাবা বিশ্বনাথই দেখেছেন, এখনও দেখবেন, সেই সঙ্গে আমিও কাছে কাছে থাকব।'

'তা ভাল। আচ্ছা, মুকুন্দ, তোমার বাবুর কী দশা হবে ভেবেছ?'

'বাবা! তাঁকে দেখবার ভাবনা! চিন্তামণি দেখবে, ইংরেজী জানে, কত কেতা তার দুরস্ত! আমি মুখ্খু মানুষ, গেঁয়ো ভূত···ঠাকরুণই আমাকে বাবুর কাছে

পাঠালেন, নইলে, আমি ত ঠাকরুণেরই লোক, তা বুঝি জানেন না?'

'খুব ছেলেবয়সে বুঝি মাসীমার কাছে আস?'

'আমার ভগ্নিপোত কর্তার খাস চাকর ছিল— বেয়ারা যাকে বলে গো! কবে অনাথ হলাম জানি না, দিদিটাও মরে গেল। তখন ভগ্নিপোত বল্লে, তুই ছাড়া আমার দুকূলে কেউ রইল না রে! আমাকে আনলে কর্তার কাছে। আমি হলাম গিন্নীর চাকর। একটা ঝি ছিল তাঁর নিজের— তার বাড়াভাতে নুন পড়ল ভেবে প্রথম প্রথম সে খুব পেছনে লাগত। একবার আমার খুব জর হল, বুকে সর্দি, ঝিটা, তাকে পিসি বলতাম, কি সেবাটাই না করলে বাবু! গরম মাসকড়াই-এর তেলে আমাকে চুবিয়ে রাখলে। এই মরি কি এই বাঁচি! একদিন ভোরবেলা শুনি, ভগ্নিপোত বলছে, মোক্ষদা, এর কেউ নেই, তুই ওর সত্যিকারের দিদি। মেয়ে-মানুষের মন, আবার ছোটলোকের প্রাণ! আমিও মলামনা, দিদিও সেই থেকে রোজ লুকিয়ে ভাজা মাছ খাওয়াত, খুব আমসত্ত্ব খাওয়াত— সোনার মতন রং বাবু— বড়বাজারের কালো ঘুঁটে পাওনি!'

'ছেলেবেলা বেশ ছিলে তবে?'

'আমাদের আর থাকাথাকি! তবে হাঁ কর্তা বাবু! কর্তা বাবু ত' কর্তা বাবু! কোলকাতা থেকে ফি শনিবার কাঠের বাক্স ভর্তি করে রকম রকম বোতল আসত। শনিবার রোববার আমাকে ভগ্নিপোত বৈঠকখানায় যেতে দিত না। ভালই করত। বাবাঃ····একদিন, শনিবার রাত্রে লুকিয়ে দেখলাম কর্তা বাবু মেজের ফরাসে শুয়ে আছেন, আর মাথায় ভগ্নিপোত ঘড়া ঘড়া জল ঢালছে। ছুট্টে গিন্নীর কাছে এসে বল্লাম, বাবুর অসুখ, শীগ্‌গির আসুন গে। গিন্নী শুনে চুপ করে বসে রইলেন। উনি ঐ রকম, চিরটাকাল। সে-রাতে গিন্নীর খাটের নিচে ঘুমিয়ে পড়লাম— এত ভয় লেগেছিল। খুব দিল ছিল কর্তার— দু'হাতে বকশিশ····। তারপর কর্তা মারা গেলেন, সজ্ঞানে, তুলসীতলায়। তারপর যা হয়···· পেয়াদা এল। গিন্নী কোলকাতায় চলে এলেন, আমাকে আর ছাড়েন কী করে! সেই থেকেই কাছে কাছে ছিলাম!'

মুকুন্দ নিজের মনেই বকে চলল, 'বাবুকে গিন্নীমা মানুষ করলেন, বিয়ে থা' দিলেন, ঘর-সংসার পাতালেন। বৌমা যেন কেমন-কেমন ছিলেন, ছেমো ছেমো ····গিন্নী দেখে শুনে বন্দোবস্ত করে কাশী চলে এলেন। থাকলে আর ও-সব কাণ্ড ঘটত না। আমি গিন্নীর সঙ্গে আসতে চেয়েছিলাম, গিন্নী বল্লেন, 'ওরা ছেলে-মানুষ, একজন পাকা লোক থাকা চাই।' তাই রইলাম। কতই দেখতে হল, আর কতই না দেখব! যে-কটা দিন বাঁচব বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণে আর ঠাকরুণের কাছে কাছেই যেন থাকি। আচ্ছা বাবু, আপনি ত' বন্ধুলোক, ফেরেও মানুষ,

আপনিই না হয় আমাদের বাবুকে অন্য কোথায় বেড়িয়ে আসুন না? কত দেশ-বিদেশ ত' রয়েছে! আর না হয়, জোরজাবুরি করে, ভুলিয়ে ভালিয়ে, যা করে পারেন, বিয়ে থা দিয়ে দিন!'

'ও-প্রস্তাবটা তুমিই কর মুকুন্দ।'

'তালে আর বাঁচতি হবে না! এই কট মট চাউনি···যাকগে আপনার সঙ্গে আলাপ হল যেন····'

'খেপেছ মুকুন্দ!'

'ভদ্দরলোকেরাই বলে দেয়! আমি এখন বাড়ি আগলে কতক্ষণ বসে থাকব কে জানে! কখন যে ফিরবেন তার পাত্তাই নেই। একটা কাজ থাকত, তবু! চললেন বাবু?'

সুজন বড় রাস্তা পার হয়ে রমলা দেবীর বাড়ির পথ ধরল। ঝাণ্ডা নিয়ে একটা দল বেরিয়েছে। সামনে ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, পিছনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবৃন্দ, সকলেরই কপালে ত্রিশূল আঁকা। সালুর ওপর তুলোয় লেখা, 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ', দেবনাগরী অক্ষর, যেন ঝামা, স্টেশনের সাইডিংএ লাইন থেমেছে মাটির ঢিবিতে, কয়লাগাড়ি এসে ঘুমোয় সেখানে, সেই লাইনে শ্লিপারের ফাঁকে ফাঁকে ঝামা পড়ে রয়েছে কতদিন থেকে। দুজন দণ্ডধারী দুটো ঝাণ্ডা ধরে চলেছে। বৃদ্ধেরা কী আবৃত্তি করছেন স্পষ্ট বোঝা যায় না। চা-এর দোকান থেকে একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্যা চিল্লাছে জী, ঘেউ, ঘেউ?' উত্তর এল, 'পণ্ডিত মদনমোহনের বিপক্ষে সনাতনীরা খেপে উঠেছে, হরিজনদের শিবমন্ত্র দেবার জন্যে, তাই বলছে, পাষণ্ডেণ যৎকথিতম্ তদ্ধেয়ম্।' তদ্ধেয়ম্, তদ্ধেয়ম্, তদ্ধেয়ম্···। সুজন পাশ কাটিয়ে রমলা দেবীর বাড়ি এল।

খগেনবাবু ঘরে একলা বসে আছেন। সুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সকালে গিয়েছিলে? আমার একটু দরকার ছিল। বিশেষ কোনো কাজ আছে কি?'

'বিশেষ? না, তেমন নয়। মাসীমা—'

রমলা দেবী ঘরে প্রবেশ করলেন, সোনালি চাঁপারঙের শাড়ি, কনে-দেখা বেলার রং, ভি-কাটা ব্লাউজ, সমগ্র হাত খোলা, বাঁকা তলোয়ার, শাড়ির পাড়ে বলাকার নকশা— সূর্যাস্তের আভা লেগেছে মুখে, বুকে, হাতে।

'সুজন!'

'এই বেড়াতে বেড়াতে এলাম!'

'যাবে নাকি?'

'কোথায়?'

'বেড়াতে? আমরা একটু বেরুচ্ছিলাম—'

'না।'

'ভাল কথা, বিজনকে চিঠি লিখেছ?'

'লিখেছি। আপনারা ঘুরে আসুন। আমার একটু—আপনি একবার, যদি পারেন, মাসীমার সঙ্গে আজ দেখা করবেন।'

খগেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাসীমার অসুখ? ডেকেছেন?'

'অসুখ নয়। জানি না কী কাজ—অমনি—'

রমলা দেবীর মুখে কে যেন কালি মেড়ে দেয়। সুজন চলে গেল।

'এ শাড়িটা খুব ভাল ত।' রমলা দেবী শাড়ির আঁচল দিয়ে হাত ঢাকেন। দুজনে নিচে নামলেন।

'যেখানে নিয়ে যাব বলছিলাম সেইখানেই যাবে?'

'না, যাব না সারনাথে। ভাল লাগে না।'

'মূলগন্ধকোটি বিহারে একজন ভিক্ষুণী দেয়ালে ছবি আঁকছেন। জাতকের গল্প, রঙের সমাবেশ ভাল, ভালই লাগবে।'

'পুনর্জন্ম, পূর্বজন্ম কিছুতেই বিশ্বাস নেই, না আমার, না বুদ্ধের। এই জন্মই যথেষ্ট— এই আমার সার্থক হোক।'

'অন্য গল্পেরও ছবি আছে। অশোকের এক রানী ছিলেন, নাম দেবী, মধ্য ভারতের এক জংলী রাজার মেয়ে। অশোক তখন যুবক, সম্রাট হননি, বাপের প্রতিনিধি হয়ে সেখানে রাজ্যশাসন করেন। দেবীর সঙ্গে দেখা হয়, একটি ছেলেও হয়। কলিঙ্গ বিজয়ের পর অশোক রাজা হলেন--তারপর ধর্মশাসন শুরু হল। ছেলেকে বাপের কাছে পাঠিয়ে দেবী ভিক্ষুণী হন। পুরাতন স্মৃতিরক্ষার জন্য সাঁচির বিহার তৈরি হচ্ছে— এ ছবিটা ভাল।'

'অশোকের অনেক স্ত্রী ছিল?'

'চার পাঁচটি ত' বটেই। তিষ্যরক্ষিতার কাহিনী নিশ্চয়ই শুনেছ?'

রমলা দেবী জোরে ঘাড় নেড়ে বল্লেন, 'আমি সারনাথ যাব না। ঘাটে যাই চল। লোকালয় তোমার আজকাল প্রিয়, নয়? এই যে শুনলাম কাল!'

'এইখানেই বসবে?' খগেনবাবুর দৃষ্টি পড়ল রমলা দেবীর হাতের ওপর···· হগ্ সাহেবের বাজারে মাংস ঝোলানো রয়েছে, পাউডার ঘামে জড় হয়ে চর্বির মতন দেখাচ্ছে। 'বাইরে চল, বাইরে চল বলছি, এখানে বসা যায় না।' রমলা দেবী বিস্মিত হলেন দেখে খগেনবাবু একটু চেঁচিয়ে বল্লেন, 'চল ঘাটে, এখানে আমি আর বসতে পারছি না। তাই চল রমা। নিশ্চয় বসার জায়গা আমরা পাব। ভিড় হয়, নৌকায় বেড়ানো যাবে, সেই ভাল কেমন? চল, একসঙ্গে বসে

সানাই শুনব। না হয়, চুপ করে বসে থাকব। কথায় বাধা তোলে, নয় রমা? তুমি আর এ-কাপড় এ-জামা পোরো না। একজন লোক ছিল সে তার স্ত্রীকে রঙিন কাপড় পরতে দিত না, তার কষ্ট হত। তুমি তাকে চেন না। ঘাটের এক ধারে বসব। পুরো হাতার জামা তোমার নেই? আজ থাক্ পরে তাই পোরো। কেমন?'

দুজনে ঘাটের দিকে এগোলেন। সন্ধ্যা হয়, এখনও অন্ধকার নামে নি। বড় রাস্তা থেকে একটা গলি বেরিয়েছে, পার হবার সময় একটা মোটর এসে থামল। অক্ষয় এঞ্জিনিয়ার তাড়াতাড়ি নেমে গলির মধ্যে অদৃশ্য হলেন, যাবার সময় চাঁপা রঙের শাড়ির দিকে চাইতে চাইতে। রমলা দেবী আঁচল দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকতে গেলেন। খগেনবাবু ও রমলা দেবী হাঁটতে হাঁটতে ঘাটের অনেক দূর পর্যন্ত এগোলেন।

'তোমার খারাপ লাগছে। লোকজন?'

রমলা দেবী মন্ত্রমুগ্ধের মতন সামনে চেয়েই রইলেন, কোনো উত্তর দিলেন না।

'আমি ওদের চিনি না, তবে চিনতে চাই। এইবার বসবার জায়গা পাওয়া গেল।'

'আরো দূরে চল। ওটা কি সুর?'

'পুরিয়া, পঞ্চম পাবে না, তীব্র মধ্যম তার বদলে, গোড়ায় কোমল রেখাব। বড় জমাটি সুর....'

'মাসীমা তোমাকে ডেকেছেন।'

'আমি যাব না। ও-সব এখন থাক।' দুজনে বসলেন।

কাছেই একটা নৌকা ভিড়ল। অক্ষয় এঞ্জিনিয়ার লাফিয়ে ঘাটে নেমে একটি মেয়ের হাত ধরে নামায়, মেয়েটি ঝোঁক সামলাতে না পেরে খিল খিল করে হেসে অক্ষয়ের গায়ের ওপর ঢলে পড়ে। দুজনে চলে যায়। মাঝি পয়সা চায় না, চেনা-লোক বোধ হয়, পুরানো খদ্দের।

রমলা দেবী বল্লেন, 'বাড়ি চল। আমার গা কেমন করছে।'

'চল পৌঁছে দিই।'

'মাসীমার বাড়ি....মাগো। মাগো। ঐ ছাখ কি ভেসে এল।'

'ও কিছু নয়, খড়।'

'পোড়া বাঁশ....ঐ ছাখ মুণ্ডু....তুমি বাড়ি নিয়ে চল আমাকে।'

খড়, বাঁশ, আর হাঁড়িটা ঘাটে এসে ঠেকল।

বারো

আকাশে ছোট-বড় কত না তরঙ্গ ছোটাছুটি করে। আধারের শক্তি অনুসারে সেগুলি রূপায়িত হয়। খগেনবাবু ও রমলা দেবীর ভাবতরঙ্গ সুজনকে আঘাত করে, কিন্তু সহজে গৃহীত হয় না, সুজনের চঞ্চলতার সঙ্গে কাটাকুটি হয়ে যায়। রমলা দেবী ও মাসীমার সম্বন্ধ সে ধারণ করতে পারে। প্রবৃত্তি ও সংস্কারের দ্বন্দ্বে সেটি স্বতঃই পরিস্ফুট। মাসীমা রমলা দেবীকে স্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু মাসীমারই পরাজয় হবে, কারণ মহাকাল তাঁর বিরুদ্ধে, কেবল প্রবৃত্তি নয়। অথচ, মাসীমারই দিকে সভ্যতার, অর্থাৎ সংযমের সমর্থন। সুজনের প্রতীতি জন্মায় যে খগেনবাবু রমলা দেবীর আগ্রহের একটানা স্রোতে নিমজ্জিত হবেন, এবং সে কূলে দাঁড়িয়ে দুজনেরই আত্মহত্যা দেখবে। বিজনের সোশিয়ালিজম আর খগেনবাবুর নৈর্ব্যক্তিকতার সাধনা এক বস্তু নয়। বিজনের সম্মুখে সর্বনাশ, সে পুরাতনকে অগ্রাহ্য করে নতুনতর সমাজ সৃষ্টি করবে। খগেনবাবু চান মুক্তি। কিন্তু বিজনের মধ্যেও সংস্কার বর্তমান, নচেৎ বিজন, সেই ছোট্ট বিজন, আজ না হয় সে কলেজে পড়ে, টেনিস খেলে, দেশের চিন্তা করে, সেই বিজন কেন তাকে রমলা দেবীর কাছ থেকে টেনে নিয়ে যেতে চায়? বলে গেল কোলকাতা পালিয়ে যেতে, বলে গেল, 'পারবে না।' স্নেহের দোহাই পর্যন্ত দিলে। প্রেম তার সমাজে থাকবে না এই কারণে নিশ্চয় নয়। ওটা কেবল যৌবনসুলভ রুক্ষতা। সেও ত' কত আদর খেয়েছে তার আদরের রমাদির কাছে! সে-রাত্রের আদরের স্মৃতি সুজনের দেহকে রোমাঞ্চিত করে। খগেনবাবু যখন আসেননি তখন মনে হত যে তাঁর রক্ষা হয়ত কালসাপেক্ষ। কিন্তু রমলা দেবীর প্রবৃত্তিকে সে চিনেছিল। সে-রাতে সে তাঁর কাছে খগেনবাবুর প্রক্সি হল! পরিবর্তে, চেঞ্জলিং, পরীতে সত্যকারের খোকাকে মায়ের কোল থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে, রেখে গেছে বোবা-খোকাকে। কিন্তু খগেনবাবুর সাধনা নিষ্ফল হয়েছে। কোথায় গেল তাঁর সাধনা, কোথায় তাঁর জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, কোথায় তাঁর শিক্ষাদীক্ষা! রমলা দেবীর সাধনা যাকে চাইছেন তাকে পাওয়ার; বোঝা যায়, খুব সোজা, কিন্তু খগেনবাবু কেবল নিজেকে ঠকিয়েই এলেন।

রমলা দেবী ডেক্ চেয়ারে শুয়ে ভাবেন তিনি আজ জয়ী। অথচ জয়ের আনন্দ অনুভব করতে পারেন না। উজ্জ্বল শাড়ি, হাত ও গলাকাটা জামা খগেনবাবুর পছন্দ না হওয়ার কারণ সন্দেহ করে লজ্জিত হন। বাড়ি এসেই টান মেরে ফেলে

দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু থাক্, হয়ত পরে, নেহাৎ না হয় অন্য কাউকে দিলেই চলবে, নষ্ট করে লাভ কি! তাঁর সঙ্গে উচিত ব্যবহারই করেছেন। খগেনবাবুর স্বীকারোক্তি শুনে নিজেকে কঠিন রাখতে পেরেছেন এই যথেষ্ট। দুর্বল মুহূর্তে, প্রলুব্ধ হয়ে যদি খগেনবাবু তাঁকে গ্রহণ করতেন তবে গৃহীতার জয়মহিমা বিজিতের বিষাদে মলিন হত। কোথায় কখন কে জেগে ওঠে কেউ জানে না। সুজন কি জেগেছে? তার ব্যবহার অপ্রত্যাশিত মনে হয়। কিন্তু কোনো অভিসন্ধি ছিল না। কেন সে চিরকাল কচি থাকবে! গ্রামোফোনের রেকর্ডে কি কখনও পিন বসবে না! তাঁর কোনো দোষ নেই। রাগ হয় মাসীমার ওপর, মুকুন্দর ওপর। ওরাই কেড়ে নিতে চায়, সকলকে বঞ্চিত করতে চায়। খগেনবাবুকে ভয় করে, যে-রকম মানুষ! তাঁর আত্মসংশোধনের প্রবৃত্তি দুর্বলতার নামান্তর, আত্মবিশ্বাসের অভাব। সে-অভাব দূর করতেই হবে, সে-দুর্বলতা বিতাড়িত করার সামর্থ্য রমলা দেবীর আছে বিশ্বাস হয়। তখন, বুকের ওপরকার জগদ্দল পাথর সরে যাবে, অশৌচের পর শীতল জলে অবগাহন করে করে শুদ্ধ হবেন, দুর্গের অবরোধ ঘুচবে, দুর্গাধিপতি সসম্মানে বহির্গত হবেন। মাসীমা বর্জন করবেন, তবু তাঁরা সুখী হবেন। স্থিরসঙ্কল্প রমলা দেবী চেয়ার থেকে উঠে স্নানের ঘরে যান। বড় আরশি না থাকলে নানা অসুবিধা। ছোট আরশির সামনে মুখ আনেন, কৈ চোখের কোনে চামড়া এখনও মসৃণ রয়েছে ত! বিজন কেন ভয় দেখালে? সে কি চায়? তার সমাজে রমলা দেবীর কি স্থান হবে? হবে একমাত্র তাদের যাদের গঠন সুদৃঢ়, ত্বক মসৃণ, জল পড়লে পিছলে যায়। তারা কি রঙের শাড়ি, কী জামা পরবে? সব সাদা, মোটা খদ্দর। পোড়াকাট সব! রমলা দেবীর বুক কেঁপে ওঠে।

খগেনবাবুর চিত্তে কোনো শান্তি নেই। আত্মশুদ্ধির অস্বাভাবিক প্রচেষ্টায় আত্মম্ভরি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন নৈরাত্মবোধের সঙ্কল্পে চিত্তকে বহির্মুখী করাই তার একমাত্র প্রতিকার। অন্তঃশীল প্রবাহকে বহির্মুখী না করলেই মজে যায়, অথবা আবর্তের সৃষ্টি হয়। এ কি হল! এতদিন সংস্কারের মূলধন ভাঙিয়ে চলল, আজ একটি কানাকড়িও নিজের হাতে নেই, যা বাকি ছিল সব গচ্ছিত রাখলেন, বাঁধা পড়ল রমলার হাতে। এখন সব তারই। তারই শক্তিতে চালিত হবেন ভাবতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। অতএব তার শক্তিকেও ঘোরাতে হবে, চালাতে হবে সকলের মধ্যে। সাবিত্রী কোনো সমস্যাই তোলে নি। রমলা সজীব, তাই সমস্যা সৃজন করে। চিত্তধর্মী ও প্রাণধর্মী মানুষের সহযোগ কি বহির্মুখী সাধনার প্রতিকূল? এতদিন তাই হয়ে এসেছে। সম্পত্তিজ্ঞানের

ওপর মিলনকে প্রতিষ্ঠিত না করলেই চলল। পারা যাবে? রমলার দিকে চাইতে চাইতে অক্ষয় গলিতে ঢুকল, রাগ হল কেন? ঘাটের লোক হাঁ করে চাইছিল, খারাপ লাগল কেন? ওরা অসভ্য। না, না, শিক্ষার অভাবে অসংযত। কেনই বা শিক্ষার তারতম্য হয়। সমাজের দোষে। তাই বিজনের স্বভাব অপরিণত হলেও তার পরিণতির মূলধর্মটা ঠিক। প্রকৃত মিলন সম্ভব। কেন হবে না? সম্পত্তিজ্ঞান

যদি প্রাকৃতিক হত, তবে হয়ত অসম্ভব হত। সেটা মানুষের রচনা, তাই নতুন সমাজে অনুষ্ঠানও বদলে যাবে। যথার্থ মিলনের জন্যও সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিকে সাহায্য করতে হবে। তখন, মিলন হবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া, সুর ও কথার মিলন, রবীন্দ্রসংগীত, দু-এ মিলে তৃতীয়। অতএব যে-শক্তিতে সম্পত্তিজ্ঞান লোপ পায় তারই মধ্যে নবতর সৃষ্টির বীজ রয়েছে। বিজন হয়ত বোঝে নি। তাতে কি আসে যায়! পরে বুঝবে, অন্তত তাই বোঝা উচিত।

নতুন স্তরে অন্যের সঙ্গে মিলনে রমলা কি বাধা দেবে? যেমন সাবিত্রী দিত? না, রমলা দেবে না, এ-রমলা তখন থাকবে না, সে নিজেই অন্য হবে। অন্যের হবে? অত ভাবা যায় না! সুজনকে একবার ক্যাট্যালিটিক এজেন্ট বলেছিলেন। সুজনের সমগ্র জীবনটাই মৈত্রীস্থাপনের সেতুস্বরূপ। যেন সন্দেহ হয় সে-সেতু আজ দুর্বল হয়েছে। দুজনের পদচারণার কম্পনের লয়ে সেতুটি কি ভেঙে যাবে? পদার্থবিজ্ঞানে কেবল একটি দৃষ্টান্ত আছে। সুজন যদি মানুষ হয় তবে সে ভাঙবে না। বিজনের ধাতু কঠিনতর! দেখতে ইচ্ছে হয় তার দৃপ্ত যৌবনকে। হয়ত তার মনের আনাই শখ, তবু শখেরও সাহস আছে। বিবেকানন্দের আত্মা তার ওপর ভর করুক, পরিণতির নীতিতে চলবার সাহস আসুক। মাসীমা রমলা দেবীকে কী অমন অপমান করলেন? রমলা দেবীকে তিনি চেনেন না, তবু কেন অপমান? কিসের পূর্বাভাস? তবু মাসীমা ভালবাসেন, এখনও! রমলা দেবীরই বা ভয় কিসের?

মাসীমা ঘুমোন। নিদ্রা গভীর হয় না এই বয়সে। বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে, সেই আগেকার মতন, যখন বয়স ছিল কম, ছিলেন সধবা, বৈঠকখানা কি বাগানবাড়ি থেকে শুতে আসতে কর্তার দেরি হত, সদর-মহলের বড় ঘড়িটা ঢঙ্ ঢঙ্ করে বুকে ঘা দিত, আস্তাবলের ঘোড়াগুলোর পায়ের খট্ খট্ শব্দ শোনা যেত, একটার সর্দি লেগেই থাকত, ঘুমুত না যতক্ষণ কাল ঘুড়িটা ট্যাণ্ডমে বাবুকে এনে কাঠগড়ায় না ফেরে। উনি তখনও অন্দরে আসতেন না, আসতেন আরো ঘণ্টা খানেক পরে, বুক ধক্ ধক্ করত ততক্ষণ, নিদ্রার ভাণ করতেন,

কখনও ডেকে তুলতেন, কখনও জামা না ছেড়েই এলিয়ে পড়তেন, তারপর নিজে ভোর বেলায় ঘুমোতেন।··· অভিমান কার ওপর। বুকের অসুখ সেরে যায় কোলকাতায় আসার পর··খগেন জোর করে ওষুধ খাওয়াত, বিধবাদের অমনি সারে···কাশীতে এর পূর্বে বুকের কষ্ট হয় নি, আজ আবার কে যেন ধাক্কা দেয়, ঢঙ্ ঢঙ্ করে ঘণ্টা বাজে, খট্ খট্ শব্দ শোনা যায়, ওষুধ খাবেন না কিছুতেই··· তার চেয়ে এক গেলাস জল খাবেন·· ধক্ ধক্, কে রে! খগেন? আয়। মাসীমা উঠে এক গেলাস জল ঢক্ করে খান।

দীপা ঘুমোয় পুতুল কোলে নিয়ে। পুতুলের নিশ্চয় জ্বর হয়েছে। মাথা ব্যথা করছে খুকু? কাল সকালে ওষুধ দেব, লক্ষ্মী···এই ওষুধ খাও, মোটে তেতো নয়, নাক টিপে ধরছি। অক্ষয় এসে খুকির গায়ে চাদর ঢাকা দেয়।

অক্ষয় একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসে। খগেনবাবু তাকে দেখতে পেয়েছে। কি হয়েছে! সঙ্গে ছিলেন কে? চাঁপা রঙের শাড়ি পরা? সুজনও ভেতরে ভেতরে মজা লুটছে··বেশ ছোকরা? মুখেই যত গোঁড়ামি! খগেনবাবু লোকটা ভারী দাম্ভিক। বিজন ছোকরার ভিৎ কাঁচা, কোন দিন ধসে যাবে। ছোকরার স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু আগুন নিয়ে খেলছে। বিয়ে থা করলে সেরে যাবে বদ্‌খেয়াল। দীপার একটু বয়স বেশি হলে বেয়ে চেয়ে দেখা যেত। অক্ষয় সিগারেট শেষ করে বিছানায় যায়— গিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

মাসীমার বুকের ধক্‌ধকানি ধাক্কা দেয় সুজনের মস্তিষ্কে।

ভীষণ পার্থক্য বৃদ্ধার আকুলতার সঙ্গে রমলা দেবীর অধৈর্যের। একজন ছেলের বিবাহ দিলেন, না জেনে যে, ছেলে চিরকালের জন্য পর হয়ে যাবে। অস্বীকার করলে কি হয়? মাসীমা নিশ্চয় পরে বুঝেছিলেন বিবাহ দিলেই নিজের প্রিয়জন পর হয়; তখনও নিশ্চয় ধারণা ছিল বউ রক্তমাংসের পুতুল, সংসার করা পুতুল খেলার সামিল। সেই সকাল থেকে দুধ না খেয়েই সাজান গোছান, তত্ত্বপাঠান, ছেলে আর ছেলের বৌ নিয়ে। সংসার সেই শিশুকালের গৃহিণীপণারই রাজকীয় সংস্করণ। ক্রমে, বৌমা ছেলের ঘরে যায় দুপুর বেলাতেই, ছুতো করে যখন তখন দেখা করে, পান সেজে লুকিয়ে খাওয়ায়। রোজই বন্ধুর বাড়ি খেয়ে আসে, রাতে খায় না। রাগ হয়, না-খেলে— আবার হাসি পায় নিজেদের কথা মনে হলে··সেই প্রথম, প্রথম! সকলেরই এমনি হয়···মাসীমা ভিন্ন নন। গৃহিণী পাড়াপড়শির কাছে গরব করেন, 'আমার ছেলে এখনও আমার রান্না ছাড়া খায় না, শ্বশুর বাড়ি যেতে চায় না, অথচ বৌকেও খুব ভালবাসে', কথাগুলি বলে

গৃহিণী জোরে হাসেন, লুকানো ব্যথা, ধকধকানি, গোপন করতে, পরের কাছে নিচু না হতে। প্রেমেন মিত্রের অনাবশ্যক-গৃহিণী সর্বজনীন। মাসীমার,সংযম হয়ত একমাত্রা বেশি, মুকুন্দ তাই বল্লে, 'উনি বরাবরই কেমন অমনি-ধারা।' সেই ছেলে শ্বশুর বাড়ি যায়, শ্বশুর-শাশুড়ির সনির্বন্ধ অনুরোধে, অবশ্য বেয়ান ঠাকরুণের চিঠি তাঁরই কাছে গোড়ায় আসে। অন্য চিঠিও আসে, বৌমা যখন বাপের বাড়ি থাকেন, দেখতে ইচ্ছে হয়, লজ্জা আসে, পাছে কর্তা ও ছেলে টের পায়, পাছে সেই কাঁচা বাঁকা লেখার প্রমাণ থাকে ছেলে অন্যের হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই মাসীমার ও রকম ইচ্ছে হয় নি কিন্তু সাধারণের হয়। ভয়ে আসে হিংসে, রাগ, বেয়ানের ওপর— বশীকরণ মন্ত্র জানে ও-দেশের মেয়েরা, বেয়ানের বয়স কম, বৌমাই প্রথম সন্তান। গৃহিণী নিজেই একদিন সেজে কর্তার সামনে হাজির হন, কর্তা দেখে ঠাট্টা করেন। অভিমানে পুরানো দামী শাড়ি আর পরা হয় না, বৌমাকেই দেবেন, সাধে, খোকা হলে··· সবই তার, যদি পছন্দ হয়, আজকালকার ঠুন্‌কো মেয়েদের যা ফিন্‌ফিনে্‌ রুচি! ছেলে বৌ ঘর-কন্না করুক এবার। বৌমার হাতেই চাবি থাক, প্রথমে নেবে না, নিয়ে কলতলায় ফেলে আসবে, পরে, চাবি না হলে শাড়ি পড়া হবে না। ক্রমে একটি মেয়ে, আরেকটি ছেলে। মাসীমার নাতি হলে তাঁর কাশী আসা হত না। ভিন্ন ধারাতে সকলের জীবন চলত, সাবিত্রী দেবী মরতেন না, খগেনবাবুও গৃহস্থ অধ্যাপক হতেন। আর রমা দেবী! বোধ হয় তাঁর মা না হওয়ায় ভাল হয়েছে। মা-জাতের কত সহ্য! খগেনবাবুর সন্তান হলে তারা তাদের ঠাকুমার কাছেই থাকত। ঠাকুমা ভাবতেন নাতনিকে সংসারের কাজ শেখাবেন, বৌমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠতেন, খুকি চুল বেঁধে যা। ইচ্ছা হত নাতনি পুজোর যোগাড় শেখে, খগেনবাবু বলতেন খুকি পড়বি আয়। নাতির ওপর জোর খাটে না, যতদিন শিশু থাকে ততদিন সরষের তেল মাখাবার, তুলসী পাতা, মধু, চুনের জল, চিরেতা খাওয়াবার দরকার পড়ে— তাও ডাক্তারে ঘুচিয়ে দিলে, এখন অসুখ করলে ওষুধের বোতল আসে, বাবা নিজে খাওয়ায়। নাতি বড় হয়, এখন কেবল পড়ে ভূগোল, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, জমায় ডাকটিকিট, ঠাকুমার উচ্চারণে, বানানে, জ্ঞানে ভুল ধরে। বড় ভাল লাগে, আরো মধুর লাগে যখন ঠাকুমার বিছানায় বসে দুলে দুলে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে, আর পড়ায় বিজ্ঞানের কথা, সূর্য চন্দ্র তারা কি ভাবে চলে, মঙ্গল গ্রহে মানুষ আছে কি না, চন্দ্রে খাল আছে তার খবর দেয়। দিতে দিতে সেই খাটেই নাতি ঢুলে পড়ে। বৌমা এসে বকেন, ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে রেখে দুধ খাইয়ে দেন···চমৎকার মিষ্টি আর দুষ্টু দেখায় নাতিকে····চাকরে ঘরে তুলে নিয়ে যায়। নাতি নাতনি দূরে সরে যায়, ছেলে পর হয়ে যায়···গৃহিণী, সকল

গৃহিণী সকলের শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। ধক্, ধক্... মাসীমার হৃদয়স্পন্দন দ্রুত এসে সুজনের বুকে ঘা মারে।

কেউ অবহেলা সহ্য করেন, তাঁরা জনক রাজার সন্তান। কেউ বা পূর্ব থেকেই সরে যান...যেমন মাসীমা...এঁরা বুদ্ধিমতী, চরিত্রবতী, দৃঢ়চেতা। যাঁদের অন্তর শূন্য, তাঁরা গুরুর কাছে উঁচুহারে কর্জ নেন। বিধবা হলে কাশীবাসিনী হবার সুবিধা হয়। স্বামী যদি গৃহিণীর নামে পৃথক কিছু রেখে গিয়ে থাকেন তবেই ভাল, নচেৎ মাসের শেষেও টাকা আসে না। মাসীমার বল কোথায়? খগেনবাবু নিজের পেটের ছেলে নয় বলে? টাকার জোর? নাতি নাতনি হয় নি তাই? কি করে মাসীমার এই তেজ আসে যার দাপে খগেনবাবুকে ভালবেসেও ত্যাগ করতে পেরেছেন, এলে যত্ন করেছেন, অথচ নিরাসক্ত ভাবে?

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, বিদ্যুতে ভরা, পুবে হাওয়ার এক ঝলকে পরিষ্কার হয়। সুজন এখন ভাবতরঙ্গ স্পষ্টভাবেই ধরতে পারে।

মাসীমা দাঁড়িয়ে আছেন কোনো এক সংস্কারের ওপর। তাঁর তেজ ও রমলা দেবীর তেজে কত প্রভেদ! তাঁর বিরক্তি আর রমলা দেবীর বিরক্তি ভিন্ন জাতের। মাসীমা সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েও স্বাধীন। পাকাল মাছের মত তাঁর জীবন, কাদায় থেকেও গায়ে কাদা লাগে না। রমলা দেবী একটি সম্বন্ধ ছিন্ন করেছেন অন্য একটি মনোমত সম্বন্ধে জড়িত হবার জন্য। খগেনবাবুর নিজের নিরালম্বতা নিরর্থক, সে-কেবল অবলম্বনহীনতা, তাই তাঁর অক্ষমতা রমলা দেবীর কাছে ধরা পড়ল। তিনি একলা থাকতে পারবেন না, তাঁরও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। হাতের কাছে এই সহজ, পুরাতন, সামাজিক সংসার রয়েছে, তাকে ভেঙে নতুন সংস্কারের কি প্রয়োজন? এক জীবনে সম্ভব? পুরাতনে নাটকত্ব নেই বলে? জন্মদিনে, নববর্ষে, উপনয়নে, বিবাহে, জীবনের সব পর্বেই কি ঘটা করে নতুনের বোধন করা চাই? নিচে দিন, বরষ, জীবন একটানাই বইছে। সেইটাই মূল সত্য, তাই সংস্কার, ওই সাধারণ। মাসীমার জীবন তারই সুরে বাঁধা, তাই বিপর্যয়ের মধ্যেও তাঁর শান্তি অক্ষুণ্ণ। রমলা দেবীর, খগেনবাবুর প্রত্যেক ব্যবহারে ঝাঁজ, উগ্রতা, খরতা, পৃথিবীর ওপর যেন ভীষণ আক্রোশ। জগৎ চলছে ছাড়া আর কি দোষ করেছে? নিজের নিজের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই অত আয়োজন, এত অপচয়— বনেদী বংশের অধঃপতন ঘটেছে, ধারে মাথার চুল বাঁধা, চৈত্রের কিস্তিতে বসতবাটি পর্যন্ত লাটে উঠবে...তবু কালী পূজোর রাতে একশ' ছাগল বলি চাই— সেই বলির বাজনা উঠেছে। সংস্কার ভেঙেছে তাই সকলের প্রাণে ব্যাকুলতা, শান্তি কোথাও নেই, না আছে চিত্রে, না আছে দর্শনে, নেই খগেনবাবুর মনে, নেই রমলা দেবীর প্রাণে। এটা যুগধর্ম। মাসীমা সে-যুগের, খগেনবাবু রমলা দেবী এ-যুগের। বিজন

ভবিষ্যতের। সুজন নিজে কি?

কিংবা হয়ত মাসীমা ও রমলা দেবীর ধর্মই পৃথক। দুজনের আকর্ষণ এক হতে পারে না, মাসীমা জননী, রমলা দেবী প্রিয়া। কামই কি যত গোল বাধায়? সামাজিক ব্যবহারে তার স্থান কোথায়, কতটুকু? একজন পণ্ডিত বলেছে বলেই তাকে প্রাধান্য দিতে হবে! ভারতীয় সমাজে কামকে সংযত করা হয়েছে, উড়িয়ে দেওয়া হয় নি। সংযমের আইনকানুন না হয় বদলাক, কিন্তু সংযমকে পরিত্যাগ করতে হবে? সভ্যতার এতবড় মূলমন্ত্রকে বাদ দেওয়া যায় না। ব্যক্তিগত জীবনের কোনো অধ্যায়ে ঐ রিপুটি হয়ত নায়ক হয়ে উঠল, কিন্তু সমগ্র বইটা পড়ে রয়েছে যে! রমলা দেবীর জীবনে না হয় দেহের ক্ষুধা মেটেনি,…খগেনবাবুরও নয়। কিন্তু খগেনবাবুর কোনো আচরণেই প্রমাণ পাওয়া যায় না যে কাম অবদমিত হয়েই তাঁর আত্মসন্ধানের প্রবৃত্তিকে সদাজাগ্রত রেখেছে। রমলা দেবীর সে-রাতের আচরণকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? সে-রিপু হয়ত আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রসার। শক্তিরূপিনী রমা দেবী, জয়লিপ্সাই তাঁর প্রবৃত্তি। কিন্তু কী হবে জয়লাভ করে! জীবজন্তুরও ও-প্রবৃত্তি থাকে। হলই বা সাধারণ, সনাতন, তবু, কি লাভ! সুজন শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে।

বিজন আজ ঘুমুতে পারে না। সভায় প্রস্তাব করেছিল মেয়েদের কর্মক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত করতে। সভাপতি, স্বামীজি, কড়া মন্তব্য করেন। স্বামীস্ত্রীর বিশুদ্ধ সম্বন্ধ নিয়ে অনেক ওজঃস্বিনী বক্তৃতা বিজনকে শুনতে হয়। তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। সোশিয়ালিস্ট দলের এ-সব কী কথা! তখন বিবাহ ছিল পরিবারের সঙ্গে পরিবারের। যন্ত্রের প্রথম যুগে বিবাহ একজনের সঙ্গে অন্যজনের। স্বাতন্ত্র্যই তার প্রাণ। কিন্তু আজ সেই প্রাণই রক্ষা হয় না। মেয়েরা যে গিলে খেতে চায়। ও মেয়েটা যেন পেয়ে বসেছে। ব্যাপারটা অত সোজা নয়। মাত্র একজনের, আর কারুর নয়, অর্থাৎ সম্পত্তি, জড় পদার্থ, তাই সম্বন্ধ কেবল শুষে নেবার, অন্যে আবার যেন না নিতে পারে। তাই এত হিংসে দ্বেষ, তাই অত 'প্রেম'। খগেনবাবুর স্ত্রীটা মরেই গেল প্রেমের চোটে। প্রেম বনাম সম্পত্তি, নিজের সম্পত্তি, কার ওপর একাধিপত্য। তাই লুকিয়ে প্রেম করতে হয়, চালাকি করে এগুতে হয়, তাই এত লুকোচুরি। সেই জন্য প্রেম ছাড়া কবিতা হয় না, নভেল হয় না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বোধ রোম্যান্টিসিজমের গোড়া, সমাজ যখন ভাঙে তখনই সাহিত্যে রোম্যান্টিক মনোভাব প্রকাশ পায়।

তখনকার সমাজ কি ভাবে চলত? স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধের ওপর সমাজ কখনও থাকে নি, থেকেছে বড়লোক গরীবলোকের বিরোধকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টার

ওপর। দুটো বরফের টুকরো যেমন জুড়ে যায় তেমন ভাবে কখনও কোনো সমাজে কোনো দুটি প্রাণী এক হয়ে যায় নি। স্বামীজী বললেন, সমাজের ভেতর দুটি দেবতা বাস করে বিষ্ণু ও মহেশ্বর। সেই হিসাবে ধর্ম হোলো বিষ্ণুমায়া, স্থিতির ওপরকার গিল্‌টি। সেইটাই আচার, সংস্কার। কিন্তু এখন সোনালি আবরণ খসেছে, লোহা বেরিয়েছে, সংস্কার এখন শৃঙ্খল। শৃঙ্খল কীভাবে ধারণ করতে পারে? ভাঙা বাড়ির অশত্থগাছ ইঁট কাঠগুলোকে যেমন ধুলিসাৎ হতে দেয় না। কিন্তু ঝড় আসেই আসে, মহেশ্বর ক্ষেপে ওঠেন, তখন রক্তের অণু-পরমাণুতে ভাঙনের নাচন লাগে, ভূমিসাৎ প্রাসাদের ধূলিই তাঁর বিভূতি, তাঁর এক পা ঊর্ধ্বে, অন্য পায়ের ভারে মেদিনী কাঁপে, ডমরুনিনাদে তেত্রিশ কোটি দেবতা মূর্ছা যান। ব্রহ্মাও ভয়ে জড়সড়। ধ্বংসলীলার শেষাঙ্কে ব্রহ্মা আসেন সৃষ্টি করতে। সৃষ্টির আগমনবার্তা শঙ্কর শিঙায় প্রচার করেন বলেই তিনি শিব। স্বামীজীর পৌরাণিক দৃষ্টান্ত জনসাধারণে পছন্দ করে। বিজনের ভালো লাগে না। ঐ সব উপমায় মন ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে। খগেনবাবু কোন দেবতার উপাসক? সুজনদা সকলের কল্যাণ চায়, কিন্তু যে-স্তরে ধ্বংস সে-স্তরে মঙ্গল অসম্ভব। অন্য স্তরে আরোহণ করতে হবে। ব্যক্তিত্ববোধ, প্রেম, রোম্যান্টিসিজম ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। সুজনদা এ কি করলে! সে চলে আসুক রমাদির কাছ থেকে, কোলকাতায়।

বিজনের তীব্র বাসনায় সুজনের মানসিক গতিতরঙ্গ কক্ষচ্যুত হয়। বিজন চাইছে নতুন সমাজ, যেখানে স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকবে না— বেশ, বেশ, তাই হোক বিজন, সেই নেভি-র সার্জের নাবিকের পোশাক পরা ছোট্ট বিজন…তার এত টান! কিন্তু সে কি করে বুঝবে সে-যাত্রীকে, যাকে সঙ্গীরা ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল? সে যে একলা হতে বাধ্য, যে পড়ে রইল তার স্বাতন্ত্র্যই ভয়ঙ্কর। চলবার পথে ভাই-ভাই, কিন্তু যে চলছে না, তার কি দশা? বিজন বোঝে না, বুঝতে পারে না,। অভিমানের মেঘ আকাশে জমে ওঠে। বিজনের বার্তা শোনা যায় না।…এ দেশের, এ-যুগের বিপদ এই যে একই মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ চাই, আবার সাধারণের সাথে সংযোগবোধও চাই। চলার পথে ব্যক্তি সকলের সঙ্গে মিশবে, ব্যক্তিত্ব বর্জিত হবে, সব মানুষই হবে পুরুষ। খগেনবাবু তাঁর চিঠিতে এই কথাই লিখেছিলেন। তাঁর ভাষায়, এই পুরুষসিদ্ধি। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ও ব্যবহারে এত পার্থক্য কেন? রমা দেবী বল্লেন, 'আমরা বেড়াতে যাব…।' কে বাধা দিচ্ছে। খগেনবাবুও কিছু বললেন না। ওঁরা দুজনে এক হলেন, পৃথিবী স্বতন্ত্র হল, বাতিল পড়ল। কিন্তু খগেনবাবু তখনই ঠিক লিখেছিলেন। স্বাতন্ত্র্য-

বোধ না ঘোচালে নতুন যুগে নতুন স্তরে যাওয়া যাবে না। রমা দেবীর প্রবৃত্তি, তাঁর আকাঙ্ক্ষার উগ্রতা তাঁকে জড় থেকে ব্যক্তিতে পরিণত করছে। তারপর? পুরুষ-সিদ্ধি? খগেনবাবুর সকল সাধনা পণ্ড করে দুজনে আবার সেই দুটি পৃথক জীবেই পরিণত হবেন। খগেনবাবুর বহির্মুখী হওয়া অসম্ভব। রমলা দেবী এখন নিজেকে ভুলে পরকে চাইছেন, পাওয়ার পর যে কে সেই। তার চেয়েও খারাপ। সর্বনাশ এই মিলন। কাশী অতি ভয়ঙ্কর স্থান। সে নিজেই ত' কাশী আনলে রমলা দেবীকে। কাশী না এলে অন্য রকম হত।

অনেক রহস্য আছে কাশীর অলিগলিতে, বড় রাস্তায়, চা-এর দোকানে! এখানে মৃত্যু গোপনে চলে। এ রহস্যের কোন দৃশ্যে রমলা দেবী ও খগেনবাবু অভিনয় করবেন? টুকরো টুকরো স্মৃতির তরঙ্গ ধাক্কা দেয়! কতবার সুজনের গা ছম্ ছম্ করেছে সর্বনাশের ইঙ্গিতে। এক সন্ধ্যায় সে ঘাটে বসে আছে, রাত বোধ হয় দশটা, রমলা দেবীকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে অক্ষয়ের সঙ্গ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে ঘাটে এসেছে। ঘাটে লোকজন নেই বল্লেই হয়। পাশে দুজন ছেলে এসে দাঁড়াল। যেন তাকেই লক্ষ করছে। একজন কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, দেশলাই আছে? নেই শুনে তারা চলে গেল। একটি মেয়ে এল, সর্বাঙ্গে চাদর জড়ান। সুজন মুখ ফেরালে। দূর থেকে চাপা গলায় ডাক এল· ইস্···এইখানে। মেয়েটিও তাড়াতাড়ি চলে গেল·তারপর জোরে জোরে বাঁশি বাজল, পুলিশ পাহারা ছুটল, ইন্সপেক্টার ছুটলেন, চক্ চক্ করে উঠল তাঁর হাতের পিস্তলটা··· সর্বনাশের খেলা··সকালে হৈ চৈ সারা শহরে, শস্ত্রবাদীর দল আরেকটুকু হলে ধরা পড়ত।

আরেক দিন বাঙ্গালীটোলার গলিতে। সুজন এই পাড়ার নাম শুনেছে অনেক। ছেলেবয়সে লুকিয়ে পড়া ডিটেকটিক গল্পের নায়ক, বিখ্যাত জুয়াড়ি, খুনে, সুদর্শন, দয়াশীল, দুঃসাহসী, ধনী রোশনলালের কীর্তিকলাপ এই পাড়াতেই। মেয়েরা তাকে দেখে আত্মসংযম করতে পারত না। সে বাংলা বলত বাঙ্গালীর মতন, বৃদ্ধাদের মা বলত, মাসের শেষে লুকিয়ে টাকা দিত, সিকরোলের বড়-বাবুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে, আশ্রিতদের বিপদ থেকে উদ্ধার করত, ছাতের ওপর দিয়ে সারা পাড়া ঘুরত, হাতে থাকত ছোট লাঠি আর বাঁশি, কোমরে পিস্তল আর ছোরা···এই রোশনলাল শেষে বিখ্যাত ডিটেকটিভ অমরেন্দ্রপ্রসাদের হাতে ধরা পড়ল·· তখন রমণীদের কী করুণ বিলাপ····একজন এসে অমরেন্দ্রপ্রসাদের কাছে আত্মবলি দিতে চাইলে। কিন্তু ডিটেকটিভ সচ্চরিত্র, এবং বাঙ্গালী তাই চোখের জল মুছতে মুছতে রোশনলালকে শ্রীঘরে পাঠালেন····কিন্তু রোশনলাল যে বৃদ্ধাকে মা বলত তাকে বরাবরই অমরেন্দ্রপ্রসাদ সাহায্য করতেন। সেই বৃদ্ধা থাকতেন এই গলিতে।

বাঙালীটোলার গলিতে সুজন রমলা দেবীর বাড়ি খুঁজতে যায়, সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ, সুজন দেখলে একটি ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, একটি মেয়ে প্রদীপ হাতে আধ ভেজান দরজার পাশে, আলো পড়েছে শ্যামবর্ণ মেয়েটির মুখে····বিধবা, অল্প-বয়সী, চোখে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে ভুল ধারণার সুযোগ নেই··· সর্বনাশী। সুজন চলে এল লজ্জায়, আতঙ্কে, আশঙ্কায়।

সে-ই ফিরে আসে। অন্য সকলে নিজের কাজ করে, এগিয়ে চলে, না-ভেবে। সেই রইল পুলের মতন স্থাণু হয়ে। নিচে তার জল থই থই, ভরা গাঙে ঢেউ লেগেছে, তরী স্রোতের টানে হাওয়ার জোরে পাল ফুলিয়ে এগিয়ে চলে। দুজনের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনা নিতান্ত নঙর্থক। জোড়া লাগাতে সকলেই পারে। কিন্তু তাকে বৃত্তি করার অর্থ জীবনকে সঙ্কুচিত ও ব্যর্থ করা। ছুতোর মিস্ত্রিরও ঘর-বাড়ি আছে, সংসার আছে, সন্ধ্যায় সে কর্তাভজার আড্ডায় যায়। তারও বৃত্তি তার জীবন থেকে পৃথক। বিজনের মতামতে, তার কর্মে এই সত্যটুকু কি ধরা পড়েছে? নদীর স্রোত, পুলের কুলী, নৌকার মাঝি, সব পৃথক, না একই বহতায় বাঁধা?

সেনহাটিতে একবার বিজয়ার ভাসান সে দেখেছিল। ভৈরবের বুকে একশ প্রতিমা ভাসছে। প্রত্যেকটি দুটি নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কত ঘোরাঘুরির পর বিসর্জনের শুভলগ্নে নৌকা দুটি সরে গেল— প্রতিমা ডুবল, রাংতা কুড়োতে, মুকুট তুলতে ছেলেরা লাফাল জলে। আশেপাশে অসংখ্য নৌকার বাচ্ খেলা শুরু হল····প্রতিযোগিতার, দাঁড়টানার, বোট বাওয়ার আবেগময় আনন্দ। অনেক রাত্রে সেই ছেলেরা বাড়ি ফেরে, সিদ্ধি খায়, তখনও কি ফুর্তি! কিন্তু সে-রাতে সমগ্র গ্রামে বিষাদ নামে····মাঝিদেরও মনে। সুজন মনে মনে প্রতিমা তৈরি করেছিল, তার প্রতিমা ডুবেছে, বিজন নেই যে কোলাকুলি করবে····একলা, নেগেটিভ, ক্যাটালিটিক এজেন্ট। খগেনবাবু রমলা দেবী বাড়ি ফিরবেন, কোলাকুলির আনন্দে, সিদ্ধির নেশায় সব ভুলবেন।

সে-রাতের অবস্থায় অক্ষয়ের আদিমতা উঠতো জেগে। খগেনবাবু কি করতেন? সুজন বুঝতে পারে না। হয়ত মিলন হত, কিন্তু নাইট্রোগ্লিসারিনের অস্থায়ী সংযোগের মত, দম্ করে ফাটত, পালক ঠেকত পরীক্ষাগারের ছাতে। হাওয়ার মুখের পালক, আর পাখির গায়ের পালক, কত তফাৎ! সুজন যেন ভাসতে থাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে।

বাদ পড়ে গেল, বাদ পড়ে গেল, পরাশ্রিতের মতন, রমলা দেবী ও খগেনবাবুর সম্বন্ধ থেকে, বিজনের শোভাযাত্রা থেকে। কোথায় যেন সম্পত্তির প্রয়োজন রয়েছে। তার বোজা চোখে জল আসে। বৃষ্টি নামে, বার্তা পৌছায় না।

বাদ যদি পড়ল তবে কাশী থাকার প্রয়োজন? সে বিজনের কাছে

কোলকাতাতেই যাবে। কী শক্ত বিছানা! গাল শিউরে ওঠে— এখানেই রমাদি শুয়েছিল, উঠলেন রমলা দেবী হয়ে…চেয়ারে বসেও রাত কাটান যায়… 'বোকা ছেলে।' সত্যই বোকা। যার নিজের জীবন নেই তার মতন নির্বোধ আর কে? রমলা দেবীর কাছে খগেনবাবুই বুদ্ধিমান। বেশ— তাই ভাল। কিন্তু বুদ্ধিমানেরা শান্তি সহ্য করতে পারে না। তার চেয়ে মাসীমার মতন লোকেরাই শান্তিভোগ করতে জানে। শান্তির কল্পনায় সুজন ভোর বেলা ঘুমিয়ে পড়ে।

চোখ চেয়ে দেখে দীপা পুতুল কোলে নিয়ে মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে দেখছে। 'দীপা, ওগো দীপা, মা আমার …'

সুজন দীপাকে তুলে নিয়ে চুমু খায়, তার কোলে শোয়, বলে, 'মাগো…খিদে পেয়েছে, দুধ খাব।' দীপা ফ্রক বুক পর্যন্ত তুলে দুধ খাওয়ায়।

খগেনবাবু পরের দিন সন্ধ্যাবেলা মাসীমার সঙ্গে না দেখা করে থাকতে পারলেন না। 'তুমি আমাকে ডেকেছ?' 'না ডাকলে আসতে নেই?' 'তোমার শরীর কেমন? "এ বয়সে যেমন থাকে।' 'কাল রাতে মাসীমা তোমাকে মনে পড়ছিল। অমনি! কোনো কারণে নয়।' 'এলেই পারতে। ছেলেটি কাল এসেছিল।' 'ওঃ, সুজন বুঝি! আমার কথা হচ্ছিল? নিশ্চয়, না হলে আমার অত ভাবনা হবে কেন? কি কথা?' 'তোমাদেরই। শুনলাম মেয়েটি বৌমার বন্ধু ছিলেন, তোমারও। আজকালকার মেয়ে, বেশ লেখাপড়া জানে, খুব ভাল লোক।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে খগেনবাবু মাসীমার মুখ নিরীক্ষণ করেন, মন্তব্যের অন্তরালে কোনো অভিসন্ধি ধরা পড়ে না। সুজন কখনও কুৎসা করতে পারে! মুকুন্দই নিশ্চয়। খগেনবাবু অপেক্ষা করেন। মাসীমা অন্য দিকে মুখ সামান্য ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাল, নিয়ে কি করবে মনে করেছ?' 'মাসীমা, তুমি কি ভাবছ জানি না।' 'ভাববার কি আছে? মেয়েটি বিধবা?' 'না।' 'স্বামী আছে?' 'আছেন।' 'তবে বিয়ে হয় না, হিঁদুবাড়িতে।' খগেনবাবু অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন মাসীমা বলেন, 'তবে, কিছুই করা যায় না যে-কালে, তখন? তার চেয়ে তুই যেমন ঘুরে বেড়াচ্ছিলি তেমনই দেশ-বিদেশে বেড়াগে যা। ও দুদিন পরেই চলে যাবে— যে চুলোয় ইচ্ছে থাক, স্বামী না নেয়, মাস্টারি করুক। তুই এখন বড় হয়েছিস তোকে তাই বলছি, তোর মেসোমশাই-এর এমনি হয়েছিল, তাকেও তার স্বামী অত্যাচার করত, তাড়িয়ে দেয়— সামলাতে পারলে না, নিজেকে মেরে ফেল্লে। তার চেয়ে ধর্ম করা ভাল। তুইও সামলাতে পারবি না। সেবার গেল বৌমা, এবার তোর জীবন নিয়ে টানাটানি। আমার শরীরে সামর্থ্য নেই, বুক

ধড়ফড় করছে আবার, নইলে, তোর মেসোর জন্যে যা করতে পারিনি, তোর জন্য করতাম, বলতাম গিয়ে মেয়েটিকে— বাছা, তুমি চলে যাও, অনেক অশান্তি এনেছ, আর দিয়ো না। বলিস ত যাই ?' 'তোমার যেতে হবে না। তোমার আবার বুক ধড়ফড়ানি শুরু হল ? ছিল না ত!' 'না ভুগিয়ে মরাই ভাল রে! ভয় নেই, এখন মরছি না। কি বল্, যাই ?' 'তুমি ওষুধ খাচ্ছ ?' 'না। তার বদলে···তুই কি বলিস ?' 'তোমাকে কে ভুল বুঝিয়েছে ?' মাসীমা হেসে উত্তর দিলেন, 'কেউ লাগায় ন।···মিথ্যে কথা আগে ত কইতিস না।' 'এখনও কই না। কথাটাই বড় হল ? আচরণটা বাদ পড়ছে দেখলে না। পূজোআচ্চা করে আবরণটাকেই প্রধান করলে, সেইটাই আসল, কেমন ? ভেতরে ছাই-পাঁশ যাই থাক না কেন!' 'আসলটা কি শুনি! যা ইচ্ছে তাই করা ?··আচ্ছা, তুই এখন যা:··· কাশী ছেড়ে যাবার সময় পার যদি দেখা করো। গঙ্গাজলের ঘটিটা মাজলে কি না দেখি, কাল ভোরেই চাই।' মাসীমা ঘর থেকে চলে গেলেন।

খগেনবাবু বাড়ি ফিরে আসেন। অন্ধকারে চৌকাঠে হোঁচট খান··· মুকুন্দ··· কালা···নিশ্চয়ই। বাড়িতে আছে, ঘুমুচ্ছে সন্ধ্যেবেলা, বদমায়েসি করে উত্তর দিচ্ছে না। মুকুন্দ আসবে না···মাসীমার চাকর। খগেনবাবু ঈজিচেয়ারে শুয়ে পড়েন।

মাসীমাকে কখনও বোঝা গেল না, ধরা ছোঁয়া গেল না, বাঁধা গেল না। স্নেহের এ কী রূপ! যেন বিপ্রযুক্ত রণবাহিনী, সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করা যায় না, আছে কোথাও না কোথাও— আততায়ী সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে, পিছন থেকে এসে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

শাঁস নেই, ঝুনো নারকেল, বোঁটাটি পর্যন্ত খসেছে, ছোবড়া, জল শুকিয়েছে এই সংস্কারের। ভালবাসেন নি মাসীমা তার স্বামীকে···তাঁর জন্য যা করেন নি আজ তাও করতে প্রস্তুত! কেন! মৃত্যুর পানে যত অগ্রসর হচ্ছেন ততই সংস্কারের বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার কেন বুক ধরফড়ানি!

মাসীমার আছে অভ্যাস, যে অভ্যাস নেতি দিয়ে গড়া। জীবনের অভাব, গতিহীনতা, চারপাশে না'র বেড়া। অভাব কেবল— ভাবশূন্যতা, কোনো অস্তিত্ব নেই। তবু বাধা দেয় কিসে ? নিষেধ, অভাব কি সদর্থক ? নচেৎ দেওয়ালে মাথা ঠোকে কেন ? গৌরীশৃঙ্গে দম বন্ধ হয় কেন ? এক ঘণ্টায় মাত্র তিন গজ···বুকে হাঁপ লাগে। মাসীমা যদি মারা যান। খগেনবাবু উঠে জানলার পাশে দাঁড়ান।

মাসীমার সংস্কারে অনুবিষ্ট হতে চেষ্টা করেন! সেই বহু পুরাকালে বুদ্ধদেব আনন্দকে বলেছিলেন, মত্তহস্তী ইক্ষাকুবনে প্রবেশ করলে যেমন সর্বনাশ হয়

তেমনই আশ্রমে স্ত্রীলোক প্রবেশ করলে বৌদ্ধধর্মের সর্বনাশ হবে, তার আয়ু কমবে! বৌদ্ধযুগে কাশীর এক শ্রেষ্ঠী তাঁর সুন্দরী কন্যার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য প্রাসাদের উচ্চতম প্রকোষ্ঠে তাকে বন্দী রেখেছিলেন, রাস্তা দিয়ে চোর ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, কন্যা দেখলেন সুদর্শন পুরুষ, প্রেম হল····তারপর বিদ্যাসুন্দরের পালা। কিন্তু নিশ্চয় শূলে দেওয়া হল, চোরকে। শ্রেষ্ঠীকন্যা ওপরতলার জীব। রূপমতীকে তাঁর পিতাই বিষ খেতে আজ্ঞা করেন, কারণ গরীব গৃহস্থের বাগদত্তা কন্যাকে প্রবল যবন রাজকুমার দেখে ফেলেছেন! সতীদাহের আগুন জ্বলে ওঠে, সতীর শাশুড়ি বৌমাকে লাল চেলি পরিয়ে, কপালে সিঁদুর মাখিয়ে, গলায় রক্তজবার মালা দিয়ে চিতায় পাঠিয়েছেন, সঙ্গে দিয়েছেন জোয়ান ছেলেদের, দেবরবৃন্দের হাতে লাঠি, বৌমা যদি কাতর হন····তারপর, জব চার্ণকের উদ্ধার, সমাজ থেকে বহিষ্কার, সাহেবের ঘর-কন্না, আবার মাতৃত্ব, একটি আধটির নয়, পঙ্গপালের। চাঁড়াল বামুনের বিধবা মেয়েকে দুর্বৃত্তরা ধরে নিয়ে গেল নৌকা করে, এ-গঞ্জে ও-গঞ্জে রাখলে, পুলিশে উদ্ধার করলে, দুর্বৃত্তদের জেল কয়েক মাসের জন্য····মেয়েটাকে ঘরে নিলে না কেউ। কোথায় যাবে সে? যাক সে আশ্রমে! একজন স্ত্রীলোকের স্বামী মাতাল, সর্বাঙ্গে রোগের চিহ্ন, মা-শাশুড়ি দুজনেই বলছেন, তবু ত স্বামী! আবার,····বড় লোকের আদুরে মেয়ে স্বামীর ঘর করে না, স্বামীকে অবহেলা করে, নীচ, স্বার্থপর, কলহপ্রিয়, স্বামীর জীবন দুর্বিষহ করেছে····তবু স্বামীকে সৎ থাকতে হবেই হবে, নচেৎ শ্বশুর-শাশুড়ি জামাই-এর মুখ দর্শন করবেন না। স্মৃতিরত্ন মশাই-এর বিধবা ভগ্নীর কলেরা হয়েছে, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে, সেদিন একাদশী, 'মামা জল' বলতে বলতে দম আটকে গেল, আর চায় না, স্মৃতিরত্ন মশাই-এর দ্বিতীয়া গৃহিণী তখন আঁতুড়ঘড়ে, গিয়ে বল্লেন,····'সব দিকেই অশৌচ নতুন বৌ! মেয়েটা অকল্যাণ করে গেল অসময়ে।' পাঁজি নিয়ে বসলেন ঠাকুর নবজাত কন্যার ঠিকুজি গুণতে। ইনিই কিছু দিন পূর্বে জমিদার মহাশয়ের বিধবা ভ্রাতৃবধূর জন্য বৈশাখী একাদশীর দিন বরফ বন্দোবস্ত করেছিলেন, বরফটা পানীয় নয়, চর্ব্য। কে বলে হিন্দু সমাজ স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিচারে পক্ষপাতদুষ্ট! অন্য যে-দোষ তার, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য, সে-দোষ সব সমাজেরই আছে! বিশেষত্ব এই কেবল, তার জীবন নেই, তাই সংস্কারই আছে। সেটা আছে ভীষণ ভাবেই আছে····জিজ্ঞাসা কর রমাকে।

মাসীমার সংস্কার আছে। মন্দাক্রান্তা ছন্দের একটানা বারিধারার ঘুমপাড়ানির শব্দের মতন তার ধ্বনি। তবু পয়ারের পাড়াগেঁয়ে একঘেয়েমি নয়, কোথায় যেন খানদানী গাম্ভীর্য রয়েছে সন্দেহ হয়। এর জোরে কত রাজকুমার সংসারত্যাগী হল— বুদ্ধ থেকে সেদিনকার ছাতু বাবু পর্যন্ত। ব্রহ্মচারিণীর কাঠিন্য, রাজলক্ষ্মীর

সতীত্ব লোপ পায় নি এখনও এরই কৃপায়। তা ছাড়া, শান্তি চায় লোকে। মাসীমার মুখে চোখে দীপ্তি নেই, তবু, ব্যবহারে প্রশান্ত, আভিজাত্য রয়েছে। তাঁর তলার মাটি কাঁপে না, তাঁর আকাশ নির্মল।

কিন্তু সে শূন্যে নক্ষত্র যেন নিশ্চল, বাতাস নিস্পন্দ। প্রাণ ওঠে হাঁপিয়ে। মাসীমার ধর্ম মাসীমার, অন্যের নয়। এই সেদিন একজন ইংরেজ ছোকরা আরবদের জাতীয় নিয়তিকে আপন করে নিলে। আরব-স্বাধীনতা যেন তারই আত্মার বিকাশ, পোশাক বদলালে, গ্রহণ করলে তাদের শোওয়া বসা খাওয়া, তাদের ভাষা। তবু পারলে না আপন হতে। জীবনটাই অসার্থক হল। কী ভীষণ একাকিত্ব! অন্যের ধর্মে আত্মসমর্পণ করতে করুণভাবে মানা করেছেন। পরের ধর্ম গ্রহণ করা বেশ্যাবৃত্তিরও অধম, ধোবিকা কুত্তা, না ঘরকা না ঘাট্‌কা, নিজেরও নয়, পরেরও নয়, কারুর আপন নয়, কেউ আপন নয়, ঘৃণা হবে শেষে নিজের ওপর। ঘৃণায় দেহ অবশ হয়, অভ্যাসের আদেশটুকু পালন করতে পারে। চিত্ত ভাসে ওপরে, নিদ্রিত বিষ্ণুর নাভিপদ্মে লক্ষ্মীর মতন, শবের ওপর বিদেহী আত্মার মতন। দেহ ও চিত্তের সমন্বয় হয় না, সংস্কার ও সৃষ্টিতে রফা চলে না। স্বধর্মত্যাগই সব চেয়ে বড় মিথ্যা, মিথ্যায় মানুষ বাঁচেনা··· না মাসীমা, সত্যি বলছি, মিথ্যা কথা কই নি।

অন্তর্মুখী হওয়ার চেয়ে বাইরে আসাই ভাল। দেহেই সকল চিত্ত সঞ্চারিত হোক। প্রতি রোমকূপে বৃষ্টি পড়ুক, আলো পড়ুক···· সমুদ্রের বালুতটে নগ্নগাত্রে রোদ পোয়াচ্ছে স্ত্রীপুরুষে, কোনো লজ্জা নেই, যারা চিত্তসর্বস্ব নয়, আপন নিয়ে উন্মাদ নয়, তাদের আবার কি লজ্জা! তাদের দেহমন শব্দের যুক্তবর্ণ, কাব্যের যুগ্মধ্বনি, ভূত-বিদ্যার ক্ষেত্রকাল।

খগেনবাবু রমলা দেবীর বাড়ি এলেন! আলো ঘরের কোনে সঞ্চিত হয়েছে। রমলা দেবীর ডেক-চেয়ারের সামনে চেয়ার টেনে খগেনবাবু বসলেন। তাঁর মুখে চঞ্চলতা লক্ষ করে রমলা দেবী বল্লেন, 'মাসীমার ওখানে····?'

'কথা হোলো।' কোনো ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হয় না। রমলা দেবী ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'তুমি তা হলে কি করবে? তিনি কি করতে বলেন?' 'কাশী ছেড়ে যেতে।'

খগেনবাবু ও রমলা দেবী অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। রমলা দেবীর জিজ্ঞাসু নয়নের উত্তরে খগেনবাবু বললেন, 'আমি আমার কর্তব্য ঠিক করতে····'

'পারছি না, সময় চাই, সময় চাই, কেমন?'

'কোলকাতা ঘুরে আসি একবার। তুমিও চল।'

'আমি যাব না কোলকাতায়। এই যে বল্লে কাশীতেই থাকবে। কোলকাতা কেন?'

'চল না। বিজনের সঙ্গে দেখা হবে।'

আমি যদি বলি বিজনকেও দেখতে চাই না?'

খগেনবাবুর মুখে হতাশার চিহ্ন উঁকি দেয়। 'তুমি জান না, মাসীমার সমাজে স্থান নেই, কিন্তু বিজনেরই সমাজে তোমার আমার স্থান, অন্য কোথাও নেই।'

'আগে তৈরি হোক, তখন যাব। আপাতত, কাশী থাকব। পারবে না?'

খগেনবাবুর ইচ্ছা হয় বিজনের সমাজের প্রকৃতি বোঝাতে, তার ধর্মের ব্যাখ্যা করতে, রমলা দেবীর সামনে সে-সমাজের মনোজ্ঞ রূপ ফোটাতে। কিন্তু বাধা আসে, রমলা বুঝবে না কিছুতে। তার স্বার্থে আঘাত পড়বে। বর্তমানের প্রাণী রমলা, তার অতীত নেই, ভবিষ্যত নেই। খগেনবাবু সংযত হয়ে বসে থাকেন। রমলা দেবী তাঁর চিন্তাস্রোত অনুসরণ করে বলেন, 'সেটা পরলোক। পরলোকে যেতে চাই না। পাষাণের মতন ধৈর্য আমার নেই। কেউ জ্যান্ত থাকবে না বিজনের দেশে, সেখানে ইচ্ছাই কেবল, কর্তা নেই, কর্ম নেই। প্রেতপুরী···ভূতপত্নীর দেশ···আমার ভয় করে, ওগো···পারব না, তুমিও পারবে না।'

রমলা দেবীর সর্বাঙ্গে ত্রাস পরিব্যাপ্ত হয়। বয়স কমে যায়, দেহ সঙ্কুচিত হয়, শৈশব ফিরে আসে। খগেনবাবুর চোখে করুণা ফোটে। রমলা দেবী অভয় পেয়ে বলেন, 'তুমি বোঝ না। স্বর্গ তৈরি করছ, কিন্তু কার জন্যে? আমি মাটিরই মানুষ! কেন যাব স্বর্গে? তুমি চাও আমি মরে যাই? তুমি ছুতো খুঁজছ। তার চেয়ে সোজা বল যে ভয় করছে, মাসীমার আদেশ অমান্য করবার সাহস নেই। কিন্তু সে আদেশের মানে জান না। তুমি সুখই চাইছ।' 'আমি বিরোধকে স্বীকার করেছি।' 'কর নি, কর নি। সংসারকেই গ্রহণ করেছ। তুমি মিথ্যে কথা কও না, তুমিই বল? পরে কি হবে তার জন্য মাথাব্যথা— সেটা কি এখনই যা হতে পারে তার সম্ভাবনাকে স্থগিত রাখা নয়? কবে হবে; কি আসবে— কে জানে! কেন অপেক্ষা করব? কাদের জন্যে? তারা আমার কে বল! কে ভোগ করবে? তাদের জন্য থোড়াই কেয়ার করি! তুমি আজকের কাজ ভুলে গিয়ে আসছে কালের জন্য ভাবছ··।' 'ঠিক তা নয়। ভবিষ্যতের কথা না হয় নাই ভাবলাম। তাকে পৃথক করে, দূরে রেখে যারা কাজ করে, তাদেরই উপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক, রমা। কিন্তু অন্য দিক থেকে ভবিষ্যতকে পৃথক ও দূরে রাখা যায় না। যে পথে সৃষ্টি অসম্ভব সে-পথ গ্রহণ করতে আমি অনিচ্ছুক।'

রমলা দেবীর অবশ দেহ ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ে। সাবিত্রী অমনি মাঝে মাঝে চুপ করে শুয়ে থাকত। তার মুখে বিরক্তি ও অধীরতার মূর্তি। বড় করুণ···দেখলে দুঃখ হয়, অনেক সহ্য করেছে, তার অধীরতা মার্জনীয়। খগেনবাবু উঠে এসে তার মাথায় হাত দেন।

'এত গরম কেন কপাল ?' রমলা দেবীর মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'আমি বসছি। মাসীমার বাড়ি যাব না। আমি সোয়াস্তি চাই না। চাইলে, কাশী ফিরতাম না, দেশ-বিদেশে ভেসে ভেসে বেড়াতাম। এ-টুকু তুমি বুঝবে, রমা ? মাসীমা আমাকে বলছিলেন কাশী ছেড়ে চলে যেতে। তাঁর কথায় যাব না। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমি ছাড়া আমার কে রইল ?' রমলা দেবী শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন, 'আমি জানি, তোমার বিজন আছে।....হার মানলাম, হার মানলাম, কিন্তু দুর্বলের কাছে।' 'স্বীকার করছি দুর্বল! কিন্তু.... শক্তি দেবে না ?' 'আমি দেব! কোথায় পাব! সব গেছে চেয়ে চেয়ে। সকলের সঙ্গে মিশে শক্তি পাবে বলেছিলে সে দিন, তাই ভাল। আমার ভাঁড়ার খালি।' 'তা নয় গো, তা নয়! চল দুজনে কোলকাতায় যাই।' 'কোলকাতা আমি যাব না।'

খগেনবাবু বাড়ি ফিরে এসে ছাতে একলা বসে থাকেন। মুকুন্দ এখনও এল না দুজনের মিলন অসম্ভব। ব্যর্থতায় চোখে জল আসে। দূরপণেয় পার্থক্য। যাকে জানতেন, যাকে আপন ভেবেছেন তার সঙ্গে মিলন হয় না যখন, তখন কি উপায়ে সাধারণ জীবনের ভাগী হবেন ? দুজনে মিলে সৃষ্টি-পথের পথিক হওয়া যেত না ? সাবিত্রী, মাসীমা, রমলা....পর পর এল, গেল....কে রইল সামনে। বড় একলা অথচ মিলতে হবে....এ কী অভিশাপ! হতাশা উপদেশ দেয়....ভাসিয়ে দাও নিজেকে। কিন্তু স্রোতের বিপক্ষেই পুরুষে এতদিন সাঁতার কেটেছে। কিসের জন্য ? পারে উঠতে হবে ? অন্ধকারে কূল দেখা যায় না। চোখের জলে দৃষ্টি ক্ষীণ....সকাল কখন হবে! মাত্র বারোটা বাজল। সেই কখন সন্ধ্যা হয়েছে! মুকুন্দ এখনও এল না কেন! মাসীমার ওখানে ঘুমিয়ে পড়েছে, মাসীমা জানেও না, না হলে নিশ্চয় পাঠিয়ে দিতেন।

খগেনবাবুর ইচ্ছা হয় বিজনকে চিঠি লিখতে। কী লিখবেন ? সুজনকে লেখা যায়, কিন্তু বিজনকে তিনি পারেন না। অভ্যাস নেই, তবু লিখলে হয়। খগেনবাবু চিঠির কাগজ খুঁজতে লাগলেন। ফাউনটেন পেনে কালি নেই।

মুকুন্দ কাঁদতে কাঁদতে এসে খবর দিল, মাসীমা মারা গেচেন। জল খেতে গিয়েছিলেন পড়ে যান, আর উঠলেন না।

সে তখনি খগেনবাবুকে ডাকতে এসেছিল, পায় নি, মাসীমার পাশে বসেছিল ....ভাবলে ততক্ষণে নিশ্চয় মেমসায়েবের বাড়ি থেকে ফিরেছেন। তাই মড়া ছেড়ে এসেছে। যা ইচ্ছা হয় করা হোক! ডাক্তার আনতে হবে না....সব শেষ হয়ে গেছে....।

মাসীমার, রমলার ওপর রাগ আসে। কিন্তু কী দোষ! বেচারিরা। যার যা স্বভাব।

মোহানা

উৎসর্গ

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে

—বড়দা

মাসীমার মৃত্যুর পর খগেনবাবু ও রমলার একত্রে বসবাসে বাধা রইল না। মুকুন্দ আর চাকরি করবে না বলে দেশে গেল। গিন্নীর কৃপায় সে কিছু ধান জমি করেছে, তাইতে একটা পেট ভরবে যা করে হোক। সুজনেরও কোনো খবর নেই। বিজন ছাত্র-সমাজের একজন কর্মিষ্ঠ বামমার্গী সভ্য হয়েছে। গুজোব এই যে ইতিমধ্যে সরকারের দৃষ্টি তার ওপর পড়েছে। বিজনের পিতার একজন বাল্যবন্ধু, পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বিজনকে চা'য়ে ডেকে উপদেশ দিলেন পড়াশুনোয় মন দিতে। ভদ্রলোকের স্ত্রীর অত্যধিক স্নেহময় উদ্বেগও যখন তাঁর তের বৎসরের কন্যার রূপের ক্ষতিপূরণে অসমর্থ হল তখন বিজন গুরুজনদের মুখের ওপর যৌবনের দায়িত্ব শুনিয়ে সোজা খেলার মাঠে চলে যায়। পরের দিনই তার রমাদিকে সে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলে যে-কোনো দিন সে দেশত্যাগী হয়ে হয় বিদেশে, না হয় অন্য প্রদেশে চলে যাবে। বিদেশের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া, এবং প্রবাসের মধ্যে বম্বে কিংবা কানপুর তার গন্তব্য নির্বাচিত হয়ে গিয়েছে— কিন্তু, কাশী কিছুতে নয়।

কাশীধাম পুরাতনের প্রতীক। কাশীর জীবনযাত্রায় মাসীমার জীবন মাখান ; ভাঙা বাড়ির বড় কর্তার আলবোলার ধোঁয়ার মতন সর্বত্র তার পরিব্যাপ্তি ; পরতে পরতে পাকে পাকে ভাকে ভাকে গতায়ু সংস্কারের ছোঁয়াচ, আর কণ্ঠশ্বাস। সমগ্র শহরটা গঙ্গাবাসীর ঘর, তার হালফ্যাশানের বাংলোগুলোয় এক বছরেই ফাটল আর নোনা ধরে। বৃদ্ধা পিতামহী বহুদিন যাবৎ শুষছেন, প্রথম প্রথম নাতি নাতনি নাতবৌরা সেবা করতে আসত, এখন তারা নিজের ধান্দায় ব্যস্ত, ছেলেরা চাকরি করে ঔষধালয়ে, আর ঝিউড়িরা রামনগরের বেগুন কেনে, বউএরা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার রান্নাঘরে তাই পুড়িয়ে সোয়ামীদের ভাতে ভাত দেয়। মধ্যে মধ্যে ভাগবৎ পাঠ, আর বিধবার প্রসব-

বেদনার চিৎকার। কাশী যে-বস্তু যখের ধনের মতন রক্ষা করে সেটা এক প্রকাণ্ড ছোবড়া। জড়বাদের লীলাক্ষেত্র কাশীধামে যখন সাধু-সজ্জনের নতুন আশ্রম স্থাপিত হয় তখন তন্ত্রের আবশ্যিকতা বুঝতে দেরি থাকে না। এখানকার জীবনে যতটুকু স্বাধীনতার সুযোগ মেলে সেটুকু শব-সাধনার। অথচ, কাশী আসা চাই, থাকা চাই, সেখানে কেন্দ্র স্থাপনা না হলে কোনো অনুষ্ঠানই সর্বাঙ্গীণ হয় না। কিন্তু সত্য কথা এই, কাশীধামে সব কিছু রটে, কোনো কিছুই ঘটে না।

অবশ্য, মধ্যে মধ্যে সন্দেহ জাগে ঘটনার দরকারই বা কি? বিজ্ঞান, দর্শন, অধ্যাত্মচর্চা এই ত' হল, অন্ধকার ঘরে অন্ধজনের কালো বিড়াল খোঁজার মতনই তার সার্থকতা। চিত্তশুদ্ধি চিররুগ্নের ভাববিলাস, অবসর-বিনোদন, ক্ষতি ও ইচ্ছাপূরণ। হিমালয় ভ্রমণ নিজের ছায়া থেকে পলায়ন। তাতে দুঃখ নেই, কর্মফল কাটাতে হবে, আদিম অভিশাপের স্খালন চাই, নচেৎ দেহ ও মন প্রেতলোকেও কলহের জের টানবে। কিংবা, হয়ত মানুষের জীবনে উত্থান-পতনের কক্ষ সুনির্দিষ্ট, তার থেকে বিচ্যুতি নেই, ঘটলে প্রলয় বাধে, কে আর প্রলয় চায়! তবে. কোনটা ওঠা, আর কোনটা নামা? যারা সব কাজের পিছনে ও সামনে উদ্দেশ্য রয়েছে মানে তাদের খানিকটা সুবিধা; কিন্তু যাদের পক্ষে উদ্দেশ্য প্রেরণা কাব্যসংস্কার মাত্র, তারা এই চিরন্তন দোলায় দুলতে পারে না; হয় জীব-ধর্ম, না হয় বুদ্ধি, এই ধরনের যুক্তি তাই তারা গ্রহণ করতে বাধ্য।

প্রথম প্রথম খগেন বাবুর চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটে। এমন কয়েক দিন গেল যখন দেহসম্ভোগ থেকে বিরাম ছিল না। পরের কয়েক দিন সারাক্ষণ সাহিত্যপাঠ—বোকাচ্চিও, পেট্রোনিয়াস, বার্টন, কাসানোভা, বাৎস্যায়ন, কালিদাস। যখন বোদলেয়ার হাতে এল, তখন বুঝলেন, যে-সাধনার ফলে অমঙ্গল বিশ্বরূপ ধারণ করে সেটা চিত্তশুদ্ধিরই শুচিবায়ুগ্রস্ত প্রক্রিয়া, পাপ ও পুণ্য-সম্ভোগ একই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায়। বোদলেয়ার তাই বিরেচকের কাজ করল। ফলে খগেনবাবু স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন, দেহ ও মনের পার্থক্য ঘুচে যুগ্ম-অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। এই লঘু অবসরে শারদীয় মুক্তি বসন্তের প্রসারণে পরিণত হল।

নৌকাবিলাসে দুজনের সারা সন্ধ্যা কাটত। বিকেল থেকেই সাজসজ্জার আরম্ভ, এলো খোঁপায় কখনও রঙ্গন, কখনও বেলীর মালা, ছোট ব্লাউজ কাঁধের ওপর তোলা, আংরাখার ফিতে দেখা যায়, নানা রঙের শাড়ি এঁটে-পরা, আঁচল ছোট রাখার কৃপায় গড়ন পাতলা দেখায়। যতক্ষণ আলো থাকত,

ততক্ষণ কাশীর লোকাকীর্ণ ঘাট পরিত্যাগ করে অন্য তীরে চলে যেতেন, সেখানে বালির উপর বসতেন দুজনে। ওপারে এক একটি করে আলো জ্বলত, নহবতখানা থেকে সানাই-এ মূলতানী, পূরিয়া, পূরবীর আলাপ ভেসে আসত। সন্ধিরাগে মন উদাস করে দেয়, তার কোমল রেখাব আর তীব্র মধ্যমের সংযোগে কী এক জাদু আছে যার আহ্বানে অতি নিকটের সামগ্রী দূরে সরে যায়, এ-পারের ডাক ও-পারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। খগেনবাবু রমলার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন, রমলা ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। রাত আসে, বালুর চরের ওপর দিয়ে পাখি ওড়ার শব্দ আর পাওয়া যায় না। ইমন, কল্যাণ, ভূপালির গৎ শুরু হয়, লোকালয়ের আকর্ষণে তাঁরা নৌকায় চড়েন। এত শীঘ্র বাড়ি ফিরে লাভ নেই। ধীরে ধীরে নৌকা চলে। নৌকার খোলা পাটাতনে কার্পেট বিছানো। মাঝি ওপাশে গলুই-এ ব'সে হাল ধরে, নৌকার কুটুরির জানলায় পর্দা টাঙানো, কারুর দৃষ্টি পড়ে না। রাত দশটায় দুজনে বাড়ি ফেরেন।

একদিন সন্ধ্যায়, তখনও অন্ধকার হয় নি, অন্য একটি নৌকা পাশ দিয়ে গেল। তার ওপর অক্ষয়বাবু রয়েছেন। খগেনবাবুকে অভিবাদন করে নিজের নৌকাটা পাশে ভেড়ালেন। অক্ষয়বাবু বল্লেন যে তিনি এখানকার বাঙালী যুবক সাঁতারুদলের সেক্রেটারি, কাল প্রতিযোগিতা হবে হিন্দুস্থানী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে, তাই আজ সন্ধ্যায় তদারক করছেন। রমলা আপনা থেকে ঘরের মধ্যে উঠে যাচ্ছিল। অক্ষয়বাবু হেসে বল্লেন, 'একটু আধটু ঠেকা দিতেও জানি। ভেতরে হারমনিয়ম আছে?' রমলা উত্তেজিত হয়ে মাঝিকে ঘাটে যেতে আদেশ করলে। পরের কয়েকটি সন্ধ্যা সিনেমায় কাটল। যেদিন আবার নৌকায় বেরুলেন সেদিনও অক্ষয় ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'ও মশাই, কাশীর এ-রীতি নয়, একলা মজা লুটতে বাবা বিশ্বনাথের বারণ আছে।' ফিরে এসে রমলা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলে। কাশীর জীবন বিষিয়ে উঠল। খগেনবাবু রমলাকে আনন্দ দিতে সারাক্ষণ পাশে বসে রইলেন, আদর বাড়ল, শাড়ির পর শাড়ি দোকানিরা দেখাতে আনল, দ্বিগুণ উৎসাহে মালীরা ফুল যোগাতে আরম্ভ করলে, খানকয়েক বড় আরশি কেনা হল। বিচিত্র পোশাকে, বিচিত্র ভঙ্গিতে রমলা দাঁড়াত আরশির সামনে, ঘরের কোনের আলো পড়ত তার মুখে, বুকে, হাতে, খগেনবাবু অন্ধকারে চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেন। দেখতে দেখতে কখনও তীব্র বেদনা সঞ্চারিত হত সর্ব দেহে, নিজে উঠে আলো নিভোতেন, রমলা মন্ত্রমুগ্ধের মতন চোখ বুজে খগেনবাবুর কাছে আসত। পরস্পরের অন্তর্ব্যাপ্তিতে শারীরিক সম্ভোগ অপাপবিদ্ধ, চিন্তাধারা অদ্ভুত,

প্রবৃত্তিগুলি রঙ্গমঞ্চে নর্তকীদের মতন সুসম্বদ্ধ হত। যে অদ্বৈতবাদের প্রেরণায় পরিশীলনের অলিতে-গলিতে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন তার সন্তুষ্টিসাধন এই দেহবাদের অন্তরে বিরাজ করে। বিরোধ-বিমুক্ত অবস্থায় খগেনবাবু যৌবন ফিরে পান, রমলার অকুণ্ঠ আত্মদানে জীবনের নতুন স্তর আবিষ্কৃত হয়।

এক ক্লান্ত প্রত্যূষে শয্যায় বাসি বেল ফুলের দুর্গন্ধ নাকে আসতে খগেনবাবু উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় গলা ধরে রমলা তাঁকে শুইয়ে দিলে। বুকের কাছে মুখ এনে বল্লে, এখনও সকাল হয়নি, অত ভোরে উঠতে তার মাথা ঘোরে, গা কেমন কেমন করে। গভীর আলিঙ্গনে রমলা খগেনবাবুর জড়তা কাটালে। 'জানলা দিয়ে আলো এসেছে, এবার ওঠ।' 'আমি পারছি না, রোজই সকালে আমার গা গুলুচ্ছে।' 'বেশি রাত করে খেলে অসুখ হবে, বরাবর বল্লেছি, তুমি কিছুতে শুনবে না।' 'সেজন্য নয়, বোধ হয়···।' 'বোধ হয় কি?' 'যেন জানেন না, কচি খোকা!' অনেকক্ষণ খগেনবাবু রমলার দিকে চেয়ে রইলেন, একাগ্রদৃষ্টিতে কাতর হয়ে রমলা হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। 'রাগ হল?' 'রাগ কেন হবে?'

সারাদিন রমলা বিছানায় শুয়ে রইল। কোন কথাবার্তা হয় নি দুজনের মধ্যে। সন্ধ্যায় খগেনবাবু বল্লেন রমলার নৌকা চড়া আর হবে না, নৌকা বড় দোলে। রমলা মেনে নিলে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য খগেনবাবুকে রোজই বেরতে হবে আবদার করে বসল। দুদিন শুনলেন না, কিন্তু তৃতীয় দিনে বেরিয়ে পড়লেন। দশাশ্বমেধের ঘাটের জনতা পরিহার করে অহল্যাবাঈএর প্রাসাদের নিচে বসে রইলেন। পথের নির্দেশ পাওয়া যায় না পথের মধ্যে, ওপরের সামনেকার আলো জোর আগের কয়েক ধাপ দেখিয়ে দেয়, দুপাশের খানা খন্দর থেকে সাবধান করে, কিন্তু কিন্তু মোড়ের ওপাশে যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। পথ যদি নাৎসি জার্মানীর রাস্তার মতন সোজা ও বাঁধান হত, তবে গোল থাকত না। কিন্তু এ পথের সবটাই বাঁকা, প্রতি পদে দিক পরিবর্তন, প্রতিক্ষেপে ভিন্ন স্তর। ইয়ুক্লীডে চলে না, রীমানের জ্যামিতি চাই, তার শাস্ত্র অজ্ঞাত, জ্ঞাত হলেও যেকালে অপ্রযোজ্য, তখন অবান্তর। কিন্তু একটা জিনিস ভারী মজা—মনে কোনো আলোড়ন হল না শুনে, না এল আনন্দ, না এল দুঃখ। যোগসাধনার ফলে? এর মধ্যে একটা কোথায় প্রতিহিংসা রয়েছে। সাবিত্রীর আত্মহত্যা, দেশ ভ্রমণ, বুদ্ধির চর্চা, মাসীমার মৃত্যুকে তিনি মুক্তির এক একটি স্তর ভেবেছেন, পেঁয়াজের খোসা খুলতে খুলতে অন্তস্থ সারবস্তুর সাক্ষাৎ পাবেন প্রত্যাশা করেছেন, কিন্তু আজ মনে হয় স্তর সেটা কেবল সাপ-মই খেলার ধাপ, পেঁয়াজের কূটে সেই খোসা ছাড়া আর

কিছুই নেই। প্যাফহুটিয়াসের পতন, না সেণ্ট আণ্টনি ও বুদ্ধের জয়, কোনটা সত্য? যীশু, বুদ্ধ নিজেরা হয়ত সফল হলেন, মোক্ষ পেলেন কিন্তু আজ একজন খৃস্টান, একজন বৌদ্ধের কি দশা? তাঁদের নির্দিষ্ট, তাঁদের সৃষ্ট সভ্যতা আজ চুরমার। তাঁদের ধর্ম নিশ্চয় জীবনের প্রতিকূল ছিল, নচেৎ জীবপ্রগতি তাঁদের অবহেলা করতে কিছুতেই পারত না। একজন বল্লেন শ্রমণ হও সকলে, আরেকজন আদেশ দিলেন সাধারণকে তাঁর অনুগামী হতে। অথচ সর্বসাধারণের জীবনযাত্রায় যে-সব প্রবৃত্তি প্রকাশ পায় তাদের মধ্যে রয়েছে প্রবণতার পরিমাণ, লঘু-গুরুর তারতম্য; তাকে যেমন স্বীকার করা যায় না, তেমনই তাকে ওলটপালট করাও চলে না। অবশ্য প্রবৃত্তির মধ্যে পরিণতিও আছে, কোনটাই একান্ত ও বিশুদ্ধ নয়। তবু ক্রমকে অতিক্রম করলে জৈব-প্রকৃতি নাক দিয়ে জরিমানা আদায় করে। সেটা দেবার সময় মূলধনে টান পড়ে। লোকের ধারণা, ধর্মে সর্বজীবের আশাভরসা ভয়ভাবনায় সন্তুষ্টি থাকে। কিন্তু সেগুলো ভাব মাত্র, প্রবৃত্তি নয়। অর্থাৎ সব ধর্মের সঙ্গে জনগণের জীবনের কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নেই! নেই বলেই, সভ্যতার এই দশা, তাই মানুষের কাটা পথ রমলার খোঁপার কাঁটার মত অত বাঁকা। প্রবৃত্তি কাজে পরিণত হবেই, সভ্যতা সর্বসাধারণের কাজ, বৈদগ্ধ্য সভ্যতার ফল; ব্যক্তিগত জীবনের সফলতা-নিষ্ফলতা তাই সার্বজনীন জীবনের সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা। সজ্ঞান প্রয়াসে সভ্যতাসৃষ্টিই মানুষের প্রকৃত ধর্ম—এ ছাড়া অন্য ধর্ম অস্বাভাবিক। চিন্তার এই বিস্তৃতিতে খগেনবাবুর সাধনার দাম্ভিক নিরর্থকতা প্রতিপন্ন হয়, সমগ্র পথ ও প্রতিবেশ আলোকিত হয়ে ওঠে।

ফেরার পথে এক ডাক্তারখানায় ঢুকে খগেনবাবু লেডি ডাক্তারের সন্ধান নিলেন, প্রয়োজন হলে পরে যাকে পাওয়া যাবে। রমলা বিছানায় শুয়েছিল। খগেনবাবু বল্লেন, 'একবার ডাক্তার দেখালে হত না?' চমকে উঠল রমলা, 'কেন? সে আমি পারব না, মরে যাব।' 'আমি তোমাকে কি বোঝাব? তুমি সবই জান। ডাক্তার পরীক্ষা করুক, যদি সম্ভব হয় তবে আপত্তিটা কি?' রমলা চোখ বুজে শুয়ে রইল।

ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে খগেনবাবু পাশ ফিরলেন। রমলা কি একাগ্রমনে এতদিন ধরে মাতৃত্বেরই কামনা করেছিল? খগেনবাবু কি তারই উপলক্ষ মাত্র? তাই যদি হয় তবে সে চরম মুহূর্তে নির্জীব হল কেন। বিজয়ের গরিমাতে ফেটে পড়াই ত' সঙ্গত ছিল! কিন্তু নুয়ে গেল, ভেঙে পড়ল। দৈহিক অবসাদ? সেটা স্বাভাবিক, ডাক্তারে তাই বলবে। কিন্তু ব্যাপারটা অতখানি জৈব নয়। যৌবনের উন্মাদনা ঘুচে যে অভিজ্ঞ-শান্তি চিত্ত অধিকার করে, তার অন্তরে

থাকে অপার করুণা, যার আশীর্বাদে চিত্ত শুদ্ধ হয়, সর্বাঙ্গে বিষাদ ছায়। ঘুমের ঘোরে রমলা চোখের উপর হাত রাখল, ঘর ত' অন্ধকার, কোথা থেকে আলো এল? ডান কনুই-এ ভর দিয়ে একটু উঠে শ্বাসপ্রশ্বাস শুনলেন, অনেক পরে পরে নিশ্বাস পড়ে, ক্রমে গতি নিয়মিত হল, খানিক পরে আবার মন্দগতি, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, বন্ধ হল, আর একটু বন্ধ থাকলে সর্বনাশ হত। বুকটা ধড়াস করে···রমলার বুকে হাত রাখেন, চেতনার চিহ্ন নেই, কোন আদিম অভ্যাসে রমলা অন্য হাতটি খগেনবাবুর হাতের ওপর রাখে···ছন্দে ফিরে এল আবার, চেতনার বহু নিচে যেখানে ঘন গাঢ় কালো স্রোত বয়, প্রগৈতিহাসিক জীবন স্পন্দিত হয়, সেখানকার লয়ে। এরই সন্ধানে সকলেই ঘুরে মরে, জেনে, না জেনে। আবার কেন চেতনায় অভ্যুদয়, আবার কেন অঙ্কুরোদ্ভব?

খগেনবাবু উঠে টেবিল থেকে টর্চ আনলেন। রমলার এক হাত চোখের ওপর, অন্য হাত তলপেটে। ওপরের হাতে আলো ফেল্লেন, রমলা নড়ল না। অন্য হাতের ওপর আলো ফেল্লেন, উত্তাপেরও অনুভব নেই। বুকের ওপর শাড়ির আঁচলটা পড়ে রয়েছে, নিচে হালকা বাঁধা জামা, অল্প চেষ্টায় সেটা খুলে গেল, সরিয়ে দিলেন আবরণ, আলো ফেল্লেন বুকের ওপর। নীল আড়া, না কালির প্রলেপ? আলো প'ড়ে কালো বরফ গলে যাবে, নীল মেঘের টুকরো থেকে দুধ বৃষ্টি হবে, পরে নদীর সৃষ্টি, যেটা পার হওয়া দুঃসাধ্য। রমলা নির্লজ্জের মতন পড়ে রইল। লজ্জাটা প্রাথমিক নয়, নন্দাদেবী বদরীনাথের পাশে বুক খুলে চিরটা কাল দাঁড়িয়ে রইল, পাশে নন্দকোট পঞ্চকোট প্রভৃতি পুরুষ প্রহরী—কিন্তু বুক ঢাকল না। লজ্জা নেই প্রকৃতির অন্তরে। সে কেবল কাজ করে. খগেনবাবু আলো নিভিয়ে টর্চটা টেবিলে রাখলেন।

পনের দিন প্রায় রমলা বিছানা ছেড়ে উঠল না। ঝি চাকর বেয়ারা বাবুর্চি রোজ সকালে আদেশ নিয়ে যায়। পেয়ালা পিরিচ ভাঙতে শুরু হল, মাছ মাংসের দর বাড়ল, ফল দুষ্প্রাপ্য, খাওয়া দাওয়ার সময় গেল বিগড়ে, ন্যাপকিন ধোপার বাড়ি থেকে আসেনি, শাড়ির জরি ছিঁড়েছে, রং জ্বলেছে, শার্টের বোতাম নেই। রমলা উঠে বসল কাজ করতে। খগেনবাবু একটু বিরক্ত হলেন, এতদিন যে সংসার চলেছে তখন রমলা ছিল কোথায়?

বিকেলে একদিন রমলা খগেনবাবুকে জানালেন যে সুজন তাকে চিঠি লিখেছে। ঔৎসুক্য প্রকাশের অভাবে রমলা চিঠিটা খগেনবাবুর হাতে তুলে দিল। 'দেখই না, আমি ওকে বুঝি না!' খগেনবাবু চোখ বুলিয়ে চিঠিটা ফেরৎ দিলেন, রমলা না নিয়ে টেবিলের ওপর রাখতে ইঙ্গিত করলে। 'এতে না বোঝার কি আছে? বেশ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছে।'

'কিন্তু আমার দোষ কি? ওকে অল্প বয়স থেকে দেখে আসছি। আমার প্রতি ঐ ধারণা পোষণ করবে স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'ধারণা কৈ? মনোভাব, সেটা স্বাভাবিক।'

'ঢের হয়েছে আর ঠাট্টা করতে হবে না। আমার কাজই বুঝি ছোট ছেলেদের বিপদে ফেলা।'

'ঠাট্টা নয়, ছেলেটিও ছোট্ট নয়। ছেলেবেলা বাছুর কোলে করেছ বলেই কি বৃদ্ধ বয়সে ষাঁড় কোলে করতে পারবে?'

রমলা বিরক্ত হল। 'উপদেশগুলো না দিলেও পারত।'

'উপদেশ কোথায়?'

'ওগুলো কি? ঐ যে লিখেছে,—যদি নতুন কর্মপ্রবাহে জীবন চালাতে পার তবেই সার্থক হবে, অবশ্য সেখানে তোমার কাজ নেতিমূলক। এ-সবের মানে জানি।'

'আমিও জানি, মানে অভিমান। বেচারি একলা, তাই তোমাকে চেয়েছে। এতদিন ভেবেছিল চাওয়াটা মানসিক। হঠাৎ আবিষ্কার করেছে কেবল মানসিক নয়। তাই ভয় পেয়েছে, তারই বিকৃত রূপ ঐ অভিমান। তার প্রতি তোমার দায়িত্ব থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।'

'আমার দায়িত্ব। কোনোদিন তাকে আমল দিই নি, নিজে যদি ছেলে-মানুষী করে আমার তাতে আসে যায় না। এখানে আসতে চেয়েছে, আমি লিখে দিচ্ছি আসতে হবে না।'

'তা ত লেখে নি! যদি প্রয়োজন হয় তবে সে চলে আসবে, এইটুকু জানিয়েছে।'

'তবে ত' সব বুঝেছ! ওর মানে আমি তাকে আসতে লিখি। কোনো প্রয়োজন নেই।'

'থাকতে পারে, ডাক্তার যদি রাজি হয়।'

নিচু গলায় রমলা প্রশ্ন করলে 'কাশী ছাড়তে বলছে কেন? তুমি তাকে জানিয়েছ?'

'জানাইনি। নেহাৎ ভুল নয়। নতুন জীবন নতুন প্রতিবেশের অপেক্ষা রাখে। ঠিক লিখেছে। প্রেতাত্মারাই ছাতাপড়া দেওয়ালে কিম্ভূতকিমাকার নকশায় আত্মগোপন করে, ঘরের কোনে লুকিয়ে থাকে, বেলগাছে আশ্রয় নেয়, স্থানীয় আবহাওয়ায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাকে থমথমে ক'রে তোলে। অদৃশ্য তাদের শিরা উপশিরা, কিন্তু তবু শক্ত। এত জোর কী হবে যে ছিঁড়তে পারব?' রমলা শঙ্কান্বিত চোখে চেয়ে থাকে। খানিক পরে উঠে বসে বলে,

'সুজন আমাকে চেনে না। ওর ধারণা আমি তোমাকে নরকে নামাব। বেশ, তুমি ডাক্তার আন। আমি মা হতে চাই না, তোমাকে আমি বাঁধব না।'

লেডি ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা করলেন। তাঁর মতে যদিও সন্তান-সম্ভাবনার চিহ্ন কিছু আছে, তবু আরও কিছুদিন অপেক্ষা না করলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তবে কোনো আন্তরিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েক দিন পর লেডি ডাক্তার আবার এলেন। পরীক্ষার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লেন, 'না, একটি সন্তান হয়েছিল অনেকদিন আগে, মধ্যে কিছু হয় নি শুনলাম, তাই ঐ রকম হয়েছে। একটা প্রেস্‌ক্রিপশন দিচ্ছি···পরে নিয়মিত ওষুধ খেলেই সেরে যাবে।'

রমলা মুড়ি দিয়ে আরো তিন চারদিন শুয়ে রইল। খগেনবাবু ঘরে এলেও মুখ খুলত না। বেয়ারাকে বলে দিলে সাহেবের অন্য ঘরে বিছানা করতে। ক্রমে বন্দোবস্তটি পাকা হল। একদিন সন্ধ্যায় আবার দুজনে নদীতে গেলেন। সেদিনও অক্ষয় ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ফেরার পথে রমলা খগেনবাবুকে বল্লে, 'চল, কাশী ছেড়ে চলে যাই। লক্ষ্ণৌ বেশ ভাল জায়গা শুনেছি! তোমার মেশবার উপযুক্ত লোক রয়েছে অনেক সেখানে।'

'তোমারও আছে, মেয়েদের ক্লাব খুব আধুনিক শুনেছি।'

রমলা বাড়ি এসে বল্লে, 'তালুকদারি জায়গা তোমার ভাল লাগবে না! চল কানপুর। নতুন শহর গড়ে উঠেছে।'

রমলা চাইলে ছোট লাইনে আসতে, কারণ দেখালে যে সে ইতিপূর্বে ছোট গাড়িতে চড়েনি। খগেনবাবু কিন্তু বড় লাইন ও বড় গাড়ির পক্ষপাতী, কারণ, যদিও তাতে ভিড় বেশি, অতএব স্টেশনে ও গাড়িতে যাত্রীদের মধ্যে পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্ভব, তবুও সেখানে স্মার্ত পণ্ডিতের উৎপাত আজ লুপ্ত, দ্রুতগতিই সভ্যতার প্রতীক, সহজিয়ার মন্ত্র হল লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিন থাকতে নয়, এবং যেকালে বড় গাড়ির বড় কামরায় মন সঙ্কুচিত হয় না, বিদেশ ভ্রমণের মোহ জাগে, তখন তাতে চড়তে আপত্তি থাকতেই পারে না, বরঞ্চ উৎফুল্ল হওয়াই কর্তব্য। রমলা এই যুক্তি মেনে নিলে এবং পুরুষের গাড়িতেই উঠল।

লক্ষ্ণৌ স্টেশনে গাড়ি বদল করতে হয়। হাতে সময় রয়েছে অনেক। ওয়েটিং রুমে মালপত্র রেখে খগেনবাবু খানকয়েক খবরের কাগজ কিনলেন। 'কানপুরে ধর্মঘটের সম্ভাবনা, মজুরদের অত্যধিক আবদার···লক্ষ্ণৌএ দিন দুপুরে ডাকাতি··· সংঘাইএ গোলাবর্ষণ···মুসোলিনির বক্তৃতা···সুভাষ বসুর জ্বর···স্পেনে ১০৮টি গির্জা ধ্বংস···চার বছরের মেয়ের অতীত জীবনের

কাহিনী'···প্রকাণ্ড অক্ষরে প্রথম পৃষ্ঠা ভরা, প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, ফেটে গিয়ে কানের পর্দা ছিঁড়ে দেয়···ওয়ালট্ ডিজ্‌নের ছবির মতন অক্ষরগুলো নেচে বেড়ায়, তবে বর্ণহীন, শব্দহীন, তাদের না আছে তালমান, না আছে মানুষঘেঁষা প্রতিকৃতি। কাগজের গায়ে গোবরের গোলা ছুঁড়েছে, সব কাঁচা, পাঁচ আঙুলের দাগও ধরে নি। রমলা লেডিজ ম্যাগাজিনের ছবি দেখছিল। খগেনবাবু পাশে এসে চুপি চুপি বল্লেন, 'কিশোরীর নতুন জুতো ও ঘাঘরা চাই, নচেৎ ছোকরা নাচতে ডাকবে না···মুখের ও গায়ের গন্ধে অমন সুন্দরীরও বিয়ে হল না হায়, কী সর্বনাশ, রমলা···সমুদ্রের ধারে পোশাক-প্রদর্শনী, চমৎকার দেখতে মেয়েগুলো, কিন্তু অমন বোকা হাসি কেন? অন্তঃসারশূন্য, তাই দেহের উগ্র বিজ্ঞপ্তি। দোষ দিচ্ছি না, চাই বৈ কি···মনের ক্ষতিপূরণ আছে, তবে সেটা কি কেবল দেহেরই মারফৎ? অন্যায় নয় অবশ্য···কি বল? শাড়ির আঁচল পিছনে টেনে রমলা ম্যাগাজিনটা স্টলে রেখে দিলে।

স্টেশনের বাহিরে একটাও টঙ্গা নেই, ট্যাকসি নেই। একজন কুলি খবর দিলে যে টঙ্গা ও এক্কাওয়ালারা ধর্মঘট করেছে, সর্দার দিনে প্রত্যেকের কাছে আট আনা চেয়েছিল, কেউ রাজি হয় নি। পরে আয়-ব্যয়ের পার্থক্য রেখে টঙ্গা পিছু আট আনা ও এক্কা পিছু চার আনায় লোকটা রফা করতে যায়। দু'চারটে টঙ্গাওয়ালা রাজি ছিল, কিন্তু তারা ঠ্যাঙানি খেয়ে ধাতস্থ হয়েছে। এখনও মিটমাট হয় নি, এখনই সামনের বাগানে মিটিং হবে। ট্যাকসি লক্ষ্ণৌএ অচল, কেবল ঘোড়দৌড়ের সময় ছাড়া, তখন দেশ বিদেশের বাবুরা এসে এক সপ্তাহের ফুরন করে নেয়—আর রাজা বাবুদের বাড়ির গাড়ি আছে। কুলি ফিটনে যাওয়া পছন্দ করলে না, বড় আস্তে যায়, কানপুরের ট্রেন ছাড়বার আগে শহর দেখিয়ে স্টেশনে পেঁাছে দিতে পারবে না।

বাধ্য হয়ে খগেনবাবু ও রমলা স্টেশনের বাইরে এসে সামনের বাগানে বসলেন। মরশুমী ফুলের বাহার খুলেছে, লাল হলুদ গোলাপী 'ক্যানা', সবুজ ঘাস, ফিরিঙ্গী ছেলে মেয়ের লাল মুখ রঙিন জামা— যেন সেতারের জোড়ের আলাপ। আয়ার দল প্র্যাম ছেড়ে বয়ের দলের সঙ্গে গল্প করে। একটি ছোট মেয়ে সবুজ রেলিংএ ধাক্কা খেয়ে ঠোঁট কাটল। রমলা ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিলে— রক্ত পড়ছে, রুমাল রক্তে লাল হল, আয়া ভয়ে চেঁচাতে লাগল, 'লুসি ভারি পাজি মেয়ে, হারামজাদী সাহেবের কাছে বকুনি খাওয়াবে রোজ, মেমসাহেব জরিমানা করবে, চাবুক নিয়ে তেড়ে আসবে।' রমলা আয়াকে খুকিকে নিয়ে বাড়ি যেতে বল্লে, গিয়ে যেন আইডিন লাগান হয়, ভয় নেই, মেমসাহেব বকবে না, হোঁচট খেয়ে সব ছেলে মেয়েরাই ঠোঁট কাটে। 'না,

মেমসাহেব, আপনি জানেন না! এ মাসে আমার তিন টাকা কেটেছে, বেয়ারার দু টাকা, এক বোতলের দাম ফিরে এল সাহেবের।' 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'···একটি যুবক পার্কে ঢুকল, সামনে চলে লাল ঝাণ্ডা, কাস্তে আর হাতুড়ি আঁকা, পিছনে আসে পঁচিশ ত্রিশ জন লোক। 'ভাইয়োঁ',···যুবক বেঞ্চের ওপর উঠে হাঁকে, 'ভাইয়োঁ-বহিনোঁ।' রমলাকে খগেনবাবু প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে বল্লেন।

কি ভাষায় যুবক কথা কইছে বোঝা যায় না, পাস্তির মাঠে, স্বদেশী বক্তৃতার বাঙলায় তার অনুবাদ হয় না। এককাট্টা, মজদুর, কিষাণ, ক্রান্তি, সাহুকারী রাজ, কথাগুলি স্পষ্ট, বুলেটের মতন গোটা-গোটা! কিন্তু চার পাশে ধোঁয়া, জনতার মুখে কালি ও তেলের দাগ, দেশী গাদা বন্দুক— নিশ্চয়ই তাই আওয়াজ জোর। মধ্যে একটি রাইফেল ঐ ছেলেটি, খদ্দর সাফ্, চোখ তীক্ষ্ণ, চুল ছাঁটা, গোঁফ দাড়ি কামান, স্বর পরিচ্ছন্ন। ক্রমে ভিড় জমল! সেই হ্যারিসন রোডের ও গোলদীঘির লোক সমাগম, আর এই জনতা, একেবারেই অন্য রকমের, ভিন্ন জাতের, পৃথক ধাতুর। সেটার অস্তিত্ব দুপাশের চাপে নিয়ন্ত্রিত, এটার আকর্ষণ ভবিষ্যতের আহ্বান, সেটা নালার মধ্যে কাদার স্রোত, এটা ঘূর্ণিপাক, স্রোতের বুকে আবর্ত। কোলকাতা শহরের এলোমেলো চৈতী হাওয়া গলির মধ্যে ঢুকে জঞ্জাল জড় করে, আর পূর্ববঙ্গের বুনো ঝড় নিজের বেগে, আপন খেয়ালে নৌকা ডোবায়, ঘরের চাল ওড়ায়, প্রতীক্ষারত নতুন বৌএর চোখে ব্যাকুল দূরদৃষ্টি আনে। কাজ দুটি আলাদা। কোলকাতার ভিড়ের শক্তি নেই, আনুগত্যই তার ধর্ম: এই জনতার গতি আছে, অতএব শক্তি থাকতে বাধ্য! কিন্তু মতি? মন নেই তার মতি, মাথা নেই ত মাথাব্যথা!

কিন্তু ঠিক সেই জন্যই মতিভ্রম হবার শঙ্কা। এই লিভিয়াথান নির্বিবাদে, সানন্দে আত্মসমর্পণ করবে মহাপুরুষের শ্রীচরণে, তেমনই আড়ষ্টভাবে যেমন নৃত্যশীলা কচিখুকিরা দুটো লম্বা হাত বাঁকাতে বাঁকাতে, 'পিয়'র পায়ে মাথা নোয়ায়; একত্রে রসজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির অপমান ক'রে। ইটালী জার্মানী, প্রায় সর্বত্র এই ঘটেছে, এখানেও দেরি নেই। ভিড়কে জনতায়, সমাবেশকে সমবায়ে, ক্রাউড্‌কে ম্যাস্-এ পরিণত করার জন্য যে পারিপার্শ্বিকের, যে গণচেতনার প্রয়োজন সে কোথায়? তবে ভিড়ের টান আছে বলতে হবে, যার জোরে পিল্‌পিল্ ক'রে হাজার লোক বাগানে জমায়েত হল। আয়া বয় পালিয়ে গেল। 'জওহরলালকি জয়!' মহাত্মা গান্ধীর নাম নেয় না কেন এরা? অল্পক্ষণেই নেতৃবৃন্দ এলেন। বেঞ্চের ওপর তাঁদের স্থান করে

দেওয়া হল। সকলেরই বয়স কম, নিশ্চয়ই বহুবার জেলে গেছেন প্রত্যেকে, মুখে কিন্তু সংগ্রামের ক্ষত নাই, অহিংসার প্রলেপে দাগ উঠে গেছে। খগেনবাবু আরো কাছে এলেন, কৈ কারুর চোখ আত্মপ্রসন্নতায় স্তিমিত নয়ত! নিশ্চয়ই উকিল ব্যারিস্টার, ডাক্তার নয়, যাঁরা বাঙলা দেশের মঞ্চ অধিকার করতেন, যাঁদের জন্য সভাস্থ ভদ্রলোক উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতেন, যাঁদের মুখ দিয়ে ইংরেজী বুলি অনর্গল নিঃসৃত হত, মধ্যে মধ্যে বার্ক, ব্রাইটের বুথ্‌নি পাতলা ঢাকাইএর ওপর জরির বুটির মতন। বোধ হয় বৃত্তিটাই এঁদের দেশসেবা, আর শ্রীঘরবাস। মুখে বুদ্ধির ছাপ রয়েছে, চালাকির নেই। একটু অন্য ধরনের বুদ্ধি, যেন একটু শান্ত, স্থির, ধীর রকমের। মনে হয় হিসেবি নয়, অথচ বে-পরওয়া চাউনিও নয়। চিন্তার ভারে কপালে দাগ পড়েনি, যুক্তিতে সবল নাও হতে পারেন, কিন্তু মনোভাবে গলদ নেই। একটা প্রাথমিক নীতিজ্ঞান তর্কবিচারের দায়িত্ব থেকে এঁদের নিষ্কৃতি দিয়েছে। মহাত্মাজীর কৃপা? তাই যদি হয় তবে তাঁর নাম নেওয়াই উচিত। তাঁর কল্যাণে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানসিক পরিবর্তন না লক্ষ করে যাবার উপায় নাই। কিন্তু তার বেশি আর কি ঘটল?

ইতিপূর্বে একজন দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষ বেঞ্চের ওপর উঠে পড়েছেন! জনতা নীরব হল, পার্শ্ববর্তী নেতারা মুখ তুলে চাইলে। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন, এই শহরে তিনি একপ্রকার আগন্তুক, কিন্তু এলাহাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে কুলিদের, এবং শহরে একাওয়ালাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তিনি কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে অনেক ন্যায্য দাবি আদায় করেছেন। যে-পন্থা সেখানে অবলম্বিত হয়, এখানেও তাই হোক—অর্থাৎ, টঙ্গা ও একাওয়ালাদের মধ্যেকার বিরোধ ঘুচে যাক। এইভাবে ঐক্যসাধনের পর যে শক্তি তারা পাবে তাকে অগ্রাহ্য করা দুঃসাধ্য হবে। কিন্তু সেটা পরের কথা, আগে টঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে বিবাদ মেটান কর্তব্য। তার উপায় হল এই: সর্দাররা চেয়েছে আট আনা ওদের কাছে, আর চার আনা তোমাদের কাছে। তোমরা সকলে মিলে সর্দারদের বল যে চার আনার বেশি এক পয়সা তারা পাবে না, পাবার অধিকার নেই, দেওয়া অসম্ভব, জবরদস্তি করলে সত্যাগ্রহ করব। আরেকজন বক্তা উঠে সত্যাগ্রহের মহিমা কীর্তন করলেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি পাশের একটি স্বেচ্ছাসেবকের হাত থেকে নিয়ে ত্রিবর্ণের জাতীয় পতাকা খুল্লেন। তাঁর মতেও চার আনার অধিক দেওয়া অন্যায়, এমনকি তাঁর ধারণা যে চার আনাটাই বেশি, তবে টঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে রফা করতেই হবে, নচেৎ শক্তিক্ষয় অনিবার্য। একজন লোক বেঞ্চের ওপর এসে

বক্তার পাশে দাঁড়াল। মাথায় দোপাল্লি টুপি, গায়ে আদ্দির জামা, তার ওপর ওয়েস্টকোট, পায়ে নাগরা, কিন্তু সব ছেঁড়া, নোঙরা, রঙ্গমঞ্চের মোসাহেবের পোশাকে যেমন আতিশয্য দারিদ্রকেই বাড়ায়, তেমনই। এই বোধ হয় লক্ষ্ণৌএর সেই বিখ্যাত এক্কাওয়ালা, যে ভোর বেলা থেকে মাঝ রাত্রি পর্যন্ত কেবলই ঠুংরী গায়, যার মেজাজ নবাবী, যার রক্ত খানদানী, যার রসিকতা অতুলনীয়, যার ভাষা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা,...এ কি সেই? নিশ্চয়ই, ঐ যে বাবরি চুল, কানে আতর, মুখে জরদা, সমগ্র অবয়বে বিশেষত্ব, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কমনীয়তা, চাউনিতে লজ্জা। একপ্রকারের আভিজাত্য রয়েছে বটে, কিন্তু, কোথায় যেন পচ ধরেচে সন্দেহ আসে, ধুঁকছে যেন যক্ষ্মারোগী পুতুল বৌএর মতন। সভার কাছে লোকটি পরিচিত হল এক্কাওয়ালার মুখপাত্র ব'লে। লোকটি চারধার ঘুরে সেলাম করলে, পতাকাবাহী পূর্ববর্তী বক্তার প্ররোচনায় নীচু গলায় খানিকটা কি বল্লে, তার মধ্যে ফারসী বুলিই বেশি, তাই বোঝা গেল না। তবে তার ভদ্রতায় মনে হল যে সে আপত্তি করতে ওঠেনি। তার বক্তব্য শেষ হবার পূর্বেই লালপতাকাধারী যুবকটি বাধা দিলে। তার প্রতি ভঙ্গিতে ফুটে উঠল অসমর্থন। লাল ঝাণ্ডা খাড়া ক'রে সে উচ্চকণ্ঠে বল্লে, 'ইয়ে নাহি হো শক্তা। এক্কাওয়ালাদের কাজ নয় টঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে রফা করা...চার আনা যদি তারা রোজ দিতে পারবে তবে আর ভাবনা ছিল কী! কেউ দেবে না এক পয়সা! ধর্মঘট চালাতে হয় আমরা চালাব। স্টেশনের সব কুলিরা কাজ বন্ধ করবে। যে সর্দার এদের শোষে, সে সর্দার ওদেরও শোষে। আর সবার পিছনে কাঁরা আছেন জানতে বাকি নেই!' বেঞ্চ থেকে একজন মুরুব্বি গোছের ভদ্রলোক বল্লেন, 'এই ধরনের দায়িত্বহীনতা অসহ্য। অহিংসানীতি মিথ্যার প্রশ্রয় দেয় না।' যুবক উত্তর দিয়ে, 'রফা আর রফা, কতদিন চলবে এই চালে। অন্ধ যারা তারা কেন আসে নেতৃত্ব করতে!' তর্ক বাধল, 'দুটো ঝাণ্ডা পাশাপাশি উড়ছে' অন্য একজন যুবক বেঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠে হাঁকলে, 'লাল ঝাণ্ডা জিন্দা রহে!' রব উঠল, 'লাল ঝাণ্ডা, লাল ঝাণ্ডা...'

কখন ও কী ভাবে তিনি অতটা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছেন খগেনবাবু বুঝতে পারেন নি। এক ঝলক দুর্গন্ধ নাকে আসতে ফিরে দেখেন চারপাশে কাতারে কাতারে লোক, এক্কাওয়ালা, রেলের কুলি। সামনে ফিরে দেখলেন লাল ঝাণ্ডা পড়ে গেছে, একজন কুলি ছুটে এসে সেটা তুলে নিয়ে বেঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠল। জাতীয় পতাকাধারী লোকটি খগেনবাবুর ওপর পড়ে গেলেন। চারপাশের লোক তখন উত্তেজিত হয়েছে। শোনা গেল পুলিশ আসছে। ভিড় পাতলা হতে শুরু হল, কিন্তু লোকেরা ছুটে পালাল না। শীতের নারকেল

ভেজ রোদ্দুরের ঝাঁজে খানিকটা গলেছে, খানিকটা খোলো খোলো রয়ে গেল, জমাট ভাব রইল কেবল বেঞ্চের চারপাশে। তিন জন কনস্টেবল ও একজন দারোগা সামনে এল। দারোগা ভদ্রভাবে অনুরোধ জানালে হল্লা যেন না হয়। লাল পতাকাধারী যুবক উত্তর দিলে, 'হল্লা নয়, মিটিং, যা করবার অধিকার আছে, পার্ক সাধারণের জন্য, উয়ো জমানা চ'লে গেছে। হল্লা হবে না। আপনারা আসুনগে।' জাতীয় পতাকাধারী ভদ্রলোকটিও সায় দিলেন। দারোগা আরও নরম সুরে বল্লে, 'মিটিং করুন আপনারা, কিন্তু হল্লা থেকেই হাম্‌লা হয়। আপনারা আইন না মানলে সরকারের মান থাকবে না, এরাও হাতের বাইরে যাবে যে!' একজন কনস্টেবল সামনে এগিয়ে আসতে যুবক ধমকে উঠল, 'যাও বাহার যাও, নিক্‌লো হিঁয়াসে।' পুলিশের দল পার্কের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, দারোগার মুখে অপ্রস্তুতের হাসি।

খগেনবাবু প্লাটফর্মে ফিরে এলেন। দূরের এক বেঞ্চে রমলা বসে আছে, গালে হাত, পায়ের ওপর পা। ফিতে বাঁধা কালো জুতোয় সরু লাল পাড়, পায়ের গাঁট চোখে পড়ে, একটা নীল শিরা ওপরে উঠেছে। না, না, দাঁড়কাকের পা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলেতী বারণের অর্থ ছিল। কবি বলেন, মেয়েদের অন্তরের সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হয় অঙ্গ ব'য়ে, আঙুল দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে। আবার বৈজ্ঞানিকের মতে বাইরের সোন্দর্য অন্তরকে আক্রমণ করে, কারণ, ভঙ্গিই ভাবের জন্মদাতা। এই ঠিক! অন্তরের আবার সৌন্দর্য কি? বসবার, দাঁড়াবার, নড়বার-চড়বার, সাজসজ্জার ঢঙেই মন মাতায়। ফটোগ্রাফারও তাই বলবে। সিনেমার খেঁদী পেঁচীরা অপরূপ হয়ে ওঠে এরই জন্য! সব সময় কি সত্য? কে জানে! সুজন নিশ্চয়ই বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখাত? চিরকাল সে ভেসে বেড়াল—ডাঙা পেল না। মঙ্গলে বিশ্বাসীদের দশাই তাই। তারা মঙ্গল ও সুন্দরকে যুগ্মপ্রত্যয় ভাবে, তাই পড়ে বিপদে। ফলে সত্য হয় যা অ-মঙ্গল ও অ-সুন্দর নয়। অথচ সমগ্র বিশ্বে অ-মঙ্গল ও অ-সুন্দর পরিব্যাপ্ত। তাকে বাদ দিলে ফাটা বেলুনের মতন জীবনটা কুঁচকে যায়। তারপর, যত ফুঁ দেওয়া যাক না কেন বেলুন আর ফোলে না। প্রেম, আত্মিক সাধনা, সাহিত্য, এ-সবে তার পেট ভরে না। সুজন ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চর্চায় নিজের পরিণতি কামনা করেছে, সুন্দরের আকর্ষণে নয়, তাই সে দুঃখী।

খগেনবাবু রমলার কাছে আসতে তার গালের হাড় চোখে পড়ল। হাত এত নরম, তুলতুলে, মুখ এত কঠিন কেন? এই ত সেদিন পর্যন্ত কচি তালশাঁসের মতন ছিল। আঙুলের মাথা চ্যাপ্টা, কলাপ্রিয় নয়। গলার কণ্ঠা দেখা যায়, উঁচু হাড়ের মধ্যে গর্ত, আট পেয়ালা জল ধরে। চমকে খগেনবাবু

মুখ ফেরালেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং স্বপ্ন—এই দুয়ের অতীতে যার সন্ধান মেলে তার রূপ 'সুররিয়ালিস্ট' ছবির মত অবাস্তব ও বীভৎস। কিন্তু হয়ত অতিক্রম করবার দরকার নেই। অদ্বৈতবাদের ঝোঁক কাটান শক্ত। তার চেয়ে—তোমার আমার মধ্যস্থিত বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুতকণা সৃষ্টি হল, তার ফুল্‌কি তোমার-আমার আঙুলে ধরল, জ্বলতে জ্বলতে ওপরে উঠল, শুখনো সল্‌তে হলে ছাই এক মুহূর্তে, নচেৎ ধিকি ধিকি, জ্বালা থামাবার জন্য কবিতার মলম ক্ষণে ক্ষণে। চোখের জল ঢাললে জ্বালা কমে না, বাড়ে কেবল, ফোস্‌কা আর ঘা হয়। সেই ক্ষতের স্মৃতি অসহ্য, যেন ঘা দেখিয়ে ভিক্ষে চাওয়া। ভগবান রক্ষা করুন এই অভিমানের বিলাস থেকে সমগ্র স্ত্রীজাতিকে।

রমলা এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে খগেনবাবু বল্লেন, 'ট্রেন ছাড়বার দেরি নেই, চল গাড়িতেই বসিগে।' রমলা উঠল।

'তুমি ঠিকই বলেছ।'

'কি ?'

'এ যেন সরাইখানা। এত বড় স্টেশন ভাল লাগে না। ছোট আশ্রমই ভাল। যত বড় জায়গা তত প্রকট হবে বিরোধটা। কৈ হোক দেখি ধর্মঘট পাড়াগাঁয়ে, পুঁইমাচার তলায়।'

'কেন, স্টেশনটা চমৎকার নয় ?'

'স্টেশন হবে পাথরের, তাকে জড়াবে আইভি, রেল-লাইনের বাঁকের মুখে থামবে এঞ্জিন ও ট্রেন, আধখানা চাঁদের মতন, তোমার পুরু গাল যেমন ছিল তার মতন, দূরে দেখা যাবে লোহার কাঠামোর ওপর ঝোলা সিগ্‌ন্যাল, প্লাটফর্মে থাকবে ক্যানার ঝোপ, বাইরের প্রাঙ্গণে থাকবে টু-সীটার, ট্র্যাপ্‌! ভারতীয় দৃশ্য নয়, কিন্তু এ-পোড়া দেশে কোনটাই বা স্বদেশী! বিদেশী তাও নয়। আদর্শ জীবন মানেই হল কল্পিত বিদেশী পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা। সত্যকারের দৃশ্য নয়। পার্কে গোলমাল বাধল এইমাত্র,— সেটা স্বদেশী? বিদেশী ? জগাখিচুড়ি। স্বদেশী ধারায় পঞ্চায়েৎ মিটিয়ে দিত, বিদেশী ঢঙে প্রস্তাব স্থাপন, গ্রহণ, অনুমোদন সব কিছুই হত। এটা অনুকরণ, খাঁটি মাত্র ঐ দোপাল্লিধারী এক্কাওয়ালাটা, কোন নবাবের বংশধর, এখনও বোধহয় পেনশন পায়। তা হোক্, তবু সে সত্যিকার মানুষ, জরাগ্রস্ত, মুমূর্ষু, তবু মানুষ। দেখছ না চারধারে, রেলকোম্পানীর চাহিদা পূরণ করতে কাশী, জগন্নাথক্ষেত্র, হরিদ্বার, ম্যয় কাঞ্চনজঙ্ঘা, পর্যন্ত প্রাণপণে ব্যস্ত। ভারতবর্ষের নিসর্গপটও ইংরেজের খয়েরখা। অথচ মনে আছে কাশীর গঙ্গায় মড়াভাসা, হাঁড়ি আর খড়ের জঞ্জাল, পুরীর মন্দির দ্বারে কুষ্ঠরোগী, আর হরিদ্বারে ভণ্ড

সন্ন্যাসীর ভিড়। সে-সব কোথায় এই ছবিগুলোতে? দৃশ্য নেই এদেশে, নবদম্পতির ফোটো দেখলে অন্নপ্রাসনের ভাত উঠে আসে। শুভক্ষণ, না অশুভক্ষণের যাত্রারম্ভ? স্বাভাবিকতা অসম্ভব এদেশে। সত্যাগ্রহ স্বদেশী, ধর্মঘট স্বদেশী, কংগ্রেসরাজত্ব স্বদেশী? মহাত্মাজীর আবিষ্কার বলেই কী ভারতীয়?'

রমলা জিজ্ঞাসা করলে, 'মিটিং করে কি চায়?'

'ওরা দস্তরি দেবেনা সর্দারকে।'

'তুমি কি বল যে ওরা বিনা ওজরে দিক?'

'মোটেই না। কিন্তু না দেওয়ার ভঙ্গিটা নিজস্ব নয়।'

'দোষ কি তাতে?'

'না বেশি দোষ নয়, ময়ূরের পোশাকে পরা দাঁড়কাকের চেয়ে। এও এক রকমের জবরদস্তি, স্বভাবের ওপর। অত্যাচারের বিপক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হবার দৃষ্টান্ত ভারতীয় ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে, কোন পৃষ্ঠায়, কোন পঙ্‌ক্তিতে? থাকে যদি সে পাদটীকায়, তাও আবার দেশপ্রেমিক ভাষ্যকারের কৃপায়। সহনশীলতাই এ দেশের ধর্ম, রয়েছে আমাদের অস্থি মজ্জায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও এদেশের মেয়েরা স্বপ্ন দেখে যে স্বামী ঠ্যাঙাচ্ছে, আর তারা মুখ বুজে সহ্য করছে, আর তারপর স্বামীর সোহাগ খাচ্ছে। লজ্জা নেই, তেজ নেই, তাই হল সতীত্ব। একটা কবিতা আছে যেখানে বিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবি বলেছিলেন যে শূদ্র শূদ্র হয়েই ধন্য, কারণ ব্রাহ্মণের সেবা করতে পারবে চিরটা কাল।'

'অনুকরণ করবে না বলেই কী সকলে আধ হাত ঘোমটা টেনে ঘরের কোনে বসে থাকবে! স্ট্রাইক না হয় বিদেশী, কিন্তু স্বদেশী থেকেই ত' পরাধীন? সকলের জীবনেই একটা না একটা পরিবর্তন আসে, তুমি বদলাও নি?'

'নিশ্চয়ই বদলেছি। সেটা নীতির ক্ষেত্র, একটি মানুষের ক্ষেত্রে, কিন্তু সমগ্র জাতের যে পরিবর্তন আসবে তার উৎস হবে ইতিহাসের স্রোত।'

'সেটা বুঝি অন্তঃশীল? যদি পরিত্যাগের সাহস আমাদের সংস্কারে না থাকে, তবে তোমার মতে যারা শুষছে তারা ঠিকই করছে? আমি অবশ্য কিছু বুঝি না, তাই বোকার মতন জিজ্ঞাসা করছি। তুমি যাই বল না কেন, শোষণটাও খাঁটি দেশী। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিতরাও, যারা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার গুণ সর্বক্ষণ গায় তারাও এই হিসাবে খাঁটি স্বদেশী।'

'নিশ্চয়ই। যে-জাত স্বদেশী শোষণ প্রক্রিয়াকে প্রেম ভক্তি করুণা প্রভৃতি নাম দিয়ে নিজেকে চোখ ঠেরেছে, যার সমাজধর্মের মূলকথা দায়িত্বজ্ঞান, যার দাসত্বে শিক্ষানবীশি হাজার বছরের ওপর, তার অধিকার-সচেতনতা নিতান্ত

কৃত্রিম, তার আপত্তিটা উত্তেজনা মাত্র। তাকে আজ স্বভাব পরিত্যাগ করতে বল্লে সে চেঁচাবে, কেলেঙ্কারি বাধাবে, জয় রবে গগন ফাটাবে, তারপর, সেই ঘরে ঢুকে বিছানা নেবে, তামাক আর আফিম খাবে, কলেজে কাউনসিলে কারখানায় সুড় সুড় করে ঢুকে পুনর্মূষিক হবে। এর বেশি জোরাল প্রতিবাদ আমাদের কণ্ঠে ফুটে ওঠা শক্ত। কচি খোকার ককানি, স্নেহময়ী মাতা স্তন্য দান করতে থাকুন, খোকার পেটে বিঘেৎখানেক পিলে গজাক···বালসুলভ চপলতা, খানিক পরে ঘুমে নেতিয়ে পড়বে অকাতরে, শুভ অবসরে স্ত্রী যাবেন স্বামীর অঙ্কে, মাস্টার হবে রায় বাহাদুর, জেল ফেরৎ নেতা হবে গবর্নমেন্টের খেতাবধারী চর, আর ধর্মঘটের পাণ্ডা হবে মিলের জমাদার। রমলা, রমলা, এ চলবে না।'

রমলা হোঁচট খেল, শাড়ির পাড় গেল ছিড়ে। 'ঘোড় তোলা জুতো পোরো না, সাণ্ডাল পোরো।'

'আমি খালি পায়ে হাঁটতে পারব না বলেদিলুম।'

লক্ষৌ থেকে কানপুর যেতে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগে। ইণ্টার ক্লাসের তক্তার ওপর নোঙরা গদি, গা ঘিন ঘিন করে, তাই সেকেণ্ড ক্লাসে যাওয়াই ঠিক হল। ঐ প্রকার সরল জীবনযাপনে বিশ্বাস আসে না, চিন্তা কলুষিত হয়। কেন হবে না সে অবস্থা যেখানে তৃতীয় শ্রেণীও পরিচ্ছন্ন হবে? কিন্তু ততদিন নোঙরামি খাতে বসবে না। সেকেণ্ড ক্লাস খালি। খগেনবাবু গদি ঝেড়ে দিলেন, রমলা জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

'কি ভাবছ?'

'এমনই, দেখছি।'

'আজ রাত্রে কোথায় মাথা গুঁজব জানি না।'

'ওয়েটিং রুমে থাকতে দেয় টাইম-টেবিলে লেখা আছে'

'সেই ভাল, তুমি ঘুমিও, আমি প্ল্যাটফর্মে টহল দেব। রুমালটা ফেলে দাও—ওটা লার্ল, এইটে নাও।' দেবার সময় খগেনবাবু জোরে আঙুলগুলো টিপে দিলেন। 'কৈ হাত সরালে না?' হাত এলিয়ে পড়ল।

উনাও স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সশস্ত্র পুলিশ দাঁড়িয়ে। খগেনবাবু একজন খদ্দরধারী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপারটা কি। উত্তরে শুনলেন যে 'কিষাণ লোক' এক তালুকদারের বাড়ি 'ধাওয়া' করবে, পাছে গোলমাল বাধে তাই এই বন্দোবস্ত। 'ধাওয়া' মানে 'চড়াও', যাত্রা, শোভাযাত্রা নয়, প্রতিবাদ জানাবার জন্য সরব যাত্রা। মহাশয় ব্যক্তি 'আবোয়াব' সংগ্রহ করেছেন তিন হাজারের কাছাকাছি, সেটা জমা না দিয়ে করেছেন বাজেয়াপ্ত। আপত্তি

জানাতে বলেছেন যে সেটা নাকি খাজনা। প্রজারা উত্তর দেয় যে খাজনা তারা নিয়মিত দিয়ে এসেছে তহবিলে। তালুকদার রসিদের প্রমাণ চান, প্রজারা রসিদ দেখাতে পারেনি, কারণ রসিদের প্রথা সে তালুকদারিতে নেই। উলটে ম্যানেজারবাবু খাতা দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে খাজনা নেওয়াই হয় নি, কারণ অজন্মা হয়েছিল, এবং রাজাসাহেব দয়া করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্য উশুল করেননি। কিষাণরা প্রথমটা অত বড় মিথ্যায় হতবুদ্ধি হয়ে যায়, কংগ্রেস অফিসে খবর দেয়, ফলে কংগ্রেস কর্মীর নেতৃত্বে হাজার পাঁচেক কিষাণ ছুটছে ধন্না দিতে কাছারি বাড়িতে, পরে হেঁটে ,যাবে লক্ষ্ণৌয়ে, কাউনসিল হাউসের সামনে কিষানদের গ্র্যাণ্ড র‍্যালি হবে, বিভিন্ন জেলার লোকজনও আসবে। তারা চায় প্রতিকার।

'মারপিটের সম্ভাবনা আছে?'

'তিলমাত্র নেই, তবে যদি ওপক্ষ না বাধায়।'

'আপনারা অহিংসপন্থী, কিন্তু এ কি আগুন নিয়ে খেলা নয়?'

'মহাত্মাজীর নামেই জল। তিনি জ্বালাতেও জানেন, নেবাতেও জানেন।'

ট্রেন ছাড়ল উনাও থেকে।

'দেখ রমলা, পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হয়।'

'কাকে?'

'তবু ভাল! কেন, কীর্তন শোন নি?' খগেনবাবু হেসে ফেল্লেন।

এই প্রদেশে একটা ওলটপালট চলেছে। যত বাধাই থাক দেশের লোক রাজত্ব হাতে নিলে স্বাধীন প্রয়াসের সুযোগ ঘটেই। তার ওপর যদি সেই সব লোক সর্বত্যাগী হয় তখন তাদের আশ্রয়ে সুপ্তশক্তি জাগ্রত হবার সম্ভাবনা বেশি হবেই। বাংলাদেশে কংগ্রেস গুরুভার গ্রহণ করল না, তাই বাঙালী স্বাধীনতার আস্বাদ পায়নি, ফলে নীচ দলাদলি, গালিগালাজ, হিন্দু মুসলমানের অসম্ভব অসদ্ভাব। গোদের ওপর আবার বিষফোড়া? বৈশিষ্ট্যজ্ঞানের অহংকারই বাঙলার কাল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই তার অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল, শিক্ষার মোহ আর ভদ্রোজনোচিত বৃত্তি তার অভিশাপ। বাঙালী নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে ফ্যাশিজমের বীজ রয়েছে। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ আজ প্রগতিশীল। লক্ষ্ণৌ, কানপুরের ধর্মঘট, উনাওয়ের ধাওয়া, মীরাটের মেথর সমস্যা, গোরখপুর জেলার মহারাজগঞ্জের কৃষক আন্দোলন, যার তুলনা ফ্রান্সের ১৭৮৯ সালের কিছু পূর্বের প্রাদেশিক আন্দোলনে পাওয়া যায়। এদেশ জাগছে, সত্যি জাগছে; বাঙলা সেই কবে একবার দাঁড়িয়ে উঠে পাশ মুড়েছিল, আবার ঘুমুচ্ছে, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, চেঁচাচ্ছে, জোর স্বপ্নাবিষ্টের মতন চোখ বুজে বেড়াচ্ছে, শ্রেণীস্বার্থটি

বেশ বজায় রেখে। বাঙলা দেশে বাস দুঃসহ। যে দেশে কেউ কখনও চোখ খুলে সত্যের দিকে তাকায় না, সেখানকার পরিশীলনের প্রত্যেক অঙ্গটি সামাজিক সত্য থেকে পালাবার জন্য সাধা। সাহিত্যিক, কলাবিদ্, নেতা সকলে পালাচ্ছে, কিন্তু কোথায় যাবে জানে না। গুণ্ডার ভয়ে যারা দেশত্যাগী হয় তারাই একমাত্র কাপুরুষ নয়, কাজটা তাদের মাত্র স্থূল, ব্যস, এইটুকু। নিজেকে খগেনবাবুর নিতান্ত বাঙালী বলে মনে হয়!

আদৎ কথা, যেখানে হোক জীবনের পরশ লাগলেই হল। প্রাদেশিকতা তাদের, যাদের ঘরবাড়ি আছে, ছেলের চাকরি না হলে যাদের চলে না। সাবিত্রী যখন ছিল তখন বাঙালী, এখন বন্ধনহীন, মাসীমাও নেই যে পিছন টান থাকবে, রমলা যেভাবে থাকে সেটা ভারতের সর্বত্র চলে। বাস্তবিকই ত, বাঙলা দেশ জন্মস্থান বলেই কী ভারতীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। বড়র জন্য ছোটকে ত্যাগ করা ন্যায়সঙ্গত। ঢেউগুলো আরো ছড়িয়ে যাক, ভারতের বাইরে, চীন, পারশ্যে, এশিয়া-আফ্রিকায়, যেখানে স্ত্রী-পুরুষ প্রাণপণ চেষ্টা করছে বাঁচতে, আরো ভালোভাবে বাঁচতে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে, বাধাহীন সংশয়হীন আত্মপ্রত্যয়ে।

একটু কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। একলা কী দোকলার কর্ম নয় সন্দেহ হয়। নিজের মূলধন কতটাই বা! পায়ের তলায় অনড় মাটি, দুপাশের চেনা গাছ পালা, ওপরে পুরানো আকাশ, কাছে, খুব কাছে না হলেও, কাছে পরিচিত মুখ— এ সব চাই; নচেৎ সাইবেরিয়া থেকে উড়ে এসে দুদিনের জন্য ঝিলে বসা, আবার ওড়া হাজার হাজার মাইল ধরে— এ-কেবল পাখার পরিশ্রম। পাখিদেরও ভূম্যধিকার জ্ঞান টনটনে, বাঁচবার তাগিদে। কিন্তু যাদের সে তাড়না নেই, যারা চৈতন্যের দ্বারা স্বার্থজ্ঞান অতিক্রম করতে সক্ষম তাদের পক্ষে প্রাদেশিকতা কূপমণ্ডুকতার অনুরূপ। 'রমলা, আমরা এখানেই থাকব, কানপুরে। কাশীর পালা সাঙ্গ। এখানে জীবনের নতুন বীজ পড়েছে, তোমার-আমার এই হল প্রকৃত প্রতিবেশ।'

'আগে দেখ, পছন্দ হয় কিনা তারপর যা ঠিক করা যাবে। আমি ভেবেছিলাম, আর বাসা বেঁধে ফল নেই তোমার ধারণা!'

'ভুল বুঝেছিলে বলব না। এখন আমিই অন্য রকম হয়েছি!'

'তা একটু বদলেছ', বলে রমলা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কানপুরে যখন গাড়ি পৌছল তখন প্রায় সন্ধ্যা। প্লাটফর্মে আলো জ্বলল। ওপরকার পুল পার হয়ে পয়লা নম্বরের প্লাটফর্মে আসতে হয়, সেটা জমজম করছে, নিশ্চয়ই ট্রেনটা হাওড়া এক্‌স্‌প্রেস। একটা বেঞ্চের পাশে মালপত্র রেখে

খগেনবাবু ও রমলা হিন্দু রেস্তরাঁয় গেলেন। ঘর পরিষ্কার, টেবিল, পিরিচ-পেয়ালার ওপর স্বত্বাধিকারীর নামের আদ্যাক্ষর লেখা, কাঠের ছোট ছোট কুটরি পর্দাঘেরা, দেয়ালে তাজমহল, কাশ্মীর ঘাট, কুতবমিনারের তৈলচিত্র ঝোলান। খগেনবাবু 'দেশী' খানার অর্ডার দিয়ে একটি ছোট কুটরিতে বসলেন। 'বয়' খাবার আনল। রমলার মাথা ধরেছে তাই খেতে পারলে না। আটার রুটিতে গন্ধ, ডালে পেঁয়াজ, চাটনি দিয়ে এক গ্রাস ভাত পেটে গেল। খগেনবাবু বল্লেন, 'বোকামি হয়েছে। তুমি বস, আমি আসছি।' বাইরে এসে ম্যানেজারের কাছে খবর পেলেন যে দেশী হোটেল যা আছে তাতে সুবিধা হবে না, 'রিস্তাদার' যখন শহরে কেউ নেই তখন রাতের জন্য ওয়েটিং রুমেই থাকা ভাল। ম্যানেজার নিজে খগেনবাবুকে স্টেশন-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে নিয়ে গেলেন। নাম লিখতে হল মিস্টার ও মিসেস। রেস্তরাঁর 'বয়' বিছানাপত্র খুলে দিলে। 'আচ্ছা এখন তুমি যেতে পার, দু-বোতল সোডা ও দুটো গ্লাস এখনই পাঠিয়ে দাও, সকালে দুটো ছোট হাজ্‌রি এনো সাতটায়, দুধ যেন তাজা হয়, না পাও কনডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্‌কের টিন এনে এখানে খুলো।'

'রাত বেশি হয়নি অবশ্য, তবু তুমি শুয়ে পড়, সারাদিন গাড়িতে এসে ক্লান্ত হয়েছ। আমি একটু প্লাটফর্মে ঘুরে আসি, কোনো বই আনব?'

'না।' রমলা জুতো খুল্লে। খগেনবাবু পায়ের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'ছোট্ট পায়ের হাঁপ লাগে না? মাসীমা ছেলেবেলা গায়ে লেপ ঢাকা দিয়ে বলতেন— ওম্‌ করে শো। মুড়ি দিতাম, পরে হাঁপ লাগত, নাক বার করতুম, কান, গলা, হাত, বুক…'

'ওগো তোমার পায়ে পড়ছি মাসীমার কথা থামাও! তাঁর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়! সাবিত্রী…'

'তার নামটাও না হয় নাই তুললে!'

'বেশ বলব না, ক্ষমা কর, কিন্তু…'

'আচ্ছা তুমি একটু বিশ্রাম কর, আমি একটু আসছি।'

স্টেশনের স্টলে বই সাজান! বেশির ভাগ কলোনিয়াল সংস্করণের ভারতীয় মস্তিষ্কের উপযোগী খাদ্য। ট্রেনেই যা কিছু সময় মেলে গোলামি থেকে, তাই মূর্খরাও শিক্ষিত হতে চায়। অবচেতনার নিম্নতম স্তরে যেসব গুপ্ত ইচ্ছা লুকানো থাকে তাদের প্রশ্রয় দিতে পারলেই ব্যবসার মস্ত সুবিধা। প্রকাশক-বৃন্দ মনের এই গূঢ়তত্ত্বটি ধরেছে তাই তাদের তহবিল ভর্তি। যত বাধা তত গুপ্তি, যত সভ্যতা তত বাধা। এমন সমাজ কল্পনার অতিরিক্ত নয় যেখানে বিবেকের সূক্ষ্ম অথচ নির্মম অত্যাচারে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আত্মগোপনে তৎপর

হবে না, ফলে প্রকাশের তাগিদ কমবে, আশা পূরণের সাহিত্যের চাহিদা দুর্বল হবে। সেখানেই আসবে সৎসাহিত্যের সুযোগ। জুজুর ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত চিরকাল…ছেলে বয়সে পিতৃ-পিতামহ, যুবা বয়সে পরীক্ষক, পরে কারখানার মালিক যার এক কলমের খোঁচায় চাকরি যায়, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের নিশ্চিত কাঠামো ভূলুণ্ঠিত হয়। কিন্তু পুরুষেরাই কি একলা ভয় দেখায়? রমার মতে মাসীমার দলও নির্দোষ নন। যাকে 'মাদার ফিক্সেশন্' বলে তার মূলেও কি ঐ একই ভয় রয়েছে। শাশুড়ি-বৌএর কলহের প্রাথমিক কারণ ঐ; বৌ চায় ছেলের ঘাড়ের ভূত ছাড়াতে, দোষের মধ্যে সে আরেকটু চায়, নিজে পেত্নী হয়ে বসতে। স্বাধীন করাটা যদি স্ত্রীর উদ্দেশ্য হত, তবে স্ত্রৈণ হওয়ার মতন সুকর্ম আর থাকত না। কিন্তু সম্পত্তিবোধ দুর্নিবার। সাবিত্রীর নাম নিতে রমলার ওপর রাগ এল।

গোল্যাংক্সের বই রয়েছে বিস্তর। বামমার্গী সাহিত্যে ছেয়ে গেল দেশ। বাঙালী মেয়েদের দ্বিতীয় ভাগের পরই যেমন রবীন্দ্রনাথ, পুরুষদের তেমনই বি· এ· ক্লাসের পাঠ্য পুস্তকের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত সুবিখ্যাত অধ্যাপকের 'নোট'-এর পরই কোনো সাহেবের মার্কস-ব্যাখ্যা! মার্কস নয়, মার্কস-ব্যাখ্যা, তাও পচা, শস্তা, ভুল, একপেশে। হেগেল, আডাম স্মিথ না পড়ে 'ক্যাপিটাল' কপ্চান, মার্কস না ছুঁয়ে লেনিন, লেনিন না দেখে স্ট্যালিন, তাও না, দু আনার ঋজুপাঠ। কাঁচাপাকার অদ্ভুত সমাবেশ, বাঙালী মেয়েদের মতন, এধারে স্বার্থপরতায় ঝানু, ওধারে ভেদ্দারের চেয়েও মস্তিষ্ক অপরিণত, কচি থেকেই পচা, তাই ভিজে শ্যাওলা ধরা, উর্বর স্বল্পজীবী; পানাপুকুরের মশকী কামড়েছে পায়ে, গা শির্ শির্ করে, এখনই কম্বল আর কুইনিন চাই। বই না কিনে খগেনবাবু ওপরে এলেন।

রমলা চেয়ারে বসেছিল! 'শোওনি? মাথা ছেড়েছে?' রমা ঘাড় নাড়ল। 'বিছানা আমি পাতছি।' রমলার দৃষ্টিতে প্রতীক্ষার ব্যগ্রতা নেই, জীবনের চিহ্ন নেই। উঠে সে সাহায্য পর্যন্ত করলে না। খগেনবাবু পাশ ফিরে শুয়ে বল্লেন, 'যখন ইচ্ছে হবে আলো নিভিয়ে দিও।' স্টেশনের কোলাহল থামল। ভোর বেলাতেই রমলা স্নান সেরে চেয়ারে বসে আছে জানালার ধারে।

দুই

তখনও সকাল হয় নি, নানা স্বরের ভোঁ-তে খগেনবাবুর ঘুম ভাঙল! থামতেই চায় না, সরু মোটা ঘন পাৎলা গম্ভীর হালকা, কেউ ডাকছে উঠে পড়, কেউ বলছে ছুটে আয়, ঐ ত্যাখ্‌ মজুরনি বাজরার রুটি পাকিয়ে তাতে নুন মাখাচ্ছে, খোকার বুড়ো আঙুলের নখে খয়েরি আফিমের পালিশ ঘষলে বাচ্চা চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়বে, চেঁচিয়ে মার রোজগারের ক্ষতি করবে না, বে-মওকা দুধ খেতে চাইবে না। একটা আওয়াজ স্টিমারের মতন একটানা, তৈলধারাবৎ, ভবিষ্যধর্মের অনাহত ধ্বনি। খগেনবাবু বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন।

ছোকরা চা আনল। টঙ্গা পাওয়া শক্ত, তবে হুকুম পেলে সারাদিনের জন্য সস্তায়, টাকা পনের ও পেট্রলের দাম দিলে, একটা ট্যাকসির বন্দোবস্ত তখনই সে করতে পারে। রমলা কি বলতে যাচ্ছিল, খগেনবাবু বাধা দিলেন। চা পানের পর খগেনবাবু হোটেলের সন্ধানে হেঁটেই বেরিয়ে পড়লেন!

কানপুর স্টেশন বড়, কিন্তু সামনেকার রাস্তা অপ্রশস্ত, অযোগ্য। এ শহরের মুখ নেই, থাকতে পারে না। রাস্তা পাকা, কিন্তু কয়লার গুঁড়ায় কালো, আকাশ ধোঁয়ায় ভরা, বারো বামনের তের চুলোর ধোঁয়া সাদা থামের মতন ওপরে ওঠে, ওপর থেকে কলের চিমনির ওলট খাওয়া ধোঁয়া কয়লার ভারে নিচে নামতে চায়—দুটোর রফায় সূর্যের আলো হ্রাস পায় এক ফোঁটা হাওয়া নেই, রুদ্ধশ্বাস শহর দুর্ভেদ্য নিম্নগামী আশ্‌ল্টন স্তর তাকে চেপে মারছে। রেল-লাইন পার হয়ে শহরের প্রশস্ত রাস্তা, তার একধারে বড় বড় দোকান, অন্য ধারে নিচু ঘরের সারি, টিনের চাল দেওয়া, খাপরার। ছোট বড়র ঘেঁষাঘেষি বসবাস। একটু এগিয়ে পুরানো ধরনের বাড়ির নিচের তলায় দোকান ঘর। মধ্যে মধ্যে বসতবাটিও রয়েছে সন্দেহ হয়। হঠাৎ বড়-মানুষের বাড়ির কুটনো-কোটা, ভাঁড়ার-বার-করা গিন্নী কর্তার মান রক্ষার জন্য কাস্তাপেড়ে শাড়ির আঁচলে ভারি চাবির গোছা বেঁধে, গালে পান দোক্তা ঠেসে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগের সঙ্গে রূপোর পানদান নিয়ে, ক্ষয়িষ্ণু চুলে পাতা কেটে বিশ ভরির চুড়ি আর বেনারসী প'রে সান্ধ্য পার্টিতে বেরুবেন, এই সব বাড়ি থেকে, খাতির পেতে।

একটা লেভেল ক্রসিং-এর ফটক বন্ধ সকালবেলাতেই। কলের সাইডিং-এর মালগাড়ি এগুচ্ছে পেছুচ্ছে পনের মিনিট ধরে, শহরের যাতয়াত থামিয়ে। ফাটক

খুলে গেল, ওপারে মস্ত মিল, ফাটকে কনস্টেবলের গাঁদি। আরো আগে বড় রাস্তার বাঁ পাশে বাজার, ছেঁড়া টায়ারের, কাটা কাপড়ের পুরানো জামার, সাইকেল-মেরামতের। রাস্তার ওপর দো-দো পয়সার খেলনা পাতা। কোথাও হোটেল নেই।

শহরে এক চঞ্চলতার চিকিমিকি। রাস্তার পাশে খোলা যায়গায়, চৌরাস্তায়, বিশ পঁচিশজন লোকের জটলা। আরো এগিয়ে বাঁ দিকে বড় মাঠে লোকে লোকারণ্য, ডিমের পোচ্-এর মতন মাঝখানে ফোলা, কিনারায় ভিড় গড়িয়ে পড়ছে। ফোলা জায়গার মাথায় খদ্দরের টুপি। রোদ্দুরের তেজ বেড়ে চল্ল, শীঘ্রই হোটেল, না হয় বাড়ির সন্ধান চাই। খগেনবাবু একজন ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন, একটা ভাল হোটেল কোথায় পাওয়া যায় যেখানে ভদ্র পরিবার সপ্তাহ খানেকের জন্য থাকতে পারে?' 'পাওয়া যায়, তবে দেশী লোকের জন্য নয়। একবার তিলক হোটেলে দেখুন।' একটি দেশী ও গোটাদুই বিদেশী হোটেলের ঠিকানা পাওয়া গেল। ফেরবার পথে বড় মিলটার সামনে একটা সভা চলছে, পাশে পুলিশ প্রহরী। কে একজন বক্তৃতা দিচ্ছে, খগেনবাবু চলে যাচ্ছেন এমন সময় বক্তা মুখ ফেরাল পরিচিত ভঙ্গিতে! বিজন দেখতে পায়নি।

এখানে বিজন এল কী করে! রোদ্দুরে মাথা ধরবে ছোকরার, একি খদ্দরের টুপির সাধ্যি! টেনিস ছেড়ে দেশপ্রেমের খেলা ধরেছে, তা ভাল, তা ভাল, রমাকে কি একটা লিখেছিল, রমার সঙ্গী হল, একেবারে একলা থাকে, নিজেকে আরো সরিয়ে রাখলে শেষে পাগল হবে, বেচারি নিজের প্রতিবেশ চায়, যে-আশা করেছিল তা পেল না, ভালবাসুক না বিজনকে, বোনের মতন, মা'র মতন। পরে সুজন এসে জুটবে, জমবে ভাল রমাদির দুজনকে নিয়ে, পরিচয়ের পরিধি বেড়ে যাবে জমবে ভাল, অনেক নিয়ে, তা ভাল তা ভাল।

হাত বাড়িয়ে বিজন কাকে ডাকলে। ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে এল, পিপের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলে। বক্তৃতা, আর বক্তৃতা, মধ্যে মধ্যে ইন্‌কিলাব, আরো কত নিরর্থক চিৎকার।

বিশালকায় নদীর দুর্নিবার বহতা বাঁকের মুখে ঘাটে আটকেছে। পুরানো ঘাট, এককালে সওদাগর মশাই ময়ূরপঙ্খীতে পণ্যদ্রব্য ঠেসে লক্ষ্মীর সন্ধানে বেরতেন, মাথায় থাকত আদিম দেবদেবীর অভিশাপ। এখন ঘাটের ধাপ ভাঙা, বহতা দূরে সরেছে, সামনে পড়েছে কাশে ভরা প্রকাণ্ড চড়া। হয়ত কোনো কালে একটা অশ্বত্থ গাছ ভাসতে ভাসতে ডোবা চড়ায় ঠেকেছিল, তাকে ঘিরে খড় কুটো জমল, সেটার আশ্রয়ে তৈরি হল চড়া। স্রোত রইল না, বজরা চলল না, আলস ভরে ভাসে কেবল জেলে ডিঙ্গী, গ্রীষ্মকালের

ভোরবেলা পল্লীবধূ বালি ভেঙে জল আনতে যায়, তাও শুখল বুঝি এ ক'বছর। এই হল দেশী বক্তৃতার স্বরূপ, দেশী সাহিত্যের প্রকৃতি, বালিভরা খাত আর কথার চড়া। অবশ্য, আত্মপ্রকাশের মধ্যে সর্বদাই একটা কর্মপ্রবাহ থেকে বিরতি থাকে। চিন্তা ও কাজ সপিণ্ড হতে পারে কিন্তু যমজ নয়। এককাল ছিল যখন রক্তস্রোত থামাতে বাক্যের প্রয়োজন হত। পরে বাক্যের ছড়াছড়ি, পুথির পাহাড়, আদর্শের বড়াই, আর্টের জন্য আর্ট, চিন্তার জন্য চিন্তা, কথার জন্য কথা। প্রতিক্রিয়ায় নেচে উঠেছে রক্ত। ভারতবর্ষের রক্ত ঠাণ্ডা, কারণ নাকি তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির তুষার গলা অহিংস ধারা মিশেছে। হয়ত বা এদেশে এখন স্রোতই নেই, চরের বালি চিকচিক করতেই জানে, জোর তার বুকে কাশফুল দোলে। লোকে বলে বাঙ্গালী বেশি কথা কয়, কিন্তু এদেশে কথার রাজত্ব শুরু হয়েছে, আর রক্ষে নেই, এইবার সাহিত্যের পালা, মাসিক পত্র, সাহিত্য সভা, কে সাহিত্য-সম্রাট, কে সম্রাজ্ঞী, খেয়োখেয়ি দলাদলি তাই নিয়ে। ভগবান রক্ষা করুন এই অ-বাঙালী ভারতীয় জাতিসমূহকে, যেন তারা সাহিত্যের খপ্পরে পড়ে আত্মপ্রসাদে উচ্ছন্ন না যায়।

'এই যে আপনি! কোত্থেকে? রমাদি?'

'ঘুরতে ঘুরতে কানপুরে হাজির।'

'রমাদি?'

'স্টেশনে।'

'স্টেশনে কেন? কবে এলেন? আজই?

'এসে পড়লাম।'

'বাসা কোথায়?'

'তাই খুঁজছি একটু সাহায্য করুন না?

'আপনি টাপনি ছেড়ে দিন। তাই ত', আজ আমরা বড় ব্যস্ত। তা হোক, চলুন, ইনি সফীক। কম্‌রেড, একবার আমাকে স্টেশনে যেতে হবে।'

'যাও। ওখানকার ব্যাপারটা দেখে এস।'

পথে বিজন খগেনবাবুকে শহরের চঞ্চলতার কারণ বুঝিয়ে দিলে। কানপুরে মজুরের দল এককাট্টা, সেইজন্য তারা মালিকদের চক্ষুশূল। তাদের সভার নাম 'মজদুর সভা'। আগে যে সভা নিরীহ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ছিল, এখন তার সংখ্যা বেড়েছে, ফলে সক্রিয় হয়েছে। কর্তৃপক্ষের আপত্তি এই যে মজদুর সভার ক্রিয়াকলাপ আজ মজদুরদের আর্থিক ও মানসিক উন্নতি সাধনে আবদ্ধ নয়, ক্রমেই পলিটিক্যাল, অর্থাৎ বিপ্লবী হয়ে উঠছে। এই শিশুকে আঁতুড় ঘরেই মারতে না পারলে সমূহ বিপদ, অতএব মজদুর সভার কর্মীদের জব্দ করা চাই।

উপায় হল বিনা অজুহাতে তাদের চাকরি খাওয়া। মজদুর সভা আজ সচেতন মজুরদের অগ্রদূত, তাই সে আজ বাঁচবার জন্য লড়তে প্রস্তুত। পরের কৃপায়বাঁচা নয়, আপন শক্তিতে বাঁচা। একজনকে তাড়ালে সমগ্র মজদুর সভা তার হয়ে লড়বে। খগেনবাবু বল্লেন 'এখন সরকার দেশের, অতএব কাজটা শক্ত হবে না।'

'এক হিসেবে শক্ত, অন্য হিসেবে সোজা। কংগ্রেস সরকার কানপুরের গোলমাল থামাবার জন্য একাধিক কমিটি বসিয়েছিলেন! শেষ কমিটি একটা প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখেছে। প্রথমে মালিকরা তার সামনে সাক্ষ্য দিতে নারাজ হয়, পরে বাধ্য হয়ে রাজি হল বটে, কিন্তু রিপোর্টের প্রস্তাবগুলো তারা মানল না। শেষে অবশ্য বোঝাপড়া হয়েছে, কিন্তু সেটা নিতান্ত মৌখিক। ভেতরে ভেতরে তারা উঠে পড়ে লেগেছে যাতে সব পণ্ড হয়। গুপ্ত উদ্দেশ্য অবশ্য স্বদেশী সরকারকে বিপদে ফেলা। বিপদ এই, আমাদের সরকারও শান্তিতে রাজ্য চালাতে চান, সেটা কত অসম্ভব তাদের ধারণা নেই। সহানুভূতি থাকলে কী হয়! থুতুতে ছাতু ভেজে না।'

'আপাতত ব্যাপারটা কি?'

'মজদুর সভার একজন কর্মীকে মালিক বরখাস্ত করেছে, ছুতো সে নাকি কাজে বড় ঢিলে। অথচ সে একজন সত্যকারের হুঁশিয়ার লোক। কখনও কেউ তার কাজে গাফিলতী দেখাতে পারে নি। কিন্তু তার দোষ যে সে মজদুর সভার বড় পাণ্ডা! সভার তরফ থেকে আপত্তি জানান হয়েছিল, ফল হয় নি, যদি মাত্র একটা দৃষ্টান্ত হত, তবে বোঝা যেত, কিন্তু এ রকম প্রায়ই ঘটছে। আমরা স্ট্রাইকের জন্য তৈরি হচ্ছি, এমন সময় মালিক জন-কয়েক নিজেরাই লক্-আউট করেছে। এটা অসহ্য!'

'ব্যাপারটি স্ট্রাইক না লক্-আউট?'

'দুইই, যে ভাবে দেখেন। আসল কথা, বাইরের লোক দিয়ে কল চালান বন্ধ করা চাই। ধর্মঘট জোরে চালাতে হবে।'

বিজনকে নিয়ে খগেনবাবু স্টেশনের ওয়েটিং রুমে এলেন। আরশিতে ছায়া পড়তে রমলার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল! খগেনবাবু বল্লেন, 'একেই বলে দৈব। হঠাৎ দেখা। বিদেশে ওরই আশ্রয়ে থাকতে হবে।'

'ভালই করেছ।' ঠোঁট চেপে রমলা মুখ ফেরালে।

'এখন না হয় আমাদের আড্ডায় ওঠ, তারপর, বাড়িতে যেও। আজ আমরা একটু ব্যস্ত। তবে কষ্ট হবে বলে দিচ্ছি।'

খগেনবাবু বল্লেন, এমন কষ্ট আর কী হবে! তা ছাড়া, তুমি যখন নিয়ে যাচ্ছ, তখন ওঁর ভাল লাগবেই

'তা ঠিক নয়। আমি যা পারি আপনারা তা পারবেন না।'

'রমাদির সঙ্গে গল্পও হবে!'

'গল্প? গল্প আর করি না। বেশ তাই চল, দেখি কী হয়!'

বিজন একটা ট্যাকসিতে মালপত্র ভরে নিজে সামনে বসল।

বড় রাস্তা থেকে একটা সরু গলি বেরিয়েছে, পচা নর্দমা দুপাশে, অনেকটা দশ পনের বছরের আগেকার বাঙলা নব্য সাহিত্যের বস্তির অনুকরণে। তবে এমন দুর্গন্ধ কোলকাতার মধ্যে নেই, মেলে শহরের আশে পাশে, খিদিরপুর আর টিটাগড়ে যার পাশ দিয়ে ট্রেনে যেতে যেতে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের নাকে রুমাল গুঁজতে হয়। কানপুরে সে গন্ধ ম্যালের এ-পিঠে ও-পিঠে সুলভ। ট্যাকসি যেখানে থামল সেখানটা একটু খোলা, তারপর আর রাস্তা নেই। সামনে একটা খাপরার বাড়ি, চুণকাম করা দেওয়াল, দরজা জানলায় চিক্ টাঙ্গান। দুটি ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মালপত্র নামালে। বিজন পরিচয় দিলে, 'খগেনবাবু ও ভাবীজী, কমরেড কিষণচাঁদ, মহবুব।' ঘরে প্রবেশ করবার সময় বিজন রমলাকে নিচু গলায় বল্লে, 'এখানে বাথরুম্ টুম্ নেই, উঠোনের কোনে কলঘর, বাস্। খিদে পেলে খেয়ে নিও। স্টেশনে খেয়ে নিলে পারতে। খেয়েছো— তবু, দুপুরে যা পার তাই খেও। নতুন কিছু শিখেছ? মোমফালির স্যাণ্ডউইচের জন্য জিব এখনও সক্ সক্ করে। আমি এখন খুব শক্ত হয়েছি।'

ঘর ছোট নয়, কিন্তু বসবার জায়গা আলাদা নেই। গোটা চারেক দড়ির খাটিয়া পাতা, কোলকাতায় যাতে মড়া বওয়া হয়, তার ওপর নোঙরা বিছানা, যা নিমতলায় পড়ে থাকে, মাটিতে জুতো-চাপা ঘসা-মাথা সিগারেটের টুকরো, যা কুড়িয়ে ভিখারিরা টানে। কাঠের টেবিলে চা-বাটির গোল গোল দাগে ভরা ছাপা খদ্দর, যুবক-সমাজের নামাবলী, উপছে পড়ছে হলদে আর লাল মলাটের বই, পত্রিকা, প্যামফ্লেট. কাটা খবরের কাগজ। একটা দেওয়ালে জহরলাল, গান্ধীজীর ফোটো, অন্য দেওয়ালে একজন যুবকের, চোখে যার পাগল চাউনি। সবার ওপর স্ট্যালিনের ছবি, মাথায় কসাক টুপি। এক কোনে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা, তার ওপর লাল ঝাণ্ডা। পাতাকা মোটা খদ্দরের, রঙ ম্যাড় ম্যাড় করছে। রমলা চোখ ফিরিয়ে নিলে দেখে খগেনবাবু হাসলেন। 'কেন, পছন্দ হল না?'

'কারা এই সব রঙ বেছেছিলেন?'

'নেতৃবৃন্দ।'

'জওহরলাল আপত্তি করেন নি?

'সরোজিনী নাইডুর নাম করলে না?'

'জওহরলালের রুচিতে বাধল না! এই সমাবেশ কোনো সৌন্দর্যপ্রিয় ব্যক্তি সহ্য করতে পারেন না।' বিজন বল্লে, 'খগেনবাবু ঠিক ধরেছেন। জওহরলালকে মেয়েরা দেবতা ভাবে।' রমলা উত্তর দিলে, 'তা নয়। তাঁর নিজের মতামত আছে।' 'সে কথা আর তুলো না, রমাদি। নিজে স্বীকার করেছে যে মহাত্মাজী যা করেন তাইতে তিনি শেষকালে সায় দেন। ওইটাই ত আমাদের চরম ক্ষোভ। আজ যদি তিনি তাঁর কবল থেকে মুক্ত হতেন তবে আর ভাবনা ছিল কী! আমার বিশ্বাস, পতাকা মহাত্মাজীর আবিষ্কার না হলেও তাঁর মনোমত।'

'যাঁরই মনোমত হোক না কেন বিজন, তোমার রমাদির পছন্দ নয়; ওঁর বক্তব্য এই বোধ হয়: ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামরা, চেঁচালেই উঁচু থাকে না। ঝাণ্ডা কেবল পাঁচ হাত পাকা বাঁশ নয়, সেটা আমাদের মেরুদণ্ড, যেটা শিরকে উঁচু রাখবে। ঝাণ্ডার মাথার কাপড় হবে রেশমি, তবেই পৎপৎ করবে, কাঁপবে, সকলকে কাঁপাবে। বাস্তবিকই তাই, সমবেত উন্মাদনার জন্য সৌন্দর্য কী অবান্তর? কেবল নভেলিয়ানার জন্যই কি তার আবির্ভাব? সৌন্দর্যবোধ কি কখনও কাম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সমগ্র মানবিক সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত হবে না? ব্যক্তিগত সম্বন্ধেই কি সেটা চিরকাল আবদ্ধ থাকবে? সমাজের আদান-প্রদানে কি সেটা নিষ্প্রয়োজন?' বিজন বল্লে, 'যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের সৌন্দর্য-বিলাস বেশি দূর সম্ভব নয়।'

'মানি না। দু বেলা খেতে পায় না যারা দু মুঠো, তাদের হাতের আলপনা, কাঁথা দেখেছ? তা ছাড়া, যারা পতাকার কল্পনা করেছেন তাঁরা বুভুক্ষু নন্।'

'কিন্তু আপনাদের খিদে পেয়েছে নিশ্চয় নয় ত এত খিদের উল্লেখ হচ্ছে কেন? রমাদি, রান্নাঘরটা দেখে নাও। আমাদেরও খাবার দিতে হবে। তাড়াতাড়ি নেই, আজ আবার বেশি কাজ, কখন ফিরব তার পাত্তা নেই। অপেক্ষা করতে হবে না, কেউ কারুর জন্য বসে থাকে না এখানে। আচ্ছা এখন আমরা আসি। তোমাদের জন্য বাড়ি দেখতে হবে। দুপুরে যা করে হোক বিশ্রাম নিও।' ও কনি দুজনবজ মরেড চলে গেল।

'এরা কারা?'

'ভগবান জানেন। তুমি বোসো, আমি দেখছি।'

রমা উঠানে এল। কোনে টিনের ঘরে একজন ছোকরা ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটছে। উঁচু উনুনে ডেকৃচি বসান, পাশে এ্যালিউমিনিয়মের থালায় ঠাসা আটা, তার ওপর অগুন্তি মাছি। রমা ঘরে ঢুকতে ছোকরা উঠে সেলাম করল, খোঁড়া, মুখে বসন্তের দাগ। মাছি তাড়িয়ে আটা ঢেকে রমা ডেকৃচির

ঢাকনা খুল্লে। মাংস চড়েছে, জল কম, খানিকটা ঢালতেই ছোকরা পেঁয়াজ ছেড়ে দিলে। 'কী করলি!' ছোকরা হেসে বল্লে, 'বাঙালীবাবু কাঁচা পেঁয়াজ পছন্দ করেন না, আমি কী করব!' 'ঘি দিয়েছিস?' 'গোড়াতেই।' 'মাথা কিনেছ আমার! চাল আছে? যে বাবু এসেছেন, তিনি তোদের খোট্টাই রুটি খান না। চাল নেই ত বাজার থেকে রুটি মাখন আনতে পারিস?' 'কেঁউ নেহি?' 'কেঁউ কেঁউ করিসনি, যা নিয়ে আয়।' 'আভি?' 'আভি নয়ত কী কাল!' 'আভি যেতে পারব না, বহুৎ লোক আসবে, রোটি বানাতে হবে।' 'কজন আসবে?' 'তার ঠিকানা নেই।' 'কখন খান বাবুরা?' 'তার কী টাইম আছে! তবে দুটোর আগে নয়।' 'আচ্ছা চল্ আমার সঙ্গে, লিখে দিচ্ছি কী আনতে হবে। তোর রাঁধতে হবে না। এখানে বড় গ্রোসারি আছে, যেখানে সাহেবেরা খাবার কেনে?' ছোকরা বুঝতে পারল না। 'সাহেবদের বেণের দোকান, যেখানে মাখন-টাখন মেলে?' 'এ-পাড়ায় নেই, একটু দূরে আছে।' 'কতক্ষনে আনতে পারবি?' 'যাব আর আসব। আর যদি না মেলে তবে কি আনব?' 'তবে তোদের ভাল দেশী খাবারের দোকান কত দূর?' 'বেশি দূর নয়। সব্‌সে আচ্ছা মিঠাইলালের দোকান। বাবুরা খুব ভালবাসে ওর খাবার! সে বার হরতালে মজুরদের একবেলা রোজ পনের দিন ধরে খাইয়েছিল, বড় ভাল আদমি, ওস্তাদের দোস্ত্।' 'আগে বড় বেণের দোকানে যা, না পারিস, ভাল দেশী খাবার আনবি! ডবল রুটি আর মাখন আনতে ভুলিস নি।' রমলা ঘরে এসে কাগজে ফর্দ করে ছোকরার হাতে দশ টাকার নোট দিলে। 'শীগ্‌গির এলে বকশিশ্ পাবি' ছেলেটি চলে গেল।

'আমার অন্যায় হয়েছে স্টেশন থেকে এ-বেলার ঝঞ্ঝাট শেষ না করে আসা! স্নানের বন্দোবস্ত নেই বোধ হয়? খোলা জায়গাতেই আমার চলবে। বাক্সেই সব আছে?' খগেনবাবু বাক্স খুলতে যাবার আগেই রমলা সুটকেশ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস বার করে দিলে। ছোট-খাট ব্যাপারেই পার্থক্য ধরা পড়ে। সাবিত্রী সুটকেশের সামনে থাবড়ি খেয়ে বসত, চাবি লাগাতে পারত না, লাগালে খোলা যেত না, স্বদেশী কলের বিপক্ষে মন্তব্য জানাত, মুখ বাঁকাত ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়, একবার চাবির গায়ে নম্বর সেঁটে রেখেছিল। একবার নয়, বহুবার খগেনবাবু তাকে মানা করেছিলেন তাঁর সুটকেশে চাবি দিতে। সাবিত্রী শোনেনি কখনও। হাতে তোয়ালে নিয়ে খগেনবাবু নাইতে যাচ্ছেন, রমলা বল্লে, 'সাবানটা ওখানে ফেলে এস না।'

রমলা ঘরে অপেক্ষা করছিল, ছোকরা এখনও ফিরল না। এখানে হোটেলে থাকাও চলবে না। তার চেয়ে ছোট বাড়ি নেওয়া হোক, বিজন

থাকবে, সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত খেয়ে দেয়ে যা-ইচ্ছা তাই করুক, কে মানা করছে ওদের। নোংরামি সহ্য করা ওর রক্তে নেই। এই জঘন্য জায়গায় থাকে কী করে! সঙ্গীরাও যেন কেমনধারা, একজনেরও সঙ্গে মেশা চলে না। ভদ্রতার একটা স্তর আছে যার নিচে নামতে কষ্ট হয়। গরীবদের অবস্থা বোঝা যায়, কিন্তু এরা যেন কী! খগেনবাবু স্নান সেরে খাটিয়ার ওপর বসে বই ওলটাচ্ছিলেন, রমলা তাঁকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল, খগেনবাবু দেখতে পেলেন না।

ছোকরা খাবারের চুবড়ি নিয়ে এসেছে। 'মেমসাব, বেণের দোকানে আপনার ফরমায়েসি খাবার পাওয়া যায় না, তাই, মিঠাইলালের হালুয়া আর কচুরি এনেছি।' রমলা কোনো কথা কইল না দেখে ছোকরা চুবড়ি নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। বিজনের সঙ্গে জনকয়েক লোক ঘরে হুড়মুড় করে এল। তারা নিজেরাই টেবিলগুলো ধরাধরি করে সাজিয়ে বসবার জন্য পাশে দুটো খাটিয়া টেনে নিলে। রমলা বাক্স থেকে একটা টেবিলক্লথ বার করছে দেখে বিজন হাসল। টেবিলে এ্যালুমিনিয়ম ও কাচের ফাটা প্লেট, তার ওপর দেশী খাবার, হালুয়া, ডবল রুটি, বিজনের সামনে শুকনো পাতা, যাতে খাবার এসেছিল। 'খগেনবাবু, এঁকে ত দেখলেন, কমরেড সফীক, এদের নাম কী মনে থাকবে? আসফাক, নাখভী, মহীন্দর, সব কমরেড। আর ওঁর কথা ত বলেইছি, ইনটেলেক্চুয়াল, ইনি ভাবীজী'…

সফীক বিজনকে প্রশ্ন করল স্টেশনের হালচাল সম্বন্ধে। 'হরতাল সম্পূর্ণ। কিন্তু সেটা অন্য কারণে মনে হল। লক্ষ্ণৌএর জের বলতে পার। খগেনবাবু এখনই লক্ষ্ণৌ থেকে আসছেন, তাঁর কাছে লক্ষ্ণৌএর খবর পাবে।' খগেনবাবু বল্লেন, 'লক্ষ্ণৌএর হরতালও সম্পূর্ণ বটে, তবে মিটমাটের চেষ্টা হচ্ছে, একটা মিটিংএ ছিলাম।' সফীক উদ্‌গ্রীব হয়ে সভার বিবরণ শুনতে চাইলে। শোনবার পর, 'ইডিয়টিক' বলে সামনেকার প্লেটটা সরিয়ে দিলে। বিজন বলল, 'আপোষে ঝগড়া করে লাভ কি, ওস্তাদ?'

সফীক একটু উষ্মাভরে উত্তর দিলে— 'টঙ্গাওয়ালার চার আনা এক্কাওয়ালার চার আনা একেবারে ঐশ্বরিক সুবিচার। এরকম প্রস্তাব যে কেউ সজ্ঞানে উপস্থিত করতে পারে আমি ভাবতেই পারি না।'

খগেনবাবু: 'আমারও একটু আশ্চর্য লেগেছিল। কিন্তু কানপুরে গড়াল কি করে?'

স: 'আপনা থেকে, কারুর চেষ্টা করতে হয় নি।'

খ: 'কোনো বক্তৃতারও প্রয়োজন হয় নি?'

স: 'যৎসামান্য, কাঠ শুখনো হলে, আর হাওয়া অনুকূল থাকলে, বেশি

দেরি হয় না। আপনারা কতদিন কানপুর থাকবেন ?'

খ : 'ঠিক নেই। তবে আপাতত মাস কয়েক ত বটেই। একটা হোটেল…'

রমলা দেবী : 'বাড়িই ভাল।'

স : 'বিজন, তুমি আজই বিকেলে খোঁজ।'

বি : 'সে হয় না, ওস্তাদ, কাল দেখা যাবে, আজ হাতে অনেক কাজ।'

স : 'এঁদের কষ্ট হবে, বিশেষত ভাবীজীর।'

বি : 'তুমিই না হয় একবার ফোন কর না, তোমার এক কথায় হয়ে যাবে।'

স : 'দেখি।'

খ : 'অত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নেই, অবশ্য আপনাদের অসুবিধা হবে।'

বি : 'আমাদের! হয়ত আমরা রাতে ফিরতেই পারব না। ওস্তাদ আজকের রুটিন কি ?'

স : 'আগে রিপোর্ট আসুক।'

মহবুব : 'আজকের কাগজ দেখেছ ওস্তাদ ? এক দল বলছে লকআউট, অন্য দল বলছে স্ট্রাইক। আমার মনে হয় মজতুর সভার তরফ থেকে একটা ইস্তাহার প্রকাশ করা ভাল।'

বি : 'মজতুর সভা যা উচিত ভাববে তাই করবে।'

মহবুব : 'তাই বলে চুপ করে থাকা যায় না। একটা কিছু করা চাই। ওস্তাদ, আমি না হয় একবার উধামজীর কাছে যাই।'

স : 'তিনি কি বলবেন জানা নেই ?'

বি : 'তাঁর মতে এটা স্ট্রাইক নিশ্চয়, তবে লক-আউট হিসেবে প্রচার হলে সহানুভূতিটা সহজ হবে।'

স : 'তবে!'

বি : 'দোষটা কি তাতে!'

খ : 'ব্যাপারটা কি প্রকৃতপক্ষে ?'

স : 'প্রকৃতপক্ষে' দুইই। এমন কোনো লক-আউট হয় না যার উল্টো দিকে স্ট্রাইক নেই। সত্তা নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল, ব্যাপারটা এই, আমরা জানি, অর্থাৎ আমাদের সকলের মনে এই ধারণা দৃঢ় করাতে হবে যে আমরা স্বেচ্ছায় হরতাল করেছি।'

খ : 'পার্থক্যটুকু সূক্ষ্ম।'

স : 'সূক্ষ্ম হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত দরকারি। উধামজী চান সহানুভূতি, তার চেয়ে প্রয়োজন মজুরদের সচেতনতা। আকাশ পাতাল তফাৎ।'

খ : 'মানি।'

বিজন উৎফুল্ল হয়ে রমলার মুখের দিকে চাইলে। রমলা বল্লে, 'উনি ভাবছেন অন্য কথা।'

স : 'কি ?'

র : 'ভেতরকার শক্তি।'

স : 'তার অর্থ যদি গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব হয় তবে সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য।'

বি : 'ওস্তাদ ভাবছে গণ-চেতনা।'

খ : 'তারও সাধনা আছে।'

স : 'সেটা নাভিপদ্মে দৃষ্টিনিক্ষেপ নয়।'

খ : 'কি সেটা ?'

স : 'কানপুরে থাকলেই দেখবেন।'

খ : 'সুযোগ পাব ?'

সফীক রমলার দিকে একবার চেয়ে বল্লে, 'সুযোগ! খুঁজে নিতে হবে। পারবেন কি ?' রমলার মুখ লাল হয়ে উঠছে দেখে বিজন বল্লে, 'সাধনা হল কাজ। চিন্তা কর্মপদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।'

খ : 'এম্পিরিসিজম ? তার মূল্য আমার কাছে বেশি নয়। তাতে নতুন কিছু গড়া যায় না, যা হয়েছে সেইটাই উৎকৃষ্ট প্রমাণ করবার সুবিধা হয় মাত্র।'

স : 'নাম সেঁটে দেবার দরকার আছে কি ?'

খ : 'আছে বৈ কি! স্পেয়ার পার্ট কেনবার সুবিধা হয়।'

পর্দার বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। মহীন্দর গিয়ে একটা লেফাফা এনে সফীককে দিলে। পড়বার পর সফীক বাইরে গেল, পরে মহবুব, মহীন্দর। বিজনও উঠছে দেখে রমলা বল্লে, 'এই রোদ্দুরে। আজকে তাহলে বাড়ি খোঁজা হবে না ?'

বি : 'ওস্তাদ নিজে যখন ভার নিয়েছে তখন পাওয়া যাবেই। তুমি কিছু খেলে না দেখলাম। বিকেলে একটা হোটেলে যেও, খগেনবাবুকে খাইও, এখানে বন্দোবস্ত নেই। অবশ্য আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, তোমাদের থাকের পক্ষে নয়! ওস্তাদকে কেমন লাগল ? আশ্চর্য মানুষ! বুদ্ধিটা ঝকঝকে।'

র : 'তোমার নতুন হিরোকে আমার ভাল লাগতেই হবে।'

বি : 'খগেনবাবুর কেমন মনে হল! সুজনদার চেয়েও পড়েছে, অবশ্য দরকারি বই, মাথার মধ্যে খিচুড়ি পাকায় নি। কাজ করে কিনা, তাই।'

বিজন রমলার হাত থেকে সোলার টুপি না নিয়ে খদ্দরের টুপি পরেই চলে গেল। ছোকরা রেজগি ফেরৎ দেবার সময় একটা আধুলি বকশিশ্ পেলে।

এঁটো বাসন ছত্রাকার। ছোকরা পরিষ্কার করবার পর রমলা একটা আলু ও এক স্লাইস রুটি কাটলে নিজের জন্য।

'নতুন জীবন কেমন লাগছে?'

'ভাল। তোমার?'

'এরই মধ্যে ভাল লাগছে! মেয়েদেরও হার মানালে ক্ষমতা বটে!'

'যদি ছাড়তেই হয়, তবে নতুনকে প্রাণমন দিয়ে গ্রহণ করাই উচিত নয় কি?' মন্তব্য করেই খগেনবাবুর মনে সন্দেহ জাগে। হঠাৎ কেন মুখের আগল খুলে যায়, কণ্ঠস্বরে উগ্রতা আসে কে জানে! তর্কের খাতিরে? তাই যদি হয় তবে বুঝতে হবে— কি বুঝতে হবে? ভয় হয় মনেও আনতে, আজকাল প্রায়ই এমন হচ্ছে কেন? পৃথক ঘরের ব্যবস্থার জন্য। রমলা যেমন নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। যে স্বেচ্ছায় দূরে সরে যায় সে কি আর হাতছানি দিয়ে ডাকে! ডাকে না, কিছুতেই ডাকে না। একবার স্বামীর কাছে অত্যাচার, আবার যাকে বরণ করলে তার কাছেও আশাভঙ্গ। ভেবেছিল মা হবে, সংসার পাতবে, প্রকৃতি দেবী কী এক কলকাটি টিপে দিলেন, সর্বত্র হতাশ হল— তাই, অভিমানে সে সরে গেল। সফীক তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, সুযোগ পাওয়া শক্ত, রমলা আঘাত পেলে, আরো কত পাবে···খগেনবাবুর মন স্নেহে আর্দ্র হয়ে আসে।

রমলা নিশ্চয়ই বলতে পারত নতুনকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করুক তারা যাদের ভাঁড়ার খালি। অবশ্য রমলার ভাঁড়ার ঘরে রঙিন সুতোর সিকে ঝোলে না, তাতে রঙবেরঙের আলপনা আঁকা হাঁড়ি থাকে না, যেমন ছিল মাসীমার, তবু রমলা নিঃস্ব নয়। সে এল চলে, সংস্কার ভেঙ্গে লোকে ভাবতে পারে, কিন্তু অন্য সংস্কারের ঠেস না থাকলে সে কী পারত! নিজের সুখের তাগিদে? নিশ্চয়ই নয়, তার প্রমাণ সে দু'হাত ভরে দিয়েছে। এই সংস্কারের প্রকৃতি এতই অ-পূর্ব যে হিন্দু ভারতবাসীর পক্ষে তাকে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কিন্তু রমলার আচরণে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দ্বিধা নেই। নিঃস্বরাই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করে।

বিজনের কমরেডরা কী চায় জানতে ইচ্ছা হয়। এদের কাছে পুরাতন নেই, তার জের নেই, তাই প্রত্যেক আগন্তুক আসে বরের বেশে। কিন্তু গৌরীর আত্মদান ইতিহাসে অচল। আঁচড় না-কাটা কাঁচা রেকর্ড বর্বররাও জড় করে না, সভ্য মানুষ ত' দূরের কথা। যার অতীত আছে সে ত্যাগ করুক দেখি কেমন পারে! সংস্কার-মুক্তি অন্য কাজ। রমলা সফীককে বল্লে যে সচেতনতা আত্মিক সাধনার ফল। হয়ত লয়ালটি, মাত্র প্রতিবাদও হতে

পারে, যার ভাষা খগেনবাবুর সঙ্গে বসবাসের সুযোগে অর্জিত। সফীক ধর্মতত্ত্ব ভেবে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু সাপের বিষ নেই নেই করলেই কী উড়ে যায়! গণ-চেতনা কি ব্যক্তিগত চেতনার অতিরিক্ত? যদি না হয়, তবে মানুষের মেরুদণ্ডরূপ সংস্কারকে বাদ দেওয়া যায় না। যদি হয়, তবুও অসম্ভব, বরঞ্চ বেশি, কারণ গণ-সংস্কার সৃষ্ট হতে, বৃদ্ধি পেতে বেশি দিন লেগেছে, তার ব্যাপ্তি আরো গভীর ও প্রশস্ত, তাই তাকে ছাড়াও কষ্ট।

রমলার চাই ভাল সাবান, দামী গন্ধ মাত্রা, নানা রকমের শাড়ি, লেসের শেমিজ রেশমি শায়া, নরম বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড়। খদ্দর তাকে মানায় না কিন্তু তাতে আসে যায় না। যে সাধু সর্বত্যাগী হয়েছে একবার, সে তখনই রেশমি আলখাল্লা, রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ, দামী খাবারের ওপর অধিকার অর্জন করেছে। রমলা চলে এসেছে—এইটাই তার ব্যবহারের প্রথম প্রতিজ্ঞা। যতক্ষণ তার আচরণ এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকছে, ততক্ষণ ছোটখাট সংস্কারগুলো তাকে বাঁধতে পারছে না।

বিজন রমলাকে বেশ গ্রহণ করে নিল। কখনও বিজনের কাছে সামাজিক প্রথার অর্থ ছিল না। তাই তার পক্ষে সহজ হল। বিজন প্রত্যাশা করছে যে সেই পুরাতন রমলাকেই সে কবে পাবে, রমলাও ভাবছে যে বিজন যা ছিল তাই আছে। দুজনের পরিবর্তন যদি একই হয় তবে পরস্পরের চেষ্টায় সম্বন্ধ সমৃদ্ধতর হবে, নচেৎ পুরাতন সম্বন্ধের জোরে বিজন রমলার কক্ষে গ্রহের মতন ঘুরবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাগপাশ থেকে উদ্ধার নেই। এইটেই সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্কার।

কিন্তু কমরেডরা নিশ্চয়ই অন্য কিছু সম্পর্কের সন্ধান পেয়েছে, নচেৎ, কেমন করে তারা আত্মীয়স্বজন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে কাটিয়ে ওঠে? নতুন সমাজ তৈরি হবার পর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ফুটে উঠবে, কিন্তু ইতিমধ্যে তাকে পরিহার করা চাই। এটা মহাপুরুষরা বুঝেছিলেন। সম্পর্কের এক নকশা খুলে আরেক নকশা বানাচ্ছে মেয়ে জাতটা। চরখা আর তাঁতের সামনে বসে কী তারা আগন্তুকের অপেক্ষা করে, না সেই প্রবাসী প্রিয়ের? নকশার সামনে ও পিছনে যে আরেক বড় ছক রয়েছে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা অচেতন, নিরাগ্রহ! যে সে বিষয়ে স্মরণ করাবে সে মেয়েজাতের চিরশত্রু হয়ে রইল। সফীকের সঙ্গে রমলার ভাব হতে পারে না।

খগেনবাবুর ঘুম আসছিল দেখে রমলা বল্লে, 'একটু বিশ্রাম করে নাও। বিছানা পেতে দেব? সন্ধ্যাবেলায় ইংরেজী হোটেলেই চল।'

'সেটা ভাল দেখায় না। ওরা নিশ্চয়ই একটা বন্দোবস্ত করবে।'

'আমি এখানে এত লোকের মাঝে থাকতে পারব না বলে দিলাম। তোমার ভাল লাগে তুমি থেকো। তুমি বোঝ না কেন যে আমরা এখানে রবাহুত? ওদের কাজে আমরা বাধা দিচ্ছি।'

'—তোমাকে স্টেশনে রেখে আসাই ভাল ছিল। তুমিই বা এলে কেন?'

'বিজন এমন নোঙরার মধ্যে থাকবে ভাবতেই পারিনি।' রমলা খাটিয়া থেকে নোঙরা বিছানা টেনে মাটিতে নামাচ্ছে দেখে খগেনবাবু বল্লেন যে, তিনি ঘুমুবেন না, বই পড়বেন! রমলা তুটো চেয়ার টেনে একটির ওপর পা রেখে অন্যটিতে বসল।

বিজন যখন খবর দিলে যে আপাতত একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়া গেছে তখন প্রায় সন্ধ্যা। মাত্র তুটি স্যুটকেস ও বিছানা নিয়ে বিজন রমলা ও খগেন-বাবুকে ফ্ল্যাটে পেঁছে দিলে। রাত ৮টার সময় তু'জন 'বয়' টিফিনক্যারিয়ারে খাবার আনলে, ওস্তাদের আজ্ঞামত। 'বিজন, খেয়ে যাও।' 'না, খগেনবাবু, মাপ করবেন। আজ কাল আমরা খুব ব্যস্ত থাকব। রমাদি, হয়ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না এ ক'দিন। ইতিমধ্যে গুছিয়ে নিও। তারপর, একটা হেস্তনেস্ত হলে তোমার বাড়িতে আড্ডা জমাব আমরা।' খগেনবাবু উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই আসবে। তোমার ওস্তাদকেও এনো অতি অবশ্য।' বিজন চলে গেল।

'একবার তুমি নিজেও বলতে পারতে!'

'কি?'

'জানি না।'

'মক্ষিরাণী হবার লোভ আমার নেই।'

তিন

নতুন ফ্ল্যাট ঠিক বাসোপযোগী নয়, যতদিন না ভাল বাড়ি পাওয়া যায় ততদিন মাথা গোঁজবার মতন। কিন্তু সে কয়দিনের জন্যও যৎসামান্য পারিপাট্যের প্রয়োজন। পদে পদে তাতেও খগেনবাবু নিজেকে অনাবশ্যক মনে করেন। ঘরে থাকলেই খুঁটিনাটি বিষয়ে মতান্তর হবার সম্ভাবনা থাকে। ঘরের কাজ মা-লক্ষ্মীদের আর বাইরের কাজ—বাবুদের—এ ধরনের শ্রমবিভাগ বর্তমান যুগে অগ্রাহ্য। এক যদি এক পক্ষ রোজগার আর অন্য পক্ষ খরচই করে, তবে ব্যাপারটি সহজ হয়। কিন্তু রমলা নিজের তহবিল থেকেই টাকা

তুলেছে, খগেনবাবুর অনুরোধ সত্ত্বেও অর্থ সম্পর্কে স্ত্রী-সুলভ আত্মপর ভেদাভেদজ্ঞানহীনতার প্রমাণ একবারও দিলে না। খরচের দায়িত্ব যার, রুচির দায়িত্বে তার সন্দেহ প্রকাশ অভদ্রতা।

বিজন পরের দিন এসে খগেনবাবুকে খবর দিলে যে হরতাল জোরে চলছে, তবে খণ্ড খণ্ড ভাবে। ইতিমধ্যে, মালিকেরা প্রচার করছে যে মুনাফার হার তাদের এতই কমেছে যে দুদিন প'রে তারা আর কল চালাতেই পারবে না। যুক্তিটা নিরর্থক, কিন্তু সাধারণে ভাবতে পারে যে তার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কমরেডরা সকলে এখন কাজে ব্যস্ত, অতএব খবরের কাগজে তর্ক বাধাতে তাদের সময় নেই। বিপদ এই যে কংগ্রেস দলের অনেকেই ঘাবড়ে গিয়েছেন। মজদুর-সভা অবশ্য মুখের মতন জবাব দিতে পারে, কিন্তু দিচ্ছে না। কারণ কী বোঝা যায় না। বিজনের বন্ধুরা অনেকেই সেখানকার সভ্য কিন্তু তাদের জোর কম। গুজোব এই যে কানপুরের কংগ্রেস লক্ষ্ণৌ থেকে মন্ত্রীপক্ষকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আসছে কাল মিটিং হবে।

খগেনবাবু সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়লেন। কাতারে কাতারে লোক চলেছে একই দিকে। তারই টানে একটা প্রকাণ্ড ময়দানে এলেন। বিস্তর লোক ইতিপূর্বে জমায়েত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান চেনবার জো নেই। যারা ভিড়ের পরিধিতে ঘুরছে তাদের মুখের ক্লান্তির ছাপ ভিড়ের সমীকরণ ছাপিয়ে চোখে পড়ে। চলার ধরন নিয়মবর্জিত, দুর্বল দাঁড়াবার ভঙ্গি, ঘার সোজা, চোখ নিষ্প্রভ। তলতলে গলা আমের মতন, থলথলে প্রৌঢ়া ক্ষেত্রী গৃহিণীর মতন, হলহলে পুঁইশাকের ডাঁটা চড়চড়ি আর বিউলির ডালের সঙ্গে কাদা-চিংড়ী, ন্যাদনেদে, ভসভসে··· কোথাও হাড়ের কাঠিন্য চোখে পড়ে না। ফ্যারোর কবর গেঁথেছে, রোমান-সম্রাটের বজরা বেয়েছে, জার্মান জমিদারের জলা-জমিতে লাঙল ঠেলেছে, ফরাসী রাজার জেলখানা ভরেছে, ল্যাঙ্কাশায়ারের কলে শীতের ভোরে ছুটেছে, এদেরই জ্ঞাতি; চীনের দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, মহামারীতে, ভারতের জমিদারী শোষণে ভুগছে, মরছে, এদেরই জাতভাই। এর চেয়ে আর কী প্রত্যাশা করা যায়। শতাব্দীর সর্বগ্রাসী অত্যাচার কী কন্দর্পপ্রস্থ হবে! কেন খোলামাঠে আসে এরা হাওয়া আর সবুজ ঘাস কলুষিত করতে! তার চেয়ে বাড়ি বসে, বস্তিতে পণ্ডিতজীর কথামৃত শুনুকগে, সেই সমীচীন, সুখ দুঃখ লক্ষ বৎসর আগেকার, সীতাহরণে রামচন্দ্রজী হাপুস নয়নে কাঁদছেন, লবকুশ মাকে নিয়ে বনে বনে ঘুরছে···রামলীলাই এদের পক্ষে যথেষ্ট। তা নয়, মিটিং, সত্যাগ্রহ, ধর্মঘট, হরতাল! বর্তমানের পরশ লেগেছে এদেশে, নতুন রোগ, মৃত্যুহার একটু বেশি হবেই ত!

ভারী মজার ব্যাপার কিন্তু। বাঙলা দেশেও বিলেতী রোগ ধরেছিল, ফলে জনকয়েক ধর্মত্যাগ করলে, জন কয়েক ইংরেজী শিখে আর চাকরি নিয়ে ভদ্রলোক হল ব্যস্, এই পর্যন্ত! থুড়ি! সাহিত্য আর ওজস্বিনী বক্তৃতা বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, তিনি সব অবস্থাতেই রবীন্দ্রনাথ, এমন কোন লেখকের নাম করা যায় যিনি নিজের শিকড় খুজতে অর্ধেক শক্তি অপব্যয় করেন নি? আধুনিক সাহিত্য ত' সামুদ্রিক শ্যাওলা! অনুকরণে আপত্তি নেই, কোনো সৃষ্টি আত্মজ নয়, কিন্তু এ হেন মস্তিষ্কের একটা ছোট অংশের তাগিদ! একটা মূলগত খণ্ডতা ও অ-বাস্তবতার হাত থেকে কেউ পরিত্রাণ পাচ্ছে না। ছটফট করছে, এইটুকুই আধুনিক মনের সততা, জীবনের চিহ্ন। কিন্তু বিদেশী প্রভাব এ অঞ্চলের আঁতে টান মেরেছে। তাই বাঙালীবাবু রায় বাহাদুর ডেপুটি, লেখক হয়েছিল, আর কানপুরের শ্রমিক বিলেতী বুলি কপচালে, বিলেতী পদ্ধতি খাটালে, চাকরি খোয়ালে, জেলে গেল। জনতার নিষ্প্রভ চোখ থেকে বিদেশী সম্পর্কের স্বরূপ ঠিকরে আসে। অন্নের বিরোধ। অন্ধকারের গর্ভে আলোর জন্ম। বর্ষারাতে পদ্মার জাহাজ বাঁকের মুখে সার্চলাইট ফেলে; ঘাটের গুদোম ঘর, পানের দোকান, হোটেল, জমিদার বাড়ির টিনের আটচালা, ঘাটের ডিঙ্গি এক ঝলকে চমকে ওঠে। রমলার প্রভাবের অন্তরে বিরোধের বীজ! ভাগিস, মা হয়নি সে! রক্তবীজের লোপ নেই।

ময়দানের এক কোনে সফীক একা দাঁড়িয়ে। 'আপনি এখানে!'

'এসে পড়লাম।'

বিজন আসতে সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাদের লোক কোথায়?'

'প্যাণ্ডেলের চারধারে।'

'ও-পাড়ার কর্তৃপক্ষ বিনা পয়সায় সিনেমা দেখাচ্ছেন। পৌরাণিক গল্প, যাতে এখানে না আসে।'

'যাদের আসা উচিত ছিল তারা এল না, আর এল তামাসা দেখতে আসে যারা বরাবর। ওদের সিনেমার অপারেটারকে বলেছিলে?'

'নতুন লোক। পুরাতন লোককে সন্দেহ করে তাড়িয়েছে।'

'সিনেমা-মেশিন বন্ধ করা সোজা। যা করে হোক নিয়ে এস।'

'ওস্তাদ, জানই ত ও-পাড়ার ব্যাপার। নিজে চল, নয়ত আসবে না।'

'পারবে না তুমি? বেশ মহবুবকে পাঠিয়ে দাও।'

বিজন উত্তর না দিয়ে চলে গেল।

প্রকাণ্ড মোটর পার্কের ফটকে থামল। লক্ষ্ণৌ থেকে মন্ত্রীপক্ষ লোক

পাঠিয়েছেন দু'দলের সমঝোতা করাতে। জয়রব উঠল, অজগরের মতন দীর্ঘ জনতা ধীরে ধীরে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করল, মধ্যে দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, চারধারে কংগ্রেস সমিতির সভ্য, পিছনে স্বেচ্ছাসেবকের দল। নেতা মঞ্চে উঠলেন, ঝাণ্ডায় হাত রেখে মাইক্রোফোনের সামনে এলেন; যন্ত্র ক্যাঁক করে উঠল। পাচ মিনিট সময় গেল যন্ত্র ঠিক করতে। বক্তৃতা শুরু হল। এক একটা হিন্দী কথার ওরফে ফারসী শব্দ, হিন্দুস্থানী ভাষার জন্ম হচ্ছে খোলা আঁতুড় ঘরে। পয়দা ত' হল, কিন্তু বাঁচবে কতদিন? যদি সকলে গ্রহণ করে তবেই আশা, নচেৎ সাহিত্যিকের আর কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের পণ্ডশ্রম। গড়পড়তা অর্থ অস্পষ্ট নয়। স্পষ্টতর হতে পারে যদি অশিক্ষিতের ভাষা অশিক্ষিতরা শিক্ষিতদের দিবারাত্রি শোনাতে পারে। তার সুবিধা হবে তখনই যখন শিক্ষিতদের চতুর্দিক সচেতন অশিক্ষিত ঘিরে থাকবে। একধারে সচেতনতা, অন্যধারে শিক্ষিতের জ্ঞান যে তাদের দিন ফুরিয়েছে। তবু বিপদ থাকে— হতাশায় শিক্ষিত সম্প্রদায় ফ্যাশিস্ট হয়ে যেতে পারে। সে-সম্ভাবনা ঐতিহাসিক। তার উচ্ছেদ-সাধনে গোড়া থেকেই তৎপর হওয়া চাই। খগেন-বাবু নিজে কোন দলে পড়বেন নিজে প্রশ্ন করেন। যতদিন রমলা রইল ততদিনই এই ক্রান্তির পুরণ নেই। এক অদৃশ্য জালে রমলা আর পৃথিবীর প্রাথমিক সমস্যা জড়িয়ে গেল।

বক্তৃতার প্রথম অংশটা খগেনবাবু শোনেননি। বক্তা বলছেন; 'ভারতবর্ষ গরীব দেশ। আগে ছিল না ও এখন কেন হয়েছে তার কারণ আলোচনায় লাভ নেই। এখনকার ভারতবর্ষের গ্রামে অন্ন নেই, কুটিরে শিল্প নেই, শহরে চাকরি নেই, অথচ চাল-ডাল রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে, আর বিদেশ থেকে দৈনিক ব্যবহারের সামান্য জিনিসগুলিও আমদানি হচ্ছে। মহাত্মাজী বলছেন, এ অবস্থায় নিজের শক্তিই একমাত্র সম্বল। তাঁরই বাণী আমি প্রচার করছি। নিজের হাতে সুতো কেটে সেই কাপড় পর, সুতো বেচে উপরি রোজগার কর। স্বরাজ মানে নিজের পায়ে দাঁড়ান। তোমাদের শক্তি তোমাদেরই অন্তরে। তোমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হও তবে তোমাদের শক্তি লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পাবে। হাঁ, আরেকটি কথা। কেবল সঙ্ঘবদ্ধ হলেই চলবে না। হৃদয় পবিত্র না হলে শক্তির অপচয় ঘটে। মনে হিংসা দ্বেষ পোষণ করলে নিজেরও উপকার হয় না। মহাত্মাজীর আবিষ্কৃত সত্যাগ্রহের এই মর্ম। তোমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখ তোমাদের চিত্তে কোনো কলুষ আছে কি না। এটা ভুলো না যে অন্তরের গলদ, আভ্যন্তরীণ হিংসা, জাতীয় সাধনার অন্তরায়। আমার একান্ত অনুরোধ যে তোমরা অগ্রসর হও, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, পবিত্র মনে, অহিংস উপায়ে, জাতীয়

অনুষ্ঠানের আনুকূল্যে, মহাত্মাজীর মতন মহামানবের আশীর্বাদ মাথায় বহন করে।'

বক্তৃতার শেষ নেই। আরেকজন শুরু করলেন। কণ্ঠস্বর উদাত্ত, সুর কবিতাপাঠের, বক্তব্য শ্রমিকের জন্মগত অধিকার। আরেকজন, নাকি আওয়াজ, মহিলা কর্মী। তারপর ধন্যবাদের পালা, সেই অজুহাতে পরস্পরের গুণগান। মহাত্মাজীর জয়, জওহরলালের জয়, পন্থজীর জয়।

ময়দানের কোনে সফীক দাঁড়িয়ে। জলধারা একটা ছোট নলের মুখ দিয়ে যখন বেরোয় তখন তার কাঠিন্য তীক্ষ্ণ তরবারিকেও ব্যাহত করে। একটা শৈলবাহু সমতটে নিঃশেষিত হল, পরে বন, ঝোপ, খানা, ক্ষেত খামার, খোঁটার ওপর দরমার ঘর, হঠাৎ একটা একশ টনের কালো পাথর, ভূমির নীচে কোথায় নিশ্চয় একটা সাতত্য ছিল। সফীক একটু হেসে খগেনবাবুকে প্রশ্ন করলে, 'বক্তৃতা শুনলেন, কেমন লাগল ?'

'যতটুকু বুঝলাম তা হতে মনে হল যে কর্তৃপক্ষ আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

'অনেকটা ঠিক।' কিন্তু সফীকের স্বরে নিজের মন্তব্যের সমর্থন নেই।

'অনেকটা মানে ?'

'যতদূর অ-হিংস পথে থাকা যায় ততদূর, তার বেশি নয়।'

'তার বেশি যাওয়ায় বিপদ আছে।'

'নিশ্চয়ই আছে! বোম্বাইএর মজুররা ভাল করেই জানে। নিশ্চয়ই আছে, গুলির সম্মুখে পড়ার বিপদ নেই!' চাপা ঠোঁটের ভেতর দিয়ে স্টীমের মতন কথাগুলো বেরুল। বিদ্রূপের অন্তরে বহুদিনের সঞ্চিত বিদ্বেষ খগেনবাবুর শুভজ্ঞানকে ঝলসে দিলে। ধ্যানীর শান্তিবচন আর নির্যাতিতের পুঞ্জীভূত অসূয়া একই বৃত্তাভাসের বিন্দুপথ।

'ওঁরা আপনাদের প্রকৃত বন্ধু।'

'পাতানো বন্ধু, ধর্মভাই বলতে পারেন।'

'অন্য হিসেবে ?'

'উপদেষ্টা।'

'তা বটে, ধর্মের গন্ধ একটু উগ্র বটে। কিন্তু সেটা বোধ হয় প্রয়োজনীয়।'

'কেন ?'

'তিন কারণে; মহাত্মাজী ছাড়া গতি নেই, কংগ্রেস ছাড়া উপায় নেই, আর ভারতবাসী ধর্মের ভাষায় সাড়া দেয় সহজে।'

'অর্থাৎ অগতির গতি, নিরুপায়ের উপায় এবং অভ্যাসের বদভ্যাস। তবু

ভাল, আপনি বলেন নি যে ভারতবাসী স্বভাবতই ধার্মিক।'

'চরম নিদানে বিশ্বাসী নই; এবং এক হাত জমির জন্য কিষাণরা নিষ্ঠুর হত্যা করতে পিছপাও হয় না, দেখছি। তা ছাড়া, প্রয়োজন কথাটার অর্থ আপনার কাছে এক, আমাদের কাছে অন্য। গুঁতোর চোটে বাবা বলা, আর আদরভরে বাবা ডাকার মধ্যে প্রভেদ আছে। একটা অনিচ্ছাকৃত, অন্যটা স্বেচ্ছাপ্রসূত। স্বেচ্ছা অর্থাৎ নির্বাচন।'

'কার হাতে নির্বাচন?'

'কোনো একটি মানুষের হাতে নয়। সমাজের বিকাশধারাই বেছে নেয়। যারা সেই নীতি বুঝেছে তারাই একমাত্র সাহায্য করতে পারে।'

'আপনাদের পাতানো বন্ধুরা ধরতে পারেন নি?'

'না।' সফীকের ঠোঁট জাঁতির মতন বন্ধ হল। দুজন মজুর যেন সফীকের সঙ্গে কথা কইতে চায়, খগেনবাবু তাই দূরে সরে গেলেন।

'এই যে করিম! কি খবর?'

'আমাদের পাড়া তৈরি। একজন লোকও ঢুকতে পারবে না। বড় ফাটকের সামনে একশ মরদ ও পঞ্চাশ আওরাত পাহারা দেবে।'

'পিছনে?'

'তারও বন্দোবস্ত হয়েছে।'

'কখন থেকে?'

'কাল ভোর বেলা থেকে।'

'আজই রাত ন'টা থেকে তারা মোতায়েন হোক।'

'আজ ন'টা! কেন?'

'হাঁ। যা বলছি শোন। রফা হল না, শেষে যখন খবর পাবে তখন দেখবে চোঙায় ধোঁয়া বেরুচ্ছে।'

'আওরাত আজ রাত্রে কোথায় পাব?'

'যা বল্লাম তারা বুঝবে এবং বুঝে আসবে। দেখ, যেন বাচ্চা নিয়েই যায়। লক্ষ্ণৌ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা যেন দেখেন, এবং দেখে সরকারকে খবর দেন যে মেয়েমানুষরা কচি ছেলে নিয়ে ধন্না দিচ্ছে মিলের সামনে। বুঝেছ? কি বুঝেছ বল।'

'না হলে সমঝোতা যাবে।' সফীক হেসে বল্লে, 'আপাতত, কথাবার্তার সুযোগে লোক ঢোকান বন্ধ করাটাই উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে, কংগ্রেসকর্মীদের আমাদের স্বপক্ষে ওকালতীর সমর্থনটাও এসে যাবে।' করিমের সঙ্গীকে সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'স্টেশনের এন্তাজাম হল?'

'একশ' জন সেখানে থাকবে।

'আজই, যেমন সর্বত্র।'

'গঙ্গার পুলে ?'

'সেখানে পঞ্চাশ, ঘাটে ঘাটে দশ।'

'ওস্তাদ, যদি লরি ভর্তি লোক আসে ?'

'তবে·· তোমরা কি ভাবছ ?'

করিম তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'যদি লরি নিয়ে আসে তবে সামনে শুয়ে পড়বার লোকেরও অভাব হবে না।'

'আওরাত সামনে শোবে, বাচ্ছা নিয়ে। আগে তারা আটকাবে, পরে তোমরা।'

'আগে আওরাত ? মরদকে অপমান করছ ওস্তাদ ? তা হয় না।'

'তাই হবে, কারণ তোমাদের হাত পা ভাঙলে রোজগারি করবে কে! ওরা মরলে আবার সাদি করে নিও। এই ঠিক, যাও।' হাসির সময় সফীকের চোখের কোনের চামড়া কুচকে যায়, ঠোঁটের বাঁ দিকটা একটু ঝুলে পড়ে, ডান দিকটা উঁচু হয়।

সফীক খগেনবাবুর পাশে এসে একটা বর্মা চুরুট ধরালে। একজন লোক কাছে এল, পরিচ্ছন্ন খদ্দরের কুর্তা ও পায়জামা, কেয়ারি করা চুল একটু বেশি তৈলাক্ত, বাঁকা ভাবে খদ্দরের টুপি পরা, পায়ে ভারি বুট।

'কেঁও জমাদার সাহাব, নেহি মিলা শিকার ?'

লোকটা থতমত খেয়ে বলে, 'কিসকো পুছতেঁহে ?'

'জনাবে আলিসে।'

'জমাদার কোন ?'

'দেমাক রাখনা চাহিয়ে সাহাব!'

লোকটা ইতস্তত করে খগেনবাবুর কাছে দেশলাই চাইলে। সফীক দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে লোকটা চলে গেল।

'কে ?'

'নজর রাখছে আপনার ও আমার ওপর।'

'যখন সরকার আপনাদের নিজেদের, তখনও!'

'তবে আর মজা কী! ওরা সরকারের ওপর। তা ছাড়া, শ্রমিকদলের যারা পক্ষ নেবে তারাই কম্যুনিস্ট, অতএব তারা সকলের শত্রু। আপনিও নতুন লোক, ঘাবড়াবেন না, বাঙালী হিন্দু মাত্রেই অ-বাঙালীর কাছে টেররিস্ট।' একজন স্বেচ্ছাসেবক সফীকের কাছে এসে বল্লে, 'ওস্তাদ, আপনি

কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন না ?'

'ডাকলে নিশ্চয়ই যাব।'

'আপনার বক্তৃতা শুনতে সকলে উদ্গ্রীব ছিলাম।'

'এ-সভা অন্য কারণে, অন্যের জন্য ডাকা।'

'তবু ওস্তাদ, এত লোক জমেছে, এমন সুবিধে ছিল আমাদের বক্তব্য প্রচারের।'

'কাদের বক্তব্য ? তোমাদের ! তুমি কোন ক্লাসে পড় ?'

'টেন্থ্ ক্লাসে।'

'মন দিয়ে পড়াশুনো করগে, পরীক্ষার ফল ভাল হবে, বক্তৃতা শোনবার স্পৃহাও কমবে।' ছেলেটি চলে গেল।

'খগেনবাবু, আপনার ফ্ল্যাট সাজান হল ?'

'এক রকম হয়েছে। এখনও পুরোপুরি হয় নি। উনি আবার মনোমত না হলে কাউকে চায়ে ডাকতে পারছেন না। চলুন আপনাদের ওখানেই যাই। যদি অবশ্য, তবে...'

'একটা প্রশ্ন করছি, মাপ করবেন, আপনি স্পাই ?'

'দেখে মনে হয় ?'

'না।'

'অবশ্য, আদিম অভিশাপটার কথা তুলবেন না।'

'সেটা কাটান যায়, বড় চেষ্টায়।'

'কোনটা উল্লেখ করছেন ?'

'শ্রেণীর।'

'আমি বলছিলাম, এ-দেশে ইংরাজী শিক্ষার আদিম অকৃত্রিম উদ্দেশ্যটির কথা, যার প্রেরণায় সকল শিক্ষিতরাই গুপ্তচর। তবে এইটুকু রক্ষে যে চাকরি আমি করি না। এ অভিশাপ মোচন হয় ?'

'নিশ্চয়ই হয়, অভিশাপের মধ্যেই কাটান-মন্ত্র আছে। আচ্ছা, চলুন আমাদের ওখানে এমন কিছু গোপন কাজ হয় না। লুকিয়ে ষড়যন্ত্রের কাল নেই, যদিও বাঙালীদের কাছে তার মোহ এখনও আছে, বোধ হয়।'

সফীক খগেনবাবুকে চা খাওয়ালে। ঘরে কেউ নেই দেখে খগেনবাবু বল্লেন, 'আমি চিরকাল বই ঘেঁটেছি, কখনও কাজে নামিনি, তাতে বিশ্বাসীও নই, তাই আমার ভাষা স্পষ্ট নয়। কিন্তু একটা কথা আমার প্রায়ই মনে জাগে। সত্যই কি আপনি ভাবেন যে ভারতবর্ষের সভ্যতার কোনো বিশেষত্ব নেই, যদি থাকে তবে তার প্রকৃতি কি ধর্মমূলক নয়, এবং যদি তাই হয়, তবে তাকে

অবহেলা ক'রে কোনো স্থায়ী নতুন সভ্যতা গড়া যাবে ?'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর আছে, কিন্তু অন্য কোনো দিন আলোচনা করা যাবে। এখন মুলতুবি থাক।'

রাত প্রায় ন'টার সময় মহবুব এসে খবর দিলে, 'কথাবার্তা শুরু হয়েছে। উধামজী আছেন সেখানে। ওঁরা বলছেন বরখাস্তের কারণ এ নয় যে করিম কী অন্যান্য লোক মজদুর-সভার কর্মী, কারণ এই যে তারা হয় অপদার্থ, না হয় গুণ্ডা।'

'তারা গুণ্ডা! আর কি দশজনের পাশে যাহারা পাহারা দিচ্ছে তারা সব লক্ষ্মী ছেলে, অহিংসার খুদে অবতার! তাদের কাশী আর মির্জাপুর থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে তত্ত্বাবধানের জন্য। করিমের রেকর্ড দেওয়া হয়েছে ?'

'উধামজীকে নিজে দিয়েছি।'

'কি বল্লেন ?'

'তিনি বলছিলেন যে ওরা উত্তর দেবে করিম আগে ভাল মিস্ত্রি ছিল, এখন সে কেবল জটলা আর ষড়যন্ত্র করে, তাড়ি খেয়ে মারপিট বাধায়। তার বৌ যে মোকদ্দমা চালিয়েছিল তার রায়ের কাপিটা ওদের হাতে।'

'উধামজী কি জানেন না যে কিসের জোরে, কার পয়সায় করিমের স্ত্রী বড় উকিল দিয়ে মোকদ্দমা চালায় ?'

'উধামজী জানেন বোধ হয়, শুনিয়েও দেবেন।'

'স্মরণ করাতে বলগে যাও। টাকা এসেছিল কর্তাদের কাছ থেকে!'

'প্রমাণ চাইবেন হয়ত।'

'প্রমাণ ? প্রমাণ মানে অনবরত কানে ঢোকান। একটা কথা একশবারে প্রমাণ, হাজারে বাণী। উধামজীর পাশে পাশে থেকো। এখানে প্রয়োজন নেই তোমার।' মহবুব চলে গেল।

বিজন এসে খবর দিলে যে জুহীর সিনেমা-শো ভেঙ্গে গিয়েছে, তাকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল, মেশিন নিয়ে অপারেটার ভেতরে পালাল।

'ওটা আস্ত আছে ? কাল যেন থাকে না।'

'খগেনবাবু, রমাদি অপেক্ষা করছেন। আমাকে খেতে বল্লেন, কিন্তু নাচার। ওস্তাদ, রাত্রে আমার কোনো কাজ আছে ?'

'তুমি এখানেই থাকবে, না ফ্ল্যাটে যাবে ?'

'যা বল।'

'যা ইচ্ছে তোমার। আপনি, খগেনবাবু ?'

'আমি না হয় যাই।'

'বেশ।'

'কাল দেখা হবে?'

'এখন বলা যায় না।,

'বিজনের এখানে রাত্রে অসুবিধে হবে না?'

বিজন প্রতিবাদ জানালে। সফীক বল্লে, 'আমাদের কথাবার্তা শেষ হতে যদি দেরি লাগে তবে অবশ্য যাবে না আপনাদের ওখানে, তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ত পাঠিয়ে দেব।' খগেনবাবু উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় খগেনবাবুর বেয়ারা এসে তাঁকে একটা চিঠি দিলে। রমলা দু'লাইনে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে অনুরোধ জানিয়েছে। সফীক হাসি সম্বরণ করলে। খগেনবাবু চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে বল্লেন, 'আমি এখানে খানিকক্ষণ বসতে পারি?' বিজন খগেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল! সফীক বল্লে তার কোনো আপত্তি নেই, তবে খগেনবাবুর খাবার দেরি হবে। খগেনবাবু খাটিয়ার ওপর বসলেন। সফীক লিখতে বসল।

রাত দশটার পর জন পাঁচেক লোক ঘরে এল। সফীক তিনটে ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে সকলকে কাছে আসতে অনুরোধ করলে। প্রথমটিতে চাঁদার জন্য আবেদন। ধর্মঘট চালাবার জন্য টাকা চাই, মজদুর-সভার এমন অর্থবল নেই যে অতলোকের খরচ চলে একদিনের বেশি। অথচ পনের দিনের খোরাকের হিসাব ধরতে হবে। মজুরদের নিজেদের হাতে যা আছে তাইতে গড়পড়তা তিন দিন চলবে। বাকি ক'দিনের মধ্যে এক হপ্তা ধারে, শেষের পাঁচদিনের উপযুক্ত নগদ টাকা তোলা চাই। প্রথমে কানপুর, পরে একত্রে লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, প্রতি শহর থেকে টাকা উঠবে। চাঁদার সমিতিতে কংগ্রেসসভ্যের সংখ্যা বেশি থাকাই উচিত।

প্রত্যেককে সফীক আবেদন পত্রের সমালোচনা করতে অনুরোধ জানালে। আপত্তি উঠল চার দফায়। ভাষা একটু জোরাল হলে ভাল হয়। পনের দিন হরতাল চলবে কোন হিসেবে; চাঁদার হার কত লেখা নেই; সমিতিতে মজুরদের ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধি নেই।

ভাষা সম্বন্ধে সফীক উত্তর দিলে যে সে সাহিত্যিক নয়; ওজস্বিনী-ভাষার চেয়ে কাটা ছাঁটা আবেদন পত্রেই কাজ হয় এই তার অভিজ্ঞতা, তবে বিজন যদি চায় তবে সে ভাষা সংশোধন করতে পারে, খগেনবাবুর সাহায্যে। বিজন কাগজটি নিয়ে খগেনবাবুর কাছে গেল। খগেনবাবু মন দিয়ে পড়বার পর বল্লেন, 'হরতালের অব্যবহিত কারণগুলি স্বল্প কথায় লেখা উচিত, অনেকে হয়ত জানেন না।' সফীক রাজি হল, 'বিজন, তুমি ওঁকে জানিয়ে দাও। দু'তিন

লাইনের বেশি যেন না হয়।' লেখাটা চার লাইনে দাঁড়াল। সফীক দু'একটা বিশেষণ কেটে দিলে। সকলকে পড়ে শোনাবার পর খসড়া গৃহীত হল।

পনের দিনের সীমা সম্বন্ধে সফীক উত্তর দিলে যে 'দু'সপ্তাহে ফল যদি না ফলে তবে বুঝতে হবে যে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি আছে। গত হরতালের অভিজ্ঞতা এই যে দশ দিনের পর এখানকার মজুরদের শক্তিতে ভাঁটা পড়ে। অর্থাৎ, তখন তারা বোঝাপড়ার জন্য উন্মুখ হলেও প্রস্তুত হতে থাকে। এবার দেখতে হবে যেন জোয়ার আসে, অতএব ভাঁটা আসবার পূর্বেই সাবধানের প্রয়োজন। আট কিংবা ন'দিনের দিন মজুরদের জানান চাই যে অন্তত ত্রিশ হাজার টাকা মজুত রয়েছে। ইতিমধ্যে তারা জানবে যে চেষ্টা চলছে, ব্‌স্‌, এইটুকু।' সফীকের উত্তরে সকলে নীরব রইল।

চাঁদার হার লেখা নেই, কারণ যে যা পারে তাই মাথায় তুলে নিতে হবে। চার আনা লিখলে তার বেশি আসে না। ছাত্রেরা চার আনা, উকিল দোকান-দার আট আনা এক টাকা, আর মালিকরা, হাঁ মালিকরা লুকিয়ে যা পারে তাই দেবে, উধামজীর মারফৎ। এই টাকাটা প্রথমে তোলা চাই, তাই তাঁর প্রয়োজন খুব বেশি। মালিকরা তাঁকে মান্য করে। তিনি চাঁদার সমিতিতে একলা থাকবেন না, কংগ্রেসের লোক চাইবেন, প্রথমে আপত্তি দেখিয়ে শেষে রাজি হলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তাই অন্য পক্ষের নাম রাখা হয়েছে এখন। মজদুর সভার প্রতিনিধি হিসাবে ঐ কারণে এখন কেউ থাকছে না, পরে যখন উধামজী নিজেই দলের একাধিক লোক আনতে চাইবেন তখন আমাদের জনকয়েককে এ অজুহাতে বসিয়ে দিলেই চলবে। মুসলিম লীগের তরফে কে আসবে মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তিনি নিজে রাজি হলেই সব দিক থেকে ভাল হয়। তাঁর স্থান খালি রাখা হয়েছে। সমিতি প্রয়োজনমত নতুন সভ্য বেছে নেবে।

মহবুব জিজ্ঞাসা করলে, 'ওস্তাদ তুমি নিজে থাকছ না?'

স: 'না।'

ম: 'উধামজীর হাতে অতটা ভার দেওয়া কি উচিত?'

স: 'সব ভার তাঁকে বইতে হচ্ছে না। তাঁকে দেনেওয়ালারা শ্রদ্ধা করে তোমরা জান সকলে। অতএব টাকা তোলবার জন্য তাঁর মতন লোক মিলবে না।'

বি: 'শেষে যিনি টাকা তুলেছেন তিনিই খরচ করবেন। এই ভাবে কানপুরের সব ব্যাপারই তাঁর হাতে এসে পড়ছে।'

স: 'হাতে পড়ুক, মুঠোর জোর নেই। হরতালটা যদি খাঁটি হয় তবে

তাঁর সাধ্য কী যে তার কাঠামো ছাড়িয়ে যান।'

বি : 'ওস্তাদ, কিছু মনে কোরো না, অতটা নির্ভর আমার ধাতে নেই। এই ক'রেই আমরা নিজেদের বঞ্চিত করছি, আর 'রাইটিস্ট'দের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে! উধামজীর চারপাশে আমাদের থাকতেই হবে।

স : 'তাই হবে, তবে এখন নয়। হরতাল তুমি ভাবছ কেবল মজুরদের মজুরি ও নোকরি নিয়ে, তা নয়। হরতালের দুটো দিক আছে, পলিটিক্যাল ও ইকনমিক। প্রথম দিকে উধামজী আসতে বাধ্য; কিন্তু পরে সরে যেতেও বাধ্য, কারণ যে পরিবর্তন তাঁর মনোমত সেটা মজুরদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। অতএব আমরা যদি সজাগ থাকি তবে তিনি আপনা থেকেই বসে পড়বেন। ব্যাপারটা সজাগ রাখা। আর কিছুতে ভয় পেও না। যে আগে থাকে সেই কি নেতা? এখনও নেতৃত্বের প্রতি মোহ আছে আছে অনেকের। ওসব কথা যাক—খানিক টাকা তোলবার পর মজদুর-সভার প্রতিনিধি-হিসেবে তুমি যাকে চাইবে তাকেই আমরা পাঠাব, বিজন। সামান্য ঠাট্টা ছিল সফীকের উচ্চারণে, বিজন আর কোন উত্তর দিল না।

দ্বিতীয় কাগজে যাতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা না বাঁধে তার প্ল্যান! তার প্রথম দফা, যেন কালই প্রত্যেক মহল্লায় এক একজন কর্তা ঠিক করা হয় যার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হবে আপন আপন মহল্লার শান্তিরক্ষা। বাছা বাছা লোক নিয়ে সে একটি সমিতি বানাবে, প্রত্যেক সমিতি সব গোড়াতে এই প্রস্তাব মনোনীত করবে যে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শ্রমিক-শ্রেণীকে দুখণ্ডে বিভক্ত করার ফন্দি মাত্র। তাছাড়া সমিতি নজর রাখবে যে বাইরের কোন লোক পাড়ায় না ঢোকে। সমিতি পাহারা দেবে, হিন্দু মজুর মুসলমান পল্লী আর মুসলমান মজুর হিন্দুর পল্লীতে। শহরে শান্তির ভার কর্তৃপক্ষের, মজুরদের ভার মজুর পাড়ায় দাঙ্গা হতে না দেওয়া, তার বেশি নয়। সফীক সকলের মত চাইলে। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে তাদের পাড়ায় মারপিট বাধবে না। তবে শহরে যদি শুরু হয়, আর বেশি দিন চলে ও সেই সঙ্গে হরতালের উৎসাহ কমে যায়, অর্থাৎ পনের দিন কুঁড়েমির পর কী হয় বলা যায় না। সফীক 'কুঁড়েমি' কথাটি শুনে ভুরু তুললে। সেটা লক্ষ করে মহবুবের চোয়াল শক্ত হল। বিজনের মতে বাইরের গুণ্ডা না আসতে পেলে আর শহরের গুণ্ডাদের আগে থেকে কয়েদ করলে কোনো চিন্তাই নেই। প্রশ্ন উঠল দুটোর একটাও সম্ভব কিনা।

বিজন : 'প্রথমটা শক্ত, দ্বিতীয়টি সোজা, যদি লক্ষ্ণৌ থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর হুকুম আসে ১৪৪ ধারা শহরে জারির জন্য।'

করিম এতক্ষণ নীরব ছিল কোনে যেন আত্মগোপনে ব্যস্ত, তাকে নিয়ে

হাঙ্গামা বেধেছে এই যথেষ্ট, তার বেশি মনোযোগ যেন তার ওপর না পড়ে। মুখ বসন্তের দাগে ভরা, নাকের একটা দিক মা শীতলা কেটে নিয়েছেন, তাই ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরোয় প্রতি নিঃশ্বাসে, বাঁ রগের শিরা জট পাকিয়ে ফুলে উঠেছে, মধ্যে মধ্যে দাড়িটা নাচে, অজানিতে ডান হাত চাকার মতন ঘোরে আর বাঁ হাতের আঙুলগুলো হাওয়ায় ছক কাটে, চোখে বিজলী হানে কিন্তু মুখে থাকে হাসি, সরল, শিশুসুলভ, সফীকের মতন। করিম গলা খাঁকারি দিতে কথোপকথন যেন থিতোল।

স: 'করিম, তুমি কি বল?'

ক: '১৪৪ ধারায় আমরাই প্রথমে ধরা পড়ব।'

স: 'নিশ্চয়ই। শহরে দাঙ্গা হতে না দেওয়া আমাদের কাজ নয়, সরকারের। তা ছাড়া, শহরে মারমিট চলছে আর মজুর পল্লী ঠাণ্ডা একটা দাম আছে।'

খগেনবাবু অস্বস্তিভরে চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার বসলেন। সফীক বাঁকা চোখে সেটা লক্ষ করে তৃতীয় কাগজে মন দিলে। এতে পূর্বোক্ত দুটি প্ল্যানের কার্যবাহক বিবরণ। চাঁদার আবেদন পত্র ছাপান, বিলোন, খবরের কাগজে পাঠান থেকে ছাত্র সমাজের, উকিলদের, দোকানিদের, স্টেশনের ঘাটের কর্মী নির্বাচন পর্যন্ত সব খুঁটিনাটি লেখা। দ্বিতীয় অংশে মজুর পল্লীর সর্দার ও সমিতির লোকের নাম। প্রথম প্রশ্ন উঠল মিলওয়ালাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হবে কি না, যদি হয়, তবে সে ভার কে নেবে। সফীক উত্তর দিলে, 'চাঁদিতে স্পর্শ দোষ ঘটে না। টাকা যখন আমাদের কাজে লাগে তখন সেটা পবিত্র। আমি এদের কাছ থেকে চাঁদা তোলার ওপর জোর দিচ্ছি দুটি কারণে, ওঁরা পরস্পরের প্রেমে পাগল নন, হরতালের লোকসান যারা বহন করতে পারবে না তারা ত' দেবেই, তা ছাড়া দেবার সময় যারা জোরে লক্-আউট চালাচ্ছে তাদের অভিশাপ করবেই। মিলওয়ালাদের মধ্যে বড় ছোট আছে ছোটরা ভাবে তাদের কম লাভ কিংবা লোকসানের জন্য বড়রা দায়ি, বড়রাও ঠিক একই কথা ভাবে, তবে তাদের লোকসান কখনই হয় না। অতএব প্রত্যেকের ছোট স্বার্থ এই যে তার মিল চলুক, অন্য মিলে ধর্মঘট হোক। এই জন্য টাকা সহজে আসবে, এবং ওদের নিজেদের বিরোধটা খুলবে ভাল। উধামজী ধুনো দেবেন দেশী-বিদেশী পার্থক্যের। সব মালিকরাই আজ কংগ্রেস ফণ্ডে টাকা ঢালতে তৎপর, সেজন্যেও উধামজীর প্রয়োজন। এ ভার তাঁরই।'

দ্বিতীয় অংশের আলোচনার সময় খগেনবাবু ক্ষমা চেয়ে, সবিনয়ে প্রশ্ন

করলেন, 'আগে থেকে সর্দার ও সমিতি ঠিক করা কি সম্ভব ?'

স : 'সেইটাই সম্ভব, আপনি যা ভাবছেন সেটা অচল। তা ছাড়া আমরা জানি কে রাজি হবে, কে হবে না।'

খ : 'তবু'···

স : 'তবু, ডেমক্রাটিক নয়, এই বলছেন ত ? ফলে তাই দাঁড়াবে, দেখবেন'খন।'

বি : 'খগেনবাবু বলছেন পদ্ধতির কথা।'

স : 'সেটা পরে বিবেচ্য।'

শেষ প্রশ্ন উঠল সরকার মিটমাটের জন্য যে চেষ্টা করছেন তার সমর্থন করা উচিত কিনা। বিজন সফীককে সোজা জিজ্ঞাসা করলে এ সম্বন্ধে তার নিজের মত কি।

'নিজের মত নেই। কী ধরনের কথা চলছে খবর পাওয়া যাক প্রথমে···'

করিম বললে, 'ওটা আমাদের হাতে নয়! মজদুর-সভা যা করবে তাই হবে।' একজন কর্মী ঘরে এল।

স : 'কি খবর ?'

'কথাবার্তা কখন শেষ হবে জানি না। এখন ওঁরা খেতে গেলেন। উধামজীর মতে আশা আছে।'

স : 'আশা, আশা আশা নেই, থাকতে পারে না। ওহে বিজন, শুনেছ, আশা আছে, করিম ভাই শুনেছ, আশা!' সফীক হাসতে লাগল, দাঁড়িয়ে উঠে গা হাত মোড়া দিলে, হাত দু'টো সোজা মাথার উপর উঠে একটা মুঠোয় আবদ্ধ হল, যেন এপস্টাইনের যীশু দীর্ঘতর হয়ে আকাশ স্পর্শ করছে, তাকে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দিচ্ছে না, স্বর্গ-মর্ত্যের দূরত্ব বজায় রাখছে, দু'টোকে এক হতে দেবে না।

'বিজন, তুমি খগেনবাবুর সঙ্গে যাও। রাতে তোমার কোনো বিশেষ কাজ নেই।' এক একজন করে সকলে চলে গেল, বিজন ও খগেনবাবু তখনও বসে রয়েছে দেখে সফীক জিজ্ঞসা করলে, 'আমাকে পৌঁছে দিতে হবে ? ভাবীজি নিশ্চয়ই রাগ করেছেন। কিন্তু আমার উপস্থিতি কি বাঞ্ছনীয় ?' বিজনের সাগ্রহ আমন্ত্রণে খগেনবাবু সায় দিলেন।

ফ্ল্যাটের একটা ঘরে আলো জ্বলছিল। কড়া নাড়তে 'বয়' দরজা খুলে দিলে। বিজনের উচ্চ কণ্ঠস্বরের আহ্বানে রমলা ঘরে এল। টেবলে ন্যাপকিন ঢাকা খাবার সাজান রয়েছে। রমলা টেবলের মাথায় বসে খাবার ভাগ করে দিলে। রমাদি, আমার মত হতভাগাকে নিয়ে চালান শক্ত। ওস্তাদকে ভাল

করে খাওয়াও দাওয়াও। ওর প্রয়োজন আছে যত্নের, ভাওয়ালীতে একবার যেতে হয়েছিল, ফিরে এসে কারুর কথা শোনে না, যে কে সেই !'

র: 'তাই না কি !'

স: 'বিজনের কথা ধরবেন না। ওটা কানপুর থেকে আমাকে সরিয়ে দেবার ছুতো ছিল। আমার শরীর এখন খুব ভাল।'

বি: 'তা ভাল হতে পারে, কিন্তু বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। একবার যখন রক্তবমি হয়েছে তখন…'

খ: 'কতদিন আগে ?'

স: 'তিন বছর হয়ে গেল।'

খ: 'তবে কোনো চিন্তা নেই।' রমলা অন্য কাঁটা দিয়ে মাংসের টুকরো বিজনের প্লেটে দিলে।

র: 'আপনি কিছু খাচ্ছেন না. অসুবিধে হ'ল হাতে করেই খান।'

খগেনবাবু রমলার দিকে চাইলেন। ঠঙ্ করে রমলার কাঁটা বেজে উঠল।

বি: 'রমাদি, ওস্তাদ পুডিং ভালবাসে। আছে ?'

র: 'কালকের কিছু থাকতে পারে, দেখছি।' রমলা পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে বল্লে, 'যতটা আছে তা দেওয়া যায় না।'

বি: 'তা হোক।'

র: 'আরেক দিন ক'রে পাঠিয়ে দেবো। বিজন, তুমি কি এখানে আজ শোবে ?'

বি: 'না, আজ থাক।'

স: 'আজ নয় কেন ?'

বি: 'কোথায় শোবো ?'

খ: 'সে জন্য ভেবো না। আমার ঘরে জায়গা আছে।'

খাবার পর বিজন সফীককে খানিকটা রাস্তা পৌছে দিতে চাইলে। সফীক প্রথমে রাজি হল না। খগেনবাবুর ঘরে বিজন আর রমলা ঢুকল শোবার বন্দোবস্ত করতে।

খ: 'আমি দেরিতে ঘুমুই। খাবার পর একটু হাঁটা ভাল। একটু না হয় যাই ?'

স: 'আসতে চান আসুন।'

একটু দূরেই পথের ধারে একটা খোলা মাঠ। পার্ক নয়, মাত্র খালি জায়গা, মাটি এবড়ো, খেবড়ো, ঘাস নেই, কাঁকর আর কয়লার ওপর হাঁটতে মচ্

মচ্‌ শব্দ হয়, পূবে বস্তির আলো টিম্‌টিম্‌ করে, পশ্চিমে রাস্তার বিজলী বাতি নিল'জ্জভাবে জলে। সফীক বস্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে মাটিতে বসল। খগেনবাবু ঘাস খুঁজে তার ওপর রুমাল বিছোলেন।

খ: 'আপনার সঙ্গে এত শীঘ্র আলাপ জমবে আশা করি নি। ভাল মিশতে জানি না। আপনাদের মতামতের সঙ্গে আমার পরিচয় বই-এর দৌলতে, তাও সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে অক্ষম।'

স: 'কতটা পারেন?'

খ: 'গোড়ার তাগিদ মানি। মানুষকে শ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি আগ্রহ, উন্নতির প্রবৃত্তি, মৈত্রীভাব, এগুলো সভ্যতার তাড়না, বহু পুরাতন। আরো স্বীকার করি, সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করতে, এমন কী তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সকলকে সজাগ ও সক্রিয় হতে হবে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে।'

স: 'কোথায় পারেন না?'

খ: 'অতটা মেটিরিয়ালিজম গিলতে পারিনা।'

স: 'যদি তাগিদগুলোর অস্তিত্ব গ্রাহ্য হয় তবে মেটিরিয়ালিজমের যান্ত্রিকতা আপনা থেকে বাদ পড়ে। জড়বাদ অনেক রকমের।'

খ: 'তা জানি। কিন্তু পদ্ধতিটা? হরতালের জন্য অত হিসেব নিকেশ কেন? আপনি যে প্ল্যান শোনালেন তাতে মানুষের ব্যবহারকে যন্ত্রের পর্যায়ে ফেললেন। সকলে যেন পুতুল, আর আপনারা যেন খেলোয়াড়, পর্দার আড়াল থেকে সুতো টানছেন, আর তারা আপনাদের আজ্ঞা পালন করছে। জীবনটা মেকানিক্‌স নয়।'

স: 'সাধারণ মন্তব্যগুলো ছেড়ে দিন, আমি ঠিক বুঝি না। প্ল্যানের গলদ কোথায়?'

খ: 'আমি কখনও কর্মক্ষেত্রে নামি নি, অতএব আমার সমালোচনা ধৃষ্টতা হবে। কিন্তু সাধারণ প্রতিজ্ঞা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত কোনো পদ্ধতি কার্যকরী হবে না। আপনি পনের দিন ধর্মঘট চলবে ধরছেন, কেন? বিরোধের সন তারিখ ঠিক করা যায় না! তার ছন্দ আছে, উত্থান-পতন আছে নিশ্চয়, কিন্তু যদি মজুরদের সচেতন রাখা উদ্দেশ্য হয় তবে বিরোধ কোনো এক তারিখে ঝুলে পড়বে ভেবে কাজ করা নিজের পায়ে কুড়ল মারা। বিরোধকে চিরন্তন ভাবাই আপনাদের প্রথম প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। ক্ষমা করবেন। এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছি অন্য দিক থেকে, সেটাও জীবনের দিক, তাই অন্য দিকেও তার স্বার্থকতা থাকতে বাধ্য। খণ্ড খণ্ড দেখার বিপদ আছে সন্দেহ হয়।'

স: 'আপনার মত অনুসারে প্ল্যানকে কতটা সংস্কৃত করবেন?'

খ: 'তা আমি জানি না।'

স: 'বেশ। ভেবে দেখবেন। অন্য আপত্তি?'

খ: 'পূর্বেই জানিয়েছি। আপনারা কেন, নিজেরা পল্লীসমিতির সর্দার ও সঙ্ঘের নাম লিখলেন? কিছু মনে করবেন না, এখানেও জনসাধারণের জীবনশক্তিতে অবিশ্বাস ফুটে উঠেছে। 'ডেমোক্রাসি' শব্দ ব্যবহার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু সাম্যবাদীর সমাজ যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অপমান করে, তবে, জনসাধারণের দশা কী হয় ভাবুন দেখি।'

স: 'আরো কিছু বক্তব্য আছে?'

খ: 'আপাতত কিছু নেই। তবে আবার বলি, অত হিসেব-নিকেশ, অত প্ল্যান সৃষ্টি আমার শিক্ষার হোক বা না হোক, অভিজ্ঞতার প্রতিকূল। জনসাধারণের ধর্ম মানুষের ধর্ম ছাড়া নয়, সেই ধর্মবলে শক্তির স্ফুরণ হয় অন্তর থেকে। অতএব, হরতাল শুরু হবে, সামান্য ঝগড়ার বিষয় ছাপিয়ে সেটা দুকূল ভাসাবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত আপন বেগে চলবে—এসব সম্ভব একমাত্র আপন শক্তিতে। মানুষ, নেতা, স্রোতের বড় কুটো মাত্র, এই দেখলাম।'

স: 'আপনি কখনও দলভুক্ত হয়ে কাজ করেছেন?'

খ: 'না। করতে পারি নি। একবার দলে এসে পড়ি, কিন্তু প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। আমি বলছিলাম, ব্যাপারটা চল্‌তি, স্থাণু নয়।'

স: 'কে বলছে স্থাণু! অনেক রাত হল না?'

খ: 'তা হোক গে! খোলাখুলি তর্কের সুযোগ দিয়েছেন ব'লে সত্যই কৃতজ্ঞ অবশ্য তর্ক আর হলো কৈ! আপনি মুখ খুললেন না এখনও পর্যন্ত।'

স: 'আপনি যা বল্লেন তার আংশিক সমর্থন আছে। ১৯০৫।৬ সালে রাশিয়ায় যে বিপ্লব শুরু হয় সেটা অনেকটা বন্যার মত এসেছিল। তাতে সর্বপ্রকার বিবর্তন এসে পড়ে, মানসিক পর্যন্ত, কিন্তু স্থায়ী হল না এই জন্য যে বন্যাকে খাতে বওয়াবার কোনো উপায়, অর্থাৎ পার্টি ছিল না। তাই দশ বছর বৃথা গেল, তাই অত দামও দিতে হল, তাই অবশ্য অত লোকে কাঁদতেও পারলে। এই প্রকার ঘটনাকে সার্থক সংক্রান্তিতে পরিণত করতে পারে পার্টি। তার কাজ এই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসের দিক্ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়, পূর্ব থেকে তার খাত তৈরি ও সাধারণকে তার ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন করা। পার্টির নেতৃত্ব মানে সংস্থান বুঝে বিরোধকে ঠিক পথে চালান, তাকে বাঁচিয়ে রাখা, সামাজিক শ্রেণীগত সম্বন্ধের নিচুতে বিরোধকে নামতে না দেওয়া, তাই থেকে শক্তি আহরণ ও তাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা। এটা আপনাদের জীবনস্রোতের

নিজের ক্ষমতার বাইরে। সেটা অন্ধ, তার চোখ দেয় পার্টি। তাই পার্টির একটা প্রাথমিক দায়িত্ব আছে, কিন্তু, তার কাজের মধ্যেই ডেমক্রাটিক পদ্ধতি খুঁজে পাবেন। কার্যনির্বাক সমিতির নির্বাচন জনমতের অতিরিক্ত নয়, তার চেতনাংশ মাত্র। জীবনস্রোতে বিশ্বাস যথেষ্ট নয়। এতদিন ধরে ত' সেটা বইছে, তবু তার জোরে দৈনিক দুমুঠো অন্ন খড়কুটোর মতন গরীবের পেটে ভেসে আসছে না কেন? সেখানে যে চড়া! কেন সেটা ব্যাঙ্কের দিকেই অনবরত ছুটছে? সত্য কথা এই—মুখে বলছেন স্রোত, কিন্তু ভাবছেন বৃষ্টি, ভগবানের আশীর্বাদের মতন আকাশ থেকে ঝরছে, আর আমরা শুদ্ধস্নাত হচ্ছি। যদি এক জেলায় না পড়ল, বলবেন তার খামখেয়াল, অন্য জেলায় বেশি প'ড়ে যদি ভেসে গেল, তবু ভাবছেন তাঁরই লীলা। আপনি বল্লেন, মানুষকে অপমান করছি আমরা, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কারা করছে বলুন ত! মানুষকে গাছ-পালারও অধম ভাবছেন। তার বুদ্ধিকে, তার কর্মপ্রবৃত্তিকে, তার বাঁচবার চাহিদাকে, সমবেত চেষ্টায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে এতদিনে, এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এত রক্তপ্রবাহের ভেতর দিয়ে, সেই সভ্যতাকে, সব জিনিসকেই আপনার ঐ স্বতঃপ্রবৃত্ত জীবনশক্তি নাকচ করছে না কি? ঐ বস্তুটির প্রতি আস্থায় একটা দাম্ভিকতা আছে, যাকে পণ্ডিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আখ্যা দেন, কিন্তু যার স্বরূপ হল একটি মাত্র শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখার ধোঁকা। সেটার জন্ম ইংলণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যখন তার বোলবোলাও, সেটা বাড়ল ফ্রান্সে, যেখানে বারোটা ঘরোয়ানা সমগ্র দেশের উপর কায়েমি স্বত্ব দাখিল করছে। তার যৌবন দেখতে চান ত জার্মানী, ইটালিতে যান, তারাও জীবনস্রোতের দোহাই দিচ্ছে। তাই ফেবিয়ান বার্নার্ড শ' মুসোলিনীকে সমগ্র সভ্যতার শত্রু ভাবেন নি। দু'জনেই যে জীবনস্রোতে বিশ্বাসী! অনেক রাত হল না?'

খ: 'আপনি ক্লান্ত হয়েছেন, এইবার ওঠা যাক।'

সফীক খগেনবাবুকে ফ্ল্যাট পর্যন্ত পৌঁছে দিলে! ড্রয়িং রুমের আলো জ্বলছে, বিজন সোফার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে, বুকে একটা বই। নিজের ঘরের আলো জ্বাললেন, বিছানা পাতা, ছোট টেবিলে এক গ্লাস জল, ঢাকা নেই। রমলার ঘরের দরজা একটু ঠেলতেই শব্দ হল······বন্ধ। ফিরে এসে ড্রয়িং রুমের দরজায় খিল দিলেন। আলো নেভাবার পর নিজের ঘরে এসে একটা আরাম কেদারায় শুয়ে পড়লেন।

পার্টির প্রয়োজন স্বীকার করা তাঁর পক্ষে শক্ত। আশ্রমবাস তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়েছিল। নীচ কলহ, প্রাথমিক উদ্দেশ্য-ভ্রষ্টতা, যৌক্তিকতার বলিদান.

গুরুভক্তি, সংকীর্ণতা, সর্বোপরি পরিবর্তনবিমুখতা ও সমগ্র জাগতিক ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রাণপণ প্রয়াস তাকে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ করে ফেলছিল। পালিয়ে এসে তিনি বেঁচে গেছেন। তারপর রমলার সঙ্গে যোগ হল। দৈহিক সম্বন্ধে অশান্তির শেষ হবে আশা করেছিলেন। রমলার আশা ছিল ভিন্ন। সে চাইলে ফল, যার দেহ আছে, প্রাণ আছে, যাকে হাতে তোলা যায়, বুকে রাখা যায়, সাজান যায়, পুতুল খেলা যায়, যাকে কেন্দ্র করে সে স্বেচ্ছাকৃত বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে। তা হল না, অমনি গেল বিগড়ে। পারিবারিক জীবন দৈনিক যুদ্ধের ছোট ঘাঁটি, লোহা আর সিমেণ্টের পিল্‌বক্স। হুড়মুড় করে তার চারধারের কাঁটাতারের বেড়াজাল না ভাঙলে সেই ঘুণ্টি থেকে নতুন বিপত্তির সৃষ্টি হবে, বিপদ বাড়বে, কারণ, গুলি চলবে পিছন থেকে। না, আর দল নয়। অন্তত ও ধরনের নয়।

তবে যদি সচেতন ব্যক্তির সঙ্ঘ হয় তবে পৃথক কথা। কারা সচেতন? যারা অভিব্যক্তির ধারাটি বুঝেছে। অভিব্যক্তি জীবজগৎ থেকে আরম্ভ, সমাজের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। প্রথম দিকটায় না হয় জীবনস্রোতের খেলা, তারপর কিন্তু মানুষের নিজের প্রয়াসই বেশি। প্রয়াস মানে পরিশ্রম নয় কেবল, ভেবে-চিন্তে পরিশ্রম। চিন্তার বিষয়বস্তু থাকা চাই, নিরালম্ব চিন্তা মস্তিকের চঞ্চলতা। বিষয় হল সামাজিক বিবর্তনের রীতি আবিষ্কার। সেটা সম্ভব তখনই যখন বিবর্তনের প্রতিজ্ঞা মানুষের করায়ত্ত। প্রতিজ্ঞাটা হল বিরোধ। কিন্তু কার সঙ্গে কার? ওরা বলছে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর। অত কাটা-ছাঁটা বিভাগে প্রত্যয় আসে না। বিভাগ আছে, কিন্তু অস্পষ্ট। অবশ্য, স্পষ্ট হলেই সত্য হবে, এবং অস্পষ্ট হলেই সেটা মিথ্যা, এ ধরনের যুক্তি অচল। কবিতার যে-ভাব প্রকাশিত হয় সেটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অথচ যে কবিতা যত অস্পষ্ট ভাবকে গোচরে আনে সে-কবিতা তত ভাল, তার কবির তত বাহাদুরি। সচেতন পুরুষ এই হিসেবে আর্টিস্ট এবং বৈজ্ঞানিকও জানবার পদ্ধতিতে। গ্রহ-উপগ্রহের প্রকৃতি অবিদিত ছিল সেদিন পর্যন্ত, আজ তার ধাতু, তার ব্যবহার সবই প্রায় জানা গেছে। তা ছাড়া, চিন্তার উদ্দেশ্য আছে। আত্মোন্নতি……সেটার পরিমাণ নেই, প্রমাণ নেই, আত্মপ্রসন্নতা ছাড়া তাতে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে যে-চিন্তার উদ্দেশ্য সামাজিক বিবর্তনকে সাহায্যদান তার সাধনাই মঙ্গল। একার কাজ নয় কিন্তু। সমগোত্রের সহানুভূতি চাই। চৈতন্য যতই উন্নত হোক না কেন, একজন, দু'জন, তিনজন পুরুষের চৈতন্য অসম্পূর্ণ। এইখানে পার্টির আবশ্যকতা।

তবু কোথায় যেন খিচ্‌ লাগে। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সৎ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু উদ্দেশ্য উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। সফীকের কথাবার্তা শুনে মনে হয় যে সে উপায়ে মর্যাদা দেয় না, তার কাছে উপায় উদ্দেশ্যের অধীন। এটা অ-যৌক্তিক এইখানেই সন্দেহ হয় যে তার যুক্তি অবরোহী; সত্তাকে সে মূলাধার, সারাংশ ভাবে, তার ক্রমিক গতি, তার পরম্পরায়, তার প্রকাশে সে বিশ্বাসী নয়। অভিপ্রায় উদ্দেশ্য খুলবে উপায়ের সৌজন্যে। যে ব্যক্তি দুটোকে পৃথক রাখে সে নিষ্ঠুর হতে বাধ্য। সফীকের মধ্যে একটা জবরদস্তির ভাব আছে, তার সঙ্গে মিশেছে সিনিসিজম্‌, হতাশ আদর্শবাদ। তার ঔচিত্যজ্ঞান অ-বৈজ্ঞানিক, কারণ সেটার যুক্তি প্রণালী উদ্দেশ্যরূপ প্রতিজ্ঞা থেকে কর্মে আরোহণ করেছে না। সে বলবে, এইটাই বৈজ্ঞানিক, ঔচিত্যানৌচিত্যের একমাত্র কষ্টিপাথর বাইরের সামাজিক সংস্থান, যেটা ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধির সম্পর্করহিত, নৈরাত্ম্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য মানুষে যখন বিচার করে তখন তার ভয়-ভাবনা আশা-ভরসা বিচারের সঙ্গে মিশে যায় সেগুলি-বাদ দেওয়া হোক। কিন্তু বাদ দিলেই কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ হল! অবজেকটিভিটির চর্চাই বিজ্ঞানের সর্বস্ব নয়, তা ছাড়াও যুক্তিতর্কের অন্য বিশেষত্ব আছে। অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে না তুললে বিজ্ঞান নিরর্থক। অভিজ্ঞতা ছক কেটে চলছে সর্বদা, অতএব উদ্দেশ্যও স'রে যাচ্ছে। তাই যদি হয় তবে অমন গোঁড়ামি সম্ভব কিসের জোরে? অভিজ্ঞতাই মূল। অবশ্য সচেতন অভিজ্ঞতা। আবার সেই 'চেতনা' ঘুরে ফিরে এসে গোলমাল বাধায়।

তার চেয়ে তাকে ধুয়ে মুছে তাকের ওপর তুলে রাখাই মঙ্গল, তার মাথায় হাতুড়ি মেরে বিছানায় ঢাকা দিয়ে শুইয়ে রাখাই ভাল, কবর দেওয়ার আগে যেমন বিলেতী রাজোয়াড়াদের রাখা হয়, মাথায় জ্বলুক মোমবাতি, পায়ের কাছে দাঁড়াক সুসজ্জিত প্রহরী ঘাড় নিচু করে, তলোয়ারের ওপর ভর দিয়ে, ভোর বেলায় আসবেন রানী হাঁটু গেড়ে বসে বিছানায় মুখ বাড়াতে, রাজার হাতে চোখের জল ফেলতে। খগেনবাবুর হাতটা ছ্যাঁক করে উঠল। 'তুমি? কেন, কেন আবার এলে? এত কষ্টই বা কিসের? এই ত রয়েছি।'

চার

রমলা ভাবে দূরত্ব বেড়েই চলল। লেডি ডাক্তার বলেছিল নিয়মিত ওষুধ খেলে তার সাময়িক বন্ধ্যাত্ব ঘুচবে। এতদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে ওষুধ খেয়েছে, অথচ পরীক্ষা করবার সুযোগ মেলে নি। দম্ভের বশে পৃথক ঘরে রইল, কেন সে

মান খোয়াবে ? খগেনবাবুর জন্য সে কি কিছুই ত্যাগ করে নি, সুনাম, সামাজিক স্থান, সামান্য সুবিধা ? অথচ তার প্রতিদানে প্রভেদ কমল না, নতুন আগ্রহ, নতুন ভাবনা এসে জুটল, নতুন সঙ্গী হল, সফীক, বিজন তাকে 'ওস্তাদ' বলে ডাকে। বিজন, হাঁ, বিজন পর্যন্ত। যতদিন মাসীমার দাসত্ব ছিল, ততদিন তবু আশা ছিল। মেয়েতে মেয়েতে যুদ্ধ সম্ভব। মাসীমা কতটা দিয়েছেন—স্নেহ, মমতা, আশীর্বাদ, টাকা, আদর ? তার বেশি সে দিতে পারে, দিয়েছে, সঙ্গ, রূপ, যৌবন, বেশ রূপ না হয় নেই, যৌবন না হয় গেছে, তবু যা আছে তাতে, ওর না হয় লোভ নেই, অন্যের সুজনের হয়ত লোভ আছে। কিন্তু, স্ত্রী-পুরুষের যুদ্ধ অন্যায়। সফীক তাকে আপমান করলে কৈ ও ত প্রতিবাদ করলে না ! ওর কি উচিত ছিল না অন্যের সম্মুখে তার সম্মান রক্ষা করা ? সফীক কী এমন দেবে, তার দলের কাছে ও কী এমন পাবে, যাতে ক্ষতিপূরণ হয় ! ক্ষতিই বা কোথায় ! এমন কী টাকার দিক থেকেও নয়। তবু কেন এমন ঘটে ! কেনো সে বোঝে না তার কথা ! তার কী কোন দিকই নেই ! সব পুরুষই স্বার্থপর। ওদের উদ্দেশ্য কেবল নিজের কার্যসিদ্ধি, দেহের ক্ষুধা মেটান, আরাম পাওয়া আর গৌরব-বোধ, সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, পায়ে লুটচ্ছে, কাঁদছে, মরছে। মেয়েদেরও ওপর ঘৃণা আসে। তার চেয়ে দরজা বন্ধ থাক ···ডাকলে খিল খুলবে না, ডেকে ডেকে ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু দেহের শিরা-উপশিরায় ডাকবার সময় বিদ্যুৎ চমকায়, বুক গুরু গুরু করে, পা শির শিরিয়ে ওঠে, খানিক পরে দেহ অবশ হয়, চোখে অকারণে জল আসে। চিরটাকাল এই দৈহিক দৌর্বল্যে ও যন্ত্রণায় মেয়েদের ভুগতে হবে, কোনো অব্যাহতি নেই কি ! এই বাধ্যবাধকতার ওপর ভিত্তি করে সমাজ আর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। রাতে ডাকলে মুখে উত্তর না দিলেও দেহে সাড়া দেয়—এই আদিম, প্রাথমিক জৈব দুর্বলতাকে নিজেদের কাজে লাগান কী নীচ নয় ! মেয়েরা পারে না থাকতে, এইটাই পুরুষের শক্তি। ইচ্ছা হয়, সব মেয়েরা সমগ্র পুরুষ-জাতকে দুর্বল করে দিক, সেজে, লোভ দেখিয়ে, নির্লজ্জভাবে। ও বল্লে লক্ষ্মৌ স্টেশনে, 'দেহের উগ্র বিজ্ঞপ্তি'। কেন বিজ্ঞাপন হবে না ? মেয়েদের সম্মান নেই, রাগ হয় না ! যতদিন এই ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন মেয়েরা নিজেদের যার-তার হাতে সমর্পণ করুক, বেটাছেলেরা জব্দ হোক, তাদের দম্ভ টুটুক, সমাজ ভাঙুক, পারিবারিক সম্বন্ধ উচ্ছন্ন যাক্।

এক এক সময় আবার রমলার সন্দেহ হয় খগেনবাবু অন্য পুরুষ থেকে ভিন্ন। সে বুঝতে চায়, তার দরদ আছে, অন্তত ছিল। গেল কেন ? প্রথমে সন্ন্যাসী, তার পর বিজন, ঐ সফীক, ঐ বাইরের টানের জন্য। ও চায় না সংসারে

জড়াতে, ও চায় বাইরে থাকতে। তা হয় না। তাই যদি বাসনা ছিল তবে কেন কানপুরে আসা ? দুর্বল, দোলায় দুলছে, কচি খোকার মতন ঝুমঝুমি আর চুষিকাটি দিয়ে ভোলাতে হবে— তাই তার যোগ্য, তাই তার প্রাপ্য। ও চায় না সত্যি মানুষটাকে পেতে, ভুলতে পেলেই ও খুশী। বেশ, সেই ভাল। রমলা ঘর সাজাতে তৎপর হল, আবদার ধরলে সপ্তাহে এক সন্ধ্যা অন্তত সিনেমা যেতে হবে। বিজন এ কাজে সহায়তা করবে, তাই বিজনেরও চাহিদা বাড়ল রমলার কাছে।

লক্ষ্ণৌ, ফরাক্কাবাদ, জয়পুরের ছিট শহরে প্রচুর পাওয়া যায়, দামও সস্তা। কিন্তু ছিট দিয়ে চেয়ার কোচ টেবল ঢাকা যায় না, ঘরদোর যেন খালি শেমিজ পরে রয়েছে মনে হয়। তার চেয়ে বিলেতী কাপড়ে আভিজাত্য আছে। খদ্দর অচল। ভাড়াটে আসবাবে বসতে ঘেন্না করে, টাঁস ফিরিঙ্গীর এঁটো। বিজন নতুন স্বদেশী ডিজাইনের আসবাব দেখালে, দূর থেকে দেখতেই ভাল, কিন্তু বসা যায় না পা ঝুলিয়ে, পিঠে লাগে, অজন্তা আর মোগলাই-এর মিশ্রণে অসুবিধাই ফুটে ওঠে। তার চেয়ে বিলেতী আসবাবই ভাল, হোক তার গদির গরম তবু দেহের বাঁকগুলো মেনে চলে। বিজন বল্লে বুর্জোয়া রুচি। সেও অসহনীয়, ভারতীয় বুর্জোয়া রুচি নয় এই ভাগ্য। খগেনবাবুকে মধ্যস্থ মানাতে তিনি রমলার মতে সায় দিলেন।

রমলা দেশী ফিল্‌ম্ কিছুতেই দেখবে না। তার ভাববিলাস, তার মন্থর গতি, তার গান বাজনার অধিকার, তার দৈর্ঘ্য, তার গল্পাংশের দুর্বলতা, তার অনুকরণ, তার ফোটোগ্রাফি, কোনোটাই তার পছন্দসই নয়। মাত্র দু'তিনটে দেশী ফিল্‌ম তাকে দেখতে হয়েছে, আর দেখবার দুরাশা তার নেই। বিজন কিন্তু অতটা খারাপ বলে না, নতুন ছবিগুলো মন্দ হচ্ছে না, আদর্শবাদের একটা ছাপ পড়েছে, গানও মন্দ নয়, ফোটোগ্রাফি প্রায় নির্দোষ। তবে গল্প দুবল নিশ্চয়ই, কিন্তু উপায় কী ? সামাজিক সম্বন্ধকে অতিক্রম করা অসম্ভব কোনো আর্টের পক্ষেই। তবে ফিল্‌মের ভবিষ্যৎ আছে জনমতের পরিবর্তন সাধনের দিক থেকে। খগেন বাবু এক্ষেত্রেও রমলার সঙ্গে একমত। বিলেতী ছবির ভাববিলাস অন্য ধরনের। তার অন্তরে একটা সন্দেহ লুকিয়ে থাকেই থাকে। দেশী ফিল্‌ম্ অত্যন্ত নিশ্চিত, বালিগঞ্জের লেকের ধারে বেঞ্চিতে এণ্ডির পাঞ্জাবি পরা, কোঁচান চাদর ঝোলান সদরঅলার মতন, কেবল একশিরার জন্য যা একটু হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠে নেই।

ক্লাবের কথা উঠতে খগেনবাবু কেবল এইটুকু বল্লেন, 'না পার একলা থাকতে পরে দেখা যাবে। আগে লোকজনের সঙ্গে আলাপ হোক তার পর

ভাল দেখে একটা ক্লাবের সভ্য হলেই চলবে। এত তাড়া কিসের?' বিজন অবশ্য ইডিয়লজির দিক থেকে ক্লাব-টাল্‌বের বিরুদ্ধে, কিন্তু তাকে মধ্যে মধ্যে যেতেই হয়, টেনিস খেলতে। তা ছাড়া যারা কর্মক্ষেত্রে নামছে না তাদের পক্ষে সময় কাটান দুঃসহ। অবশ্য, আজকালকার ক্লাবে এমন দু'একজন লোকের সন্ধান মেলে যারা ব্রীজ খেলা আর গাল-গল্প করাকে জীবনের সাফল্য ভাবে না। তাদের অনেকেই বেশ পড়াশুনো করেছে; বিলেতী সংগীতে দখল রাখে, আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তাল রেখে চলে, প্রায়ই মার্কসিস্ট, বেচারিরা কোথাও কথা কইতে পায় না, তাই সন্ধ্যায় ক্লাবে আসে। তবে ব্যাপারটা বুর্জোয়া এটা ঠিক। মোটর নেই অথচ ক্লাবে যাব, এটা অসম্ভব।

খগেনবাবু রমলার পরিবর্তনে খুশীই হলেন। দুজনে যখন একত্র বসবাস করতেই হচ্ছে, তখন সহজে আদান-প্রদান ভিন্ন গতি নেই। রমলা না এলেই পারত। এমন ত কত দৃষ্টান্ত হিন্দু-সমাজেই রয়েছে যেখানে দু'জনে পরস্পরকে আন্তরিকভাবে চাইছে, অথচ মিলন অসম্ভব জেনে আপন আপন নিয়তিকে গ্রাহ্য করে নিয়েছে। ছেলেপুলেও হচ্ছে, ভাবও থাকছে। অবশ্য মন ব্যাকুল হয়, কিন্তু নিরুপায়, তাই সম্বরণই রীতি, সংযমই নীতি। খগেনবাবু নিজেও এই বিপুলা পৃথ্বীর কোন অজানা দেশে প্রবাসী হলেই পারতেন, বিদেশ যাবারও দরকার হত না, লাইব্রেরীর মধ্যে বইএর ওপর মুখ গুঁজড়ে থাকলেই চলত. কোনে একটা নরম চেয়ার, পাশে একটা ছোট টেবল, হাতলের ওপর লিখবার তক্তা, আর একটা ভাল চাকর, যে কফি আর পাইপ সাফ্ করতে জানে, আর তাক থেকে বই এনে দিতে পারে। সে জীবনটা মন্দ ছিল না, কিন্তু প্রতীতি জন্মাল যে বহির্মু'খিনতায়, কর্মপ্রবাহে দ্বন্দ্বের অবসান আসবে। এইটাই জড়বাদের জয়, অশান্তির ক্ষয়, তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়। দেহের চর্চায় যে সহজ আনন্দ জন্মায় তার মূল্য এই বিচ্ছিন্ন জগতে কম নয়। যখন হিন্দু সভ্যতা জোরাল ছিল তখন জড়বাদ হেয় হয় নি, তখন কামশাস্ত্রে চৌষট্টি কলার প্রত্যেকটির কদর ছিল, খোঁপা বাঁধারই বা কত ঢঙ, গন্ধ-মাত্রারই বা কত রকম, মালাই বা কত রঙ-বেরঙ ফুলের, তা ছাড়া, গান বাজনা নাচ, মায়, পান সাজা পর্যন্ত। দেহের প্রতি অঙ্গের পরিশীলনে যেটা ফুটে উঠবে সেটা হবে দেহাতীত, এই ছিল উদ্দেশ্য। জড়, বস্তু, তথ্যই প্রথম, প্রথম হলেই সর্বস্বতা আর থাকে না, ব্যাপারটা গৌণ হয়ে ওঠে। নচেৎ তাকে অবহেলা করলেই সেটা উঁকি মারবে, অজানিতে সব কৃষ্টিকে টেড়া করে দেবে, ফলে কাঁটার জন্ম, ফুল নয়, ফলও নয়। অতএব রমলার স্ত্রীত্বটাই তার সঙ্গে সম্পর্কের আদিম প্রতিজ্ঞা। তার ওপর খগেন বাবুর ব্যবহার যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন

খগেন বাবু অন্য কাজে মন দিতে পারলেন।

ইতিমধ্যে কানপুরের ঘটনাবর্তের চাঞ্চল্য তাঁকে স্পর্শ করেছে। গুমোট ঘরে পাখার ঝড় ছাপিয়ে ঝির ঝিরে মৃদু মন্দ হাওয়া এল। লক-আউট আর হরতালে এখন কোনো প্রভেদ নেই। হরতাল ক্রমেই বেড়ে চলেছে, প্রথমে মজুর সংখ্যার শতকরা বার জন হরতালি ছিল, এখন কুড়ি। কাগজে লিখছে, অনুপাতটা যৎসামান্য, অতএব আন্দোলনটা আংশিক ও জনকয়েক বাইরের লোকের, যাদের কাজকর্ম নেই, যারা সম্ভবত কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের টাকা খেয়েছে, যারা ভারতীয় সংস্কৃতি, অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ ও মজুর-কিষাণদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক, ভদ্রতা, এমন কি ধর্ম পর্যন্তকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত, যারা জাতীয়তার পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন না বুঝে একটা কাল্পনিক শ্রেণীর স্বার্থ ও তারই বিশ্বজনীনতাকে শ্রেয় ভাবে, তাদেরই কারসাজি মাত্র। খগেনবাবুর বুদ্ধি ঐ সব যুক্তি গ্রহণ করল না, মন বিরক্ত হল তার অসারত্বে। দৈনিক কাগজ তিনি নিয়মিত কখনও পড়তেন না, পড়লেও ব্যস্ত হতেন না। এখন সকালে অন্তত তিনখানি দৈনিক চায়ের টেবলে থাকবে হুকুম দিলেন। তারপর কাটিং রাখার পালা, বেলা ৯টা পর্যন্ত সংবাদ সংগ্রহেই যায়।

ঐ সব কাগজের টুকরো নিয়ে প্রত্যেক দিনই তিনি বিজনদের আড্ডায় যেতেন। সফীকের সঙ্গে আলোচনা হত। অনেকেই আসত, তার মধ্যে করিমকে বিশেষ ভাল লাগল। জীবনে তিনি ঐ ধরনের লোকের সঙ্গে মেশেন নি, তথাকথিত বড়লোকের সঙ্গ তিনি চর্চা করেননি অবশ্য, কিন্তু বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাদের দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন তারা কেউই অন্নকষ্টে ভোগেনি। শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের প্রতিবেশই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই সর্বপ্রথম অশিক্ষিত ও গীরবদের মধ্যে বুদ্ধি ও তেজের নিদর্শন তিনি পেলেন। বরাবর তিনি এই ভেবেছেন যে শিক্ষার অভাবেই দেশ স্বাধীন হবে না, অতএব জনগণের মধ্যে শিক্ষার যত বিস্তার হয় ততই মঙ্গল। উচ্চশিক্ষা না হলেও চলবে, কিন্তু অন্তত পক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত, বি· এ· ডিগ্রী হলেই ভাল। অর্থাৎ মনটা সজাগ না হলে স্বরাজ-সাধনা স্বপ্নবিলাস।

করিমকে দেখে সজাগ রাখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে! প্রথম উদ্দেশ্য যদি স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতা হয়, তবে করিমের অ-শিক্ষাই যথেষ্ট। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, তার অতিরিক্ত সমাজের স্বার্থ, অর্থাৎ মঙ্গল। করিম অবশ্য সমগ্র সমাজের কল্যাণ কামনা ও কল্পনা করতে অসমর্থ, কিন্তু মনে হয় যে-ধরনের মঙ্গল সে চাইছে সেটা অধিকতর পরিব্যাপ্তির প্রতিকূল মোটেই নয়, বরঞ্চ অনুকূলই সে ভাবছে। এটা ঠিক, করিমের দলবল এখনকার ওপর স্তরের লোকজনকে

সে-ভাবে দেখবে না, যে রকম বড়লোকেরা এখন গরীবদের দেখবে। কারণ সোজা, তখন ব্যবসায় মুনাফার হারবৃদ্ধির তাড়না থাকবে না। তবে করিমের চেতনায় ভবিষ্যৎ সমাজের ছবি স্পষ্ট নয়। অবার সেই চেতনার কথা ঘুরে ফিরে আসে। সেটা বুদ্ধি নয়, শিক্ষার্জিত ফল নয়, জ্ঞানও বলা চলে না তাকে। খগেনবাবু তার কোনো সংজ্ঞাই দিতে পারেন না।

সফীককে জিজ্ঞাসা করতে হবে। সে কূটতর্ক এড়িয়ে চলে, কিন্তু অক্ষমতার দরুণ নয় বেশ বোঝা যায়। অবান্তর ব'লে না, অনেক গোড়ার কথা কইতে হয় তাতে শক্তির অপচয় ঘটে, সেটা সে চায় না, এই জন্য? মৌনতায় শক্তি বাড়ুক আর নাই বাড়ুক শক্তি ক্ষয় হয় না নিশ্চয়। ভাওয়ালীর নির্দেশও হতে পারে। ভাওয়ালীর নামে প্রাণে আতঙ্ক জাগে। যারা নতুন সমাজ গড়তে যাচ্ছে কোথায় তাদের প্রাণের প্রাচুর্য থাকবে, পরিবর্তে তাদেরই মধ্যে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ বেশি। প্রকৃতির কী ক্রুর পরিহাস? তারই প্রত্যুত্তরে কি সফীকের ঠোঁট বাঁকা? প্রকৃতির না প্রতিষ্ঠানের? যক্ষ্মা সামাজিক ব্যধি; দারিদ্র্যের রোগ; হয়ত সাম্যবাদ যক্ষ্মারোগীর সর্বজনবিদিত আশাসর্বস্বতা, বাঁচবার ব্যাকুলতা। তবু, রমলা কেন অসভ্যতা করলে! ইতিপূর্বে টেবলে সে কখনও অভদ্র হয় নি। আশ্চর্য লাগে। জিজ্ঞাসা করলে সেও কারণ বলতে পারবে না, কিংবা বলবে না, সফীকেরই মতন নীরব থেকে ব্যবহারকেই চরম পরিচয়ের বিষয়; সেইটাই মানব সম্বন্ধের একমাত্র যোগ, এবং তার অতিরিক্ত জ্ঞানের অপ্রয়োজনীয়তাই প্রতিপন্ন করবে। চারধারেই দরজা বন্ধ, দেওয়ালে মাথা ঠোকে, সর্বত্রই জড়। তবে কি চেতনা কোথাও নেই, কোন ছিদ্র দিয়ে বহির্গত হয়ে মানুষ মানুষকে বোঝে, কবি স্বল্পবাক্যে অশরীরী ভাবকে মূর্তি দেয়, বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির পদ্ধতি উদ্‌ঘাটন করে, একজন আরেকজনকে ভালবাসে? ব্যবহারটাই যথেষ্ট মানা অসম্ভব—আচরণের অনুরণন রয়েছে, উদারা মুদারা তারা পৃথক নয়, একত্রে বাজে, রেশ বাদ দিয়ে সুর নেই। আচরণ চৈতন্যের আশ্রিত, চৈতন্যের কাছে লোকে স্পষ্ট অর্থ প্রত্যাশা করে। পায় না, কারণ আচরণে অনেকখানি জড় মেশান রয়েছে—বিশেষত মেয়েদের। রমলা বুদ্ধিমতী নিশ্চয়, কিন্তু ব্যবহারে অনিশ্চিত। কোন দিকে বেড়াল লাফাবে কে জানে? যদিও পড়বে শেষে সেই থাবারই ওপর, মাটির পরে। মেয়েদের মধ্যে মার্জার অংশই বেশি! সফীক জড়বাদী তবু তার ব্যবহারে জড়ত্ব নেই। রমলারই মতন ব্যবহার-সর্বস্ব, তবু সে সুনিশ্চিত। চৈতন্যের সঙ্গে জড়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য— আগে বীজ না আগে ফল এ তর্ক বিফল—যে জানে অচ্ছেদ্য সেই সহজ, যে ভাবে পৃথক সে লজ্জা পায়, তাই সে অনিশ্চিত, খামখেয়ালি।

প্রথম প্রথম খগেনবাবুর আর সফীকের মধ্যে যে আড়ষ্ট ভাব ছিল সেটা ঘুচে গেল একটা কাজের মারফতে। সফীক খগেনবাবুকে অনুরোধ করলে যে, যদি তাঁর সময় থাকে তবে মন্ত্রীপক্ষের জন্য একটা নোট লিখতে হবে। বিষয়টি হল এই—মালিকদের এমন কোনো অধিকার আছে কি না যাতে তারা মজুরদের তাড়াতে পারে। খগেনবাবু রাজি হলেন। অনেক রাত পর্যন্ত খেটে তিনি একটা খসড়া তৈরি করলেন। খগেনবাবুর মতে কোনো অধিকারই নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব, কিংবা অবাস্তব ও জন্মগত নয়, অধিকার থাকলেই কর্তব্য থাকবে। অধিকার ও কর্তব্য দুয়ে মিলে আইনের চুক্তি। অন্য দেশের মজুর-সভার সঙ্গে মালিকদের বোঝাপড়া থাকে যাতে মজুরির শর্ত নির্দ্ধারিত হয়, সেই বোঝাপড়া সরকার স্বীকার করে নেয়। এ ক্ষেত্রে মজুর-সভাকেই অগ্রাহ্য করা হচ্ছে, অতএব বোঝাপড়া, অঙ্গীকার, স্বীকারের কথাই আসে না। তবে অন্য দিকে বলা চলে প্রভু-ভৃত্যের আইনসম্মত সম্বন্ধে বরখাস্ত করবার ক্ষমতা মালিকদের ওপর ন্যস্ত হলেও সুনির্দিষ্ট কারণের অবর্তমানে চাকরি থেকে তাড়ানতে ক্ষতিপূরণের দাবি জন্মায়। কিন্তু কারণ দেখান মালিকের পক্ষে যেমন সোজা, অ-প্রমাণ তেমনই মজুরদের পক্ষে কঠিন, কারণ, ব্যয়সাধ্য। অতএব, 'কলেক্‌টিভ বার্গেনিং'-এর অধিকার অর্জন না হওয়া পর্যন্ত মালিকরাই সর্বেসর্বা।

সফীক নোটটি পড়ে বল্লে এটা মন্ত্রীপক্ষের হাতে দেওয়া চলে না। খগেনবাবু একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিলেন, 'এখনকার ব্যবস্থা যা তার অতিরিক্ত লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

স: 'তা ঠিক। কি ভাবে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটবে সে সম্বন্ধে ধারণার অভাবে এর বেশি বলাও যায় না।'

খ: 'বরখাস্তের অধিকার নিয়ে বিবাদ এখন সমীচীন নয়। আমার মতে কলেক্‌টিভ বার্গেনিং-এর ওপরই আপনারা জোর দিন।'

করিম বল্লে: 'সেটা পরে আনবে, আগে মজদুর-সভা যে কানপুর শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি এটাই ওদের স্বীকার করান চাই। অবশ্য বাবু যা বলছেন সেটাই দরকারি।'

খগেনবাবু উৎসাহের সঙ্গে করিমের বক্তব্য সমর্থন করলেন। সফীকের রূঢ়তায় মনটা ভারী হয়েছিল, এখন লঘু হল।

করিম বল্লে: 'বাবু সাহেব, সবচেয়ে কম মজুরি, যার কম দিলে কর্তাদের জরিমানা হয় শুনেছি, সে বিষয় কেতাবে কি বলে? অন্য দেশে ঐ রকম কানুন আছে শুনেছি, এখানে হবে না কেন?'

বিজন: 'ওরা বলছে মাত্র একটা শহরে, একটা প্রদেশে ঐ আইন চালান

দুষ্কর, কোথাও এমনতর হয় নি।'

খ: 'কাগজে দেখলাম বটে। ওদের মতে, নিম্নতম পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করতে পারে একমাত্র কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র, কাজটা প্রাদেশিক সরকারের নয়, কারণ প্রাদেশিক হার কম-বেশি হলে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে শ্রমিকরা চলে যাবে।'

স: 'মূলধনও ভাগবে ভয় দেখিয়েছেন।'

বি: 'এর জবাব কি, ওস্তাদ?'

সফীক আর করিম, উভয়েই খগেনবাবুর দিকে চাইলে। খগেনবাবু বল্লেন যে তিনি ব্যাপারটি বিশদ করে বুঝবেন প্রথমে, তারপর নোট যদি দরকার হয়, তবে একটা লিখে দেবেন।

পরের দিন একজন কর্মীর সঙ্গে খগেনবাবু লাইব্রেরী ঘেঁটে বেড়ালেন। যা বই ও রিপোর্ট পাওয়া যায় সেগুলি পুরনো, তাতে কাজ চলে না। মজদুর সভার বাড়িতে ও বালাই নেই, খানাতল্লাসির ভয়ে এবং অর্থাভাবে। শহরে অনেক কলেজ আছে, তারা নাকি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে চায় আবার! মজুর-সমস্যা সংক্রান্ত পাঠের কোনো বন্দোবস্ত নেই। যা পাওয়া গেল তাই পড়ে খগেনবাবু আড্ডায় গেলেন। ইংরেজীতে বল্লেন সফীককে যে কর্তৃপক্ষদের আপত্তি টেঁকে না। কানাডায় প্রথমে প্রদেশে প্রদেশে, এমন কি আরো ছোটো ছোটো জায়গায়, রিজানে, সর্বাগ্রে নিম্নতম মজুরির হার ঠিক হয়েছে, পরে কেন্দ্রীয় সরকার সামান্য অদল বদল করে সেই বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছে। সফীক খগেনবাবুর কাছ থেকে ছোট একটি নোট লিখিয়ে সেটা তখনই উধামজীর কাছে পাঠালে। খগেনবাবু জানতে চাইলেন, যদিই বা যুক্তপ্রদেশে নিম্নতম হার ঠিক হয়, তবে ভিন্ন প্রদেশে মজুরির হার কমবে না বাড়বে?

সফীক: 'কমত— বাড়ত, যদি প্রবাসী হবার মোহ থাকত লোকের। তারা ঘরের কোনেই জন্মাবে ও মরবে। হার কতটা তারই ওপর নির্ভর করছে। যদি উঁচু হয়, তবে গ্রামে যাদের জমি নেই তারা কানপুর আসবে। কোলকাতা বোম্বাই, শোলাপুর, আমেদাবাদের গড়পড়তা মজুরির চেয়ে এ-অঞ্চলে নিম্নতম মজুরি কিছুতেই যখন বেশি হচ্ছে না তখন ও-অঞ্চলের ক্ষতি হবে না। সেইখানেই এই প্রদেশের মজুর বেশি গিয়েছে। অতএব ক্ষতি কিছুতেই কারুর অর্শাবে না। এখানকার হার যদি সত্যই বেশি হয়, তবে কানপুর লোক আকর্ষণ করবে, সেটা লাভ, কারণ···'

খ: 'ক্ষতি হবে মালিকদের, তারা কি মজুরির অতিরিক্ত ভারে নুয়ে পড়বে না? কিছুদিন পরে তারা অন্যত্র মিল খুলবে, যেখানে ঐ সব ঝঞ্ঝাট নেই।'

স: 'মিথ্যে কথা! তাদের লাভের হার দেখেছেন? যতদিন শ্রমিক আন্দোলন চলেছে ততদিনে তাদের উৎপাদন বেড়েছে, কমেনি। কেবল তাই নয় এরই মধ্যে ক'টা নতুন কোম্পানি ও কল খোলা হয়েছে জানেন? গোলমালের হাত থেকে রেহাই পেতে যদি অন্যত্র, আশপাশের রিয়াসতে ফ্যাক্টরি খোলা হয় তবে সেখানকার লাভ, সেখানকার ফিউডালিজম্ শীগ্গির ধূলিসাৎ হবে। খাল কেটে কুমীর ঢোকানটা ভারী মজার! বোম্বাই থেকে স্যাসুনের মিলগুলো উঠে গেল, না খেতে পেয়ে পুঁজিদাররা মরে যাচ্ছে? টাকা সেখানে মাটিতে পোঁতা রয়েছে?'

বিজন বল্লে, 'তা ছাড়া মজুরি বাড়লে কর্মক্ষমতাও বাড়ে। সেই দিক থেকেও ওঁদের লাভ।'

বাড়ি ফিরে খগেনবাবু স্নানের কামরায় গেলেন। গুখনো গরমে নেয়ে সুখ নেই, তখনই তেষ্টা পায়। রাস্তায় ধুলো আর কয়লা, সফীকদের ঘর খুব নোংরা নয়, তবু তার অপরিচ্ছন্নতা খারাপ লাগে। পুরুষের চেষ্টায় ঘর দোর পরিষ্কার সহজেই রাখা যায়, তবে ছেলে-ছোকরাদের ওদিকে খেয়াল থাকে না। রমলার নজর অবশ্য একটু বেশি, চাকর খাটায় সাবিত্রীর চেয়ে কিন্তু সাবিত্রীর গিন্নীপনায় আপত্তি জমত, রমলার প্রভুত্ব সহজ। চাকর-বাকরে বেশ বুঝে নেয় কোথায় ও কতখানি অবাধ্যতা চলবে। কারণ, গোটা মানুষের ব্যবহারে ফাঁক থাকে না যার ভেতর দিয়ে অবাধ্যতার আগাছা ফুঁড়ে বেরুতে পারে। কম মেয়েরাই আস্ত জীব। রমলার ব্যবহারে পূর্বে একটা সামঞ্জস্য ছিল, কোথায় যেন চিড় খেয়েছে, নইলে সাবানের বাক্সে জল থাকে? এই ধরনের ঢিলেমি তিনি পূর্বে কখনও লক্ষ করেন নি। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। লোকে ভাবে সামান্য জিনিস এগুলো, কিন্তু ভেবে দেখলে এই খুঁটিনাটি গাফিলতিতে অযত্ন ধরা পড়ে, চরিত্রের দুর্বলতা, মনোভাবের পরিবর্তন প্রকাশ পায়। বিশেষত যখন নিজের সাজসজ্জায় ত্রুটি নেই, ক্রমেই সেটা উগ্র হয়ে উঠেছে।

রমলা আর বিজন টেবলে অপেক্ষা করেছিল। খগেনবাবু বসে গেলেন। বয় স্যুপের প্লেট নিয়ে যাবার পর আড়ষ্টতা ভাঙ্গল। বিজন কাঁটা ঠুকতে ঠুকতে বল্লে, 'উনি নাকি চাকরি করবেন!' খগেনবাবুর মুখে কোনো ভাবের চিহ্ন ফুটল না দেখে বিজন নিজেই মন্তব্য করলে, 'চাকরি অমনি কথার কথা আর কি! তার চেয়ে মজুরপল্লিতে ছেলেমেয়েদের পড়ান ভাল! কি বলেন, খগেনবাবু?'

খ: 'আমি কি বলব! ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।'

র : 'তোমাদের উদূ' আমি জানি না।'

খ : 'পাড়াও অত্যন্ত নোংরা।'

র : 'এখানে বাঙালী মেয়েদের স্কুল নেই ?'

বি : 'আছে, খুব ভাল স্কুল। কিন্তু দশটা চারটে, মনে থাকে যেন, পারবে ? তা ছাড়া একটা বড় কথা আছে···সাধারণভাবে বলছি।'

খ : 'বলই না! বড় কথাই ত' শুনতে চাই।'

বি : 'ঠাট্টা ছাড়ুন ; সব বাঙালী অ-বাঙালী, মেম মাস্টারনীদের দেখলে দুঃখ হয়। যেন খেতে পায় নি কতদিন, চোখের কোল বসা, কণ্ঠার হাড় বেরিয়েছে, হাতের চুড়ি ঢলঢলে, যেন জোর করে ঘরোয়া সাজ পরেছে। অথচ একটু নজর দিয়ে দেখুন, সব যেন ওত পেতে বসে আছে, বিয়ের বেনারসী পরবার জন্য। আমি জানি ব্যাপারটা কি!'

র : 'খুব খাটিয়ে নেয় বুঝি ? শুনেছি সকলকেই প্রায় বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয় ?'

বি : 'তা, খাটুনি আছে বৈ কি! স্কুলের সেক্রেটারি, সমিতির সভ্য, বড়লোক অভিভাবকদের বাড়ি ধন্নাটাও বাদ যায় না! তবে, টাকা ? 'সেত মজুররাও পাঠায় বাহাদুরিটা কোথায় ?'

র : 'কষ্ট আর অপমান দুই-ই বেশি লাগে তাদের। ভদ্রঘরের মেয়ে সকলেই।'

বি : 'ওটা মস্ত ভুল রমাদি। ভদ্রঘরের মেয়েদেরই অপমান কম লাগে। একবার মজুর-গিন্নিদের দেখো, এক একটি যেন রায়-বাঘিনী! কথায় কথায় স্বামী ত্যাগ!' বলেই বিজন অপ্রস্তুতে পড়ল। কথা ঘোরাবার জন্য খগেন-বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে—'আপনি মেয়েদের রোজগার করা পছন্দ করেন ?'

খ : 'আমার পছন্দ-অপছন্দে কী আসে যায় ? সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে সব শ্রেণীর মেয়েদের খেটে ঘরে টাকা আনা দরকার।'

বিঃ 'আলাদা তহবিল থাকলে আত্মসম্মান বজায় থাকে।'

খ : 'কেবল তবিল নয়, রোজগার। স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, ওটা প্রারব্ধ নয়। রোজগারিতে কেবল আত্মসম্মানটাই একমাত্র লাভ নয়।'

বি : 'তা ঠিক, ঝগড়াঝাঁটি থেকে পরিত্রাণটাও মস্ত জিনিস।'

র : 'তাতে অত ভয় কেন ?'

বি : 'মেয়েদের ও-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় যত না দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।'

খ : 'সেটা সত্যকারের বিরোধ নয়।'

বি : 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। ওরা শ্রেণী নয় খগেনবাবু, ওরা ভিন্ন জাতি!'

র : 'বিজন তোমার জ্ঞান খুব এগিয়েছে দেখছি। কোথা থেকে শিখলে এত ?'

খ : 'যতটা পৃথক থাকলে জ্ঞানবৃদ্ধির সুবিধা হয়, ততটা দূরত্ব বিজন বজায় রেখেছে কি না, তাই !'

বি : 'যা বলতে ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু রমাদির মতন মেয়ে ও পারবে না। ঐ ভিন্ন জাতের জন্য, দেখবেন তখন। ওঁর মধ্যে যে বিরোধের বীজ আছে তাতে ফল ধরে না, ধরলেও সেই মাকাল ! ফল ধরে কেবল শ্রেণী সংঘর্ষে।' রমলার চিবুক দৃঢ় হল।

খগেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমঝোতার বিষয়ে বিজন তোমার মত কি ?'

বি : 'ওটা হবে না আমার বিশ্বাস। তাড়িয়ে দেবার অধিকার মালিকরা কখনও ছাড়ে ! অধিকার জন্মগত নয়, যাদের ভবিষ্যৎ আছে তাদেরই শক্তির জোরে অধিকার আছে, অন্যদের অধিকার স্বার্থরক্ষা। অবশ্য ওস্তাদ ভাবে, অধিকার নিয়ে লড়াই করা বৃথা।' রমলা ঠোঁট বেঁকিয়ে বল্লে, 'তবে ত দেখছি ওস্তাদের মত অগ্রাহ্য করবার সামর্থ্য ধর !'

বি : 'নিশ্চয়ই, কেন ধরব না ? ওদের অধিকার থাকলে আমারও আছে খেটে খাবার। দুই অধিকারে লড়াই হোক !'

খ : 'দুঃখ এই বিজন প্রথমটার স্বীকার সরকারের পক্ষে সোজা, দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে সকলেই অজ্ঞান।'

বি : 'আমাদের মন্ত্রীপক্ষে এমন লোক আছেন যাঁরা অজ্ঞান নন, তাঁদের আমরা খবর দিয়েছি। তাঁরা এসে পড়লে যাই বোঝাপড়া হোক না কেন আমাদের লাভ বই ক্ষতি হবে না।'

খ : 'সুখবর দিলে বিজন। একটা নিষ্পত্তি হলে রমাদি তোমাকে আরো কাছে পাবেন।'

বি : 'তা আর পাচ্ছেন না। অনেক কাজ থাকে যেগুলো বাহাদুরির নয়, তবু না হলে সব কেঁচে যায়। যেমন ধরুন পাড়ায় পাড়ায় ফাটকে ফাটকে বক্তৃতা, রাত্রে মজুরদের ছেলে পড়ান, রিপোর্টের মালমশলা যোগাড়। ওস্তাদ আপনার নোটের তারিফ করছিল। এই ত চাই ! এত লেখা-পড়া শিখলেন, পুঁজি নিয়ে কি হবে ? নেমে পড়ুন, বেড়ার ওপর আলগোছে চিরকাল বসে থাকা অচল। বিলেতে অনেক দৃষ্টান্ত আছে, দিগ্‌গজ পণ্ডিত এধারে, অথচ শ্রমিকদলের সভা, পার্টির কাজও করছে। আপনি ভাবছেন স্বাধীনতা যাবে, নয় ?'

খ : 'অনেকটা ঠিক।'

বি: 'অনেকটা নয়, পুরোপুরি। আমাদের দেশের পণ্ডিতরা ঐ ছুতো তোলেন। কিন্তু স্বাধীনতা কোথায় ও কতটুকু? বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি!'

খ: 'সেটা চিন্তারই গলদ। ভয় ভাবনার খাদ সর্বদাই মিশে রয়েছে, সেটা যখন যাবে তখন…'

বি: 'তখন খাঁটি সোনাটুকু পড়ে থাকবে, এই বলছেন ত! বেশ, মানলুম যে ভাবের মিশ্রণ সর্বদাই থাকে। কিন্তু ভাবগুলো কোত্থেকে উঠছে? আপনার শ্রেণীস্বার্থ থেকেই। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্তে তাদের অজানিতে বর্তমান বন্দোবস্তের সমর্থন নেই? দোষ দিচ্ছি না কারণ এই সংস্থানের কৃপাতেই তাঁরা খাচ্ছেন দাচ্ছেন। বুদ্ধির দিক থেকে এটা বিশুদ্ধ? বড় বড় অর্থনীতির অধ্যাপক প্ল্যানিং-এ বিশ্বাসী নন কেন? কারণ সোজা। প্ল্যানিং হলে তাঁদের হাতে কলমের জায়গায় কাস্তে হাতুড়ি আসবে, খাটতে হবে বেশি, আধিপত্য, খাতির সব যাবে ক'মে। ভিকটোরীয়ান যুগে এক স্ত্রীই ছিল ফ্যাশান, অমনি পণ্ডিতরা খুঁজে পেতে দিলেন যে অসভ্য জাতি, এমন কি পশুপক্ষীদের মধ্যেও বহু বিবাহ কখনও কোথাও প্রচলিত নেই, এমন কি এক স্ত্রী-এক স্বামীর সম্বন্ধটি জীবতত্ত্বের প্রাথমিক প্রবৃত্তি। আচ্ছা, আচ্ছা, আমার দৃষ্টান্ত না হয় ভুলই। স্বাধীন চিন্তা কাদের পক্ষে সম্ভব? যারা ভাল স্কুল কলেজে পড়েছে, বই কিনতে পেরেছে। কারা তারা? যাদের বাপের পয়সা আছে। কিন্তু যারা পড়তে পারেনি, স্কুলের খাতা পেনসিল কেনবার যাদের সামর্থ্য নেই, আর বই কেনা যাদের স্বপ্নাতীত, যাদের চাকরি নেই, থাকলেও মাসিক বিশ টাকা, চারধারে বুভুক্ষু আত্মীয়স্বজন, তাদের চিন্তা নেই, সুযোগ নেই, অতএব স্বাধীনতার তাগিদই নেই। আপনি কি তাদের বাদ দিচ্ছেন সমাজ থেকে? তাদেরই যে সংখ্যা বেশি, খগেনবাবু! ধরলাম যে তারা প্রত্যেকে বড় কবি হবে না, তবু চারধারের স্ট্যাণ্ডার্ড উঁচু না হলে আপনার চিন্তার স্তরই যে নেমে যাবে! কি রকম জানেন? যেন চারপাশে ঠেলা চাই তবে আপনারা দাঁড়াতে পারবেন, সার্থক হবেন। মাপ করবেন, খগেনবাবু, আমি সুজনদার মত বই পড়িনি, ছেলেবেলা টেনিস খেলেছি, মোটর চড়েছি, রমাদির আদর খেয়েছি, কিন্তু কানপুর আমাকে নতুন করেছে, ভেঙ্গে-চুরে গড়েছে। ভাবি, আজ যদি ওস্তাদের সঙ্গ না পেতাম, তবে সাউথ ক্লাবের সভ্য হয়েই জীবনটা কাটত। রমাদি, তোমার কাছে আসা কতদূর নিরাপদ জানি না।'

রমলা এতক্ষণ যেন অন্যমনস্ক ছিল। বিজনের শেষ কথাগুলিতে তার চমক ভাঙল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বিজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ার থেকে উঠে নিজের ঘরের দিকে গেলে। যাবার সময় স্বপ্নাবিষ্টের মতন উচ্চারণ

করলে, 'বেশ এস না।'

'রাগ হল, রমাদি!'

রমলা ম্লান হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অন্ধকারে কী একটা শব্দ হল, চেয়ারটা বোধহয় উল্টে গেছে, বিজন ছুটে ঘরের মধ্যে যাচ্ছিল, পর্দায় রমলার সঙ্গে ধাক্কা খেলে।

খ: 'কি পড়ল?'

র: 'কিছু না। বসো, বিজন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।' রমলা দাঁড়িয়ে রইল, বিজন বসল।

র: 'শুনলাম তোমার কথাবার্তা। অথচ তুমি স্টেশনে সেদিন বল্লে, ভালই করেছি। কোনটা ঠিক? আমার সঙ্গতে যদি ক্ষতিই হয়, তবে আমাকে ত্যাগ কোরো। তোমার ওস্তাদ আছে, তাই তুমি পারবে। তোমারও কি ঐ মত? আমাকে তোমরা দুজনে অপমান করছ কেন? আমার দ্বারা যদি সবই অসম্ভব তবে কেন কানপুর এলাম?'

খ: 'রমলা, তুমি শোওগে যাও।'

র: 'যাব না, বলতে হবে। কি করেচি আমি যাতে বিজন প্রমাণ পেলে যে আমি···ঐ রকম?'

বি: 'আমি কিছুই বলিনি, রমাদি। সাধারণভাবে কথা হচ্ছিল, তুমি সামনে ছিলে, তাই তোমার নামটা জুড়ে দিলাম।'

র: 'আমার সঙ্গ বিপজ্জনক কেন?'

বি: 'মোটেই নয়, ঠাট্টা বোঝনা তুমি। মেয়েমানুষ পয়লা নম্বরের। আচ্ছা, আমি এখন যাই। সারাদিন ঘুরেছ, বিশ্রাম নাওগে যাও। কাল যদি সময় পাই আসব।'

র: 'আসতে হবে না।' বিজন ধীরে ধীরে চলে গেল। খগেনবাবু নীরবে বসে রইলেন। রমলা ঘরে যাবার পর টেবলে বসে কাজ শুরু করলেন।

ডিভিডেণ্ড দিয়েছে শতকরা দশ থেকে পনের, বিশ পর্যন্ত। মূলধনে আবার মুনাফা জমা হয়েছে, তাই হার কম দেখাচ্ছে। এ-কোম্পানি ও-কোম্পানির সঙ্গে জোড়া, একটার কম লাভ, হয়ত লাভ নেই, অন্যটার পনের—বোঝা যায় না লাভের গড়পড়তা হার কত। মোটামুটি দশের কম নয় যদি ধরা যায়, তবে পনের টাকা নিম্নতম মজুরি ঠিক করলে উৎপাদন খরচায় জোর আড়াই পারসেণ্ট বাড়বে, তবু থাকে ৭৷৷০ শতকরা, মন্দ কী? গবর্নমেণ্ট পেপারগুলোর হার তিন তার দুগুণ থাকবে তবু। অবশ্য বড় ফ্যাক্টরিগুলো। ছোট ফ্যাক্টরিতে

মজুরি আরো কম, সংখ্যাও বেশি নয়। তাদের আপাতত বাদ দিয়ে বড় ফ্যাক্টরির মজুরি ধরলে বিশেষ ক্ষতি হবে না মনে হয়। প্রেফারেন্স শেয়ার-গুলোর বাজার দর অত কেন? নিশ্চয়ই যারা শেয়ার খেলে তারা জানে লাভ রীতিমত হচ্ছে। তারা আট-দশের কম খেলেই না। কেন যে মিলওয়ালারা বলছে পারবে না বোঝা গেল না, তাদের হিসেবে নিশ্চয়ই গলদ আছে। কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। হররকমের কাজ পিছু কত মজুরি তারও পাত্তা নেই। কোনো সিদ্ধান্তে আসা চলে না। সন্দেহ হয় যেন পনের টাকা মজুরি ঠিক হলে লাভের হার শতকরা একটাকা কমবে, যদি অবশ্য উৎপাদনের খরচের অন্যান্য অঙ্কগুলো যা ছিল তাই থাকে। খগেনবাবু পৃষ্ঠা তিনেকের একটা নোট লিখলেন।

ভেতরে যেতে ইচ্ছে হয় না। রমলা হঠাৎ মেজাজ না দেখালেই পারত। বিজন এমন কিছু অপমানসূচক কথা ব্যবহার করেনি যার জন্য রমলা তাকে কটুকথা শোনাতে পারে। তার ধারনা সে জানিয়েছে মাত্র। হয়ত ভুল। বিরোধের বীজকে লালন-পালন করানইত ত' মেয়েদের ধর্ম। মাতৃত্বের অর্থ ই তাই। নতুন বৌ এসে ভাই-এ ভাই-এ মনোমালিন্য ঘটায়, তার উদ্দেশ্য নতুন ঘর বাঁধা। অবশ্য তারপর কেবল সেই সংসারকে পাকা করা ছাড়া অন্য কিছু কর্তব্য থাকে না, তবু একটা সিন্‌থেসিস্‌ হয় ত! বিজন এইটাই বলতে যাচ্ছিল। ছেলেমানুষ, মন্তব্য তাই সাজাতে পারে নি। কিন্তু মাথা বেশ পেকেছে এই অল্প বয়সে। এখনও ভাবের ঝোঁক রয়েছে, তা থাক, কিন্তু শিখল কোত্থেকে? ওস্তাদের ওপর ভক্তি অগাধ। তার সঙ্গে মতের পার্থক্য থাকতে পারে এ-সন্দেহটুকুর অস্তিত্ব·সে ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চায়, তাই সেটা ধরিয়ে দিলে চটে। ভক্তির প্রসাদে চিন্তা সরল হয় না কি? নিজের বেলা হয় নি। অবশ্য ভক্তির যুগ তাঁর নিজের জীবনে আসেনি। নিশ্চয় অন্য কারণ। চিন্তার চর্চা না করেই বিজন আসরে নেমেছে। কর্মের আগুনে বুদ্ধি সাফ হয় না ঝলসে যায় কেবল। কী ভাবে হল কে জানে, তবে বিজন আরেক ধাপে উঠেছে। সেখান থেকে সে কথা কইল এতক্ষণ। বক্তৃতার মক্‌স···তা হোক। রমলা সে-ধাপে ওঠে নি, তাই গেল চটে। যেন সাবিত্রীরই দিদি, রাগ আর রাগ, মুখ ঝামটা দেওয়া মজ্জাগত। অঙ্গার শতধৌতেন···মাস্টারি পারবে না। কিন্তু চাইল কেন করতে? একলা থাকার ভয়ে? কত রকম একাকিত্বই না আছে এই সংসারে। এই নীরবতার মধ্যে আরেক নীরবতা, শহরের নিরর্থক শব্দপ্রবাহ থেকে মন নিরাগ্রহ হল, একটা ফাঁক এল, মন বসল কবিতা রচনায় অশরীরী রূপ পেল,

অমনি এল আরেকটি অবসর, সেটি পড়লে সহৃদয় পাঠকে, লেখক পাঠকের মিলনে চতুর্দিকে অবকাশের সৃষ্টি হল। কেন, কী ভাবে একাকিত্বের এই চীনে বাক্স তৈরি হয় বোঝা যায় না। শূন্য শাঁখে সমুদ্রের ডাক। মিলনের মধ্যেও বাষ্পের পর্দা, সেটা বিকিরণকে রুদ্ধ করে। বুকের মধ্যে মুখ লুকালো রমা, ধুক ধুকুনি শুনলে, তবু একা, নচেৎ, কেন মাস্টারি করতে চায়! পার্থক্য সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়, তর, তম-তে পৌঁছবার আগেই ভয়ে কম্পন, গেল ছিঁড়ে, গেল ছিঁড়ে। ছিঁড়ে যাবে বিজন বলছে—রমা পারবে না।

নোটটি আবার পড়লেন। ভাষা ভাল হয়নি। ইংরেজীতে তৈরি কথার ছড়াছড়ি, ধরতাই বুলির চোরা-বাজার, সস্তায় যত চাও পাবে। বাংলা ভাষার গুণ ঐখানে। নতুন ধরনের বাংলা গদ্য আবশ্যক। পুরানো চালের বাংলা গদ্যে খাদ বেশি। তবে শুনতে ভাল লাগত। খগেনবাবু কাটাকুটি করে নতুন খসড়া লিখলেন। সফীকের পছন্দ হবে কি না কে জানে! সে জমকাল বিশ্লেষণ-বহুল ভাষার পক্ষপাতী নয়। ভাষা হবে কার্পাস্তিয়াসের দেহের মত, এক টুকরো অতিরিক্ত মাংস থাকবে না, চওড়া হাড় নিতান্ত প্রয়োজনীয় মাংসকে গ্রথিত করবে। রমলা বলবে রক্ত-মাংস নেই। তা বলুক গে! কাজের ভাষায়, সব ভাষারই গোড়ায় ও শেষে কাজ, চাই হাড়, শক্ত হাড়। খসড়াটি আবার পড়লেন। সংখ্যায়, দফায় সাজানই ভাল। মন্দ দাঁড়ায়নি··· তবে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না, তথ্যগুলো ঠিক কি না কে জানে, যদিও বা ঠিক হয়, তবু তর্কে অনেক ফাঁকি রয়ে গেল। সফীক ও করিম চেয়েছে—তাই লেখা। সফীকের ভাল লেগেছে বিজন বলছিল, তা মনে হয় না। ব্যবস্থার পরিবর্তন না জানলে জ্ঞান বিবৃতিতেই আটকে যায়। সফীক ঠিক ধরেছে, পণ্ডিতী রচনার দোষই তাই। বিজন একটা আস্ত ছেলেমানুষ, যেমন বিজনের মতে রমা একটি আস্ত মেয়েমানুষ। তবু শ্রদ্ধা বটে! কথায় কথায় ওস্তাদ, নাম উচ্চারণে বাধে, কিন্তু উল্লেখের জন্য উন্মুখ। যেন ওস্তাদের ভাল লাগাটাই শ্রেষ্ঠ পারিতোষিক। খগেনবাবুর মুখে হাসি ফুটল।

রমলার ঘরের দরজা বন্ধ নয়—নিশ্চয় ভুলে গেছে, স্বেচ্ছায় খুলে রাখবে না, অন্ধকারে রমলার গালে হাত পড়তে রমলা উঠে বসল।

'তুমি এখনও ঘুমোও নি?'

'না। আলো জ্বালো।'

'অনেক রাত হয়েছে।'

'তা হোক, আলো জ্বালো।' খগেনবাবু আলো জ্বাললেন। রমলা বিছানা

ছেড়ে উঠে পড়ল। ‘চল বাইরের ঘরে।’ বাইরের ঘরে এলেন। ‘ঐখানে বোসো।’ খগেনবাবু কোনের ইজিচেয়ারে বসলেন।

‘একটা কথার উত্তর দেবে? আমাকে এনে ব্যতিব্যস্ত হয়েছ, নয়? তোমার ঘাড়ে বোঝা হয়েছি, নয়? আমাকে ঠকিয়ো না, যা ভাবছ আমাকে বল, বিহিত করব।’ খগেনবাবু উত্তর দিলেন না। ‘তোমাকে আমি দোষী সাব্যস্ত করছি না, নিজে তোমার সঙ্গে এসেছি, জানি নিজে, অতএব স্মরণ করাতে হবে না। কিন্তু আমাকে না হলে তোমার চলছিল না ভেবেছিলাম, এখন দেখছি বেশ চলে।’

‘কেন রমলা এ-সব কথা তুলছ? আর এ-সব মান-অভিমানের পালা ভাল লাগে না। তুমি ত' অন্য ধরনের···অন্তত এই আমার বিশ্বাস। সেটা ভেঙ্গো না।’

‘অন্তত, অন্তত, অন্তত,···বেশ, আমি একটা মাস্টারি খুঁজে নেবো, বাধা দিও না।’

‘পারবে?’

‘ যে চলে আসতে পারে সে ওটুকুও পারবে।’

‘ঐ জন্যেই যদি না পাও’ বলেই খগেনবাবু চমকে উঠলেন। ভীষণ অন্যায় হয়ে গেল···কেন বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়···‘রমা, চল যাই।’

তাড়াতাড়ি উঠে রমলা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। চৈতন্যের অগোচরে বাক্যের সৃষ্টি·· কোনটাই বা চৈতন্যের অধীন! কপালে এক্স্-রে যন্ত্র নিয়ে বেড়ান আর মাথায় গল্পের সেই চক্র নিয়ে জীবনযাপন একই বস্তু। অন্তরালের প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রয়োজনই বা কী! থাক সেটা ঢাকা, তবেই সুখ বজায় থাকবে—বিশ্লেষণের শেষ বেশ একটা অভিশাপ মাত্র। অন্যায় হল···কিন্তু আসতই একদিন অমন-ধারা যখন রমলার সঙ্গে সম্বন্ধটি মন-ভোলান মাধুর্য্যে আবৃত থাকত না। যেটা সত্যি, তাকে স্পষ্ট দেখাই মঙ্গল, যত সত্বর প্রকট হয় ততই মঙ্গল। মনকে চোখ ঠেরে দিনযাপন নিরর্থক। কাজ করুক রমলা, কে বাধা দিচ্ছে! ঝোঁক কেটে যাবে, শরীরপাত হবে তখন বুঝবে। বুঝেছে বল্লে। ছাই বুঝেছে। দেহের গোলমাল, তাই মাথার মধ্যে পোকা ঘুর ঘুর করে উঠল। সাবিত্রীরও ঐ রকম হত! সব শেয়ালের এক রা।

খগেনবাবু আবার নোট নিয়ে বসলেন টেবিলের ধারে। ক্ষতি হবে না মিলওয়ালাদের, মুনাফায় এমন টান ধরবে না যাতে তারা মিল বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ধর্মঘটে যা লোকসান হয়, তার বেশি আর কী হবে। তা ছাড়া মজুরি পনের টাকা ধার্য হলে তারা ফুর্তিতে কাজ করবে—পরে লাভ, এখন না হয়

টানা-টানি। বেশি মজুরির গুণ ঐখানে। এতদিন লাভ করেছে মোটা, এখন না হয় একটু কম হোক, সফীক এই বলবে। ঠিকই। চিরটা কাল এক কদমে সংসার চলে না, কখনও লাভের, কখনও ক্ষতির বরাত।

হঠাৎ মনে হয় পুরাতন কক্ষ থেকে চ্যুত হয়ে নতুন কক্ষের আবর্তে ঘুরছেন। মাথায় চক্কর লাগে। কুঁজো থেকে জল নিয়ে রুমাল ভেজান, সেটা মাথায় রাখেন। মাথাঘোরা থামে···অভ্যাস হবে ধীরে ধীরে।

পাঁচ

"তুমি কি আসতে পারবে—চিঠি লিখছি" তার পাঠিয়ে রমলা সুজনকে কি লিখবে ভেবে পেলে না। সব কথা চিঠিতে লেখা অসম্ভব। কলম ধরলেই ভাবনাগুলো ছুটে পালায়। তাদের একটি যদি সূতো থাকত, তবে তার খেই খুঁজে বোনা চলত। এ যে অদ্ভুত সম্বন্ধ, ভালমন্দ তরতমের জট পাকান, খানিকটা অতীত, খানিকটা বর্তমান, এটা ওর ঘাড়ে পড়ছে, কুকুরছানার খেলা যেন। রমলা জানে স্বামীরা কী চায় এবং স্ত্রীরা কী দেয়। খগেনবাবু তার অতিরিক্ত আরো কিছুর প্রত্যাশা রাখেন, অথচ নিজেই জানেন না সেটা কী। স্বামী পশুত্বের দাবি করেছিল, সে পূরণ করতে পারলে না, তাই চলে এল। ইনিও তার কম কিছু চান নি, কিন্তু মানুষ হিসেবে, প্রাণের প্রাচুর্যে, তাই অপমান লাগে নি দৈহিক লেনদেনে, অনিচ্ছার আত্মগ্লানি স্বেচ্ছার গঙ্গাজলে গেল ধুয়ে। কিন্তু প্রাচুর্যটাই কাল হল। প্রচণ্ড ক্ষুধার নিবৃত্তির পরও যেন অতৃপ্তি থাকে। উদ্বৃত্তের ছটফটানি কী ভাষায় ব্যক্ত করা যায়, তাও আবার সুজনকে! পরকীয়ার এই পরিণাম, না সব পুরুষেরই এই দশা! চাঞ্চল্য বশ করতে বাইরের কাজ, প্রতিদিন রাত্রে ফেরা, খাবার ঠাণ্ডা আর প্রতীক্ষা। এই যদি মনে ছিল তবে আপন পায়ে দাঁড়ালেই পারত। সফীক আর শ্রমিক, কাজের বিরাম নেই, ঘুম নেই, ঘুমের মধ্যেও ঐ ভাবনা ঘুরছে। ভূত ছাড়াতে সে সেজেছে, স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ করেছে, নায়িকা হয়েছে, তার চেয়েও নির্লজ্জ ব্যবহারে আপত্তি জানায়নি। কোনো ফল হল না, দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে এখন প্রায় স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধে এসে পৌঁছল। এত কথা কী লেখা যায়, না নিজের কাছেই মুখ ফুটে মানা চলে।

কেমন করে অন্যকে জানাবে, বোঝাবে যে তার ভালবাসা বিফল, তার

স্বার্থত্যাগ অস্বীকৃত, তার সব চেষ্টা ব্যাহত হয়েছে ? যারা এখনও বুকের ভিজে পর্দার ও-পাশে কাঁপছে তারা কোন সাহসে পর্দা ঠেলে সামনে এসে নাচবে ? এ কি জানান যায় যে তার হার হয়েছে, শেকল নিয়ে ঝটপটানিই সার, জোর উস্কো-খুস্কো পালক খুঁচিয়ে দেহটা তৈলাক্ত করা, যাতে জল যায় ঝরে আর বাইরের লোকে না বোঝে লালমণিটির কি দশা! বাইরের বাঁধন তবু ছেঁড়া যায়, নিজের পরা শেকল বওয়া ছাড়া উপায় নেই যে! কিন্তু আত্মধিক্কারটা উবছে পড়ে, তাড়নায় গরল ওঠে। পুরাণের নীলকণ্ঠ মহাদেব, এ-যুগের নীলকণ্ঠ সতী, নীল দাগ ঢাকবার জন্য মুক্তার সাতনরী। টেবলের আয়নায় চোখের চারপাশের কালো দাগ দেখা যায়, কণ্ঠা বেরিয়েছে, আঙ্‌রাখা কাতর, অসমর্থ, বাহু থেকে বুক ফসকে গেল, পৃথক হল, সুজনও দেখেছে হাত ছিল দেহের অঙ্গ, একখণ্ড সাদা পাথর থেকে কাটা। সুজনের বয়স হল কত ? এক বয়সী নিশ্চয়, এখনও তার দেহে যৌবনের সামঞ্জস্য অটুট। সু-পুরুষ, সুন্দর নয়, ঝলকায় না তার রূপ বিজনের মত, কিন্তু আভা আছে, সুস্থির প্রদীপশিখা, নিজের রসদ নিজে যোগায়, শান্তি আছে, বিষাদ থেকে তার উত্থান। বিষণ্ণ কেন ? বঞ্চিত তাই বিষণ্ণ। কেনই বা একজন চিরজন্ম বঞ্চিত থাকবে, আরেকজন স্বেচ্ছার দান পায়ে ঠেলবে! সুজন আসুক, আর সে ঠকবে না। রমলার মুখ উজ্জ্বল হয়, তাই দেখে লজ্জা আসে, বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

সফীকের না-হয় হৃদয় ব্যাকুল হোক কুলিদের জন্যে, কিন্তু বিজনের ব্যাকুলতা নিরর্থক। কখনও সে গরীবদের ঘর দোর পর্যন্ত দেখেনি। তার কল্পনার দৌড়ও এত বেশি নয় যে তাতে অভিজ্ঞতার ক্ষতিপূরণ হয়। আর উনি যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সফীকের সঙ্গে কাটাচ্ছেন তারও মূলে না অছে প্রত্যক্ষ অনুভব, না আছে সুদূর দৃষ্টি। এ কেমন দৃষ্টি যেটা সামনের জিনিস এড়িয়ে চলে! বরঞ্চ সে দৃষ্টি, সে অনুভূতি, সে কল্পনা আছে সুজনের। পরের বাড়ি মানুষ হয়েছে, বিজনের বাবা বড়লোক, তিনি সমান ভাবে রেখেছেন দুজনকে, তবু এই অপক্ষপাত সুজনকে ভোলাতে পারে নি, ভদ্রভাবে সে তাকে মেনে নিয়েছে, কিন্তু স্বার্থে প্রয়োগ করে নি, সহজে পরের উপকারে এসেছে, আচরণে আড়ষ্টতার প্রমাণ দেয় নি, তাই তার স্বভাব সুমিষ্ট হয়েছে। একটু হয়ত মেয়েলী, মুখের হাসিটা নম্র, অত পুরুষের হয় না। কেন সে সর্বদা পিছিয়ে থাকে; কেন এগিয়ে এসে নিজের সত্তা প্রতিষ্ঠিত করে না ? আপন অধিকার কেড়ে নেয় না ? এক সময় রমলা নিজেই অমনোযোগী ছিল, তাকে হয়ত নিজেই মনের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। 'কি ঘুম তোরে পেয়েছিল···' এই লাইনটা ঘুরে ফিরে কেবলই আসে···পরিচিত···কখন প্রথমে আসে রমলা মনে করতে যায়, মনে পড়ে না।

এবার জেগে থাকবে, তন্দ্রা আসতে দেবে না। এবার এলে সে সব পাবে···মুছাব পা আকুল কেশে···'

শরম আসে···কেন সে আবার নিজেকে দেবে? সেই কোন যুগ থেকে মেয়েমানুষ দিয়েই এল; লোভ দেখিয়ে, আদর করে, কখনও খোকা সেজে, কখনও যাত্রার বীরের পোশাক পরে ওরা খাজনা নিয়েই গেল, মেয়েদের আপত্তি নেই, উল্‌টে কৃতকৃতার্থ, আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি, ওদের কৃতজ্ঞতা নেই, যেন তাদের প্রাপ্য, তারপর হতশ্রদ্ধা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে থাকা, কিনা কাজ, ছাই কাজ, কাজের মুখে আগুন, মিথ্যার সম্ভার, নচেৎ শ্রমিকদের জন্য হৃদয় বিগলিত, আর ঘরের মধ্যে একজন সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা ধন্নাই দিয়ে যাচ্ছে, তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ইচ্ছা কিছুই নেই, কিছুই থাকবে না, থাকা উচিত নয়, থাকা পাপ। এ-অত্যাচার অনাদি অনন্ত ওতপ্রোত। কবি বলেন এই মেয়েদের স্বভাব, তাই পা মোছান চাই, বাঙালী বলে বাঙালী মেয়ের মিষ্টতা, তাই প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে বসে থাকতে হবে! কিন্তু স্বভাব নয়, সংস্কার, যার দম ফুরিয়েছে বহুকাল। রমলা বিছানা থেকে উঠে কলম নিয়ে বসে।

'সুজন, তোমার শেষ চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি! অবশ্য ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু তুমিও প্রত্যাশা কর নি। উপদেশের একমাত্র উত্তর, পালন···'

উপদেশ দিয়েছিল, কোথায় গেল চিঠিটা? রাগের বশে নিশ্চয় সেটা ছিঁড়ে ফেলেছে, কিন্তু উপদেশ ছাড়া আরো কিছু ছিল প্যাঁচালো ভাষায়, যার অর্থ আবিষ্কৃত হল···সুজন তাকে প্রেম নিবেদন করেছে···তাই আপদ দূর হল, পাছে···কাঁটার মতন সেটা সর্বাঙ্গে চরে বেড়ায়···তবু বুঝলে না। রমলা হঠাৎ উঠে হাতবাক্স খুলে ঘাঁটতে থাকে···এই যে চিঠিটা রয়েছে···হাতের লেখা সুন্দর শান্ত, মিষ্টি—লিখেছে···

'আশা করি এতদিনে তোমার একাকিত্বের অবসান হবে। অথচ, পরাশ্রয় আমার অগোচর নয়। তবু আমি তোমার জন্য খুশী। তোমার সাধনায় তুমি ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছ, খগেনবাবুরও 'পুরুষ সিদ্ধি' নিষ্ফল হয়নি আমার ধারণা। দুজনেই মানুষ না হলে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ শেকলই থেকে যায়! তুমি নিজের জোরে আপন অধিকার বিস্তার করেছ, তার সামনে বাধাবিপত্তি স্থায়ী হবে না। এখন কি আমরাও সেখানে অবান্তর? অবান্তরের স্থান নেই যখন সে বুঝতে পারে তখন সে 'বোকা'। তুমি যখন আমাকে 'বোকা ছেলে' বলেছিলে তখন আমি ঠিকই বুঝেছিলাম অর্থাৎ তোমাদের জীবনপথে আমি অনাবশ্যক। কষ্ট হয়েছিল, বলতে এখন লজ্জা নেই, কারণ তার জন্য অর্থ পেতে প্রাণ ব্যাকুল হয়, ক্ষণিকের জন্য। আজ আমার কষ্ট নেই। বিজনের এখন আপন মতামত

হয়েছে, সেই অনুসারে সে কাজ করছে। তাতে কী আমার দুঃখ হওয়া উচিত ?'

'কেবল একটা কথা মনে ওঠে। যদি নতুন কর্মপ্রবাহে জীবন চালাতে পার তবেই সার্থক হবে—অবশ্য সেখানে তোমার কাজ নেতিমূলক। যে এতদিন একলা থাকতে পেরেছে তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।'

'তোমরা কোথায় থাকবে যদি জানতে পারি, এবং তোমাদের এখান থেকে বই কী অন্য কোনো জিনিস পাঠাবার যদি দরকার হয় তবে আমাকে লিখো। অন্য কোনো প্রয়োজন হয়ত উঠবে না, যদি ওঠে, তবে সঙ্কোচ যেন না হয়।'

'বোকা ছেলে'···মনে পড়ে সেই রাতে অক্ষয়বাবুর বাড়িতে সুজনের ঘর, সুজন বিছানায়, আরাম কেদারায় নিজের সারারাত কাটল, সুজন মড়ার মতন শুয়ে রইল। অবান্তর ব'লে বোকা নয়, মোটেই নয়, না বোঝবার ক্ষমতা অসীম। কী আশ্চর্য। কোনো পুরুষের মাথায় কী এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই!

'উপদেশের একমাত্র উত্তর পালন' নতুন কর্মপ্রবাহে জীবন বহান শুনতে বেশ, গালভরা কথা। এর নাম কর্মপ্রবাহ! কার কর্ম! যার কেউ নেই সে শ্রমিক আন্দোলন করুকগে—সফীকের মা নেই বাপ নেই নিশ্চয়, নচেৎ ভাওয়ালী পাঠাতে হয়! বাপেতাড়ান মায়েখেদান ছেলেরাই এই হুজুকে মাত্‌বে···জোর করে প্রেম হয় না···যার কর্ম তার সাজে অন্যের লাঠি বাজে। সুজন এ-ধরনের উপদেশ কিছুতেই দেয় নি···সে বলতে চেয়েছে, পুরানো ইতিহাস ভুলে নতুন অধ্যায় খোলো···ও যত পড়ে পড়ুক, লিখুক, কে বাধা দিচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বইয়ের পাতায় চোখ সেঁটে থাক···কে মানা করছে···কিন্তু এ-সব কী! সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস-চর্চা খুইয়ে তর্ক, আর মজুরদের জন্য নোট লেখা! একে 'কালচার' বলে না। কথার কথায় 'ইতিহাস' কপচান—অথচ কোথায় ইতিহাসের বই তার পাত্তা নেই। নীল মলাটের লম্বা লম্বা বই, সংখ্যায় ভরা, ছাপা বাঁধাই যাচ্ছে তাই, তাই হল খোরাক! কেমন করে তাদের দৌত্যে দুটি প্রাণী এক হয়! 'নেতিমূলক', অর্থাৎ খাবার টেবল সাজান, আর তার পাশে চুপ করে বসে থাকা, তাও নিমন্ত্রণের নাম নেই, একজন ভদ্রলোককে খেতে বলা হয় নি এতদিনে, শহরে কী ভদ্রলোক নেই, এলেও তাদের এই সরঞ্জামে কষ্ট হবে, সফীকের এই যথেষ্ট, বিজন এইতেই খুশী···নেতিমূলক··· অর্থাৎ খগেনবাবুকে আরাম দাও যত পার, আর তার চোখে স্বার্থের ছানি পড়তে থাকুক! কী চমৎকার বন্দোবস্ত! এ অচল···সুজন বোঝে না চিঠিতে বোঝান যায় না, সে চলে আসুক···ও আপত্তি করবে না, ওর সুবিধা হবে, সুজন আর বিজনের হাতে সমর্পণ ক'রে সে সফীকের জন্য নোট লিখবে, তার

সঙ্গে রাত বারটা পর্যন্ত আড্ডা জমাবে। রমলা নতুন চিঠির কাগজে আবার লিখতে শুরু করল।

'সুজন, নিশ্চয়ই তুমি আমার তার পেয়েছ। তোমাকে পেলে আমরা সকলেই খুশী হব। কানপুরের মতন শহরে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা যায় না, কিন্তু সেইজন্যই তাদের প্রয়োজন বেশি। বিজন ও সেইসঙ্গে এরাও 'নতুন কর্ম প্রবাহে' অবগাহন করছেন। যে-ফ্ল্যাটে আছি সেটা মোটেই ভাল নয়। শীঘ্রই অন্য বাড়িতে উঠে গেলে সব দিক থেকে সুবিধে। আমাকে তুমি বিশ্বাসে ধন্য করেছ, তাই বলছি যে তুমি 'অবান্তর' নও। কবে আসবে পত্রপাঠ জানিও।

ইতি—রমলা

রমলা চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে বসবার ঘরে এসে একটা ক্যান্‌ভ্যাসের চেয়ারে বসল। হাতে পশম আর কাঠি। সোফায় একটা বই পড়ে আছে, নামটা পড়া যায় না। তার চোখ খারাপ হল না কি? চশমা পড়লে কেমন দেখাবে? কালো ডাঁটির চশমা পরুক মার্কিন মেয়েরা, যারা জিনিসপত্র বেচে বেড়ায়, পাদ্রিগিরি করে, আর পরুকগে রুশ মেয়েরা, যারা চুল ছেঁটে, চামড়ার খাপে কেতাব আর কাগজ পুরে গ্রামে আর শহরে কম্যুনিজমের মহিমা প্রচারে ব্যস্ত। প্যাঁসনে-র কাল গেছে। ফ্রেম্ না থাকাই ভাল—না হয়, হোয়াইট গোল্ড। রমলা সোফার কাছে যেতেও অক্ষরগুলো স্পষ্টতর হয় না। তবে কি চালশে ধরেছে? না, চশমা এক প্রকার গয়না, কখনও গহনার ওপর তার মোহ ছিল না, এই বয়সে আর শোভা পায় না। রমলা বইটা তুলে নিয়ে দেখলেন অর্থনীতি, মেয়েদের শেখবার অযোগ্য, যাদের সর্বদা টাকা-আনা-কড়া-ক্রান্তির হিসেব রাখতে হয় তাদের পক্ষে অর্থনীতির মূল্য নেই!

বাড়িতে একটা নভেল কী গল্পের বই নেই যে সময় কাটান যায়। পুরুষের আগ্রহে স্ত্রী ভাল রাখবে কেন? স্ত্রীর যখন সন্তান সম্ভাবনা হয় তখন ত' পুরুষে নতুন অতিথির সংবর্ধনায় কালক্ষেপ করে না···প্রথমটা ভয় পায়, ভয় ছাড়া কি? খগেনবাবুকে যেদিন সে সন্দেহ—মাত্র সন্দেহটুকু জানালে তখন তাঁর চোখের তারা ভয়ে নিশ্চল হয়েছিল; ভয় নিশ্চয়, এ অবার কে এল ভাগ বসাতে সম্পত্তিতে, আরামে, দাসীগিরিতে; কেবল অজানার ভয় নয়, এক লাইনে রেলগাড়ি বেশ চলছিল, অন্য লাইনে কেন যাবে, কেন ধাক্কা খাবে সহজ জীবনটা? ওরা বলে 'এক্‌সপ্লয়টেশন' চলছে, কিন্তু গোড়ার পাপ ঐখানে। স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধেই তার প্রকাশ, চরম বিকাশ, তার বাইরে যেতে হয় না, কলকারখানায়।

হাঁ, যদি পুরুষে কবি হয়, গল্প কী নভেল লেখে তবে স্ত্রীজাতি সাহায্য দিতে

পারে, কারণ তারা জানে ব্যাপারটা কি! বৈজ্ঞানিক স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দুর্লভ···কুরী আর মাদাম কুরীর তুলনা কোথায়! জোর মেয়েরা টাইপ করবে, স্লাইড ধোবে আর স্বামীর বক্তৃতার সময় সামনের বেঞ্চে বসে থাকবে। যে পুরুষ শ্রমিকদের নিয়ে ব্যস্ত তাদের স্ত্রীদের কর্তব্য কেবল খাবার টেবলের পাশে অপেক্ষা করা। এর বেশি আর কিছু নয়। মেয়েরা শ্রমিক আন্দোলনের বাইরে।

কিন্তু সময় কাটে না। সুজন এলে খানিকটা সময় কাটবে। ততদিন কি কাজ নেওয়া যায়? নিজের খেয়ালে বইপড়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু ভাল লাগে না। কখনও খুব বেশি আগ্রহ ছিল না। কনভেণ্টের শিক্ষাপদ্ধতিতে বাড়িতে পড়বার সুযোগ নেই, সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্কুল আর খিল-খিল হাসি বেণী দুলিয়ে, সেই মেয়েতে মেয়েতে ভালবাসা, না হয় মাস্টারনির সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া। সিস্টার সিসীলিয়ার কথা মনে পড়ে, বড়লোকের মেয়ে, হিন্দু দর্শনের ওপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাই ভারতবর্ষে আসে, গুজোব উঠল সে ধর্ম পরিবর্তন করবে। নীহার এসে বল্লে, মিথ্যে কথা, হিঁদু ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে, তাই ছুতো করে চলে যাচ্ছে। মুখটা মিষ্টি ছিল, কী নীল চোখ, সোনালী চুল, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটত, বাপের জমিদারিতে ঘোড়ায় চড়ে দল বেঁধে শেয়াল মারতে গিয়ে পড়ে যায়। নীহারটা কেবল নিন্দে করত, তবু, মন ছিল তার সরল, যা মনে আসত তাই বলে ফেলত গল্ গল্ করে। মাদার সুপিরিয়ার বলছিলেন, কথার আমাশায় ভোগে নীহার···কোথায় আছে কে জানে! একবার একটা গল্প বেরোয় তার নামে··কনভেণ্টের কথা ছিল, নিশ্চয়ই নীহার···আর কে অমন কুৎসা রটাতে পারে।

খগেনবাবুর সঙ্গে বিজন এসেই রমলাকে চা দিতে অনুরোধ করলে। কুরুশ-কাটি আর পশমের গোলা গুছিয়ে রেখে রমলা ভেতরে গেল। বিজন স্নানের ঘরে গিয়ে মুখ হাত পা ধুলো। যখন বেরিয়ে এল তখন তার চেহারা ভিন্ন, চুল ব্যাক-ব্রাশ, ফরসা জামা ও পান্তালুন, পায়ে কাবুলি চটি।

'রমাদি ভাগ্যিস এখানে জামা কাপড় রাখতে বলেছিল! আঃ বাঁচলাম! আপনিও একবার স্নান করে আসুন, আরাম পাবেন।' খগেনবাবু উঠলেন না। বয় চা-এর ট্রে আনল, সঙ্গে পেস্ট্রি। হাত পা না ধুয়েই খগেনবাবু পেস্ট্রি তুলে নিলেন।

'সত্যি বলছি, খগেনবাবু, ওস্তাদকে বুঝি না, দেখলেন ত' ব্যাপারটা! অমন সুবিধা কেউ ছেড়ে দেয়। মার্কস নিজে বলেছেন যে বিরোধের কাছে সব পদ্ধতিই সমান, কোনোটা বড় আর কোনোটা হেয় নয়।'

ব্যাপারটা এই—একজন কর্মী এসে সফীককে খবর দেয় যে একটা ফ্যাক্টরিতে যার মালিক মজুরদের পুরি হালুয়া কাবাবের লোভ দেখিয়ে ফাটকের মধ্যে শোবার বন্দোবস্ত ক'রে কাজ চালাচ্ছিল, সেই ফ্যাক্টরির একজন মজুর অনেকদিন বৃষ্টি না হওয়ার জন্য অসহ্য গরম থাকাতে ধ্যানে বসেছে, যতক্ষণ না বৃষ্টি পড়ে ততদিন সে উপবাসে থাকবে। অনেক লোকজন জমায়েত হচ্ছে দেখে কর্তৃপক্ষ দু'মিনিট আগেই ছুটি দেয় শিফটের বাঁশি বাজিয়ে। ফ্যাক্টরির মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য, রীতিমত কাজ হচ্ছে না। গোলমালের ভয়ে ওরা রাতে তাকে ভাগাতে পারেনি, সঙ্গে অনেক লোক ছিল। সাহেবরা ভয় দেখায় কিন্তু লোকটা কথাই কয় না। পরের দিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন! মজুররা 'বাবা' 'বাবা' করছে, চড়াই দিচ্ছে, মালিকরা ভীষণ গোলমেলে পড়েছে। বৃষ্টি যদি না পড়ে আর মেঘ যদি উড়ে যায়, তবে কাজ বন্ধ থাকবে। কলের সাহেব বলেছে যে সন্ধ্যার আগে যদি লোকটা সরে না যায় তবে পুলিশের হাতে দেবে। ইতিমধ্যে ফাটকের বাইরে সিপাহি এসে হাজির, মজুররা ক্ষেপে উঠেছে। ঘটনা শুনে সকলেই উত্তেজিত হয়। বিজন বলে ভগবানের না হোক ইতিহাসের আশীর্বাদ এবং হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা যেকালে উচিত নয় তখন শীঘ্রই ব্যাপারটাকে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়াই সংগত। খগেনবাবুরও তাই মত, কারণ বিবাদ যখন চলছে, এবং হরতাল যখন অসম্পূর্ণ তখন সুযোগটা গ্রহণ করাই ভাল। করিম নীরবে ছিল। সফীকের কোনো আগ্রহ না দেখে বিজন একটু হতাশ হয়। যেন কিছুই নয় ভাবটা, নিতান্ত হালকা ভাবে খগেনবাবুকে অনুরোধ জানায় হরতালিদের নাম-ধামের সূচীপত্র তৈরি আর চাঁদা খরচের হিসাবের ভার নিতে। খগেনবাবু সফীককে অবশ্য বলেছিলেন, 'বিজনের কথাটা ফেলবার নয়।' কিন্তু সফীক উত্তর না দিয়ে কেবল করিমকে দেখিয়ে দিলে। করিম ইতস্তত করছিল। খগেনবাবুর সোজা প্রশ্নের উত্তরে সে সোজা উত্তর দিলে, 'হিন্দু বাবাজীর পিছুপিছু ফকির সাহেবও আসবেন, তখন ওদেরই লাভ, হিন্দু মুসলমানদের দাঙ্গা বাধবে, পুলিশ ঢুকবে সব কলের মধ্যে।'

এই উত্তর বিজনের মনঃপুত হয় নি। লড়াই-এর সময় বাচবিচার অচল, দাঙ্গার ভয়ে বিরোধ বন্ধ রাখা অনুচিত প্রভৃতি যুক্তি দেবার সময় সফীকের মুখে হাসি ফোটে। সেই দিনই সন্ধ্যায় দু' ফোঁটা বৃষ্টি হয়, 'বাবা' মহারাজ হয়েছেন, ফাটকের বাইরে যাগযজ্ঞ ক'রে একটা ডেরা তুলেছেন। ইতিমধ্যে একটা বেশি মাইনের চাকরি খালি হয়েছে, পদোন্নতিতে মহারাজের এইবার বোধহয় ধ্যানভঙ্গ হবে।

চা খেতে খেতে বিজন বল্লে, 'আপনি জানেন যে ওস্তাদকে আমি কত শ্রদ্ধা

করি, কিন্তু কখন যে কি ক'রে বসে তার হদিশ পাই না।'

খ: 'এক হিসেবে সমর্থন দিতে পারি। দাঙ্গা বাধত, এবং সেটায় হরতালের ক্ষতি হত। করিমেরও তাই মত।'

বি: 'বলতে বাধে, কিন্তু এক এক সময় মনে হয়, ভুল ঠাওরাবেন না, করিম, সফীক মুসলমান ব'লে বোধ হয়, ঠিক এই সব হিঁদুয়ানী পছন্দ করে না। তাদের কোনো গোঁড়ামি নেই, বুদ্ধিতে, কিন্তু সংস্কার যাবে কোথায়!'

খগেনবাবু কঠোর ভাবে চাইতে বিজন উত্তেজিত হয়ে বল্লে, 'পজিটিভ ভাবে মোটেই নয়, কখনই নয়, কিন্তু যদি তাদের কার্যকলাপ দেখে কেউ ঐ ব্যাখ্যা দাখিল করে তবে তাকে দোষী ভাবা যায় না। কেনই বা আমাদের এমন আচরণ হবে যে সম্বন্ধে ভুল ভাবা সম্ভব! আমাদের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে যদি কারুর কখনও সন্দেহ ওঠে তবে আমাদেরই সর্বনাশ! তাছাড়া, কার্ল মার্কস, লেনিন ঠিক বিপরীত উপদেশ দিয়েছেন, সেদিন একটা বইএ দেখছিলাম।'

খ: 'তাঁরা হিন্দু মুসলমান সমস্যার ধার ধারতেন না। ঘটনাটা বড়, না মতামত বড়। এই ধরনের পবিত্র, শুদ্ধ মার্কসিজম-কে মার্কস ও লেনিন উভয়েই আচ্ছা করে ঠুকেছেন জান না?'

বি: 'কিন্তু লোকে ভুলই বা বুঝবে কেন?'

খ: 'তারা কারা?'

বি: 'অনেকে, আপনি জানেন না। এই ধরুন, ওস্তাদ মধ্যে মধ্যে একেবারে ডুব দেয়, কোথায় গায়েব হয় কেউ জানে না। নানা লোকে তাই নিয়ে কানাঘুষা করে—কারুর মতে, ওস্তাদ তখন শুষ্ক কর্মে বিতৃষ্ণ হয়ে রূপচর্চায় মগ্ন থাকে. কেউ ভাবে, যেমন আমি, ঐ ফাঁকে ওস্তাদ ভাল ভাল বই পড়ে। সত্যি কথাটা কি তাকে একবার ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু কেমন যেন অবহেলার হাসি, 'হু কেয়ার্স' ভাব!'

বিজনের স্বরে, তার প্রতিবাদে, আলোচনায়, অনুযোগে অভিমানেরই রেশ রয়েছে। অবশেষে বিরোধের মধ্যে সে ব্যক্তিগত বিশেষ সম্বন্ধের অবিচল কেন্দ্র চায়। সফীক এই চাহিদার প্রশ্রয় দেয় না! সফীক-বিজনের সম্পর্ককে অমানুষিক বলা যায় না, কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা নিবিড়তার প্রতিকূল। জড়ের কাঠিন্যের অপেক্ষা বায়বশূন্যতা মানবিক প্রসারকে দমন করবার শক্তি রাখে··· জড়ের আঁশ অনুসারে যন্ত্র চালালে তাকে বশে আনা সম্ভব, কিন্তু পঞ্চ ক্রোশের ঊর্ধ্বে ঈথরের চাঞ্চল্য ঠাণ্ডা খামখেয়াল, কোনো বৈজ্ঞানিক তার নিয়মকানুন ধরতে পারলে না, পাইলটরা তাকে বশে আনতে অপারগ হল। কন্‌কনে পাগলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক। সফীক স্নেহহীন নয়, কিন্তু তাকে

স্নেহশীল আখ্যা দিতেও বাধে। মেয়েরাও খামখেয়ালী, প্রহেলিকা, কারুর ভাঁড়ার খালি তাই, কেউ বা দিয়ে ফিরিয়ে নেয়, সম্পর্কের স্থিরতা ও সাতত্য রাখে না। যেমন রমলা। কিন্তু সফীক যে মর্মে জীবন চালায় তার তর্ক-পদ্ধতি ভাব-রহিত, যুক্তি-বুদ্ধিবিবর্জিত। খগেনবাবু বিজনকে বল্লেন:

'সফীক ডায়েলেক্‌টিক্‌স্‌ ধরেছে।'

বি: 'তা হয়ত ধরেছে, কিন্তু তাই বলে কোনো যুক্তি মানবে না, ব্যবহারে কোথাও নরম হবে না!'

খ: 'আমি অবশ্য তাকে বেশি চিনি না, কিন্তু একটা দিক থেকে তার আচরণের ব্যাখ্যা সম্ভব।'

'ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যা, কেবল ব্যাখ্যায় বুক গেছে শুকিয়ে, হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ, খুলির সামনেকার ঢিবি বেড়েই চলেছে, এইবার শিঙ্‌ বেরুবে, তার পর দাড়ি গজাবে, দেখাবে মজার ভেবে, রমলা হাসল। হাসি চোখে পড়তে খগেনবাবু অসোয়াস্তি বোধ করলেন, ব্যাখ্যার খেই গেল হারিয়ে, খুঁজতে গিয়ে একেবারে গোড়ার কথা ধরলেন।

'ব্যাপারটা এই তুমি···কোনো কিছুকে, ধর, সম্বন্ধকে স্থির ভাব, না বদলাচ্ছে ভাব? সুবিধের জন্য স্থির ভাবতেই হয়, কিন্তু সুবিধার ফাঁকে সত্যবস্তুটা ফসকে যায়।'

'যাই বলুন না, একটা খোঁটা চাই।'

'খোঁটা অবশ্য লোকে চায়, কিন্তু কী ধরনের? জড়বাদীরও খোঁটা আছে আদর্শবাদীদের মতন।'

'জানি, তবু চাই, সেটা ধরুন, প্রগতিতে বিশ্বাস, মানুষকে ভালবাসা।'

'প্রগতি এবং ভালবাসা একত্রে? কী বলছ, বিজন! তোমাদের প্রগতি মানে নিশ্চয় সেই পুরানো উন্নতিবাদ নয়, আর মানব-প্রেম, সে ত' য়ুটোপিয়ান সোশিয়ালিজম!'

'আমি বলছি ইতিহাসের নিয়ম-কানুন।'

'আমি যদি বলি সফীক সেটা বুঝেছে, কেবল মাথা দিয়ে নয়, হৃদয়ঙ্গম করেছে, তবে তোমার আপত্তি টেঁকে না। তোমরা ইতিহাসের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ছ, রক্ত বেরুচ্ছে, সকলে আহা করছে, মহিলারা বিশেষত, রমাদিও, আর ভাবছ এক একজন মার্টার!'

বি: 'রমাদিকে কেন আবার! রমাদি একটা মজা দেখেছ, খগেনবাবু তর্কে তোমাকে না নিয়ে এসে থাকতে পারেন না? তুমি তাঁর মাথার মধ্যে ঢুকে পড়েছ···আচ্ছা মেয়ে যা হোক···উনি মুখ ফুটে স্বীকার করবেন না, কিন্তু ওঁর

সকল চিন্তায়, সকল কর্মে আছ তুমি। ওঁর বুদ্ধির চর্চা একার নয়। সত্যকারের প্রেরণা তুমি দিয়েছ ওঁকে, রমাদি।

খগেনবাবু হাসলেন না দেখে বিজন রমলাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'রমাদি তোমার মত কি ?'

রমলা বল্লে, 'অমন সুবিধে ছাড়তে আছে!'

খগেনবাবু কেবল চাইলেন রমলার দিকে তার মুখ হঠাৎ যেন সুন্দর হয়ে উঠল। তারা দুটো চোখের কোনে গেছে, চক্‌ চক্‌ করছে, বাঁ হাত থুৎনিতে, ক'ড়ে আঙুল দাঁতে, হাতের রেশমী রোঁয়ায় চুড়ির সোনালী আভা, গ্রীবা বাঁকা, এলো খোঁপা কাঁধে লুটিয়েছে। খগেনবাবু দেখছেন বুঝতে পেরে রমলার মুখ কঠিন হল। 'বিজন, পেষ্ট্রি কেমন হয়েছে ?'

বি: 'চমৎকার। মেয়েদের বুদ্ধিতে যা আসে তা আমাদের মাথায় আসে না।'

র: 'সব পুরুষদের অবশ্য নয়। আমরাই ও-সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।'

বিজন জোরে হেসে উঠল। 'কেমন মানতে হল ত!' খগেনবাবু ঘর থেকে উঠে গেলেন।'

রমলা বিজনকে বল্লে, 'তোমাকে আজ বেশ দেখাচ্ছে। আজ তুমি আর ক্লাবে যেও না, মেয়েদের বড়ই দুরবস্থা হবে, আমারও হিংসে হবে।'

বি: 'দ্যাখ, রমাদি, ঐ ধরনের ঠাট্টা আমাকে কোরো না। কানপুরে এসে আমি পাকিয়ে গেছি জানি, তাই বলে···তা ছাড়া, আমাকে নিয়ে তোমার রসিকতা শোভা পায় না সে বরং সুজনদার প্রাপ্য।'

র: 'আজ আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে ? কতদিন তোমার টেনিস খেলা দেখি নি, গলা খোলা শার্ট, দুধের মতন শাদা ফ্লানেলের ট্রাউজার্স, আর এমারেল্ডের মত ঘাস, ঘন নীল পর্দা—বিজনবাবুর ঘন কালো চুল, হাতের পেশীতে ঢেউ খেলছে, ব্যাক্‌ হ্যাণ্ডের মার, বল তীরের মতন, ফিঙের মতন, লাল নেটের কালো টেপ্‌ ছুঁয়ে গেল, পড়ল গিয়ে ডান দিকের চুনের দাগের—বাইরে।'

বি: 'না, রমাদি, বাইরে নয়, লাইনের ওপর। যাক্‌গে ও-সব কথা। তুমি ক্লাবেই ভর্তি হও, মাস্টারি তোমার ভাল লাগবে না। একলা থাক জানি, মন আমার খারাপ হয়···কী জানি, তোমরা কি করলে! যাই হোক—সুজনদাও যদি থাকত। মানুষ সামাজিক জীব কথাটা সোশিয়ালিস্টদের মানতেই হয়।'

র: 'মানো, মানো, তুমি ? তবু ভাল!' রমলার মুখে সামান্য যেটুকু

উত্তেজনার চিহ্ন ফোটে সেটা মুছে যায় ঘন স্থূল অনিশ্চিত কণ্ঠস্বরে। একটু কাশতে গলার ঘড়ঘড়ানি কেটে গেল। বিজন অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বল্লে, 'তুমি যদি ক্লাবে যেতে না চাও, তবে ওয়েলফেয়ার সোসাইটিও আছে, ঐ সব মজুরদের ছেলেমেয়েদের জামাটামা দেওয়া, লেখাপড়া শেখান, এই সব আর কি! তবে—'

র: 'তবে কি? নতুন আপত্তি মনে উঠল বুঝি?'

বি: 'ওটা মালিকরা খাড়া করেছে কি না, তাই—'

র: 'অর্থাৎ ওস্তাদ পছন্দ করবে না, তাই বিজনবাবুর পছন্দ নয়, বিজনবাবু চান না যে তাঁর কোনো আত্মীয়া ওদের কোনো অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকেন, বিজনবাবুর দলের কাছে, তাঁর হিরোর কাছে সম্মান যাবে কেমন?'

বি: 'মোটেই না। ওস্তাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা হস্তক্ষেপ করি না, কেনই বা সে আমাদের বেলা করবে?'

র: 'একটু তফাৎ এই যে তোমার প্রাইভেট কিছু নেই, এবং তাঁর প্রাইভেট অনেক কিছুই আছে।'

বি: 'ওয়েলফেয়ার সমিতিতেও যোগদান আবার মনোমত নয়। যত সব বুর্জোয়া মেয়েরা মোটর চড়ে মধ্যে মধ্যে চামানগঞ্জ, জরীব-কি-তলাও এর ধোঁয়া ও ধুলো খেতে যান, আত্মপ্রসন্ন হয়ে ফিরে আসেন, স্বামীদেরও আত্মগ্লানি কমে, গর্ব বৃদ্ধি হয়, তাঁরাও বলতে পারেন—'

র: 'থাক, আর বুদ্ধি দেখাতে হবে না। ও আমি পারব, কি করতে হয়?'

বি: 'আগে ভেবে দেখ। মোটর না হলে ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে খাতির নেই।'

র: 'টঙ্গাতেই চালাব, তারপর যা হয় হবে। কাল সভ্য হবার ফর্ম আনবে?'

বি: 'অমনি ক্ষেপে উঠলেন! আগে জিজ্ঞেস-পত্র করি, তুমিও খগেনবাবুকে একবার বলে কয়ে ঠিক কর—'

র: 'তুমি কাল খবর দেবে কি না— সোজা প্রশ্নের উত্তর দাও।'

বি: 'দেবো! কিন্তু পারবে না। তার চেয়ে মিক্স্ড্ ক্লাব ঢের ভাল। সব চেয়ে ভাল হয় যদি সুজনদা এসে পড়ে। সুজনদা, তাকে কতদিন দেখি নি— যাকগে—আমার আবার কাজ পড়েছে, এখনই যেতে হবে। আরেকদিন তোমাকে ক্লাবে নিয়ে যাব, রমাদি কেমন? রাগ করলে না ত? ভাল কথা, রমাদি, একটা চমৎকার বাড়ি দেখেছি, সামনে ফুলের বাগান, একেবারে নতুন

ডিজাইনের—কী বলব! যেন!'

র: 'খুব বেশি ভাড়া?'

বি: 'তা জানি না, তবে আমি বাড়িওয়ালায় ছেলেকে জানি, ক্লাবের আলাপী। বোধ হয় সিক্স চাইবে, আমি জিজ্ঞাসা করব'খন। তবে কোলকাতার তুলনায় খুবই সস্তা।'

ছয়

বিজন চলে যাবার পর খগেনবাবু ঘরে এসে একটা বই নিয়ে বসলেন। রমলা পশম বোনার কাটি তুলে খগেনবাবুর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মাথার পিছনটা চাপ্টা বেশি, মা বোধ হয় সরষের বালিশে না শুইয়ে তুলোর তাকিয়ায় শুইয়েছিল, মাসীমাও নজর দেয় নি, নাক লম্বা কিন্তু ডগা ভোতা, টিপে ঠিক করা যেত, ঘাড়ে রোঁয়া এত গজায় কেন, চোয়াল চওড়া, ঠোঁট একটু ঝুলে পড়েছে, দুর্বল, দুর্বল নিতান্ত, চেষ্টাকৃত কাঠিন্য, তাই গোঁড়ামিই প্রকট হয়, বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগের নীতি দ্বিতীয় ভাগে কৃত্রিম ভাষায় মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। নতুন মানুষ হবার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। সফীক হল আদর্শ, প্রগতিতে বিশ্বাস হল ধর্ম। ঝুঁকি মানুষ, একরোখা লোক, তবু দুর্বল, কারণ পারম্পর্যবিহীন, যত দুর্বল তত পরিণতির অনিবার্যতায় বিশ্বাসী! তার চেয়ে সুজনের মাথা অনেক ঠাণ্ডা, দোরাখা জামিয়ার। সে ধর্ম মানল না, তবু তার স্বভাব সুসম্বদ্ধ। এদের ভগবানের নামে আপত্তি, কিন্তু সুজন হলে গুছিয়ে বলত, ইতিহাস তার চেয়ে ভীষণ ভগবান, দয়া-হীন, মায়াহীন, অ-মানুষিক, নৈর্ব্যক্তিক। শঙ্করাচার্যের শিষ্যের, জেস্যুইটদেরও হৃদয় আছে, কিন্তু এই ঐতিহাসিক কৈবল্য সাধনায় মানুষ যায় শুকিয়ে। তাই সফীকের মুখ-চোখ রুক্ষ, সেই রুক্ষতার তাপ পড়েছে খগেনবাবুর মুখে। বিজনের আন্তরিক আর্দ্রতা তাকে রক্ষা করবে, কিন্তু এ যাবে জ্বালানি কাঠ হয়ে। নচেৎ সাবিত্রী মরে! রমলার ভয় হয়, জয় করতে কথা কয়।

'মেয়েদের একটা সমিতি আছে এখানে শুনছিলাম।' 'বেশ ত! সেখানে যাও না, সময় কাটবে। হয় কি?' 'এই সেলাই বোনা শেখান থেকে—'

'কত লোককে সেলাই শেখাবে!' রমলা সাবিত্রীকে সেলাই শিখিয়েছিল এটা কি তারই ইঙ্গিত!

'যে শিখতে চায়।'

'আগ্রহ কাদের হয়?'

'জানি না! অন্য কথা কইতে পার ত কও।'

'কী কথা সম্ভব?'

রমলার হাত থেকে বোনার কাটি পড়ে গেল। খগেনবাবু একবার দেখে বই-এ মনোনিবেশ করলেন। অনর্থক এই বোনা আর বোনা, কেবল ফাঁকভরা, তাও আবার যন্ত্রের মতন, মনের বালাই নেই, অন্য দিকে চেয়ে আঙুল চালাও, মাসীমার মালাজপের মতন, যখন ভ্রূ কুঁচকে ঘর গুণতে হয় তখনকার একাগ্রতা একেবারে যৌগিক! নিজেকে ঠকান পরোপকারের অজুহাতে, যার দশটা পশমের জামা তার জন্য পিসিমা একাদশ জামা বুনছেন। জর্জেট পরে চোখে সুর্মা টেনে, অনাবশ্যক ফার্-কোট চাপিয়ে, উঁচু জুতো পরে, মোটর চড়ে সেলাই পার্টি, হঠাৎ—বড়লোক পাঞ্জাবি ভাটিয়া মেয়েরা চুলে সোনালী রূপালী গুঁড়া মাখিয়ে সমবেত হয়েছেন জনসেবায়, আর মেম সাহেবদের মুখ থেকে ডাক-নাম শুনে কৃতকৃতার্থ হওয়া। সাম্যবোধ! মেয়েদের সাম্যবোধ আসে না, মাতৃত্বেও নয়, ননদের ছেলে আর ভাজের মেয়ে হল, আসুক দেখি সাম্যজ্ঞান! দিল্লীতে মহিলাদের আচরণ দেখলে রমলা বুঝবে বৈষম্য কারা চিরস্থায়ী করে রেখেছে। তার ওপর এই ব্যবসায়ী শহর, নতুন বুর্জোয়ার লীলাক্ষেত্র এখানে জনসেবা অচল। বড় শক্ত এখানে মনুষ্যত্ব রাখা—

'বড় শক্ত'। রমা চাইল। খগেনবাবু বল্লেন।

'আমি জানি শক্ত, এই বিজন ধর, বড় শক্ত—বুদ্ধির প্রয়োগ। কেউ পারে, কেউ পারে না। চরিত্র মানে অন্য কিছু নয়, যে বুদ্ধির সিদ্ধান্তকে জীবনে প্রয়োগ করতে পারে তারই চরিত্র আছে, অন্যরা জড়, খায় দায় ঘুমোয় মরে, তারা মানুষ নয়, অথচ এই জড় নিয়েই কারবার। ছ্যাখ, রমলা, সাহিত্য সর্বনাশ করেছে মানুষকে জড় ভেবে, কিনা 'স্বাভাবিক' হওয়া চাই! ওটা কি জান? বুদ্ধিকে ভয়, তাই বুদ্ধির প্রয়োগকে জীবন থেকে পরিত্যাগ করাই স্বাভাবিকতা, অর্থাৎ ভদ্রতা,—বিজন খুব ভদ্র? আর তোমাদের বাঙলা সাহিত্যের চাহিদা 'স্বাভাবিক' মানুষের চরিত্রাঙ্কন', 'স্বাভাবিক' মনোভাবের কবিতা, প্রকৃতির 'প্রকৃত' বর্ণনা, আরো কত কী! আমি অ-স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী।' রমলা চুপ করে বসেই রইল।

'প্রয়োগ কথাটা হয়ত ঠিক নয়, কি বলব? প্রদীপ্ত, জীবনের প্রতি আচার ব্যবহার কর্ম ইচ্ছা প্রেরণা পদ্ধতিতে বুদ্ধির আলো পড়ুক, হাঁ, ভাবগুলোরও ওপর প্রবৃত্তিগুলোও অন্ধকারের বাদুড় হয়ে থাকবে না? একবার উদ্ভাসিত হোক, তখন দেখবে কত মজা! লোকে ভাবে বুদ্ধি বিশ্লেষণ করতেই জানে,

এবং বিশ্লিষ্ট হলেই নাকি সৌন্দর্য কর্পূরের মতন উবে যায়। আমি মানি না, বিশ্লেষণের ফলে আনন্দ বাড়ে, কমে না। তবে সেটা এতই নতুন ধরনের যে দুঃখ, হাঁ, দুঃখ বলে ভুল হয়। এই ধর···তুমি—'

'তুমি থাম, থাম, অনুরোধ করছি থাম, জোড় হাত করব আরো!' 'এই ধর তুমি—তোমার বসার ভঙ্গিটা, যদি হাত দুটো উবুড় করে উরুর ওপর সোজা শুইয়ে রাখতে তবে মনে হত মিশরী প্রতিমা, মনের মুকুরে প্রতিফলিত হত চিরন্তনের শান্ত গভীর ভাবমূর্তি; কিন্তু, হাত দুটো কোলের ওপর গুটিয়ে রাখতে'—'রমলা হাত সরিয়ে নিলে।

'হাত সড়ালে কেন? এবার কিন্তু অন্যরূপ—নেমে এলে কেন পাথর থেকে রক্ত মাংসের মানুষে? যেন নেহাৎ সাধারণ মেয়ের মতন বিরক্তিভরে উঠতে যাচ্ছ, পায়ের জোরে নয়, শির দাঁড়ার জোরেও নয়, কেবল কনুইএর ভরে, অর্থাৎ কৃত্রিম রোষে, এমন কবি বাংলা দেশে আছেন যাঁরা এই ভঙ্গিমাতেই সন্তুষ্ট হবেন. কিন্তু আমি—'

রমলা উঠছে, এমন সময় খগেনবাবু হ্যাঁচকা দিয়ে তাকে টানলেন, টাল সামলাতে না পেরে রমলা খগেনবাবুর চেয়ারে বসে পড়ল। 'ছিঃ রাগ করতে নেই। তুমি জান যে তুমি আমাকে ভরে দিয়েছ। শুনলে ত বিজ্ঞনের মতটা।' বরফের চাঙড়ের মতন রমলা বসে রইল।

'তোমার এখনকার ব্যবহারকে ডাক্তারে বলবে 'ফ্রিজিড'—অথচ, তা নও। ঢাকাই পোরো না, খস্ খস্ করে না? জাপানে স্ত্রী পুরুষে একত্রে স্নান করে, অথচ জাপানী মহিলাদের পোশাক স্ত্রীত্বের 'কফণ।'

'তোমার কি হল বল ত! কেবল মেয়েদের দেহ আর পোশাকের কথা মাথায় ঘুরছে!' রমলা চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজের ঘরে গেল, সঙ্গে খগেনবাবুও গেলেন।

আবার কেন বন্যা এল? জোয়ার ভাঁটার মত দেহের ক্ষুধায় যে ছন্দ আছে তাকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাত্রায় ধরা যায় না। নববধূর লজ্জা রমলার কখনই ছিল না, সাবিত্রী দৈহিক সম্বন্ধকে ঘৃণা করত, রমলার যে ঘৃণা নেই তা সে খুঁটিনাটি ব্যবহারে প্রমাণ দিয়েছে। অথচ স্বামীর ব্যবহারে ঘৃণাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। সেই ব্যাকুলভাবে চেয়েছিল, কিন্তু হতাশ হল যখন, তখন থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে আরম্ভ করলে। সিস্টিন চ্যাপেলের মোছা ছবি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনের দূরত্ব যত বেড়ে চলে ততই দেহের সংযোগের প্রয়োজন হয়—ক্ষতিপূরণ হিসেবে। যত বেশি ক্ষতি ততই পূরণের আগ্রহ। কিন্তু কিছুতেই শান্তি আসে না। মধ্যেকার ব্যবধান দুর্ভেদ্য। ফ্রিজিডিটি— ওটা ত নাম, পরের

ঘাড়ের দোষ চাপান! মানসিক স্তরের পার্থক্য? সেটা চিরন্তন, এক হবার সময় বুদ্ধি লোপ পায়। মানুষ চিত্ত শূন্য হলে দৈহিক আনন্দে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু ক্ষণিক সুখের লোভে, স্নায়ুর ক্ষণিক শান্তির জন্য মানুষ পশু হবে! বিরোধ থাকবেই থাকবে। প্রেমের চরমক্ষণে দ্বন্দ্ব, সন্তান হবার পর দিন কয়েকের জন্য শান্তি এল। আবার দ্বন্দ্ব এল। কিন্তু পুনরাবৃত্তিটা সমাধান নয়। যারা নূতন আগ্রহের সন্ধান পেলে, কজনই বা পায়, তাদের কিছুদিনের জন্য আরাম মেলে। এই চলল চিরটা কাল, শাঁখের রেখার মতন, ঘুরপাক খেতে খেতে ওপরে ওঠা-নামা। শেষে? শেষ-বেশ নেই, যার আদি নেই, তার অন্তও নেই। এই যদি সত্য হয় স্ত্রী-পুরুষের নিতান্ত ব্যক্তিগত ও অন্তরতম সম্বন্ধের বেলা, তবে ডায়েলেকটিক্‌স অপ্রযোজ্য কোথায়? মন গোলোযোগ বাধায়, কিন্তু সেই ভয়ে তাকে বলি দেওয়া কাপুরুষতা, অমানুষিকতা। তন্ত্র-সাধনার একটি স্তরে সাধকদের দৈহিক সম্বন্ধের সময়ে মন্ত্র জপ করবার আদেশ থাকে। মোটেই অ-স্বাভাবিক নয়, পুরুষের পক্ষে সেইটাই সহজ। মেয়েদের মনের বালাই নেই। রমার কথা স্বতন্ত্র···কি যেন একটা ভাবে—পদ্মের ওপর লক্ষ্মীর মতন মন তার ভাসে।

সন্দেহ ওঠে হয়ত বা মনের অধিকারীত্বটাই শেষ কথা নয়। সক্রিয় হওয়াটাই দরকার, সেটাও যথেষ্ট নয়, সমন্বয় চাই, সেখানেও থামা চলে না, সমন্বয়ের পর ওপরে ওঠা। এক-একটি ধাপে আটকে গিয়ে এক-একটি ধরনের মানুষ হল। বিজন সক্রিয়, সুজন সমন্বয়ী, সুজন পরের স্তরের। কেউ কাউকে বুঝবে না— বাদুড় কখনও চিলকে বোঝে? বিজন ভাবছে সফীক বড় ঠাণ্ডা, খাদ পুড়ে যাবার পর খাঁটি সোনা ছ্যাক-ছ্যাক করে। অবশ্য স্বভাব শীতলকে বুকে ধরে গরম করা শক্ত। কোনটাই বা সহজ। অঙ্ক সহজ! ব্যতিরেক-বর্জিত সাধারণ বিশেষকে প্রাণবন্ত করতে ব্যগ্র হবে কেন? ধরাই যাক, কাজটা ক্ষমতার বাইরে, তাই বলে সেটা অগ্রাহ্য? যেটা অসহজ সেটাই নাস্তি? 'যন্ত্র-সংগীতের আলাপ যখন দ্রুত তখন রাগিণীকে চেনা কঠিন, কিন্তু আনন্দ দিতে সেকি অক্ষম? আরাবেস্ক, অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ছবি ও মূর্তিতে মানুষের ছোঁয়াচ নেই, কিন্তু তারা কিছু রসোৎপাদনের অকৃতকার্য নয়। সভ্য অভ্যাসের দোষে খাদ্যে বাজে জিনিস এসে গেছে, ও-গুলো মসলা, তরকারির প্রকৃত স্বাদ নষ্ট করাই তাদের কাজ, শেষে রুচি এমন বিকৃত হল যে মসলা না হলে চলে না, কেবল তাই নয়, যে সিদ্ধ তরকারি চাইবে তার নাম হবে বুদ্ধি-সর্বস্ব, কোল্ড, আরো কত কী! সফীকের মধ্যে শুদ্ধির তাগিদ আছে, সে চলিষ্ণু, তার বিবর্তনের

ক্রিয়ায় মূল্যহীন বিশেষ খসেছে। উথোর গুঁড়ো উড়ে যাক, চুলোয় যাক, অন্যেরা পোড়াক গে, যতক্ষণ কাঠের টুকরো ঝকঝকে তকতকে হয়ে আন্তরিক নির্মাণবিন্যাস উদ্ঘাটিত করছে।

'চল রমা বেড়াতে যাই, একটু হাওয়া লাগিয়ে আসি, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে!'

'মাথা ছাড়ল না?'

'ছেড়েছে, এখনও একটু টিপটিপ করছে।'

'চল, বেশি রাত হল না?'

'তা হোক্ গে, চল যাই। ভাল শাড়ি পর একটা, যেটা দেহের হুকুম মানে, তাঁবেদার-শাড়ি।' রমলা হেসে কাপড় বদলে এল।

খগেনবাবু রমলাকে নিয়ে পার্কের কোনে একটা লোহার বেঞ্চে বসলেন। আরেকটা বেঞ্চে একজন লোক মুড়ি দিয়ে বসে রয়েছে। চৌকিদার হবে। মোটরের হেডলাইট মুখে পড়তে রমলা দু-হাত দিয়ে মুখ ঢাকল—পাংশুবরণ, রঙ আর পাউডার মিশ খায় নি, যেন ননদবৃন্দ ভাগ্যবতী এয়ো-জার মৃতদেহ সাজিয়েছে—খগেনবাবু বলেন, 'ভাবি কখন তোমাকে ভাল দেখায় বেশি, সকালে স্নানের পর দেখেছি গরদের শাড়ি প'রে, সন্ধ্যায় দেখেছি বিজলী বাতির নিচে, এখন দেখছি আবছায়া অন্ধকারে, ঠিক বুঝি না—' রমলা খগেনবাবুর হাতটা টিপে দিলে। নিজের মনে লজ্জা হয় মিথ্যা আচরণে, রমলা পাশের লোকটার বিপক্ষে সাবধান করে দিচ্ছে ভাবেন; 'বসে থাক্ না।' রমলা আরেকটু জোরে হাত টিপলো; 'কেন?'

'কিছু না, চুপ করে বসে থাক, আমার খুব ভাল লাগছে।' আবার একটা মোটর গেল পার্কের পাশ দিয়ে হেড-লাইট জ্বেলে, ফ্যাকাশে রঙ হলদে হয়ে গেছে, 'চল, রমলা, এখান থেকে উঠে যাই।'

'এইখানেই বোসো।'

'যা বলেছ, সভ্যতার বেশি দূরে থাকতে পারি না, অথচ কাছে থাকলে তার কুৎসিত রূপটাই চোখে পড়ে। তবু আমি ভালবাসি, সত্যি বলছি, রমলা, ভালবাসি।'

'তবে কেন আপত্তি করছ?'

'কিসে?'

'এই বিজন যা বলছিল···'

'ওতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধত।' রমলা চুপ করে রইল। খগেনবাবু বল্লেন 'ও ঐ কথাটা! সত্যি তুমি ওদের সমিতিতে যোগ দিতে চাও?'

'কী করব বল একা বসে থেকে ? তা ছাড়া…'

'তা ছাড়া কি ?'

'না, কিছু না।'

'কেন, আমি ত সর্বদাই রয়েছি তোমার সঙ্গে না হোক, আশে-পাশে। এতদিন কানপুরে রয়েছি এক মিনিটের জন্য…তা ছাড়া বিজন ত প্রায়ই আসছে আজকাল। আচ্ছা, বিজনের মনে কী একটা হয়েছে বলত ? যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে।'

'জানি না।'

'সকলেরই জীবনে একটা মুহূর্ত আসে যখন সহজ বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে চোখে পড়ে। তখনই আতঙ্ক হয় বুঝি বা মাথার ওপরকার আকাশটাই খান্ খান্ হয়ে ভেঙে ঘাড়ে পড়ল। কিন্তু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে যাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম সেটা ছিল নিজেরই কামনা মাত্র। বিশ্বাসের প্রকৃতি হল ইচ্ছাপূরণ। আমাদের ইচ্ছাগুলোও আবার ভীষণ কাঁচা, আকাশের দোষ কী! না যাচিয়ে আদর্শ খাড়া করা আমার ধাতে নেই, তাই, রমলা, সহজে আমি হতাশ হই না, আশ্চর্যও লাগে না। বিজন সফীককে মহাপুরুষ ঠাউরেছিল, লোক মন্দ নয়, ভালই, বেশই ভাল, যতটুকু দেখেছি, মাথা পাকা, তাই বলে আদর্শ ব্যক্তি নয়। তুমি যেন, রমলা, আমাকে উঁচু চাতালে বসিও না, নিজেই বিপদে পড়বে…তখন ভীষণ কষ্ট পাবে, সাবধান করে দিলাম আগে থাকতে।'

কোথায় যেন সততার অভাব রয়েছে সন্দেহ হয়—ও সাবধানের অর্থ নেই—ও চায় উঁচু চাতালেই বসতে— কচি খোকার মতন নিজেকে ঠকাচ্ছে—আত্মম্ভরি ধার্মিক—ইংরেজীতে কী একটা নাম আছে—প্রীগ—রূঢ় বিচারে রমলার মনে কষ্ট হয়, ধীরে ধীরে আলগোছে খগেনবাবুর ঊরুতে হাত রাখে।

কী বলতে চায় রমলা, যে সে বিপদে পড়বে না, যে তার বিশ্বাস ঠুনকো নয়, ভিত পাকা, বেদী অটল, গগনচুম্বী তার শিখর ? 'আচ্ছা, রমলা, তুমি আজকাল কথা কও না কেন, কানপুরে এসে কী বোবা হয়ে গেলে, কি ভাব বসে বসে ? একটা বিষয় নিয়ে তুমি চিন্তা কর না জানি, মেয়েরা পারে না, একত্রে একাধিক ব্যাপার তাদের চোখে পড়ে, তোমাদের সময় আমাদের নয়, সেলাই করছ, কথা কইছ, খোকার খেলা দেখছ, উনুনের দুধ উথলে উঠল কিনা ভাবছ — ঐ একই ক্ষণের ছকে নিজের চেহারা ভয় ভাবনা স্মৃতি আশা ভরসা এসে জুটছে— এই যে আজকালকার ছবি, সাহিত্যের টেলিস্কোপিক দৃষ্টি, সব তোমাদেরই আশ্রয়ভুক্ত, মেয়েলি এককালীনতা আর ঐতিহাসিক পারম্পর্য—দুটো পরস্পরের বিরোধী নয় কি ? মেয়েলি আর পুরুষালী প্রত্যয় দুটো—

সেই পুরনো চীন, কেবল চীন কেন, আদিম সভ্যতা মাত্রেই এই দুটিকে প্রাথমিক হিসেবে ধরেছে। নূতন সভ্যতা শুরু হল সেদিন যেদিন পারম্পর্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে মানুষ বুদ্ধিমান হল, তারই ফলে বিজ্ঞান, সেটা পরীক্ষাগারে, তার বাইরে বুদ্ধির পরিচয় আর প্রয়োগ পাচ্ছি সোশিয়ালিজমে। অবশ্য, সাধারণত যাকে চিন্তা বলে সেটা স্নায়ুর চাঞ্চল্য মাত্র, তাই এনার্কিজম্ আসতে পারে জোর, তার উদ্দেশ্য নেই, গড়ন নেই, জেলির মত থক্‌থকে কাদার স্রোত, হাঁ, চলছে, কিন্তু সে চলার ছন্দ নেই, রীতি নেই, গন্তব্য নেই—চলাটাই সর্বস্ব নয়— খানার জলও চলে, তাকে হরিদ্বারের গঙ্গা ভাবা ভুল। খানিকটা তুলে এনে জালায় ভর, ফটকিরি দাও, তলায় কাদা রইল, কেবল ওপরের জল ছেঁকে খাও···এই হল জীবনযাত্রার উপযোগী দর্শন···এ জল বরফ-গলা পাহাড়-ফোঁড়া পানীয় নয়···এই ময়লা স্রোত নিয়েই কারবার চালাচ্ছে সকলে, কে আর চুড়ো থেকে বরফ আনছে বল?···কী ভাবছ?···আমি এ ব্যবসায় যোগ দিতে নারাজ···অন্যে পারে চালাক, এই থেকে অন্নসংস্থান করুক···আমি পারি না এইটুকু জানি···কথা কইছ না যে! পার্কে বসেও চুপ?'

রমলা নীরবে বসে রইল; অন্ধকারের মোটা তুলিতে স্থূল হয়ে দেহের পরিচিত রেখাগুলো মুছে গেল; দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে মনে হয় কষ্টিপাথরের অসম্পূর্ণ মূর্তি; আরেকবার, বহু পূর্বে, রমলা স্মরণ করিয়েছিল আরেক মূর্তির কথা···তার রূপ ছিল সুনিবদ্ধ, সম্পূর্ণতার অভিমুখী, কিন্তু এ যেন ভাঁটি, পাথর আনাই সার, বাটালির দাগ রয়েছে মাত্র··তাই কী! নিশ্চয়ই এর রূপ আছে। খগেনবাবু চোখ কুঁচকে রমলাকে দেখেন। 'তোমার ঈজিপ্টে জন্মান উচিত ছিল, রমলা, কেন জানি না, কেবল তাই ভাবছি। মুখটা ফেরাও, এইবার স্পষ্ট হচ্ছে রাস্তার আলো প'ড়ে, না, গ্রীক টাইপ নয়, ইতালিয়ান নয়, বাঙালী মুখ নয়, অমন তুলতুলে আদুরী মুখ নয়···এই বার ধরেছি, মিশরী···কিন্তু কোন যুগের, আমেন হোটেপ— তুতেন খামেন যুগের? 'না; তখন পচ ধরেছে পুবে হাওয়ার পরশ লেগে···তারও আগেকার থীবান যুগের···মিশরী থীবান। ভারী মজা, রমলা, মিশরীরা বাঁচত মৃত্যুর জন্য, তাদের জীবনের প্রধান বৃত্তি ছিল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া, মৃত্যুর পর দেহ কি খাবে, কোথায় শোবে, কোথায় যাবে তার খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত করা, কবরে জল, খাবার, কাপড় যায় নীল নদের নীচে স্বর্গে যাবার বাধা খাগড়া কাটার কুড়ালটা পর্যন্ত···অথচ মিশরী পোর্ট্রেট নিতান্ত জীবনধর্মী, মাংসপেশীর প্রতি অংশটা পর্যন্ত স্পষ্ট ফোটান। তুমি তার আগেকার নয় জানি। অথচ, গ্রীকরা মৃত্যুর পরে কী হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাত না, এই জীবনই তাদের আদি, মধ্য, অন্ত,—

ব্যায়াম, দৈহিক ও মানসিক পরিণত সৌন্দর্যের পাটই তাদের প্রধান ধর্ম। কিন্তু তাদের ভাস্কর্য দেখলে মনে হয় যে তারা নর-নারীর ওপর দেব-দেবীর অবিশেষত্ব আরোপ করবেই করবে···আরোপ করা আমার ভাল লাগে না···তুমি বলবে আমি আরোপই করি···ওটা ভুল, একদম ভুল···একটা গ্রীক মূর্তিকে বলতে পার না যে এটা অমুক মানুষের প্রতিকৃতি। মিশরী ভাস্কর আত্মাকে দেহ দেয়, গ্রীক ভাস্কর দেহকে আত্মিক করে। আমি মিশরী ভঙ্গি পছন্দ করি, এতে দেহ আছে, যেমন এক একটা মতের 'দেহ' থাকে—আদর্শবাদী আমি নই, বিজন আদর্শবাদী, তাই সে সফীককে হিরো বনিয়েছে। তোমার···ঠিক বলা যায় না, নয় রমলা ?'

রমলা হাত সরিয়ে রাখলে। 'খুব বক্তৃতা দিলাম—নয় রমলা ? কেনই বা দেব না ? আচ্ছা, বিজন কি তোমাকে ক্লাবে ভর্তি করে দিতে পারবে ?'

'ওর সঙ্গে অনেকের আলাপ আছে।'

'থাকাই স্বাভাবিক। বড়লোকের ছেলেরাই কমরেড হয়।'

'ওকে না ভালবেসে কেউ থাকতে পারে ?'

'তা বটে···দেখো, যেন···'

'থাক, অনেক রসিকতা হয়েছে, মাস্টারমশাইএর। কিন্তু, কি করে ক্লাবে যাব ভাবছি।'

'টঙ্গায় যাওয়া হবে না বলে দিলাম।'

'ওগো তা যাব না, তোমার খাতির আমি রাখব।' রমলা খগেনবাবুর কাছে এল। হাত টিপে বল্লে, 'তারও বন্দোবস্ত হয়েছে। বিজনকে অত্যন্ত ঘোরাঘুরি করতে হয়, ও একটা টু-সীটার কিনবে, স্পোর্টস্ মডেল, একেবারে নতুন, অথচ সস্তা।'

'ও কিনলে তোমার কি ?'

'ওই আমাকে পৌঁছে দেবে মধ্যে মধ্যে, আমি ত আর রোজ হাজরে দিচ্ছি না তোমার মতন'! খগেনবাবু খনিক পরে বল্লেন, 'যাবে না কি ?'

'বোসো না, বাড়ি গিয়ে কি হবে! যা ছিরি ফ্ল্যাটের!'

'বিজনকে বল না নতুন ফ্ল্যাট দেখতে ?'

'ফ্ল্যাটে আমি যাব না।'

'ভালই ত বাড়ি পেলে।'

'একটা বুঝি ছোট বাংলো আছে, নাম মাত্র ভাড়া, সামনে লন্ আর ফুলের ছোট বাগান। খোলা জায়গায় তোমারও ভাল লাগবে। তবে লিজ চায় ছ-মাসের। বিজন ধরে বসেছে এখনই নিতে, আমি বলেছি তোমাকে

জিজ্ঞাসা করি তার পর কথা দেব। চল না কাল দেখে আসি। বিজন কাল এলে কি বলব ?'

'ফুলের বাগান, বেশ ত, তোমারও ভাল লাগবে. সেই ভাল। আমার কাজ আছে, তুমি আর বিজন গিয়ে দেখে এস, পছন্দ হয় কথা দিও— আমাকে এর মধ্যে কেন ? কাল আবার কাজ আছে, ওদের কী হল জানতে পেলাম না···চল তোমাকে পৌছে দিই।'

'বোসো না একটু আমার পাশে। উস্‌খুস্‌ করছ কেন ? ওটা দারোয়ান। আমার কী ইচ্ছে হয় না, আমি কি বুঝি না তোমার কষ্ট হচ্ছে, চাই না কি তোমাকে ভাল রাখতে ? এখানে এসে পর্যন্ত তুমি যেন কেমন ধারা হয়েছ··· অত কেবল নিজের দিকে দেখতে নেই গো, দেখতে নেই, লোকে স্বার্থপর বলবে। সত্যি কথা কও···আমিও কী তোমার জন্য কিছু করিনি, খোঁটা দিচ্ছিনা···কি নিয়ে থাকি বল ? বিজন আমাকে কী দিতে পারে যা তুমি একবার আমাকে দিয়েছিলে, যা পেয়েছি ? তুমি কী চিরটা কাল ছেলে মানুষই থাকবে ?' রমলা হঠাৎ খগেনবাবুর মুখ বুকের মধ্যে চেপে ধরলে। 'আঃ কী করছ ! চল বাড়ি যাই।'

'না, যাব না, এখানে বসে থাকব সারারাত, তুমি যেতে চাও যাওগে ঐ ফ্ল্যাটে, দারোয়ান আমাকে পাহাড়া দেবে।' খগেনবাবু হাত ছাড়িয়ে দূরে বসলেন। কেমন যেন ঘিন ঘিন করে···ছলাকলা এই মানঅভিমান, হিসেব-নিকেশ এই দান-প্রতিদান, মিথ্যা আচরণে বক্তব্যের এই মুখ ফিরিয়ে দেওয়া, এই আদর-আপ্যায়ন, এই স্ত্রীত্ব থেকে মাতৃত্বে দ্রুত পরিবর্তন। সত্যি কথা, রমলা পারছে না ফ্ল্যাটে থাকতে, মোটর না চড়ে, স্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে না মিশে। কেন এই জুয়াচুরি ! জবরদস্তিতে সে আপন হবে না। 'সেই ভাল, বিজনের সঙ্গে ক্লাবে যেও, তার দিদি হিসেবে খাতিরও হবে।' রমলা বিদ্রূপ বুঝলে না, সম্মতি আদায় করে উল্লসিত হল দেখে মন বিষিয়ে ওঠে। রমলার বোঝা না-বোঝা অ-বোঝা ইচ্ছাধীন, উদ্দেশ্যাধীন, স্বার্থাধীন, ইচ্ছা উদ্দেশ্য স্বার্থ নিজের নয়, যে পঙ্‌ক্তিতে বসে এসেছে তারই। কিছু পরে খগেনবাবু আর রমলা বাড়ি ফিরল। সে-রাত্রের ব্যবহারে মনে হল রমলা নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে।

পরের দিন বিকেলে বিজনের সঙ্গে রমলা নতুন বাংলো দেখতে গেল। খগেনবাবু একলা বাড়িতে রইলেন। সফীক চেয়েছে চাঁদার হিসেব, হরতালিদের নামধাম, কাজের সূচীপত্র। ভাল লাগে না, কুঁড়েমি আসে। এককাল ছিল যখন বাড়ি নিয়ে মন খুঁতখুঁত করত, তখন বাড়ি ছিল সম্পত্তি। সাবিত্রীর

মৃত্যু হল, দেশ বিদেশে ঘুরলেন, বাড়ির মোহ কেটে গেল। খগেনবাবু মার্কসের চিঠিপত্রের বই নিয়ে বসলেন। কী আশ্চর্য। মাত্র একখানি চিঠিতে, ৫ই মার্চ ১৮৫২ সালে, হ্বীডেমেয়ারকে, মার্কস মজুরদের একাধিপত্যের উল্লেখ করেছেন। এর পূর্বে আছে ১৮৫০ সালের "ফ্রান্সের শ্রেণীবিরোধের" তৃতীয় অধ্যায়ে, এর পরে, ১৮৭৫ সালের "গোথা প্রোগ্রামের সমালোচনায়"। মাত্র এই তিনবার-এর বেশি শ্রমিক একাধিপত্যের ব্যাখ্যা কাল´ মার্কস করেন নি। এঙ্গেলস্ মাত্র দুবার করেছেন, তাও স্পষ্ট সাধারণতন্ত্র হিসেবে। তা হোক, শ্রেণী রয়েছে, শ্রেণী বিরোধ চলছে, সেটা একটা মস্ত শক্তি, যার প্রয়োগ হবে সময় বুঝে, তবেই যাবে সজ্ঘাত, এবং ইতিমধ্যে এই সজ্ঘাতের অজানা ভয়ে কেউ যাবে ওপরতলার আশ্রয়ে, কেউ ভাসবে নিচের স্রোতে। আজ না হয় মজুর হর্তা-কর্তা-বিধাতা নাই হল, কিন্তু এই চেষ্টায় একটা বড় ফাঁকি ধরা পড়ল— এটাই কী কম লাভ!

হাতের বই হাতে থাকে। বিজন ঠিক ধরেছে, প্রত্যেক চিন্তায় রমলা এসে পড়ে। সফীক হয়ত ভাবে যে কানপুরের আবহাওয়ায় এই বদল ঘটেছে। তা নয়, গোড়ার তাগিদ ঐ রমলা, সোশিয়ালিজমটা বুদ্ধি দিয়ে মনকে চোখঠারা মাত্র! খগেনবাবু খাতাপত্র কলম নিয়ে বসেন। বই তুলে রাখতে দুঃখ হয়। বইএর সঙ্গে সম্বন্ধেরও পরিবর্তন ঘটেছে। ছাপা পৃষ্ঠা বাঁধান হলেই চলত, ভাল বাঁধাই হলে ত কথাই নেই, তার ওপর যদি নতুন বক্তব্য, নতুন তথ্য, নতুন অভিজ্ঞতা থাকত তবে পোয়া বারো,·· নবাব-বাহাদুরের প্রতিদিন কুমারী চাই। এখন যাতে তাতে মন বসে না, মনের সে হ্যাংলামি নেই, এখন বইএর কাছে মন তার নিজের দেয় নিয়ে উপস্থিত হয়, যদি লেখকে গ্রহণ করে তবে আগ্রহ জাগে, নচেৎ সময় নষ্ট করতে মন নারাজ হয়। আধুনিক হবার মোহ এবং সময় কাটাবার নেশা এই ছিল তখনকার উৎসাহের রাসায়নিক রচনা। এখনও ছোঁক ছোঁক যে করে না তা নয়, কিন্তু সামলান যায়। এখনও বই পড়ে সময় কাটাবার প্রয়োজন ওঠে, ওঠে বৈ কি! মজুর সভার জন্য নোট লেখার পরেও, সফীকের সঙ্গে তর্ক করার পরেও ওঠে বৈ কি! একটা ফাঁক থেকেই যায়, রমলা ভরাতে পারলে না, দূরত্ব বেড়েই চলল। অবশ্য, রমলা কি বইএর প্রতিভূ? তাই কখনও সম্ভব! জ্যান্ত মানুষ মরা কেতাব হতে চাইবে কেন! নতুন নতুন বিয়ের পর সকলেই বৌকে জীবন্ত পুস্তক ভাবে, বেশ আঁটসাঁট পরিপাটি গেট্-আপ, চমৎকার জ্যাকেট, ওপরে মজাদার ছবি আর বৌএর বাপের বাড়ির ঝি আর ঠাকুমার বিজ্ঞপ্তিতে ভরা, আর ভেতরে নায়িকা, সুন্দরী, প্রেমিকা, রসিকা, অর্থাৎ অরিজিন্যাল কবিতায় ঠাসা! সাবিত্রীকেও হয়ত তাই

ভাবা হয়েছিল, রমলার কাছেও কী সেই প্রত্যাশা! কেবল কবিতার রূপটাই আধুনিক! আবার রমলা মাথার মধ্যে জুড়ে বসে···সে বলে হাতে তার কাজ নেই, তাই পার্কে অনুযোগ করলে, কিন্তু সেটা তার অবসর মাত্র, ভরাক না সংসারের চিন্তায়। তাও পারবে না, মা নয় যে! তাই রাজবালা বিরহবিধুরা, সাবিত্রীও তাই, পার্থক্য নেই। আবার সাবিত্রীর কথা মনে ওঠে কেন? কোথায় গিয়ে মন হাজির হয় কে জানে! দূরে চলে যায়, শহরের ঘুড়ি পাড়াগেঁয়ে, শহরের ছোকরা লাটাইএ সুতো গোটায়, গ্রামের ছেলে ইটে সুতো বেঁধে ঘুড়ি ধরে···কিন্তু ভো কাটা!

রমলা সরে গেল। হয়ত অন্যায় হয়েছে তার দিকটা না দেখে। কি বল্লে, আত্মসর্বস্ব না আত্মকেন্দ্রিক? তবে নিশ্চয় এটা স্বার্থপরতা নয়, অন্তর্মুখিতা মাত্র, সেটা মজ্জাগত, বহির্মুখীরাই সুখ দিতে জানে, যেমন বিজন, বিজন! সুজনের মধ্যে দুইই আছে? কাজের মধ্যে এলেই অন্তঃশীলতা ঘুচবে। ধর্মঘটের খবর পাননি সারাদিন।

রমলা ও বিজন ফিরল।

'খগেনবাবু, বাংলোটা কিন্তু আমার আবিষ্কার, মাত্র আশি টাকা, গ্যারাজ পর্যন্ত পাওয়া যাবে, স্যানিটারি ফিটিঙ্ চমৎকার।'

'গাড়ি কেনা হয় নি?'

'সেটা অবশ্য আপনারা বুঝবেন। রমাদি বলছিলেন যে টু-সীটারের বদলে···'

'নিশ্চয়ই, কিনতে যদি হয় সীডান বডি কেনাই ভাল।'

'অবশ্য আমারও তাই মত, এ অঞ্চলে যেমন ধুলো তেমনি গরম, যেমনই শীত, তেমনই ধোঁয়া। অবশ্য খরচ একটু বেশি পড়ে। তবে কমান যায় অতি সহজে, একটু নজর রাখলে।'

'সে তোমরা যা হয় কোরো। যা দিতে হবে আমাকে বোলো।'

'রমাদি কিন্তু···ও-বিষয় তোমরা বোঝাপড়া করগে, আমি সহজেই দফায় দফায় শোধ দেবার বন্দোবস্ত করছি, কোম্পানির মালিকের ছেলে যে আবার ক্লাবের মেম্বর!'

'মজুর, মালিক, মেয়ে— ভাগ্যবান! তার ওপর সবার সেরা রমাদি। একটা অফিসের ঘর পাওয়া যাবে? ছোট? তা হোক! তাই চাই। ওপরতলায়? চমৎকার! এখানে নোটিশ দিতে হবে কি? তাও সহজে হবে? তবে আর কি! গুছিয়ে নাও তোমরা। ওস্তাদের খবর কি হে! রমলা, সুজনের ঘর হবে বাংলোতে?'

'ভারি মজার কথা কিন্তু! বাড়ি খুঁজে বের করলাম আমি, আর এসে থাকবেন সুজনদা! অর্থাৎ, বিজন নয়।'

রমলা নিজের ঘরে গিয়ে টেবল খুঁজলে, সুজনের চিঠি যেখানে ছিল সেখানেই আছে। বাইরে এসে দেখে বিজন নেই, খগেনবাবুও নেই।

সাত

কয়েকদিন ধ'রে তর্কবিতর্কের ফলে যখন করিম ও অন্যান্য মজদুর-সভার কর্মী বিতাড়িত মজুরদের গৃহীত হবার আশা রইল না, তখন কিষণচাঁদ ছুটে এসে সফীককে বল্লে, 'ওস্তাদ, আমরা তৈরি। ওরা নতুন লোক নিয়ে মিল খুলবেই, আর আমাদের বন্ধ করতেই হবে।' সফীক বর্মা-চুরুট ফেলে দিয়ে ছুটল ডেপুটিপাড়ার দিকে। ভোর হতে তখনও দেরি রয়েছে। একটা দোকানের দরজায় টোকা মারতে একজন বৃদ্ধ মুখ বার করলে। 'আও, বেটা।' জন কয়েক লোক চা খাচ্ছিল। 'ওরা রাজি হয় নি শুনেছ?' 'সঠিক শুনিনি বটে, তবে কেই বা শোনবার জন্য কান পেতে বসেছিল!' 'অন্য বন্দোবস্ত?' 'রাত ন'টা থেকে ফাটকের সামনে লোক জমেছে।' 'স্টেশনে?' 'তৈরি।' 'ব্রীজে?' 'সেখানেও।' 'কিষণ, সাইকেল ক'রে দেখে এস ফাটকের সামনে এখনও লোক শুয়ে আছে কি না। ভোর বেলাতেই সিঁধেল ঢোকে। আসবার সময় উধামজীর ওখানে ঢুঁ মেরে আসতে পার। হয়ত সারারাত তর্কবিতর্কের ফলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিংবা জয়োল্লাসে জাগ্রতই দেখবে।' কিষণ বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ দোকানদার বড় বাটিতে চা এনে দিলে, এনামেলের প্লেটে শিক্ কাবাব। সফীক খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বড় রাস্তায় তখনও নিয়ন-লাইট জ্বলছে। চৌরাহার ঘুন্টির বাইরে কনস্টেবল্, কালো কোটের হাতে সাদা কাপড় জোড়া। 'কি খবর, জমাদার সায়েব! ভাই সাহেবের চাকরি হল?' 'কোথায় চাকরি ভেইয়া! বড় নখাড়া বাধিয়েছে, পঁচিশ রূপেয়া চাইছে।' 'ভাই সাহেবকে না হয় আমার কাছে পাঠিও, উধামজী বলছিলেন মুন্সিপালের দফ্তরে একটা নোকরি খালি আছে। ভাই সাহাব ত' ইংরেজী জানে?' 'তিন দরজা পাশ করেছে, ইংরেজী জানবে না! ডিউটি খতম হলেই পাঠিয়ে দেবো।' কনস্টেবল্ সেলাম ক'রে সফীককে একটা সিগারেট দিল। 'ভোরের দিকে শীত করে, তাই বিলেতী চীজ পোড়াতে হয় ভেইয়া।' সফীক হেসে ফেল্লে। 'বিলেতী চীজের তারিফ

করতেই হয়।' 'নিশ্চয়ই, রূপেয়া ত বিলেতী!'

বড় রাস্তা ছেড়ে সকীক গলির মধ্যে ঢুকল। বেশ্যাপল্লী— একবার বিজন সঙ্গে আসছিল এই গলি দিয়ে, কী রাগ বুর্জোয়া সভ্যতার ওপর, সব চেয়ে জঘন্য এই পাড়া তার মতে। বই-পড়া রাগ, যেমন যুবকদের বই-পড়া কাম? কিন্তু বেশি রাগ কেন? রাগই বা কেন? গোয়াটুলি, জুহীর চেয়েও পচা? যে ব্যাপারটা বুঝেছে তার রাগ আসবে না। জ্ঞানের পর যে-ভাবটি থিতোয়, মানুষের সর্বাঙ্গে সকল ব্যবহারে যেটি ওতপ্রোত হয়, তার প্রকৃতি রাগের মতন উদ্বায়ী নয়। সেটা তৈলাক্ত ধাতুমলের মতন থক্‌থকে, ঘন, ঘৃণার মতন স্থায়ী, গভীর আর ব্যাপক। ঘৃণা, শৌখিন দুঃখবাদ নয়, সদ্‌ভাব, মোড় ফেরান আদর্শবিলাস নয়, যার সক্রিয়তায় গোটান হাত পা খুলে যায়, শুখনো মাথা রসাল হয়। কাজের মূলে ব্যাপক অথচ শান্ত ঘৃণা না থাকলে সেটি অকাজ হয়ে ওঠে। যেমন পল্লী-সংস্কার, সেবা-ধর্মের দুর্দশা হয়েছে। কাজের ক্ষেত্র যখন ছোট এবং রীতিনীতির ভিত্তি যখন বড়, তখন কাজের ফল ধরবে রীতিনীতিরই প্রয়োগে। ওরা বলবে, কেউ বলেছে বোঝাপড়া হতে বাধ্য এই অবস্থায়।

অবস্থাটা কি? হরতাল সম্পূর্ণ, চাঁদা উঠেছে, যদিও আশানুরূপ নয়, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধে নি, বাধবারও সম্ভাবনাও নেই, কিষণচাঁদ ও আরো অনেকে খবর দিয়েছে যে ফাটকের সামনে হরতালিরা জমায়েৎ হয়েছে। হয়ত মাত্র ভিড় করে আছে, একবার দেখলে হয় নিজে। মজুরদের বিরোধজ্ঞানে ভাঁটা পড়ে নি, নিশ্চয়। তবু বোঝা-পড়া হবে কেন? এই সঙ্কটে মিটমাট হলে সর্বনাশ হবে। এগিয়ে চলুক বিরোধ, বেঁচে থাক জিদ্‌, তাকে জুড়ুতে দেওয়া ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। খগেনবাবুও যেন ঐ কথাই বলছিলেন সে রাত্রে, বিরোধ চিরন্তন, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কথাগুলি ফুটেছিল, লোকটির সততা আছে, যা সাধারণত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থাকে না, কত ছুতোনাতা ফুঁড়ে কলি গজায়! 'কতদিক থেকেই না বাধা আসে! একে ত বাইরের চাপ, তার ওপর স্বকৃত ফাঁকির বোঝা। কিন্তু সুযোগও আসে তাইতে। ভিন্ন ভিন্ন অংশের অর্জিত অভিজ্ঞতা এক হতে বাধ্য, সকলেরই মূলে জীবন, সকলেরই মধ্যে দিয়ে জীবনের উর্ধ্বগতি। অথচ খগেনবাবু জীবনস্রোতে বিশ্বাসী নন। যুক্তিটা গ্রহণ করা যায়। পার্টির প্রয়োজন ভদ্রলোক ধরতে পারেন নি, নিতান্ত স্বাভাবিক, তাঁর সংস্কার ব্যক্তিগত, অন্তর্মুখী, জোর ক'রে, কল্পনার জোরে বাইরের সংস্থান বুঝতে চাইছেন, তবু ভাল, বিজনের চেয়ে। বিজন কেন্দ্রচ্যুত হচ্ছে, অবশ্য কেন্দ্র তার ছিলই না।

বিজনের কথা ভাবতে সফীকের চিবুক দৃঢ় হয়। প্রাণবান ছেলে, কিন্তু মাত্র প্রাণ নিয়ে কী হবে! গলির দুধারে এইত' প্রাণের পরিণতি! গলির মোড়ে বাতি টিম্‌টিম্‌ করছে, একটু দুলে উঠল. নিবল না, বিজলী বাতি। মিউ-মিউ শব্দ কানে এল, মরা ছানার পাশে বেড়াল কাঁদছে, কেবল কাঁদছে, আর কাঁদছেন ভারতমাতা, হাপুস নয়নে, বিধবার বেশে, উঠে দাঁড়ান না, চোখ পুঁছে ঘাঘ্‌রা ঘুরিয়ে হাতুড়ি নিয়ে তেড়ে আসেন না! সফীক বেড়ালটাকে লাথি দেখিয়ে তাড়ালে, মরা ছানাটাকে ঠোক্কর মারতে মারতে গলির মোড়ে নিয়ে এল। সমঝোতা নেহী হোনা চাহিয়ে, নেহী হোগা·· মোলকের চোখ জ্বলছে সামনে, ম্যায় ভুঁখা হুঁ। আহুতির যোগান চাই।

মজুর-পাড়ার কিনারা যেন দেখা যায়, আলোর আশীর্বাদে নয়, তমসার ঘনতর প্রলেপে। ধোঁয়া নেই, কল বন্ধ, চুলাও বন্ধ, তবু আকাশটা ত' স্পষ্ট। তার মধ্যে প্রবেশ করতে জাগরণের মৃদু কম্পন অনুভব হয়, তিন মাসের ভ্রূণের মতন, একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তবে বাড়বে, যথা সময়ে প্রসূত হবে। নেতারা নিজেদের ভাবেন জন্মদাতা, দম্ভের শেষ নেই তাঁদের, তাঁরা ধাই মাত্র, দেশী ধাই, তাই আঁতুড় ঘরেই মরে মা ও বাচ্চা উভয়েই, শিক্ষিত ধাই চাই, পরে নার্স, তার পরে শিক্ষয়িত্রী, শেষে চ'রে খাকগে। অনেক দেরি লাগান প্রকৃতি ঠাকরুণ শহুরে ভদ্রঘরের বাপ মায়ের মতন। জৈব-অভিব্যক্তির বিকাশ দীর্ঘকাল ব্যাপী। এতদিন তাতে আসত যেত না, কোটি বছর লেগেছে এক-একটা জাতি জন্মাতে। কিন্তু আজ অচল তার এই মন্থরগতি। বিজ্ঞান এল, কল-কব্জা এল, জীবনযাত্রার উপায় পরিবর্তিত হল, এখনও সমাজ-বিবর্তন মহাকালের খেয়ালের তাঁবেদারি করবে! কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতে হবে. পাতা ঢাকা দিয়ে কাঁচাকে ডাঁসা, ডাঁসাকে পাকাতে হবে, তবে বাজারে চলবে। আমেরিকায়, রাশিয়ার যব গম পাকাচ্ছে তিন সপ্তাহে, আর মানুষ সচেতন হতে লাগবে বিশ বছর! তা হয় না— অত বেহিশেবিপনা মধ্যযুগে চলত; অচল বিশেষত আজকাল, যখন দারিদ্র্যের দুর্দশার অন্ত নেই, ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। শ্রেণীর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা প্রকৃতির নিয়মাধীন নয়— অন্তত যে-রীতি নিয়ম বলে চালান হয়েছে এতদিন যাবৎ। বিরোধের পর বিরোধ, হাতুড়ির ঘা-এর ওপর ঘা, এক ঘা-এ হল না ত' বিশ ঘা, এতে হারজিত নেই, ধারাবাহিক আঘাতের ফলে চৈতন্য আসবে। উধামজী ভাবছেন এটা বুঝি সরকারের কাজ। সরকারের চোদ্দ-পুরুষের ক্ষমতা নেই। ওরা নিজেরা লড়ুক। পার্টির কাজ জাগান, জাগিয়ে রাখা। সাপে কামড়ান লোক ঘুমলেই মরে, তাই ঠেলে বসাতে হয়, চড়-চাপড়-ঘুষি দিয়ে। 'এতে হারজিত নেই, সবটাই জিত।

'করিম, তোমাদের পাড়ার খবর কি ?'

'আমার পাড়ার জন্য ভাবি না, কিন্তু অন্য পাড়া যেন তৈরি নয় সন্দেহ হল। তারা বলে বোঝাপড়া হওয়াই মঙ্গল।'

'সেখানে কে কে আছে ?'

'সরযুপ্রসাদ, উধামজীর লোক।'

'সরাও তাকে। পাড়া থেকে নিজেদের লোক খাড়া কর।'

'আগেই বলেছি ওস্তাদ, ওদের নিয়ে চলে না। সরযুপ্রসাদের চার-চারখানা বাড়ি।'

'জানি, কিন্তু না নিলে আপাতত চলে না তাই সরযুর মত লোক এসে পড়ে। যা হবার হয়ে গেছে, এখন ?'

'কাল পর্যন্ত দেখি।'

'কালের বাকি কি! সকাল হয়ে এল। তোমার মিলের সামনে…'

'আমাদের মিল-কমিটির আওরাৎরা বাচ্চা নিয়ে চলে গেছে আধ ঘণ্টার ওপর। ওস্তাদ…'

'কি ?'

'যদি ওরা ঘাবড়ে যায়!'

'কারা ?'

'ও পাড়ার দল…'

'তখন প্রত্যেক মিলের সামনে যারা শোবে তাদের মাথায় ও পায়ের কাছে আমাদের লোক থাকবে, তারা লরি আটকাবে, লরি যদি চলে তাদের বুকের উপর দিয়ে প্রথম চলবে।'

'আচ্ছা ওস্তাদ, মজদুর সভার…'

'মজদুর-সভা লীড্ দেবে তখন, যখন আমাদের পিকেটিং শুরু হবে—প্রস্তাব গৃহীত হতে লাগবে দু'তিন দিন— অত দেরি সহ্য হয় না, ইতিমধ্যে হাজার লোক হাজির হবে! আমাদের তৈরি থাকা চাই।'

'কেবল তৈরি ওস্তাদ ?'

'ঠিক বলেছ করিম, কেবল তৈরি থাকলে চলবে না। ব্যাপারটা বাধিয়ে দিতে পারলে মজদুর-সভা বাধ্য হবে আমাদের সমর্থন করতে।' করিম চলে গেল।

আগে এটা হোক পরে ওটা হবে! কিন্তু এটা-ওটার মাঝখানে প্রকাণ্ড অবসর, সেই ফাঁকে কর্মপ্রবাহে ভাঁটা আসে, লোকে আরাম খোঁজে, ঝুলে পড়ে, ভিজে যায়, নিবে যায়। ধাক্কার পর ধাক্কায় গাঁথুনি নিরেট হয়, নয়তো বালির

প্রাসাদ।. যে বিশ্রামে ঘুম আসবে অচেতনদের, সেই বিরামে বিরোধের নতুন ফন্দী আবিষ্কৃত হোক্। তার বদলে মিউ, মিউ, মিউ'···স্বদেশ-প্রেমিকের রচিত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। বিরামে সাহিত্য, চারুকলাও তৈরি হয় না। যে অবস্থায় কর্মের সুযোগ ঘটে তাকে বিরাম বলে না— সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পর ক্লান্তি এল, আধ-জাগন্ত আধ-ঘুমন্ত মনটা তখনও অচেতন হয় নি, সেই সময়েই গুপ্ত কামনা মুখর হয়। অকাজের আই-ঢাই থেকে বেলোয়ারি, ঠুনকো জিনিসই পয়দা হয়। শহরের হঠাৎ-বড়লোকদের বাংলোর চিম্নী যেন! ভোরের দিকে এখনও ঠাণ্ডা পড়ে,···আর এক কাপ চা পেলে ভাল হত।

গোয়ালটুলির চৌরাহায় আলো নিবেছে, সূর্যের আলো পড়তে দেরি। যাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল, তারা এখনও উপস্থিত হয় নি। অত্যন্ত দেরি করে এরা···কিষণচাঁদ কথা অমান্য করে না···হয়ত অত রাত্রে উধামজীর দেখা পায়নি। খগেনবাবু পলিটিশিয়ান নন, তবু খেটে ভাল নোট লিখলেন। উপকারী জীব···বুদ্ধিসর্বস্ব বলে অভিমান আছে। সন্তুষ্ট রাখলে কাজ পাওয়া যাবে। বিজন ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। স্ত্রীলোকটি·· স্ত্রীলোক· ·সাধারণ স্ত্রী·· বিজনের আরাম মিলবে·· একটু বিপদ আছে। তখন অন্যত্র সরিয়ে দিলেই চলবে।

'কিষণচাঁদ।'

'ওস্তাদ! তুমি নিজে একবার চল। লোক রয়েছে, তবে যেন যা চাইছ, তা নয়। উধামজী বলছিলেন, সরকার ভয় পাচ্ছেন হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গাতে।'

'বাধবেনা। যদি বাধে, সরকার রয়েছেন কী করতে! গুলি ফুরিয়েছে!'

'ওঁরা চালাবে না।'

'শান্তিপ্রিয়, বুঝেছি। টিয়ার গ্যাস— তাতেও বাধা!'

'জানি না।'

'সাইকেলটা দাও, দেখে আসি কতদূর বন্দোবস্ত হল। সরযুপ্রসাদের পাড়ায় প্রথমে যাব।'

পথে একটা দোকানে চা খেয়ে সফীক জুহীর পথে একটা মজুর-পল্লীতে হাজির হল। মেয়ে-পুরুষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে। মিলের ফাটক থেকে হাত পঞ্চাশ দূর পর্যন্ত রাস্তায় মজুর নেই, কিন্তু জনকয়েক পালোয়ানের মতন চেহারার লোক মোটা মোটা লাঠি বগলে রেখে হাতে হাতে খয়নি ডলছে। মহবুবের সঙ্গে দেখা হতে সফীক প্রশ্ন করলে. 'কি হালচাল?'

'ভাল নয় ওস্তাদ।'

'শুনেছি। কি করবে?'

'আগে থাকতে বলতে পারছি না। দেখি ওরা কি করে?'

'ওরা ত বেশ এন্তাজাম করেছে! গুণ্ডাগুলো যদি প্রথমেই মারপিট শুরু করে তবে এ-পাড়ার মজুররা ভয়ে পিছিয়ে যাবে। তার পূর্বে যদি হুড় হুড় করে সব মজুর ওদের ঘিরে ফেলে তবে আমাদের সুবিধা। একবার অন্তত জয়ের স্বাদ পেলে আর ভাবি না। এক কাজ কর— তুমি ভিড়ের ঐ দিকটার পাড়ায় যাও, আমি এ দিকটায় ঢুকছি। পাড়ার লোকদের বলগে যে আরো গুণ্ডা আসছে, তার পূর্বে এদের ঘিরে ফেলা চাই চালাকি করে।'

মহবুব কথামত চলে গেল, সফীক ওভারকোটের কলার নামিয়ে কোমরের বেল্ট এঁটে ঢুকে পড়ল জনতার ডানদিকের পাড়ায়। তাকে যেতে দেখে জনকয়েক লোক ছুটল সঙ্গে। চারপাশে খোলার ঘরের মাঝখানে একটা খোলা জায়গা, যত রাজ্যের ময়লা জমেছে, একটা নর্দমায় পচা জল, সবুজ বুদবুদ ফুটে আছে, দুটো ঘেয়ো কুকুর চেঁচিয়ে উঠল, বেড়াল ছুটে পালালে, মুরগী ও হাঁস চরছে কাদা মেখে, খোলার ঘরে দরজায় চটের ছেঁড়া পর্দা ঝুলছে, ন্যাংটো ছেলে মেয়ের মাথার পশমি টুপি, গায়ে জামার ওপর জামা, জাঙ্গিয়া নেই কারুর, হামাগুড়ি দিচ্ছে তিনটে বাচ্ছা। জন পনের মজুর জমল সফীকের পাশে— পর্দার আড়াল থেকে মেয়েরা উঁকি দিচ্ছিল।

সফীক বল্লে চেঁচিয়ে, 'তোমরা মরদ না আওরাৎ? ফাটকের সামনে গুণ্ডা জমায়েৎ, লরিভর্তি আরো আসছে, যদি নয়া মজুর আসে তবে তোমাদের খানা-পিনা জুটবে না, যদি গুণ্ডা আসে তবে তোমাদের বিবিদের ইজ্জৎ থাকবে? ওরা মুসলমানদের জেনানা ভেঙ্গে দেবে, আর তোমরা দাঁড়িয়ে তা সহ্য করবে?'

একজন মেয়ে মানুষ পর্দার আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল অভদ্র ভাষায়, 'পরশু থেকে আদমি বেহোঁস হয়ে পড়ে রয়েছে, আরো দারু চায়, বলে পিয়াস লেগেছে, আওরাতের সারা অঙ্গে কাল্‌সিটে, এ আদমি কোন কাজের লায়েক নয়, বাইরের গুণ্ডা এলে তাদের সঙ্গে ভাঁটিতে যাবে জেনানা ছেড়ে।'

'চুপ্ রহো— চুপ রহো···'

'কাহে চুপ্ রহুঙ্গী' বলে মেয়েমানুষটি বেরিয়ে এল বোরখা পরে। সফীক তাকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল— 'এ আওরাতের কী দশা হবে ভেবেছ···তোমরা এখনই বিহিত কর। তোমাদের সর্দার কে?···নেই! বেশ, এখনই সর্দার ঠিক কর, এটা লড়াই, সর্দার চাই।'

একজন বুড়ো বল্লে, 'এরা যদি চায়, আমি রাজি আছি।'

'তোমরা রাজি আছ?' তিন চার জন একত্র বলে উঠল, 'খাঁ সাহাব বড়

কাবিল আদমি।'

সফীক— 'আচ্ছা, খাঁ সাহাব আপনার মতে কী এখন ঘরের ভেতর বসে থাকা উচিত, না বেরিয়ে এসে ফাটকের সামনে যে সব গুণ্ডা জমায়েৎ হয়েছে তাদের তাড়ান উচিৎ?'

খাঁ সাহেব বল্লে, 'প্রথম থেকেই মার দেওয়া মরদের কাজ।'

স: 'আপনি যা বলবেন এরা তাই শুনবে, কেমন?' সকলে হাঁ-হাঁ করে উঠল।

'খাঁ সাহেব, তবে আপনি জনকয়েক বাছা-বাছা লোক নিয়ে ফাটকের দিকে চলুন— জন তিনেক জোয়ান-পাট্টা এইখানে থাকুক— আপনি যাকে যাকে বেছে নেবেন তারাই যাবে, বাকি, লোক এখানে থাকবে— আপনিই সর্দার।'

সফীক ছেঁচতলার গলি দিয়ে অন্য পল্লীতে পড়ল।

অত সকাল বেলাতেও কথক ঠাকুর চাঁদোয়ার তলায় ব'সে আছেন। পণ্ডিতজীর গলার মালা শুকিয়েছে, অখণ্ডপাঠ নিশ্চয়। হারমোনিয়াম বেজে উঠল, পণ্ডিতজী গাইতে শুরু করলেন ভাঙ্গা গলায়, তবলার ঠেকা ঢিমে লয়ে। মধ্যে মধ্যে পণ্ডিতজী বক্তৃতা দিচ্ছেন, অযোধ্যায় রামরাজের গুণবর্ণনা, বিনিয়ে বিনিয়ে বলছেন, মহারাজ প্রজাবৎসল, ব্রাহ্মণদের গাভী দান করেন, যাগযজ্ঞ লেগেই আছে, ভোরের বেলা নহবতে সানাই বাজে। সফীক পাশের লোকের কানে কানে বল্লে, 'এ রাজ্যে মিলের ভোঁ'। লোকটা হাসলে। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ নেই, (এখানে খেতে পায় না) মরাই-ভরা গেঁহু আর যব (এখানে খালি), গোয়াল-ভরা গাই, দুধের দাম দিতে হয় না, (এখানে দুধ মাখন খেতে পাও নাকি হে!), যত পার খাও (যত পার খেটে মর), সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য. প্রত্যেকের জমিজরাত, (ভেইয়া, তোমার তালুক থেকে ক' হাজার রূপেয়া ওঠে!) পাশের দু'তিন জন লোক সফীকের টিপ্পনী শুনে মুচকে মুচকে হাসছিল। সফীক ভাল মানুষের মতন জিজ্ঞাসা করলে, 'পণ্ডিতজী সে সময় জমিদারী ছিল না, লাগান দিতে হত না?' পণ্ডিতজী থতমত খেয়ে বল্লেন, 'কথার সময় বিরক্ত করতে নেই, পাপ হয়।' সফীক বিনীত মুখভঙ্গি করে অতিশয় নম্র কণ্ঠে মাপ চাইলে। সামনের জন কয়েক লোক পিছন ফিরে দেখলে। পণ্ডিতজী গান শুরু করতে সফীক এগিয়ে গেল তাঁর সামনে। 'বাঃ বাঃ পণ্ডিতজী, ইয়ে আপিকা কাম। ঠেকা দ্রুত চলছে, পণ্ডিতজী উৎসাহিত হয়ে গাইছেন, সফীক তাল দিচ্ছে সকলে তালি দিতে শুরু করল, সফীক উত্তেজিত হয়ে জোরে জোরে তাল দিতে লাগল, মনে হয় যেন আড়িতে বাজাচ্ছে, লোকগুলো তাল রাখতে পারছে না, ক্রমে যেন তাল ভ্রষ্ট হল, পণ্ডিতজী তবলচিকে ধমকালেন, সে

তালচিমে করে সিধে ঠেকা দিতে শুরু করলে। সফীক বল্লে, 'ওস্তাদ, জোরসে, ফুর্তিসে বাজাইয়ে।' পঞ্চাশ জোড়া হাতে তখন ঘন ঘন তালি চলছে। পণ্ডিতজী গান থামালে সফীক দশাপ্রাপ্ত ভক্তের মতন মাথা নাড়তে লাগল। 'বা, বা, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ···জয় রামচন্দ্রজীকো জয়'— পণ্ডিতজী বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

একজন লোক এসে খবর দিলে, 'খাঁ সাহেব লোকজন নিয়ে ফাটকের দিকে গেল, বাইরে থেকেও নাকি গুণ্ডা এসেছে'। সফীক উচ্চ কণ্ঠে বল্লে, 'আমিও শুনেছিলাম বটে আসচে, তারা এরি মধ্যে হাজির হয়েছে ? মুসলমান গুণ্ডা ? তোমাদের পাড়ার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত চাই।' 'নিশ্চয়ই'। জনকয়েক সফীককে ঘিরে দাঁড়াল।

'পঞ্চায়েৎ বানাও, এ পাড়ায় একজন গুণ্ডাকেও ঢুকতে দেওয়া হবে না কিছুতেই।' পঞ্চায়েৎ তৈরি হল তৎক্ষণাৎ। এইবার পঞ্চায়েৎ একটা সর্দার খাড়া করুক।' সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে সফীক বল্লে, 'কেউ কাউকে বিশ্বাস কর না দেখছি। খাঁ সাহেবের মতন মরদ একজনও তোমাদের ভেতর নেই, অথচ সে হল বুড়ো থুড়থুড়ে।'

'খাঁ সাহেবের কথা দুসরী, সন্ সাতাওয়নের জোয়ান।'

'বেশ পঞ্চায়েৎ বানিয়ে মার খাও সকলে মিলে। যদি না পার, অন্তত পাশে খাঁ সাহেবের পাড়া আর তোমাদের পাড়া এককাট্টা করে পাহারা দাও। এস জনকয়েক আমার সঙ্গে।' জনকয়েক ছোকরা সফীকের সঙ্গে চলল। পথে সফীক তাদের বল্লে, 'বড়ই লজ্জার কথা— তোমরা জোয়ান, আর বাইরের লোক এসে কানপুরের মিলে কাজ করবে, কানপুরের মজুরদের বাড়ি ঢুকে মেয়েদের ওপর অত্যাচার করবে, ঘর দোর জ্বালিয়ে দেবে, বাড়ি অবশ্য তোমাদের নয়···হা, হা, হা···কার বাড়ি কে জ্বালায়···' সঙ্গীরা হেসে উঠল।

'কিন্তু বড়ই লজ্জার কথা।'

'আপনি কি বলেন ?

'আমার ত' মনে হয়, মারপিটে কাজ নেই।'

'নিশ্চয়ই, মারপিটে বহুৎ লোকসান।'

'কিন্তু আমি বলি— না খেতে পেলেও লোকসান। যেই বাইরে থেকে মজুর আসবে তখন তোমাদেরই সর্বনাশ। ওদের আসা বন্ধ করতে হবে। এখন পর্যন্ত মাত্র জনকয়েক এসেছে। বেচারিদের দোষ কি! তাদেরও বালবাচ্ছা আছে তাই আমি বলি— ভালয় ভালয় তারা ফিরে যাক্।'

'তাই কখনও যায়!'

'নিশ্চয়ই যাবে।'

'দেখবেন তখন, গলা ধাক্কা না খেলে তারা ভাগবে না।'

'অতদূর যাবার প্রয়োজন নেই। মহাত্মাজী বলেন ...'

'তা ঠিক...সত্যাগ্রহ করতে হবে।'

'সত্যাগ্রহ করবে তোমাদের জাতভাইদের বেলা। আর যারা লাঠি নিয়ে যমদূতের মতন সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে?'

'তাদের...?'

'আমি ভাবছি তাদের চারধার থেকে ঘিরে ফেলতে হবে। যেই তারা দেখবে অনেক লোক, তখন তারা ভাগবে নিজে থেকেই।'

'সেই ঠিক— কিন্তু লোক?'

'তার ভাবনা নেই। তোমাদের পাড়ায় ক'জন মরদ?'

'পঞ্চাশ-ষাট।'

'খাঁ সাহেবের সঙ্গেও তাই। ঐ রকম আরও শতখানেক চাই। রাস্তার দু'দিক থেকে ঘিরতে হবে। তোমরা এ ধার থেকে যাও, আমি অন্য পাড়ার লোক আনছি।'

সফীক যখন ফাটকের সামনের বড় রাস্তায় এল, তখন বিস্তর লোক হাজির হয়েছে। তখনই মহবুব প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক দিয়ে এল। দুটো ভিড় মিশে গেল।

'মহবুব, এ হবে না, সকলেই একদিকে রয়েছে, শতখানেক লোক নিয়ে ওপাশে যেতে পার কাউকে না জানতে দিয়ে? যদি না পার, তুমি ওদিককার পাড়ায় খবর দাও যে মন্ত্রীরা শীঘ্রই আসছেন, তারা ঝাণ্ডা নিয়ে চলে আসুক, সামনে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে তুমি এগুবে, পাশে থাকবে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা, সেইটে আগে রাখবে, বড় রাস্তায় পড়লে লাল ঝাণ্ডা সামনে— বুঝেছ?'

মহবুব চলে যেতে সফীক এ পাশের ভিড়কে এগিয়ে নিয়ে চলে গেল। সফীক একজন ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাদের ঝাণ্ডা নেই? লাল ঝাণ্ডা?'

'কংগ্রেসের ঝাণ্ডা আছে।'

'তাই নিয়ে এসো জলদি।' লোকটা ছুটল। সফীক খাঁ সাহেবকে দেখে বল্লে, 'আপনি একবার কষ্ট করে এদের বুঝিয়ে দিন যে মারপিট মজুর পল্লীতে চলবে না, ছুঁচ গলেনা এ-পাড়ায়, লাঠি ত মোটা।' খাঁ সাহেব উত্তর দিলে যে বক্তৃতা তার ধাতে নেই, সে জানে লাঠি ধরতে ছুরি খেলতে।

'আপনি এ-পাড়ার শের— আওয়াজ দিলেই হবে। ভেঁইয়ো, খাঁ সাহেবের

কিছু কথা আছে। তোমরা বসে পড়।' সকলে মাটিতে বসল। খাঁ সাহেব বল্লে, 'আমি বুড়ো হয়েছি— এককাল ছিল যখন লাঠির জোরে একা দশ দুশমণের শির ভেঙ্গেছি। এখন পারি না।'

সফীক বল্লে, 'এখনও পারেন, কেঁও ভেঁইয়া, তোমরা ভাবো পারেন না?'

'উনি আবার পারেন না, সেবারকার হাম্‌লায় একা তিন জনকে সাবাড় করলে!' 'রহিম যে রহিম অত বড় পালোয়ান, ছুটল খাঁ সাহেবের গণ্ডাশের ভয়ে!'

খাঁ সাহেবের মুখে হাসি ফুটল— 'ব্যাটা ভারী বদমায়েস ছিল, রামখেলাওয়নের লেড়কিকে নিয়ে ভাগবার মতলব। ব্যাটাকে সমঝে দিলাম, এ-পাড়ায় ও-সব চালাকি চলবে না, বদমায়েসি করতে চাস্‌ অন্য যায়গায় চলে যা যতদিন এখানে থাকবি ততদিন চুপচাপ থাক্‌।'

সফীক নিচু স্বরে বল্লে, 'কিন্তু খাঁ সাহেব, ওরা বাইরে থেকে গুণ্ডা এনেছে।'

'ভেতরে আসতে পাবে না— এক পা এগিয়েছে কী মরেছে!'

'লরি-ভরা লোক আসছে।'

'আসতে দেওয়া হবে না, আদমীর দেওয়াল উঠবে।'

সফীক জোরে জোরে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে লাগল। সকলে বল্লে, 'জরুর, দেওয়াল বন্‌-যায়গা!'

'কিন্তু সামনে?'

খাঁ সাহেব— 'সামনেও তাই হবে।'

'নিশ্চয়ই খাঁ সাহেব, তাই ঠিক। কিন্তু ওরা ফাটকের সামনে, পিছন থেকে পুরী হালুয়া কোপ্তা কাবাব আসবে, যতদিন ইচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকবে, পরোয়া নেই, আর আমাদের যেতে হবে ঘরে খানার জন্য, ঘরে যা খানা আছে তা ত জানি! হা, হা, হা, তবু— আমি বলি, ওদের লোক কম, আমরা বেশি, যদি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই দু'পাশ থেকে ওরা কোন-ঠেসা হবে, ভয়ে তখন ফাটকের ভেতর পালাবে, তখন ফাটকের সামনে ধন্না দিলেই চলবে।'

'বহুৎ আচ্ছা বেটা!'

'ওদিকের বন্দোবস্ত করে আসছি, আপনি তৈরি থাকুন।'

সফীক ছুটে গলির ভেতর দিয়ে রাস্তার অন্যদিকে পৌছুল। মহবুব বিস্তর লোক এনেছে, তারা মন্ত্রীদের আগমন প্রতীক্ষা করছে। সফীক বল্লে, 'এগিয়ে নিয়ে এস সকলকে, ওদিকে খাঁ সাহেব তৈরি, জাঁতাকলে পিষে মার। সামনে মুসলমান রাখ, যতজন আছে ততজনেই হবে, তাদের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দাও, তুমি পিছনে থেকো। ওপাশ থেকে এগুচ্ছে দেখলেই তোমরা এগুবে— আদৎ

কথা, মুখোমুখি যেন দুটো ভিড় মেশেনা, একটু ত্যারছা ভাবে চলো, যাতে ফাটকের সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা ভাবে যে তাদেরই দিকে এগুচ্ছে··· বুঝেছ···কিছুতে মুখোমুখি নয়। আমি যাব, না এইখানে থাকব?'

'ওস্তাদ, তুমি এই পাশটায় দেখ, আমি ওধারে যাচ্ছি···এদের মেজাজ ঠিক বুঝতে পারছি না, এসেছে এরা মন্ত্রীদের অভ্যর্থনা করতে, যদি উল্টা বোঝে?'

'সোজাকে উল্টা করতে হবে। মহবুব, তুমি ওদিকে যাও, দেখ যেন ফাটকের দিকেই এগুচ্ছো, দারোয়ানেরা এই সন্দেহই করে।'

মহবুব সরে যাবার পর সফীক পাশের লোককে একটু উঁচু গলাতে বল্লে, 'আমার মনে হয়, মন্ত্রীরা এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন না। সকাল থেকে আবার মিটিং বসেছে, একটা হেস্তনেস্ত না করে তাদের আসা উচিত নয়।' লোকটি উত্তর দিলে, 'তাঁরা এখনই আসবেন আমি খবর পেয়েছি!'

'পাকা খবর?'

'নিশ্চয়ই, আমার কাছে কাঁচা খবর আসে না।' পাশের লোক হেসে মন্তব্য করলে, 'চৌধুরীর কাছে কাঁচা খবর, কী বলছ ভেইয়া! উনি নিজে ছাপাখানায় কাজ করতেন, এখনও ওঁর জামাই তেল ঢালে।'

সফীক ক্ষমা চাইলে ভুল খবরের জন্য।

'কতক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়ান যাবে, তার চেয়ে মিলের দেওয়ালের পাশে ছায়া আছে, সেখানে চৌধুরী সাহেব দাঁড়াবেন চলুন। ঐ যে ও-পাশের লোকেরাও এগুচ্ছে— বা রে! ওরা আবার অত লোক কেন? সে হয় না, আমরা আগে পৌছুব···কি বলেন, চৌধুরী সাহেব?'

'নিশ্চয়ই, সকলের ছায়াতে দাঁড়াবার জায়গা কোথায়!'

'নিশ্চয়ই, কে আগে ছুটে পৌছুতে পারে! এক, দুই, তিন··'

সফীক একটু দ্রুত ভাবে হাঁটতে শুরু করলে, সঙ্গে চৌধুরী সাহেব, আরো দশজন, কুড়িজন—তাই দেখে ও-পাশের লোকেরাও দ্রুত এগুতে লাগল। যখন দুটো দল প্রায় ফটকের সামনে তখন সফীক এগিয়ে এসে জোর গলায় হেঁকে ফাটকের দারোযানদের হুকুম দিলে, 'ভাগো হিঁয়াসে··' ও পাশ থেকে খাঁ সাহেব বল্লেন, 'ভাগো হিঁয়াসে', মহবুব আর সফীক দুজনে প্রহরীদের সামনে এসে বল্লে, 'জলদি ভাগো হিঁয়াসে···'

দারোয়ানদের চোখের পাতা কেঁপে উঠল, হাতের খয়নি খসে গেল, এক-জনের গলা থেকে গয়ার ওঠার মত শব্দ হল···চোখের ওপর চোখ রেখে সফীক মুখে হাসি এনে বল্লে, 'দেখছো না ভেঁইয়া, ওরা কেবল ফাটকের সামনে আসতে

চায়, ভেতরে ঢুকবে না, তোমরা দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে পাহারা দাও··· তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না···যাও, এই বেলা ভেতরে যাও, আমি ওদের সামলাচ্ছি · ’

লোকটা থতমত খেয়ে বল্লে, ‘মারপিট যদি করে, আমরাও পিছুপাও না, কি ভাবে আমাদের !’

‘ওরা মারপিট করবে না···শীগ্‌গির ভেতরে যাও ··এই যে মহবুব ওদের বল যেন ফাটকের দশ পা দূরে আসে, যাও···রুখে দাও···যাও’···

সফীক ছুটো হাত বিস্তৃত করে জন তিনেক প্রহরীকে ফাটকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, যেন তাদের রক্ষা করছে। মহবুব দেখতে পেয়ে ছুটে এল · দুজনে মিলে হাত জুড়ল, তাই দেখে দুদল থেকে আরো জন কয়েক হাত জুড়ে বাকি ক'জন প্রহরীকে ভেতরে ঠেলে দিলে। সফীফ ছুট্টে গিয়ে খাঁ সাহেবকে অভিনন্দন জানালে ‘এবার আদমীর দেওয়াল গাঁথুন, রাজমিস্ত্রী·· ’ সফীক চৌধুরীকে খাঁ সাহেবের সামনে টেনে হাজির করে বল্লে, ‘চৌধুরী সাহেব বলেন যে মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করতে হলে রাস্তার ওপর হয় না। আপনার কি মত ?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘মহবুব, তুমি না হয় একবার ছুটে যাও, খবর নিয়ে এস। ইতিমধ্যে আমরা দেখব যেন ফাটকের বাইরে অন্য কোন লোক না আসে। সব বসে যাও। সরকার এলে উঠব, লরি-ভর্তি গুণ্ডা আর মজুর এলে সত্যাগ্রহ করব।’ মহবুব চলে গেল। খাঁ সাহেব ও চৌধুরী উৎসাহের সঙ্গে জনতাকে বসাতে, ওঠাতে, হঠাতে লেগে গেলেন। পানওয়ালা, হুক্কাওয়ালা, জিলেবিওয়ালা ঘুরতে লাগল।

সফীক পাশের একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। দু-পেয়ালা চা, দুটো পরোটা খাবার পর একটা বর্মা চুরুট ধরালে। এখনও এরা নাবালক, এক দুই তিন বলতেই ছোটে, খগেনবাবু চেয়েছিলেন এরা নিজেরাই কর্তা বেছে নেবে, এ-অবস্থায় তা' হয় না, আপাতত পার্টি বাছবে, তারপর দেখা যাবে···এখন কাদা, এঁটোলো মাটি চাই, তবেই এধারে ওধারে টেপো, রূপ পাবে। একমাত্র উপায় বিরোধ, ধাক্কার উপর ধাক্কা·· বলে কিনা হিন্দু-মুসলমানের লড়াই বাধবে·· চাপা হাসিতে ক্ষণিকের জন্য চোখের কোনে চামড়া কুঁচকে গেল। কিন্তু যদি বোঝা-পড়া হয়ে যায়, তবে এই জনতা ঝুলে গিয়ে ভিড়ে দাঁড়াবে··· সে হয় না। কিন্তু যদি সমঝোতার খবর পাকা হয়, তবে ! মজদুরসভা যেন কিছুতে সমঝোতা না করতে দেয়···ভোটে যদি নিষ্পত্তি হয়, তবেই সব যাবে·· উধামজীর ওজস্বিনী বক্তৃতায় বাধা টিকবে না। তাঁকে সরান উচিত···কিন্তু কে সরাবে ? উপকারী জীব ইতিহাসের শত্রু।

চায়ের দোকানে মহবুব বল্লে, 'সমঝোতা প্রায় হয়ে গেল। শুনছিলাম, মন্ত্রীপক্ষ বলেছেন, ওদের বাদ দিয়ে যদি মিল খোলা হয় তবে ১৪৪ ধারা জারি হবে। তাইতে মালিকেরা ঘাবড়ে গেছেন। গুজোব এই যে তাঁরা রাজি হয়েছেন মজুরদের নিতে। শুনে সফীক বর্মা চুরুট ফেলে দিয়ে যাবার সময়ে বল্লে, 'মন্ত্রীরা আসছেন, তাদের অভ্যর্থনায় যেন ত্রুটি না হয়···যতক্ষণ মজুর সভা বোঝাপড়ার শর্ত না নিচ্ছে, ততদিন ফাটকের সামনে সত্যাগ্রহ চলবে···এটুকু পারবে···না তুমিও একটা বোঝাপড়া করে নেবে? আমি আড্ডায় যাচ্ছি · ঘুমুব।'

মহবুব গম্ভীর হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ ··বিড়বিড় করে কাকে গালাগালি দিলে অভদ্র ভাষায়···'আবে শালে·· চায়ে লেয়া·· '

আট

আড্ডায় ফিরে এসে সফীক বিছানায় শুয়ে পড়ল। এই দেহটা কত সহ্যই না করতে পারে! ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, শাস্তি, কোনো কিছুরই অভাব বোধ হয় না। কোথা থেকে শক্তি উৎসারিত হয়ে সকল ক্ষতির পূরণ করে। করিম একদিন বলছিল, লোহা-লক্কড়েরও জান্ আছে, তারাও এলিয়ে পড়ে, খুব খানিকটা ব্যবহারের পর ভয় হয় এই ভাঙ্গল, একটু জিরোন দাও, আবার তাজা হয়ে যায়! শক্তি কি গোপনে সঞ্চিত থাকে? করিম অত খেটেছে সারা জীবন ধরে, তার ওপর বাড়িতে বৌ ও কারখানায় মালিকের আক্রোশ বহন করেছে, তবু সে ভাঙ্গেনি, মচকায়নি, মিল-কমিটির কাজ সে পুরোদমে চালিয়েছে। তার জোর এল সংঘাত থেকে, নিজেদের তৈরি অনুষ্ঠান থেকে, সক্রিয় জনগণের বিপ্লবেচ্ছা থেকে। তার মতন কর্মীই ভবিষ্যতের ভরসা। আরো কিছুদিন ধর্মঘট চালান যদি সম্ভব হয় তবে মজতুর-সভার বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বের পরিবর্তে সমগ্র মজতুর-শ্রেণীর বুকচেরা অধিনায়কত্ব প্রকাশ পাবে। করিম বুঝবে, অন্যেরা বুঝবে না। তাদের সহানুভূতি ভাববিলাস মাত্র। আজ যদি করিম সমঝোতা না চায়, তবেই মঙ্গল, নচেৎ খুচরো সুবিধা, সংস্কার আর বোঝাপড়ার আবর্তে নৌকা হাবুডুবু খাবে, ঘাটের কাছে ভরাডুবি হবে।

বিজন ব্যস্ত হয়ে এসে বল্লে, 'ওস্তাদ, ব্যাপারটা চুকে গেল মনে হচ্ছে।' একটু যেন বেশি ব্যগ্র কী যেন ঢাকতে চায়।

সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'নতুন খবর কিছু আছে?'

বিজন: 'গুজোব ত অনেক রকম। তোমার কি ধারণা?'

সফীক : 'তোমার ?'

বিজন : 'আমার ধারণা এই অবস্থায়, এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে—'

সফীক : 'বিপ্লব সাধিত হয় না, বরাবরই এই বলেছি ··কেমন ? তবে তুমি অত ছোটাছুটি কর কেন ? হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেই পার। খগেনবাবু ও তাঁর সঙ্গে যিনি এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?'

বিজন : 'ওঁরা প্রায়ই তোমার কথা ভাবেন। নতুন বাড়ি ঠিক হয়েছে।'

সফীক : 'ভাল। আমার ব্যক্তিগত ধারণা যাই হোক, করিমরা যা ভাবে তাই হবে শেষে।'

'বিজন : 'তবু, তুমি যা বলবে তাই ত' হবে !'

সফীক : 'আমাদের কোনো অধিকার নেই ওদের বিপক্ষে যেতে।'

বিজন : 'বিনা নেতৃত্বে ওরা সামলাতে পারবে না ভয় হয়। আমরা না হয় বাইরের লোক দিয়ে কল চালান বন্ধ করলাম, তারপর ? আমাদের লড়বার ক্ষমতা অসীম নয়।'

সফীক : 'মাত্র বন্ধটুকুই না হয় কর, তারপর দেখা যাবে। কাল রাত্রে কোথায় ছিলে তুমি ? ঘষতে ঘষতে বিদ্যুৎ জন্মায়. শক্তিটা বালতির জল নয়, স্রোতের বহতা · বুঝেছ ? শক্তি বাপের সম্পত্তি নয়. অর্জিত ধন। সে যাই হোক, মজুররা ফিরতে চায় বলছ···'

বিজন : 'ফিরতে চায় বলছি না·· খগেনবাবুর কাছে ঐ ধরনের অনেক কথা শুনেছি, যদিও তিনি বাপ তোলেন না।'

সফীক : 'ফিরতে বাধ্য, ফেরা উচিত, একই কথা. মাত্র একটু বেশি খারাপ কথা। তারা কি চায় তুমি বেশি জান, না করিম জানে ?'

বিজন : 'এক হিসেবে করিম অবশ্য, কিন্তু·· '

সফীক : 'এর মধ্যে কিন্তু নেই। যা কিছু কিন্তু ঐ মাতব্বরিটুকু ছাড়বার বেলা।'

বিজন সিঁটিয়ে গেল। সফীক মেজের ওপর থেকে একটা পোড়া বিড়ি তুলে বিজনের গায়ে ছুঁড়ে দিলে···'বিজন, বিড়ি খেতে শেখ হে ! পার্থক্য দূর হয়।' করিম ঘরে আসতে সফীক লাফিয়ে উঠে প্রশ্ন করলে, 'খবর কি ?'

'কাল রাতেই ওরা লোক আনবার মতলবে ছিল, কিন্তু পারে নি। আজ আনবেই ওরা, কারণ, ওরা কাল-পরশু সরকারের কথা মেনে নিতে বাধ্য হবে।'

বিজন : 'শর্তগুলো যদি ভাল হয়, তবু খানিকটা লাভ নয় কি, করিম ভাই ?'

করিম : 'আরে ভাই, তাই কখনও হয় ! এখন গুঁতোর চোটে যাই বলুক

না কেন ছুঁতোনাতার অভাব হবে না, তখন আবার ধর্মঘট চালাতে হবে। কে একজন অফিসার থাকবে শুনছি, প্রথমে তার দরবারে নালিশ করা চাই, তিনি ওদের ডাকবেন, ওদের কথা শুনবেন, তার পর, কতদিন পরে কে জানে, রায় বেরুবে। সে রায় ওরা শুনবে কেন, যদি আমাদের স্বপক্ষে সেটা যায়! অফিসার হবে সায়েব মানুষ, সে ওদের সঙ্গে খানা খাবে, ওদের মেমেদের সঙ্গে নাচবে···অর্থাৎ ধর্মঘট বন্ধ হল চিরকালের জন্য।'

সফীক: 'কার কাছে শুনলে?'

করিম: 'উধামজীর বাড়িতে ভিড় জমেছে, সেইখানে শুনেছিলাম।'

সফীক: 'আর কি শুনলে?'

করিম: 'উধামজী নাকি বলেছেন যে সরকার চান না যে এখানকার ব্যবসার কোনো ক্ষতি হয় অনবরত সত্যাগ্রহের চোটে। সরকারের মত, দেশের ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখা, তাকে বাড়ান, এ সবই দেশের কাজ।'

সফীক: 'তোমরা কি করবে?'

করিম: 'ওস্তাদ, স্ট্রাইক করতে পারবো না, এ কেমন কথা! ওরা যাকে ইচ্ছে তাড়াবে আর আমরা বাকি সব ভাল মানুষের মতন কাজ করে যাব--আমরা যেন মেশিন! এ হয় না।'

সফীক: 'তোমরা মেশিন কে বল্লে! তোমাদের ভোট আছে যখন, তখন তোমরা মানুষ, নিশ্চয়ই মানুষ! চাকরি গেলেও ভোট থাকবে! তা ছাড়া নতুন জজের কাছে দরখাস্ত দিলেই গোল চুকে গেল!'

করিম: 'ও সব আদালতি ব্যাপার আমাদের জানতে বাকি নেই। মোকদ্দমা চালাতে কতদিন লাগে? তাতে খরচ নেই? এই ত কানুন রয়েছে, দরখাস্ত দেবার পর হাত-পা ভাঙ্গলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে টাকা দেবে। ক'জন দরখাস্ত দেয়, ক'জন পায়, কেন দেয় না, কেন পায় না? অত হাঙ্গামা যদি গরীবরা পোয়াতে পারত তবে আর ভাবনা ছিল না! এখন তা ফাঁসি হোক, পরে আপিলে খালাস পাওয়া যাবে ভেবে ক'জন ফাঁসিকাঠে গলা দিতে পারে? ও সব আইন-আদালত বুঝি না— অফিসার লোক ওদের এক গেলাসের ইয়ার, ওদের বিবিদের দোস্ত— ওদের হাতে সেই ঘুরে ফিরে পড়তেই হবে। স্ট্রাইক করব— সরকার যা ভাবেন ভাবুনগে!' বলতে বলতে করিমের মুখ বেঁকে যায়, দু-হাতের আঙুল ঘোরে যেন কল চালাচ্ছে, চোখ জ্বলে ওঠে, যেন মোটরের হেড-লাইট পড়েছে বন্য জন্তুর চোখে।

সফীক: 'এখন কি করবে তোমরা?'

করিম: 'তাই-ত' ভাবছি। মজদুর-সভা কি করে দেখা যাক।'

সফীক : 'সেখানে আরো অনেকে আছেন ভুলো না।'

করিম : 'জানি ওস্তাদ! কিন্তু আমাদের নিজেদের সভার বিপক্ষে ত যেতে পারি না।' বিজন সোল্লাসে সফীকের দিকে চাইল।

সফীক : 'কে যেতে বলেছে বিপক্ষে! তবে মজতুর-সভাকে সঙ্গে নিতে হবে, যদি অচল হয় তবে টেনে নিয়ে যাওয়া চাই।'

করিম : 'ওস্তাদ, তুমি নিজে সেই সময় মিটিং-এ থেকো।'

সফীক : 'দেখি। তার আগে তোমাদের কোনো কাজ নেই? তোমরা আর লড়তে পারছ না স্বীকার কর।'

করিম : 'আমরা খুব পারব। ও কথা মুখে এন না ওস্তাদ, পাপ হবে।'

সফীক : 'বিজনের তাই বিশ্বাস।'

বিজন : 'আমি কখখনও তা বলিনি।'

সফীক : 'ঠিক ঐ ভাষা না হোক, অর্থ তাই।'

বিজন : 'আমার ধারণা…'

সফীক : 'তোমার ধারণা পকেটে তুলে রাখ, সুগন্ধী হবে, তারপর তোমার ভাবীজীকে উপহার দিও।'

বিজন : 'ভদ্রমহিলার নাম না হয় নাই আনলে টেনে এখানে!' বিজন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দেখে করিম তাকে উদ্দেশ্য করে বল্লে 'ঘাবড়াচ্ছেন বাবুজী? আমরা পারব।'

বিজন : 'পারলেই ভালো। আমরা কারা?'

করিম : 'আমরা সকলে। কেবল আমাকে নয়, আমার সঙ্গে প্রত্যেককে, শুধু আমি কেন, আমি ত বুড়ো হয়েছি, প্রত্যেকটি মজুর, যাকে যাকে তাড়ান হয়েছে বিনা কারণে, মজতুর-সভার সঙ্গে যোগ আছে বলে, তাকে তাকে যদি ওরা ফেরৎ না নেয়, তখন দেখবেন বাবুজী আমরা ক'জন!' সফীক করিমকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি এক কাজ করতে পার? আচ্ছা, চল আমিই যাচ্ছি। বিজন, তুমি আর খগেনবাবুকে কষ্ট দিও না।' করিম বল্লে, 'বাবুজীও আসুন না।' বিজন জবাব না দিয়ে চলে যাবার পর সফীক আর করিম রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

সফীক : 'আমি একবার তোমাদের মিল-কমিটির লোকদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

করিম : 'তারা এখন ঠিক জানি না কোথায়, উধামজীর বাড়িতেই পাওয়া যাবে।'

সফীক : 'তাই চল। আমি না হয় বাইরে থাকব।' করিম হেসে বল্লে,

'তা বটে, বাইরে থাকাই ভাল, উধামজী আবার উল্টো ভাবতে পারেন।'

উধামজীর বাড়ি গস্ গস্ করছে, বিস্তর মোটর, বনেট্-এ ত্রিবর্ণ জাতীয়-পতাকা, একটিতে লাল শালুকের উপর অর্ধচন্দ্র, অন্যটিতে গৈরিক পতাকা, ফাটকের বাইরে সারি সারি টঙ্গা, প্রাঙ্গনে মজুর জনকয়েক। ওপরের বারান্দায় চাঞ্চল্য, চাকরে চা-জলপান সরবরাহ করছে। সিঁড়ি দিয়ে করিম ওপরে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় একজন খাকি-খদ্দরের হাফ্-প্যান্ট পরা স্বেচ্ছাসেবক দুটো লাঠি তেরছা করে পথ আটকাল। এখন দেখা হবে না, আধ ঘণ্টা পরে আসতে বল্লে। ওপরতলার ঘরের পর্দা বাতাসে উড়ছিল, ভেতর থেকে আওয়াজ এল 'আইয়ে।' স্বেচ্ছাসেবক পথ ছেড়ে দিলে। করিম ভেতরে যেতে উধামজী তার কাঁধে হাত রেখে বল্লেন, 'কি খবর ভেইয়া?'

করিম: 'খবর ত' আপনিই দেবেন। খবরের মালিক ত আপনিই।' উধামজী করিমকে নিয়ে বারান্দায় এলেন, চোখে হাসি, ঠোঁটে হাসি, চুপি চুপি বল্লেন, অনেক কোশিসের পর জেতা গেছে। এখন তোমার মত কর্মীরা, যারা সত্যকারের কাজের লোক, কেবল বাক্যবাগীশ নয়, বিলেতী বুলি কপচায় না, তোমরা একটু মদৎ দিলেই ফতে। রফী সাহেবের উপস্থিতিটা বড়ই সমীচীন হয়েছে। ওঁরা একটু চা-পান করছেন। কিছু বলবার থাকে আমাকেই বল।'

করিম: 'উধামজী, আপনাকে ছাড়া কী ওঁদেরকে বলব! শর্তগুলো কি?'

উধামজী: 'সবই একটু বাদে টের পাবে। তবে জেনে রেখো, আমাদেরই জিৎ।'

করিম: 'জিৎ কি হিসেবে?'

উধামজী: 'যাদের বিনা অজুহাতে তাড়িয়েছিল তাদের ফিরিয়ে নেবে ওরা। সব চেয়ে আনন্দের কথা এই যে তোমাকেও আর বাইরে থাকতে হবে না। তবে কাগজপত্র নিয়ে একটু গোল আছে তোমার। আরে ভাই, রাজি কী হয়! শেষে ভয় দেখান হল, ফ্যাক্টরি জোর করে খুলতে গেলেই ১৪৪ ধারা জারি হবে শহরে। 'এখন ওপক্ষ মিটিং করেছেন শর্তস্বীকারের জন্য। আশা করছি আজকালের মধ্যেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। ওধারে দেখছ ত ভেইয়া, টাকা ঠিকমত উঠছে না, তার ওপর একবার দাঙ্গা বাধালেই হল, তখন ঠ্যালা সামলাতে সেই উধামজী!'

করিন: 'হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধবে না, ঘাবড়াচ্ছেন কেন, উধামজী?'

উধামজী: 'তুমিত ব'লে খালাস। ভাগ্যিস এখনও বাধে নি! তোমরা ফিরে আসছ এই যথেষ্ট, এর জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ।'

করিম: 'উধামজী, শুনছি কে একজন অফিসার আসবে যার কাছে দরখাস্ত

পেশ করতে হবে ?'

উধামজী : 'সেই কথা চলছে। ওটা একটা বাহানা মাত্র। আসল কথা তোমরা।'

করিম : 'মাপ করবেন উধামজী, আমি অত-শত বুঝিনা। ওরা গুঁতোর চোটে না হয় আমাদের নেবে, কিন্তু দু'দিন পরে আবার তাড়াবে। তাই মনে হয়, ব্যাপারটা ঠিক আমরা নই, অন্য একটা !'

উধামজী করিমকে বারান্দা থেকে ভেতরে অন্য একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। 'করিম ভাই, একটু চা দিই, না সে কিছুতেই হয় না।' হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে করিম বল্লে, 'দেখুন বাবু সায়েব, ব্যাপারটা সুবিধে নয় মনে হচ্ছে।'

উধামজী : 'কেন, কেন, কেন ? তুমি ভাবছ অধিকারের কথা, কিন্তু আমাদের লড়াইএর কারণটা কি ? জনকয়েককে তাড়িয়েছিল ওরা, আমরা বল্লাম, তা হবে না, নিতেই হবে ফিরিয়ে। রাজি কী হয় ! কত ধ্বস্তাধ্বস্তিই না চলল, সে কী বলব ! আর যাতে কথায় কথায় বরখাস্ত না হয় তার বন্দোবস্ত পাকা না করে আমরা ছাড়ছি না।'

করিম : 'ওরা যা করত তাই করবে।' উধামজী হো-হো করে হাসতে লাগলেন, হাসি আর থামে না, সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়ে, প্রতি অঙ্গ নাচতে থাকে, মাথা পিছন দিকে ঝোঁকে, দুটো হাত ওপরে ওঠে, মুখের মধ্যে সোনাবাঁধান দাঁত চোখে পড়ে, তাতেও পানের কালো ছোপ, হঠাৎ হাত দুটো হাঁটুর উপর এল, দেহ কুঁজো হল, হাসির গর্‌রায় করিম অপ্রস্তুত। উধামজী সোজা হয়ে উঠে বল্লেন, 'ভেইয়া; ও-টুকু বিশ্বাস হল না আমাকে ? আর কিছু বুঝি আর না বুঝি, হাওয়া বদলেছে এ-টুকু বুঝি। আর, বাছাধনেরাও বোঝে। কিন্তু, করিম ভাই, একটা প্রশ্ন করি তোমাকে···এত অধিকার শিখলে কোত্থেকে ? ও-সব এখন রেখে দাও। অধিকার কী ভাই হাওয়ায় ঝোলে ? ও-সব পণ্ডিতী বোলচাল তোমার আমার মুখে শোভা পায় না।'

করিম : 'অধিকারটা ওদেরেই রইল তবে ?'

উধামজী : 'মোটেই না অবশ্য কথাটা উঠেছিল বটে, কিন্তু প্যাচ কাটান গেছে। আমি বল্লাম, সরকার যে নতুন অফিসার নিযুক্ত করবেন তাঁরই হাতে ভার দেওয়া হোক !'

করিম : 'কিসের ভার ? তিনি ত তাড়াবার আগে নয়, পরে শোচ-বিচার করে রায় দেবেন ? তার পর. তাঁর রায় গ্রহণ করা ওদের মর্জি। এ যেন কী রকম লাগছে।'

উধামজী : 'ভাই, আমারও কী ভাল লাগে ! কিন্তু এধারে দেখছ ত !

আমরা কতদিন চালাতে পারব তার ঠিকানা নেই। ওরা খুব জব্দ হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু আমাদের অবস্থাও ত সঙীন, সেটা আমি জানি, টাকা তুলতে হয় সেই আমাকেই। অন্য অন্যবার একজন না একজন মালিকের কাছে মোটা টাকা পাওয়া গেছে, এবার একজনও উপুড়হস্ত করলে না। জব্দ যখন ওরা হয়েছে, আমরা যখন জিতেছি, বাস্…করিমভাই, ভেতরে চল, তোমার মতন লোককে মন্ত্রীরা দেখলে খুশীই হবেন। তোমরাই ভারতমাতার কৃতী সন্তান …তোমরাই··সত্যি বলছি ভাই, তোমরাই··মা এখনও উর্বরা · একধারে মহাত্মাজী অন্যধারে তোমরা…দুপাশ থেকে দু'হাত ধ'রে তোরা মা-কে এগিয়ে নিয়ে চলেছ অন্ধকার পথে · তোমাদের আঁখির রোশনীতে মায়ের মুখ উজ্জল হল…সেই আলোয় আঁধেরা পালাল· না, না, সে হয় না, করিমভাই · অবশ্য কাজ যদি থাকে তবে অন্য কথা…তোমার সঙ্গে আমার কোনো তকল্লুফ্ নেই · তবে ভাই একটি অনুরোধ রাখতেই হবে··আজকের সভায় হাজির থেকো : হয়ত তোমাকেও কিছু বলতে হবে।'

করিম : 'বাইরের মিটিংএ কিছুই হবে না, যতক্ষণ না মজদুর-সভায় ঠিক হয়।'

উধামজী : 'নিশ্চয়ই, মজদুর-সভার সকলেই সেই সভায় থাকবে। তোমরা কী ভাবছ যে লুকিয়ে লুকিয়ে বোঝাপড়া করছি ? না, তা কখনও হয় ! আমি থাকতে সেটা অসম্ভব জেনে রেখো। তবে, কেবল মজদুর-সভা কেন ? তোমাদের মদৎ কী শহরশুদ্ধ লোকে দেয় নি ? তাদের বাদ দিলে তারা কী ভাববে ? সেটা কী আমাদেরই ভাল হবে ?'

করিম : 'আগে মজদুর-সভা মেনে নিক্, তারপর সাধারন মিটিং হোক্।'

উধামজী : 'চমৎকার কথা ! কিন্তু স্বীকার করছি ভাই, এর মধ্যে আমাদের একটু চাল আছে। মন্ত্রীপক্ষ থাকতে থাকতে ওদের আটকে ফেলতে চাই ! ও-পক্ষকেও সেখানে আনব, ওদের মুখ দিয়ে কথা বা'র করিয়ে নেবো।'

করিম এবার হেসে ফেলে মাথা নাড়তে লাগল। উধামজী বল্লে, 'দেখই না, করিম ভাই, যাতে হাত দিয়েছি সেটা কখনও ফস্কেছে ? তুমিই বল, গুমোর করছি না। আমরা ত' পিছনে আছিই। যদি ওরা অমান্য করে তবে এবার শেষ-দেখা দেখে নেবো। তুমি কী ভাব ওরা এতই বোকা যে এই সোজা কথাটা ওদের মাথায় ঢোকে নি ? কথাবার্তার সময় যদি একবার ওদের মুখভঙ্গি দেখতে ! ভাঙবে ত মচকাবে না !' উধামজী ওদের মুখভঙ্গি অনুকরণ করলেন। করিম গম্ভীর হয়ে বল্লে, 'যদি পিছনেই আছেন সর্বদা, তবে মজদুর-সভাকে আগেই থাকতে দিন।' উধামজী ব্যস্ত হয়ে পিছনে মুখ

ফিরিয়ে বল্লেন, 'এখনই হাজির হচ্ছি, আভি···করিমভাই, একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না—সরকারের সহানুভূতিটা ফেলে দেবার জিনিস নয়, কংগ্রেস একসঙ্গে কজনের সঙ্গে লড়বে!' উধামজী সিঁড়ি দিয়ে নেমে করিমকে উঠানে পৌঁছে দিলেন; উঠানে জনকয়েক মজুর দাঁড়িয়ে রয়েছে, উধামজী তাদের কাঁধে হাত দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। করিম বেরিয়ে এল। উদাত্ত কণ্ঠস্বর ও হাসির রেশ অনেকদূর পর্যন্ত সঙ্গে চলল।

ফাটকের বাইরেই মহবুবের সঙ্গে দেখা। মহবুব বল্লে, 'ব্যাপার সুবিধের নয়। যদিও গুণ্ডারা এখন ফাটকের ভেতর, তবু নরিভর্তি লোক আসবে আজই, চুক্তির আগেই।' দুজনে ছুটল সফীকের কাছে। পথে করিম অন্য দুজন মজুরকে সঙ্গে নিলে। তারাও মিল-কমিটির মেম্বর— বিতাড়িত। সফীক একটা ল্যাম্প পোস্টের তলায় দাঁড়িয়েছিল। সফীক খবর জানবার ইঙ্গিত করাতে করিম বল্লে, 'ওস্তাদ, যা শুনেছ তাই ঠিক, তবে ও-পক্ষ এখনও মত দেয়নি। উধামজী আশায় আছেন যে ওরা মেনে নেবে, আমরাও।' সফীক খানিক নীরব থাকার পর জিজ্ঞাসা করলে, 'এরা ত' মিল-কমিটির লোক, এদের বক্তব্য শোনা যাক।' একজন বল্লে, 'করিমভাই ভাল করেই জানে যে এ-বন্দোবস্ত চলবে না।' কণ্ঠে উষ্মা এনে সফীক মন্তব্য করলে, 'করিভাইকে ছাড়, তোমাদের কি বিশ্বাস?' উত্তর এল— 'এ কখনও হয়!'

সফীক: 'যদি না কখনও সম্ভব হয় তবে সমঝোতা মেনে নিতে অত ব্যগ্র কেন?' করিম তাদের হয়ে জবাব দিলে— 'ব্যগ্র নই, ওস্তাদ। তবে একটা দিক আছে—আমরা যদি বাগড়া দিই তবে উধামজী ও তাঁর দলের লোককে পাওয়া শক্ত হবে।'

সফীক: 'কথাবার্তায় তাই বুঝলে?'

করিম: 'অনেকটা তাই। উধামজী বলছিলেন যে একটা বড় মিটিং হবে, সেখানে আমাদের মত নেবেন।'

সফীক: 'মত! সাধারণ সভায় মত! অর্থাৎ তিনি যা বলবেন তাই ঠিক!'

করিম: 'বড় মিটিং বুঝি না। মজদুর-সভা যদি সায় দেয় তবেই আমরা ধর্মঘট তুলে নেবো— আমি সাফ্ বলে দিয়েছি।'

সফীক: 'তিনি কি বল্লেন?'

করিম: 'কংগ্রেস ক'জনের সঙ্গে লড়বে!'

সফীক: 'তাই বুঝি এক হাত খালি রাখতে চান, ভোট কুড়োবার জন্যে? ভুল, ভুল, ভুল···'

করিম: 'কার ভুল?'

সফীক : 'তোমাদের, আমাদের···তাঁরা বাধ্য আমাদের তরফে আসতে। যদি ধর বোঝাপড়া না মেনে স্ট্রাইক জোরসে চালাও তবে কি ভাব যে ওঁরা জবরদস্তি করে ভেঙ্গে দেবেন ?'

মহবুব : 'বোম্বাইএ কি ঘটেছে, ওস্তাদ ?'

সফীক : 'বোম্বাই আর এদেশ এক নয়। ওখানকার মিলওয়ালাদের শক্তি বেশি, তারা পুরানো, খানদানি, ওখানকার সাধারণ লোক ব্যবসায়ী, এরা নাবালক, এদের সমর্থন কম দেশের জনমতে। মারতে হয় ত ছোট বেলাতেই···ওরা যেমন তোমাদের পাকড়ায় ছোট বেলাতেই···শত্রুর বয়োবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নয়!' গলার আওয়াজ ঢিলে করে সফীক বল্লে, 'আমার বিশ্বাস, আমাদের সরকার আমাদের ত্যাগ করতে পারবে না, এখানকার কংগ্রেস অন্য জাতের···নয় কি? হয়ত, আমারই ভুল···কিন্তু স্ট্রাইক করতে পারব না, এ-কেমন কথা!'

মহবুব : 'নোটিশ দিতে হবে একমাসের— এই গুজোব।'

সফীক : 'নোটিশ! ওরা নোটিশ দিয়ে লোক তাড়ায়? নোটিশ দিয়ে কাজ কমায়? নোটিশ দিয়ে মাইনে কাটে? নোটিশ দিয়ে নতুন কল আনে? নোটিশ!'

মহবুব : 'নোটিশ দেওয়া হবে না।'

সফীক : 'হবে না ত বলছ! কাজে কি দেখাচ্ছ?'

করিম : 'মজতুর-সভা যা বলবে তাই হবে।'

সফীক : 'শুনেছি। আমিও আবার বলি, তুমি কি জান না মজতুর-সভা কাদের হাতে এখনও?'

করিম : 'জানি। কিন্তু আজ যদি মজতুর-সভাকেও উড়িয়ে দিই, তবে ওরা পেয়ে বসবে।'

সফীক : 'কে অস্বীকার করছে! কিন্তু স্ট্রাইক করতে পারব না, এ-কেমন ব্যবস্থা! এ-যে মজতুর-সভার গোড়ায় কোপ্। স্ট্রাইক চলুক। ওরা আজ হেস্ত-নেস্ত করবেই।'

মহবুব : 'আমিও সে খবর পেয়েছি। আজ লরিবোঝাই লোক আসছে!'

সফীক : 'চল, ঐ ধারে যাই। লোক আনা বন্ধ হোক ত আগে, দেখি কি হয় তারপর!' সকলে জুহীর দিকে চলল।

কলের ফাটকের সামনে লোক জটলা করছে, দারোয়ানরা বাইরে আসতে পায় নি। খাঁ-সাহেব সফীককে দেখে এগিয়ে এল। খাঁ-সাহেব ফাটকের সামনে থেকে এক পাও নড়েনি, সেইখানেই বসে খাওয়া দাওয়া করছে, পাশে·

বদনা হুঁকো বাঁড়া, সানকী। সফীক হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ-যে দাওয়াৎ দিয়েছেন, খাঁ-সাহেব! আহা, আগে যদি টের পেতাম!'

খাঁ-সাহেব উত্তর দিলে, 'পেট না ভড়ালে কী কাজ পাওয়া যায়? ফাটক ছেড়ে যেতেও পারি না, একলা বসে খেতেও পারি না। বেচারা চৌধুরীর বাড়িতে বিপদ, তাই আমাকে তদারক করতে হচ্ছে। চৌধুরীর বাচ্ছার খুব অসুখ, কি-সব বিলিতী দাওয়াই খাইয়েছে। এত করে বল্লাম হকিম ডাক, তা শুনলে না কিছুতে!'

সফীক চৌধুরীর পাড়ায় ঢুকল। একজন বুড়ি কাঁদছে চৌধুরীর দরজার বাইরে, চার-পাশে মেয়েরা ঘোমটার ভেতর থেকে ফোঁপাচ্ছে, বুড়ি নিজের কপালে হাতের ভারী বালা ঠুকল, রক্ত বেরুল, পাশের মেয়েরা হায় হায় করে হাত চেপে ধরলে, যত চেপে ধরে বুড়ি তত হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে, পাশের চালা থেকে অন্য মেয়েরা উঁকি দিতে লাগল, একজন বয়স্থা এগিয়ে আসতে বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, 'এখান থেকে ভাগ, আমার সামনে আসিস নি, তুই ত বল্লি তাই বিলিতী দাওয়াই···' অভদ্র ভাষার আওয়াজে চৌধুরী বেবিয়ে এসে বুড়িকে ধমকালে। সফীককে চৌধুরী বল্লে, 'রোগীর শ্বাস উঠছে, তিন সপ্তা ভুগছে যখন, তখন পাড়ার লোকে পরামর্শ দিলে কলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে, বিলেতী দাওয়াই খেয়ে কিছুই ফল হল না, উলটে খারাপ হয়ে গেল।'

সফীক: 'কলের ডাক্তার যেন আপনার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ দিচ্ছে! সে ত লাল দাওয়াই দিয়েই মাইনে পাবে!' একজন মেয়ে কেঁদে উঠল···'হায় হায়···এক এক করে চারটি গেল।' চৌধুরীর চোখে জল,···বুড়ি চেঁচাতে লাগল, 'বিষ···লাল বিষ···' চৌধুরী বল্লে, 'কেনই বা নিজে বিলিতী দাওয়াই খাওয়ালাম।' সফীক চৌধুরীর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা জানালে, 'বিলিতী দাওয়াইএর দোষ কি! তাই খেয়ে হাজার লোক সারছে···যারা দিয়েছে পাপ তাদের···তাদের কি মাথা ব্যথা যে একটা মজুরের ছেলে বাঁচে কী মরে! সাহেব ডাক্তার? সে ত আরো মজা! এই সময় সত্যাগ্রহের ফলে ক্ষতি চলছে, এখন কী চৌধুরী সাহেব ওদের হাতের কোনো জিনিস নিতে আছে।' 'বিষ দিয়েছে'···'খোকার মুখ নীল হয়ে গেল'···ছেঁচতলা দিয়ে পাড়ার মেয়েরা একে একে এসে বাড়ির ভেতর গেল···ফোঁস ফোঁস কান্নার মধ্যে ফিস্ ফিস্ কথা 'বিষ···বিলিতী বিষ···'চৌধুরী ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়াতে সফীক তাকে তুলে বাড়ির ভেতর ঠেলে দিলে।

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই বিজনের সঙ্গে দেখা···'তুমি?'

বিজন: 'খবর এসেছে, লরি বোঝাই লোক আসবে।'

সফীক : 'তাই নাকি !'

বিজন নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে অন্যমনস্কভাবে বল্লে, 'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ?' সফীক উত্তর দিল না, খাঁ সাহেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লে, 'আজ দেখাতে হবে সন্ সাতাওনের জোয়ান কোন চীজে তৈরি।' খাঁ সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দিলে, 'আরে ভাই, সেদিন আর নেই, তবে, আমি থাকতে মারপিট হবে না।'

সফীক : 'এবার হিন্দু-মুসলমানের হাঙ্গামা নয়। মিলওয়ালারা লরি করে লোক আনছে, তারা এসে পড়লে যারা ধর্মঘট করেছে তাদের অন্ন যাবে।'

খাঁ : 'তবে যে শুনলাম মিটমাট হয়ে গেল !'

সফীক : 'এখনও হয় নি। তার আগে ওরা নিজেদের লোক এনে ফেলতে চায়, যাতে পরে আর আমরা আসতে পারব না কিছুতে। সব ভুখায় মরবে।'

খাঁ : 'যারা লড়তে না পারে তাদের বেঁচে লাভ কী !' করিম এসে পাশে দাঁড়াতে খাঁ সাহেব থতমত খেয়ে গেল। সফীক বল্লে, 'সত্যিই তাই, খাঁ সাহেব লড়তে হবে। কিন্তু লড়বার জন্যও ত খানা চাই, তাই যদি যায় তবে হাওয়া খেয়ে কতদিন বাঁচবে মানুষে, বাল-বাচ্ছা নিয়ে। কি বল, করিম ?'

করিম : 'আমি আর কী বলব ! ভাবছি কেবল ওদের বেইমানির দৌড় কতটা। এধারে বোঝা-পড়া চলেছে, অন্যধারে রাতারাতি লোক আনা।' খাঁ -সাহেব তীব্র-স্বরে বলে উঠল, 'আমিও তাই ভাবছি। এমন বেইমানি বরদাস্ত হয় না।'

সফীক : 'বেইমানি কেন, খাঁ সায়েব ? আমার মিল থাকলে আমিও তাই করতাম্। ইমান্ কোথায়, কার সঙ্গে ? যাদের ইজ্জত নেই তাদের সঙ্গে ইমান্ !'

খাঁ সাহেবের চোখে আগুন। 'কভি নেহি হোগা !' ব'লে খাঁ সায়েব গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, বার্ধক্যের কোনো লক্ষণ নেই, কোমর সোজা, হাতের পেশী শক্ত, মুখের চামড়া নিটোল, দীর্ঘ পুরুষ, পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সমগ্র দেহের ভারে মাটিকে যেন চেপে মারছে। 'বেইমান, বেইমান, খানা চায় কোন্ এই বেইমানদের হাত থেকে !' বিজন তার মূর্তি দেখে সন্ত্রস্ত হল।

আধঘণ্টার মধ্যে মহল্লাময় প্রচার হয়ে গেল যে এখনই লরিভর্তি বাইরের গুণ্ডা জোর করে মিলের মধ্যে ঢুকবে। চৌধুরীর পাড়ার লোক বেশি এল না, তারা মড়া নিয়ে ব্যস্ত। খাঁ সাহেব উপস্থিত লোক থেকে জনকয়েক জোয়ান বেছে নিয়ে বাকি লোকদের প্রতি হুকুম দিলে যেন তারা বাড়ি থেকে খেয়ে

তখনই চলে আসে। খাঁ সাহেবের আদেশে রাস্তার ওপর লোকেরা শুয়ে পড়ল। সফীক একবার বল্লে, 'খাঁ সায়েব, ঐ ধার থেকে লরি আসবে বলে মনে হচ্ছে, প্রথমেই মেয়েদের রাখলে হয় না?' খাঁ সায়েবের তাতে আপত্তি, তাঁর মতে আওরাত কোথাও না থাকাই ভাল এক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে জনকয়েক ছোকরা মেয়েদের পাশে বসে পড়তে খাঁ সাহেব তাদের তাড়া ক'রে গেল— 'ভাগ হিঁযাসে ভাগ।' সফীক মিনতি জানালে খাঁ সায়েব, আপনার মতন বীরের কী জাত থাকবে না?' 'জাত! সব বদ্‌জাত ব্যাটারা···হাতে তলোয়ার ধরবে ওরা! যে হাতে বিঁড়ি ফোঁকে!' খাঁ সায়েব একটু কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করাতে সফীক হেসে উঠল, ছেলেরাও হাসল, মেয়েরাও···খাঁ সায়েব তখন বল্লে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তবে লেট্ যা ··যা অর্ডার দেব শুনতে হবে, একদম উঠতে পাবি না, জমির সঙ্গে মিশিয়ে থাকবি, ঘাবড়েছিস ত' মরেছিস আমার হাতে, জানিস ত! আওরাতদের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করতে পারবি না বলে দিলাম, আমার চোখ এড়াতে পারবি না·· লেট্ যা।' লেট্ যা, লেট্ যা কলরব করতে করতে ছোকরারা শুয়ে পড়ল। 'মেয়েরা ফাটকের সামনে যেন যাস নি, ভেতরের দারোয়ান হঠাৎ ফাটক খুলে ধরে নিয়ে যাবে। দু'চারটে বদমাস মাগিকে এখানে রাখলে হত। হুঁ, তারা কী এসেছে! আদমির সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার ফন্দি আঁটছে রসুইখানার ভেতরে।' খাঁ সায়েব ঘৃণাভরে থুতু ফেলে ফরসির নল মুখে নিলে।

সফীক একটা চায়ের দোকানে ঢুকল, সঙ্গে বিজন···চায়ের দোকানে বিজলী বাতি জ্বলছে, ধুলোর আবডালে হলদে দেখায়···বিজ্ঞাপন ঝুলছে, 'চা খাও, উপরি রোজগার কর।' মহবুব এল চায়ের দোকানে। বিজনকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ কদিন দেখি নি বড়!' সফীক বল্লে, 'মেহমান এসেছে জানই ত! তাদের জন্য বাড়ি খুঁজছিল। আচ্ছা, বিজন, মহবুবকে চা-এর প্রসার হল কী করে বলেছ? সে ভারী মজা···প্রথমে বিনা পয়সায় বিতরণ, তারপর দো-দো পয়সা, এখন শুনেছি এক টাকার উপর পাউণ্ড···না আরো বেশি, বিজন?'

বিজন উত্তর দিল না।

মহবুব: 'আরেকজন ছিল না খাঁ সাহেবের সঙ্গে?'

সফীক: 'চৌধুরীর বাড়িতে বিপদ! তার বাচ্চা মরেছে···বেচারা···বিজন, শিশুমৃত্যুর হার কত কানপুরে?'

বিজন: 'ভারতবর্ষে যত শহর আছে তার মধ্যে প্রায় সবচেয়ে বেশি, কিন্তু বাঁচার আশাটাও ধরতে হয়। সেটা জন্মালেই সাড়ে চব্বিশ।'

সফীক : 'বাঁচা গেল! অতদিন আর ভুগতে হল না। সংখ্যায় সান্ত্বনা পাওয়া যায়। বিজন; চা-বাগানের কুলিরা কত পায়?'

বিজন : 'টাকার দিক থেকে এখানকার চেয়ে কম, কিন্তু অন্য সুবিধা বেশি।'

সফীক : 'নিশ্চয়ই, সস্তায় চা, তাতে খিদে কমে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে, যেমন ধর কোলকাতার বাবুদের। মহবুব, ওরা কখন লাশ নিয়ে বেরুবে? এই যে কিষণচাঁদ! ভাবছিলাম, তোমারও কী মেহমান এল? কিষণ, তুমি ত হিন্দু, শ্মশান ঘাটের রাস্তা কোথা?'

কিষণ : 'ফ্যাক্টরির দরজার ভেতর দিয়ে।'

সকলেই হেসে উঠল। সফীক বর্মা চুরুট ধরালে, ঠিক মত ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, ছিদ্র আছে নিশ্চয়, থুতু দিলে সেখানে, তবু ধোঁয়া আসছে না, টানলেও ধোঁয়া বেরোয় না, একটা দিকমাত্র ধরেছে, আঙুল দিয়ে ছিদ্র চাপতে নীল ধোঁয়া সরল রেখায় ওপরে উঠল, ধোঁয়ার মাথা সাপের মতন বেঁকে যায়, একটু চোখ বুজে সফীক টানতে থাকে, ঘোরাতে ঘোরাতে সিগারের মাথা গোল হয়ে ধরে ওঠে। বিজনের দিকে এক চোখে চেয়ে সফীক বল্লে, 'একবার দেখে এস দিকিন ফাটকের সামনেটা, সকলে শুয়ে আছে কি না। এখানে হুজ্জোত হবে. তুমি·· তোমার কি থাকবার প্রয়োজন আছে?'

বিজন : 'আমার বিশ্বাস, আছে। এখনই আসছি।' বিজন চলে যাবার পর সফীক উঠে এসে মহবুবের পাশে বসল, কিষণকে কাছে ডাকলে। সিগার টানতে টানতে সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'শ্মশানের রাস্তা কোন্ দিকে?'

কিষণ : 'এই ধার দিয়েই যেতে হয়।'

সফীক : 'অন্য পথ আছে?'

কিষণ : 'বস্তি থেকে গলি বেরিয়েছে অনেক, কিন্তু বড় রাস্তায় না এসে উপায় নেই।'

সফীক : 'মধ্যে মধ্যে ভগবান মানতে ইচ্ছে হয়। ভাল, ভাল, মড়ার রাস্তা আর কুলি মজুরের সড়ক এক হওয়াই উচিত।'

মহবুব : 'সেই সড়ক দিয়ে আবার বড় সাহেবের মোটর যায়।'

সফীক : 'তোমাদের স্ট্রাইক ভাঙ্গারও লরি আসে। কিষণ, কিষণ, তুমি চৌধুরীর পাড়ায় যাও। একটু মদৎ দাও···ছাখ, শোন যা বলছি···লাশ নিয়ে তুমি বেরুবে, তুমি হিন্দু, আপত্তি হবে না, একটু ছোটখাট শোভাযাত্রা করলে হয় না? খাট বইবে তুমি। যখন খবর দেবো তখন এই বড় রাস্তায় আসবে, বুঝেছ?' সফীক সিগারেট টানতে লাগল নীরবে।

বিজন এল? কিষণ বল্লে, 'বিজনও চলুক না?'

বিজন : 'কোথায় ?'

কিষণ : 'পাড়ায় চৌধুরী সাহেবের বাচ্চার স্বর্গলাভ হয়েছে, ওস্তাদ চাইছেন একটা ছোটখাট শোকযাত্রা।'

বিজন : 'এ-সময়! এখানে আমার যদি কোন কাজ না থাকে, ওস্তাদের মতে তবে যাব।'

সফীক : 'তুমি যাবে? যাও!'

বিজন : 'ওধারে লরি কখন এসে পড়বে হুড়মুড় করে তার ঠিকানা নেই, আর এখন শোকযাত্রা।'

সফীক : 'ওটা সিম্বলিক্, যাওই না · জিনিসটাকে একটা উঁচু স্তরে তোলা দরকার, ফুল-টুল পাওয়া অসম্ভব? একটু আর্টের পরশ না হয় এল। ক্ষতি কি? যা বলছি, তাই শোনো, যাও।'

কিষণ ও বিজন চলে গেল।

কানপুর শহর থেকে পিচঢালা রাস্তা বরাবর এসেছে রেল-লাইনের ব্রীজের তলা দিয়ে। বেশ খানিকটা ঢালু বেয়ে ধীরে উপরে উঠতে হয়। রাস্তার দু-পাশে লম্বা লম্বা সাদা কালো দাগ নিচের দিকে, বাঁকের মুখে ও চড়াইএ মোটর যেন ধাক্কা না খায় তাই। তীব্র আলো রাস্তার উপর, দু-পাশে বস্তি, মাটির তেলের ডিবে জুল্-জুল্ করে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যা নামল ধোঁয়ার ওপর, বিজলী বাতির জোর কমল, বস্তির আলো খুলল। রাস্তার আলো আজ যেন নিষ্প্রভ, কমতে কমতে নিভে যাবার সামিল। বিজলী ঘরেও কী হরতাল শুরু হয়েছে? ওখানকার মজুরদের বাগানো যায় না সহজে, বলে, অবস্থা ভিন্ন। ভিন্ন কোথায়? একই অনুষ্ঠানের অঙ্গ, একই চাপের পেষাই, একই দারিদ্র্যের সাম্য, না খেতে পেলে একই রকমের যন্ত্রণা, রোগে একই ব্যবস্থা, কলে সেই একই মাটি আর আগুন। সমস্যাগুলোকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখে জীবনটাই টুকরো টুকরো হয়ে গেল। যতক্ষণ বাঁচা ততক্ষণ এক'— এই মোটা কথাটা ধরা শক্ত বটে, কিন্তু বাঁচতে যাবার, তার উপায় আবিষ্কারের পন্থার ঐক্যটা ধরাও কী কঠিন? চৌধুরী আর খাঁ সাহেবের ধাত আলাদা, কিন্তু দু'জনেই দু'মুঠো খেতে চায়। চৌধুরীটা অকর্মণ্য ··ছেলে মরেছে বলে ঘাবড়ে গেছে। ছেলে মরেছে এইজন্য কী চন্দ্র উঠবে না, শহরে ধুলো উড়বে না, মাঠে ফসল ফলবে না, গাছে নতুন পাতা গজাবে না, কল চলবে না, কর্তাদের মুনাফায় ঘাটতি পড়বে, সত্যাগ্রহ ধর্মঘট থেমে যাবে! সফীকের হাঁফ লাগে···বুকটা দুর্বল রয়েই গেল··· থামতে পারেনা লড়াই···যারা জীবন দিয়ে লড়বে না তারা অন্য কিছু দিয়ে লড়ুক···অত সহজে ছাড়ান নেই—বিজন দুর্বল, অপদার্থ, মানুষ হবে কি ক'রে!

খিদের কামড় নেই, উল্টে আদর আছে, ভাবীজীর কাছে···সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় ভাবতে স্ত্রীলোকের অ-মানুষ করবার অসীম ক্ষমতা। নিজের কখনও প্রয়োজন হয় নি নরম হাতের সেবার···হাসপাতালে নার্সকে দেহ ছুঁতে দেয় নি। রিলিফ-ম্যাপের মতন একই স্তরে সমগ্র অতীত প্রলম্বিত হয়, সমতলভূমি···উঁচু নীচু খাঁজ খন্দর বাঁকা চোরা নেই···স্ত্রীলোকের কোন উল্লেখ নেই, নেহাৎ সাদামাটা তামার পাত, কেবল গরম, কুঁচকে গেল হঠাৎ, একটা যেন চোঁয়া·· তার ভেতর দিয়ে কেবল দূরের জিনিস দেখা যায়। গড়ান রাস্তার নিচে থেকে দুটো চোখ ধীরে ধীরে উঠছে।

'লরি আরহি·· লরি আরহি'। সফীক বল্লে, 'মহবুব, কিষণকে শীগ্‌গির লাশ নিয়ে এখানে আসতে বল। যেন পাঁচ মিনিটের বেশি না লাগে। খাটিয়ার ওপর চাপিয়ে নিয়ে এস·· আর কিছুই চাই না···দু'চার জন লোক থাকলে সুবিধে হয়, বুঝেছ?' মহবুব ছুটল। 'লরি আরহি, আরহি·· ' রাস্তায় যারা শুয়েছিল তারা উঠে পড়েছে দেখে সফীক খাঁ সাহেবের কাছে গিয়ে বল্লে, 'উঠলেই সর্বনাশ·· ' খাঁ সাহেব ঘাড় ধরে দু-একজনকে শুইয়ে দিলে। অন্যেরা শুয়ে পড়ল, কিন্তু মাথা তুলে দেখতে লাগল। সফীক মাথার দিক থেকে গিয়ে পায়ের পাশ দিয়ে ঘুরে এল। প্রায় শত খানেক লোক রাস্তায় শুয়েছে। 'খাঁ সাহেব, এদের একটু ওপাশে সরালে হয় না? যাতে ফাটকের সামনেও লোক থাকে? যদি ফাটক খুলে ভেতরের দারোয়ানরা বেরিয়ে পড়ে?'

'ওখানে কোনো দরকার নেই। ঘাবড়াচ্ছ কেন? একবার দেখে আসছি?' খাঁ সাহেব ফাটকের সামনে গিয়ে হাঁক দিলে, 'যদি দরজা খোলা হয় তবে একটা লোক আর আস্ত থাকবে না।' খাঁ সাহেব ফিরে এসে শোয়া লোকদের পায়ের দিকে দাঁড়াল। হাতে লাঠি রয়েছে। সফীক বল্লে, 'ওর দরকার হবে না খাঁ সাহেব, ওটা আমাকে দিন।'

'কেঁও জী? লাঠিতে আমার হাত দিও না। ম্যয় কভি নেহি ছোড়ুঙ্গা!'

জোড়া কয়েক চোখ গড়ান রাস্তা দিয়ে গুঁড়ি মেরে উঠছে। আলো কম, প্রাইভেট কার? তদারক করতে এসেছে? গলির ভেতর থেকে ছোট খাট শবযাত্রা বেরুল···'রাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সত্য হায়, সত্য হায় সত্য হায়, রাম নাম সত্য হায়।'···গিয়ার্ বদলানর কর্কশ আওয়াজ রাম নাম ছাপিয়ে সকলের কানে আসে। সত্যের আহ্বানে যারা শুয়ে ছিল তারা উঠে পড়ল। এক জোড়া চোখ চলে আসছে ওপরে। 'খাঁ সায়েব, শুইয়ে দিন।' হঠাৎ চোখ দুটো আরো জ্বলে উঠল·· হেড লাইট···'লরি আ-গেই, লরি আ-গেই·· লেট্ যা, লেট্ যা, ডরো মাৎ, রাম নাম সত্য যায়, গোপাল নাম সত্য হায়'···রাস্তার

মাঝখানটা ফাঁক হয়ে গেল, মধ্যে খাঁ সায়েব দাঁড়িয়ে, হাতে লাঠি ··শবযাত্রা সেই ফাঁক দিয়ে এগুচ্ছে···বিজন রয়েছে···কেন এল ? চলে যাক এখান থেকে··· ওর কর্ম নয়, সহ্য হবে না···দুর্বল···লরি এসে পড়েছে, খোলা রাস্তা দেখে জোরে আসছে···কিষণের গলা শোনা যায়··· রাম নাম সত্য হায়, গোপাল বোলো সত্য হায়···' সফীক শবযাত্রার সামনে এসে গলায় গলা মিলিয়ে চেঁচাতে লাগল ··'রাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সত্য হায়, সাথ সাথ চলে আয়, সত্য হায় সত্য হায়, সাথ সাথ চলে আয় চলে আয়, চলে আয়···'লোক উঠে পড়ল, ফাঁক ভরে গেল ··'বিজন, চলে যাও···অমান্য কোরো না আমার কথা··· যাও···'বিজন গেল না···'বিজন, পিছনে যাও, শোন আমার কথা।' বিজন গেল না · শবযাত্রা দীর্ঘ হল। লরি এসে পড়েছে ··'আবে, রোখ্‌লে, রোখ্‌লে'··· লরি থামল না, ড্রাইভারের পাশে দু'জন গুর্খা, হাতে যেন বন্দুক, ঐ চোঁয়া দেখা যাচ্ছে না ? তার দিয়ে ঘেরা লরি, কালো রঙ, মাথায় কারা যেন শুয়ে আছে···হাতে তাদেরও বন্দুকের মতন কি রয়েছে ···বন্দুক···গাড়ির ভেতর লোক নেই বোধ হয়···চুপচাপ, কেবল ইঞ্জিনের আওয়াজ···ধক্ ধক্···'রাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সত্য হায়, গোপাল বোলো ··'হেডলাইটের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, 'রোখ্‌লে শালে, রোখ্‌লে'··শববাহকরা থেমে পড়ল লরির সামনে···বিজন কেন সামনে ? 'বিজন, ইধার আও'···ঘ্যাস করে গিয়ার্ বদলাল···বিজন শুনতে পায়নি, সফীক ছুটে এসে বিজনকে ঠেলে খাট কাঁধে করলে, 'রাম নাম বোলো, বোলো জোরসে ইন্ কিলাব জিন্দাবাদ ইন্-কিলাব জিন্-দাবাদ···'ধক্ ধকানি বন্ধ, এঞ্জিন চলতে শুরু হয়েছে···'রোখো, রোখো' ··সফীক চাকার সামনে খাট ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে সরে দাঁড়াল, মড়্ মড়্ করে ভেঙ্গে গেল ষাট পয়সার খাট। সফীক হাঁক দিল, 'ইন্-কিলাব জিন্দাবাদ', শতকণ্ঠে সেই রব ধ্বনিত হল। বিজন সফীকের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ··'এখান থেকে যাও' ··'খুন কিয়া, খুন কিয়া', 'বাচ্চাকো মার ডালা'···লরি থামল, চারধারে লোক ঘিরল, খাঁ সাহেব এগিয়ে এল···'ভাগো হিঁয়াসে···নয়ত এইখানে গোর দেব এই পাকা সড়কের ওপর'···মহবুব টায়ারের ওপর খোঁচা মারছিল···'পেট্রল ট্যাঙ্ক জ্বালিয়ে দেব ওস্তাদ ?' চার ধারে লোক চেঁচাচ্ছে—লরির ভেতরে বিশেষ কোনো শব্দ নেই—সফীক খাট থেকে মড়া খোকাকে তুলে নিলে···'মহবুব, মহবুব, যদি এখ্‌খনই না ফেরে ওরা গাড়িতে পেট্রল জ্বালিয়ে দাও।' পিছন দিয়ে কিষণ লরির ছাতে উঠেছে··· 'ওস্তাদ, বন্দুক নয়, লাঠি, লাঠি···হো, হো হো···' 'নেহিজী, বন্দুক···' অসভ্য গালি এল ভিড়ের মধ্যে থেকে···খাঁ সাহেবের আওয়াজ। এক, দুই, তিনটে

লাঠি পড়ল ওপর থেকে···কিষণ হাসছে···'ওস্তাদ, ওস্তাদ, লাঠি কেড়ে নাও···' সফীক মড়াটা বিজনের হাতে তুলে দিয়ে ড্রাইভারের সামনে এল···লরির ভেতর থেকে সামান্য কোলাহল হচ্ছে···পিছনের দরজায় খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে···মহবুব একটা মশাল এনেছে। 'আগ্ লাগায়ে দেও···'ভেতরে কারা চেঁচিয়ে উঠল, গিয়ার বদলাল, লরি ব্যাক করছে, কিষণ ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ল···হঠাৎ লরিটা চলতে আরম্ভ করল, পাশের লোক সরে দাঁড়াল···লরি খোলা রাস্তা পেয়ে ছুটল জোরে। অন্য লরিগুলো মাঝ রাস্তায় ব্যাক্ করে আগে থেকেই সরে পড়েছে।

সফীক বল্লে, 'কিষণ, পাড়ায় পাড়ায় খবর দাও···লরি ভর্তি গুণ্ডা আর নতুন মজুর আসছিল···এরা বাধা দেয়···একটা ছেলে চাপা দিয়েছে··মজদুর-সভায় যেন সকলে এখনই ধাওয়া করে···আর বোলো, অতিশয় শান্ত ও অহিংস পদ্ধতিতে লরি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে, আগুন লাগান হয় নি···মারপিট হয় নি, এমন কি লরির মধ্যে যারা ছিল তারা নির্বিঘ্নে ফিরেছে। সাইকেল নিয়ে যাও··জরুরি কাজ···বিজন, লাশটা দাও!' ধরাধরি করে রাস্তার পাশে মড়া শোয়ান হল—চৌধুরী চেঁচিয়ে কাঁদছিল, সফীক ধমকে উঠল··'মড়াও উপকারে আসে।' কিষণ আওয়াজ দিলে··'ইন্-কিলাব জিন্দাবাদ'···সফীক বল্লে··· মুর্দাবাদ··বিজন সামনে থেকে চলে গেল।

নয়

খবরটা অতি শীঘ্র রাষ্ট্র হল যে মালিকরা নতুন মজুর দিয়ে হরতাল ভাঙতে চেষ্টা করে, হরতালিরা যখন বাধা দেয়, তখন লরি তাদের বুকের ওপর দিয়ে চালাবার চেষ্টা হয়, এবং গোলমালে একটা ছেলে চাপা পড়েছে। যখন অন্য পাড়া থেকে মজুররা ছুটে এল তখন গোলমালে চাপা পড়াটা খুনে পরিণত হয়েছে। সফীক কিষণকে বল্লে চৌধুরীকে সরিয়ে ফেলতে। মহবুব সফীককে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওস্তাদ, এখন?'

স: 'এখন? এখনও গুণ্ডারা ভেতরে আছে, অতএব অহিংসাই ধর্ম! তবে ওদের ঠাণ্ডা রাখতে হবে, সেই সঙ্গে মোড় ফেরান চাই। একটা বাচ্চা খুন হয়েছে এই দেশে, এই শহরে, যেখানে জন্মাবার পূর্বেও মরে, পরেও মরে, যেখানে কেউ বাঁচে না—একি ঠাট্টার ব্যাপার! দাও ঘুরিয়ে ভগবানের আশীর্বাদকে মানুষের কাজে!'

ম : 'ও-সব বুঝি না ! দু'চারটে কথা কও, নয়ত' মারপিট বাধবে !'

স : 'পরে, প্রয়োজন এলে দেখা যাবে। এই যে খাঁ সাহেব, দেখলেন কাণ্ডটা চৌধুরীর বাড়ির মেয়েরা কাঁদছে, একবার নিজে না হয়…'

খাঁ : 'ও কাজ আমার নয়, বিবিদের, তারা শকুনের মতন এতক্ষণ হাজির হয়েছে। কিন্তু লাশ কোথায় ?'

স : 'পবিত্র হিন্দুর আশ্রয়ে।'

মহবুব সফীকের কানের কাছে মুখ এনে বল্লে, 'ওস্তাদ, মেয়েদের কী বলা হবে ?'

স : 'কেন ? কেন ? খাঁ সায়েব, এখনই আসছি, একটু জরুরি বাৎ আছে, কেন, কেন ? বলা হবে খাঁটি মিথ্যে কথা, যা তারা চায়, যা তাদের প্রাপ্য, লরি চাপা দিয়েছে খোকাকে ! কেমন ?'

ম : 'ওস্তাদ, এমন কিছু লাভ হবে না তাতে। তাছাড়া, আমার সাধ্য নয়।'

ন : 'বল কি ! মেয়েদের শক্তি ভিন্ন কী কখনও কোনো বড় কাজ হয় ! তুমি হলে কমরেড, ঘাঘরার ভয় তোমার শোভা পায় না। ওটা বিজনের উপযুক্ত।'

ম : 'যদি পুলিশে লাশ নিয়ে যায়, আর পরীক্ষার পর প্রমাণ হয় যে…'

স : 'খোকার মুখ দেখেছিলে ? ডাক্তারের বাপের ক্ষমতা নেই…যদি কেড়েই নিয়ে যায়, তবে চমৎকার হবে, সব মজুর কোতওয়ালির সামনে ভিড় জমাবে।'

ম : 'সঙ্গে সঙ্গে ১৪৪…'

সফীক একটু ভেবে বল্লে, 'ধন্যবাদ, মহবুব, তোমার বুদ্ধি পেকেছে এতদিনে। পুলিশের হাতে লাশ না পড়াটাই ভাল, তাই ঠিক। কিন্তু এই সুযোগে ওরা বাইরের লোক না ঢোকায় তার বন্দোবস্ত কর। খাঁ সায়েবকে দিয়ে এইটি করিয়ে নাও !' মহবুব চলে গেল।

সফীক শহরের দিকে চলল। রাত হয়েছে গভীর…কত রাত বোঝা যায় না। প্রত্যেক রাত্রিতে এমন একটি সময় আসে যখন কালের পরিমাণ পুঁছে যায়, মানুষের তৈরি বিভাগ অবলুপ্ত হয়, কালস্রোতে নিরুদ্ধ হয়ে দেশ ও পাত্রের ব্যবধান দূর করে, তখন ঘড়ি ঘুমোয়, ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিমোয়, কিশোরীর গায়ের কাপড় খুলে খড়-পাকাটির কাঁচা পুতুল দেখায়, শ্বাসটানা বুড়িরও ঘড়-ঘড়ানি বন্ধ হয়। তখন জাগে কেবল কবির বিকৃত মস্তিষ্কের নারকীয় পরিকল্পনার অসংলগ্ন প্রতিচ্ছবি, জাগে ফাইলেরিয়ার বীজাণু, আর রাজকুমার সিদ্ধার্থ। মঙ্গল-

অমঙ্গলের বাইরে এই সময়, তাই যোগীজনসুলভ। প্রকৃতি যেখানে আদিম সেখানে সে অনন্ত, যেই মানুষের ছোঁয়াচ পড়ল তখনই শুরু হল ছেঁড়াছেঁড়ি। সেই অবধি সভ্যতা, ইতিহাস, পারম্পর্য, নীতি নিয়তি। এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নেই। যারা মানুষকে বরণ করেছে তারা প্রকৃতির একটানা বিরতিতে বিশ্রাম পেল না। অথচ, তার প্রয়োজন আছে। ত্রিযামার আশ্রয় যেন ত্রিবেণীর স্নান।

নিশাচরের জীবন শুরু হয়েছে সফীকের কলেজে থেকে। দিনের আলোয় ঘটনাগুলো চিক্‌চিক্ করে, সুখঃদুঃখের ভেদাভেদ হ্রাস হয়, তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয় না। দুঃখের রূপ যদি ফার্সি বয়েতের মতন হ'ত তবে আর ভাবনা ছিল না। সুখের ঢঙ যদি ঠুংরীর তানের মতন হত, তবে ভাবের বদলে ভাও-বাতলানতেই কাজ চলত। বুদ্‌বুদ না হয় রঙিন, কিন্তু তারা ভাসে বর্ণহীন জলরাশির ওপর, জল বাইরে নিথর, যে স্তরে আলো প্রবেশ করল না সেখানে সে একটানা, তাই বুঝি বা স্রোতের রঙ কালো। গতি রুদ্ধ হলে রঙিন, নচেৎ আদিম অবিচ্ছিন্ন একরোখা বেগ মসীমাখা। বিজন একবার তাকে কালীবাড়িতে কালীপূজা দেখতে নিয়ে যায়·· অমাবস্যার ঘনতায় মূর্তি প্রাণ পেয়েছিল, সংহারের। যে রাতকে চেনে না সে প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ ধ্বংস ও মৃত্যুর ক্ষুধাকে জানে নি। অহিংস নীতি দৈনিক জীবনের, রাতের নয়। মহাত্মাজী সন্ধ্যার পরেই ঘুমিয়ে পড়েন। রাতের কাজ ধ্বংসের, এবং সৃষ্টির, অর্থাৎ কামনার, তার দুই অংশেরই। দিনে সংস্কারই সম্ভব, তার বেশি নয়। আমূল পরিবর্তনের চাহিদা রাতে।

রাস্তার দুই পাশের দোকান, হোটেল, হালুইখানা বন্ধ, এক্কা নেই, টঙ্গা নেই, অত রাতে কে সোয়ারি হবে! কিছু খেলে হত, ডাক্তারে বলেছিলা নিয়মিত পথ্য চাই···দামী উপদেশ···খগেনবাবুকে অসুখের কথা কেনই বা বিজন বলতে গেল! কেনই বা বিজন মড়া ফেলতে গেল! সে কি ও কতটা দেখলে! মুখ সিঁটিয়ে গেল বেচারি! পোড় খায়নি, ধাতু নরম, কুঁচকে যায় সহজে। মজদুর সভার বৈঠক কখন বসবে খবর নিলে হত। সফীকের পেটের নাড়ি টেনে ধরে, যন্ত্রণায় রাস্তার পাশে বসে পড়ে। গা বমি বমি করে, পিত্তি ওঠে!

সফীক খগেনবাবুর বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে। ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে, দরজা খোলা! সফীক রাস্তা থেকে ডাকতে খগেনবাবু নিচে এসে তাকে ওপরে নিয়ে গেলেন।

'আপনার নোটটা তৈরি হল?'

'বিজন বলছিল আর দরকার নেই।'

'তাই নাকি! ঠিক বলা যায় না।'

'কেন?'

'দিনে দিনে ঘটনা বদলাচ্ছে, সেই সঙ্গে প্রয়োজনও।' বিজন কতটা বলেছে খগেনবাবুকে, কি বলেছে, জানতে ইচ্ছা হয় সফীকের। প্রশ্ন করে:

'বিজন বোধ হয় ঘুমুচ্ছে?'

'বিজন এখনও এল না, খেল না।'

'খায় নি? খায় নি কেন?'

'এখনও ফেরে নি।'

'তাও বটে। আজ আবার একটা হাঙ্গামা বাধল। একটা ছেলে চাপা পড়ল, লরির ধাক্কায়, ওরা নতুন লোক আনছিল। এত রাতে বিরক্ত করলাম।' খগেনবাবুর সামনে ভাষা অন্য হয় কেন? লজ্জা আসে অজানিতে, লজ্জা জয় করতে সফীক চোখ বুজে চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। খগেনবাবু সফীকের বসবার ভঙ্গি দেখে আশ্চর্য হন, সহানুভূতি জেগে ওঠে।

'বিজনকে আর আপনারা ছাড়বেন না, খগেনবাবু···ওকে ভাবীজী কত যত্ন করেন· সেই ভাল। ভাবীজী নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছেন?'

রমা ঘরে এল, সফীক চেয়ারের হাতলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। 'এত রাত্রে বিরক্ত করলাম, কিন্তু···কেবল বিজন এসেছে কিনা জানতে এসেছি। ও এখনও খায় নি?'

রমা সফীকের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর ভেতরে গেল। একটা প্লেটে বিস্কুট আর মাখন এনে সফীকের সামনে রাখলে। 'এক গ্লাস জল।' রমা ঠাণ্ডা জল এনে দিলে।

স: 'বিজনের ধারণা বোঝাপড়া হওয়াই ভাল। আপনার?'

খ: 'নতুন ব্যাপার কি ঘটেছে জানি না। তবে মনে হয় যেন ওরা কোনো শর্তই রাখবে না!'

স: 'শর্ত, শর্ত রাখলেই বা কি, ভাঙ্গলেই বা কি! আদৎ ব্যাপারে যে-কে সেই! ন' আনার জায়গায় দশ আনা, আজের বদলে কাল···আপনার কি মত? ভাবীজী?'

র: 'কিসের?'

স: 'শর্ত রক্ষাটাই কী সব?'

র: আমি কী জানি!'

স: 'এই ধরুন, মিলের শাড়ির বদলে বেনারসী, রূপোর বদলে সোনা,

সোনার বদলে প্ল্যাটিনামের ব্রুচ, একটা না হয় দশটা···কিন্তু মানুষটা, সম্বন্ধটা যা ছিল তাই রইল!' খগেনবাবু আচম্বিতে বলে উঠলেন, 'তা ঠিক···ওগুলো বাইরের মিল, ভেতরটার যা বিরোধ তাই রইল, তার আর নিষ্পত্তি নেই।' রমলার দৃষ্টি খগেনবাবুর অমনোযোগিতায় ব্যাহত হল···খগেনবাবু বলতে লাগলেন, 'সেই জন্যই স্বীকার করাই ভাল তার অস্তিত্বকে। তুমি ভাববে, লোকে বলবে, হার।'

স: 'হার নয়, এইটাই জয়ের সূচনা। প্রলেপ দিয়ে যে ঘা শুখোয় তার প্রলেপের প্রয়োজনই ছিল না। মজা নদীর খাতে ভরা নদীর স্রোত এলে কী সর্বনাশ হয় জানেন ত। ভাবীজীর সঙ্গে আমিও সাহিত্যিক হয়ে গেলাম! রমলা গেলাস ও পিরিচ নিয়ে উঠে গেল।

বিজন এত রাতেও এল না, রমলা নিজের কোট ছাড়তে পারল না, সফীকের চেষ্টা সফল হল না— অথচ প্রত্যেকটি হওয়া উচিত ছিল। উচিত আর সার্থক, এই দু'য়ের ব্যবধানই যদি দুঃখের উৎপত্তি, তবে শান্তির জন্য অন্তত একটাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়। সার্থকতাকে পরিহার করলে থাকে কি? তার চেয়ে বিদ্যাসাগরী ধর্ম-জ্ঞান চলে যাক। কিন্তু সহজে যায় না। অন্য কিছুর সাহায্য নিতে হয়। সেটা নতুন জ্ঞান হোক। কেবল দেখতে হবে, জ্ঞান নতুন ধর্মজ্ঞানে পরিণত না হয়। তার প্রতিষেধক, কর্ম, বুদ্ধি-প্রণোদিত কর্ম, ভাবার্জিত কর্ম। মানুষ নীরস হবে তাতে, কিন্তু দোটানায় থাকা অসম্ভব। আরেকটা উপায় আছে— সেটা বিরোধকেই স্বীকার করা। স্বীকার মানে কি? তার অস্তিত্বে কোনো ভাবোদ্রেক যেন না হয়, না ওঠে রাগ, না ওঠে ক্ষোভ। এটা সমাধান নয়। যুক্তিটা এই— বিরোধের জন্য কষ্ট হয়, কষ্টের অবসান কিসে হবে? না, কষ্ট না আসতে দিলে! স্বীকার নিশ্চয় অন্য অর্থে আছে। আইন যখন মজদুর-সভাকে স্বীকার করে তখন সে মজদুর-সভাকে গোটাকয়েক অধিকার ও দায়িত্বের আধার হিসেবে সৃষ্টি করে, যার ফলে সেই অনুষ্ঠান নিজের রচিত কর্তব্য পালন করতে পারে, অর্থাৎ অর্জিত অধিকার-সমষ্টিকে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়। স্বীকার মানে পৃথক সত্তার স্বীকার, সেই সত্তার বিকাশে বাধা না দেওয়া, অর্থাৎ পৃথককে পার্থক্যটুকু কাজে লাগাতে দেবার অবকাশ দেওয়া। শেষে সেই কাজে আসা। কিন্তু বিজনকে রমলা গ্রাস করেছে, খগেনবাবুকে গ্রাস করতে চেয়েছিল, পারল না, সফীকের মতামত তার মনুষ্যত্বকে গ্রাস করে ফেলেছে। অন্য ধারে বিজনও রাজী, তাই রমলা-বিজনে বিরোধ নেই, খগেনবাবু গররাজি, তাই মান-অভিমান; অন্য ধারে ঘটনাগুলো সফীকের মতামতের অপেক্ষা শক্তিশালী, তাই সফীকের মানসিক চাঞ্চল্য;

আরেক দিকে রমলা-বিজন-সফীকের সম্বন্ধ ঝড়ের আগে আকাশ-বাতাসের মতন থমথমে। বিদ্যুৎ চমকাল রমলার অঙ্গ আশ্রয় করে।

রমলা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এখনও বিজন এল না। আপনি পাঠিয়েছেন?'

স: 'এতক্ষণে আসা উচিত ছিল।'

র: 'কোথাও দুর্ঘটনা ঘটে নি ত?'

স: 'মোটর চাপা নিজে পড়েনি জানি।' সফীকের চাপা হাসি লক্ষ করে রমলা বল্লে, 'যেন সেজন্য দুঃখই পেয়েছেন সন্দেহ হয়।'

স: 'চাপা পড়লে তার আনন্দ হত, আপনার আদর-যত্ন পেত, এবং তার অত্যন্ত প্রিয় আন্দোলনটি আরো দুলে উঠত।'

র: 'আপনারও প্রতিদ্বন্দ্বী থাকত না।'

স: 'আপনার স্নেহের? সে-কথা খাটে খগেনবাবুর বেলা। আমার ক্ষেত্রে…বলছেন কি! জানতামই না আমি এতটা স্থান পেয়েছি ভাবীজীর হৃদয়ে!'

রমলার মুখ কাঠ হয়ে গেল। খগেনবাবু বল্লেন, 'এত রাত হয়েছে বুঝতেই পারিনি। আপনিই বা ফিরবেন কী করে?'

স: 'আমার রাতে ঘোরা অভ্যাস আছে। আমার এখনই যেতে হবে।'

খ: 'চলুন এগিয়ে দিই।'

রমলা শান্ত কণ্ঠে বল্লে, 'না, এগুতে হবে না।' সফীক দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, 'ভাবীজীর সঙ্গে অন্তত একবারও মতের মিল হল দেখে আনন্দ হচ্ছে। খগেনবাবু আপনার যাবার কোন প্রয়োজন নেই।' সফীক তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

মজদুর সভার অফিসের চারদিকের জীবন চঞ্চল। রাস্তার দুপাশের দোকানে আলো জ্বলছে, অফিসের বারান্দায় পেট্রোম্যাক্সের আলো শোঁ শোঁ শব্দ করছে, চারধারে পোকা ঘুরছে, দোকানের সামনে ছোট ছোট জটলা। একটার পাশে আসতে একজন জিজ্ঞাসা করলে— 'আপনি এখানে? আপনার দেখা পাওয়াই ভার!' সফীক হাসল— জটলার কথাবার্তা থেমে গেম, ক্রমে একজন মাত্র রইল। সফীক দোকানিকে প্রশ্ন করলে, 'এরা বুঝি কোম্পানির লোক!' 'আমার সন্দেহ তাই, মালিকরা নতুন মজদুর সভা খুলেছে! সফীক পান ও সিগারেট কিনলে। অন্য জটলায় আর একজন পরিচিত মজুরের সঙ্গে দেখা হল, 'এই যে কমরেড! ব্যাপারটা কি বলুন ত? শুনলাম লরি একটা ছেলে চাপা দিয়েছে, সি· এস· পি·র লোকেরা বলছে আগেই মরেছিল!'

ম: 'দক্ষিণপন্থীদের ভাষ্যটা?'

মজুর বুঝতে পারলেনা দেখে সফীক প্রশ্ন করলে— 'উধামজীর লোকেরা কি বলছেন ?'

তারাও বলছেন, 'আগেই মরেছিল।'

স: 'গরীবরা, মজুররা আবার কবে বেঁচেছিল! এই হিসেবে তাঁরা সত্যবাদী।'

মজুর ঠাট্টা ধরতে পারলে না, 'উধামজী বলেছেন না কি যে মোটরের সামনে দিয়ে মড়া নিয়ে যাওয়াই অন্যায় হয়েছিল।'

স: 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ভীষণ অন্যায় হয়েছে তোমাদের, ওঁদের মোটর কী খানার ওপর দিয়ে যাবে! মড়ার জন্য খানা আর গঙ্গার ঘাট রয়েইছে! মোটরগুলো যখন সিনেমা ও নাচ থেকে ফিরে বিজলী শোভিত গ্যারেজে ঢুকে বনাতের ঘেরাটোপের ভেতরে আরামসে ঘুমুবে, তখনই লাশ বার করবার সময়! তারপর ঘাটে নিয়ে গেলেই হত! অন্যায় হয়েছে, খুব, বুঝতে পারছি·· লরিভর্তি মজুর ফাটকের মধ্যে প্রবেশ করবার পর নিঃশব্দে খুঁদে মড়াটাকে গঙ্গাযাত্রা করালেই সুবিধে হত, সব দিক থেকে···কি বল! হাঃ হাঃ হাঃ···' শ্রোতারা হেসে উঠল। মজুরটির হাসিতে একটা কৃত্রিমতা রয়েছে, যেন বুঝতে পারছে না অন্যায়টি কোথায়। অন্য একজন জিজ্ঞাসা করল, 'বোঝাপড়া হয়ে গেল শুনলাম·· শর্তগুলো কি? আইনে বেঁধে দেওয়া যদি হয় তবে মন্দ কি।'

স: 'জরিমানা মাইনে থেকে উশুল করার বারন নেই আইনে? তবে?'

মজুর চলে গেল অন্য জনতায়।

অফিসের সামনেকার জনতা একটু বড়। দরজা বন্ধ করে সভা চলছে। বারান্দায় একজন কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য আসতে সফীক অনুরোধ জানালে করিম যদি ভেতরে থাকে যেন একটিবার বাইরে আসে। 'করিম! কোন্ করিম্? এটা আমাদের সমিতির বৈঠক, সফীক।' সফীক ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে পানের দোকানের সামনেকার বেঞ্চে বসল। উধামজী অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। তাঁর গম্ভীর আওয়াজের আকর্ষণ মানতে হয়, তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা শক্ত। সফীকও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। মজদুর-সভা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে শুনে সফীক বল্লে, 'সভা এখনও গ্রহণ করেনি, মাত্র সমিতি হয়ত গ্রহণ করেছে। আপনাদের শর্ত সমস্ত মজুরদের সামনে পেশ করবার পূর্বেই কেমন করে গৃহীত হল?' উধামজী হেসে বল্লেন, 'কমরেডের আইন জ্ঞান উকিলের মতনই·· তবে এটা ঠিক আমরাও বে-আইনী কাজ করব না। তা ছাড়া, কমরেড, সব মজুরদের সামনে ধরতে হবে কেন? মজদুর-সভার লোকদের সামনে পেশ করলেই কি যথেষ্ট হবে না?'

স : 'না, হবে না, কারণ, মজদুর-সভা বলেছে যে তারাই সমগ্র মজুরদের প্রতিনিধি।'

উ : 'প্রতিনিধি, তার বেশি ত' নয়! যাক্, ও-সব পণ্ডিতি তর্ক আবার আমি চালাতে পারি না। তবে বে-আইনী কাজ আমি থাকতে হবে না।'

স : 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ওটা আপনার ধাতে নেই, ওতে আপনার বাধে।' উধামজী উত্তর না দিয়ে অফিসের ভেতরে গেলেন। সমিতির অন্যান্য সভ্যবৃন্দ ক্রমে বাইরে এলেন, চলাফেরায় উল্লাসের, আত্মতৃপ্তির চিহ্ন বর্তমান, প্রত্যেকেই প্রায় সিগারেট কিংবা চুরুট ধরালেন, পান, শুপুরি, চুন বিনিময় চলল। প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তবে তিন জন আপত্তি জানিয়েছিল, টেকেনি এই কারণে যে মজুরদের অবস্থা কাহিল, আরো দু-একদিন জোর ধর্মঘট চালান যেত, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেড়েই চলেছে। একজন চেঁচিয়ে বল্লে, ভয়টা ঝুটো, সরকার রয়েছেন কি করতে!' কোনো মন্তব্য হল না কথাটার ওপর। জনতা ক্ষীণ হল।

করিম অন্য একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

ক : 'নিজের পাড়ায়। শুনেছ?'

স : 'শুনেছি। কাল বড় মিটি'-এ কিছু করতে পারবে?'

ক : 'গোলমাল পাকান শক্ত নয়, কিন্তু ফল কী ভাল হবে? মজদুর-সভাটাই ভাঙ্গবে।' সফীক অস্থির হয়ে বল্লে, 'চল, একটু খোলা জায়গায় বসি গে।' দুজনে একটা ঢিবির ওপর বসল।

স : 'তুমি সমঝোতা চাও না, কেমন!'

ক : 'না।'

স : 'তুমি মজদুর-সভা ভাঙ্গতে চাও না?'

ক : 'না।'

স : 'মজদুর-সভা না ভেঙ্গে যদি বোঝাপড়া ভাঙ্গে তবে খুশী হবে?'

ক : 'নিশ্চয়ই। তবে উপায় দেখি না।'

স : 'উপায় আছে। একটা ছেলে আজ মরেছে জান?'

ক : 'চাপা দিয়েছে শুনছিলাম। ব্যাপারটা কী?'

স : 'ব্যাপারটা যাই হোক না, খৃস্টানেরা বলে যারা অল্প বয়সে মরে তাদের ওপর ওদের ভগবানের আশীর্বাদ আছে। শিশুটি একটি মাত্র সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের কৃপায় ধন্য রবে কেন, করিম? আমি ভাবছিলাম, ভোর বেলা যদি ঐ লাশটাকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়ে, একটু লোকজন জড়

করতে করতে, এই ধর বেলা তুটো তিনটের সময় গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া যায়···তবে, মজতুর-সভাও টিঁকে থাকে···কি বল ?'

ক : 'বুঝলাম, কিন্তু লাশটা পাবে কোথায় ? লাশ এখন থানায় ।'

সফীক লাফিয়ে উঠল। 'সে কি! অসম্ভব! লাশ কিষণের চার্জে। হতেই পারে না।'

ক : 'আমি সঠিক জানি, লাশ এখন থানায়। কেবল তাই নয়, দেখো ওস্তাদ, সমঝোতার আগে লাশ খালাস পাওয়াই যাবে না। পুলিশ কী অত বোকা ?'

সফীক অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বল্লে, 'অসম্ভব লাশ বার করতেই হবে।'

করিম : 'পুলিশে খবর পেলে কি করে ? তোমার উপায়টি খাটল না ওস্তাদ।'

স : 'তবে মজতুর-সভা ভাঙ্গুক, করিম। বুঝে ছাখ, করিম, তুমিই ভাব, ওরাই বলছে মজতুর-সভার প্রভাব কমেছে, এক একটি কোম্পানি এক একটি নিজের নিজের ইউনিয়ন খুলছে, লোক সেই সব ইউনিয়নে ভর্তি হচ্ছে ত' ! তবেই, ছাখ করিম··'

ক : 'নতুন লোকেরাই যাচ্ছে। কিন্তু ঐ ইউনিয়নগুলির একটিও বাঁচবে না বলে দিলাম। ওরাই বলছে আমাদের প্রভাব নেই, আমরা তা বলছি না। ওদের কথা মেনে নিলে যে আমাদেরই হার হল, ওস্তাদ। না, সে হয় না··· বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তুমি কী ভাব, ওরাই মজতুর-সভা চালাবে বরাবর ? আজ না হয়, তুদিন পরে আমাদেরই হবে, তখন ভয়ে কাঁপবে সকলে।'

স : 'মিল-কমিটি কি চায় ?'

ক : 'আমি কতবার তোমাকে বলেছি। তারা জানে শর্তগুলো তুদিন পরে ফুঁয়ে উড়ে যাবে, তবু তারা চায় না মজতুর-সভা ভাঙ্গুক। জানি ওস্তাদ, ছুতোয় নাতায় আবার আমাদের বরখাস্ত করবে। তা করুক! এই ভাবেই ত জোর বাড়ে ? নয় কি ? তোমার মতন লেখাপড়া শিখিনি, আট বছর থেকে হাতুড়ি চালিয়েছি বাপদাদার সঙ্গে, তার পরের ঘটনা তোমার অজানা নেই···আমারও নালিশ আছে···তবু কি জান ? এই মজতুর-সভা আমাদের হাতে গড়া···তুমি হয়ত এটা ঠিক বুঝছ না, মাপ করো, লেখাপড়া শিখলে অনেক বাধা আসে···তোমার বাধা সবচেয়ে কম, জানি তুমি আনক চেষ্টা করেছ···যখন তোমাকে চেয়েছিলাম, তখন সভ্য হতে রাজি হলে না···। আমিও আর ফিরতে চাই না ওদের জানিয়ে দিয়েছি, সত্যই আর খাটতে পারি না, আমাকে নিয়ে ঝগড়া যেন না চলে।'

সফীক করিমের কাছে বিড়ি চাইলে। করিম, একটা পুরো প্যাকেট গুঁজে দিলে হাতে। 'করিম, প্রায় ভোর হয়ে এল, আমি আড্ডায় যাচ্ছি···কাল সভায় যাবার প্রয়োজন আছে কি ?'

ক : 'তুমি মানুষকে অত ভয় পাও কেন, ওস্তাদ ?'

সফীক বিড়ি ধরিয়ে একাই আড্ডায় গেল।

ঘরের ভেতর খাটে কে একজন মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। তার ঘুম যাতে না ভাঙ্গে ভেবে সফীক চুপি চুপি বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুম আসে না, শরীর আবার বিগড়েছে, না হলে রাস্তার ধারে যন্ত্রণার চোটে বসে পড়তে হয়! ভাবীজী ভাগ্যিস চা-বিস্কুট খাওয়ালেন! দুর্বল দেখাচ্ছিল নচেৎ মনে মনে, এমনকি আচার-ব্যবহারেও যার শত্রুভাব, সে করুণা দেখাতে যাবে কেন? মহিলাটি চান না যে খগেনবাবু ও বিজনের সঙ্গে তার কোনো যোগ থাকে। অতরাত্রে যাওয়াটাই অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু শরীর মানল না ধর্মকথা। বাস্তবিকই অন্যায়; তাই·· অচল এই মেয়েদের সংশ্রব! বুর্জোয়া মেয়েরা স্বামী ও আত্মীয়স্বজনদের শোষণ করতে পেলে আর কিছু চায় না। তাদের শোষণ-পদ্ধতি নিতান্ত মানুষিক, অর্থাৎ দৈহিক, তাই আরো ভয়ঙ্কর। অথচ মুখে সব ফেমিনিস্ট। মিথ্যুক! এক একটি সন্তান ইন্‌সিওরেন্সের চাঁদা, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন গাঁঠ, স্বাধীনতার পায়ে ছেলে মেয়ের কচি হাত দিয়ে কুড়ুল মারা। 'খুকি তোমাকে না দেখতে পেয়ে ঘুম ভেঙ্গেই কাঁদছিল, খোকা তোমার ফটো দেখেই বা-ব্‌বা বলে উঠল··' এবং তার পরই···'ওদের বাড়ির ললিতাকে সুন্দরী বলে যে কিসে তা বুঝি না! মিটিং থেকে ফিরতে অত রাত হল! স্যুপ ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল, আইসক্রীম গেল গলে। জন্মগত দাসী মনোভাব, দৈহিক শক্তি, তার অভাবে, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের পুজা! যুযুৎসুর প্যাঁচ মেয়েলি ইম্পিরিয়ালিজমের প্রধান আঙ্গিক। তার ওপর শিশুর অত্যাচার!

নিজে যদি রোমান্টিক হত তবে চৌধুরীর বাচ্চার মুখচ্ছবি মানসপটে ভেসে উঠত। সফীক চোখ বড় করে অন্ধকারে চাইলে। কোথাও কিছু নেই, লরির চাকার চাপে থেঁতলে গেল, তাই বোধ হয়। কিংবা হয়ত, কোনো মায়াই ছিল না। মায়া থাকলেই ছায়া ঘুরবে! বরঞ্চ, অন্যায়বোধ, অধর্মজ্ঞানই ঐ ধরনের ছায়ার জন্ম দেয়। যারা আত্মসর্বস্ব তাদের কষ্ট পাওয়ার প্রতি একটা আন্তরিক টান থাকে। অতীতের কাল্পনিক দুঃখ যদি না মূর্ত হয় তবে বিঁধবে কারা? খিদের তাড়া নেই, অসুবিধের অন্য কোনো জ্বালা নেই, সৃষ্টি ও প্রকাশের ব্যথা নেই, একটা কিছু যন্ত্রণা পাওয়ার অস্ত্র চাই ত! তাই নিজের নখ আর দাঁতের সাহায্যে আঁচড়ে কামড়ে যত পার ঘা কর! সেই ক্ষত যত দগদগে হয় ততই

আনন্দ, ততই বিলাস, ততই তৃপ্তি। এই বিলাসের নামই না কত! করিমের বিলাস নেই, সে নিজেকে সরিয়ে নিলে কেমন সহজে, কেমন নীরবে! অথচ ঐ ধরনের স্বার্থত্যাগের অছিলায় বুর্জোয়া মেয়েরা কত ন্যাকামিই না করত। রোমান্টিসিজমের মূলে শতাব্দীর সঞ্চিত জমান সারপ্লাস ভ্যালু!

কিন্তু লাশ গেল পুলিশের হাতে কি করে! কিষণ ছাড়লে কেন? মড়া খোকাও কাজে লাগে দশের। একটা শোকযাত্রার বন্দোবস্ত হলে দেখা যেত উধামজীর জোর কতটা। মজদুর-সভা বজায় থাকত। করিম রক্ত মাংস দিয়ে গড়ে তুলেছে, তাই এত মমতা। কিন্তু নিজের সৃষ্টির প্রতি মোহটাও থাকবে কেন? মাতৃত্বের সঙ্গে পার্থক্য আছে—মজদুর-সভা তৈরি হবার পর সর্বসাধারণের, ছেলে বিয়ের পরও মায়ের। করিমের স্নেহ ভিন্ন জাতের। তবু, মজদুর-সভার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন আছে। নিজে সভ্য হতে রাজী হয় নি। করিম বল্লে মানুষকে ভয় কেন? কৈ? ভয় নেই ত! ভয় কাকে? মড়াকে ভয় নেই, জেলের ভয় নেই, মৃত্যুরও ভয় নেই ত, মানুষকে ভয়! করিম ঠিক বুঝতে পারে নি. সমবেত মানুষকে, নিপীড়িত শ্রেণীকে যে সেবা করেছে সে ভয় পাবে কেন? আবার পেটে সফীকের অসহ্য যন্ত্রণা…তীরের মত বেঁধে …অকস্মাৎ মনে হয় একটা পৃথক মানুষকে ভয় পায় বলেই কি সে সমষ্টিগত মানুষকে আঁকড়ে ধরেছে, যেমন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ব্যক্তি জনসাধারণকে ভয় করে ব'লে ব্যক্তিত্ববাদী হয়। সফীকের গলা শুখিয়ে ওঠে, বিড়ির টানে জিব জ্বলতে থাকে, ঘরের কোনে সোরাই, সফীক উঠে জল খেতে গেল, সোরাই বক্ বক্ শব্দ করলে, বিছানার লোকটি ধড়মড় করে উঠে পড়ল, 'কোন হ্যায়?'

'ডাকু…শুয়ে পড়…বিজন! এখানে?' বিজন শুল না। সফীক আলো জ্বাললে। 'এক গ্লাস জল দাও, তারপর তোমার বক্তৃতা শুনব।' বিজন জল দিলে। দাঁত চেপে যন্ত্রণা জয় করতে সময় লাগল।

স: 'কি বলতে চাইছ, বিজন?' উত্তর এল না দেখে সফীক বল্লে, 'আমিই বলব?'

বি: 'না, ধন্যবাদ।'

স: 'কেন নিজে লজ্জা পাবে? আমিই না হয় লজ্জাটা ভাঙ্গি? তোমার নিজের দুর্বলতার কাহিনী আমার মুখে কম রোমান্টিক শোনাবে। এটা ভাবের খেলা নয় বিজন। তোমার শক্তিতে ইয়ুটোপিয়ার রচনা হয়, কিন্তু জগদ্দল পাথর এক চুল সরান যায় না। কে বলেছে তোমার বিশ্বাস ছিল না? কিন্তু বিশ্বাসে এই স্বার্থের পাহাড় টলাবে! ইডিয়টিক! জোর নিজে অচল থাকা যায়। আমাদের বিশ্বাসে অটল থাকতে পারে ক'জন? এতে ত অনুষ্ঠান নেই যেটা

তোমাকে আশ্রয় দেবে! পার্টির মেম্বার তুমি নও, তুমি বাইরের বন্ধুমাত্র, অর্থাৎ আজকের বন্ধু, কালকের গুপ্তচর; শত্রু।'

বি: 'ওস্তাদ···'

স: 'গুরুবাদ তোমার রক্তে মাংসে, ও-নামটা আজ থেকে না হয় নাই ব্যবহার করলে! বল।'

বি: 'মিথ্যে দিয়ে কাজ হাঁসিল করবে! তা হয় না। পারবে না দেখ, সব মজুরই মাথা পেতে নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করবে। তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, একটার জায়গায় দশটা মড়া, মড়া কেন দশটা জ্যান্ত মানুষ লরির সামনে ছুঁড়ে দাও না কেন, পারবে না, পারবে না···আমি তোমাদের এপ্রেন্টিসি করলাম এতদিন···কিন্তু চলবে না···কিছুতেই।'

স: 'এ যে একেবারে অলডাস্ হক্সলে! এইবার সন্ন্যাসী হবে নাকি বিজন?'

বি: 'ঠাট্টা ছাড়। তোমার মতও 'পিওর সোশিয়ালিস্ট'দের মতন। দেশের নেতৃত্ব যদি মধ্যবিত্তের হয় তবে বোঝা-পড়া ছাড়া গতি নেই।'

স: 'ধরতাই বুলিগুলো ছাড়।'

বি: 'মিল-কমিটি পারলে চালাতে? তুমি তাদের মানছ না।'

স: 'খুব ভাল ভাবেই পারত···'

বি: 'যদি না···'

স: 'যদি আমাদের দলে তোমার মতন 'ডিফিটিস্ট' না থাকত।'

বি: 'অপমান করে লাভ নেই।'

স: 'তার চেয়েও বেশি।'

বি: 'কি?'

স: 'বিশ্বাসঘাতক। পুলিশে খবর দিয়েছ তুমি।'

বি: 'হাঁ, দিয়েছি। লজ্জা পাচ্ছি না। এক হিসেবে তুমিও খুনী।'

স: 'অনুগ্রহ করে এই ঘর থেকে এখনই বেরিয়ে যাবে? হয়ত, তোমার ইচ্ছা ছিল না, অন্যের প্ররোচনা ছিল। তাই সম্ভব, তাই আশা করছিলাম। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিও। এখনই যাবে?' বিজন চলে গেল। না, কিছুতেই হার স্বীকার চলে না, চলে না, শেষ চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টার শেষ নেই, নেই, নেই, শরীরপাত হোক, সকলে ত্যাগ করুক, তা বলে বেটা অন্যায় সেটা সহজে ঘটবে! বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, মেয়েমানুষের আঁচলধরা বুড়ো খোকা! মার্কস বলে গেছেন সেই কতকাল পূর্বে যে মধ্যবিত্তের দু'ভাগ, একভাগ ঝাঁপিয়ে পড়ে, অন্যভাগ সহানুভূতি দেখায়, চাঁদা দেয়, অবশেষে তারাই রক্ষণ-

লীগের দলে মেশে, ধর্মের ছুতোয়, ব্যবহারিক যুক্তির অছিলায়, বস্তুত স্বার্থের তাড়নায়, অজানার ভয়ে। তাদের নিজের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করাই ভাল— কারা বন্ধু কারা শত্রু স্পষ্ট বোঝা যাক, যন্ত্রণা যেন একটু কমল।

সকাল ন'টার সময় মজতুর-সভার মিটিং ডাকা হয়েছে। ভিড় হয়নি। সফীক একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। উধামজী বক্তৃতা দিলেন···'ভগবানের আশীর্বাদে আজ মজতুরের জয়লাভ হয়েছে। তাদের ত্যাগ, তাদের জিদ্, তাদের বিশেষত, মেয়েদের, আমাদের মা-বোনেদের সহ্যশক্তি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যে-শান্তিতে তারা এই ধর্মঘট চালিয়েছে তার তুলনা জগতে নেই। রুশবিপ্লবে যেমন মস্কোর স্থান, ভারতীয় বিপ্লবে তেমনই কানপুরের। সবচেয়ে আনন্দের কথা এই যে কানপুরের মজতুর-সম্প্রদায় আজ অভিন্ন-হৃদয়, তার অন্তরে-বাহিরে আজ হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ জ্ঞান নেই। এই সূত্রে আমি শহরের মুসলিম লীগকে সমর্থন জানাচ্ছি বিশেষ করে। আজ দেশ বুঝেছে, এবং আমাদের বিদেশী প্রভুরাও বুঝুন, যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেস ও লীগ একই পথের পথিক। আমাদের সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁরা আমাদেরই··অতএব আমাদের বুকের নীরব ভাষা তাঁদের কানে পৌঁচচ্ছে। তাঁরা আমাদের, আমরা তাঁদের— এই সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থান নেই। আমি বৃথা সময় নষ্ট করব না। আপনারা সকলে একমত হোন এই সাধারণ প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে। সর্ববাদী ও আন্তরিক সম্মতি চাইছি। কারণ রয়েছে তার··এখনও এমন শত্রু রয়েছে যাদের উদ্দেশ্য যেন ঝগড়ার নিষ্পত্তি না হয়। তাদের দুরভিসন্ধিটা নাকচ করুন আপনারা। আমাদের সকলের, শ্রমিকদের, মালিকদের, সরকারের, দেশের লোকসান কতটা হবে তাঁরা তলিয়ে দেখছেন কি? তাঁদের গায়ে আঁচ পর্যন্ত লাগবে না, ঝলসাব আমরা, তোমরা· '

মজতুর-সভার কার্য নির্বাহক সমিতির একজন সভ্য প্রস্তাবটি পড়তে লাগলেন। মহবুব পাশে এসে বল্লে, ওস্তাদ, এই মওকা···' 'রাজি আছি, তোমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে সায় দেবে···কিষণ কোথায়?' 'ভিড় ছোট, আমাদের লোক কম, তবু, তুমি যাও।' সফীক ভিড় ঠেলে মঞ্চের দিকে এগুল। উধামজী তাকে দেখে বল্লেন, 'এই যে কমরেড, স্বয়ং, অনেকদিন দেখিনি, কিছু আপত্তি আছে নিশ্চয়···হা, হা, হা···কমরেড আপত্তি ছাড়া আর কিছুই তোলেন না, এমন কি চাঁদাটি পর্যন্ত নয়। সভাপতি বোধহয় রাজী হবেন না, একটু দেরি হয়ে গেল।' প্রস্তাব পাঠ শেষ হল। সফীক বল্লে, 'আমি এখনই

বলতে চাই কিছু, পরে সুবিধে হবে না···মনোনীত হবার পর আর বক্তব্য থাকবে না।' সফীক মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল।

'এই প্রস্তাবের সম্পর্কে আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে আসি নি। গ্রহণ করা, না করা সভার হাত। আমি কেবল একটি প্রশ্ন করছি···তোমরা কি ভাবছ যে মালিকরা শর্তগুলো মানবে?' দূর থেকে একজন বল্লে, 'মানবে না।' 'কিছুতেই মেনে চলবে না মনে নেই মাত্র কয়েক মাসের পূর্বেকার ব্যাপার? যারা সেবার ধর্মঘট চালালে তারা এখন কাজ করছে নিজের নিজের জায়গায়? কার জন্য এবারকার হরতাল? করিমকে নেওয়া হবে ফেরৎ? তাকে নেওয়া হলেও তাকে অকর্মণ্য বলে ওরা যে ছাড়িয়ে দেবে না এমন কিছু শর্ত আছে?' উধামজী বল্লেন, 'করিমকে অমনভাবে এক্স্‌প্লয়েট করবেন না কমরেড। করিম ভাই নিজেই আর চাকরি নেবে না, খবরটি বোধ হয় কমরেডের অজ্ঞাত।' সফীক···'করিম নিজেকে বলি দিলে, আপনারা তাই নিয়ে গর্ব করছেন···একজন মাত্র, কিন্তু মজুরদের রাখা না রাখার মালিক কে? কারণ দেখবার ভার কার হাতে? তোমরা বল, বিশ্বাস রাখতে পারা যায় এদের ওপর?' উধামজী বাধা দিয়ে বল্লেন, 'সভাপতি মহাশয় যদি অনুমতি দেন তবে'···মঞ্চের ওপর দুজন দাঁড়িয়ে। সভাপতি চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লেন, 'যিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি আমার অনুমতি চাইবার প্রয়োজন মনে করেন নি। তবে এই ডেমক্রেসীর যুগে সকলেরই অধিকার আছে মত প্রকাশের। আমি সেই ভেবে কমরেডকে পাঁচমিনিট সময় দিচ্ছি। উধামজী আপনি বসুন।'

সফীক বোধহয় অতটা নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করেনি। একটু থতমত খেয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমরাই বল, বিশ্বাস করা যায় এদের ওপর?' সফীক মহবুবকে খুঁজতে লাগল ভিড়ের মধ্যে, পাওয়া গেল না, 'বিশ্বাস রাখা যায় ওদের প্রতিজ্ঞায়, যারা মুনাফার জন্য আইন ভাঙতে সর্বদাই প্রস্তুত?' বিজন বল্লে খুনী ·· আইন ভঙ্গ সেটাও···মহবুব নেই, কিষণকে দেখা যাচ্ছে না, কোথায় গেল তারা, ভিড়ের মধ্যে তাদের মুখ সফীকের মুখের চাবি···চাবি হারিয়ে গেল না কি। 'আজ যদি বিনা অজুহাতে, ছুতোয়-নাতায় আবার তাড়ায়···তখন? বিশ্বাস করা চলে কি?' একটা কথা, ঐ বিশ্বাস, ঘুরে ফিরে সেই বিশ্বাস আর অবিশ্বাস আসে—ইতিহাসের অন্তর থেকে, শ্রেণী-বিরোধের পিছন থেকে, চেতনার আড়াল থেকে—সফীক আর বিশ্বাস কথাটি ব্যবহার করবে না। সভাপতি মহাশয় দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, 'দেখছি, কমরেড সব ব্যাপারটা অবগত নন। অবশ্য তাঁর দোষ নেই। যদি ওরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তবে আবার হরতাল হবে।' সফীক উত্তর দিলে—'হবে···কিন্তু কবে? নোটিশ দেবার পর; উধামজী— 'অর্ডার,

অর্ডার, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, কমরেড সভাপতির সঙ্গে তর্ক বাধিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত অন্যায়···তা ছাড়া কমরেড শ্রেণীবিরোধ প্রচার করছেন, তার স্থান ও কাল এই নয়। হাঁ, স্বীকার করছি নোটিশ দিতে হবে মজতুর-সভাকে। দেরি হবে অবশ্য, কিন্তু অধীর হলে চলবে না। কমরেড ভাবছেন, ইতিমধ্যে আন্দোলনে ভাঁটা পড়বে। তাতে অবশ্য কমরেডের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কিন্তু আমাদের শক্তি সঞ্চয় হবে। যে ধর্মঘট পনের দিন কি একমাস অপেক্ষা করতে পারে না তার অন্তরে ন্যায়ের সমর্থন নেই! কমরেড ভাবছেন নতুন শর্তগুলোর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আছে বৈ কি! পার্থক্য আগের সঙ্গে এই যে এবার সরকার খুদ, নিজে, মালিকদের ওপর চাপ দিতে পারবেন! একজন বড় জজ যদি রায় দেয় তবে সাধ্য কী তাকে অমান্য করা মালিকদের? লোকমত নেই? সরকার নেই?' সভাপতি মহাশয় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে লাগলেন। উধামজীর বক্তৃতা চলল—'একজন নামজাদা লোক শীঘ্রই নিযুক্ত হচ্ছেন— খবরটি একটু আগেই হয়ত প্রকাশ করে ফেললাম··· কিন্তু আশা করি খবরের কাগজের বন্ধুরা যেন ব্যবহার না করেন·· জজের সামনে যেতে আমাদের ভয় নেই···আমরা ন্যায়ে বিশ্বাসী, আমরা প্রপীড়িত, ন্যায় আমাদের দিকে, আমাদের আন্দোলন ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভয় আমাদের নেই, ভয় অন্যের।'

সফীক: 'রায় যতদিন না বেরুচ্ছে ততদিন কারা খাওয়াবে? রায় যদি ওরা গ্রাহ্য না করে সরকার ওদের কি করতে পারেন? রায় দেবে কে? ওদেরই দলের, ওদেরই শ্রেণীর একজন?'

উধামজী: 'পাঁচ মিনিট হয়ে গেল, সভাপতিজী। এইবার প্রস্তাবটা গৃহীত হোক। যদি অনুমতি পাই তবে মহাত্মাজীর বাণী পড়ে শোনাতে পারি?' সভাপতির সানন্দ অনুমতি পাবার সঙ্গেই উধামজী পাঠ শুরু করলেন। সফীক বল্লে, 'আগে প্রস্তাব···কতদিন নাম ভাঙ্গিয়ে খাবেন?' সভাপতি— 'আপনি এইবার থামুন। মহাত্মাজীর অপমান কেউ সহ্য করবে না। আমি আমার কর্তব্য জানি। উধামজী আপনি পাঠ করুন।' উধামজী মঞ্চের কিনারায় দাঁড়িয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে জনতাকে সম্বোধন করলেন, 'মহাত্মাজী এই মর্মে লিখেছেন···তাঁর বাণীর সারমর্মটাই বলছি, কে তাঁর অনবদ্য ভাষার অনুবাদ করবে? তিনি লিখছেন,···হরিজন-পত্রিকার মারফৎ···আমি বিশ্বাস করি না ধনিক শ্রমিককে কোনো আন্তরিক বিরোধ আছে। আমি নিজে শ্রমিক···তাই শ্রমিকদের হয়ে বলবার অধিকার আমার আছে···' সফীক বাধা দিলে— 'কিন্তু নিজে তিনি ধনিক নন— এবং তিনি শ্রমিকও নন।' 'অর্ডার-অর্ডার···'উধামজী ···'সে হিসেবে আমাদের কমরেডেরও কোনো অধিকার নেই···মহাত্মাজী

লিখেছেন— সত্যগ্রহ একটি বিজ্ঞান. তার রীতি আমার আয়ত্ত। সত্যাগ্রহ নিষ্ফল হবে তখনই যখন বিপক্ষকে অবিশ্বাস করব। অবিশ্বাস প্রেমের পরিচয় নয়। সত্যাগ্রহীর হৃদয়ে ঘৃণা থাকবে না, থাকবে আততায়ীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, আস্থা, শ্রদ্ধা। তারই শক্তিতে আততায়ী বন্ধু হবে।…জয় মহাত্মাজীর জয়…আপনারা সকলেই প্রস্তাবটা শুনেছেন, একবার সমস্বরে বলে উঠুন…জয় মহাত্মাজীর জয়…ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' সফীক মঞ্চ থেকে নেমে পড়ল…জয়, জয়, জয় উধামজীর জয়, জয় মালিকের জয়, মহবুব বলতে পার, হার তবে কার? বিজন বলবে হার আমার, আমার দম্ভের, তা নয় মহবুব, হার তার, তার…ভাবীজীর…আমাকে আড্ডায় নিয়ে চল মহবুব।'

দশ

নতুন বাংলোয় আসার পরই নতুন মোটর এল। বিজন একটা টু-সীটার কিনতে যায়, কিন্তু ছেলেমানুষের টাকা এইভাবে নয়-ছয় করতে দেওয়া উচিত নয়, নিজের মোটর থাকলে টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে, এই সব কারণে রমলা নিজেই মোটর কিনলে। সীডন্-বডির খরচ বেশি, রাক্ষসের মতন মোবিল্ খায়, দামও অন্তত সাত আটশ টাকা বেশি টুরিং মডেলের চেয়ে। টুরিং-কার-ই কেনা হল। কানপুর শহরে কোনো ড্রাইভারই রাস্তার নিয়ম মেনে চলে না। তাই বিজন নিজে গাড়ি চালাবে আপাতত এবং রমাদিকে চালাতে শিখিয়ে দেবে সুবিধেমত। কোলকাতার চেয়ে ড্রাইভারের মাইনে কম হলেও, কেন মিছি মিছি অতগুলো টাকার মাসিক শ্রাদ্ধ করা! খগেনবাবু কিন্তু মোটর চড়ে তাঁর নতুন বন্ধুদের আস্তানায় যাচ্ছেন না। তা ছাড়া ড্রাইভাররা একটা স্বতন্ত্র জাত, তাদের না আছে নীতিজ্ঞান, না আছে প্রভুভক্তি, সত্য মিথ্যার ধার তারা ধারে না, কথায় কথায় মেজাজ দেখিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেয়। যন্ত্রের সম্পর্কে এসে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কী দুর্দশা হয়েছে এদের দেখলেই বোঝা যায়। এরা না হিন্দু না মুসলমান। সেটা অবশ্য সুখের কথা, কিন্তু শ্রেণীজ্ঞান অত্যন্ত টনটনে এদের। লরি-ড্রাইভার সব চেয়ে নিচু থাকের, তার ওপর বাস-ড্রাইভার, উঁচুতে যারা বাড়ির গাড়ি হাঁকায়। আবার তাদের মধ্যেও জাতিবিচার। ফোর্ড-ফিয়াট বৈশ্য, বুইক-ডজ্-ভক্সহল ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ প্যাকার্ড-ডেম্‌লার, কুলীন ব্রাহ্মণ রোলস্-রয়েস্— একেবারে বেগের গাঙ্গুলি, নৈকষ্য…কানপুরে মাত্র পাঁচ-ছ'খানা আছে, তাদের ড্রাইভারদের মাটিতে পা পড়ে না— রাস্তার কনেস্টবল

তাদের সেলাম ক'রে আগে ছেড়ে দেয়। বিজনের অভিজ্ঞতায় বলে এই সব কারণে মোটর-ড্রাইভারদের সঙ্ঘবদ্ধ করা মুস্কিল। হিন্দুধর্মের জাতিবিচার শেকড় জমিয়েছে এঞ্জিনের ভেতর পর্যন্ত। এইজন্য একটু দেখে শুনে ড্রাইভার নিযুক্ত করতে হবে। ইতিমধ্যে বিজন নিজেই চালাবে···সেটা মোটেই অশোভন নয়, খুবই শোভন, খুব ফ্যাশনেবল্ ছোকরারাও তাই করে, তাতে নতুন সভ্যতার প্রাণবস্তু— চরখা নয়, এঞ্জিন, তাও বাষ্পীয় নয়, কম্বাস্‌চন্ এঞ্জিন— তার সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়, যেটার নিতান্ত প্রয়োজন আছে এই ফিউডাল দেশে, যেখানে সময়ের কোনো মূল্যই নেই। রমলা বল্লে, 'আমি তোমার পাশে, সামনের সীটে বসতে পেলে সুখী হব, মনে হবে ছেলে-মানুষটি।'

বাংলোটি ছোট হলেও পরিপাটি। আধুনিক ঢঙের, জাহাজের কেবিনের পরিকল্পনায় ঘর, ডেক্-এর অনুকরণে নিচু দালান, মায় রেলিং,পোর্টহোল্ পর্যন্ত। রমলা হালকা নীল পর্দা টাঙ্গাল। কানপুরে মনোমত ছবি পাওয়া যায় না। বেঙ্গল স্কুলের ছবি বিজনের পছন্দ নয়. সেটা কাব্য-গন্ধী, গুহাভিমুখী, রক্ষণশীল, প্রগতিবিরোধী; বম্বে স্কুলের ছবিতে তবু আনাটমি নির্ভুল, যদিও তেজের অভাব সেখানেও। একজন চেক্ মহিলা কানপুরে এসে ছবি আঁকছেন, তাঁর দু'তিনটে নতুন ধরনের, কিউবিস্ট ডিজাইনের সামুদ্রিক দৃশ্য আঁকা আছে। দাম নিয়ে গোলমাল হবে— দু'শ টাকা ছবি পিছু চাইছেন, কিন্তু দু'খানা একত্র মিলে মাত্র তিন শ' টাকাতেই হবে। কার্পেট কিন্তু পার্শিয়ান কিংবা বোখারার, জমা রক্তের মতমত ঘন লাল, কিনারায় সাদাসিধে ফুলের কাজ। নতুন ও পুরাতনের কনট্রাস্ট খুলবে ভাল। সবই এক প্যাটার্নের হবে— এটা ছিল আগেকার রুচি, এখন ব্লাউজপীস্ আর শাড়ির নকশা পৃথক। তাই হওয়াই সংগত, কারণ এটা ভারতবর্ষ, বয়েলগাড়ি ও মোটর গাড়ি, উভয়ই চলছে এখানে। আসবাব-পত্র আপাতত বিদেশী আধুনিক হোক, পরে যদি সত্যকারের ভাল দেশী প্যাটার্ন পাওয়া যায়, তখন বেছে নিলেই হবে। কানপুরে ক্রোমিয়ম প্লেটের আসবাবপত্রের দোকান খুলেছে এই সেদিনই। রমলা ও বিজন গিয়ে তাই কিনে আনলে। বাংলোর দোতলায় ছোট একটি ঘর, কাপ্তেনের, বিজনের মতে সেটা যেন খগেনবাবুর প্রকৃতি বুঝেই প্রস্তুত। সুজনদা এলে খগেনবাবু নিচে থাকবেন, কিন্তু সুজনদার আসবার নাম নেই। বাংলোর সামনে ছোট একটি লন্, বিলিয়ার্ড টেবিলের কাপড়ের মতন মসৃণ, পাশে মরশুমি ফুলের বিছানা কাটা জ্যামিতির আকারে। প্যান্ট্রিটা ভাল, তবে একটু ধোঁয়া যে হয় না তা নয়। ধোঁয়াটা খগেনবাবুর ঘরে যায়। খগেনবাবুকে

ধোঁয়া থেকে বাঁচাবার জন্য নতুন স্টোভ কিনতে হল। বেয়ারা, বয়, বাবুর্চি নিযুক্ত হবার পর বিজন ধরে বসল সব চাকর-বাকরকে খদ্দর পরতে হবে। রমলা উত্তর দিলে, 'ধোপার অতিরিক্ত খরচটা তবে তুমিই দিও।' কিন্তু সৌন্দর্যবোধেরই জয় হল— ফর্সা, ধপধপে খদ্দরের আচকান ও টুপিতে যেমন মানায় অমন কিছুতে নয়।

প্রথম চায়ের দিনে মাত্র বাইরের তিনজন, আর বিজন, অবশ্য খগেনবাবু। তিনজনের মধ্যে একজন দেশী মহিলা, একজন ইংরেজ পুরুষ, এবং অন্যজন একটি ভারতীয় অধ্যাপক। এই ভদ্রলোক অক্সফোর্ডে কাটিয়েছেন বছর আষ্টেক, মডার্ন গ্রেটস্-এর ছাত্র, সেখানকার ইউনিয়নের সেক্রেটারি হন। সেখানে এত জনপ্রিয় হন যে পরীক্ষার কিছু আগে এপেন্ডিসাইটিস অপারেশন হবার জন্য পরীক্ষা দিতে যখন তিনি পারলেন না তখন টিউটর, ফেলো, প্রোফেসর ও কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্য অনুপস্থিতির ডিগ্রী অনুমোদন করলে। ভদ্রলোক ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের কর্ণধার ছিলেন। বিলেতে, কন্টিনেন্টে যখনই ভারতীয় কিংবা অ-ভারতীয় ছাত্রদের মজলিস বসত তখন তাঁকে না হলে চলত না। বিজনের সঙ্গে আলাপ টেনিস-কোর্টে, খেলেন ভাল, কিন্তু ম্যাচ জেতবার মেজাজ নেই, বিজনেরই মতন। মতামতে বামমার্গী, লেফটিস্ট। চায়ের টেবিলে খগেনবাবুর সঙ্গে একতালে পা ফেলবার মতন লোক বটে, তাই তিনি এসেছেন।

কথাবার্তা শুরু হল সোভিয়েট-রাশিয়ার ট্রায়ালগুলো নিয়ে। খগেনবাবুর মতে ওদেশের আধুনিক অভিব্যক্তি ও শাসন পদ্ধতিতে কোথাও একটা গলদ আছেই আছে, নইলে এতগুলো ধুরন্ধর যারা লেনিনের সঙ্গে কাজ করে গণতন্ত্রটাকে দাঁড় করিয়েছিল তারা হঠাৎ ইম্পিরিয়ালিস্টদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরুই বা করলে কেন? যদি ষড়যন্ত্রটা সত্যিই না হয়, তবু অন্তত এটুকু বুঝতে হবে যে স্টালিনের শাসন জনপ্রিয় নয়। অধ্যাপক উত্তর দিলেন যে স্টালিনই লেনিন-পন্থী, এবং ট্রট্স্কির দল ঘুষ খেয়েছে সাম্রাজ্যবাদীর কাছ থেকে। খগেনবাবু যুক্তিটা গ্রহণ করলেন না, কারণ ঘুষের আর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ নেই; দ্বিতীয়ত কে লেনিনকে বেশি বুঝেছে, স্টালিন না ট্রট্স্কি, এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই, কারণ লেনিন নিজে আধুনিক অবস্থার উপযোগী করতে গিয়ে কার্ল মার্কস্-এর মতামত অদল বদল করেছেন, তাঁর থেকে দূরে সরে গেছেন। কে-কতটা কার অনুযায়ী সেটা মুখ্য নয়, প্রধান হল গতি, এবং গতির অবস্থা অনুযায়ী কর্মপদ্ধতির উদ্ভাবন। অধ্যাপক বল্লেন, সেই হিসেবেও স্টালিন নমস্য। খগেনবাবুর মতে নমস্কার পরে প্রাপ্য, যখন পৃথিবীর সর্ব দেশে অন্যায়ের অবসান হবে, স্টালিনের রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে। লেনিন ও স্টালিনের ব্যক্তিগত

কথা উঠল। খগেনবাবু বল্লেন, যদি লেনিনের স্ত্রী, যে আবার লেনিনের শিষ্যা ও সহকর্মী ছিল সেও যদি লেনিনকে না বুঝে থাকে তবে অবশ্য নাচার! অধ্যাপক আপত্তি তুললেন যে স্ত্রী হলেই স্বামীকে বুঝবে এমন কোনো ঐশী আজ্ঞা নেই— বরঞ্চ, না বোঝাই স্বাভাবিক; কমরেডরাই এই ব্যাপারে বেশি অধিকারী। অধ্যাপক মশাই রমলার টেবিলে চলে গেলেন।

ইংরেজ অতিথিটির বয়স কম, ভারতবর্ষে নতুন এসেছে কানপুরে একটা ম্যানেজিং এজেন্সির য়ুরোপীয়ান এসিস্টান্ট হয়ে। হাতের কব্জি ভীষণ মোটা, মাথাটা প্রকাণ্ড, বৃষস্কন্ধ, চোয়াল চৌকো ও ভারী, চোখ গাঢ় নীল ও ছেলে-মানুষী দুষ্টুমিমাখান হাসি। ভারতীয় মহিলা 'রণি' বলে ডাকছেন, আর ছোকরার গাল ও ঘাড় লাল হয়ে উঠছে। অধ্যাপক তার পাশে যেতে সে দাঁড়িয়ে উঠল। ভারতীয় মহিলা, ডাকনাম বেবী, সকলেই ডাক নাম ব্যবহার করছে, রণির পিঠে একটি হাত রেখে বল্লেন, 'সে হয় না, রণি, অমন মীন হোয়ো না, আপনিও বসুন।' বিজন ঠাট্টা করলে, 'ভয় নেই বেবী, তোমার রণিকে নিয়ে ভাগবো না, খগেনবাবুর সঙ্গে আলাপ নেই বুঝি?' বিজন রণিকে নিয়ে গেল খগেনবাবুর টেবিলে, 'খগেনবাবু, পরিচয় করতেই হবে রণিব সঙ্গে।' বিজন বাঙলায় চুপি চুপি বল্লে, 'এখনও সেদ্ধ হয় নি, মেলামেশা করতে চায় ভারতবাসীর সঙ্গে।' রসগোল্লা ও সিঙ্গাড়া খেতে যেন না ভোলে, রণিকে উপদেশ দেবার পর বিজন রমলার টেবিলে গেল। সকালে ধর্মঘটের মীমাংসা সংবাদে সে খুশী হয়েছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে রণি উত্তর দিল যে প্রকৃতপক্ষে ওটা সম্ভবত স্ট্রাইক নয়, লক-আউট, তবে লেবার-কমিশনার নিযুক্ত হলে, বিনা অজুহাতে, কেবল মজদুর-সভার সভ্য হবার জন্য 'ছুটি' পাবার ভয় খানিকটা কমতে পারে। খগেনবাবু সন্দেহ প্রকাশ করাতে রণি বল্লে, 'যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের জজ আসে তবে রায়ের মর্যাদা বাড়বে, অবশ্য, একটা ছোট অসুবিধা এই যে মজদুরদের ব্যাপারে হয়ত বা পুরানো নথি পাওয়া যাবে না, এবং অন্য দেশের নথিও চলবে না। শ্রমিক-ধনিকের সম্বন্ধের জন্য দেওয়ানী কিংবা ফৌজদারী মোকদ্দমার মূলসূত্রও ঠিক খাটে না। একটু নতুন ধরনেব জুরিস্ট হওয়াই বোধ হয় মন্দ নয়। ব্যাপারটা ঠিক ল' আর অর্ডারের পর্যায়ে পড়ে না।' বেবী একটা প্লেট থেকে কাঁটা দিয়ে খাবার তুলে রণির প্লেটে দিয়ে বল্লে, 'রণি, এটা খাঁটি দেশী খাবার— বাঙালী মিঠাই নয় বটে, তবে বিশুদ্ধ ইণ্ডিয়ান, রমার নিজের পেটেন্ট, পছন্দ হবে কি না জানি না, তবে ফ্যাট নেই।' রণি লাল হয়ে সবটাই খেলে। খগেনবাবু প্রশ্ন করলেন যে মজুরির নিম্নতম হার বেঁধে দিলে মালিকের, তাঁর কোম্পানির,

কোন ক্ষতি হবে কি না। এপাশ ওপাশ চেয়ে উত্তর দিলে, 'ওটা ঠিক হিসেব করে দেখি নি। মজুরদের বাড়িগুলো অসম্ভব নোংরা, যদি ভাল বাড়িতে থাকবার স্থবিধা তারা পায় তবে গোলমাল অনেকটা মিটে যায়।'

খগেন: 'ঐ মজুরিতে ছবেলা ছ'মুঠো অন্ন জোটে না ত' ভাল বাড়ির ভাড়া!'

রণি: 'অবশ্য ওদের খরচও কম। সকলের ধার আছে জানি, খাদ্যও অস্বাস্থ্যকর। তবে মজুররা যদি একটা কো-অপারেটিভ সমিতি খাড়া করে, মিউনিসিপ্যালিটি জমি দেয়, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট আগাম টাকা ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করে, তবে বাকি টাকা মালিক ও গবর্নমেণ্ট কেন দেবে না বুঝি না।'

খ: 'মালিকরা যদি সাহায্য করে তবে তারা কি প্রতিদান প্রত্যাশা করবে না? যেমন ধরুন মজতুর সভার সভ্য না হওয়া?'

র: 'তবে গবর্নমেণ্টই সব টাকা দিক। গবর্নমেণ্ট এখন ত' জনসাধারণের।'

খ: 'গবর্নমেণ্ট এই সেদিন এল, টাকাই বা কোথায়? আমি ত' তাই চাই, কিন্তু তার সম্ভাবনা দেখি না। মালিকরা রাজী হবে?'

র: 'তা ঠিক। প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা লোকসান হল প্রহিবিশনের জন্মে, একজনের খেয়ালের দাম দেওয়ায়। মালিকরা কি বাধা দেবে? জানি না!'

বেবী এসে বল্লে, 'রণি, তুমি কি আমাকে লিফট দেবে? আজ আবার রিটার ডিনার, গঙ্গার ধারে,একটু বোটিং হবে। তুমি আবার 'ব্লু' ছিলে, এখানে তোমাদের বোট মিলবে না সাবধান করে দিলাম। কি কথা হচ্ছিল?' রণি আমতা আমতা করে বিষয়টি উল্লেখ করাতে বেবী বল্লে, 'তা ঠিক, মজুরি অত্যন্ত কম। তবে সত্যের খাতিরে মানতেই হবে, লজ্জার কথা, কিন্তু না মেনে উপায় নেই, আমাদের দেশী মিল্‌গুলোতেই সব চেয়ে কম · আর তারা মজুরদের থাকবার বন্দোবস্ত যা করে তার কথা না তোলাই ভাল। অবশ্য আমি তাদের পুরো দোষ দিচ্ছি না। লাভ তারা করে, কেনই বা করবে না? লাভের অর্দ্ধেক যে কংগ্রেস ফণ্ডে যায়!' ইংরেজ যুবকের মুখে লাল রঙ চড়ল, মৃদু আপত্তি জানাতে বেবী হেসে বল্লে, 'রণি আরো কিছুদিন কানপুরে থাক, বুঝবে এখানকার আজব পলিটিক্‌স্‌ আর ইকনমিক্‌স্‌। কি বল বিজন?'

বিজন: 'অনেকটা সত্যি। আমাদের কংগ্রেস ক্যাপিট্যালিজমের মুখপাত্র, সব দিক থেকেই।'

বেবী: 'বিজন, তুমিই তা হলে রমাকে নিয়ে আসছ রিটার পার্টিতে। সে আমাকে ফোন করলে দু দু'বার। বিজন, এবার দেখব।'

বিজন: 'কি যে বল বেবী', বেবী ও রমলা খিলখিল করে হেসে উঠল।

'খগেনবাবু, দিদিকে নিয়ে যেতে পারি?'

খ: 'নিশ্চয়ই। আমাকে আবার জিজ্ঞাসা কেন?' অধ্যাপক বল্লেন, 'কিছু যদি না মনে কর বিজন, রমা দেবী, আপনি কি আমার চালনাতে বিশ্বাসী নন? অবশ্য এটা অক্সফোর্ড নয়, স্পীড লিমিট রয়েছে এদেশে। তবু কিছু থ্রিল্ দিতে পারব ভরসা রাখি। আমি ওঁদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেব। বিজন, তুমি ফিরিয়ে এন।' রমলা হেসে সম্মতি দেওয়াতে বেবী আর বিজন একটু অপ্রস্তুতে পড়ল। 'প্রোফেসার, আপনিও পার্টিতে চলুন না?' 'আমার আবার একটা জরুরী কাজ আছে— পেন্ ক্লাবের তাগিদ এসেছে···কিন্তু রমা দেবী, ড্রাইভার হিসেবে সুনাম আমার এককালে ছিল, বিজন, তুমিই না হয় রণিদের নিয়ে চল।' রমা পোশাক বদলে প্রফেসারের টু-সীটারে উঠল, বেবী রণির গাড়িতে, এবং বিজন নতুন গাড়িতে একলা চলল, একবার ক্লাব হয়ে যাবে। বেবী— 'দেরী কোরো না বি, রিটা চটবে, চটলে তাকে বড ভাল দেখায়, কিন্তু রাগ পড়লে, বি, রিটা আর বিউটি থাকে না।'

বিজন: 'ডোণ্ট বি সিলি।'

ওপরে যাবার সময় রমলার ঘর দিয়ে যেতে হয়। ড্রেসিং টেবিলের তিন দিকে আরশি, কাঠের ওপর কাচ, কাচের শিশি, পাউডারের বাক্স, রূপোর ব্রুশ, বিছানার ওপর হরেক রকমের ব্লাউস, শাড়ি, কোনে জুতোর সারি, নানা রঙের ফিতের বাহার, উঁচু খিলেন, নিচু, সমতল, স্যাণ্ডাল, নাগরা নেই, সাবিত্রীর কাছে নাগরা পরে আসত, এখানে বাইজীরা পরে, তাই বোধ হয় অচল। কাচের পেরেক দেওয়ালে, ড্রেসিং গাউন ঝুলছে, বলাকা উড়ছে নীল আকাশে। উগ্র গন্ধ ঘরটায় মাখান·· চড়াং করে মাথায় চড়ে চন্‌মনিয়ে দেয়, পাঁচুলী, কাঁচুলি, নাচওয়ালী···বেশ্যাবৃত্তির শকৃথেরাপী প্রক্রিয়া···বোশেখ মাসের রৌদ্রে চাঁপার খর গন্ধ উদ্‌গত হয়— কিন্তু গ্রীষ্মের গুল্‌মোহর, আমল্‌তাস মাত্র রঙের একজিবিশ্যানিজম, কামবিলসন, গন্ধ নেই, লীলা প্রকাশ, লীলাও নেই, উলঙ্গতা। অত সাজ-সরঞ্জাম সত্ত্বেও ঘরটা যেন বীভৎস রকমের নগ্ন মনে হয়। সিকার্ট-এর ছবি টাঙ্গান থাকলেই শোভন হত। মেয়েদের যথার্থ স্থান রঙ্গমঞ্চে, সেইখানেই তাদের দেখায় ভাল, গ্রীনরুমে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, স্বামীরও। আয়নার টেবিলে কার চিঠি খোলা পড়ে আছে। রমলা সেজেছে তাড়াতাড়ি।

খগেনবাবু ওপরে নিজের ঘরে গেলেন। বিজন নাম দিয়েছিল 'আপার ডেক্', রমলার ভাষায় 'ক্যাপ্টেন্‌স্ কেবিন'। ক্যানভাসের চেয়ারে বসলে চোখে পড়ে ধূসর আকাশ ভেদ করা কালো কালো মোটা আঙুল, তাদের ডগাগুলো একধারে বেঁকেছে, পাঁড় মাতালের বুড়ো হাত কানপুর শহরের ওপর,

পক্ষাঘাতেরও হতে পারে, কুষ্ঠ রোগীর? কেন এই ধরনের অদ্ভুত অস্বাভাবিক উপমা, প্রতিমা ভেসে ওঠে? তিক্ত রসের উদ্‌গার, কিন্তু কেনই বা রস তেতো হবে? এইত কানপুরেই সাধারণ জীবনযাত্রার একটি স্তর নিঃশেষিত হল এবং নতুন স্তরের আরম্ভ দেখা গেল। এখানেই ত সফীক, করিম, মহবুব প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়। অবশ্য 'সমঝোতা' হল বটে, কিন্তু প্রত্যেক প্রয়াসই সফল হবে কেন? এই আশার অন্তরে একটা দাম্ভিকতা আছে, সেটাই বা থাকবে কেন? হিমালয় একবার বিনয় শিখিয়েছিল তার বিরাটত্ব দিয়ে, কিন্তু মানবেতিহাসের প্রগতি নম্রতা শেখায় তার বন্ধুত্ব, তার সমবায়, তার কর্মের সাহায্যে। এখানে মতবাদের ঔদ্ধত্য থাকতে পারে না, এখানে পূর্ণতার কামনা নেই, আছে ও থাকবে কেবল আবর্তন-প্রবণতার স্বীকার এবং সেই স্বীকৃতিতে আত্মনিমজ্জন। এটা মেয়েলি নম্রতা নয়, বরপক্ষের সামনে কিশোরীর চোখ তুলে চাইবার অক্ষমতা নয়, এ বিনয় পুরুষালি···অর্থাৎ ব্যক্তির অতিরিক্ত মহানকে পরিণতিরই সম্ভাবনা হিসেবে সহজে গ্রহণ করা। মেয়েরা গ্রহণ করে, যতটুকু প্রয়োজন, যতটুকু খাপ খায়। সংখ্যার দিক থেকে সেটা বেশি, তাই তার বোঝা ভারী, মেয়ে-ভক্ত পুরুষেরা ভারের গুরুত্ব দেখে দরদ জানায়। তার বদলে একটা বড় সত্যকে মেয়েরা যদি আপন বলে স্বীকার করে নিত তবে তাদের সঙ্গে এক কদমে চলা যেত। নন্দলাল বসুর ছবিতে পুরুষ এগুচ্ছে, মেয়ে এক পা পিছিয়ে···এতদিনে সাঁওতাল মেয়েটি রান্নাঘরের দাওয়ায় হাঁড়ি চাপিয়েছে, আর পুরুষ কয়লার খনিতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সরাবখানায় হাঁড়িয়া আর তাড়ি খাচ্ছে। ঘুরে ফিরে আবার সেই তিক্ততা আসে।

প্রফেসার মদরলঁ-র 'লেপার্স' দিয়ে গেছে তাকে, এবং রমলার জন্য জুল্ রোমঁ্যা-র 'র‍্যাপচারস্ অব দি ফ্লেশ'। চমৎকার শ্রমবিভাগ! লোকটি একটু ভোঁতা। অধ্যাপকের মতে মদারলঁ-ই ফরাসী অধঃপতনের প্রতীক, রচনাভঙ্গি না কি অপূর্ব! নায়ক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তৎপর, প্রেম থেকে অব্যাহতি চায়, অথচ কাম বজায় রেখে। কিন্তু অতটা স্ত্রীবিদ্বেষ রোগের চিহ্ন। স্ত্রীবিদ্বেষ বিদ্বেষের অঙ্গ, বিদ্বেষের পিছনে থাকে চাহিদা, প্রত্যাশা, সেটা যত অস্পষ্ট, ততই হতাশা, বিদ্বেষ ততটাই ব্যাপক, কিন্তু ব্যাপক ও ভাসমান অবস্থা অস্বস্তির, তাই একটা বিষয় চাই যার চারধারে বিদ্বেষ গ্রথিত হতে পারে, ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত বিষয় স্ত্রী, তাই স্ত্রী-বিদ্বেষ, সেই থেকে স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্বেষ। সাধারণ— বিশেষ-অবিশেষ— এই হল মানসিক বিবর্তন। স্ত্রীর বদলে য়িহুদি জাতি, হিন্দুর পক্ষে মুসলমান, মুসলমানের পক্ষে হিন্দু হলেও বেশ চলত, চলছেও! মেয়েমানুষ

হাতের কাছে, তাই বিদ্বেষের প্রকাশ সাহিত্যিক। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে ফরাসীরা দক্ষ। কিন্তু কোথাও যেন ফাঁক থেকে যায়। লোকে বলে ওরা মেয়েমানুষকে জীব ভাবে, এবং বিবাহকে সামাজিক অনুষ্ঠান গণ্য করে। তাতে আপত্তি নেই, জার্মান ও ইংরেজ ভাবপ্রবণতার চেয়ে ভাল। ব্যাপারটা অন্য রকমের। মেয়েরা এক স্তরের জীব নয়, এক শ্রেণীর হলেও ওদের ক্রমবিকাশের হার ও ধারাই ভিন্ন, তার ওপর শ্রেণীগত মনোভাব ত' রয়েইছে। প্রত্যেক মেয়েই বুর্জোয়া, কেউ উঁচু থাকের, কেউ নিচু থাকের। পুরুষ হয় জন্মাবধি, না হয় বুদ্ধির জোরে খানিকটা জনসাধারণের অন্তর্গত, কিন্তু মেয়েদের চরিত্রে একটা 'ক্যাপিলারিটি' থাকেই থাকে। রমলা ঘর ভেঙে চলে এল, তবু শ্রেণীর দেওয়াল তার অটুট রইল। মদরলাঁ এ খবরই জানে না। মাকাল-ফল বইটা, অধ্যাপকেরই উপযুক্ত খাদ্য।

কেন অতবার অধ্যাপকের কথা ঘুরে ফিরে আসে! দোষ কি কেবল তারই? হিংসা? ছিঃ, তার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল! অধিকারই বা কোথায়? যে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে সে নিজের সকল কর্মের ওপর স্বাধিকার অর্জন ও বিস্তার করেছে। সুজন রমলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সন্দেহ·· মনে হয়। তার সঙ্গে অবশ্য অধ্যাপকের তুলনাই হয় না। সুজন যদি আসে, অধ্যাপকের ব্যবহার লক্ষ করে আনন্দ পাওয়া যাবে। দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রমলা খুলবে ভাল। কিন্তু রমলাকে খেলার সামগ্রী ভাবতে লজ্জা হয়। সে যত পারে খেলাক, কিন্তু লোকে তাকে খেলনা ভাববে কেন? রমলার সাজ, রূপ, মাধুর্য, কথা বলবার ভঙ্গি দেখে এরা মোহিত হয়েছে, রমলা তা জানে, তাইতে সে খুশী। কিন্তু মোহিত হবার অর্থ কি? অর্থ এই যে রমলা একটা মাংসপিণ্ড, হাড় ও মাসের এক ধরনের ছক, সে ছকের নতুনত্ব আছে, চঞ্চল করবার শক্তি আছে, চমক লাগাবার জাদু আছে। তবু যে অংশটা তারা নির্বাচন করে নিলে সেটা তার জৈবাংশ। এটা তার অপমান। রমলা ভাবে খাজনা, রানীর প্রাপ্য। বোকা মেযে!

রমলাকে অপমানিত হতে দেওয়া অন্যায়। সুজনের এসে কাজ নেই, অধ্যাপকেরও এসে কাজ নেই, বিজনেরও তাকে পার্টিতে পার্টিতে ঘুরিযে নিযে বেড়াবার প্রযোজন নেই। রমলার কষ্ট হবে, সে একলা থাকতে পারে না, তবু অপমানিত হওয়ার চেয়ে ঢের ভাল। সুজনকে আসতে মানা করাই মঙ্গল। খগেনবাবু একটা টেলিগ্রাম ফর্মের ওপর সুজনকে লিখলেন, 'প্ল্যান অনিশ্চিত, কবে আসবে পরে জানাব।' বয়কে ডেকে তার অফিসে পাঠালেন, বয়ের কাছেই টাকা আছে। রমলা অপমানিত হবে দুজনের টানাটানির মধ্যে।

নতুন পরিবেশে সে থাকতে পারবে না, এখানে সব নতুন, রমলার জীবনধারা পর্যন্ত নতুন মুখ নিলে! তাকে আসতে বারন করাই মঙ্গল।

মঙ্গল, মঙ্গল, মঙ্গল···কে কার মঙ্গল করে! মঙ্গল-কামনা মনের জুয়াচুরি। এটা মঙ্গলেচ্ছা নয়, হিংসা, রাগ, দ্বেষ···এত বিজ্ঞানচর্চা, এত মার্কস পড়া, এত বিশ্লেষণের পরও স্বার্থের জন্যে মনটা সেই ধর্মের ফন্দি খাটাবে? নিজের প্রতি ঘৃণা আসে।

যখন বিজন আর রমলা ফিরল তখন বেশ রাত হয়েছে।

বিজন: 'খগেনবাবু নিশ্চই খাননি! একটু দেরী হয়ে গেল। বেয়ারাকে বল্লেই পারতেন। আমরা খাব না, রমাদি বুঝি বলে যায় নি? এসে পর্যন্ত রমাদি কোথাও বড় একটা খায়নি তাই। গাড়িটা চমৎকার চলেছে। বমাদি কী ভীষণ পপুলার হয়েছে কী বলব!' রমা ভেতরে গিয়ে একা সাহেবের জন্য ডিনার দেবার হুকুম দিলে। রমার মুখে রঙ এসেছে···মাখা রঙ নয়, স্বাভাবিক ··নতুন রূপ পেয়েছে···কোথায় সঞ্চিত থাকে কে জানে, হাওয়া একটু এদিক থেকে ওদিকে ঘুরল, অমনি ফুটল লালিমা, খুলল লাবণ্য। তাতে প্রত্যেকের অধিকার আছে। কেন রমলার রূপ উথলে উঠবে না, নতুন বৌএর সামনে বরের বাড়ির দুধের মতন। বেচারি···মা হতে পেল না···মাতৃত্বের সংক্রান্তি এল না, তাই কী প্রত্যক্ষ অনুভূতির অনুধাবন, ইন্দ্রিয়ের মৃগয়া! চার ধারে বরফ পড়ছে, শিকার গর্তের মধ্যে আত্মগোপন করেছে, তিন মাস ঘুমুবে মড়ার মতন, দিনের অস্তিত্ব লুপ্ত, বর্বর মানুষ তখন কি করে? শিকারের উত্তেজনা চাই, শুরু হল ম্যাজিক, দশকর্ম, নাটক অভিনয়। কিন্তু ব্যাপারটা 'এরসাৎজ্', নকলি চীজ, আসলিটা শিকার। রমলা মন থেকে তাকে সরিয়েছে, সুজনকে দিয়ে ভরাবে, না অধ্যাপকের সাহায্য নেবে? এ-ব্যাপারে মেয়েদের আলস্য নেই। হঠাৎ মনে হয় নিজেও ঐ কাজ করে আসছেন, তবে মানুষ দিয়ে পূরণের চেয়ে মতামত দিয়ে শূন্যতার ভরাট করেছেন, আদর্শবাদ থেকে মার্কসিজম পর্যন্ত। রমলা মধ্যে এসেছিল ইণ্টার-মেৎসোর মতন— দুটো রাগের মধ্যে জনসাধারণের তৃপ্তির জন্য চটকদার গৎ-এর মতন। তাই কি! অতটুকু রমলার ন্যায্যতা! অপরাধী মনে হয় নিজেকে। অপরাধবোধের বশে অধ্যাপক ও সুজনের প্রতি মনোভাবকে হিংসার রূপান্তর বলে মনে হয়। গ্রীগ্, গ্রীগ্, ভিক্টোরিয়ান যুগের ভণ্ড ভারতবর্ষের পটভূমিতে প্রক্ষিপ্ত। ভেঙ্গে যাক চুরে যাক এই শক্ত মাথাটা সফীকের নির্মম আঘাতে।

খাবার এল। টেবিলের পাশে বসে বিজন বল্লে, 'দেখলে রমাদি ওদের কাণ্ড'! একটা ইংরেজ পেলে আর রক্ষা নেই! এইতেই ওরা মাটি হয়।

ছোকরা ছিল ভাল, কিন্তু ওরা থাকতে দেবে না। যেন অভিমন্যুর মতন ঘিরে রয়েছে! বেবীর চোখ যেন গিলে খাচ্ছে! দাস মনোভাব আমাদের হাড়ে হাড়ে, রক্ত-মাংসে। রণিকে আপনার কেমন লাগল?'

খগেন: 'বেশ কন্‌ক্রীট্, ব্যবহারিক দিকটাই নজরে পড়ে প্রথমে।'

বিজন: 'ঠিক ধরেছেন, খাঁটি ইংরেজ, চিন্তার দিকটা একটু ভোঁতা। ইডিয়লজি নেই।'

খগেন: 'বাঁচা গেল!' বয় প্লেট বদলে দিলে! 'সে হিসেবে প্রোফেসার বেশ ধারাল।'

বিজন: 'যাই বল রমাদি, রিটা ওঁকে নিমন্ত্রণ করতে পারত! কানপুরে অত এক্‌স্‌ক্লুসিভ্ হলে চলে না, এখানে অতটা শ্রেণীবোধ অচল।'

খগেন: 'প্রোফেসার ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের নন বুঝি?'

বিজন: 'এখানে একটা প্রাইভেট কলেজের সিনিয়র···বাপের পয়সা আছে, অনেক ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের অধ্যাপকের চেয়ে আধুনিক। একবার কথাবার্তা ভাল করে চালিয়ে দেখবেন। আইডিয়া খুব পরিষ্কার। উনি অনেকদিন থেকে বলছেন ধর্মঘটটা ফেঁসে যাবে, কারণ এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিরোধটা ডেমক্রাটিক স্তরের, এবং নেতৃত্বটা মধ্যবিত্তেরই হাতে থাকতে বাধ্য।'

খগেন: 'তাই বুঝি! আমি যেন, অন্য রকমের মতামত পোষণ করেন ভাবছিলাম।'

বিজন: 'ওঁকে একটু ভুল বোঝা স্বাভাবিক। অত আইডিয়ার ব্যবসা করলে ও-টুকু দাম দিতে হয়।'

খগেন: 'আইডিয়া, আইডিয়ার হাত থেকে ভগবান রক্ষা করুন!'

বিজন: 'আইডিয়ার প্রতি কবে থেকে বিমুখ হলেন! খগেনবাবুর বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে, রমাদি লক্ষ করেছ? তোমার কি হল আবার? এই ত এতক্ষণ খই ফুটছিল!'

খগেন: 'বিজন, তোমার রমাদি একটু খেয়ালি, কুহেলি, অর্থাৎ একটু মেয়েলি, একপ্রকারের adverb, ক্রিয়া-বিশেষণ!'

বিজন: 'এতদিন পরে আবিষ্কার করেছেন! ছেলে বয়সে ওঁর খামখেয়ালে সুজনদা আর আমি ব্যতিব্যস্ত হতাম।' রমলা হেসে ফেল্লে। খগেনবাবু একটা কমলালেবু নিলেন।

খগেন: 'বেশি বদলেছি, বিজন?'

বিজন: 'তা একটু, বেশ একটু কঠিন হয়েছেন। সুজনদা যদি এসে পড়ে খুব ভাল হয়···আমার অন্তত, তার একটা ব্যালান্‌স্ আছে যেটা আর কারুর

মধ্যে পাই না। একটা হিউম্যানিটি, যেটা এদের মধ্যে কারুর নেই, নেই আমি জানি, আপনি কতটুকু জানেন খগেনবাবু! এরা নিজেদের কল বানিয়েছে মজুরদের হয়ে লড়তে গিয়ে·· যেটা শত্রু তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তাই হয়ে গেল···মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের উপকার করবে। তা কখনও সম্ভব! আপনি কি ভাবে বিচার করেন জানি না।'

খগেন: 'বিচার, বিশ্লেষণ ভাল লাগে না আর। কিন্তু, বিজন, বদলেছ তুমি, কিংবা, হয়ত, যা ছিলে তাইতে ফিরেছ, পিছুলে গিয়ে।' বিজন অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বল্লে, 'আপনি জানেন না মোটেই—আমি এখন যাচ্ছি···পরে সব কিছু দেখবেন অন্যায় কার ও কোথায়?' বিজন চলে গেল।

যাবার পর খগেনবাবু অনেকক্ষণ টেবিলের ধারে বসে রইলেন। রমলা উঠতে যাচ্ছে এমন সময় খগেনবাবু বল্লেন, 'ক্লান্ত হয়েছ, রমা?' হঠাৎ কণ্ঠস্বরে কোমলতা জড়িয়ে যায়···কতদিন রমা-সম্বোধনে মাধুর্য আসেনি, লোকের সামনে রমলা বলতেও লজ্জা হত, নামের পরিহারটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল, বিজনের সামনে 'তোমার দিদি', এমন বন্ধু নেই যার কাছে 'রমলা' উচ্চারণ করা যায়, 'রমা' আরো ছোটো, স্বল্প-পরিসরে চিন্তার পদ্ধতি হাঁপিয়ে ওঠে, ভাবেরই সুবিধা ঘটে, তাই ঘনত্ব কবিতার গুণ, রমা'র শেষে স্বরবর্ণ দীর্ঘ হয়ে ভাবপ্রকাশের অবসর দেয়, র-মল্-আ, হসন্তে আটকে যায়, দুটি কথার রমা—তান দেওয়া যায় আ-এর ওপর। 'রমা' যেন 'তুমি' মাখান···যেদিন প্রথম 'তুমি' বল্লে সেদিন সর্বাঙ্গে কাঁপন লেগেছিল, সিঁড়ির ওপর থেকে, তার পরই সরে গেল···।

রমলা: 'না, কেন?'

খগেন: 'না, অমনই। বিশেষ কোনো কথা নেই। তোমাকে দেখাচ্ছিল ভাল।' রমলা নিজের ঘরে চলে গেল। সত্যি কোনো কথা ছিল না, কিংবা অনেক কথাই ছিল যার জন্ম হল না, বহু দিনের সঞ্চিত কামনার তীব্রতা সত্ত্বেও অনাগতের আশঙ্কায় নিষ্ফল হল, কামনা অন্য মুখ নিলে, কথা ঘুরে গেল, জানাবারই বা কী প্রয়োজন? সবই নিরর্থক, মন অবসন্ন হয়, প্রকাশের শক্তি পর্যন্ত থাকে না, ব্যগ্রতার অবসানে আন্তরিক পার্থক্যবোধ দানার মতন মনের তলায় থিতোয়। এটা ঘৃণা নয়, ক্লান্তি, যাতে সহানুভূতি ও অভিমানের আমেজ রয়েছে। রমলার প্রতি অন্যায় বিচার যেন না হয়, তার দিক একটা আছেই আছে, সে সমাজ ছেড়ে তাকে গ্রহণ করেছে— এটা মস্ত ত্যাগ। সেটা অস্বীকার করা মহাপাপ। কিন্তু পাপ পুণ্যই বা কেন? স্বীকার-অস্বীকার দেনা-পাওনার ব্যাপার, হিসেব-নিকেষ ধর্মজ্ঞানের বৈশ্যবৃত্তি। রমলা মানুষ···

অতএব তার অস্তিত্বটাই মুখ্য, মেয়েমানুষ হলেও মানুষ।

অনেক রাতে রমলা খগেনবাবুর বিছানায় আসতে খগেনবাবু ব্যস্ত হয়ে জায়গা ছেড়ে দিলেন। 'রাগ হল?' 'রাগ কেন হবে?' 'তুমি যদি বল, আমি কোনো পার্টিতে যাব না, কোনো সমিতিতে যোগ দেব না, কারুর সঙ্গে মিশব না।' নিশ্চল হয়ে খগেনবাবু উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই যাবে, সকলের সঙ্গে মিশবে, আমি ভুল বুঝব না। জীবনে যা যা করেছি তাই সব ঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু, কি জান, স্থূল, মোটা-মোটা সম্ভাবনাগুলো খুঁটিনাটি ছোট্ট-খাট্ট টুকরো, কাটাকাটা ঘটনার চেয়ে বেশি মূল্যবান, বেশি দরকারি মনে হয় আজকাল। তাদের প্রতিকূল আচরণে শান্তি নেই, সেটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়, নির্জলা বোকামি···। এইটুকু বদলেছি, মাত্র।' হঠাৎ রমলা খগেনবাবুর কানের কাছে মুখ এনে বল্লে, 'তুমি আমাকে ভাল দেখাচ্ছিল·· ছিল বলবে কেন? খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে এলাম যে! তোমারও কি ভাল লাগে না? আমি বুঝি বোকা, সাজলে-গুজলে আড় চোখে আবার দেখা হয়·· ' 'নিশ্চয়ই তোমার অধিকার আছে।' 'অধিকার অধিকারের কথা তোলো ত' দেখো কী করি!' 'অধিকার নয়? তবে কর্তব্য! কর্তব্য মানে···দুজনের সম্বন্ধটাকে দুজনেই ওপর তলায় নিয়ে যেতে চাইছে, চেষ্টা করছে— জীবনটাই যদি অচল হয়, তবে কর্তব্য থাকে না, থাকে চাপ আর ভার সেটাও স্বাভাবিক, প্রত্যেকে প্রসারিত হবেই, বদ্ধপ্রাকার কিছু তোমার আমার সুবিধায় আপনা থেকে প্রশস্ত হবে না।' 'তুমি কী চাও?' 'তাই জানি না, অন্তত তোমার কাছে, তবে আপাতত ভার একটু লঘু হোক। গরম পড়ে গেছে।' খগেনবাবু গলা থেকে রমলার হাত নামিয়ে দিলেন, পাথরের মতন ভারী। রমলা আবার হাত রেখে বল্লে, 'ঢের হয়েছে মশাইএর, অনেকক্ষণ রাগ দেখান হয়েছে, এইবার···না, আমি শুনছি না···নিজে ভেবে ভেবে বুড়ো হলে, আমাকেও বুড়ি হতে হবে সেই সঙ্গে?' 'তুমি কখনই হবে না।' 'উর্বশী বল!' 'তাই বটে।' 'আমাকে অপমান না করলে বুঝি হজম হয় না? বেশ, কাল থেকে আমি কারুর সঙ্গে মিশব না, মুখ হাঁড়ি করে কালপেঁচি সেজে ঘরের কোনে বসে থাকব, তোমার ভাল লাগবে? তবে জর্জেট পরতে বল কেন? আহা, আমি যেন বুঝি না·· কাল চল, একটা ভাল স্যুট পরে বেরোও, দেখো, বেশ ভাল লাগবে, অন্যেরও লাগবে গো লাগবে···ঐ যে বেবী মেয়েটিকে দেখলে·· তবে ওর এখন রণির যুগ চলছে, রিটার সঙ্গে বয়সের খাপ খাবে না, তা ছাড়া ও এখন বিজনের জন্যে পাগল, কেমন চালাকি করে বিজনের নৌকোয় গেল···দুঃখ হয়, লুইসি রাইনারের টয়-ওয়াইফ, কিংবা গুড আর্থ দেখেছ? যেন কাঁদতেই

জন্মেছে, এ-যুগেও অমন হয়!' 'প্রোফেসার ছিল?' 'ওমা, তাই বল, আমি ভাবছি কে রে! হা ভগবান! ও যদি কেউএর মতন ঘোরে আমি কোথায় যাব! তবে···আমি কিছুতে রাজী হইনি, বেবীর কাণ্ড, আমি আর হোস্‌টেস্‌-গিরি করতে পারি না···ওমা, তাই বল? ধরা পড়েছে কেবল মেয়েরা. নয়?' রমলা খিলখিল করে হেসে খগেনবাবুকে টেনে নিলে। কাঠের মতন পড়ে রইলেন উত্তেজনা নিবৃত্তির যন্ত্র হয়ে·· পার্টি থেকে ফিরে কেন অমন হয়! নিজের ওপর ঘৃণা ধরে নিষ্ক্রিয় অংশের অভিনয়ে, রমলা বুঝতে পারে, তার লজ্জা হয়, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে যায়। যাবার সময় বলে, 'শুনেছিলাম, সফীকের নামে ওয়ার‍্যাণ্ট বেরুচ্ছে!' 'কেন? সমঝোতা ত' হয়ে গেল!' 'মানুষ খুনের চার্জ।' 'মানুষ খুন!' 'শিশু হত্যা।'

পরের দিন সকালে বিজন এল না। বিকেলে বিজন গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে ভেতরে এল। 'কি রমাদি? এখনও তৈরি হও নি?' রমলা গা করল না। খগেনবাবু বিজনকে সফীকের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। 'সফীক? তার শরীর খারাপ, বেশি। তার এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল। এখানে আপাতত আর কী কাজ। ওধারে এলাহাবাদের ছাপাখানায় ধর্মঘট হয়েছে শুনছিলাম। কৈ, রমাদি, শীগ্‌গির তৈরি হও।' রমলা তবু উঠল না দেখে খগেনবাবু বিরক্তির স্বরে বল্লেন, 'যাবার কথা দিয়েছ যেতেই হবে·· যদি তোমাকে '

রমলা: 'আমাকে তুমি কিছুই বলনি, তুমি একটু থাম প্লীজ—'

বিজন: 'কেন, যাবে না কেন? আপনার অমত নাকি! কাজটা খুব ভাল· ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যাপার·· এতে দোষ হয়ত আমারই···এই কাল সব ঠিক, আর আজ কলকাটি বিগড়ে গেল! অত কথায় কথায় অভিমান করলে সমিতি চলে না! এই জন্যেই ত' বনে না তোমাদের সঙ্গে আমার।'

খগেন: 'বাস্তবিক রমলা, এখন বিজনের মান থাকে কোথায়?'

বিজন: 'আমাকে যদি বিপদে ফেলতে চাও তার অনেক সময় আছে। এখন লক্ষ্মীটি চল, সব পণ্ড হবে। বেবীর কর্ম নয়, রিটা?···তার ধাতেই নেই গড়ে তোলা কোনো কিছু। তুমি শিখিয়েছ··তুমি না গেলে একটা কেলেঙ্কারি হবে!'

খগেন: 'আমি একটু বেরুব, কাজ আছে আমার!' বলা হল না সুজনকে আসতে মানা করার কথাটা·· পরে সুযোগ হলে দেখা যাবে। রমলা সাজতে গেল ভেতরে।

ব্যাপারটা এই—ক্লাবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রমলার ওপর একটা গুরুতর

কাজের ভার আসে। অনেকদিন থেকে ক্লাবের কাগজে কলমে একটা 'ওয়েলফেয়ার সেক্‌শন' ছিল, সেটা ঠিক চলছিল না একজন উপযুক্ত কর্মিষ্ঠ কর্মসচিবের অভাবে। সকলের অনুরোধে রমলা ঐ দিকটা একটু নজর দিতে স্বীকৃত হল। প্রথমে সে রাজী হয় নি, শহরে নতুন এসেছে বলে, কিন্তু সে আপত্তি টিকল না। কানপুর শহরে শিশুদের কোনো অনুষ্ঠান নেই, অধ্যাপক বল্লেন, অথচ প্রত্যেক শিশুরই আর্টের প্রতি একটা সহজ আগ্রহ আছে, কেউ পারে ছবি আঁকতে. বিলেতে প্রায়ই শিশু-আর্ট প্রদর্শনী হয়, সে ছবি দেখলে মনে পড়ে একধারে বুশম্যানদের চিত্র, অন্যধারে অতি আধুনিক, এমন কি পিকাসোর ইদানীং আঁকা ছবি, কেউ পারে নাচতে···কত মেয়ে যে পীটার প্যান সাজছে তার ইয়ত্তা নেই, আর গান গাইবার শক্তি প্রত্যেক ইটালিয়ান মেয়েরই আছে; এ-দেশের শিশুদের মধ্যে কেন থাকবে না? সুযোগের অভাবে তাদের প্রতিভার স্ফুরণ হয় না, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে বরঞ্চ সেটা নষ্টই হয়, আজকালকার গ্রাজুয়েটরা কানা ও কালা; এতে ভারতবর্ষের যে কত ক্ষতি হচ্ছে তার ইয়ত্তা—তাই শিশুদের একটা ক্লাবের প্রয়োজন; ইতিমধ্যে ঐ ওয়েল-ফেয়ার বিভাগ মেম্বরদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে কাজ শুরু করুক, সেখানে মধ্যে মধ্যে একাঙ্ক নাটিকার অভিনয় হবে, ছেলেরাই অর্কেষ্ট্রা তৈরি করবে, ছবির প্রদর্শনী খুলবে বছরে বছরে। বিজন অধ্যাপকের উদ্দেশ্য সাধু স্বীকার করল, তবে ঐ সব প্রচেষ্টার একটা সামাজিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, নচেৎ বুর্জোয়া আমোদ প্রমোদে তার উৎসাহ নেই। অধ্যাপক তার দিকে চোখ টিপে চুপি-চুপি বল্লেন, 'সামাজিক উদ্দেশ্য কি বলছ! আমি চাই এদের শ্রেণীজ্ঞান ঘোচাতে, ডি-ক্লাস করতে।' ঠিক হল, চ্যারিটি-শো হবে, এবং তার জন্য এখন থেকে রমলা দেবী ভার গ্রহণ করুন। অধ্যাপকের পীড়াপীড়িতে এবং প্রাণপণ সাহায্য প্রতিজ্ঞায় রমলার আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। এখন রমলা ভার নিতে না নিতেই খবর এল যে দিল্লীর এক বড় সাহেব কানপুর আসছেন শীগ্‌গির, একদিন মাত্র থাকবেন, তাঁর সামনে প্রথম অভিনয় হলে টাকা উঠবে বেশি। অধ্যাপক রমলাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, 'আমরা এমন চীজ্‌ দেখাব যা কানপুরে কখনও হয়-নি, স্টেজ হবে বাইরের প্রকৃতি, আপনি কেবল সামনে থাকবেন···আপনার উপস্থিতিই আমার প্রেরণা, বাকিটা আমার প্রতিভা।' সেই মত রমলা কথা দিয়েছিল রিহার্স্যালে যাবার, এখন না গেলে সব ভেস্তে যাবে।

বয় কার্ড আনার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক ঘরে এলেন।' 'ভাবলাম দেরি হচ্ছে যেকালে নিশ্চয় কোনো গোলমাল হয়েছে।' রমলা এসে বিজনের সঙ্গে নিজের গাড়িতে উঠল। অধ্যাপক টু-সীটারে পিছুপিছু চল্লেন।

এগার

একলা বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগে না। অথচ সেদিন পর্যন্ত নিরালায় সাধনাই কাম্য ছিল। পাহাড়ে নিঃসঙ্গ ভ্রমণ, বই-এর বনে বহু পুরাতন চীনে কবি, বহুদূরের মেকসিকান চিত্রকর, অতি আধুনিক আমেরিকান সাহিত্যিকের সঙ্গে প্রদান-বর্জিত সম্বন্ধ, শয্যায় সাবিত্রী ও রমলা, তবুও সেই দুরতিক্রম্য ব্যবধান দূর হল না। এ যেন একটি স্বরূপসিদ্ধির ক্রমিক পর্যায়। বিপরীত বোধের জন্ম হল, দেহ-চর্চায় এবং শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্যে সেটা বৃদ্ধি পেল। আজ রমলা স'রে গেছে, আন্দোলনের প্রাণ নেই, ধাক্কা খেয়ে যে-কে-সেই। মাসীমা শুইয়ে দিতেন চাপা দিয়ে, গা চাপড়াতেন ঘুম আনাবার জন্যে, চোখের পাতাই বুজত, পাতার সরু ফাঁক দিয়ে মনে হত মাসীমার মুখ পিছু হটে দেওয়ালে, তারও পিছনে, বহু দূরে চলে গেছে। মজা লাগত, আর একটু পাতা খুলে চাইলেই মাসীমার মুখ ঠিক সামনে এসে যেত। দূরে ছুঁড়ে ফেলা আর কাছে টেনে নিয়ে আসা একপ্রকারের ছেলে-খেলা। এটা কিন্তু খেলা নয়। মাসীমা ঠিক বুঝেছিলেন রমলার সঙ্গে চলবে না···তাঁর মৃত্যুতেও বিরোধের অবসান হল কৈ? মাসীমা বুদ্ধি দিয়ে অবশ্য ধরেন নি, যুক্তিতর্ক তিনি পারতেন না, তবু প্রাথমিক ব্যাপারগুলো তাঁর চোখের সামনে জলজল করত। কারণ জানতেন না তিনি, তবু সিদ্ধান্তে ভুলচুক ঘটত না। কারণ, কারণ, কেন এত কারণের পিছু পিছু ছোটা। রমলা পৃথক হয়েছে এই যথেষ্ট। মাসীমা ঘটনাকে গ্রাহ্য করতেন। আজ বড় বেশি মাসীমার কথা মনে উঠেছে। মায়ের আদুরে ছেলে, সে আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, তাও এই দেশের, তার ওপর শিক্ষিত, সঙ্গে ধর্মজ্ঞান, মিলেমিশে প্রীগ্, এই প্রীগ্ মনকে চোখ ঠারতে ওস্তাদ, হাজার যুক্তি, লক্ষ জচ্চুরি দিয়ে। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় আত্মবলি, কালো পাথরের ওপর রক্তপাত, নির্মম কুঠারাঘাতে, পাথরের কুড়ুলে।

খগেনবাবু ঘুরতে ঘুরতে আস্তানায় এলেন। সফীক শুয়ে আছে। এ-কথা সে-কথার পর খগেনবাবু বল্লেন এখন কী উপায়ে এবং কোন দিকে তিনি তাদের সাহায্য করতে পারেন।

সফীক: 'নানা উপায়ে। সাহায্যের প্রয়োজন সর্বদাই রয়েছে। টাকা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে,···কিন্তু বাইরে থেকে, ভেতরে এসে নয়।'

খগেন: 'কেন নয়? শিক্ষানবীশ করতে রাজী আছি।

সফীক: 'সেটা কি সম্ভব হবে?'

খগেন: 'আদিম অভিশাপ?'

সফীক: 'তা ছাড়াও'

খগেন: 'কি সেটা?' প্রশ্ন করেই উত্তর শুনতে ভয় হয়।

সফীক: 'শোনবার প্রয়োজন আছে?'

খগেন: 'বলুন না। বোধ হয়, বুঝেছি।'

সফীক: 'আমার মুখ থেকে শুনে লাভ আছে কি?'

খগেন: 'এই ধরনের জীবন ত্যাগ করতে পারব না, এই বলছেন?' হঠাৎ রমলার প্রতি মায়ায় মন ভরে যায়, একদিন সেই ত সুনাম কাটিয়ে চলে এসেছিল, আজ নয় তার পার্টি আর প্রোফেসর জুটেছে, কিন্তু একদিন এসেছিল সে নিজে, এতে ত ভুল নেই, এবং সেও হতাশ হয়েছে তাও নিঃসন্দেহ, সর্বত্র সে হতাশ হয়েছে, মা হওয়া থেকেও বঞ্চিত হল, দোষ কি তার? খুঁজে বেড়িয়েছে পরিপূর্ণতাকে, অন্য মানুষেরই মতন, পার্থক্য এই যে সে মানুষের সম্বন্ধ চেয়েছে মতামতের আশ্রয় ভিক্ষা করেনি। সুজনকে পেলে হয়ত সর্বাঙ্গীন হত— ঐ সুতোটা খোলাই রইল, এ রকম অনেক থাকে, পুরুষে তোয়াক্কা করে না, মেয়েদের সহ্য করতে হয়। রমলা পার্টি আর প্রোফেসর দিয়ে মনের ফাঁক ভরায়। ফাঁক ভরান ফাঁকি দেওয়ার চেয়ে ভাল। সফীক রমলার কথা জানে না, বোঝে না। অপরিচিতের সঙ্গে অন্তরঙ্গের আলোচনা অশোভন লাগে। কিন্তু সফীকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, ভাবালুতা তার সামনে টিঁকতে পারে না।

সফীক: 'অনেকটা তাই। আচ্ছা বিজন আপনাকে কী বলেছে?'

খগেন: 'কি বিষয়ে?'

সফীক: 'একটা মড়া ছেলের · সেটা পুলিশের হাতে গেল কেমন করে?'

খগেন: 'ব্যাপারটা কি?'

সফীক: 'ব্যাপার যাই হোক, বিজনই পুলিশে খবর দিয়েছে।'

খগেন: 'শুনলাম হুলিয়া বেরিয়েছে?'

সফীক: 'গুজোব তাই।'

খগেন: 'তবে?'

সফীক: 'আমি সস্তার বাহাদুরি কেনার পক্ষপাতী নয়। সে যাই হোক, পথ বেছে নিতে পারেই বা ক'জন? পার্টির প্রয়োজন স্বীকার করেন এখন?'

খগেন: 'এখন করি।'

সফীক: 'কি হিসেবে? যেমন করে লোকে গুরু রাখে, ধর্মের গর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে?'

খগেন : 'সহকর্মীও ত' চাই !'

সফীক : দোষ দিচ্ছিনা কাউকে। অনেকেই ভাবে যে তারা বুদ্ধি খাটিয়ে পথ খুঁজে নিয়েছে, এক আধ কদম না এগুতেই খুঁৎ খুঁৎ শুরু হল, দম্ভের ভরে আরো দু'দশ কদম, তারপর হা-হুতাশ, ভেঙ্গে পড়া, সরাইখানায় বিশ্রাম। যখন বোঝা গেল যে এ-পথ তাদের নয়, তখন পথের নিন্দে ছাড়া উপায় কি ! অথচ অভিমানটা থেকেই যায়, তারই বশে পুলিশে লুকিয়ে খবর দেওয়া পর্যন্ত সব কিছুই সম্ভব হয়। এটাও এক রকমের ডায়েলেক্‌টিক···কি বলেন ?'

খগেন : 'না, ওটা সংকল্পের দুর্বলতা, দ্বন্দ্ব নয়, দোলা।'

সফীক : 'তাই। এবার ভাবছি আপনার কাছে একটু পড়াশুনো করব।'

খগেন : 'শরীর ক্লান্ত হয়েছে, একটু অন্য কোথাও, ঠাণ্ডা জায়গায়, বিশ্রাম নিলে হয় না ?'

সফীক : 'ওদেরও একটু হাঁপ ছাড়বার সময় চাই, এই বলছেন ? মজদুর-সভা সাবালক হয়েছে এখন নেতা অবসর নিক— কেমন ?'

খগেন : 'ঠিক তা নয়. অবসরের সুযোগ নেই। লোকে জীবনটাকে কর্মক্ষেত্র বলে। ক্ষেত পতিত রাখার প্রয়োজন আছে, কিন্তু পতিত রাখলেই জমি পোড়ো হয়ে যায়, তাতে নোনা ধরে, তখন মণ মণ গুড় ঢাললেও ফসল ফলে না। তা ছাড়া, যে একবার একটু ভাবতে শিখেছে, তার কাঁধ থেকে জোয়াল কখনও নাবে না। সত্যকারের আন্দোলন কখনও থামে না।'

সফীক : 'তবে ঢিমে হয়, ঝুলে পড়ে, বেতালা-বেসুরো হয়, দেখেন নি ? আবার ছন্দে সুরে ফিরিয়ে আনতে হয়।'

খগেন : 'বেশ ত ইতিমধ্যে মজদুর-সভা বুঝুক যে সমঝোতা হয় না, কখনও কুত্রাপি হয় নি। ততদিন আপনি একটু ঘুরে আসুন অন্যত্র।'

সফীক : 'অত ভয় পাচ্ছেন কেন আমার জন্যে ? নিজেকে অতখানি মূল্য দিই না। হুলিয়ার চার্জটা কি ?'

খগেন : 'শুনছিলাম মানুষ খুনের। ওরা একেবারে পাগল !' খগেনবাবু তাচ্ছিল্যভরে হাসলেন। সফীক জোরে হেসে উঠল, মুখ চোখের চামড়া কুঁচকে গেল, মমির মতন, চোখের তারা দুটো ছোট্ট চকচকে কালো পাথরের কুচি হয়ে যেন ঠিকরে পড়বে··অকস্মাৎ হাসি থামতে খগেনবাবু চমকে যান···দাঁতের ওপর দাঁত, ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে সফীক বলে, 'মিথ্যে কথা।' আবার মুখে রস এল, চোখের পাতা খুলে গেল, স্বরে আর্দ্রতা এল। খগেনবাবু বল্লেন, 'নিশ্চয়ই; আমি শুনছিলাম, ঠিক জানি না।'

সফীক : 'বিজন ছেলেমানুষ তাই একেবারে ভড়কে গেছে। ওর এতে

আসাই অন্যায় হয়েছিল। হুলিয়া-টুলিয়া সব বাজে কথা। আমার ওপর বিজনের দুর্বলতা আছে জানেন ত', তাই বেচারা ঘাবড়ে গেছে।' খগেনবাবু সোয়াস্তি পেয়ে বল্লেন, 'আমারও তাই সন্দেহ।' বিজন সেদিন অমন অস্বাভাবিক ব্যবহার করলে কেন? ওরা শুখিয়ে গেছে, মনুষ্যত্বের অপমান করেছে, বল্লে কেন? কোথাও একটা ভীষণ আঘাত পেয়েছে। তার ধাক্কায় একেবারে রমাদির কোলের ওপর···কচি খোকা ধাক্কা না ছাই, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা। ও আবার আঘাত পাবে। অভিমান হয়েছে মাত্র। 'মানুষ খুন, শিশু হত্যার চার্জ' রমলার মুখ থেকে যেন বিষ উদ্‌গারের মতন বেরুল, রমলা কেবল ছুরি মেরে সন্তুষ্ট হল না, পেঁচিয়ে পেচিয়ে ছুরিটা অন্ত্রের মধ্যে চালিয়ে দিলে। সফীক খুন করেনি, যেন সেই রমলার অজাত শিশুটিকে গলা টিপে মেরেছে, যেন সেই আর কাউকে মেরে ফেলেছে···কে সে? সাবিত্রী? তারই ইঙ্গিত দিলে রমলা? শিশু, সে কাল্পনিক, সাবিত্রী, সে ত মানুষই ছিল না, মাত্র রোমান্টিক, চঞ্চল শিরা উপশিরার মৃদু বাচালতা। 'একে খুনই বলে না।' 'নিশ্চয়ই না।' খগেনবাবু আর সফীক উভয়েই চমকে ওঠে। খগেনবাবু সামলে নিয়ে বলেন, 'অচ্ছা, এখন ত সরকার দেশের, তবু আপনাদের ওপর অত বিদ্বেষ কেন?'

সফীক: 'সরকার যাকে বলে তা এরা নয়। কংগ্রেস অফিসে বসছে, ক্ষমতা অন্যের হাতে।'

খগেন: 'নিজেদের হলেও আপনাদের সুবিধে হত না।'

সফীক: 'সুবিধে অসুবিধের কথা ছেড়ে দিন। কংগ্রেস না হলে আরো ক্ষতি হত! ওটা জাতীয়তার ম্যাট্রিক্স্‌, যেমন মজদুর-সভা, করিমের কাছে। আচ্ছা, বিজন কি করে আজকাল?'

খগেন: 'মধ্যে মধ্যে দেখতে পাই, কী একটা ক্লাব হয়েছে, সেখানে যায় শুনছিলাম।'

সফীক: 'ওকেই না হয় কোনো পাহাড়ে পাঠিয়ে দিন না। কানপুর নোংরা আর গরম।'

খগেন: 'কোথায় আপনার যাওয়া উচিত, না বিজনের যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন।'

সফীক: 'আমার? আমার যাওয়া হবে, তবে পাহাড়ে নয়। মিছিমিছি জেলে পচে লাভই বা কি! অবশ্য, একটু পড়াশুনো করা যায়। তবে আমি প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হব না। সে যাই হোক— আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন···এখান থেকে সরে গেলে অনেকেই খুশী হবে, হাঁ অনেকেই, তবে সকলের কৃতজ্ঞতা-

ভাজন হতে মন চাইছে না।'

খগেন : 'চলুন না, একটু ঘুরে আসা যাক গঙ্গার ধারে।'

গঙ্গার ধার বলে কিছু নেই। গঙ্গার পুল আছে, তাও একটা নয়, দুটো। একটা আবার দোতলা, ওপরে শকট চলে নিচে চলে নর, জলের ওপরে ভাসে খাপছাড়া চর। পুলের ফাটকের কাছে একটা একার ওপর দুজনে সওয়ারি হলেন। একাওয়ালা প্রথমেই ভাড়া চাইলে মাপ চেয়ে, নদীর ওপরে তাড়ির দোকানে অনেকেই সন্ধ্যের ঝোঁকে যায়, আসবার বেলা পয়সা দেয় না। তাড়ির দোকানের সামনে হল্লা হচ্ছে, একটা ফিরতি একায় মাতাল মেয়ে গজল গাইছে, সঙ্গী বেহুঁস। যেখানে বাঁকা রাস্তা সোজা হয়েছে সেখানে সফীক একা থেকে নেমে পড়ল···'আসুন, খগেনবাবু, একটু হাঁটা যাক।' সুন্দর পাকা রাস্তা, দুপাশে বড় বড় গাছ, ডালগুলো মিলেছে মাথার ওপর খিলেনের মতন। 'গাছ, বড় গাছ, বেশ, নয় ?' 'চমৎকার।' গুড়ি বেঁটে, চার পাঁচ হাত ওপর থেকেই ডালগুলো ছুটে বেরিয়েছে, বিষ ফোড়ার মতন গাঁট, যন্ত্রণা ভুলে গেছে, বহু পুরাতন গলগণ্ড, একটা গাছ নতুন পোতা, আট-দশ বছরের মনে হয়, নিশ্চয়ই পুরানো গাছটা ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল, তার পাশেই একটা মোটা আম গাছ, দুটো মিলে যেন পুরীর ভিখিরী, এক পায়ে গোদ। ডাইনে বাঁয়ে দিগন্তব্যাপী মাঠ, অন্তঃসারশূন্য দূরত্ব, অর্থহীন অবকাশ, সমতল, নিথর, নৈর্ব্যক্তিক। 'মাঠের ধারে বসবেন ?' 'আরো এগিয়ে।' 'আরো এগিয়ে একটা দোতলা বাড়ি আছে, আশ্রম, চরখা চালান থেকে চামড়ার কাজ পর্যন্ত সব কিছুই হয়।' 'তবে আর এগিয়ে কাজ নেই, ঠুকরে দেবে।' 'কি ঠোকরাবে, খগেনবাবু ?' 'লাঙ্গলের ফাল, পৃথিবীর বুক চেরে সেটা বুঝি, সে-ক্ষত আরো গভীর হোক, ক্ষতি নেই, বরঞ্চ লাভ, সেটা ভালবাসারই চিহ্ন। কিন্তু একি! কলের চাকা জোরে ঘুরুক, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুক, গা দিয়ে ঘাম ঝরুক গলগল দরদর করে, সেটা ভালবাসি আর নাই বাসি, বুঝি। বুঝি, মানুষের অন্তরের শক্তির বিকাশ হচ্ছে, তার জোরে জড়ও তার প্রাণ উজাড় করে দিচ্ছে। জানি, এই প্রাণেরও অপলাপ ঘটে, অপচয় হয়, দস্যুরা লুটে পুটে নেয়, তবু উৎসাহের বিরাম নেই, যদি একবার খুলতে পারেন। এই চরখা কাটা আর কুটির শিল্পে, এই হরিজন-সেবা আর ভজন গানে প্রেমের গভীরতা পাই না, অফুরন্ত স্রোতধারার গাম্ভীর্য পাই না, তাই···তাই ঠোকরান বলছিলাম। ঐ ধরনের এক একটা মেয়ে থাকে, সতী সাবিত্রীদেরই মধ্যে, বাইরে যেতে হবে না, তাদের ঠোঁট শুধনো··· তাই ঠোকরান বলছিলাম, কাঠ ঠোকরার পালক দেখে কে বলবে যে পাখিটা ঠোঁট সর্বস্ব।' সাবিত্রী কী ছিল ? মধুচুষী···রমলা ? লালমণি।

মাঠের এই অসীম অবসর অসহনীয়। আকাশে তবু তারার ভিড়, জুঁই ফুলের যজ্ঞ, সমুদ্রে তবু রঙের ভিয়ান, পাহাড়ে তবু বাঁকা রেখার সুচারু সমাবেশ আর অসম পিণ্ডের সুষ্ঠু পরিমাণ, কিন্তু মাঠের এই ফাঁক কেবল জড়, মানুষের ভিন্ন গোত্রের। দূরে মাত্র তিনটে গাছ থাকলেও অবকাশ অর্থবাহী হত, সেই দিকে চেয়ে দূরত্ব অতিক্রম করা যেত, কিন্তু এই বিরাট শূন্যতা ভারতের ভাগ্যের মতনই নিরর্থক, নিরুদ্দেশ, নৈরাশ্যময়। আজ যদি রমলা পাশে থাকত সে চোখ খুলে দেখতই না। মধ্য এশিয়ার একটানা প্রসারের শঙ্কায় তাতার মুঘল তাঁবুর ছাউনি ফেলে, রাক্ষসের মতন গেলে, একত্রে শিকার ধরে, লুটতরাজ করে, ঘোড়ায় চড়ে ছোটে, লড়ে, আবার ফিরে নাচে গায়, পাশবিক বৃত্তির চর্চা করে, শূন্যতার পীড়ন থেকে যতটুকু অব্যাহতি পায় ততটুকু ভরাট করে দেয়। তাই তাদের গানে একটা ভীষণ দুঃখ থাকে ও সাজসজ্জায় অলঙ্কার যেন ভিড় জমায়। অথচ ছোটতেও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, ইংরেজ তাই সাম্রাজ্য চায়, তাই শহুরে মানুষ বারান্দায় বসে, তাই রমা পার্টিতে ছোটে, সফীক ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরে। বড় ছোট দুয়েতেই দম্ আটকায়। প্রকৃতির মধ্যে কোথাও শান্তি নেই। ভূমার ভয়ে মানুষ ক্ষুদ্র আর কৃপণ, সংকীর্ণ আর গণ্ডীভূত; গুহার ভয়ে মানুষ ফাঁপা, গৃহের চাপে মানুষ গৃহহারা, স্বেচ্ছায় নিয়মের বশবর্তী। প্রকৃতির এমন একটা কিছু মর্ম আছে যেটা মানুষের সম্পর্করহিত, তার সকল নাগালের বাইরে, যেটা এক রকমের সৃষ্টিছাড়া। সফীক কী ভাবে? বিজনের মতে সে প্রকৃতির মতনই নিষ্ঠুর, অমানুষিক। বিজন যাই ভাবুক না, সফীকের ধর্ম মানুষ-সর্বস্ব, মানুষকে ভিৎ করেই সেটা খাড়া হয়েছে। বিজন ভাবে নদীর ওপর পুল তৈরির সময় যেমন 'নরবলি দেওয়া হত সফীক তেমনই নতুন সমাজে পৌঁছবার জন্য মনুষ্যত্বের বলি দিয়েছে ··রমলা বলছিল শিশু বলি·· একটা না একটা বলিদান লুকিয়ে থাকেই কোথায়। কিন্তু খুনের চার্জ নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা, সফীক তাই কখনও করতে পারে! সফীকের ধর্মটাই যে মানুষ-সর্বস্ব, মার্ক্‌সিজম তা ছাড়া কিছু হতেই পারে না, তার আদ্যন্ত মানুষ, মানুষের, চেষ্টাই তার শক্তি, প্রেরণা, সব কিছু।

তবু মনে হয় সফীকের ধর্মে অব্যবহৃত প্রকৃতির স্থান নেই। অথচ সেটাও ত' মধ্যে মধ্যে গোল বাধাতে ছাড়ে না। এই পৃথিবীর নাড়ি আপন খেয়ালে ঠায়ে কি ধুনে চলছে, মানুষ গাছ কেটে নদীর মুখ ঘুরিয়ে না হয় তার ছন্দ সামান্য একটু বদলালে, কিন্তু প্রাথমিক লয়ের উত্থান-পতন যা ছিল তাই রইল। এত লোহা লক্কড় দিয়েও কী সেই আভ্যন্তরীণ মহাচুম্বকের খামখেয়াল বশে আনা গেল? হঠাৎ বাসুকীর মতন সেটা গা নাড়া দিলে, আর এল বিহারের

প্রলয়। মহাত্মাজী যখন বল্লেন যে বিহারে ভূমিকম্প হল বেহারিদের পাপের জন্য সে-কথা শুনে তখন হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শিখর থেকে বনাবৃত পাদদেশ পর্যন্ত হাসির লহর খেলেছিল। ভূমিকম্পের মানবিক কারণ কি? মার্কসিস্ট ব্যাখ্যা কি? নেই, নেই, নেই···সেটা দোষ নয়, কারণ সেটা মানুষের বাইরের প্রকৃতির ব্যবহার। মানুষ থেকে প্রকৃতি পৃথক···কত অকিঞ্চিৎ এই মানুষের দম্ভ!

সফীক একটু যেন হাঁপাচ্ছে···'কষ্ট হচ্ছে? আমারই অন্যায় হল এতদূর হাঁটিয়ে আনা।' 'মোটেই না, এবার ফেরা যাক। খুব ভাল লাগল···কতদিন দেখিনি, গাছপালা খোলা মাঠ···কতদূর পর্যন্ত গেছে জানেন? আমিই জানি না, নিশ্চয়ই অন্য জেলার মাঠে মিশেছে। বড় ভাল লাগল, খাগেনবাবু। চলুন ফিরে আপনার খাবার দেরি হচ্ছে।' তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে ভয় হয়, রমলার অপমান মনে পড়ে···হঠাৎ কেমন মায়া আসে, এই ত' জড় প্রকৃতি থেকে জীব জন্মাল, এই ত ফুলশুদ্ধ ট্যাঁ ট্যাঁ করছে, নাড়ি কাট, নাড়ি কাট, মুখে ফুঁ দিস্‌নি আর, মধু দে, মধু দে···সর্বত্র মধু ক্ষরছে···। এই ত একটু আগে জড জীব জোড়া ছিল। এই খোকা কিন্তু বড হবে, মানুষ হবে, নতুন পরিবেশ চাইবে, পুরাতনে ঘৃণা আসবে, মাতৃগর্ভের অন্ধকার ও সংকীর্ণতায় তার মন বসবে কেন? প্রকৃতি আর স্বভাব আবার তখন পৃথক হবে। সফীক ও খগেনবাবু ফিরে এক্কায় উঠলেন।

সফীকের আড্ডার সামনে পৌঁছতে খগেনবাবু বল্লেন, 'চলুন না আমাদের ওখানে।' সফীক হেসে উত্তর দিলে, 'এখন বাড়ি ফিরতে মন যদি না চায় এখানেই আসুন, যা হয় কিছু খেয়ে নেবেন।' খগেনবাবু আপত্তি করলেন, 'না, এখন বাড়ি ফিরি। আপনি একলাই বিশ্রাম করুন। অনেক রাত হয়েছে। একটা কথা ছিল··কাল হবে···আপনি থাকছেন ত? যাবার আগে যেন খবর পাই।' সফীক বল্লে, 'খবর দেবার সুবিধা আমাদের হয় না, তবে চেষ্টা করব।'

অনেক দেরি হয়েছে, এতক্ষণ নিশ্চয়ই রমলা টেবিলের ধারে বসে আছে বেশ পরিবর্তন না করেই, তার অনুষ্ঠান আজ সফল বড সাহেবের উপস্থিতিতে, তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ কাজের সুযোগে, মন ভরাট সুখ্যাতি পেয়ে, মুখে চোখে রঙ ফুটেছে, চামড়া মসৃণ হয়েছে, বয়েস কমেছে, নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে ভাল, সঙ্গে বিজনও বসে আছে, নিশ্চয়ই রমাদিকে বোঝাচ্ছে যে সার্থকতার ও সুখ্যাতির সব খানিই তার প্রাপ্য, একটুও তার মধ্যে অতিরঞ্জন নেই। বাড়ির ফাটক খোলা,

কেবল ভেতরের বারান্দায় আলো জ্বলছে, বুক ধক্ করে ওঠে, এত রাত্রেও উৎসব শেষ হয় নি! বয় এল, মেমসাহেব আসেন নি, ছোট সাহেব অর্থাৎ বিজনবাবু এসেছিলেন, একটু পরে আবার আসবেন বলে গেছেন। খগেনবাবু বারান্দার চেয়ারেই বসলেন। খানিক পরে মালী লণ্ঠন নিয়ে ফটক বন্ধ করতে এল। লোকটা বুড়ো, কাজ জানে, ল্যাটিন নামের সর্বনাশ করতে ওস্তাদ, মালীদের চেষ্টায় উদ্ভিদতত্ত্বের পারিভাষিক তৈরি হচ্ছে, অধ্যাপকবৃন্দ চাইছেন সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি থেকে প্রতিশব্দ উদ্ধার করতে, তাই তাঁদের নাম দেওয়া গাছে ফুল ফল ধরে না··· র‍্যাস্প্‌বেরিকে রসভরী বলে মালী, এই নামের জোরেই ফল টোপা টোপা হয়ে ওঠে···ভাষা জন্মায় এদের মুখ থেকে, সাহিত্য-পরিষদের হাড়ে নেই ভাষাসৃষ্টির শক্তি···যারা খাটে তারাই স্রষ্টা, বাকিরা দ্রষ্টা, তাও নয়, সেজন্য নিরাগ্রহতা চাই···অসম্ভব এই আগ্রহ বর্জন করা, অজানিতে এসেই যায় ভাবগুলো রাত্রে চোরের মতন, যতক্ষণ চুরি চলছে ততক্ষণ মট্‌কা মেরে লেপ মুড়ি দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাক—যদি জেগেছ, নচেৎ অঘোরে নিদ্রা দাও এবং সকালে উঠে চেঁচামেচি কর আর লাল পাগড়ি আসুক। যদি বীর পুরুষ হও তবে চোর তাড়াও, তবে ছুরি খাওয়ার ভয় রইল। খগেনবাবু বয়কে বল্লেন বারান্দাতে খাবার আনতে!

এখনও এল না রমা, এতক্ষণের প্রোগ্রাম! লোকে যে অধীর হয়ে উঠবে, অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা ভাবে, নিজেদের কৃতিত্ব উজাড় করে দেওয়াই বিধির বিধান। খগেনবাবু বারান্দা থেকে নেমে সামনের ঘাসের ওপর এলেন, জুতো খুলে ফেলতে ইচ্ছে হয়, নরম পরশ ঘাসের, জুতো খুললেন, লন-এর ওপর বিসদৃশ দেখায় জুতো জোড়া, মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, কেউ যেন মারা গেছে সদ্যসদ্য তার জ্যান্ত চিহ্ন পড়ে আছে। এধার ওধার ফিরে দেখলেন কেউ নেই, পা দিয়ে জুতো জোড়া লনের কোনে সরিয়ে দিলেন। রমলা যদি এই রকম দেরি করে তবে চাকর-বাকর ভাগবে। তবে সে জানে ওদের চালাতে, তারাও বুঝেছে বাড়ির কর্তা কে। তাই ভাল, ওদের সম্পর্কে হাত না দেওয়াই মঙ্গল। ঘাস বেশ ঠাণ্ডা···তার ওপর শুয়ে পড়লে যেন শান্তি আসে···মালী যদি টের পায় কী ভাববে! চাকর-বাকরের জানতে কিছুই বাকি থাকে না, তবু তাদের সহানুভূতি পেতে লজ্জা আসে। সফীক, হাঁ, তাকে বলা যায়, সে অ-মানুষ নয়···বিজন ভুল বুঝেছে···কিন্তু বক্তব্যই বা কি! পার্টির সভ্য হতে বারণ করলে, কারণ, তার ধারণা রমলার সঙ্গে বিচ্ছেদ অসম্ভব। এইখানে সফীক মস্ত ভুল করেছে, সে রমলাকে একটা ঘৃণ্য জীবনযাত্রার প্রতীক ভাবে। কিন্তু কেন সে মাত্র প্রকতী থাকবে? জীবনযাত্রার ঘৃণ্যতাটা অপমানের নয়, অপমান

তাকে মানুষ না ভাবা। তবু, তবু সফীক মোটামুটি ঠিকই ধরেছে, মানুষ আর কোথায় রইল? এককালে ছিল, এখন লঙ্কার রাক্ষস।

মোটর আসছে মনে হল, খগেনবাবু তাড়াতাড়ি দেওয়ালের পাশে অন্ধকারে বসে পড়লেন। ফাটকের বাইরে মোটর থামল, দরজা খোলার শব্দ হল…'না, কাল কিছুতেই নয়' 'সে আমি ছাড়ব না, কথা দিয়েছেন' 'অত জোরে চালালে আমার মাথা ঘোরে, শহরের মধ্যে'…'লক্ষ্ণৌএর রাস্তা চমৎকার, ব্রীজের পর থেকে চমৎকার ড্রাইভ, সত্যি চমৎকার না সে হবে না, যদি নার্ভাস হন আস্তে চালাব, না হয় রাস্তার ধারে কোথাও একটু বসলেই চলবে…ডিনারের পর, এই কথা রইল…ভয় নেই, একলা পেয়ে খেয়ে ফেলব না। আশা করি স্যাপেরঁ নেবার দরকার হবে না। বলেন ত' বিজনকে অনুরোধ করি রিটাকে সঙ্গে নিতে। ওঃ তাইত, রিটার আবার কী একটা পার্টি আছে…কি বলেন?' কোন কথা শোনা গেল না, মোটরের দরজা বন্ধ হল, ব্যাক্ করে অধ্যাপক চলে গেল। রমলা তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে ঢুকল। তার ঘরের আলো জ্বলে উঠল… খাবে না অত রাত্রে, নিশ্চয়ই খেয়ে এসেছে, এত দেরি লাগে রাতের পোশাক পরতে বোধ হয়, পার্টির পোশাক পরেই নিচু চেয়ারে বসে আছে, ভাবছে, আরশিতে নিজেকে দেখছে, ভাবছে, বেশ করেছে,· বেশ দেখাচ্ছে, সকলে ত তাই বল্লে, ভাবছে, কেন করবে না, কেন সেই বা একলা থাকবে, তার দায় পড়েছে, ঠোঁট ওলটাল নিশ্চয় রমলা, অল্পবয়সী মেয়েদের মতন। কারই বা দায়? কিছুরই নয়।

খগেনবাবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, মুখে আলো পড়ল, তা পড়ুক, জুতো পরে বাড়ির বাইরে এলেন, ফাটক খোলা রইল, তা থাক গে, চুরির কিছু নেই, বিজন আসবে। সুজন কানপুরে থাকলে সেও আসত। তাকে আসতে বারণ করা অন্যায় হয়েছে, রমাকে বলাই হল না সুজন এল না কেন। সুজন এলে রমা নিজেকে সামলাতে পারত…সুজন নিজে হয়ত নিজেকে সামলাতে পারত না। তবু এটার চেয়ে ভাল হত…এটা কে! একটা জঘন্য কীট এই অধ্যাপকটা, মুখে কপচায় কাকাতুয়ার মতন, বেশ হয়েছে এই কাকাতুয়া আর লালমণিটার মিলন। খগেনবাবু সফীকের আড্ডার সামনেকার গলিতে এলেন। পুলিশের ভিড়। বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল। কিষণ, মহবুব, করিম, মহীন্দর, আরো দু'একজন দাঁড়িয়ে। মহীন্দর বল্লে, 'ওস্তাদকে ধরেছে!' 'কেন?' 'খুনের চার্জে।' 'ছাড়ান সম্ভব নয়?' 'জামিন চাইবে।' 'তার জন্য ভাবনা নেই।' করিম বল্লে, 'জামিনেও ছাড়বে না।' 'তবে?' 'এক যদি লক্ষ্ণৌএ সরাসরি গিয়ে ওপর থেকে ছাড়পত্র আনা যায়। তাও বোধহয় সম্ভব নয়…

চার্জটা খুনের কি না।' পুলিশ প্রহরী সফীককে রাস্তায় নিয়ে এল। রাস্তার আলোয় খগেনবাবুকে সফীক দেখতে পেলে। হাসিতে সফীকের চোখের কোনের চামড়া কুঁচকে গেল।

ফটকের দরজাটা বন্ধ হয়নি। রমলা আর বিজন বারান্দায় বসে। 'এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় থাকেন, খগেনবাবু? আমাদের কী একটু ভাবনা হয় না? সেই কখন থেকে বসে আছি। এরা বল্লে আপনি বাড়িতেই আছেন, তন্ন তন্ন করে খোঁজা গেল, পাত্তাই নেই, হাওয়া খাচ্ছিলেন বুঝি?' খগেনবাবু 'হুঁ' বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন। দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। ঘুম আসে না, একটা চিঠির কাগজ টেনে নিযে লিখলেন, 'রমলা, বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যেতে হচ্ছে। তোমার নামে চেক রেখে গেলাম। যদি দরকার হয়, ভাঙ্গিয়ে নিও।' লজ্জা হয় এই ধরনের নাটুকে মেয়েলি চিঠি লিখে যেতে। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে স্থটকেশ গোছাতে বসলেন। জিনিসপত্র কোথায় গেল?

•

পরের দিন শোনা গেল ওরা জামিন দেবে না। মহবুব অর করিম এসে বল্লে, উধামজী এ বিষযে কোনো সাহায্য করতে অক্ষম। সারাদিন জল্পনা চলল! আবার ধর্মঘট অচল। এক উপায লক্ষ্ণৌ গিযে কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা···সন্ধ্যার পর যাওয়া যাবে ট্যাক্সিতে, রাত দশটার পর মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে। খগেনবাবু বাড়ি ফিরলেন রাত নটায। রমা আটটায় খেযে দেযে বেরিয়ে গেছে দুসরে সাহেবের সঙ্গে, তাঁর মোটরে। ছোট সাহেব আসেন নি সারাদিন। লজ্জা এল কেমন।

ট্যাক্সিতে মহবুব আর কিষণ। কিষণ ভিতরে বসতে চায় নি, খগেনবাবু জোর করে পাশে বসালেন। পুলের ফাটকে ট্যাক্সি থামল। 'এখানে একটু বেশি হাওযা, সামনে···' 'সামনে হাওয়া কম।' 'তাই যাই সামনে।' ট্যাক্সি ছাড়ল। নদীর ওপর একটা নৌকোয় টিম্‌টিমে আলো জলছে। নদী পার হয়ে আবার সেই বাঁক, আবার সেই সিমেণ্টের রাস্তা, আবার দু'পাশে গাছের সারি, আবার সেই দিগন্তবিস্তারিত প্রান্তর সৃষ্টিছাড়া, অ-মানুষিক বুকের স্পন্দন কানে আসে শূন্যতা ভেদ ক'রে···ট্যাক্সি জোরে চলে···রাস্তার পাশে একটা মোটর দাঁড়িয়ে·· লোক নেই ··কোথায় গেল ওরা···এই ত মাঠটা ভরে গেল মানুষের প্রেমে, বন্ধুত্বে···'ড্রাইভার, আমাদের আবার শিগ্‌গির পেঁছতে হবে!' ড্রাইভার স্পীড বাড়িয়ে দিলে। 'ষাট মাইল চলছে, সাহেব।' 'ষাট

মাইল ঘণ্টায় ? বল কি ?' মহবুব বল্লে, 'বাবু সায়েব, আপনি ঘাবড়াবেন না। ওস্তাদ ফিরে আসবেই আসবে। পাড়াশুদ্ধ সাক্ষী দেবে ছেলেটা আগেই মরেছিল···চৌধুরী সাহেব নিজেই বলবে আদালতে···অতবড় মিথ্যে চার্জ টেঁকবে না—আপনি বোধহয় জানেন না ব্যাপারটা সব মিথ্যে—ওরাই চাপা দিয়েছে এইটাই সত্যি প্রমাণ হবে দেখবেন। পৃথিবীতে একটা সত্যি মিথ্যে আছে ত !'

'আছে না কি ?'

'ড্রাইভার, রাস্তায় সোডা লেমনেডের দোকান নেই ?'

'আছে, উনাওতে।'

মহবুব বল্লে, 'পান খাবেন ?'

খগেনবাবু একটা পান মুখে দিলেন।

রিয়ালিস্ট

মোহানা-১১

উৎসর্গ

লিলি

আমার প্রথম গল্পের বই তোমার হাতে দিতে পাবলাম না

এই আমার দুঃখ।

ধূর্জটি

...

একদা তুমি প্রিয়ে

ছোট্ট নদীর ধারে, আনিকাটের ফাটক খোলা হয়েছে ব'লে জলের ওপর একটা প্রশস্ত কাদার পাড পড়েছে। সেই কাদার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। নদী কিনারের সরকারি রাস্তার একধারে ঝাউ গাছের সার, অন্যধারে জলরেখার কিছু ওপরে কাশের হন। দীর্ঘ ঝাউগাছের গথিক উচ্চাভিলাষ, কাশগুচ্ছের সদাক্রীডারত অশ্বারোহীর শিরস্ত্রাণের পক্ষকম্পন এবং গোধূলির মন্দির-অভ্যন্তরস্থ অস্পষ্টতা মনকে যেমন কল্পলোকের দিকে নিয়ে যায়, তেমনি পেট্রলের ও কাদার গন্ধ, মোটরের হুঙ্কার ও 'ধূলাকেতু'র পুচ্ছ সম্মার্জন বর্তমান সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনকে নিষ্ঠুর ভাবে সচেতন ক'রে তোলে। এ বেষ্টনীতে প্রেমের গল্প ব'লতে হ'লে ভ্রমণরত বন্ধুযুগলকে কোন গাছের তলায় বসতে হয়। সেরকম উপযুক্ত স্থানও পাওয়া যায় না যে তা নয়। ঝাউগাছের শ্রেণী যেখানে বন্যার কৃপায় হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তারই হাতকয়েক দূরে তিনটি দেওদার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, মধ্যবিত্তের নিমন্ত্রণ-বাড়িতে বড়লোক কুটুম্বিনীর মতন। বন্ধুযুগল দেওদার-তলায় বসে পড়লেন। একজন বল্লেন, 'এ যেন সেই ছবির "তিন বোন"— এঁরা তিনজনে এক হয়ে আছেন। গল্প করতে ইচ্ছা হচ্ছে, শোন।'

অন্য বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'না শোনবার কোন প্রেরণা পাচ্ছি না, বরঞ্চ আমি গান গাই, তুমি শোন। প্রেমের গল্প চলবে না।'

'বেশ তাই গাও। আমি সমালোচনা করব।'

গান শুরু হল। গানটি রবীন্দ্রনাথের—

'একদা তুমি প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে,
বসেছ ফুলসাজে, সে কথা কি গেছ ভুলে।'

গায়কের কণ্ঠে মাধুর্য ছিল, কিন্তু সংগীত রচনার বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ পৃথক ও স্বাধীনসত্তার প্রতি গায়কের কোন শ্রদ্ধার নিদর্শন ছিল না ব'লে গানটি বোধ হয় জমল না! গায়কও অন্তরার প্রথম চরণটি শেষ করলেন না। 'সেথা যে বহে নদী নিরবধি, সে ভোলে নি···ইত্যাদি ইত্যাদি' এই বলে উঠতে চাইলেন।

বন্ধু খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লেন, 'তোমার রবি ঠাকুরের গান হয় না। সে যাকগে, আমি বলি রবি ঠাকুরের গান ভাল, তুমি বল খারাপ, এই নিয়ে এস তর্ক করি। সময় কাটাতে হবে ত ?'

'তার চেয়ে, আমি বলি ভাল, তুমি বল খারাপ।'

'ভালই হোক, আর খারাপই হোক এ কথা সুনিশ্চিত, তোমার মুখে এ গানটি খাপ খায় না।'

'কেন ?'

'এ গানের মধ্যে এমন একটা অভিমান ও আফশোষের সুর রয়েছে যেটা তোমার কণ্ঠে ধরা পড়বে না। ঐ গানটিতে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে একটা আদর্শবাদ ও সংযম, যাকে কর্তব্য-জ্ঞানের দাম্ভিকতা বলতে পার। আফশোষ, অভিমান ও কর্তব্য-জ্ঞান মিলে একটা মিশ্রসুর তৈরি হয়েছে। তুমি কি সেই মিশ্রসুরের প্রতি ন্যায়-বিচার করতে পার ?'

'কেন পারি না ? আমি কি এতই দুর্বল ?'

'না, তোমার প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। তোমার প্রিয়া তোমার কাছে যদি ঐ রকমভাবে আত্মনিবেদন করতেন, তাহলে সে আত্মনিবেদনের স্মৃতি কেবল নৈসর্গিকদৃশ্যের মধ্যে জাগরূক দেখে তুমি সান্ত্বনা পেতে না নিশ্চয়ই। তোমাকে অপমান করছি না। তোমার পুরুষকারকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।'

'আর সে কাজ বুঝি তুমি পারতে ?'

'আমাকে অত খেলো পাওনি যে নিজের স্বভাব কিংবা নিজের কাহিনী তোমার কাছে বলব! জোর, যার মুখে ঐ গানটি শোভা পায় তার স্বভাব আমি বর্ণনা করতে পারি। মানুষটা কাল্পনিক, ঘটনাগুলিও কাল্পনিক ভাবতে হবে, নচেৎ গানের তাৎপর্যটি ধরতে পারবে না। একটা গল্প তৈরি করি? শোন তাহলে মন দিয়ে। একটু কল্পনাশক্তিকে খাটাতে হবে।'

'আমাকে ত জানই। ছেলেবয়সে, মহাষ্টমীর দিন পর্যন্ত রঙিন-জামা পরিছি মনে হয় না। বাবার ধারণা ছিল, ইংরেজ জাতটা অত বড় হয়েছে তার একমাত্র কারণ তাদের পোশাকের বর্ণহীনতা, এবং তাদের পতনও অবশ্যম্ভাবী, কারণ তাদের মেয়েদের পোশাকে বর্ণ সম্বন্ধে দুর্বল উচ্ছৃঙ্খলতা।' প্রমাণস্বরূপ

পশুপক্ষী ও সাঁওতালদের বর্ণপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করতেন। বাবার এই শিক্ষা আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছে। কল্পনা আমার ধাতে আসে না। রবি ঠাকুরের গান গাই, অন্যান্য ভদ্রলোকে ও মহিলারা যে কারণে গেয়ে থাকেন, হিন্দুস্থানী-গান জানি না ব'লে, এবং খানিকটা ফ্যাশানের জন্য। খানিকটা ভালও লাগে, কী রকম গা'টা শুড়শুড়ি দিয়ে ওঠে। তুমি আমাকে কল্পনার সুযোগ নিতে বোলো না। অর্থাৎ বোধগম্য উপায়ে গানটির উপযুক্ত গায়কের চরিত্র বর্ণনা কর।'

'ফটোগ্রাফ তুলে তার ওপর রং লাগাতে বলছ। ও কাজটা অনেকেই করেন জানি। কিন্তু রবি ঠাকুর ও কাজ করেন না, তাইত তাঁর কবিতা, বিশেষ করে তাঁর ছবি অত উদ্ভট। বেশ, সহজে বুঝতে চাও ত তোমাকে আমাকে নিয়েই গল্প ফাঁদি? শেষে আপত্তি কোরো না যেন!'

'যতক্ষণ না কল্পনাকে খাটাতে বলছ, ততক্ষণ সব করতে রাজী। আরম্ভ কর।'

'ধর তোমার বিবাহ হয়েছে একজন অর্দ্ধশিক্ষিতা ও বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে এবং আমি অবিবাহিত। আমরা দুজন অন্তরঙ্গ।'

'দেখতে কেমন?'

'কি লোভী!'

'বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে তা হলে বিবাহ দিও না।'

'দিতে হবে অনেক কারণে। অন্যতম কারণ, গল্পের গূঢ় অভিসন্ধি। বড়লোকের মেয়ে না হলে কোন বাঙ্গালী মহিলার মানসিক অবস্থা প্রেমে পড়বার উপযুক্ত হয় না। ভাল করে ঘি-দুধ খেয়ে দেহটাকে শ্রীঘৃতের ছবির মতন ক'রে তোলা চাই; অবসর উপভোগ ক'রে সংসার-সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হওয়া চাই, তবেই প্রেম নামক শৌখিন-নেশাটা জমে। যাঁকে হাঁড়ি ঠেলতে হয়, পাঁচটা কাচ্ছাবাচ্ছার ধখল সইতে হয়, তিনি, যদি কোন দুর্লভ অবসরে 'মহুয়া'র পাতাও ওলটান, তবুও তাঁর মন কারুর প্রতি দুর্বল হবে না। জোর তাঁর মনে 'অপরাজিত'-এর অপর্ণার মতন স্বামীভক্তিই ফুটে উঠতে পারে। আর বিংশ শতাব্দীতে স্বামীর সঙ্গে প্রেম নিয়ে গল্প, মা'র ছবির ওপর কবিতা লেখার মতনই অচল, অতএব অসম্ভব। আমি তোমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গে প্রেমে পড়াতে চাই।'

'এমন উপযুক্ত লোক কোথায় তিনি পাবেন, আমিই বা কোথায় পাব? তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, করুণাময় স্বামীর বন্ধু?'

'কি করে প্রেমে পড়েছেন জানতে চেয়ো না। আগে তোমার স্ত্রীকে চেন।

তোমার স্ত্রীর শ্রেণী যখন ঠিক করে দিয়েছি তখন তাঁর চেহারা ও চরিত্রের অনেকটা বলা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর জীবনে বিদ্যাসাগরের ভাষায প্রলোভন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায ভূমার সন্ধান, তরুণের ভাষায বড'র আহ্বান কিছুই আসে নি, এবং সেই জন্যেই তিনি তোমার ও তোমাদের সমাজের চক্ষে সতী সাধ্বী। অর্থাৎ, তিনি, তাঁরই পিতৃদত্ত মোটরে তোমার সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে যান, এসেই, বাড়ি ঢুকেই, অসহ্য গরমে, তোমারই কষ্ট নিবারণের জন্য পাখাটা পুরোপুরি খুলে দেন, খাবাব সময় এক সঙ্গে না খেলেও— শ্বেত পাথরের মেজেতে থাব্‌ড়ি খেযে ব'সে বাপের বাড়ির বুড়ো ঝিব অদ্ভুত বড়ি দেবার ক্ষমতার কাহিনী বলেন, তাবপর পান জর্দা খেতে খেতে পান খেলে তোমার 'পাওরিযা' হবে বলে তোমাকে পান খেতে মানা করেন। রাতে দাঁড়া-আযনার সামনে চুল বাঁধতে বাঁধতে তোমার মুখ থেকে একবার, 'মাত্র একবারটি' নিজের সৌন্দর্যের প্রশংসা-প্রত্যাশা করেন। যুৎসই ক'রে সুখ্যাতি না করতে পারলে সাবারাত মান-অভিমান, সাধাসাধিব পালা। সকালে উঠলেই মাথা ঘোরে ব'লে বিছানায পার্সি বেড়ালেব মতন শুযে থাকা, আটটার সময, প্রসাধনান্তে, লুচি-হালুয়া ও ঠাণ্ডা চা, দশটার সময তোমার খাবার কাছে বসা, বেলা বারটায যৎসামান্য জলযোগেব পর মাসিকপত্রের গল্প পাঠ করতে কবতে নিদ্রা, নিদ্রাভঙ্গের পর— উঃ, সেই সমযটায ভারী কষ্ট, ক্লান্তি, অবসাদ, অতটা ঘুমের পর খানিকটা বিশ্রামের প্রযোজন হয, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাব শ্বশুরের ইটের কল থেকে মোটরে তুমি না ফিরছ। এই সমযটাই দিবাস্বপ্ন দেখতে হয, এই গল্পটার, ঐ নভেলটার নাযিকার অবস্থায নিজেকে নিযে যেতে হয, নচেৎ কী করবেন তুমিই বল? কল থেকে একটু আগেই না হয ফিরলে? তোমার কাজের মুখে ছাই পড়ুক। যার জন্য তোমার কাজ তাকে ভোলা কোন হিসেবে। যা হোক্, দেরি করে যখন এসেইছ তখন সতীকে নিযে একবার বাযোস্কোপে যাও। অনুগ্রহ করে বাযোস্কোপ দেখতে দেখতে, কিংবা টকি শুনতে শুনতে যদি কেউ কাউকে চুমু খায তা হলে হেসে ফেল না, কিংবা তাঁর ক'ড়ে আঙুলে চিমটি কেটো না, তোমার চরিত্র সম্বন্ধে তিনি সন্দিগ্ধা হবেন। তোমার মনের ভিতরকার ভাবটা ধরে ফেলবেন, আর লোকলজ্জায, অর্থাৎ তাঁরই ভয়ে তুমি যে ভদ্র হযে চল একথা শুন্‌তে হবে। এই হল তোমার স্ত্রীর চরিত্র বর্ণনা। বুদ্ধি থাকলে বুঝবে।'

'সোজা ক'রে বল।'

'শোন চুপ্‌ ক'রে। তোমার স্ত্রীটি বড ভাল। অর্থাৎ তিনি ভালও হতে পারেন মন্দও হতে পারেন। তুমি যেমন তাঁর অবস্থার ক্রীতদাস, তেমনি

তিনিও তাঁর বাপের অবস্থার ক্রীতদাসী। এ হেন স্ত্রীর স্বামীর একজন বন্ধু আছেন। তিনি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যের অভাবে এই শ্রেণীর মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্য আশা করা যায়। কিন্তু যতটুকু পাওয়া উচিত, ততটুকু পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলের মনে অল্পবয়স থেকেই গোটা কয়েক কুসংস্কার গেঁথে দেওয়া হয়, যেমন loyalty— কিনা বন্ধুবাৎসল্য, honour, যার বাংলা প্রতিশব্দ নেই, কর্তব্যজ্ঞান বলতে পার, ও আদর্শবাদ অর্থাৎ idealism প্রভৃতি। এই সব সংস্কারগুলি তোমার বন্ধুর চরিত্রকে একেবারে বৈচিত্র্যহীন ক'রে তুলেছিল। সেজন্য তাকে নেহাৎ গোবেচারি মনে হত। আদর্শবাদই তার চরিত্রের মূলসূত্র। গোটা কয়েক উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে। তার বিশ্বাস ছিল যে নারীজাতি পুরুষের দ্বারা চিরকাল ধর্ষিত হয়ে এসেছে। অতএব নারী-জাগরণের জন্য সে রাবণের উপায় গ্রহণ করতেও দ্বিধা করত না, 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'জয়শ্রী'তে তার বেনামী প্রবন্ধগুলোর মধ্যে একটা ঢাকঢোলের আওয়াজ পাওয়া যেত। সে বিশ্বাস করেছিল যে ১৯২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই আমরা স্বরাজ পাব, যখন পেলাম না, তখন কারণ দেখিয়েছিল মহাত্মাজীর প্রতি আমাদের অনাস্থা। সে আমেরিকান ম্যাগাজিন পড়ত; গ্যারিবল্ডির জীবনী, সোশ্যালিজমের ইতিহাস, রুশের বিপ্লবকাহিনী, ম্যাক্‌সুইনীর ও সুন্‌ইয়ৎসেনের জীবনকথা তার কণ্ঠস্থ ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক আশ্রমকে অর্থ সাহায্য করবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তার সামর্থ্য ছিল না বলে প্রায় সব সভাতেই তাকে যোগ দিতে হত, আর যেদিন হাতে কাজ থাকত না সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তোমার বাড়িতে বসে গ্রামোফোন ও ও রেডিওতে শ্রীআঙ্গুরবালার গান শুনত। কিন্তু তাই ব'লে দু চারখানা রবি ঠাকুরের, দশবিশটা অতুলপ্রসাদের, এবং বিশত্রিশটা কাজী নজরুলের গান শোনাবার ক্ষমতা তার ছিল না একথা ভেবো না। সে তোমার স্ত্রীকে ঐ গানগুলোই শিখিয়েছিল।

এবার তার কর্তব্য-জ্ঞানের উদাহরণ শোন। প্রত্যেকদিন সকালে উঠে খবরের কাগজ মারফৎ পৃথিবীর যাবতীয় খবর জানা, তারপর সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সাহায্যে সর্বদেশের চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হওয়া, বিকেলে মোহনবাগানের খেলা দেখা, ফেরবার পথে শ্রমিকসঙ্ঘের পাক্ষিক-সভায় কিংবা নৈশবিদ্যালয়ের মাসিক ভোজে যোগদান, প্রায় রোজই তোমাদের বাড়িতে এসে তোমার স্ত্রীকে গান শেখান, চীন-জাপানের যুদ্ধ-কথা, তরুণ-সাহিত্য, তরুণ-চিত্রকলা ও নাট্যকলা, তরুণের অভিযান, স্ত্রী-জাগরণের বিবরণ শোনান— এ সব কাজ সে কর্তব্যবোধেই করত। সেইজন্য তার মতামতে একটা একাগ্রতা,

মননে একটা উন্মাদনা ছিল। বন্ধুর চরিত্রে এ গুণগুলির অস্তিত্ব তোমার স্ত্রী ভাল ক'রে না হোক আব্‌ছা গোছের সন্দেহ করেছিলেন ভাবা যেতে পারে। অন্তত এ ধারণাটুকু তাঁর ছিল যে কোথায় যেন তাঁর স্বামীর ও সেই স্বামীর বন্ধুর মধ্যে একটা পার্থক্য র'য়ে গেছে। তাঁর পার্থক্য-অনুভূতির খবরও বন্ধুটি জানত। তুমি জানতে, কিংবা জানতে না, হয়ত জানতে চাইতে না। সেইজন্য, তুমি যখন টাকার তাগিদ দিতে বিদেশ যেতে, তখন তোমার বন্ধুর চার্জে তোমার স্ত্রীকে রেখে যাওয়াটা তাঁর বাপের বাড়ি পাঠানর চেয়ে সমীচীন ভাবতে। বন্ধুর প্রতি তোমার প্রাগাঢ় বিশ্বাস এইটাই হ'ল তার কর্তব্যবোধের সব চেয়ে বড় প্রশংসাপত্র। বন্ধু-বাৎসল্য, গোটাকযেক সনাতন বিশ্বাসে অন্ধ-আস্থা— এ সব সদ্‌গুণ তার চরিত্রে কত পরিমাণে ছিল গল্পের মধ্যেই পাবে।'

'এবার গল্প শুরু হোক।'

'গল্পের প্রয়োজন নেই। এই তিনটি চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতেই গল্প তৈরি হবে। গল্পের অন্য অস্তিত্ব আছে নাকি? গল্প এক রকম হ'য়েই গেছে অর্থাৎ এখন থেকে যে ঘটনা বিবৃত করব সেগুলি এই তিনটি চরিত্রের সম্পর্কে ঘটতে বাধ্য। আচ্ছা, আরও একটু বিশদ ক'রে বলি। তোমার বন্ধুর প্রতি তোমার স্ত্রীর মনোভাবটা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকের প্রতি বড়লোকের মেয়ের অনুকম্পা এবং কর্মবীরের স্ত্রীর বাক্যবীরের প্রতি মোহ— এই দু'এর এক দৈব সংমিশ্রণ। তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার বন্ধুর মনোভাবটা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মোহ ও হিংসার, হিংসাটা তুলে রাখা হয়েছিল খানিকটা ধনী-সম্প্রদাযের জন্য। হিংসাটা ভাল ক'রে প্রকাশ পেত শ্রমিক-সঙ্ঘের পাক্ষিক সভার বক্তৃতায়। এই মোহ, ধনী-সম্প্রদায়ের ওপর এই রাগ ও তার এক অনুপযুক্ত প্রতিনিধির ওপর অভিমান চমৎকার মিশে গিযেছিল তার আদর্শবাদের সঙ্গে। সে ভাবত, তোমার স্ত্রীর গহনা-গাঁটি মোটর রেডিও থাকা সত্ত্বেও সে ভারী গরীব, একাকিনী, বন্ধুহীনা, নির্জন পথের যাত্রী। কিন্তু তোমার চরিত্রের 'প্রশংসায় সে ছিল শতমুখ। এই সব কারণে তোমার স্ত্রী ও তোমার বন্ধুর মধ্যে একটা আদর্শ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। তোমার স্ত্রী যদি পুরুষ হতেন, তা হলে সে সম্বন্ধকে প্লেটনিক বলা চলত। বিধাতার ইচ্ছা যখন বিপরীত, তখন তাকে মধ্যযুগীয় বলতে বাধ্য।

'আর আমি। আমি কোথায় রইলাম?'

'আরে তোমাকে বাদ দিয়ে কী গল্প হয়। তুমিই ত গল্পের নায়ক। তবে এমন নায়ক নও যে সর্বদাই রঙ্গমঞ্চের সবখানি জুড়ে আছে। তুমিই সব, তবে গোপনে, অলক্ষ্যে। চক্রের যেমন কেন্দ্র, এ বিশ্বের যেমন ব্রহ্ম, জুলিযাস সীজার

নাটকের শেষ অঙ্কগুলিতেও যেমন সীজার, ঘরে-বাইরের যেমন মাস্টারমশাই, সুরের যেমন বাদী স্বর, রেমব্রান্টের ছবির কোন থেকে যেমন আলোর একটি রেখাপাত, তেমনি তুমি আমার গল্পের। লোকে ভাবছে তুমি নিষ্ক্রিয়, অনাবশ্যকীয, অনুবাদী কী বিবাদী, তা নয। তুমি ব্যাকবণেব অব্যয। অভিমান কোরো না।'

'ওটা আমার ধাতে নেই।'

'সেই জন্যই ত ঐ গানটা তোমার মুখে শোভা পায না বলছি। আচ্ছা ধরাই যাক, তোমার মনোভাব বলে কিছু নেই। ও সব বালাই নেই তোমার। খাঁটি বৈজ্ঞানিক তুমি, মন তোমার সুস্থ। এবার গল্প শোন। প্রথম ঘটনাটি ঘটে তোমারই সামনে। হযত তোমার মনে নেই। রেডিও বন্ধ ক'রে তোমার স্ত্রীকে 'সেই' গানটি গাইতে ব'ললে। তৃতীয ব্যক্তি, অর্থাৎ তোমার বন্ধুর সামনে স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধজনোচিত গোপন ইঙ্গিতটা তিনি পছন্দ না কবে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। যে গানটি গাইলেন সেটি তোমার বন্ধুব কাছেই শেখা। কাজী নজরুলের বিখ্যাত গান— 'কেন কাঁদে পরাণ, কি বেদনা কাবে কহি?' প্রথম লাইনটা শুনেই তুমি ঠাট্টা করলে, 'কাঁদবার প্রযোজন নেই, আমার কান্না ভালও লাগে না। বেদনাটা কি আমাকে যদি না বল, ত এঁকেই বল না।' তোমার বন্ধু তাডাতাডি উত্তর দিলেন, 'না, না, আমাকে বলবাব কোন প্রযোজন নেই। তোমার কান্না ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু ওঁর যে বেদনা থাকতে পারে তোমার বোঝা উচিৎ। প্রত্যেক মানুষেব, বিশেষত, প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যে একটা সৃজনী-শক্তি সুপ্ত থাকেই থাকে, তাকে জাগ্রত, তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে কোন কর্মে নিযোজিত না করতে পারলে বেদনা বোধ করতেই হবে। অন্য বেদনার কথা বলছি না।' তুমি লেডি ডাক্তারের কথা তুলে একটা সস্তা বদরসিকতা করাতে সেদিনের সভাভঙ্গ হয। পরের দিন সকালেই তুমি বাইরে চলে যাও। বন্ধু সেদিন সন্ধ্যাবেলায তোমার বৈঠকখানায এসে অনেক ক'রে তোমার স্ত্রীর— তিনি তখন তোমার স্ত্রী নন, সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতিভূ— মনোরঞ্জন করতে প্রযাসী হলেন। তাঁর চেষ্টা সফল হল না। লাভের মধ্যে, বন্ধুকে গোটা কযেক কটু কথা শুনতে হল—এই যেমন, 'আমাকে আর গান শেখাবেন না, আমি গাইতে জানি না, আমার গলা খারাপ, তাল আমার হয না।' বন্ধু খুব জোরেই প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মনে আত্মবিশ্বাস আনতে পারলেন না। শেষে লজ্জার মাথা খেযে জিজ্ঞাসা করে ফেল্লেন— 'বেদনাটা কি?' 'বেদনা, বেদনা ত কিছু নেই। আমি খুব সুখী, আমার মতো সুখী কেউ নেই।'

'এ জগতে সুখ কারুর নেই, যতদিন পর্যন্ত একটা প্রাণী কষ্ট পাচ্ছে ততদিন কারুর সুখের অধিকার পর্যন্ত নেই।'

'পরের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে না।'

'আমি জানি কাঁদে, খুবই কাঁদে। আর বাস্তবিক তাই হওয়া চাই। যার নিজের জন্য প্রাণ কাঁদে না, তার পরের জন্য কি সহানুভূতি হতে পারে? আমি জানি আপনার হৃদয় কত কোমল। বেশি কোমল বলেই ত আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে সুখ পাই। দেখুন, আমারও আপনার অবস্থা, তবে আমার হাতে কি না বিস্তর কাজ, তাই কাজের মধ্যে ডুবে থাকি, নিজেকে ভুলে থাকি। কিন্তু যখন একলা থাকি তখন এমন একটা নিষ্ফলতা আমাকে আচ্ছন্ন করে যে আমার দম বন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় কোথাও চলে যাই।'

'ও সব ভাববেন না, আমার মতন হয়ে যাবেন। কেন এখানে আসেন না? কিই বা দিতে পারি, তাও নয়।'

'একমাত্র এখানেই আসতে ইচ্ছে করে। আপনি কী দিতে পারেন। সে যাক। কিন্তু আসা উচিৎ নয়।'

'লোকে কী ভাববে? আপনাকে ত' সকলেই চেনে।'

'আচ্ছা, এবার থেকে সময় পেলেই আসব।'

'আসবেন নিশ্চয়, কিন্তু আমাকে গান শেখাবেন না।'

'কেন? গান গাইতে পারি না হয়ত, কিন্তু হয়ত শেখাতে পারি কিছু কিছু।'

'খুব পারেন আমার বিশ্বাস. তবু শেখাবেন না।'

'তবে কেন শেখাব না বলতেই হবে।'

'গান সকলে ভালবাসেন না।'

'ওঃ বুঝেছি।'

'আদর্শবাদ, কর্তব্যজ্ঞান, সংযম, বন্ধুবাৎসল্য প্রভৃতি কুসংস্কারগুলো কেমন তোমার বন্ধুর মনকে আচ্ছন্ন করেছে বুঝলে? ঐ ছোট্ট "ওঃ বুঝেছি" কথাটা বড় গভীর।'

'সবই বুঝলাম। আমার মনে হয় দুজনই এক ছাঁচে ঢালা, অবস্থা ভিন্ন হলে কী হয়? দুজনেই কল্পনাপ্রিয় ও ভাববিলাসী, দুজনেই silly ও sentimental।'

'এই সাংসারিক বুদ্ধির জন্যই তোমাকে খাতির করি। আজ যদি সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে রসজ্ঞান না থেকে সামান্য সাংসারিক বুদ্ধিটুকুও থাকত, তাহলে সমালোচনা অত জোলো হত না। এবার অন্য একটা ঘটনা বলি

শোন। এ ঘটনা ঘটে তোমার অনুপস্থিতিতে। তুমি ডিহিরীতে না কোথায় ধর চুন আনতে যাচ্ছিলে, যাবার মুখে, যখন তোমার স্ত্রী গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, তখন ধর তুমি ঠাট্টা করে ব'ল্লে, "যাত্রার পূর্বে বন্ধ্যার মুখ দেখলে অমঙ্গল হয়।"

'আমি এ ধরনের ঠাট্টা করতেই পারি না।'

'আলবৎ করতে পার। এইটাই ত ঘরজামাই-এর প্রতিশোধ! শোন। তুমি ত' ভাই চলে গেলে, তারপর তোমার স্ত্রীর সামনে দুটি পথ খোলা রইল। একটি গোঁসা ঘরের দিকে, অন্যটি নিরুদ্দেশে, তোমার বন্ধুর সঙ্গে ভেসে পড়া। কোন পথে পাঠাই ঠিক ক'রতে পারছি না।'

'গোঁসা ঘরেই পাঠাও হে।'

'ভালই বলেছ। রাস্তায় দাঁড়ানটা মুখোরোচক হলেও তোমার বন্ধুর চরিত্রের সঙ্গে অন্তত খাপ খায় না। তার কর্তব্য-জ্ঞানে ও অন্যান্য কুসংস্কারে বাধে।'

'গোঁসা-ঘরে কি হল?'

'বিষ-ভক্ষণ। বন্ধু খবর পেয়েই ছুটে এলেন। ব্যাপার বেশি কিছু নয়, গোটা আষ্টেক জেনাস্‌পিরিনের বড়ি খেয়েছেন, বুক ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে অজ্ঞান হয়েছেন। খানিক পরে জ্ঞান হল। সারাদিন তোমার বাড়িতে বন্ধু রইলেন, সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারে তাঁকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন, রাত্রে পাশের ঘরে শোবার বন্দোবস্ত হল। অনেক রাত পর্যন্ত কারুর ঘুম আসে না, দুজনে চুপ করে সামনা সামনি বৈঠকখানায় বসে রইলেন। শুতে যাবার সময় বন্ধু তোমার স্ত্রীকে বল্লেন, 'প্রতিজ্ঞা করুন, এ ভীষণ কাজ আর করবেন না। যদি প্রতিজ্ঞা করেন, শপথ ক'রে বলেন 'করবেন না', তবেই আমি শোব, তবেই আমি ওকে ব'লব না, তবেই আমি আপনাদের বাড়ি আসব, নচেৎ আমিও প্রতিজ্ঞা করলুম— আর কখ্‌খনো আসব না।'

'আচ্ছা বলছি, চেষ্টা করব, খুব চেষ্টা করব, কিন্তু কতদূর পারব ব'লতে পারি না। আপনি না এলে আমি—'

'না এলে আপনি কি··· ?'

'আমার ভাল লাগবে না, আমি বাঁচব না। ও আমাকে যা অপমান করেছে, আপনিই শুধু···আপনার জন্যই শুধু···'

'এরপর তোমার বন্ধুর কী অবস্থা হল বুঝতেই পার।'

'কি আবার হল! ও কথা শুনলে আমি স্থির থাকতে পারতাম না।'

'তোমার বন্ধুও স্থির থাকতে পারলেন যে তা নয়। তবে তিনি তোমার

মত কর্মবীর নন, তাই রাতে ঘুম হলো না— শুধু এই চাঞ্চল্যটুকু তাঁর হলো। বন্ধু পরিষ্কার বুঝলেন যে তোমার স্ত্রী তাঁকে ভালবাসেন। যেই বোঝা, অমনি তাঁহার মনেও প্রেম উপজিল। প্রতিদানের কর্তব্য-বোধটা, অতি শীঘ্রই, সমগ্র নারীজাতির প্রতি অনুকম্পার সঙ্গে মিশে, একটা খুব উঁচু ধরনের প্রেমে পরিণত হল। সাধারণত, বিদেশী সাহিত্যে এ রকম উন্নত প্রেমের বিবরণ পাওয়াই যায় না, কিন্তু বাংলাদেশে এর চলতি ও কাটতি দুইই খুব স্বাভাবিক। কোন স্ত্রীলোককে এই ভাবে দেখায় সুবিধে কত ভাব। এর মধ্যে আমাদের মজ্জাগত আদর্শবাদের ক্রীড়া চলতে পারে, স্ত্রীজাতিকে নির্যাতনের বিষয়বস্তু ভেবে মন্ত্রের জোরে সাপের বিষের মতো দেহের ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে— ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এই অ-বাস্তব ও অ-পার্থিব, অর্থাৎ স্বর্গীয় প্রেমের মধ্যে নভেল নাটকের মূল তথ্য, কিনা দ্বন্দ্ব, বইল না ভেবো না। দ্বন্দ্ব তুললে কর্তব্যবোধ ও বন্ধুবাৎসল্য। যদিও তুমি লোকটি সুবিধেব নও, তবুও তোমাকে বন্ধু বলে একবার যখন গ্রহণ করা হয়েছে, তখন তোমাব স্ত্রীকে নিযে কেলেঙ্কারি ক'রে কিছু তোমার 'সেবার ত্রুটি' ঘটান যায না। তা হলে, logically, তোমার বন্ধুর সামনে মাত্র দুটি উপায খোলা রয়েছে। (১) নিজেকে সরিয়ে নেওয়া— সেটা কী ক'বে সম্ভব বল ? বন্ধুর ভাগ্যে প্রেম কখনও হযনি, একবার ভগবানের কৃপায যদি বা সিকে ছিঁডল, তখন অতবড অভিজ্ঞতাকে সে কী ক'রে পাযে ঠেলে দেয তুমিই বল ? হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে জন্মে ঐ ধবনের আদিরসাত্মক অভিজ্ঞতার ওপর প্রত্যেক যুবকেব একটা ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, জীবনেব আহ্বান। তুমি বলবে, অন্যায, আমিও তাই বলি। কিন্তু তোমার বন্ধুর বেলা সেই অন্যায প্রবৃত্তি সংযত হ'ল, যা হওয়া উচিত। হিন্দুসমাজের বন্ধন শিথিল হলেও তোমাব বন্ধুব মনে সামাজিক কর্তব্য-জ্ঞান তখনও লুপ্ত হযনি। সেইজন্য, logically ও morally (২) বন্ধুব পক্ষে দ্বিতীয উপায হল তোমার স্ত্রীর মনকে সরিযে নিতে তাঁকেই শিক্ষা দেওয়া, তাঁকেই সংযত হতে অনুরোধ করা।'

'আচ্ছা, এইটা শেখাতে কষ্ট পেতে হযেছিল বন্ধুকে ?'

'বন্ধুর স্বরূপই হল সংযম জানি। স্বরূপ প্রকাশে আর্টিস্টের হযত কষ্ট হয না। তাও বোধ হয, হয। তোমাব বন্ধুটি আর্টিস্ট না হলেও আর্টিস্টিক্ ছিলেন ত' বটে। না হে না, গম্ভীর হযে বলছি, খুবই কষ্ট পেতে হযেছিল। সে কষ্টের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তোমাকে শোনাব। দেখ, স্ত্রীলোকদের মস্তিষ্কটা অনেকটা অধ্যাপকদের মতন। সেখানে সহজে কোন আইডিযা প্রবেশ করে না, কিন্তু "ত্যজ আশা প্রবেশি এ দ্বারে", একবার প্রবেশ ক'রলে আর তাডান যায না।

অনেকটা প্যারিসের শান্তিসভায় লয়েড জর্জ-উইলসনের সম্বাদের মতন ঘটল। তোমার প্রতি কর্তব্য ও বাৎসল্যের তাগিদে বন্ধু একচাল চাললে। সে তোমার মাহাত্ম্য-কীর্তন শুরু ক'রল। সকাল সন্ধ্যে সেই এক ধুয়ো তোমার স্ত্রীর কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'রতে লাগল— তোমার মতন দৃঢ়চেতা, কর্মবীর এ জগতে দুর্লভ, তোমার চরিত্র হয়ত মার্জিত নয়, তাঁর পছন্দসই নয়, নিশ্চয়ই নয়, হ'তে পারেই না, কিন্তু তোমার চরিত্র এই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নিতান্ত উপযুক্ত। একজন জার্মান পণ্ডিত বলেছেন— সভ্যতা সম্বন্ধে জার্মানদের মতই সবচেয়ে সারবান— এ জগতের নায়ক ও আদর্শ পুরুষ হল মোটর-চালক, অর্থাৎ সোফেয়ারের মতনই কর্মতৎপর। যেকালে তিনি বিংশ শতাব্দীর মেয়ে, তখন এই যুগের নায়ককেই তাঁকে স্বীকার করতে হবে।' এ যুক্তিতে কিছু কাজ হল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ হল না। তখন তোমার স্ত্রীকে তোমার বন্ধু নিবেদন করলেন, এই যান্ত্রিক-সভ্যতাকে যদি আপনি প্রাণবন্ত না করেন, কে করবে? এ যুগের একমাত্র আশা আপনারা। আপনাদেরই স্নেহ, মমতা, করুণা, প্রেম, নিঃস্বার্থপরতাই এ ধ্বংসোন্মুখী সভ্যতাকে বাঁচাতে পারে। আপনাকে কল্পনা ক'রেই রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী লেখেন। আপনিই নন্দিনী।' এই তুলনামূলক যুক্তি পূর্বের যুক্তির অপেক্ষা প্রাণস্পর্শী হলেও তাঁর হৃদয়াবেগকে রহিত করতে পারলে না। নন্দিনী নামটি শুনে যখন চোখে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল তখনই তোমার বন্ধু উপলব্ধি করলে যে যখন ঘোড়া উদ্দাম গতিতে ছুটতে চাইছে, তখন লাগাম ঢিল দেওয়াই ভাল। তাই দৈবদুর্বিপাকে সে বাধ্য হল স্বীকার করতে যে সেও ভালবাসে। এই স্বীকারোক্তিতে আশু ফললাভ হল। খবরটি শুনে তোমার স্ত্রী গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন, চোখের জল আর পড়ে না। বন্ধু তখন ব'লে যেতে লাগলেন— সে অনেক কথা, যে সব নভেল পড় তাইতে অনেক পাবে।'

'কিন্তু—'

'তবে কিন্তু কেন?'

'কিন্তু এই জন্য যে, আমাদের দুজনকেই সংযত হতে হবে। আমিও চিরকাল ভালবাসব, আপনিও ভালবাসবেন, এই রবে চিরকাল! দুটো পাখি পাশাপাশি দুটো খাঁচার মধ্যে থেকে সার্থক হতে পারে না কি?'

'না আপনিই বনের পাখি, আমিই সোনার খাঁচায় থাকি। বেশ, তাই হোক, আপনি মুক্ত। আমার কপালে যা লেখা আছে তাই হোক, আপনি মুক্ত। আপনি আর আসবেন না।'

'না, আসব তবু! সেইজন্যই ত' আপনাকে দেবী মনে করে পুজো করি। আপনি মানুষ নন্, আপনি দেবী।'

'সমগ্র স্ত্রী জাতির প্রতিনিধি হয়ে, বিশ্ব-সভ্যতার উন্নতির ভার স্কন্ধে নিয়ে দেবীত্বের দায়িত্বে তোমার স্ত্রী ঠিক সপ্তম দিনের মাথায় খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন।'

'আমার স্ত্রীকে না ভালবেসে থাকতে পারছিনে যে হে! মোটে সাতদিনে ঠিক হয়ে গেলেন!'

'হাঁ মোটে সাত দিনেই। ধন্য আর্য ঋষিরা!'

'কিন্তু, কই সীতা সাবিত্রীর আদর্শ সামনে ধরলে না ত' ?'

'আজকাল ও ব্রহ্মাস্ত্র একটু ভোঁতা হয়ে পড়েছে।'

'সে যাক গে। যাতেই হোক সেরে ত' গেলেন, তারপর কি হল বল ?'

'সে তুমিই জান।'

'আমি কিছুই জানি না। সবই তোমার সৃষ্টি তুমিই বল।'

'তারপর, তোমার স্ত্রী তোমাকেই পূজা করতে আরম্ভ করলেন। সেবা আরম্ভ হল। আলমারি থেকে গরদের লালপেড়ে শাড়ি বেরোল। ফলে, পনের দিনেই তোমার ওজন-বৃদ্ধি ? তুমি প্রথমে একটু হতভম্ব হয়ে গেলে। স্ত্রীজাতির চরিত্র একটু খামখেয়ালি ধরনের জানা থাকলেও তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে। ঠিক সন্ধ্যার সময় তুমি আর বাড়ি আস না, তোমার আসতে রাত হতে লাগল। হাতের কাছে নিশ্চিতের সন্ধান পেলে এক তোমার বন্ধু ছাড়া অতি বড় সাধুও বিগড়ে যায়। আচ্ছা, তোমাকে একটু দুশ্চরিত্র করব ? গল্পটা জমে।'

'না, না, তা কোরো না। কী জানি, তুমি যদি ছাপিয়ে দাও। ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে হয়, কনট্র্যাক্ট পাব না।'

'সে ভয় নেই। বেশ, পূজা পেয়ে পেয়ে তোমার হৃদয় পূজারিণীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। সেই জন্যই হয়ত ডিহিরি কি কাট্‌নীতে চুনের পাহাড় দেখাতে নিয়ে গেলে! সেখানে থেকে তোমাদের দুজনেরই স্বাস্থ্যের উন্নতি হল।'

'যে দিন যুগলে ফিরে এলে সেইদিন সন্ধ্যাবেলা তোমার বন্ধু তোমার বাড়িতে হাজরে দিলেন। অনেকক্ষণ বাদে তুমি অফিস থেকে ফিরলে। তোমার স্ত্রী বৈঠকখানায় এলেন। তোমার বন্ধুর সঙ্গে তাঁকে গল্প করতে ব'লে তুমি ভেতরে গেলে। এ-ক'টা মিনিট কি awkwardly কাটল তা ভগবানই জানেন। শোন্ নদ কতটা চওড়া, চুন কি করে পোড়ান হয়, ও অঞ্চলে কি কি খাবার জিনিস পাওয়া যায় না, যেগুলি যায় তার দাম বেশি, রাতে বাঘ এসে গ্রামের গরু-বাছুর নিয়ে যায়— এসব কথা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চলে, কিন্তু একবার

যাদের মধ্যে প্রাণের কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছে তাদের মধ্যে একেবারেই অচল। তুমি যখন ঘরে এলে, তখন তোমার বন্ধু, একটু অনুযোগের স্বরে বল্লেন, 'বনে জঙ্গলে কেমন রইলে একবার খবর দিতেও পারতে ত? ও অঞ্চলটা কখনও দেখিনি, শুনেছি খুবই চমৎকার।' তুমি একটু কুণ্ঠিত হয়ে ব'ল্লে, 'আমারও ইচ্ছে হত, সময় পাইনি, ওঁরও সময় ছিল না, উনিও সারাদিন আমার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়াতেন।'

'ওঃ সেই জন্যেই বুঝি স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে!'

'তা ছাড়া— হ্যাঁগা, যাবার সময় তুমি আমাকে কী স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলে বলি?' তোমার স্ত্রী উঠে গেলেন। এমন সাহস হল না যে তোমার মুখের ওপর রাগ প্রকাশ করেন। তিনি চলে যাবার পর বন্ধুর পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে একটু নিচু স্বরে তুমি ব'ল্লে:

'ওঁর ভাই আমাকে নিয়ে একটু বাই হয়েছে। যাবার সময় একটা খাম টিকিট চিঠির কাগজ পর্যন্ত নিয়ে গেল না হে! ওখানে কিছুই পাওয়া যায় না, এত ক'রে বল্লাম! উত্তর দিলে, "আমরা দু'জন আলাদা থাকব, কেবল তুমি আর আমি, আমিও কাউকে লিখব না তুমিও লিখবে না। আর, কাউকে আসতে বলে হাঙ্গামা বাধিও না, ওখানে খাবার-দাবার পাওয়া যায় না।" আদৎ ব্যাপার, আমি যেন কাউকে চিঠি না লিখি, ওঁরই কাছে কাছে থাকি! এবোরে জোঁক হে জোঁক হয়ে উঠেছে! কতদিন এ খেয়াল থাকে দেখি! তবে সেখানে যেটা মন্দ ঠেকেনি, এখানে তা ঠেকবে না নিশ্চয়। এটা কাজের জগৎ। তুমি ভাই মাঝে মাঝে আগের মতনই এস। আমায় ত' খেটে খেতে হবে!'

'আচ্ছা, তখন তোমার বন্ধুর মনে কি হল বল ত?'

'সে আমি কি জানি? চল রাত হয়েছে!

'তোমার বন্ধুর মনে যে ভাব হল তারই আভাস পাবে রবি ঠাকুরের গানটিতে—'একদা তুমি প্রিয়ে।' চ'ল, আমার সংগত-সমালোচনা শেষ হল!'

প্রেমপত্র

'গল্প কখনও সত্য হয় ?'

'নিশ্চয়ই হয়. নচেৎ আমি কখনও প্রেমে পড়ি !'

'বল কি হে ? প্রেমে ত সকলেই পড়ে !'

'আমি ত আর সকলের একজন নই।'

'জানি তুমি অ-সাধারণ। শুনি এক অ-সাধারণ ব্যক্তির অ-সাধারণ গল্পটি।'

দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছিল। দু'জনেরই বয়স ত্রিশের ওপর। ঠোঁটের চাপে, চোখে দীপ্তিতে, চিবুক-চোয়ালের গঠনে পার্থক্য ধরা পড়ে। একজন বুদ্ধিমান, বুদ্ধির গর্বে গর্বিত। অন্যজন সাদাসিধে ভাল মানুষ। দু'জনে নদীর ধারে গিয়ে বসল।

'ছ্যাখ, অ-সাধারণ ব্যক্তির অভ্যাসই হচ্ছে যে সে নিতান্ত সাধারণ ঘর-পোষা লোকের কাছে তার অ-সাধারণত্বের বড়াই করে। যখন তার দলের অন্য ব্যক্তির বিদ্রূপে সে কর্ণপাতই করছে না, তখন দেখা যায় যে, তার নিম্ন-শ্রেণীর লোকের-ঠাট্টায় সে বিচলিত হচ্ছে। নেপোলিয়নের সর্বদাই ভয় হ'ত, প্যারিসের মেয়েলি আড্ডায়, বুল্‌ফার্দের কাফেতে তার সম্বন্ধে কে কী বলছে ! তোমাদের দেশের যে কোন বড় লোকের কথা স্মরণ ক'রতে পার, নজির পাবে। সেই জন্য আমার গল্প শুনে তুমি ঠাট্টা করলে আমি বিচলিত হব ! কিন্তু ঘটনাটি নিতান্তই সাধারণ হলেও ব্যাপারখানি সত্যই অ-সাধারণ ও অলৌকিক।'

'বল।'

'সে ছিল আমার খুব দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। আমার সঙ্গে সম্বন্ধও হয়েছিল— বিয়ে করি নি। এক বন্ধুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। হয় কেন ? আমিই ঘটকালি ক'রে দিয়ে দিই। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় Science Association-এর লেক্‌চার হলে। ছেলেটি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক—অর্থাৎ ইংরেজী না জানা, ইতিহাস মুখস্থ করবার ক্ষমতা এবং সংস্কৃত ঝামা অক্ষরের প্রতি প্রীতি না থাকার দরুনই যে সে বিজ্ঞান পড়ত তা নয়। তার নিজের মুখেই শুনেছিলাম যে সে ছেলেবেলা থেকেই লেন্‌স্ নিয়ে নাড়াচাড়া করত ! বাপের বউবাজারে একটা পাথুরে চশমার দোকান ছিল। সে যাই হোক, বিবাহ নির্বিঘ্নে হ'য়ে গেল। বন্ধু স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে পুরলেন। বছর খানেক কী দেড়েক পরে মেয়েটি এল বাপের বাড়িতে। কারণটি শুনলাম, সনাতন, সাধ-ভক্ষণ। মাস খানেক

পরে, এক গভীর রাতে মেয়েটির ভাই এসে ডাকাডাকি করল, কেদার দাশের বাড়ি যেতে হবে। ভীষণ বিপদ— শীতের রাত। যারা মূর্খ, যাদের স্বামী এমন মূর্খ তাদের সাহায্য করাই পাপ, তাদের মরাই উচিত। হঠাৎ মনে প'ড়ল, কেদার দাশের এক এসিস্ট্যান্টের ছেলে ত আমার বন্ধু— বুক কোম্পানিতে আলাপ—ছেলেটার বাপের পয়সা আছে, নূতন বই কেনে, পড়ে কিনা জানি না। মেয়েটির ভাইকে একটা চিঠি দিতে সম্মত হলাম। ছোকরা কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্লে, 'দাদা, তুমি চল, খুকি মর-মর, সবই করেছ, আর একটু উপকার না হয় করলে?' ও রকম কাকুতি করলে আমার আবার কেমন দুর্বলতা আসে। তাই গেলাম। সস্তার এক ডাক্তার ধ'রে নিয়ে এলাম। বাড়ি ঢুকতে যেন গাটা ছম্ ছম্ ক'রে উঠল, একটা গোঁঙানি কানে এল। ছিঃ, ugly শুধু নয়, একেবারে vulgar—। হাঁ, বুঝি Creative Evo'ution লেখা হচ্ছে, বার্গসনের গোঁঙানি বোঝা যায়। কিন্তু এ কী! জীব-জগতে সৃষ্টির মধ্যে সহজ ভাব কোথায়? সব বাধা-বিঘ্ন, impediments-কে consume করলেই, পুড়িয়ে ফেল্লেই ত' আলো শুভ্র হয়। যা সৃষ্টি হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ ত' জানাই আছে। সকালে শুনলাম একটা জড়পিণ্ড জন্মেছে, ও তখনি শিশুমৃত্যুর ক্রমবর্দ্ধমান হারকে শ্রদ্ধা জানিয়েই মারা গিয়েছে। জড়পিণ্ডের জড়-ভারতী মা'টি তখনও জীবিতা, প্রথামত খাবি খাচ্ছেন। উচ্ছন্ন যাক বাংলা দেশ! ভাগ্যিস একজন ডাক্তার এনে দিয়েছিলাম! ডাক্তারদেরকেও বিশ্বাস নেই। সেদিন দেখছিলাম, বিলেতে শতকরা যত মেয়ে আঁতুড় ঘরে মরে, অথচ যাঁদের মরা উচিত নয়, তাদের মধ্যে শতকরা ১৮ জন মরে ডাক্তারদের দোষে, আর শতকরা সেই সংখ্যাই মরে নিজেদের মূর্খতা ও অজ্ঞানতার দোষে। তা হ'লে ডাক্তারের বাহাদুরিটা কি? তবু আনলাম, এই যা।

কী জানি কেমন ক'রে নিজেকে দেখলাম আঁতুড়ঘরের দরজায়। বোধহয়, সৃষ্টিতত্ত্বের শেষ ফলটি দেখতে, সমালোচকের নেশাই তাই! ভাগ্যিস্ ঐতিহাসিক নই! গলা পর্যন্ত ঢাকা. ঘরের কোনে হাঁড়িতে গুলের আগুন টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলছে— ধোঁয়ার ব্যূহ ভেদ ক'রে কিছুই নজরে পড়ে না। নজরে পড়ল এক জোড়া চোখ। কী করুণ, গরুগুলো যেমনি ক'রে চায়, কী বড! আকাশ জুড়িয়া মেলিল তব আঁখি— চোখ দুটো বাডতে বাড়তে আকাশ ভরিয়ে দিলে — ঘোলাটে মেঘের সঙ্গে মিশে টিপ্ টিপ বৃষ্টি পডছে, চৌয়ান চাঁদের আলোর ম্রিয়মাণ মুমূর্ষু দীপ্তি যেন আত্মগোপন করতে চাইছে, একটা পথভ্রষ্ট বলাকা ডানার ঝাপটা দিতে দিতে করুণ আর্তনাদ ক'রে উড়ে গেল, তারই আওয়াজ যেন কানে এল।

—'এসেছ ?'

—'তার আর কী হয়েছে! এ-ধারে যে ঘর বিষে ভ'রে গেল, গুল্ ভাল পুড়ছে না, পিসীমা, হাঁড়িটা বাইরে নিয়ে যাও।'

'বোসো— মাথা ঘুরছে, কথা কইতে পারছি না।'

'একটু কেমিষ্ট্রি জানা ভাল, মেয়েদের রংটাও পরিষ্কার হয়, আত্মরক্ষাও হয়, সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যও দূর হয়, তোমার স্বামী আবার পদার্থ-বিজ্ঞানের অপদার্থ এম্. এস্-সি, বুঝি, খুড়ি!'

'কাল মরছিলাম, সে কী কষ্ট!'

'দু'দিন পরেই ভুলে যাবে, দিদি, কোন কষ্ট কী ভয় থাকবে না।'

ভাল লাগল না, চলে এলাম। সর্দা-বিলের সর্দা সাহেব মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে বড। আরো বড় হ'তে পারতেন, যদি সমাজ-রক্ষকের দল না থাকত।

তার পর রোজই যাই। মেয়েদের কী অসাধারণ সেরে ওঠবার ক্ষমতা! এক মাসের মধ্যেই উঠে হেঁটে বেড়াতে আরম্ভ করল। বেশ গোলগাল ধরন, রং গৌর নয়, তবে কেমিষ্ট্রির সাহায্য-ব্যতিরেকেও চামড়া পাৎলা ও মসৃণ, নাইবার সময় তুর্কী-তোয়ালের দরকার হয় না, চোখের পালক sea-gull-এর ডানার মতন, সে ডানা যেমন দেহের তুলনায় বড, তেমন বড চোখের পালকগুলো তার, চোখ ঢেকে ব'য়ে এসে গালের ওপর পড়েছে। স্বভাব মিষ্টি, চরিত্রে কিসের একটা সাম্য আছে, লোভের অভাবে বোধ হয়, চোখে, মনে কিসের একটা শান্তি আছে— অজ্ঞান তিমিরান্ধত্বের নিশ্চয়। লম্বা ধরনের ছিপ্‌ছিপে হ'লে Nausica-র মতন হ'তে পারত। মোটের ওপর মন্দ নয়— ঢের বেশি সুন্দর মেয়ে দেখেছি ওর চেয়ে। রোজ যেতে হয়, রোজই কথা কই। মাঝে মাঝে চাল ভাজা, মুড়ি খেতে ভালই লাগে। গেলে কী যে করবে ঠিক পায় না। কিন্তু হাঁটে আস্তে আস্তে, চিরকালই তাই। মনে ভাবেন হয়ত থিয়েটারের রানীর মতন হাঁটাই আদর্শ হাঁটা। তাও নয় বোধ হয়— জোরে হাঁটা শিক্ষায় বাধে! সংযম! কী যে সমাজের চাপ! কত বড় জগদ্দল পাথর বুকের ওপর চাপান রয়েছে! হৃদয়ের গোপুরমে সংস্কারের পাহাড়!

মেয়েটি দেখি একদিন এক মাসিক-পত্রিকা পড়ছেন। খাঁটি অভিজাত, কুলীন-সাহিত্য, এক সংখ্যায় তিন-তিনটি আই. সি. এসের লেখা ও গল্প। সাহিত্যের নামে শৌখিনত্বের, snobbishness-এর প্রকাশ! সেও ভাল। একটু আলোচনার পর দেখি কেমন একটা সরলভাবে রসগ্রহণের ক্ষমতা আছে। তাকে বুঝিয়ে দিলাম সরলভাবে রসগ্রহণ করার মূল্য নেই, আদৎ

কথা সমালোচনা-শক্তি, তাকে অর্জন করতে হয় বিলেতী বই পড়ে, মার্জন করতে হয় শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মুখে মতামত শুনে। আমি ভাল ভাল বই যোগাবার ভার নিলাম, মাঝে মাঝে শক্ত জায়গাগুলো বুঝিয়ে দিতাম; আর আমার মতামত ছাড়া আর কারুর মত শোনবার সুযোগ তার ছিল না। স্বামী তখন Comp.on effect নিয়ে ব্যস্ত— বেচারি সাহিত্যালোচনা কখনও করেনি। সে মাঝে মাঝে আসে আর জিজ্ঞাসা করে, 'দাদা যতীন সেনের কবিতা নাকি ভাল?' আমি কবির pessimism-এর ব্যাখ্যা করি। বলি, 'আমাদের বর্তমান সাহিত্যের অবস্থায় নতুন সুর বটে, কিন্তু দেশের ঐতিহ্য ও অন্যান্য অবস্থা দেখলে এই সুরই স্বাভাবিক মনে হয়! এতদিন বাজে নি কেন আশ্চর্য হই! আশ্চর্যান্বিত হবার ফলে হয়ত যতীন সেনের কবিতাকে একটু বড় ক'রে দেখি। অবশ্য লেখেন ভাল। আমি দুঃখরাগের অন্য রাগিণী শোনবার অপেক্ষায় ব'সে আছি'— ইত্যাদি। মেয়েটি গালে হাত দিয়ে, কখনও বাঁকা চোখে, কখনও পলক নামিয়ে শোনে— বুঝতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভুরু কোঁচকায় না। স্বামী নিজের মেসে চলে চায়। একটু আমার উপর কৃতজ্ঞ। কোন দিন সেখান থেকে জলখাবার খেয়ে আসি— নিজে হাতে তৈরি! রান্নার হাত মন্দ নয়।

তার পর মধ্যযুগ। সে যুগের শুধু করুণাটুকু, ঘোড়ায় চড়া কিংবা তলোয়ারে খেলা নয়। কেমন যেন আমেজ লাগে। আচ্ছা, মাথায় কী করুণা বাসা বাঁধে? মধ্যযুগের ধারণা ছিল— করুণার পীঠস্থান পেটে। বেশ চিঁড়ে ভাজা খাওয়া যেত, চা ভাল হ'ত না, অত তাড়াতাড়ি জল গরম হয় না, এক চুমুক খেয়ে রেখে দিতাম, পরে শিখে নিলে। ঘরের কাজ ছেড়ে আমার কাজই করে। ঘরের আর কাজই বা কি? সেবা-খাওয়ার মধ্যে একটা মধুর বিলাস আছে, প্রথম শরতের হাওয়ার মতন। অভ্যাসের বশে দাবি করবার প্রবৃত্তি এল। অবশ্য এ ভাবটা ঠিক মধ্যযুগের নয়, তখন প্রেম ছিল কর্তব্যজ্ঞান! আর দাবি করবই না বা কেন? আমি না করলে আর কেউ করবে। আমার ধর্মই তাই— তার ধর্মও তাই। কথাটা সন্দীপ বলতে পারত, নয়? কিন্তু সেও মক্ষিরাণী নয়, আর স্বামীটিও নিখিলেশ ছিলেন না। আমার দাবি করবার অধিকারকে সে কেমন নীরবে, বিনা ওজর আপত্তিতে, হাওয়া যেমন মানুষে টেনে নেয়, সেই রকম সহজে মেনে নিলে। একটু খারাপ লাগত, অত অম্লান-বদনে কেউ কিছু মেনে নিলে তাকে ভাল লাগতে পারে না, তাকে শুধু ব্যবহার করা যেতে পারে। হাজার হোক সে ত পরস্ত্রী, আর পরের ক্ষেতেই ঝাল খেতে ভাল! আমার নিজের মানসী-প্রতিমা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই—

কিন্তু পরের কী ধরনের হওয়া উচিত তা আমি জানি। পরস্ত্রী হবে যেন ধনুকের জ্যা, ছুঁলেই টং ক'রে বাজবে, চাবুকের মতন চট্‌পটে, লিক্‌লিকে—না হ'লে মনে হয় যেন বর্ষাকালে তিন দিনের বাসি মুড়ি খাচ্ছি, তাও আবার ঘি দিয়ে। কিন্তু তবু অত নির্বিবাদে আমার দাবি-গ্রহণ ও অত অকৃপণ ভাবে সে দাবি-পুরণ দেখে দেখে মনে সন্দেহ হ'ত লাগল। কেমন যেন নতুন নতুন ঠেকল। এই নতুনত্বের মোহই আমার চোখে ছানি টানলে।

মোহটা কী ধরনের জান? বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে, বর্ষাকাল শেষ হ'লে, আশ্বিন-কার্তিক মাসের ভোরবেলার miasma দেখেছ! রোম-সাম্রাজ্যের মতন দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্য গেল কাম্পানার কবলে—আমার stoicism কোন ছার! কিন্তু এর বিপক্ষে লড়াই করিনি, কি সাবধানী হইনি ভেবো না। চার-ধারের ডাঙা শুকনো রেখেছি, কোন মশাকে ডিম পাড়তে দিই নি, নিজেকে মশারির ভেতর রেখেছি, নিম-পাতা কুইনিন্ খেয়েছি—তবুও কোথা থেকে কামড়ে দিল, তাই মাঝে মাঝে হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে কাঁপুনি আসত। হৃদয়ের আবেষ্টন নীরস রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও, আকর্ষণের কোন সুবিধা ও কারণ না ঘটতে দিয়েও, নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেও, cynicism-এর আবরণ সত্ত্বেও, আমার সব পুরুষালি দাম্ভিকতাকে তার নীরব নারীত্ব ঠক ঠক ক'রে কাঁপিয়ে দিলে। কত কঠিন হয়েছি, কত বকেছি, কত নিষ্ঠুর, নির্মমভাবে অবহেলা করেছি—কিন্তু কই আমি ত— এই ত্যাখনা তোমার কাছে জীবনকাহিনী বলছি। আগে কখনও ভাবতে পারতে যে আমি তোমার সঙ্গে ব'সে এই ধরনের 'কাব্যি' করব?

একদিন তাকে দাবি ও অধিকারের ইতিহাস ও মর্ম বোঝাতে লাগলাম। আদিম যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কি ছিল কি হ'ল তারই ইতিহাস। সমাজতত্ত্ব মেয়েদের বোঝা উচিত। চুপ ক'রে শুনলে, মাঝে মাঝে বড় বড় চোখ ক'রে চায়, পালক ঝাঁপের মতন ওঠে পড়ে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলছে কিনা বোঝা যায় না। বুঝছে কিনা প্রমাণ পাই না। প্রশ্ন করে, 'দাবি-দাওয়ার ভাগবাটোয়ারা ক'রে কার কতটুকু রইল? যতটুকু রইল তা'তে যদি সুখ না হয়, ভাগ না ক'রে কেউ যদি শুধু দাবিই করে, আর কেউ দাবির অধিকার পুরোপুরি স্বীকার ক'রেই সুখ পায়, তা'তে ক্ষতি কি?' উত্তর দিই, 'মেয়েদের ও-ভাবে মেরী ও মার্থার খোঁয়াড়ে পুরতে পার— জানি না ঠিক— কিন্তু পুরুষ মানুষের স্বভাব ও শিক্ষা ভিন্ন। একই পুরুষ দিতেও জানে নিতেও জানে। তোমার কি মনে হয়?' 'কি জানি', বলেই ভাঁড়ার ঘরে চলে যায়। তর্ক সে কখনো করতে শেখে নি। সব শিক্ষা বৃথা হয়েছে, ভস্মে ঘি ঢালা

হয়েছে! সে কিছুই গ্রহণ করে নি। সে শুধু দিতে শিখেছে।

আর একদিন তার বাড়ি গিয়েছি। সপ্তাহ খানেক যেতে পারি নি। স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। আমি যেতেই বলে উঠল— যে লোক তিলের তেল আর নারকেল তেলের তফাৎ বোঝে না, তার বিজ্ঞান পড়ার মুখে ছাই! আমি আনতে বল্লাম গন্ধ তেল, আনা হ'ল বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল। আমি বল্লাম, 'বৈজ্ঞানিকের মতই কাজ করেছেন,ও সুগন্ধি তেলকে তোমার চুলের পক্ষে খারাপ ভাবে, তাই আনে নি।' 'আমার চুল কিসে ভাল হয়, আর কিসে খারাপ হয় আমি জানি, বৈজ্ঞানিক জানে না, এ ফেরৎ দিও, যা বলেছি কাল এনো।' বন্ধু একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে চলে গেল। তারপর আধঘণ্টা ধ'রে তাকে শ্যেন-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছি, কোন রকমের অনুশোচনার চিহ্ন পর্যন্ত নজরে পড়ে নি। সংযম বটে! হয়ত সংযমের কথাই নয়। তবে কি মেয়েদের স্বভাব অন্য ধরনের? কারুর কাছে দাবিই করে, যতটুকু না দিলে নয় তাই দেয়, দেবার সময় ঠকায়, যেন সবই দিচ্ছে, আবার কারুর দাবি মাথা পেতে গ্রহণ করে, দ্বিধা করে না, বুঝিয়ে দেয় আরও ভার সে সহ্য করতে পারে? প্রত্যেকেই multiple personality, সামান্য উত্তেজনাতেই dissociated হ'যে যায়। আগে ভাবতাম, লোক ঠকিয়ে খায়, তা নয়।

ঠিক এই সময়ে আমাকে বার্গসনে পেয়ে বসল। জীবনীশক্তি নাম শুনেই মনে হ'ল, তাই ত, সবই ত এরি কাজ, আমরা ত এরই হাতেব পুতুল! বুঝলাম, স্ত্রীজাতি এরি প্রধান এজেন্ট! লোকটার কী লেখবার ক্ষমতা! যা সন্দেহ ক'রে এসেছি তাই ঠিক ব'লে দেয়— এই না হ'লে লেখক। সামান্য সামান্য ঘটনায়— যার পারম্পর্য তুমি বার্গসন্ না পড়লে বুঝবে না— আমি প্রমাণ পেলাম যে আমি কোন শক্তি-প্রবাহের ঘূর্ণীতে পড়েছি— আমাকে ঘাড ধ'রে কোথায় নিযে যাচ্ছে, টানের জোরে নিজত্বটুকু হারিযে ফেলেছি। বুদ্ধিগড়া নিজত্বটুকু, অ্যালান পো-এর গল্পের ঘূর্ণীর মধ্যে নৌকোর মতনই, ভেঙে খান খান হ'য়ে গেল। আমি নিজেকে হারালাম। যেদিন বুঝলাম যে হাল আমার হাত থেকে খসে গিয়েছে, সেদিন আমার যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ এসেছিল বল্লে আশা করি, বিশ্বাস করবে। না, না, অত বিশ্বাস ক'রে অপমান করো না। কী কুক্ষণেই বার্গসন্ পড়ি!

জান বোধ হয় বার্গসনের শিষ্যবৃন্দ Syndicalist-রা, তাঁদের প্রধান কথা Direct Action। তাই একদিন তা'র দিকে সোজা চেয়ে বল্লাম— 'তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে।' চোখের পাতা নামিয়ে নিয়ে পায়ের আঙুলটা পর্যন্ত শাড়ির পাড় দিয়ে ঢেকে দিলে। বল্লাম, 'তা ভাল, পূব-পশ্চিমের তফাৎ অনেক'।

আমার দিকে মুখ তুলে চাইলে। কেমন বাধ-বাধ ঠেকল— আর কিছু বলতে পারলাম না। হঠাৎ উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ঘন গলায় বল্লাম, 'আর আমার এখানে আসা উচিত নয়।' কী বড় চোখ তার, কালো তারা, পালকগুলো যেন চীনে কালিতে ডোবান তুলির আঁশ। বুদ্ধির প্রভা তাতে নেই; শুধুই ভাল মানুষ, চোখ নিয়ে জন্মেছে, তাই চায়।

আবার গেলাম পরের দিনই। তাকে বল্লাম যে সে আমাকে আকর্ষণ করেছে, সে আকৃষ্ট হয়েছে কিনা প্রশ্নের হাঁ কি না সাফ্ উত্তর চাই, আমি আকৃষ্ট হয়েছি সে জানে কি না! নড়ে না, চড়ে না, নয়ন পাথার— নট্ নড়ন্ চড়ন্ ঠকাস্-মার্বেল। তা হ'লে জানাই ভাল— nothing like facing the issue— এই হ'ল নতুন মনোবিজ্ঞানের কথা। আমি তার হাত ধরতেই উঃ করে উঠল, হাতের নোয়া বেঁকে গিয়েছে। কথা কয় না, দাঁড়িযে শুধু কাঁপে। এ এক বিপদ। নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তার জুড়ি দেখি নি। হয়, নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা, না হয় প্রাণহীন, স্পন্দনহীন জডভারতী! 'কথা কও, কথা কও, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না,' বলতে চোখ তুলে চাইলে— তা'র পরই water works! ভাবলাম সুবিধা বটে, কেননা নীরবতা কান্নার সঙ্গে মিশলে স্বীকারোক্তি কেন চুক্তিপত্র পর্যন্ত রেজিস্ট্রি হ'যে যায়। হ'লও তাই।

তার পর, তার পর আর কি? সে আমাকে এক লম্বা চিঠি লিখলে। অমন লম্বা, অমন আবোল-তাবোল, অমন ভাবপ্রবণতার রসে ডোবান রসগোল্লা মার্কা চিঠি, অমন boring লেখা এক বাঙলা মাসিক পত্রিকা ছাডা অন্য কোথাও পড়িনি। উচ্ছ্বাস, কেবলই উচ্ছ্বাস, একটু ন্যাকামি মেশানো, রেডিওতে নতুন ঢঙের যেন গজল গান শুনছি। বিয়ের পর স্ত্রীকে পড়তে দেবো ভেবে চিঠিখানি অনেকদিন রেখে দিয়েছিলাম। সেদিন পুড়িয়ে ফেলেছি। চিঠির উত্তর দিই নি। বিকেলে যখন গেলাম তখন দেখে মনে হ'ল যেন সে ব্যক্তিই নয়। শুপারি কাটছে। এই শান্ত প্রকৃতির ঘরণী-গৃহিণীর মধ্যে এত উচ্ছ্বাস ছিল— আগ্নেয়গিরির বুকে ছাইয়ের মতন। যাই হোক, সে ছাই উড়ে আমার আকাশকে রঙিন করলে, কতদিন পর্যন্ত মনের আকাশে যে সূর্যাস্তের সময় সে ছাই রঙের ভিয়ান বসাত তাই ভেবে এখনও অবাক হই। স্মরণ আছে এখনও, না হ'লে তোমাকে গল্প বলি।

যখন জিজ্ঞাসা করলাম 'যা লিখেছ সব সত্যি,' সে জবাব দিলে 'হ্যাঁ সত্যি, সত্যির অর্দ্ধেকেরও কম।'

'আর বাকিটা? সব মিছে?'

'না, তাও সত্যি।'

'আমাকে অনেক দিন থেকে বাসতে পার, কিন্তু কত জন্ম ধরে বাসছ কি ক'রে জানলে ? জাতিস্মর ?'

'জানি।'

'বিজ্ঞানে জানে না। রাইডার হাগ্যার্ডের গল্পটা বলেছিলাম, মনে হয় না ত।'

'তবু জানি।'

পিকিঙ্ মুণ্ডের যুগে না হয় সে আমাকে ভালবাসতে পারত, তারও আগে ? বরফের যুগে ? তারও আগে ? পৃথিবী যখন আগুনে টগ্ বগ্ ক'রে ফুটত ? তারি বুকের জ্বালায় বোধ হয় !

'আমাকে দেখতে ভাল লাগে ?'

'হুঁ।'

'কেন ? সুন্দর ব'লে ?'

'জানি না।'

'জান বই কী ? অনেকেরই চেহারা আমার বয়সে আমার চেয়ে ভাল ছিল।'

'হয়ত ছিল।'

'চিরকাল দাসী হ'য়ে সেবা করবে ? তুমি কোন যুগের ? এটা বিংশ শতাব্দী জান ? বিলেতে মেয়েরা সমগ্র স্ত্রীজাতির অধিকারের জন্য জেলে পর্যন্ত যাচ্ছেন জান ? কতবার না বলেছি জেলে পর্যন্ত যেতে হবে তোমাদের ?'

'দাসীও হব, জেলেও যাবো।'

'সে কী ক'রে হয়, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে দু কাজ একত্রে সমাধা হ'য়ে গিয়েছে যে।'

'বিয়ে আমার হয় নি।'

এ কী কথা বলে ? সেই যে সাতপাক, সেই যে মধু দেওয়া, পিঠে পুতুল আঁকা, মন্ত্র পাঠ,—মন্ত্রের শক্তি, দেখছি, শুধু অনুকম্পা দেবীই বুঝেছেন ! সংস্কৃত মন্ত্রকে বাঙলায় তর্জমা না করলে চলে না দেখছি। 'বিবাহ তোমার হয়ে গিয়েছে।'

'না গো হয় নি।'

কোথা থেকে তার গলায় এত জোরে এল কে জানে ! পাথরের গায়ে কোঁদা অক্ষরের মতন প্রত্যেক অক্ষরটি স্থির, সুনিশ্চিত, কথার মধ্যে কোন জড়তা নেই, সন্দেহের দোলন কী কম্পন নেই, ভাবালুতার লেশ পর্যন্ত নেই। এ কী ক'রে হয় ?

'আমাকে ও ভাবে চিঠি লিখলে কেন? এতদিন কি ঐ শিক্ষা হ'ল? বাকি ছিল, প্রিয়তম, প্রাণেশ্বরটুকু, আরো বেশি বানান ভুল আর আর্টে শূন্য আসি তোমারই দাসী— বাদ পড়ল কেন?'

'তুমি আমাকে ব্যথা দিতে ভালবাস'।

'এই ত তরুণদের ভাষা জান! তবে কেন আত্মগোপন? ধরা দেবে না ব'লে? আমাকে খুঁজে নিতে হবে ব'লে?

'আচ্ছা আর কখনও লিখব না। তোমার সব শিক্ষা বিফল হয়েছে।'

'ঠিক বলেছ। ক্ষেত্র বোধ হয় উর্বর ছিল না।'

'আমি যে ও ছাড়া লিখতে জানি না।'

'এতে অবশ্য তোমার বেশি দোষ নেই। অন্য সাহিত্যে প্রেমপত্র সব ছাপা হয়: বড বড় প্রেমিকের, হয়ত তারা বডলোকই ছিল না। প্রেমপত্রের চযনিকা সস্তা দামে বিক্রি হয়, সেজন্য সে দেশের প্রেমপত্রের সাধারণ standard অত উঁচু। রবি বাবু ভানুসিংহের পত্রাবলী ছাপিয়েই ক্ষান্ত হলেন, তাই দেশের এই দুর্দশা, তুমি কী করবে!'

কিন্তু মনে তৃপ্তি পেলাম না। ও দেশের প্রেমপত্রও ত ঝোলাগুড, কোন দানা নেই, অথচ যারা লেখে তাদের চারিত্র্যের দৃঢ়তা ও কাজ করবার শক্তিও অদ্ভুত! তবে কী প্রেমে-নিবেদনের ভাষাই ঐ? তা হ'লে, সাহিত্যের ভাষা দুর্বল হ'লেও তার পিছনের ভাবটি সত্য হতে পারে? রূপ তা হ'লে কী? সেদিন এই সব প্রশ্নের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। উত্তর পাইনি। কিন্তু আমার অগোচরে একটি ধারণা আমাকে ধ'রে বসল যে হয়ত এই মেয়েটি সত্য কথা কয়েছে, কিন্তু ভাষার দোষে তার ভাবটি বিকৃত হয়েছে। একদল মনোবৈজ্ঞানিক বলেন ভাষা থেকেই ভাবের সৃষ্টি হয়। সে কথা বোধ হয় ঠিক নয়। জোর, ভাষার জোরে ভাবটি ভিন্নরূপে ধারণা করতে পারে, কিংবা বিকৃত হ'তে পারে। সে সত্য কথা বলেছে ধারণাটি যখন আমাকে ভূতের মতন পেয়ে বসল, তখন বুদ্ধির সব আগড় গেল ভেঙে। হলাম বার্গসনের গোঁড়া শিষ্য।

এই হ'ল আমার অ-সাধারণ গল্প। আমার মতন লোকের ছোটখাট মানসিক ঘটনাও অ-সাধারণ। যদি না বুঝে থাক, তা হ'লে স্বীকার কর যে, ferroconcrete-এর ভিতর দিয়ে অশ্বত্থ গাছের চারা জন্মাতে পারে। আমার বার্গসনে বিশ্বাস, আমার পক্ষে স্ত্রীলোককে শিক্ষিত করার প্রবৃত্তি, আমার পক্ষে romanticism-এর, হৃদয়-বৃত্তির দাবি মানা— এ সব যদি অ-সাধারণ ঘটনা না হয়, তা হ'লে আর কাকে অ-সাধারণ ঘটনা বলবে জানি না।'

বন্ধুটি বললেন— 'ও রকম খোশামোদ স্ত্রীলোকে করলে সকলেই বার্গসনের শিষ্য হ'তে পারে। তুমিই আদৎ silly, তোমার বুদ্ধিবাদ সব pose— চাল! মেয়েটি তার সহজ অনুভূতি দিয়ে তোমার pose expose করেছিল। তুমি একটি আস্ত বোকা, ধরতেই পারনি। অতি সহজেই মেয়েরা পুরুষের ফাঁকি ধরতে পারেন। মেয়েদের একটি বিশিষ্ট শক্তি আছে, যার জোরে—'

'যার জোরে তোমার বোকামি-মাখান কীর্তিকলাপ অবলীলাক্রমেই তোমার গৃহিণী ধরতে পারেন, কেমন? তোমার স্ত্রীজাতির ওপর যে রকম প্রগাঢ় বিশ্বাস তাতে তোমাকে যে-কোন আশ্রমেই পাঠালে চলে— খুব বড চ্যালা হবে হে! পরে মোহন্ত পর্যন্ত উঠতে পার। হয়ত তোমার ওপর অন্যায় করেছি। বার্নাড শ পডে বোধ হয় cynic হয়েছ— তাই ভাবছ মেয়েটি বোধ হয় অতিশয় চালাক ছিল। চল, ওঠা যাক্ আজ সন্ধ্যাটাই মাটি, তুমি যাও সত্যের সন্ধানে, আমি যাই স্বপ্নের রাজ্যে। বার্নাড শ পডোনা হে, যদিও পড, তাঁর গুরু বার্গসন পোডো না, বিপদে পডবে। আচ্ছা, যদি এই নিয়ে একটা গল্প লিখি তা হ'লে "বার্গসনের বাহাদুরি" নাম দিলে কী হয়?

'মন্দ হয় না, কিন্তু "Pose Exposed" নাম রাখলে আরো ভাল হয়।'

'একই কথা।'

রিয়ালিস্ট

প্রবাসের কোন একটি আড্ডায় আমরা কখনও কখনও সাহিত্য-আলোচনার বদলে সাহিত্য-রচনা করতাম। অবশ্য লিখে নয়, মুখে মুখে। আমাদের মধ্যে প্রবীণ রসিক পুরুষটি তিন চারটি সংজ্ঞা ঠিক করে দিতেন, তাদের আশ্রয় করেই গল্প পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি করতে হত। সেদিন ছিল আমার পালা— সংজ্ঞা ছিল রিয়ালিস্ট, যক্ষ্মা, হিংসা ও পলায়ন। ঠিক পর পর কী বলেছিলাম মনে নেই, তবে অনেকটা এই ধরনেরই স্মরণ হচ্ছে। মুখবন্ধ করেছিলাম এই প্রকারে।

যাঁরা গল্প রচনা করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রাণপণে প্রমাণ করতে চান যে গল্পটি গল্প নয়, নিছক সত্যি ঘটনা। তাঁদের চেষ্টা সফল হয় না, যদি বা হয় তা হলে সত্য ঘটনার বিবৃতি, অর্থাৎ ইতিহাসের মতনই গল্পটি নীরস হয়ে পডে। তার চেয়ে গোড়াতেই স্বীকার করা ভাল যে এই গল্পটি কাল্পনিক এবং অস্বাভাবিক ঘটনারই সমাবেশ। যা বরাত দিয়েছেন তাতে মামুলি গল্প চলে

না। পৃথিবীতে রিয়ালিস্ট বলে কোন মানুষ নেই, হতে পারে না, শুধু হতে চেষ্টা করে। অথচ এই অদ্ভুত জীবকে কেন্দ্র করেই আমাকে ঘুরতে হবে। অতএব আমার রচনার মধ্যে যে রস পাবেন, যদি কোন রস সৃষ্টি করতে পারি, সেটি জ্যামিতির কিংবা দাবা খেলার, ইতিহাসের নয়ই, একাধিক ভুজের যুগপৎ বা সমকালিক সমীকরণ রীতিমত শক্ত কাজ। রিয়ালিস্টের সংজ্ঞা গোড়াতেই ঠিক করলাম না, রিয়ালিস্ট বলতে কী বুঝি কী না বুঝি গল্পের মধ্যেই তার আভাস পাবেন। আর একটি কথা বলে রাখি, সাহিত্যের কিংবা দর্শনের রিয়ালিজম্ ব্যাখ্যা করা আমার কাজ নয়। একজন রিয়ালিস্টকে ফোটাতে হবে, যক্ষ্মা রোগ হিংসা ও পলায়নের সাহায্যে।

ক-বাবুর স্ত্রীর যক্ষ্মা হয়েছিল। কোলকাতার কোবরেজেও যখন লোভ-সংবরণ করে বায়ু-পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন তখন কর্তব্য পালন ও শেষ রক্ষার জন্য তাঁকে ভাওয়ালিতে নিয়ে যেতে হল। সেখানে অসুখ বেড়েই চলল। নিতান্তই বাড়াবাড়ি হবার যখন উপক্রম হল তখন স্যানিটেরিয়মের সুনাম-রক্ষার জন্য রোগীশুদ্ধ ক-বাবু গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে একজন ফিরিঙ্গী নার্স বেরিলি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে রাজী হল। ক-বাবুর স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল না যে নার্সটি আসে। বিস্তর কারণ দেখালেন, প্রধান কারণ খরচ কিন্তু মেয়েদের প্রধান কারণেরও পিতামহী কারণ থাকতে পারে— তার নাম স্ত্রী-সুলভ হিংসা। নার্সের রং ক-বাবুর স্ত্রীর রংএর চেয়ে উজ্জ্বল ছিল। রোগের জন্য ক-বাবুর স্ত্রীর মুখে লালচে আভা এসেছিল বটে, কিন্তু হাতের রঙের কোন উন্নতি হয় নি। কিন্তু সেবার নামে, ভালবাসার খাতিরে ক-বাবু প্রধান কারণটি হেসে উড়িয়ে দিলেন। বেরিলি থেকে নার্সকে ফেরৎ দেবার সদুদ্দেশ্য তাঁর ছিল বটে, কিন্তু রোগী স্টেশনে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্যসাধনে ব্যাঘাত ঘটল, এবং নার্সশুদ্ধ রোগীকে এক বন্ধুর বাড়িতে ক-বাবুকে নিয়ে যেতে হল।

বন্ধু পুরাতন, বিপত্নীক এবং অবস্থাপন্ন। বহুদিন বাংলা দেশ ত্যাগ করার জন্য ছোঁয়াচে রোগ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অর্থাৎ ভয় ছিল স্বল্প, স্বাস্থ্য ছিল অটুট এবং সাহস ছিল বুকভরা। ফলে সৌজন্যরক্ষা করতে তাঁকে বেগ পেতে হল না। বাড়িতে ছেলেপুলে নেই। অতিথির জন্য তিনটি খালি ঘর দেওয়া হল, একটি ক-বাবুর, একটি রোগীর, ছোটটি নার্সের। ক-বাবুর ঘর এক কোনে, রোগীর ঘরের উল্টোদিকে। তা ছাড়া ক-বাবুর স্বাস্থ্যবিজ্ঞান জানা ছিল, তাই রোগীর ঘরে যেতেন না। রোগ ও রোগীর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু কিন্তু ক-বাবুর স্ত্রী জানতেন না। তাঁর ধারণা ছিল যে তাঁর স্বামী সুদীর্ঘ অবসরে গৌরবর্ণা মহিলাটির ধ্যান করেন, মধ্যে মধ্যে সঙ্গ উপভোগও করেন। ধারণাটি

কোন সময়েই সুস্পষ্ট বাক্যে রূপায়িত হত না, কিন্তু আচার ব্যবহারে কখনও কখনও প্রকাশ হয়ে পড়ত। সাধারণ লোকে যা দেখত শুনত ও বুঝত সেটি ক-বাবুর স্ত্রীর যন্ত্রণা সহ্য করবার অদ্ভুত ক্ষমতা, স্বামীকে বাইরে বাইরে থাকার ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ ও পতিময় আদর্শ রমণীর সংযম ও স্বার্থত্যাগ। ক-বাবু কিন্তু সাধারণের একজন ছিলেন না। তাঁর মতে তাঁর স্ত্রীর মাহাত্ম্য জেলেনীর মাহাত্ম্যের অনুরূপ, অর্থাৎ মাছকে ডাঙায় তোলার আগে নাকে সুতো বেঁধে জলে অবাধে বিচরণ করবার সুযোগ দেওয়ার মতন খানিকটা। ক-বাবুর মনোভাবের কোন হেতু ছিল না যে তা নয়। তাঁর চরিত্রের কোন দোষ বন্ধুরাও লক্ষ করেন নি। তিনি ক্ষমাশীল ছিলেন, এতকাল একত্র ঘর করার পরও স্ত্রী স্বামীকে বুঝতে পারেননি বলে তিনি স্ত্রীকে দোষ দিতেন না। স্ত্রীজাতির মা মাসি পিসি, মাতামহী, পিতামহী, বড়বোন, এমন কী শ্বশুর বাড়ির শাশুড়ি ননদ ভাজ সকলেই শিক্ষা দিয়ে এসেছেন যে ভাল-বাসার অর্থ ই হল স্বামীকে সন্দেহ করা—সমাজের প্রথাই হল তাই। যে স্ত্রী স্বামীকে সন্দেহ করে না তার নিজের কোনও স্বার্থ আছে, অর্থাৎ সে নিজে সতী নয়— এই হল সামাজিক শিক্ষাদীক্ষা ও প্রথার ইঙ্গিত। সন্দেহকে, হিংসাকে গুণে পরিণত করাই হল সামাজিক স্ত্রীশিক্ষার গুণ-নির্দেশ। একটিমাত্র স্ত্রীলোক সমগ্র সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জয়ী হতে পারে না। তাই ক-বাবু স্ত্রীর ওপর কখনও রাগ করেন নি। তাঁর স্থির— ও জ্ঞানের দ্বারা মার্জিত বুদ্ধির কাছে সামাজিক ও মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কার্য-কারণ সম্বন্ধ গুপ্ত ও অবোধ্য থাকত না।

ক-বাবু কিন্তু অধ্যাপকদের ধরনে জ্ঞানী ছিলেন না। ব্যবহারের দ্বারা তিনি জ্ঞানকে যাচাই করতেন। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে স্ত্রীর প্রতি তাঁর ব্যবহার অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকারান্তরিত হল। মুমূর্ষু স্ত্রীর সন্তোষবিধানের জন্য তিনি মতামত কিছু পরিবর্তিত করলেন। শুরু করলেন ফিরিঙ্গী জাতটার নিন্দা থেকে, তারপর নার্স শ্রেণীর, শেষ হল ঘোমটা খোলা, জুতোপরা, পাউডার ও ঠোঁটে সিঁদুর মাখার পাপেতে। এ প্রকার আলোচনায় ক-বাবুর স্ত্রী বরাবরই ক-বাবুর প্রকৃত সহধর্মিনী ছিলেন। বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই দুজনের ভেতর একটি চমৎকার শ্রমবিভাগ হয়ে গিয়েছিল। যদি কোন স্ত্রীলোক আধুনিক ভাবাপন্না হয়ে বয়ঃক্রম নির্বিশেষে কোন পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন তা হলে সেই মহিলার ওপর ক-বাবুর স্ত্রী খড়্গহস্তা হতেন, আর যদি কোন পুরুষ তার স্বভাবেরই দোষে কোন মহিলার প্রতি তিলমাত্র অসংযত ব্যবহার করছেন সন্দেহ হত তা হলে ক-বাবু স্ত্রীর কাছে থেকে খড়্গটি

ধার নিয়ে সেই পুরুষের ওপর তাকে নিষ্ঠুরভাবে চালাতে কুণ্ঠিত হতেন না। অবশ্য অস্ত্রোপচারে সকলে সিদ্ধহস্ত হতেই পারে না। খাঁড়া স্ত্রীর হস্তে ছুরি হয়ে উঠত, ক-বাবুর হস্তে খাঁড়াই থাকত, কারণ ক-বাবুর ছিল বিদ্যার ওজন, আর তাঁর স্ত্রীর ছিল সহজবুদ্ধি ও পুরাতন শিক্ষার দক্ষতা। সমধর্মী হয়েও কিন্তু ক-বাবু তাঁর স্ত্রীর অবিশ্বাস ঘোচাতে পারেন নি। ভগবানের নাম নিয়েছেন, মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করেছেন যে তিনি শঙ্করের মতই অ-দ্বৈতবাদী, তবু সমর্থ হন নি। ক-বাবুকে তাঁর স্ত্রী দেবতার মতনই শ্রদ্ধা করতেন, চিরুনির ওপর "পতি পরম গুরু" লেখারূপ বৈদ্যুতিক ইঙ্গিত চুলের ভেতর দিয়ে তাঁর মস্তিষ্কে প্রবাহিত হত বটে, কিন্তু জুতো না পরার জন্যই বোধ হয় সেখানে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পেত না, অতি শীঘ্রই ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে মিশিয়ে যেত। তিনি বলতেন, 'তোমার দোষ দিই না, তুমিই বলেছ পুরুষ-জাতিকে বিশ্বাস করতে নেই, তুমি দেবতা, কিন্তু তুমি যে পুরুষ মানুষ।' ক-বাবু মুখের ওপর উত্তর দেওয়া ভালবাসতেন না, মুখের ওপর পুরুষজনোচিত অন্য কর্তব্য পালন করতেন। অবশ্য রক্ত বেরোবার আগে পর্যন্ত, পরে প্রত্যুত্তরই দিতেন, তবে অতি মিষ্টভাবে।

বন্ধুগৃহে তাঁরা সত্যকারের যত্ন পেয়েছিলেন। আন্তরিকতার একাধিক উৎস ছিল। বন্ধুপত্নীর ভগ্নীর হৃদয়খানি থেকে স্নেহ-মন্দাকিনী সর্বদাই উৎসারিত হত। তিনি বিধবা. মাসিক পত্রিকার পাতায় বিধবার যা ছবি পাওয়া যায় তাঁর চেহারা ছিল অনেকটা সেই ধরনের— লীনা, দীনা, শীর্ণা প্রথামত যা হওয়া উচিত তাই। কিন্তু প্রথাবিগর্হিত কাজও দুএকটা তিনি করতেন, অথচ অশোভন ঠেকত না— যথা, দুহাতে দুগাছি করে চুড়ি পরা, নরুন পেড়ে ধুতি পরিধান, পান ভক্ষণ, সকাল বিকেল চা সেবন। ভাওয়ালিতে ক-বাবু পান খেতে পান নি, বেরিলিতে এসে পান খেয়ে বাঁচলেন, লক্ষ্ণৌ-এর পান, কোলকাতার কেয়া-খয়ের ও কাশীর মশলা। ক-বাবুর ধাতে ধাত এল। মনোরমা দেবী রোগীকে বৌদি সম্বোধন এবং নার্সের অপ্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করে রোগীর মন ও প্রাণ হরণ করলেন। যার যেটি দরকার তিনি ইঙ্গিতের অপেক্ষা না করে সেইটি নীরবে. ধীর ও শান্তভাবে, সকলের অলক্ষ্যে পূরণ করতে লাগলেন। নাইবার ঘরে গরম জল, শুখনো গরম তোয়ালে, দরজার গোড়ায় চটিটি থেকে আরম্ভ করে বিছানার মধ্যে গরম জলের ব্যাগ ও বোতল ইন্দ্রজালের মতন আপনা থেকে আসতে আরম্ভ হল। সবই যে কার কারসাজি ক-বাবুর বুঝতে দেরি হল না।

মনোরমা দেবীর ইতিহাস এই। অল্প বয়সেই তিনি বিধবা হন, শ্বশুরকুলে

কেউ না থাকার দরুণ তাঁর ভগ্নী তাঁকে নিজের কাছেই রাখেন। তাঁর অবর্তমানে মনোরমা দেবীই এখন বাড়ির গৃহিণী। এঁর প্রধান গুণ এই যে, এঁর চারধারেই নজর চলে। অল্পবয়সে মন্ত্র নিতে দেওয়া হয়নি বলে পূজা অর্চনা করেন না, সেবা করেন, অত্যন্ত সুচারুরূপে। বন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লেন, 'সত্যই দেবী। হিন্দু সমাজের কী অদ্ভুত গঠন! এই সমাজের মধ্যে একদল এমন স্বেচ্ছাসেবিকা তৈরি করা হয়েছে যার জন্য কোন খরচ নেই, অথচ সমাজের ভিত্তি পাকা ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কোশাকুশির কাল চলে গিয়েছে, মানুষের সেবাই এখনকার পূজা, নর হয়েছে নারায়ণ, বিশেষত দুঃস্থ আত্মীয়ের। আজ যদি বিধবাবিবাহ দেশে.প্রচলিত হয় তা হলে কুমারীদের দুর্দশা ছাড়া আমাদের মতন অবস্থার লোকের কী হবে ভেবে পাই না। মনোরমা আদর্শ হিন্দু বিধবা। কোন স্ত্রীলোকের ঐ রকম সেবা দেখলে ও সুখ্যাতি শুনলে সকলেরই মনে আগ্রহ হয় তাঁকে জানবার জন্য; সাধারণে আকৃষ্ট হয়, ক-বাবু মাত্র পর্যবেক্ষণশীল হলেন। মহিলাটিকে দেখলেই, তাঁর ধীর শান্ত নম্র গতিবিধি চোখে পড়লেই, তাঁর মিষ্ট কথাবার্তা শুনলেই ক-বাবুর মনে পড়ত মধ্যযুগের খৃস্টান মঠ-বাসিনীদের কথা। ক-বাবু তাঁর মুখের ম্লান হাসির আমেজটুকু পর্যন্ত অনুভব করলেন। তাঁর ঠোঁটের কোন দুটি টেপা ও আনত, যেন সেণ্ট গডেন্সের বিষাদ ও সিবিলের দুজ্ঞেয়তার ষড়যন্ত্রে। গিয়কণ্ডার মুখের হাসি ধরবার জন্য নেপথ্যে মৃদু সংগীতের আয়োজন ছিল গুজোব আছে। এই মহিলাটির মনের পর্দার আড়ালে সর্বদাই কী অশ্রুত করুণ সুরের ব্যঞ্জনা হয় জানবার জন্য ক-বাবুর ভীষণ কৌতূহল হল। তাঁর মনে হল মনোরমা দেবীর সবই গুপ্ত। রহস্যময়ী প্রহেলিকাকে বোঝবার জন্য তিনি ব্যগ্র হলেন। তিনি সর্বপ্রকারে তাঁকে ঈক্ষণ করতে লাগলেন। সুযোগও মিলল যথেষ্ট, বৈজ্ঞানিকের যেমন জোটে। যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতী তাদৃশী।

ইতিমধ্যে একদিন সান্ধ্যভ্রমণ থেকে ফিরে এসে ক-বাবু মনোরমা দেবীর মুখে শুনলেন যে নার্স তার কর্তব্যে বিশেষ অমনোযোগী হয়ে উঠেছে। সে রোজই সাজসজ্জা করে ঠিক ভর-সন্ধ্যায় কোথায় চলে যায়, ক-বাবুর ফেরবার কিছু আগেই সে ফিরে আসে। ক-বাবু ইতিপূর্বে একটু সন্দেহান্বিত হয়েছিলেন। রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউটের বাগানে তিনি একবার নার্সটিকে এক গোরার সঙ্গে দেখেছিলেন মনে হয়েছিল, কিন্তু কাউকে বলেন নি, তা ছাড়া বন্ধুটি একবার তাকে বায়োস্কোপে নিয়ে গিয়েছিলেন— ক-বাবুকে সেই সন্ধ্যায় রোগীর তদারক করতে হয়। মনোরমা দেবী আরও একটি খবর দিলেন যে ফিরিঙ্গী মহিলাটি তাঁর পান খাওয়া নিয়ে ভারতবাসী মহিলাদের অপমান

করেছে সেই দিনই ক-বাবু বুঝতে পারলেন যে নার্সের আর কোন প্রয়োজন নেই। পরদিন বিকেলের ট্রেনে নার্সকে ফেরৎ পাঠিয়ে যখন তিনি রোগীর ঘরে এলেন তখন তাঁর উজ্জ্বল মুখটি দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা হওয়া উচিত ছিল বটে, কিন্তু হল না। তাঁর ওপর ক-বাবুর কেমন যেন একটা ক্ষোভ, অভিমান, রাগ পর্যন্ত এল। যার প্রতি কোন রকমের টান ছিল না, টান থাকা অস্বাভাবিক ও অন্যায় তাকে নিয়ে সন্দেহ করা স্ত্রীর কখনও উচিত হয় নি। কোন মেয়েই তাঁকে কাবু করতে পারে না, তিনি না কতবার স্ত্রীকে বলেছেন ? তবু তাঁকে এ অবিশ্বাস ও অপমান! ঘরে ঢুকতেই রোগী তাঁর স্বামীকে বল্লেন, 'আজ আমার শরীরটা হালকা মনে হচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে একটু ঘুমুই, তোমরা দু'জনে একটু বাগানে বেড়াও না। গলায় মাফলারটা দিও, বারান্দায় চাকর ত থাকবেই, দরকার হলেই তোমাকে ডেকে পাঠাব।' সোয়াস্তিতে তিনি দাতা হয়ে উঠলেন দেখে ক-বাবুর মনে ঘৃণা এল।

কোন জোরাল প্রবৃত্তির বশে ভাবুক-হৃদয় দিশাহারা হয়। কিন্তু ক-বাবু কবি নন— ভাবুকও নন। তাঁর মতন লোকের প্রবৃত্তি যে থাকে না তা নয়, প্রবৃত্তি কর্মে নিযুক্ত হয় মাত্র। হৃদয়বৃত্তিগুলিকে এক বিশেষ কর্ম-প্রণালীতে প্রবাহিত না করাতে পারলে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। কিন্তু এ কাজে তাঁর দেরি হত না, সেই জন্য তাঁর সব ভাবই ক্ষণস্থায়ী হত, অনেকটা যোগীদের মতন। স্ত্রীর নির্দেশ মত তিনি বাগানে বেরিয়ে পড়লেন। মনোরমা দেবীর ইচ্ছা ছিল না, লজ্জা হচ্ছিল, কিন্তু কোন এক সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণ তাঁকেও বাগানের দিকে নিয়ে চলল। বেশ ফুল ফুটেছে, নানা রকমের গোলাপ। বেরিলিতে ছোটনাগপুর কিংবা লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের মতন অত বড় গোলাপ হয় না বটে, তবু বাংলা দেশের মরকুটে গোলাপের চেয়ে ঢের ভাল। দু' পাতার **Kitchner of Khartoum**, বড় বড় ডীন হোল, চুনে হলুদে লেডি হিলিংডন, মিশমিশে ব্ল্যাকপ্রিন্স, রাস্তার পাড়ে ফ্লক্‌স, কস্‌মস্‌, টবে ভরা ভারবিনা, কোনে হাইড্রাঞ্জিয়ার' ঝোপ। একপ্রান্তে বুগেনভিলিয়ার কুঞ্জ, ভেতরে পাথরের আসন। বাকিটা সবুজ লন। ক-বাবু পাথরের ওপর বসে পড়লেন, মনোরমা দেবী বাইরে দাঁড়িয়ে শুকনো গোলাপপাতা ও ফুল ছিঁড়তে চেষ্টা করছিলেন। ক-বাবু মালীকে গোলাপের কাঁচি আনতে হুকুম করলেন। কথাবার্তাব কোন তাগিদ ছিল না— শুধু ভদ্রতারক্ষার খাতিরে কথাবার্তা চলল।

ক: 'আপনাদের খুব কষ্ট দিচ্ছি, কবে সেরে উঠবেন বলতে পারেন ?'

মনোরমা খানিকক্ষণ নীরব থেকে জবাব দিলেন— 'কেন আপনি কী জানেন না ?'

'সবই জানি, কিন্তু স্পষ্ট করে জানতে চাইনা, ভয় হয়'— বাক্যটি ক-বাবুর মুখ থেকে যেন বেরিয়ে গেল। নিতান্ত সাধারণ মানুষেরই উপযুক্ত মন্তব্য, তাঁর নয়। মনোরমা একটু মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, 'স্পষ্ট করে জানাবার ভার কি আমার? আমি কী জানি বলুন? আমি মেয়ে মানুষ, আমি শুধু আশা দিতে পারি, সান্ত্বনা দিতে পারি।' 'বেশ, আপনাকে বলতে হবে না। প্রশ্ন করাটাই আমার ভুল হয়েছে। পুরুষ হবে রিয়ালিস্ট, সে জীবনকে ভয় করবে না অর্থাৎ মৃত্যুকে ভয় করবে না, অগ্রাহ্য করবে। সেই জন্য আমি ওঁর মৃত্যুর পর কী হবে সে পর্যন্ত ভাবতে চেষ্টা করব আজ থেকে— কেমন? আপনি সে চেষ্টায় আজ থেকেই সহাযতা করুন— কেমন? শুধু আশান্বিত করলে চলবে না, সান্ত্বনা ত মুখের কথা। এই শর্ত রইল— কেমন?'

ক-বাবু 'কেমন' শব্দটির মধ্যে এমন মধুর মীড় টেনেছিলেন যে তার প্রত্যুত্তরে মনোরমা দেবীকেও মীড় দিতে হল— 'না, অ—ত দূর ভাবতে হবে না।'

'নিশ্চযই ভাবতে হবে, আজ থেকেই, এখন থেকেই নচেৎ পুরুষ হযেছি কী জন্য?'

'যার যতটুকু কর্তব্য সে ততটুকু করবে, আমরা এই বুঝি।'

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, আপনি আমাকে কর্তব্যের পথ দেখিযে দিলেন। এক এক সময পুরুষ মানুষে কানা চামচিকের মতন ঘুরে বেড়ায, পথ খুঁজে পায না, জানালা খোলা থাকলেও। হঠাৎ পথ পেলাম, আজ থেকে আমি সহজে নিঃশ্বাস ফেলতে পারব। অনাগতের অনির্দেশে আমি মুহ্যমান হব না।'

কৃতজ্ঞচিত্তে ও লঘু পদবিক্ষেপে ক-বাবু বাগান থেকে চলে এলেন। আজ আবার নার্স নেই ব'লে মনোরমা দেবীও ফিরলেন। পাহাড়ে হাওযা দিচ্ছে, খুব কন্‌কনে হাওযা। ক-বাবু রোগীর ঘরে উঁকি মেরে দেখলেন রোগী অকাতরে ঘুমুচ্ছে— মুখে আঙুল দিয়ে মনোরমা দেবীকে প্রবেশ করতে মানা করলেন। মনোরমা দেবী অন্যত্র যাবার পর কিন্তু পা টিপে নিজেই ঘরে এলেন। রংটা মন্দ নয়, মুখটা বেশ ঢল্‌ঢলে—শুধু নাকটা উঁচু দেখাচ্ছে, চুলের বাহার যেন খুলেছে, আজ মনোরমা নিশ্চয়ই চুল বেঁধে দিয়েছে। নিজেই বেঁধেছে নাকি? বালিশের পাশেই পাউডার-পাফ্‌টা পড়ে রযেছে যে! টেবিল-ল্যাম্পের শেড্‌টা আলোটাকে মুখের ওপর সংগৃহীত করে রেখেছিল। শেড্ নড়ে উঠল, মুখের আলো বুকের ওপর পড়ল, একটি হাতের ওপর অন্য হাতটি রাখা, আঙুলে সেই আংটি, হাতের ওপর শিরা দড়া হযে উঠেছে, চুড়িগুলো ভারী ঢিলে হয়ে গিয়েছে, কনুইএর ওপর পর্যন্ত যেতে পারে, অথচ বিয়ের পর আঁট হত, একবার

খোলা যায় নি, সাবান দিয়ে খুলতে হয়। আলো আবার সরে গেল। তাই ত, দোর-জানালা খোলা রাখতে ডাক্তারে পরামর্শ দিতেন, কিন্তু কিছুতেই সহ্য হত না। যখনই খোলা রাখা হত, তার পরের দিন সকাল থেকেই কাশি বাড়ত, রক্ত উঠত, জ্বর বাড়ত। বাঙ্গালীর মেয়ে হাজার হোক; সাহেবী চিকিৎসারীতি ধাতে বসে না। ছাই ডাক্তারি শাস্ত্র! মেয়েরা শুধু ভুগতেই জানে, বিবাহের পর থেকেই ভুগতে আরম্ভ করে, বাপের বাড়ি থেকে রোগ সব জড় করে আসে, শ্বশুর বাড়িতে উজাড় করার জন্য। কে জানত! বিয়ের সময় বেশ ত নধরই ছিল! ও সব বর্ণচোরা চেহারা, ছেলেপুলে পর্যন্ত হল না, একবার সম্ভাবনা হয়েছিল বটে, কিন্তু সাত দিন বিছানায় শুয়ে থাকা ছাড়া কোন ধখল্ সহ্য করতে হয়নি। ধুত্তোর বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য! তবু বিজ্ঞানে বলছে জানালা খুলে রাখতে, খুলেই রাখা যাক। ঠাণ্ডা যদি লাগেই তা এর বেশি আর কী হবে? যদি বাঁচে তা হলে অভ্যাস করান চাই ত। শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। একটু উঠে বসতে পারলেই কোলকাতায় যেতেই হবে, দোর-জানালা খুলে রাখতেই হবে। হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, মনোরমা ত তাই বল্লে, কোলকাতা পর্যন্ত যেতেই হবে না, এইখানেই সব শেষ হয়ে যাবে। তাই যদি হয়, তা হলে বাঙ্গালীদের শ্মশান কত দূরে কে জানে? এই শীতের রাত্তিরে ক'জন বাঙ্গালী ঘাটে যাবে? ভাগ্যিস্ বন্ধু বাঙ্গালী ক্লাবের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট? যা হয় হবে। অত ভাবলে, অত ভয় করলে চলে না, যা ঘটবে তাকে আটকান যায় না। এই ত এত ওষুধ বিষুধ খাওয়ান গেল, কড়া ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছে। বেড়ালছানার মতন নাড়ানাড়ি, আজ এ যায়গায়, কাল ও যায়গায়, আজ সমুদ্রের হাওয়া, কাল পাহাড়ের, শেষে ত' অক্সিজেন সেবন করতেই হবে। বেচারি ইতিমধ্যে একটু মুক্ত হাওয়া খাক, ওষুধ থাকগে। কতদিন আর যমে মানুষে টানাটানি চলবে? হাজার হোক ধর্মরাজ ত! পুরুষে কিছু সাবিত্রীর স্বজাতি হতে পারে না, গোত্র পরিবর্তন মেয়েদেরই জন্যে। শতপুত্রের পিতা হবার সম্ভাবনাও ত নেই, বিশেষত এই দেশের দুরবস্থায়, আর ঐ মায়ের স্বাস্থ্যে, সে কী এক আঁচড়েই বোঝা গিয়েছে। মাত্র একটি হলেই চলত, তাও হতে পারবে না, ডাক্তারে বলেছে। দুই সন্তানের প্রয়োজন··· একটি সন্তান বড় একলসেঁড়ে হয়, বইএ আছে। কাদের ভাগ্যে ছেলে থাকে, কারুর থাকে না। নিয়তির বিপক্ষে লড়াই করে মূর্খে, নিয়তিকে মেনে তার সহায়তা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই যদি হয় তা হলে যে মারা যাবেই তাকে বাঁচিয়ে রাখবার বিফল প্রয়াস শক্তির অপচয়। শক্তির সঞ্চয় বিজ্ঞানের মূলকথা, ভাগ্যকে মেনে নেওয়াই সুখের চরম উপায়,

নিয়তিকে জানাই স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা। এইটুকু হল পুরুষের পুরুষকার। সেদিন ফরাসী দেশের এক মহিলা তার মুমূর্ষু পিতাকে গুলি করে মারলেন। ফরাসী জাতটাই বড়, ক্যানসারের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দেবার সদুদ্দেশ্য বুঝে ফরাসী আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস দিলে। সবরমতী আশ্রমে ঐ কারণে গো-হত্যা পর্যন্ত হয়ে গেল। ক্যানসার যা রাজযক্ষ্মাও তাই, আর গাভীর চেয়ে একটি মহিলার প্রাণের মূল্য বেশি স্বীকার করতেই হবে, লোকে যা বলে বলুক না কেন।

শিওরের ঐ জানলা দুটো, গায়ে লাগুক হাওয়া।
হায়রে ওষুধ ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলাম এজীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে।
বেঁচে থাকা সেই যেন এক রোগ,
কত রকম কবিরাজী ; কতই মুষ্টিযোগ,
একটুমাত্র অসাবধানেই, বিষম কর্মভোগ

—লাইন কয়টি কার? মুক্তির আস্বাদ আছে এতে।

মধুর ভবন, মধুর মরণ······দাও খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও
কালের পারাবার—

এই ত রোগীর প্রাণের অনুরোধ— সত্যকারের অনুরোধ। হঠাৎ একটা দমকা হাওযা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল, শেড্ নড়ে উঠল। নিজের চিন্তাধারায় ক-বাবু চকিত হয়ে চারধারে চাইলেন। দরজার পাশে মনোরমা দেবী দাঁড়িয়ে আছেন, রামেশ্বরমের মন্দিরের লম্বা করিডোরের শেষে অর্ধপ্রকাশিত স্মিতহাস্য-মুখী স্ত্রীমূর্তির মতন। সেই হাসিমাখা ঠোঁটের ওপর যেন স্বপ্নে কারুর নিঃশ্বাস পড়েছে,— প্রতীক্ষা-প্রস্ফুটিত কমল-কলি। বারান্দা থেকে ওভারকোট নিয়ে ক-বাবু বাইরে এলেন, সঙ্গে মনোরমা এল। রোগী ঘুমুচ্ছেন, দোর-জানালা খোলাই রইল, ওষুধ খাওয়ান হল না।

লনে এসে ক-বাবু হাতের ওভারকোটটি মনোরমা দেবীর কাঁধের ওপর রাখলেন। রাখলেন— আলগোছে নয়, কিন্তু যতটুকু সময় ও অংশ স্পর্শ করবার প্রয়োজন ছিল ক-বাবু তাই করেছিলেন, তার এক নিমেষ এক তিলও বেশি নয়। তাকে স্পর্শ করাই বলে না। বিশুদ্ধ ও সুরুচিমার্কা গল্পের নায়কও তার বেশি স্পর্শ ক'রে নিন্দনীয় হন না। কিন্তু তাইতেই দুজনের মধ্যে একটি প্রাণ-মণ্ডলী স্থাপিত হল, বিদ্যুৎগমনাগমনের ফলে যেমন একটি বৃত্ত স্থাপিত

হয়! অন্য তুলনার সাহায্যে বলা যায়, প্রেমের মোদ্দা কথা দানা বাঁধা। ওভারকোট পরানর স্পর্শেই ক-বাবুর ভাসমান ভাবনাগুলি দানা বেঁধে জমাট হল। ক-বাবু মনে জোর পেলেন, তাঁর লক্ষ্য স্থির হল। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বালবিধবাকে বিবাহ করা উচিত ও সঙ্গত।

একবার মনস্থির হয়ে গেলে ক-বাবু হাতের কাজ ফেলে রাখেন না। তাই তিনি মনোরমা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন—

'যদি কখনও সম্মতি চাই দেবে ত?' মনোরমা দেবী কিন্তু ঘাড় না নেড়ে শুধু বল্লেন— 'না।'

ক-বাবু একটু সামলে নিয়ে বল্লেন, 'একটু তাড়াতাড়ি হচ্ছে কি! আচ্ছা, না হয়, একটু জিরিয়ে নিন।' আবার সেই ম্লান হাসি। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিতে জবাব এল— 'আপনি বুদ্ধিমান, আপনাকে আমি কী বলব? আপনারা পুরুষ, আপনাদের ভেবে চিন্তে কাজ করা শোভা পায়, আমরা ঘটনার ক্রীতদাসী, আগে থাকতে কী বলব? কোথায় কখন কী হয় মেয়েরা কী বুঝতে পারে?' আপনি যা ভাল বুঝবেন, আপনি পুরুষ, তাই করবেন।'

উত্তর শুনে ক-বাবু একটু অধীর হলেন। অধীর হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, এতদিন পুরুষের কী ধর্ম, অর্থাৎ অধর্ম, কী কর্ম, অর্থাৎ কী অকর্ম শুনে শুনে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন— আবার সেই! কিন্তু ক-বাবু বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাই অতি সহজেই দুজনের উক্তি ও প্রকৃতির পার্থক্য বুঝে ফেললেন। তিনি বলতেন, পুরুষের স্বভাব বহির্মুখী, পরস্ত্রী অনুগামী, অর্থাৎ অবস্থার ক্রীতদাস, যদি অবস্থানের মধ্যে স্ত্রীলোক এসে পড়ে; আর ইনি বলছেন, পুরুষের কাজ, এঁর মুখে প্রকৃতি কথাটার তাই অর্থ, ভাগ্যকে নিজের হাতে তুলে নেওয়া। এইত প্রকৃত সহধর্মিনীর কথা— তা নয়, কেবল সন্দেহ আর হিংসে, হিংসে আর সন্দেহ। এ ধরনের মন্তব্য একমাত্র লেডি ম্যাকবেথই করতে পারতেন—তিনিই এ যুগের আদর্শ মহিলা— অর্থাৎ রিয়ালিস্টের যোগ্য স্ত্রী। লোকে যে কেন সীতা সাবিত্রীর নাম করে! সকলেই বোধ হয় চায় প্যান্‌পেনে মেয়ে। কিন্তু তার কী ভীষণ সুদই দিতে হয়। সারাজীবন সন্দেহের বিষয় হয়ে কাল কাটান। তার চেয়ে লেডি ম্যাকবেথ ঢের বড় চরিত্র, স্বামীর জন্যে খুন পর্যন্ত করলে। এই উচ্চ আদর্শের আকস্মিক আবির্ভাবে তিনি এক প্রকার মুহ্যমান হয়েই বলে ফেল্লেন, 'তুমিই আমার যোগ্য। এতদিন তোমার জন্যই প্রতীক্ষা করছিলাম। আমি ভাগ্যবান পুরুষ, ভাগ্যবানেরই যথার্থ সহধর্মিণী জোটে, যদিও দেরিতে।'

ঝুপ্ করে মনোরমা দেবী মাটিতে ভেঙে পড়লেন। দেহটা অসিত

হালদারের নমিতার মতন হয়ে পড়ল। ক-বাবু তাঁর উত্তমাঙ্গটি তুলে ধরলেন, যেমন চতুর্থ ভাগের শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর গলবস্ত্রমাথা পা থেকে তুলে ধরে। তাঁর চোখের পাতা বোজা, খানিক পরে চোখ খুলে গেল, দেহলতা কাঁপতে লাগল। ক-বাবু তাঁর হাত ধরে পাথরের ওপর নিয়ে বসালেন। দুজনেই চুপচাপ। ক-বাবুই মৌনতা ভাঙলেন— 'তা হলে, কথা রইল ত?'

'আচ্ছা।'

'তা হলে তুমি আমাকে 'তুমি বল।'

'সে আমি কিছুতেই পারব না। আগে শেষ বেশ হয়ে যাক, শুনতে পেলে তিনি শকেই মারা যাবেন। নাঃ নাঃ এখন থাক। ওঁর যা হিংসে?'

মনোরমার মুখে যে দুর্জ্ঞেয় হাসিটি আলগোছে ঠোঁটের ওপর ভাসত, আজ সেটি শব্দায়মান হল! ঝিলমের তীরে একটি বলাকার ডানার ঝাপটে যেমন সমগ্র বিশ্বের রহস্যময় বাণী রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যাখ্যাত হয়েছিল, আজ মনোরমা দেবীর ছোট্ট হিঁ হিঁ-তে সমগ্র স্ত্রীজাতির গোপন কথাটি যেন উন্মুক্ত হয়ে গেল। ক-বাবু চমকে উঠে দাঁড়ালেন, মনোরমা দেবী বল্লেন, 'আর নয়, চল তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।' এই প্রথম 'তুমি' শুনেও ক-বাবু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারলেন না। হাসির অর্থ তাঁকে ভাল ক'রে বুঝতেই হবে— হাসিটা অ-প্রস্তুতের না অতি প্রস্তুতের, করুণার না অনুকম্পার, রিয়ালিস্টের না সরলা অবলার, কৃপার না জয়ের। তিনি সোজাসুজি রোগীর ঘরেই গেলেন।

প্রবেশ করেই ক-বাবু বুঝলেন যে তাঁর মন বাস্তবের বহু পুর্বেই ছুটেছে। যাঁর সম্বন্ধে এতক্ষণ অতীতকাল প্রয়োগ করছিলেন, তিনি এখনও বর্তমানের কোলে নিদ্রিতা। বর্তমানের এই ধাক্কায় তাঁর মন বিকল হয়ে গেল। এই সুযোগে এক আদিম দুর্বলতা তাঁকে আশ্রয় করলে। তাকে করুণা কিংবা বাৎসল্য বল্লে ক-বাবুর প্রতি অবিচার করা হবে না। তিনি বিছানার শিয়রের জানালা বন্ধ করলেন। অসন্তোষ প্রকাশ ও দ্বিধার ক্ষতিপূরণ করলেন সশব্দে। তাতে রোগীর ঘুম ভেঙে গেল! ক-বাবু গায়ের ওপর ভাল করে কম্বল চাপা দিলেন, কপালে হাত দিয়েই বুঝলেন উত্তাপ বেড়েছে, তাড়াতাড়ি ওষুধ খাওয়াতে গেলেন। 'ঘুমুচ্ছিলে তাই ওষুধ দিই নি, ঠাণ্ডা লেগেছে? অত কাঁপছ কেন? গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার কর, ওষুধের ঝাঁঝ উড়ে যাবে।' রোগীর চেষ্টায় বেশ খানিকটা রক্তই বেরিয়ে এল, তিনি অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়বার সময় হাত নেড়ে ওষুধ দিতে বারণ করলেন। ওষুধ খাওয়ান আর হল না।

'এতক্ষণ বোধ হয় কাঠগুদামে পৌঁচেছে!'

'কে?'

'আহা যেন জানেন না, তোমার তিনি। রাতে কোন রেলের সাহেবের বাড়ি থাকবেন 'খন!'

'যেখানে হোক থাকবে, তুমি ভেবোনা, অত ছেলেমানুষী করলে কি চলে! আর এক দাগ ওষুধ ঢালছি, লক্ষ্মীর মত ঢুক করে খেয়ে নাও। কতবার না তোমাকে বলেছি ওর প্রতি আমার কোন দিন মন পড়েনি। ভারী দুষ্টু মেয়ে, ওরা কথনও ভাল হয়। ওর চেয়ে আমি ঢের ভালো মেয়ে দেখেছি।'

'তুমি ঢের দেখেছ জানি গো জানি।'

'একজনকে।'

'আমি ছাই ভাল। তার ওপর তোমার মন পড়ে নি সে কী আমি জানি না। তোমাকে আমি ঠাট্টা করি তুমি বুঝতে পার না। তুমি ভারী বোকা, ছেলেমানুষ! তোমাকে যে কোন মেয়েই ঠকাতে পারে। মেয়েরা ভারী ঠকায়, আদর ক'রে, ভালবেসে, খোশামোদ ক'রে। তাই তোমাকে একটু সাবধান করি, পুরুষ জাতটার মনই ছুঁকছুঁকে। তুমি আমার সে রকম নও আমি কী জানি না! তোমার মন কী পবিত্র তা আমি জানি। আমি নিশ্চয়ই জানি যে আমি মরে গেলে আমার অনুরোধ সত্ত্বেও তুমি বিয়ে করতে পারবে না। তুমি আমার চিরকালের!'

'সত্ত্বেও' কথাটি ভারী মজার; আরো মজার, আরো মজার ঐ 'তুমি আমার চিরকালের।' 'চিরকালের' কি? শুধু 'আমার' কেন? সব চেয়ে মজার কিন্তু রোগীর মুখের একগাল হাসিটি। উচ্চ আদর্শের নয়, ভক্তির নয়, সোয়াস্তির, স্বামীকে চিরকালের জন্য সম্পত্তি ক'রে বেঁধে রাখবার উল্লাসের। অন্তত ক-বাবুর তাই মনে হল। তিনি খুব জানতেন যে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ঠাট্টা করতেন না, কেন না তিনি ঠাট্টা করতে পারতেন না, তিনি পারতেন ঠেস্ দিয়ে কথা কইতে, অতি সুললিত ভাষায়। তিনি তাঁর সমগ্র বৃত্তি ও শিক্ষা দিয়ে বিশ্বাস করতেন যে তাঁর স্বামী শ্বেতাঙ্গিনীর প্রতি রীতিমত আকৃষ্ট হয়েছেন। শুধু তাই নয়, শ্বেতাঙ্গিনীটি শেষ অধ্যায়ের নায়িকা মাত্র। দেবতা ঠাওরাবার আর সময় হল না, নার্স চলে যাবার পর দিব্যানুভূতিটা এল! তিনি পরিহাস করতে না জানলে কী হয়, নিয়তি ঠাকরুণ ছেড়ে কথা কইবেন কি? ক-বাবুর মনে হল, তাঁর সমগ্র বিবাহিত জীবনটাই একটা তীব্র পরিহাস। আর একটু আগেই বাগানে যে ব্যাপারটি ঘটল! যে মুহূর্তে তিনি মানুষের মতন ব্যবহার করলেন, সেই ক্ষণেই তিনি দেবতা হলেন, যে ক্ষণে মাটির ওপর পা দিলেন, সেই মুহূর্তে তিনি ভক্তির জোরে আকাশ-প্রদীপ হয়ে শূন্যে ঝুলতে লাগলেন। হয়ত, এ শুধু পরিহাস নয়, ভীষণ চালাকি! মেয়েরা খুবই চালাক, কিন্তু নীচুস্তরেই তাঁদের

চালাকি খাটে, সারাজীবন ধরে এই চালাকি-মাখান নীচতাকেই লোকে পাতিব্রত্য বলে। পতিগতপ্রাণার স্বামীকে সেইজন্য ধূর্ত হতে হয়। তাই ক-বাবু মনের ভাবকে দাবিয়ে রেখে বল্লেন, 'বাইবেলে লেখা আছে স্বর্গেও বিবাহ হয়। আমার জন্ম এই পৃথিবীতে, মরব এইখানে, স্বর্গে যাব না, তবে যদি যাই…'

'ছিঃ ওসব অলুক্ষণে কথা উচ্চারণ করতে নেই। তুমি দেবতা। আমার অসুখের জন্য কত কষ্টই না পেলে, একদিনের জন্য তোমাকে সুখী করতে পারলাম না, তবে আসছে জীবনে যদি পারি।'

'অসুখ তোমার নিজের দোষে নয়, জীবাণুর দোষে।'

'তবু কত কষ্ট দিলাম ক্ষমা ক'রো।'

রোগী তাঁর শীর্ণ হাতটি স্বামীর পায়ের দিকে বাড়ালেন— স্বামী বিছানাতে এসে বসলেন, বিনা আপত্তিতে পা'র ধুলো দিলেন। যেন শেষ বিদায় নেওয়া হল।

ভোর বেলা গলার ঘড়-ঘড় আওয়াজ শুনে ক-বাবুর মনে হল 'যেন' সত্যে পরিণত হতে আর দেরি নেই। সকাল সাড়ে ছ'টার সময় সব শেষ হয়ে গেল, স্বামীর কোলে মাথা রেখে। সতী-সাধ্বী হলেও যক্ষ্মা রোগী। দৃশ্যটি মনোহর ক'রে তোলবার চেষ্টা করলেন মনোরমা দেবী। পায়ে আলতা, সিঁথিতে, কপালে, নোয়ায় সিঁদুর দেওয়া হল— পাতলা করে, সরু করে, লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরান হল, গায়ে দামী কাশ্মিরী লাল দোরোখা ঢাকা দেওয়া হল, বাগানে ফুলের অভাব ছিল না। অনুষ্ঠানের কোন প্রকার ত্রুটি হয়নি, মনোরমা দেবী সে মেয়েই নন। তাঁর দৃষ্টি সব দিকেই চলে। শুধু ক্যামেরার দৃষ্টি এ করুণ দৃশ্যের ওপর পড়ল না। ফোটোতে মনোরমা দেবীর আপত্তি হল, ক-বাবুও সায় দিলেন। বেরুতে বেশি দেরি হল না।

ঘাট থেকে ফিরে এসে মাত্র দু-চার পেয়ালা চা খেয়ে ক-বাবু সোজা বিছানায় আশ্রয় নিলেন। বেশ গরম বিছানা— ওম কোরে শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন উঠলেন তখন অনেক বেলা হয়েছে। চোখ-দুটো জ্বালা করছিল, মনোরমা দেবী বোরিক্ লোসন দিয়ে ধুইয়ে দিলেন। মনোরমা দেবী বল্লেন, 'স্নান করে সামান্য কিছু খেয়ে নাও, একটু বিশ্রাম কর গে।' পশ্চিমের বারান্দায় নেওয়ারের খাটিয়াতে মনোরমা দেবী নিজ হাতে বিছানা পেতে দিলেন, চিক্ নামিয়ে দিলেন! আবার ঘুম। যখন ঘুম ভাঙল তখন বোধহয় বেলা পড়-পড়। বিছানার পাশে মনোরমা দেবী চা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

'এবার তুমি একটু বিশ্রাম করগে, দুপুরে ঘুমোওনি?'

'আমি ঘুমুই না।'

'তাও ত বটে! আজ একটু ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে বেঙ্গলী ক্লাবে যাব। না, কাল গেলে হবে না, ধন্যবাদটা শেষ করাই ভাল।' পোশাকের ঘর থেকে ক-বাবু নতুন জামা কাপড় বার করলেন। যেন কতদিন দাড়ি কামান হয় নি, চুল আঁচড়ান হয় নি, মাথায় লোসন দেওয়া হয় নি, ফর্সা কাপড় পরা হয় নি! তাঁর সমস্ত গা ঘিন্ ঘিন্ করছিল। আজ একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া যাক্। আচ্ছা, আজ না হয় ক্লাবে গিয়ে কাজ নেই, আজই না গেলে তারা কিছু মনে করবে না। ক-বাবু বাগানে গেলেন। দূরে মসজিদের চূড়ায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, না, সূর্য যেন উদয় হচ্ছে, কোন রঙের বাহার নেই, তার চেয়ে বাগানের মালীর হাতের ফুলের বাহার খুলেছে! বুগেনভিলিয়ার লাল ফুল-গুলো টক্‌টকে, জমাট রক্তের মতন। অন্য রঙেরও ত' পাওয়া যায়! কেন লোকে তাই পছন্দ করে না— রক্তের ডাক আছে বোধ হয়। কুঞ্জের মধ্যে মনোরমা দেবী পাথরের ওপর বসে আছেন, যেন মার্কাস স্টোনের ছবি একখানি, পরনে ফরসা কাপড়, শিউলি ফুলের মতন শুভ্র, সরু পাড়টা হলদে, শিউলির বোঁটার মতন। এ যে শীতের মাঝে শরতের আগমন! শুভ্র শরৎ ভেসে এল হেমন্তেরই আঙিনায়। হেমন্ত নয়, তবু যদি শিশির ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মনোরমা দেবী নিস্তব্ধতা ভাঙলেন— 'গেলেন না?'

'না, এখানেই এলাম।'

'বড় কষ্ট হয়েছে? হবেই ত! অভ্যেস নেই।'

'হ্যাঁ, কষ্ট হয়েছে, হয়েছিল বরং। কিন্তু কিসের জন্য জান?'

'ঘাট অনেক দূরে, কোন বন্দোবস্ত নেই, ও শরীরে সহ্য হবে কেন? আবার নিজের না অসুখ হয়।'

—'হলে মন্দ কী? সেবা খাব। সে জন্য কষ্ট নয়।' মনোরমা দেবীর চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠল।

'কী জন্য জান? তোমাকেই বলি, আর কাকে বলব? তুমি হয়ত বুঝবে। আমার কষ্ট হয় নি, দুঃখু হয়েছে। দুঃখ এই জন্য যে সে আমাকে দেবতা হতে বলে গেল, কিন্তু আমি দেবতা হতে পারব না, আমি দেবতা নই। আমি রিয়ালিস্ট। আমি তার দুরাশা পূরণ করতে পারব না, তার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'কি বলে গেলেন?'

'বলাবলি আর কি? অনুরোধ, সাংঘাতিক অনুরোধ, জীবন-ধর্মের বিরোধী, অনুরোধ আমি যেন দেবতা হই, অর্থাৎ হিন্দু বিধবার আদর্শ যেন

আমাতেই মূর্তিমান হয়, সারাজীবন যেন আমি তাঁরই ধ্যানে মগ্ন থাকি, এক মিনিট যেন তাঁকে না ভুলি। অর্থাৎ জীবনকে প্রত্যাখ্যান করি, মেয়েদের দূরে পরিহার ক'রে বাকি যা ইচ্ছে হয় তাই করি।'

'ওঃ বুঝেছি। বেশ ত, শেষ অনুরোধ রক্ষা করুন না!'

'এটি অনুরোধ নয়, আবদার, সমগ্র পুরুষজাতির প্রতি একটি মাত্র স্ত্রীর প্রতিশোধ, আদর্শের আবরণে।'

'তবু—'

'তবু নয়, সেই জন্যই। তুমি ঠাট্টা কোরো না। তুমি বোঝো না। আমি প্রত্যেক অভিজ্ঞতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চেষ্টা করি। আমার কাছে সাতত্য নেই, আছে বিরতি: অতীত নেই, অতএব ভবিষ্যৎ নেই; আছে শুধু বর্তমান। আমি কী করে অনুরোধ পালন করব? অনুরোধ রক্ষা করতে গেলে অতীতের আদর্শ ও ভবিষ্যতের কর্তব্য স্বীকার করতে হয়। ভাল-মন্দ আমি জানি না, আমি শুধু প্রত্যেক অভিজ্ঞতাকে বিশিষ্ট ভেবে শ্রদ্ধা করি। আমার কাছে সব ঘটনাই একান্ত। বাইরের কোন সূত্র ধ'রে আমার অভিজ্ঞতা সজ্জিত হয় না। আমার জীবন মালা নয়। এক একটি অভিজ্ঞতার চারপাশে ছক হচ্ছে, ছকের সঙ্গে ছক কখনও মিশছে, কখনও মিশছে না। যেন সিনেমার ছবি। তুলনা উপমা ভালবাসি না; কিন্তু যদি দিতেই হয় তা হলে বলতে পার— হীরের খনি জমিদারিতে পাওয়া গিয়েছে শুনে মালিক মশাই দাতা হয়ে উঠলেন, মাত্র কয়েক দিনের জন্য মজুর ও হাঘরের দলকে মাটির ওপর যা পাওয়া যায় তাই কুড়িয়ে নেবার স্বাধীনতা দিলেন; সকলে ছুটে গিয়ে জমির ওপর বাঁশ-গাড়ি করল; ছেঁড়া তাঁবু খাটালে; কারুর কপালে কাঁচা হীরে জুটল, কারুর জুটল না, কেউ কয়লা বা চক-চকে পাথর কুড়িয়ে ভাবলে হীরে পেয়েছি। তার পর, যারা হীরে পেয়েছে তারা আধা দামে কোন চতুর বণিককে বিক্রি করলে, বদখেয়ালে দুদিনেই টাকা উড়ে গেল, আবার যে কে সেই হাহাকার! হল মাত্র ক্ষণিকের সম্ভোগ। যারা হীরে পায়নি, তারা নিরাশ হল, অন্যত্র হীরের আশায় তাঁবু গাড়লে। লাখের মধ্যে একজন হয়ত ট্রেডার হর্নের মতন আশা নিরাশার কাহিনী লিখে নামী হল, বিখ্যাত হল। জীবনটাই এই রকম, যদি জীবন বলে আলাদা কিছু থাকে। অন্তত আমার জীবন তাই, পরের কথা জোর করে বলা যায় না। যেটা হীরে মনে করেছিলাম সেটা একটুকরো রঙিন কাঁচ। আবার খনির সন্ধানে ছুটেছি। আমার কাছে জীবন্ত হল বর্তমান ক্ষণ, অতীত ফ্যারাওদের মতন মৃত, পিরামিডের মধ্যে পোঁতা, আর ভবিষ্যৎ? অজ্ঞাত। এই ধর, তিনি ছিলেন, তখন শুধু তিনিই ছিলেন, এখন আর নেই, এখন কেউ

নেই ! তবে যে থাকবে না পরে কেউ তাই বলি কি করে ?'

'তা আমি বুঝেছি। আচ্ছা, তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ?'

'না, তা করিনি। তার চেয়ে বড় কাজ নিজের প্রতি কর্তব্য করা। এখন থেকে তাই করব। যদি তুমি সাহায্য কর। আমার প্রাণের কথা তোমাকে বল্লাম। বুঝেছ ?'

'বুঝেছি— বোধ হয়।'

'কী বুঝেছ বল, সোজা করে বল। ভুল বুঝব না।'

'তাঁর মতন মেয়ে নিজের উপযুক্ত কাজই করেছে— কোন অন্যায় করেন নি ! আপনিও প্রতিজ্ঞা করেন নি, ভালই করেছেন। তবে দুঃখুই বা কেন ? আফশোষই বা কেন ? প্রতিজ্ঞা যখন করেন নি, তখন তা রক্ষা করতে পারবেন না বলে আফশোষে বাকি জীবনটা কাটান কি উচিত ? আপনার সামনে সব জীবনটাই পড়ে রয়েছে। আপনার তাই দেখে সাহসী হওয়া উচিত।'

'আমার ভবিষ্যতের মধ্যে আপাতত তুমি।'

'আপাতত ?'

'তুমি সাহস দেবে ত ? তুমি না হলে আমার চলছে না।'

'ছিঃ ও কথা বলতে নেই। আমি সামান্য মেয়ে আমার সাধ্য কতটুকু ? আমার কপাল ভাঙা, কখনও জোড়া লাগবে না। তবে আপনার ভবিষ্যতের কথা সর্বদাই মনে রাখতে চেষ্টা করব। আপনার আদর্শের ওপর বিশ্বাসই আমাকে শক্তি দেবে— তবে ধারণ করতে পারব কিনা জানি না। আমি স্ত্রী আর আপনি পুরুষ।'

ক-বাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'Oh, Damn ! এযে সেই কথা আবার ! ভগবান একটি মাত্র স্ত্রীলোক তৈরি করেছিলেন, বাকি সব রক্তমাংসের রেকর্ড নাকি !' ক-বাবু ঈষৎ উত্তেজিত হয়েই বল্লেন, 'আমার আদর্শ নেই, আমার আছে শুধু বর্তমানের অভিজ্ঞতা। সেটা তোমাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, তোমাকে আশ্রয় করেছে। এতক্ষণ কী ছাই বল্লুম ? তোমাকে ও সব কথার কথায় বিশ্বাস করতে হবে না। তোমার শক্তির কথাই উঠছে না। তুমি স্রেফ তুমি, তাইতে আমি আপাতত সন্তুষ্ট, তুমিও সন্তুষ্ট হও, নচেৎ আমার অশান্তি থেকেই যাবে।'

'আমি কী তোমাকে চিরকাল সন্তুষ্ট রাখতে পারব ? তোমার তালে পা ফেলব কী করে ? তুমি চাও আপাতত ; আর আমি মেয়েমানুষ— আমরা ধীরে ধীরে হাঁটি : লাফিয়ে চলা অভ্যেস নেই। তাছাড়া, শুনেছি অশান্তিই

পুরুষের লক্ষণ, উন্নতির বীজ।'

'শোনা কথা বিশ্বাস কোরো না। আমি উন্নত হতে চাই না, চাই শান্তি, চাই তার চেয়েও কম, সোয়াস্তি। আমাকে সোয়াস্তি দাও।'

'বেশ, চল, আমি রাজী আছি, কিন্তু আদালতে গিয়ে নয়।'

'Slow but steady wins the race.'

'বিবাহের কথা আমি বলছি না, ও কাজ আর না, তবে বিবাহেরই মতন সব, রাজী আছ? দেশে আর যাব না, তা হলেই চলবে।'

মনোরমা দেবী শিউরে উঠলেন, ধীরে ধীরে নতমুখে বল্লেন, 'না, তা হলে চলবে না।'

'তবে কী হবে?'

কোন উত্তর এল না। অনেকক্ষণ পরে ক-বাবু প্রশ্ন করলেন, 'তা হলে এই শেষ, ভেবে ছ্যাখ।'

'ভেবেছি।'

'সম্ভব হবে না?'

'না।'

'কিছুতেই নয়?'

'না, সে আমি পারব না। তোমাকে একটা কথা বলব?'

'বল।'

'আমার ওপর যত পার অসন্তুষ্ট হয়ো, কিন্তু আমি চাই তুমি বড় হও। আমি চাই তুমি গরবী হও, গরবী হয়ে জগন্নাথের রথের মতো ভক্তদের পিষে দলে যাও।'

ক-বাবু এই ওজস্বী নিবেদনে বিচলিত হলেন না। শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,

জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো ওঠো জয়রথে তব
মোরা জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে বসে রব—

গানটা নীহারবালার মুখে শুনেছ বুঝি? কিন্তু ভক্তির বহরে রথ যে থেমে যায় আর একটা কবিতায় পড়নি? সেটা বুঝি থিয়েটারের মেয়েরা গায় না? আচ্ছা, তুমি ভক্ত নও, রাস্তার ধারের বড়বাড়ির ছোট মেয়ে, রথ দেখতে এসেছ। তাওতো বটে! তোমাকে চাপা দিয়ে আমার কী ঐশ্বর্য বাড়বে? পথ থেকে সরে যাও।'

'তোমার ভাষা আমি বুঝতে পাচ্ছিনা যে। আমাকে থিয়েটারের মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে অপমান করবেন না, আমার কেউ নেই।'

ক-বাবু—'আজকাল আর তাঁদের ঘৃণা করা চলে না। তাছাড়া তাঁদের একটা মহৎ গুণ এই রঙ্গমঞ্চের বাইরে তাঁরা অভিনয় করেন না।'

'আপনার ওঁদের সম্বন্ধে বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে আমার জানা ছিল না, সেই জন্তেই বোধহয় উনি…'

ক-বাবু একেবারে চুপ করে গেলেন।

উনি অর্থে তাঁর স্ত্রী। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর ক-বাবু গম্ভীর হয়ে বললেন— 'তাঁদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নেই। থাকলে দেখছি মন্দ হ'ত না। যে জিনিস কেনা যায় তাকে জোর করেই বলা চলে গোলমাল বাধিওনা। কিন্তু কন্তা হিসাবে বিক্রীত হলেও হিসাবে গোলমাল বাধাবার অধিকার কোথা থেকে আসে বলতে পারেন ? প্রত্যেক স্ত্রীইতো স্বামীর অন্ন খান, স্বামীর দেওয়া গয়না শাড়ি পড়েন ? অধিকার প্রেমের, স্নেহের, গৃহিনীপনার। অর্থাৎ সম্পত্তির, কেমন ? আপনার ওপর ক্ষণিক দৌর্বল্য এসেছিল, প্রেম হয়নি, কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম। ব্যস্, এ পর্ব খতম, এবার ছুটি দিন, দেশে যাবো।'

'আপনি যান না, কে আপনাকে বেঁধেছে ? মেয়েরা কবে পুরুষকে বাঁধতে পারে ? আমরাই মাঝ থেকে বাঁধা পড়ি।'

'আবার সেই স্ত্রী ও পুরুষ ! স্ত্রী ও পুরুষ বলে ছুটো ভিন্ন জাত নেই। আছে শুধু আইডিয়ালিস্ট ও রিয়ালিস্ট। ও রকম unscientific generalisation শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়েছিল, আবার ! আমি ভেবেছিলাম তুমি একটু অন্ত ধরনের ! তাও নও। তোমার নীরবতার অন্তরালে নিজস্ব কী কিছুই নেই ? শুধুই কী মামুলি কথার পুনরাবৃত্তি ? ছাখ, আমি জীবনে রোমান্স চাই না, চাই সায়েন্স, ম্যাজিক নয়, লজিক। তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। তুমি বেশ চালাক মেয়ে, তিনি যেমন ছিলেন সেই জাতেরই, তবে রকমফের। যাকগে, নিজগুণে ক্ষমা করো, বোধ হয় পারবে না। কালই আমি যাচ্ছি। আমাকে ভুলে যেও।'

স্বীকার করতেই হবে যে ক-বাবু মনোরমা দেবীকে অপমান করেছিলেন। যদি তাঁর বাক্য সংযত হত তাহলে ঐ বাগানে ঐ অবস্থায় কী হত বলা যায় না। ক-বাবু অবশ্য ইচ্ছা করে মহিলাটিকে অপমান করেননি। রিয়ালিস্টের কাছে বাক্‌সংযম প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু যেখানে জীবনমরণের ব্যাপার সেখানে আত্মরক্ষার জন্য অসংযম মার্জনীয়। তাই মনোরমা দেবীও মার্জনা করলেন না। তিনি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলেন, 'ক্ষমা করব সেদিন, ভুলে যাব সেইদিন, যেদিন ইচ্ছে করে মুমূর্ষু স্ত্রীর ঘরে জানলা খুলে রেখে তাকে মরবার সময় ওষুধ না দিয়ে, সতী সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি. ইহজীবনের স্বামীর প্রধান কর্তব্য

ভুলে গিয়ে, ক্ষণিক তৃপ্তির আস্বাদে একটি সামান্য নার্সের পিছনে ছুটেছিলেন— এসব কথা আপনি যেদিন নিজে ভুলে যাবেন, গিয়ে নিজেকে ক্ষমা করবেন। আপনার পাপ-পুণ্য জ্ঞান নেই, আপনি আবার আমাকে বিবাহ প্রস্তাব করেছিলেন! ছিঃ ছিঃ আমার নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছে। এখনও তার টেবিলের ফুল শুকোয়নি! আপনি বাড়ি ফিরে যান কী নার্সের পিছনে ছুটুন গে আমার তাতে কি? আপনাকেও আমি ভুল বুঝেছি। আপনার জীবন-ধর্ম শুধু কথার কথা; মেয়েদের প্রবঞ্চনা করবার চাতুরি ও ছলাকলা মাত্র।'

আচ্ছা মনোরমা নার্সের কথা জানলে কী করে? তাঁতে এঁতে তাহলে সন্দেহের বিনিময় হত! আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ প্রেমিকা। এই কথা ভাবতে ভাবতে ক-বাবু স্যুটকেস গোছাতে লাগলেন। শেষের তীরটি তিনি হৃদয় হতে সহজে উপড়ে ফেলতে পারলেন না। গোটাকয়েক প্রশ্ন তাঁকে উদ্‌ব্যস্ত করে তুল্লে— আমি কী তাহলে খুনী, অসচ্চরিত্র, বদমায়েশ? নিশ্চয়ই নয়, আদর্শবাদীরা রিয়ালিস্টকে ঐ সব বলে গালাগালি দেয়। মনোরমা কি? নিশ্চয়ই মনোরমা সেই টাইপের মেয়ে যারা পুরুষের আদর্শকে পূজা দেবার ভান কোরে তাদের দাম্ভিকতা বাড়িয়ে দেয়, পুরুষ দাম্ভিক হলে আদর্শবাদী অর্থাৎ দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়ে, সেই সুযোগে মনোরমার মত মেয়েরা কাজ গুছিয়ে নেয়। মুখে তারা inspire করে, কিন্তু আনে পরে despair। মনোরমা সেই টাইপের যারা দেখতে লাউডগার মত কোমল, যাকে spirituelle বলে, উর্দুতে যাকে বলে 'নাজুক', যেন কোমলতার ভারে ভেঙে পড়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাদের কেমলতা টেপওয়ারম্ ও হুকওয়ারমের ষড়যন্ত্র, গ্ল্যাণ্ডের দরদ কিংবা স্বার্থ-সিদ্ধির রঙিন আবরণ মাত্র। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে মনোরমাই রিয়ালিস্ট ও আমিই আইডিয়ালিস্ট; তা কখনও হতে পারে না?'

ক-বাবু পাইপ মুখে দিয়ে, টাঙায় চড়ে বেঙ্গলী ক্লাবের শ্মশান-বন্ধুদের ধন্যবাদ দিতে চল্লেন। ঠাণ্ডা হাওয়ায় পাইপের ধোঁয়ায় মাথাটা তাঁর পরিষ্কার হয়ে গেল। টাঙাওয়ালাকে মনে হল ছন্দক, আর ঘোড়াকে মনে হল কণ্ঠক। একি পলায়ন, না মহানিষ্ক্রমণ?

ভূতের গল্প

সেবার শরীরটা বেশি রকমেরই খারাপ হয়। ঘুম হত না রাত্রে। ভোরবেলা তন্দ্রা আসত, কিন্তু ভীষণ স্বপ্ন দেখতাম। দুর্গন্ধ কোবরেজি তেলে উপকারের মধ্যে খুব সর্দি হল। ঘুম না হওয়ার জন্য যা কষ্ট তার চেয়ে বেশি সর্দির।

সারাদিন মন খারাপ করে থাকতাম, কোথায় যে বেড়াতে যাব তাও ভাল লাগত না! আর যাবই বা কিসে? ট্র্যামের চাকায় ও মাথায় ভারী বিদ্যুৎ চমকায়, মোড় ফেরবার ও থামবার সময় কিচ্ কিচ্ করে ওঠে, চলবার সময় শব্দ হয়। বাসে চড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ট্যাক্সি রোজ কিছু চড়া যায় না— বাঙ্গালী হিন্দু ড্রাইভারও ডাকতে না ডাকতে মেলে না। ডাক্তারে পরামর্শ দিলেন দার্জিলিং কিংবা শিলং যেতে, কোবরেজে বল্লেন পুরী। শেষে হোমিওপ্যাথের মতেই কাজ করলাম। গেলাম চন্দননগরে।

সেখানে থাকবার সুবিধা ছিল। আমার দাদা, দূরসম্পর্কের হলেও পরমাত্মীয়, সেখানে থাকতেন। তাঁর বাড়ি খুব বড় ও খোলা যায়গায়, গঙ্গার ধারে না হলেও কাছে, এক মিনিটের রাস্তায়। সংসারে এক স্ত্রী ভিন্ন দ্বিতীয় বালাই নেই। বৌদিও চমৎকার লোক প্যাশ্‌নে পরেন, মোটর পর্যন্ত চালাবার দরকার হলে পিছপাও হন না, ইংরেজী বলেন, ডিনার খান, অথচ সিগারেট খান না, খোঁপাও বাঁধেন। তা ছাড়া স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একটা অতি মধুর সম্পর্ক ছিল যার জন্য অতিথি অভ্যাগতের প্রতি সৌজন্যরক্ষা অতি সহজেই সম্পন্ন হত। তাঁর বাড়িতে প্রতি শুক্রবার শহরের যুবকদের বৈঠক বসত। সে বৈঠকে আমি যোগ দিয়েছি, কখনও কোন আড়ষ্টভাব কিংবা অভদ্রতা লক্ষ করিনি। সব সময়েই খুব যে উঁচুদরের কথা হত তা নয়। হাসি ঠাট্টা, খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা, মজা তামাশাও হত, আবার ছন্দ নিয়ে কূটতর্কও বাদ যেত না। এক এক শুক্রবার আবার নতুন কিছু একটা মজা করা হত। দাদা-বৌদির সংসারে সত্যিকারের লক্ষ্মী বাসা বেঁধেছিলেন— এমন সুষ্ঠু সংসার চোখে পড়ে না। তাই যখন হোমিওপ্যাথ গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করে মাথাঠাণ্ডা করতে উপদেশ দিলেন, আমি বৌদিকে একখানা চিঠি লিখলাম, কিছু দিন গিয়ে থাকতে পারি কী না, অনেক দিন যাইনি, কোন খবরও পাইনি, যেতে ইচ্ছে করছে। অসুখের কথাও লিখলাম গুছিয়ে, দাদা ডাক্তার কিনা। পরের দিনই উত্তর এল, যেন বৃহস্পতিবার না গিয়ে শুক্রবারেই যাই। স্টেশনে গাড়ি থাকবে। শুক্রবারেই পৌঁছতে অনুরোধ করার কারণ এই যে হয়ত শনিবার দাদাকে একবার চুঁচড়ো যেতে হবে— সিভিল সার্জনের সঙ্গে কনসাল্‌টেশনে।

ফরাসীদের চন্দননগর নগর হলেও পাড়াগাঁ। সন্ধ্যাবেলায় ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে, রাতে শেয়ালের ডাকও শোনা যায়। অন্ধকার সূচিভেদ্য না হলেও রাস্তার আলোর পক্ষে রীতিমতই দুর্ভেদ্য। সব রাস্তাগুলোই যেন বাগানের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, দুপাশে খোলা নালা, নিশ্চয়ই সাপ আছে। বাগানের মধ্যে বাড়ির গায়েই বুড়ো বুড়ো গাছ, তাল, নারকেল; আম, কাঁঠাল, বাজ পড়লে আর

রক্ষে নেই, বেত আছ্ড়া সাপ লাফিয়ে ঘরে ঢুকতে পারে। তবে ঐ যা, কোন বাস ট্র্যামের গোল নেই, যা হয় শনিবারের রাত্রে, রাস্তার মোড়ে; তাও কলের ও কোলকাতার বাবুদের গলায়। যখন পৌছলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। স্টেশনে মোটর আসেনি দেখে একটু চিন্তিত হলাম। একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার বল্লেন, 'তার আর কি? আসুন না আমাদের গাড়িতে।' শহর থেকে অমন অনেক শেয়াররর গাড়ি যাতায়াত করে। মাথায়ও লোক চড়ে দরকার হলে। আমি ভেতরেই স্থান পেলাম। নড়নড়ে গাড়ি, কিন্তু চলে মন্দ নয়, শব্দ হয় মড়মড়, ক্যাঁচ্কোঁচ্, তার ওপর ছপ্টির ছপাং ছপাং। গাড়িতে উঠেই কানে বোরিক তুলো গুঁজে দিলুম; বাজ ও ধাতব পদার্থের ঘর্ষণের আওয়াজ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদাই খানিকটা মেডিকেটেড তুলো সঙ্গে রাখি, কেটে গেলে দরকার হতে পারে। কানে গুঁজলাম লুকিয়ে, কেননা লোকদের কানেও যে চামড়া নেই আমি সংগীতের আসরে গিয়ে পরিষ্কার বুঝেছি। একটা চৌমাথার মোড়ে আমাকে নামতে হল, গাড়োয়ান সুটকেসটা নামিয়ে দিলে, পয়সা চুকোবার সময় বলে দিলে 'ঐ ফাঁসিতলার গলির শেষের বাড়িটা, বড় ফাটকঅলা বাড়ি দেখলেই চিনতে পারবেন'। সুটকেসটা হাতে নিয়ে অগ্রসর হলাম। ঠিক গলি নয়, কোলকাতার বড় রাস্তার মতন। তবে এ রকম অন্ধকার কোলকাতার কোন বাই লেনেও নেই। যত সব পাখি গাছের ওপর আওয়াজ করছিল। অদ্ভুত আওয়াজ সব, মোটেই পরিচিত নয়, বোধ হয়, বাদুড়ের। বাদুড়ের না হোক চামচিকের— অন্তত গন্ধে তাই মনে হল। একটা চামচিকে— চামচিকেই বোধ হয়, আমার অগ্রদূত হয়ে উড়ছিল। পাখিটা কানা, নচেৎ অত ঘোরে কেন? কিংবা হয়ত কোন ভাঁটিতে পড়ে গিয়েছিল। পাখিটার দিকে চাইতে চাইতে হোঁচট খেলাম, সামলে নিয়ে চারধারে বাড়ির চিহ্ন খুঁজতে ব্যগ্র হলাম। খুব দূরে মনে হল একটা আলো জ্বলছে। দশবিশ কদম এগোতেই দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ফাটক হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভের শেষে গাড়িবারান্দা, তাইতে একটা আলো ঝুলছে। নিশ্চয়ই এ বাড়িটা, কেননা এ বাড়ি আমার পরিচিত। তবে পাড়াগাঁকে বিশ্বাস করতে নেই, বিশেষত রাত্তিরে। কী জানি, ঐ ধরনের অনেক বাড়ি হয়ত আছে। বাড়ির ত আর নম্বর নেই, আলোর বহরও এত কম যে তাতে করে বাড়ি চেনা যায় না। মনটা একটু বিরক্তও হয়েছিল, অতটা রাস্তা একলা আসব, সুটকেস ব'য়ে, জানলে হয়ত আসতাম না। যা হোক, এসে যখন পড়াই গেছে তখন মন্দ হল না। একটু এ্যাডভেঞ্চার না হলে জীবনটা নীরস হয়ে যায়। স্নায়ু-দৌর্বল্যের পক্ষে একটু-আধটু বৈচিত্র্য ভালই।

দরোয়ান হাত থেকে স্যুটকেস নিয়ে এগিয়ে চলল। গাড়িবারান্দার নিচে সিঁড়ির উপর একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছেন। একচটকায় দেখে চেনা-মুখ বলে মনে হল না, পেশোয়ারি-চালে ধুতি পরা, ছোট পাঞ্জাবি, চোখে কাল টর্টিজশেলের মত গোল চশমা। আমাকে দেখে, 'এই যে দাদা' বলে এগিয়ে এলেন। 'এ কি, হেঁটে যে! গাড়ি কোথায়? তাও ত' বটে! রঘুটা চিনতে পারেনি নিশ্চয়ই। মালী হয়েও ফুল চিনলি না, ব্যাটা আহাম্মক! যাকগে পৌঁচেছেন এই ভাগ্যি। গলিটাও ভাল নয় আবার! ওরে চা দে।'

ড্রয়িংরুমে আলো নেই দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দাদা বৌদি বুঝি বাড়ি নেই?' 'না ডাক্তারবাবুকে হঠাৎ চুঁচড়ো যেতে হয়েছে, আজ রাতে হয়ত আসবেন না। বৌদি, আহা বৌদি···কেন আপনি কী জানেন না?'

'কেন, বৌদি বুঝি বাপের বাড়ি গেছেন?'

'হুঁ···আজ আমাকেই অতিথিসৎকার করতে হবে— নিজগুণে দোষত্রুটি দেখবেন না।'

ছোকরাটি ভারী সপ্রতিভ। নিশ্চয়ই যুদ্ধের ফেরৎ! ফরাসী সভ্যতার ছোঁয়াচে মানুষ সামাজিক হয়ে ওঠে, বোবার মুখ ফোটে, ব্যবহার সহজ হয়— আর ইংরেজী সভ্যতা! ও-জাতের ভদ্রতা কোথায়? গোমড়ামুখো জাত, তাই বাঙ্গালীরাও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি আমাকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেল! নিজে প্রথমে ঢুকে আলো জ্বেলে দিলে! প্রকাণ্ড ঘর, মাঝখানে একটা চৌকো লণ্ঠন, আলো বৈদ্যুতিক। লণ্ঠনটি মজার। কালো ঘেরা টোপের ওপর বোধ হয় একটা চীনে ড্রাগন কিংবা গার্গইলের মতন একটা জন্তু আঁকা। এই ধরনের **bizarre** ও **exotic** রুচি আমার ভাল লাগে না। যখন সূক্ষ্মরুচি ভোঁতা হয়ে যায়, জীবনস্রোতে ভাঁটা পড়ে, দৈনন্দিন সুপরিচিতের আস্বাদ মুখে রোচে না, তখনই অদ্ভুত একটা কিছুর প্রয়োজন হয়। আলোটির দিকে চেয়ে থাকতে দেখে ছেলেটি বল্লে, 'ওটা আমার আঁকা। আচ্ছা এবার চা আজ্ঞে হোক।' চা এল, সঙ্গে খাবার! চাএর সঙ্গে খাবার খাই না সাধারণত, চাএর রসভঙ্গ হয়, কিন্তু ছেলেটির নিরতিশয় অনুরোধে খেতেই হোল। কর্তব্যজ্ঞানের দায়িত্বে সে নাছোড়বান্দা হয়েছে. নিয়মভঙ্গের জন্য মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল, সেও বুঝলে অন্যায় হয়েছে। তাই দুজনেই একটু কেমন চুপচাপ হয়ে রইলুম। অপ্রস্তুত হয়েছে দেখে আমিই কথা পাড়লাম—

'আচ্ছা, এ গলিটার নাম কেন ফাঁসিতলা?'

'বহুপূর্বে ঐ মোড়ে যে গাছটা দেখলেন তার নিচে একবার একটি লোককে গিলোটিন্ করা হয়েছিল। সে ভারী আশ্চর্য কাণ্ড, শুনবেন?'

'না থাকৃগে, তাহ'লে ওখানে বেশি আলো দেওয়া উচিত।'

'দেওয়া হয়, কিন্তু হাওয়াতে কেবল নিবে যায়।'

'চন্দননগরে খুব হাওয়া বুঝি? গঙ্গার হাওয়াতে প্রাণ জুড়োয়। একবার জাহাজে রাজগঞ্জ গিয়েছিলুম, মনে আছে, হাওয়াতে আমাকে ডেক থেকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আর কী!'

'চলুন, এই ত স্ট্রাণ্ড, পাশেই। হাওয়া দেখবেন চলুন, কাকে হাওয়া বলে!'

'বেশ ত চলুন না, আলো নিয়ে যাওয়া যাক।' ছেলেটি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল।

'লোকে যে পাগল বলবে দাদা, স্ট্রাণ্ডে লণ্ঠন। এ ফরাসী রাজত্ব, লোকে ঠাট্টা করতেও জানে, তাই ঠাট্টাকে ভয় করে চলতে হয় দাদা। কোলকাতা নয় যে বড়বাজারে পিদ্দিম নিয়ে রাস্তায় হাঁটলেও ফিরে লোকে তাকাবে না। তা ছাড়া, ডাক্তারবাবুর এখানে এসেছেন, তাঁর পসার মাটি হবে যে!'

লণ্ঠন না নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। বাস্তবিকই এমন সুন্দর জায়গা দুর্লভ এদেশে। প্রকাণ্ড চওড়া ও লম্বা পাথর-বাঁধান রাস্তা, গঙ্গার কিনারে বড় ফুটপাথ, তার ওপর বেঞ্চি, দূরে দূরে বড় বড় ঘাট, রাস্তার ওপাশে কাফে, হোটেল, মেয়েরা খাচ্ছে চোখে পড়ল। গঙ্গার ওপারে মিলের আলো মালা সাজিয়ে রেখেছে। ফ্যাক্টরি আমার চক্ষুশূল, কিন্তু রাত্রে ভারী সুন্দর দেখায়, বিশেষত আলোর মালা। গঙ্গার স্রোতে প্রতিবিম্ব একটু কাঁপছিল। যেন স্বপ্নপুরী! একটা বড় গাছের তলায় বেঞ্চিতে আমাকে ছেলেটি বসালে। দৃশ্যের খাতিরে সিগারেটের নতুন টিন খুললাম। এগিয়ে দিতে উত্তর পেলাম —'খাই বটে, কিন্তু আপনার সামনে খাব না।' ছেলেটি সত্যই অনেষ্ট। না খেয়ে যদি ছেলেটি ঐ কথা বলতে পারত তা হলে অধ্যক্ষ হেরম্ববাবু ভালবাসতেন নিশ্চয়, সিটি কলেজের জলপানি পর্যন্ত পেত।

চন্দননগরের ইতিহাস শোনা গেল। অতি পুরান শহর, গঙ্গাবক্ষে যুদ্ধ, বর্গীর আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে স্বদেশী যুগের উপেন বাঁড়ুয্যে, চারু রায়, কানাই দত্ত, রাসবিহারী বোসের কাণ্ড সবই ছেলেটির জানা। তা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক পুরানো বাড়ির গল্প তাঁর ঠোঁটস্থ। আমাদের দেশের লোকেরা নিজেদের পারিপার্শ্বিকের কোন খবরই রাখে না, তাদের ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান স্বল্প। কারণ বোধ হয় দেশটা ছোট নয়! ইংলণ্ড ফ্রান্সে প্রত্যেক গ্রামের নামের ইতিহাস, রাস্তা, ভাঙা গির্জা ও প্রাসাদের ইতিহাস নিয়ে লোকে মাথা ঘামায়। তাদের দেশাত্মবোধ এই স্থানমাহাত্ম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে

অত সুদৃঢ়। আমাদের দেশে সতীর অঙ্গ যেখানে পড়েছে সেখানে পুজো দিয়েই খালাস, ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের যে প্রয়োজন আছে জানিই না। তাই ছেলেটির মুখে শহরের নানা বৃত্তান্ত শুনে ভারী আনন্দ হল। উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু জেলের ঘণ্টা বেজে উঠল, সেই সঙ্গে গির্জার ঘড়িতে ন'টা বাজল। 'এইবার দাদা উঠতে হবে, আর বসবার হুকুম নেই চলুন, খাওয়া দাওয়া করা যাক্‌গে।'

ওঠা গেল। পথে শুনলাম তার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ, লোকে পুণ্ড্র ব'লে ডাকে। নেহাৎ আত্মীয়েরা পুঁটু বলেন। 'তবে ঐ ব্যাপারের পর কাউকেও নাম ধরে ডাকতে দিই না, ভাল লাগে না শুধু নয়, দিনের বেলা ও ডাক শুনলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। দিদির এত আদরের ডাক!'

'ও নাম বুঝি আপনার দিদির দেওয়া।'

'হুঁ।'

'তিনি বুঝি এখন স্বর্গে?'

'স্বর্গেও বটে, মর্তেও বটে। কেন আপনি কী জানেন না?'

আমি একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম। পুণ্ড্র বড় স্নেহশীল বুঝলাম। কিন্তু আমি কি-করে তার বাড়ির খবর জানব?

বাড়ি ফিরে দেখি সব অন্ধকার। পাড়াগাঁয়ের বিজলী বাতি নিয়মের ও ভদ্রতার তোয়াক্কা রাখে না, কল চালাবার সময় গোল হয় না, সাহেবদের কল কিনা, ধনিকতন্ত্র নির্মমভাবেই কাজ আদায় করতে জানে। গাড়ি-বারান্দায় প্রবেশ করা মাত্র দরোয়ান হাতলণ্ঠন নিয়ে হাজির, দাঁত বার করে। পিত্তি জলে গেল! বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে পড়লাম। বেয়ারা এসে ড্রয়িং রুমের টেবিলে একটা আলো বসিয়ে খাবার ঘরে আলো দিতে গেল। ভারী খারাপ লাগছিল। মানুষে আর কত আপ্যায়িত করতে পারে এ যুগে? ছেলেটিও বিমর্ষ হয়ে পড়েছে লক্ষ করলাম, যেন দাদা চুঁচড়ো থেকে ফিরলে সে বাঁচে, তার দায়িত্ব কমে। বল্লাম, 'তা তার কি হয়েছে? জীবনটাই এই রকম, accident will happen in best regulated families.'

'কি বল্লেন? ভারী সত্যি কথা। কে আর জানত দিদির আমার এই রকম হবে! এই ঘরে বসে আছি, ভাবছি দিদি এল পার্টি থেকে, না তার বদলে···যাকগে, কাল শুনবেন সব কথা, আজ ক্লান্ত আছেন।'

কি জানি কেন প্রাণটা ছাঁৎ করে উঠল। কার কথা বলছে? বৌদি নয়ত? বাড়ি অত অন্ধকার কেন? যেন মৃত্যুর ছায়ায় আচ্ছন্ন। যার দীপ্তিতে গৃহ সমুজ্জ্বল হত তারই অভাবে না কি?

'আপনি কার কথা বলছেন? আমার বৌদির কথা? তিনি ত' বাপের বাড়ি গিয়েছেন!'

'হাঁ ভগবান, বাপের বাড়িই বটে! পরমপিতার কোলে।'

মাথায় যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল, বুকের তার ছিঁড়ে গেল, পেটে যেন কে এক ধাক্কা মারলে, শরীরটা হালকা হয়ে গেল। সেই বৌদি। ওঃ সেইজন্য বাড়ি অন্ধকার, শহরে আলো নেই!

'কই, আমি কিছুই জানতাম না।'

'আপনি shock পাবেন বলে খবর দেওয়া হয় নি! দাদা নিজে দিতে চান না, তাই আমাকে এই অপ্রিয় কাজ করতে হল। তিনি আপনার বৌদি, কিন্তু আমার, আমাদের সকলের দিদি ছিলেন, মা ছিলেন।'

ছেলেটির চশমা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হল। আমি চুপ করে বসেই রইলাম। বেয়ারা খবর দিলে, খাবার তৈরি। এইখানেই নিয়ে আয়, সামান্য কিছু, ঐ ছোট টেবিলে রাখ। কিছু খেয়ে নিন, খেতে কি কেউ পারে? তবে দিদি না খাইয়ে কখনও ছাড়েন নি, তাঁর আত্মার তৃপ্তির জন্য কিছু মুখে দিন। তিনি অসন্তুষ্ট হবেন আপনি না খেলে, আপনাকে না খাওয়ালে। খাবার পূর্বে খবরটি দেওয়া উচিত হয় নি, কিন্তু ভাবলাম আপনি জানেন। তা ছাড়া, কখনই বা দিই বলুন, এই স'দশটা বাজল ব'লে! তখন হয়ত খুবই ভয় পেতেন, আমি একলা, আপনাকে নিয়ে কী করতাম। পরে যদি আপনার অসুখ বেড়ে যেত। আমি দাদাকে কী করে মুখ দেখাতাম? যা হয়, দু এক টুকরো রুটি ঐ ডিমের কারিটায় মেখে পিত্তি রক্ষে করুন। দুঃখুত' সারাজীবন ধরেই করতে হবে আমাদের!'

ড্রইংরুমের পর্দাগুলো কালো দেখাচ্ছিল— যেন কফিনের ঢাকা। ছাত থেকে যে লণ্ঠন ঝুলছিল তার শেডের ছবিটা ভীষণ দেখাচ্ছিল, যেন আমাদের দুঃখে অন্ধকারের প্রতিমা ঘরে আকাশ থেকে নেমে আসছে। হাতে রুটি নিয়ে কতক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম জানি না। গির্জার ঘণ্টায় দশটা বাজল, কবর দেবার সময় যেমন ঢং ঢং করে ভাঙা গলায় ঘণ্টা বাজে। আমার সঙ্গী বলে উঠল— 'এইবার! আর দেরি নেই! কোন ভয় নেই, কিছুই বলেন না। আমাদের স'য়ে গিয়েছে, এখন প্রতীক্ষাও করি, প্রথম কী হত ভগবানই জানেন!'

ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে তিনি সব বৃত্তান্ত বলে গেলেন। বৌদি কৃষ্ণভামিনী স্কুলের কমিটি মিটিংএ সন্ধ্যাবেলা যান। সোফেরারের অসুখ করেছিল, নিজেই হাঁকিয়ে যান। ফেরবার পথে এক বাসের সঙ্গে ধাক্কা খান। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু

হয়। দেহে কোন ক্ষতের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না, হৃৎপিণ্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। যখন বাড়িতে আনা হল, শেঠেদের গাড়িতে, তখন কে বলবে যে প্রাণ আর নেই। মুখে সেই হাসি, শুধু চোখ দুটো একটু বেশি জলজলে। দামি শাড়িপরা ছিল, একটু বিস্রস্ত পর্যন্ত হয় নি। যেন পার্টি থেকে নামছেন। আমি চুপ করে শুনে গেলাম— কি আর বলব? তার মুখটা আমার মানসপটে ভাসছিল শুধু। তাঁর দুষ্ট দুষ্ট হাসি মাখান মুখটি যে একবার দেখেছে সে কি কখনও ভুলতে পারে? যেমন পুরানো বাড়ির দেওয়ালে কোনো একটি দামী ছবি চিরকাল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ক'রে প্রত্যেক মনের আসবাবের সামিল হয়, তেমনি আমার বৌদির মুখখানা তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মনে চির-দিনের জন্য আপন হয়ে গিয়েছিল। সে ছবি ভোলবার নয়, যে একবার দেখেছে, সে আর কখনও ভুলবে না, ভুলতে পারে না।

'তিনিও আমাদের ভোলেন নি। তিনি আসেন।'

'সে কি?'

'হাঁ আসেন। প্রতি শুক্রবার আসেন, এবং বরাবর ওপরের ঘরে না গিয়ে ড্রয়িং রুমে এসে আপনার ঐ পাশের চেয়ারেই বসেন।' আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। 'শুক্রবার কেন?' 'শুক্রবার মারা যান। আমাদের রাত্রে খেতে বলেছিলেন, তারপর সেদিন ঠিক হয়েছিল দাদাকে নিয়ে একটু প্র্যাকটিক্যাল জোক করা যাবে! কী প্র্যাকটিক্যাল জোকই তিনি করলেন!'

'তিনি আবার কোথায় করলেন?'

'ভগবান করলেন, সেই একই কথা।'

'তিনি কি করেন এসে?'

'সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! রাত্রি ঠিক দশটা তের মিনিটে, আমরা ঘড়ি পর্যন্ত তাই দেখে মিলিয়ে নিই, গলির মোড়ে মোটরের হর্ন শোনা যায়, অল্পক্ষণ পরেই গেটের ফাটক খুলে যায়, ড্রাইভের পাথর কুচির ওপর দিয়ে মোটর আসবার কুড় কুড় শব্দ শোনা যায়। তারপর, তার পরের ব্যাপারটাই সব চেয়ে আশ্চর্য। দিদির প্রাণের পরিচয় পাবেন, তাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিত পাবেন শুনলে। আমরা বুঝেছি যে তাঁর প্রাণ এখনও আমাদের জন্য কাঁদে। অথচ তিনি চান না আমরা যেন কোন ভয়ের লক্ষণ দেখাই। তাঁর ইচ্ছা আমরা যেন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে গ্রহণ করি। তাঁকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করার অর্থই হল দুর্ঘটনাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করা, মৃত্যুকে অনাবশ্যক আড়ম্বরের সঙ্গে না ধরা। এই আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান নেই, ইংরেজ কবি যা বলেছেন, মৃত্যুটা নিদ্রা মাত্র, জার্মান

কবি গ্যেটে যা বলেছেন— The end of life is life। অতএব আপনি ভয় পাবেন না। পুণ্ডুবাবুর কথা সারগর্ভ হলেও আমার স্নায়ু এত শক্ত নয় যে আমি তৎক্ষণাৎ ভয়কে জয় করব কিংবা দার্শনিক গূঢ় তত্ত্বের আস্বাদ উপভোগ করব। আমি সত্যই ভয়ে কাঁপছিলাম স্বীকার করতে লজ্জিত হচ্ছি না। জীবজন্তুর প্রতি তাঁর ব্যবহার জানতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলাম। শুনলাম যা তা অভূতপূর্ব। গেট খোলার শব্দ হলেই তাঁর এক পোষা কাবলি বেরাল 'মিউ, মিউ' দুবার মাত্র আস্তে আস্তে ডেকে সিঁড়ি দিয়ে সরাসর নামে, তারপর বারান্দা দিয়ে এগোয়, মোটরের পা-দানিতে ওঠে, তিনি কোলে তুলে নেন। আলোগুলো তেজ পেয়ে জ্বলে ওঠে। তিনি হ্যাট-র‍্যাকে প্যারাসল রেখে বেরাল কোলে করে প্রবেশ করেন, মুখে তাঁর হাসি লেগেই থাকে। 'ঐ হর্নের আওয়াজ হল!'

তারপর কি হল সব লেখা যায় না। যতটুকু লেখা যায় তার দ্বারা ছোকরার সত্যবাদিতার প্রমাণই হয়। গেট খুলল, কুড় কুড় শব্দ করে গাড়ি বারান্দার নিচে থামল। মিউ মিউ শব্দ শুনলাম, এঞ্জিনের শব্দ বুকের মধ্যে হচ্ছিল, হঠাৎ এঞ্জিন থেমে গেল, আমার হৃদ্‌পিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। আমি চিৎকার করতে পারলাম না, পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতন চেয়ারে বসেই রইলাম। চোখের ওপর যে ছবি ভেসে উঠল তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। বেগুনে পর্দার ফাঁক থেকে দেখলাম— বাইরের সব বৈদ্যুতিক আলো যেন চতুর্গুণ তেজে জ্বলে উঠেছে, সেই হাস্যমুখী বৌদি আমার, তাঁর আদরের বেরাল কোলে করে এগিয়ে আসছেন। খুট্‌ ক'রে ছাতা রাখার শব্দ হল— তারপর পর্দা সরে গেল, ড্রয়িংরুমের আলো হঠাৎ জ্বলে উঠল, এ যে আমার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছেন! একটা অস্ফুট ধ্বনি আমার মুখ থেকে বেরিয়েছিল। তারপর বৌদির ঠোঁট নড়ে উঠল, তাঁর হাসি অদৃশ্য হল, মুখে ফুটে উঠল শঙ্কার চিহ্ন। খুব দূর থেকে একটা নাকিসুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম— 'এই যে ঠাকুরপো কখন এলে? মিটিং আর শেষ হয় না! দেরি হয়ে গেল ক্ষমা কোরো। খাওয়া দাওয়া হয়েছে ত? এ কী! তুমি যে একদম ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছ? তোমার হয়েছে কি? পুঁটু, বাড়াবাড়ি করেছ বুঝি? মাত্রা রাখতে পারনি? রোগী বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়!'

ছোকরাটি ধীরে ধীরে বলে, 'আমি কী করব! এধারে যে complete nervous breakdown, বেরাল দেখলে পর্যন্ত ভয় পান!'

মনোবিজ্ঞান

'তোমার মনোবিজ্ঞানের পায়ে গড় করি। ঐ কুপ্রবৃত্তিগুলি সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল, না, তোমরা নতুন করে মানব-প্রকৃতির ঘাড়ে চাপাচ্ছ? যা কেতাবে পড়বে তাই কি আমাকে শেখাতে হবে? যার নিজের মন পাঁকে ভর্তি সে-ই সুন্দরকে কুৎসিত করে দেখে। তোমার কথা শুনে সরল সহজ সম্বন্ধের মূল্য দিতে ইচ্ছা করে না।'

স্ত্রীর ঝাঁজের কারণ এই যে আমি তাকে Freud Jung-এর গভীর তত্ত্বগুলি বোঝাচ্ছিলাম অতি প্রাঞ্জল ভাষায়। সন্ধ্যাবেলায় বর্ষা নামল; পশ্চিমে বৃষ্টির ঝাপটা, তাই ছোট ভাইদের ঘরের দিকে জানলা দরজা বন্ধ করে পুবের জানলা খুলে দিয়েছিলাম। সারাদিন Flugel-এর Psycho-Analytic study of a Family পড়ে মাথা ধরেছিল, তাই মাথা পরিষ্কার করবার জন্য স্ত্রীকে নতুন মনস্তত্ত্ব বোঝাতে শুরু করলাম। লাভের মধ্যে প্রমাণ হয়ে গেল যে, আমার মন নিচু, পঙ্কিল ইত্যাদি। ইতিপূর্বে বহুবার উক্তরূপ প্রমাণ পেয়েছি বলে ধীরে ধীরে উত্তর দিলাম, 'তুমি যে কথাগুলি বল্লে— আমার সম্বন্ধে নয়, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে, সেগুলি ইতিপূর্বে বলা হয়ে গিয়েছে। তোমার মনোভাব রক্ষণশীলতার পরিচায়ক। তোমার আপত্তি হচ্ছে নতুনের বিপক্ষে পুরাতনের মামুলি আপত্তি। রক্ষণশীলতা সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ, অনেক সময় চরিত্রের লক্ষণ, যদিও সময় সময় স্থিতিশীলতার নামান্তর মাত্র।'

'তোমায় আর ব্যাকরণ-শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করতে হবে না— তোমার বাংলা ভাষার দৌড় জানা আছে।'

'মন ভারী পঙ্কিল, ভাষার শুচিতা দিয়ে মনের নিচতা ঢাকতে পারা যায় না কি? যাই হোক, কথা একটু অন্য ধারে চলে যাচ্ছে। Ludovici ঠিকই বলেছেন যে, মেয়েরা তর্কের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছতে পারেন না, tangentially বিপথগামিনী হয়ে পড়েন। এমন কি Arabella Kineley স্বয়ং এ-কথা স্বীকার করেছেন।'

'তার কারণ বোধ হয়, পুরুষের তর্কে কোন কেন্দ্র নেই!'

'ভেবে দেখলেই বুঝবে, আছে। মেয়েদের আলোচনার বিষয় যেমন পুরুষ, তেমন পুরুষদের হচ্ছেন মেয়েরা— এই কথাই নতুন মনোবিজ্ঞানে বলছে।'

'আমরা তোমাদের বিষয়ে কথা কই না গো, কই না। অত দাম্ভিক হয়োনা।'

'তোমরা হয় ত নিজেদের কথাই কও, আমরা কিন্তু তোমাদের কথা ছাড়া কই না।'

'তার কারণ তোমরা পাজি'— স্ত্রী হাতের পাখাটি ছুঁড়ে ফেলে ও-পাশ ফিরে শুলেন। আমিও অন্য পাশ ফিরে Flugel-এর মতামত সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত হলুম। বইখানি আমার মনকে বেশ একটু ধাক্কা দিয়েছিল, তবে বই পড়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ধাক্কা খাওয়া— পুরীর সমুদ্রতীরে, গোড়ালি জলে দাঁড়িয়ে, স্বামীর হাত ধরে, বাঙ্গালী রমণীর ঢেউ খাওয়ার মতনই খানিকটা।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় আবার পুবে হাওয়া দিচ্ছে। বেড়াতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ভাল লাগল না। স্ত্রী ইশারায় বল্লেন— 'অনেক কথা আছে, মূর্খ বাজে লোকদের সঙ্গে কথা ক'য়ে কী লাভ হবে?' ওপরতলায় এসে জানলার ধারে বসলুম। খানিক পরেই তিনি পানের ডিবে এবং দিয়াশলাই নিয়ে ঘরে এসেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে ভুরু কুঁচকে বল্লেন, 'আবার মেয়েদের বল curious!'

'ওগো, curious কথাটির ইংরেজীতেই খারাপ মানে— অন্যান্য ভাষায় অনুসন্ধিৎসুই বোঝায়! যদি অনুসন্ধান প্রবৃত্তি না থাকত তা হলে বিজ্ঞান, দর্শন সম্ভব হত না।'

'তবে মেয়েদের দোষ কি?'

'এই মাত্র যে তাঁদের প্রবৃত্তি Scientific নয়, বুঝেছ? অবশ্য আমি তোমার কথা শুনতে ব্যগ্র হইনি। আজ কতদিন পরে তুমি যে আমাকে তোমার প্রাণের কথা শোনাবে সেই জন্য আমার প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হয়েছিল। যদি সেই আনন্দের ঝলক আমার প্রাণপিয়ালা থেকে উপচে তোমার গায়ে লাগে, তা হ'লে হে সাকি! আমার কুত্র দোষঃ?'

'আবার সেই কান্তি ঘোষের ভাষা।'

'এ ত কেবল মুসলমানী ভাষা নয়, শেষকালে 'কুত্র দোষঃ' বোলে মুসলমানের জাত মেরে দিয়েছি। ভাষার পত্তনই সত্যকারের হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যপীঠ।'

'তা হোক, ও ভাষায় কথা বলো না।'

'কি ভাষায় বোলব?'

'কেন, আমি যেমন বলি।'

'ও বীরবলী ভাষা, যেমন বিদ্যাসাগরী ভাষায় লেখাও যায় না, কথা কওয়াও যায় না, তেমনই বীরবলী ভাষায় লেখা ত যায়ই না, কথা কওয়াও যায় না। উক্ত ভাষাটি কথা কওয়ার ভাষা নয় একেবারেই। প্রত্যেকেরই এক একটি

আলাদা ভাষা হওয়া উচিত, যেমন ধর্ম, ভাষা বাঙ্ময় জগতের ধর্ম বৈ আর কিছু নয়। তোমার কথা শুনে একটি ভাব মনে উঠছে, শোন বলি। দেখ, বিবাহের পূর্বে কুমড়ো ভাজা খেতুম না, এখন খাই ; জামার গলায় বোতাম দিতুম না, এখন দিই ; রাত্রে একটি ঘরে একলা শুতুম, এখন ভয় করে। আবার ধীরে ধীরে ভাষাও তোমার মত হয়ে যাচ্ছে, রং কিংবা চুলটি যদি হত ত ভালই হত !'

'থাক্, আর ঠাট্টা করতে হবে না— ছোট কাকিমার ভাই বল্লেন আমি ফ্যাকাশে হয়ে গেছি, চুল পাৎলা হয়ে গেছে— বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন— ছিঃ ছিঃ আমার লজ্জা করছিল ভারী।'

'এতে আবার লজ্জা কী ? আচ্ছা, বিবাহ কি স্বামী-স্ত্রী— পরস্পরের গলাধঃকরণের সংস্কৃত নাম ? চুম্বন বোধ হয় ঐ সত্যের দৈহিক প্রতীক মাত্র। ছেলেদের বই-এ পড়েছিলাম যে একটা সাপ আর একটা সাপকে গিলছে— খানিক পরে কিছুই রইল না— দুটো সাপই উপে গেল।'

'না, এখানে একটি সলুই থাকে।'

'ঠিক বলেছ তুমি দিব্যচক্ষে বড বড় সত্যের আভাস পাও !'

'আর তুমিও যে বিশ্লেষণ কর— কাল যা করেছিলে, তা বোধ হয সত্যি।'

'কী রকম ? ঠিক হতেও পারে, না-ও হতে পারে।'

'নিশ্চয় হতে পারে, আমি অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি।'

'পেতেই হবে।'

'নিজের মত সম্বন্ধে অত প্রগাঢ় বিশ্বাস রেখোনা। বেশি তর্ক না ক'রে শুনে যাও। কিন্তু তোমাকে বলতে ভয করছে, অভয দাও যদি তা হলে বলি। আমার বিশ্বাস— রাগ করবে না ত' ?'

'এই রাগ করব, রাগ করব suggestion দিয়েই ত আমাকে বদ্‌রাগী করে তুললে— যাই হোক্ বলে যাও, বিজ্ঞানের খাতিরে সব সইব !'

'আচ্ছা, তোমার দাদা যখন মারা যান তখন তোমার বৌদির বয়স কত ?'

'একুশ বাইশ।'

'তখন পর্যন্ত প্রবৃত্তিগুলি কি বেঁচে থাকে ?'

'খুব বেশি রকম—Freud বলেন, প্রবৃত্তির হাত থেকে কখনও উদ্ধার নেই। পুরাতন বিজ্ঞানে বলত প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী, এবং একটির সাহায্যে অন্যটিকে চাপা দেওয়া যায় চিরকালের জন্য, এখন বলা হচ্ছে যে চিরকালের জন্য চাপা দেওয়া যায় না, অজানিত ভাবে ঢাকা খুলে বের হবেই হবে, এবং ভীষণতর রূপে।'

'আচ্ছা, বৌদি তোমার দাদা মারা যাবার পর আর বাপের বাড়ি যান নি ?'

'না, তাঁর বাপের বাড়িতে কেউ নেই।'

'তা হলে চিরকালই এইখানে?'— এই প্রশ্নটি করেই স্ত্রী গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'হাঁ কেন? তোমার কি হয়েছে?'

খানিকক্ষণ পরে স্ত্রী বল্লেন, 'আচ্ছা, তুমি ত বল তোমার মনে কোন পাপ নেই, অথচ তোমার বৌদি শুচিবাইগ্রস্তের মতন কেন এত ঘরদোর সাজিয়ে রাখতে চান—কাউকে বাসি কাপড়ে ঘরে ঢুকতে দেন্ না?'

'আমার শুচিতার সঙ্গে বৌদির শুচিবাইয়ের কি সম্বন্ধ?'

'রাগ কোরবে না?'

'আবার। কি সম্বন্ধ বল না।'

'ভয় কোরছে যে বড।'

'বিজ্ঞানের কাছে ভয়! অভয় দিচ্ছি, বল!'

'এই নাও, ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর কি লিখেছেন পড়!'

বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে ডাক্তারবাবু লিখেছেন (পাতা ৮১ প্রবাসী বৈশাখ, সন ১৩৩২)—'এক স্ত্রীলোকের নিজের ঘর পরিষ্কার করিবার ঝোঁক অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে…চিকিৎসার সময়, মানসিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেল, স্ত্রীলোকটির মনে কোন সময়, অপবিত্র ভাবের উদয় হয়। তিনি তাহা মন হইতে নির্বাসিত করিয়া যাহাতে মনে কোনরূপ কলুষ ভাব উদিত না হয়, তাহাতে সচেষ্ট ছিলেন। এ ক্ষেত্রে রোগীর ঘর রোগীর নিজের দেহের প্রতীক-রূপে দেখা দিয়াছিল!'

সব প্রবন্ধটি না পড়েই স্ত্রীর কথার ভাবার্থটি সংগ্রহ কোরে নিলাম। ছিঃ— আমার মাতৃতুল্য বৌদি—তাঁর কাছে কি না আমি অন্যায় প্রস্তাব করেছি! জঘন্য কথা! মিথ্যা কথা!

দিন কয়েক মন ভারী খারাপ হয়ে রইল। বৌদির কাছে পান চাওয়া দূরে থাকুক তাঁর মুখপানে আর চাইতেই পারি না। মনকে প্রবোধ দিলাম এই বলে যে ডাক্তারবাবু হয়ত বিশেষ কোন স্ত্রীলোকের কথা বলেছেন— সাধারণ ভাবে বোধ হয় তাঁর কথা সত্য নয়। সব শুচিগ্রস্ততার কি একই কারণ? একটি সুকোমল মনের ওপর আমাদের নিষ্ঠুর আচারের ছাপ পড়েছে— এ ব্যাখ্যাও ত হতে পারে। কিন্তু আমরা আচারভ্রষ্ট, বৌদির বাবাও ছিলেন ঘোর অ-হিন্দু, বৌদির মা মারা গিয়েছিলেন অতি অল্প বয়সে— বৌদি পশ্চিমে বড় হয়েছিলেন, কোন্ প্রভাবে তিনি নিষ্ঠাবতী হয়ে উঠলেন? আর আমি চিরকাল তাঁকে দেবীভাবেই দেখে এসেছি। পনের দিন আমার মনের কি

অবস্থা ছিল তা ভগবানই জানেন— ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখরও সে-সময় আমার মনে শান্তি আনতে পারতেন না। তবে বৌদি কি আমাকে কুভাবে ভালবাসেন? তাও কি হতে পারে? তিনি যে 'তুই' ছাড়া 'তুমি' বলেন না। মন আর বাড়িতে দুদণ্ড থাকতে চায় না। স্ত্রীর আপত্তি অগ্রাহ্য করা আমার নিত্যকর্মপদ্ধতি হয়ে উঠল। একদিন রাগ করে স্ত্রীকে সাফ বলে দিলাম— 'তুমি আমার মনে অনেক অশান্তি এনেছ— তোমাকে দেখে, তোমার ব্যবহার ভোগ করেই Lawrence-এর Aaron's Road, England, My England-এর সারগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েচি। অন্য স্ত্রীরা ঝগড়া ক'রে ঘর ভাঙে—তুমি শিক্ষার গরব রাখ, তাই উক্ত কার্য psycho-analytically, গোপনে, কৌশলে সম্পন্ন করছ। কিন্তু আমি না রেগে তোমাকে বলছি যে, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে judicial separation, কী করব দেশে divorce নেই! Chancery আদালতের ভিতরে যত সুখ, বাইরেও ততোধিক!'

আমার স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করলে তিনি ঠোঁট ফোলাতেন, তিনি নিজে তাদের চেয়ে ভাল বলে নয়—তারা যে হিংসুটে, আর যে পরনিন্দা করে, আর কেবল তাদের ছেলেটি খিদে পেলে আসন পেতে খাবার চায় বলে বড়াই করার জন্য। তাই আমার কথা শুনে বল্লেন, 'তুমি তোমার বৌদিকে ভালবাস, তিনি কি তোমাকে ভালবাসেন আমার concern নয়, তুমি তোমার বৌদিকে নিয়ে থাকগে, আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও— সেই যেতেই হবে, দুদিন শান্তিতে শুধু থাকিবারে চাই একটি নিভৃত কোনে।'

রাগলেও কবিতায় কথা কওয়া যায়। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রীকে বাপের বাড়ি রেখে এলাম। তাঁদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে Flugel-এর গোটাকয়েক complex-এর বিরুদ্ধে সাবধান করে দিয়ে এলাম। একটি জ্বলন্ত দৃষ্টির স্মৃতি অন্তত একমাস ধরে আমার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করেছিল।

একমাস পরে একটি খোকা হল। বৌদি নাপিতের মুখে খবর শুনে আব্দার ধরে বসলেন 'এখনি আমাকে বৌএর বাড়ি নিয় চল।' আমি গর্‌রাজি হলুম— নাপিত পাঠিয়েছে বলে— ঘোর অসভ্যতা! বৌদি পুরাতন চাকরকে নিয়ে নিজেই চলে গেলেন। রাত্রে ফিরে এসে বল্লেন, 'ওরে ঠিক যেন রাজপুত্র! কাল সকালে গিয়ে দেখে আয়। হাঁারে— তুই বৌকে কি বলেছিস্ যে সে আমার পা ধরে ক্ষমা চাইলে?'

'আমি আর কি বলেছি! আজ দুই মাস ধরে তার খবরই পাই নি।'

'ভারী বীরপুরুষ! তার আগে?'

'কি জানি কি বলেছি মনে নেই। ও অবস্থায় স্ত্রীজাতি একটু কল্পনাশীল

হয়েই থাকেন— আর যদি আমি কিছু বলে থাকব তাহলে সে ক্ষমা চাইবে কেন ? সেই হয়ত বিপক্ষে কিছু বলে থাকবে, বোধ হয় অনুতাপ তার এতদিন পরে এসেছে।'

'তোমাদের ছেলেমানুষি কথা আর শুনতে চাই নি— যাই কাপড় ছাড়িগে, তুই যা।'

এই বৌদি, যিনি কারুর কথায় পর্যন্ত থাকেন না, তাঁকে অপমান। তিনি কি না— ছিঃ। খানিক নীরব থেকে আমি বৌদিকে বল্লুম—'আচ্ছা বৌদি, তুমি নিশ্চয়ই এ বাড়ির ছেলেকে ভালবাসবে ? এরি মধ্যে বোধ হয় ভালবেসে ফেলেছ ?'

'তোর ছেলেকে বাসব না ত কাকে বাসবো রে ? আমার আর কি আছে ? ছোট বৌ খোকাকে আমাকে একেবারে দিয়ে দিয়েছে।'

'সে ত হতে পাবে না।'

'এরি মধ্যে মায়া পড়েছে। দেখিস।' 'না, সে-জন্য নয়।' 'কেন ?'

'না, তাই বলছি ভালবাসায় ভাগ বসে না, কেউ বসতেও দেয় না, বিশেষ করে মেয়েরা, যাঁদের সম্পত্তিজ্ঞান ভয়ানক বেশি।'

'আমি ত ভাগ বসাব না আমি শুধু যত্ন করব, খোকা বৌএর ছেলেই থাকবে··· আমি হব তার ধাই মা।'

'হাঁ, তার প্রমাণ এরি মধ্যে পাচ্ছি— তাই আঁতুড়ে ছেলেকে ছুঁয়ে কাপড় ছাড়তে যাচ্ছ— তার পর যখন বড় বড় অত্যাচার করবে তখন দেখছি শুচিবাই-এর চোটে আমাদের পাগল করে তুলবে। যদি সত্যই তুমি তার মা হতে চাও, তা হলে, এই ব'লে দিচ্ছি এখন কাপড় ছাড়তে পারবে না— ঐ পরে তোমাকে বিছানা ছুঁতে হবে।' কথাগুলি বোধ হয় একটু উত্তেজনার সঙ্গেই বলেছিলুম। বৌদি আমার মুখের দিকে চেয়ে খানিক পরে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন— 'বেশ।' বৌদি intuition-এ সব বুঝলেন না কি।

'তা হলে একটি আকৃবরী নিয়ে ছেলের মুখ দেখে আয়,— আর গোটা কয়েক টাকা নিয়ে ছোট ছোট পেনি ফ্রক, বিছানা নিয়ে আয়, ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো।' 'ও সব আমি কিনতে পারব না— কাঁথা, ফ্রক! ছিঃ বৌদি, বাস্তবের গুণছুঁচ ফুটিয়ো না। তবে টাকার দরকার আছে বৌদি— বৌকে উপহার দেবার জন্য নয়, বই কেনবার— তবে, Psycho-analysis-এর বই কেনবার জন্য নয়।'

পরিশিষ্ট

রিয়ালিস্ট প্রসঙ্গে : রবীন্দ্রনাথ

কল্যাণীয়েষু,

তোমার দুখানি বই পেয়েছি, তার একখানি অর্থাৎ "রিয়ালিস্ট" — কাল সায়াহ্নে বৈদ্যুতদীপালোকে পড়া শেষ করলুম :— প্রথমেই পত্রের ভূমিকায় একটা কথা জানিয়ে রাখি। আজকাল কিছুদিন থেকে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছি— সেটা বয়সের ধর্ম। কিছুকাল পূর্বেই আমার যে মন ছিল সমুদ্রচর অষ্টপাদ জীবের মতো, যে জীব তার কর্ষণীগুলো দিয়ে আলোচ্য বিষয়গুলোকে আঁকড়ে ধরে তার থেকে খাদ্য শোষণ করে নিত, তার মানসিক মাংসপেশী আজ ঢিলে হয়ে পড়েছে, সেইজন্য সে আজ এলোমেলো চরে বেড়ায়, কিছুই ধরে বেড়ায় না। তাই হতাশ হয়ে আজকাল ছবি এঁকে কথঞ্চিৎ আত্মসম্মান রক্ষা করতে চেষ্টা করে। আমি যে জাতের ছবি আঁকি তাতে মনোনিবেশ বলে কোনো বালাই নেই, মাংসাশী মন লক্ষ্য সন্ধান করে শীকার করে, উদ্ভিজ্জাশী মন এদিকে ওদিকে যা পায় যেমন তেমন করে খাবলে বেড়ায়। আমার ছবির লক্ষ্য নেই, যেমন তেমন করে আঙুল চালাই। যা হোক একটা কিছু হয়ে ওঠে। বুদ্ধির চতুরাশ্রমের মধ্যে এইটেকেই বানপ্রস্থ বলা চলে— এতে সঞ্চয়ের লোভ নেই, কর্মের প্রয়াস নেই, যদৃচ্ছাক্রমে নিষ্কৃতির পথে চলা।

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার লেখা মাংসাশী মনের পথ্য— নখদন্তের জোর চাই, ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিশ্লেষণ করতে না পারলে গলাধঃকরণের উপায় নেই। তাই বোধহয় চর্ব্য পদার্থকে লেহ্যরূপে ব্যবহার করতে চেয়েছি। তাতে স্বাদ পাওয়া যায় না তা বলতে পারিনে, কিন্তু বাদ পড়ে অনেকখানি।

তোমার বইখানি সম্বন্ধে প্রথম নালিশ এই, পাতা কেটে পড়তে হয়েছিল, সংসারে আকাটা পাতার বই হচ্ছে নববধূ, নানা দাগ পড়া খোলা পাতা পুরাতনীর, অথচ তোমার গ্রন্থের বিষয়গুলিতে খোলা-

খুলি ভাবের অট্টহাস্য, বয়ঃপ্রাপ্ত চিত্তের সঙ্গে তার বোঝাপড়া। কিন্তু অত্যন্ত পেকে উঠেছে যে বয়ঃপ্রাপ্ত চিত্ত সে কি গল্প শুনতে চায়? তার সমস্ত ঝোঁক সন্ধান করবার দিকে— প্রকৃতি যা সাবধানে লুকিয়ে বেড়ায় তাকে টেনে বার করতে পারলে সে ভারি খুশি, সহজ বিশ্বাসী নাবালকদের পরে তার দয়ামায়া নেই। নাবালকেরা ধুলোবালি প্রভৃতি যা তা নিয়ে সৃষ্টি করে, অর্থাৎ তারা বিশ্বসৃষ্টিকর্তার নবীন শিক্ষানবীশ। তাতে এমন কিছু ভঙ্গি থাকে যাতে কল্পনার দৃষ্টিতে কোনো একটা রূপের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিতে পারে রূপ মাত্রই ছলনা, আমাদের তত্ত্বশাস্ত্রেও বলে সৃষ্টি মাত্রই মায়া। গল্পও সৃষ্টি, বিশ্বসৃষ্টির মতোই সেও ছলনা। কিন্তু ভালোবেসেছি এই চিরকালের ছলাকলা,— তাই রাজার মতো আরামে বসে আমরা জাদুকরকে ডাক দিয়ে পাঠাই, ফরমাস করি ইন্দ্রজালের,— বলি এমন কিছু করে তোলো ঠিক মনে হবে যেন দেখতে পাচ্ছি, রূপ দেখে মজ্‌তে চাই। কেন না সংসারে চারদিকে এমন সব ব্যাপারের মধ্যে আছি, ব্যবহারের ঘর্ষণে যার স্থূলবস্তু বেরিয়ে পড়েছে, যার মায়া-আবরণের লাবণ্য মুছে গেছে, কালি পড়ে দাগী হয়েছে, যা মনকে ভোলায় না। কেননা বস্তু মনকে ঘা দেয় উঁচট খাওয়ায়, রূপ মনকে ভোলায়। অতএব জাদুকর, ভোলাও আহত মনকে, ক্লান্তকে আরাম দাও।

সাবালক বলেন নিজেকে অমন করে ভোলানো ভালো নয়, ওতে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। রূপলুব্ধ বলে সংসার ক্ষেত্রে বাস্তবের সঙ্গে ঠেলাঠেলি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে থাকে, সেখানে পালোয়ানির চর্চার বিশ্রাম নেই। তাতে করে মানুষকে ভুলিয়ে দেয় এই বাঁও কষাকষি, এই ঘাড় ভাঙাভাঙি। ধুলোয় কাদায় উলটু পালটু খাওয়াই বিশ্ব ব্যাপারের পরম সত্য নয়। এটাই বস্তুত ঠকানো। অর্থাৎ চরম নয় উপকরণগুলো, চরম হচ্ছে অমৃত, রূপের সৌন্দর্য। মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, 'উপকরণবতাং জীবিতং' তিনি চান না, তিনি চান 'অমৃতম্'।

কত হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষ আপন সভ্যতার মধ্যে আপন রূপসৃষ্টির উদ্ভাবন করতে চেয়েছে। কেবলি বাইরের এবং অন্তরের সাজ বানিয়েছে। সে চায় আপনাকে শোভন দেখতে, নইলে তার লজ্জা হয়, নইলে তার চারিদিকের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। ভদ্র তাকে হতেই হবে, ভদ্র হওয়ার মানে এমন নয়, তার স্বভাবের উপাদানগুলোকে বাইরে মেলে দিতে হবে। হয় সেগুলোকে ভিতর থেকেই কোনো একটি উৎকর্ষের আদর্শে পরিণত করে তুলতে হবে, নয় বাইরের আবরণে তার রূঢ়তাকে ঢেকে রাখতে হবে। সেই ঢাকা দেওয়া পরস্পরকে সম্মান করা, নগ্নতা অসম্মান। এমনি করে কতক

সাধনার দ্বারা কতক আবরণের দ্বারা সভ্যতা আপন রূপকে পরিদৃশ্যমান করে তোলে। সভ্যতা সম্মিলিত মানবচিত্তের সৃষ্টি, এ সৃষ্টি বিজ্ঞানের দ্বারা নয়, জাদুর দ্বারা, যে জাদু রং ফলায়, রস জমায়, সুর লাগিয়ে দেয়। বিজ্ঞান-প্রবীণ একে ছেলেমানুষি বলতে পারে, কিন্তু এই ছেলেমানুষিই সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা বৈজ্ঞানিক হলে বিশ্ব বীভৎসভাবে অনাবৃত থাকত, তাহলে বৈজ্ঞানিককে ছুরি চালিয়ে নাড়িনক্ষত্র সন্ধান করতে হতো না। বাস্তব সংসারে ঘাত সংঘাত চলছে, সেখানে রূপ সম্পূর্ণ জমে উঠতে পারছে না— এই জন্যেই মানুষ আদিকাল থেকে কেবলি বলে আসছে গল্প বলো। অবাস্তবের মহাকাশেই সত্যকে সে দেখতে চায়। বীণাযন্ত্রের তার যেমন তেমন ভাবে আলগা হয়েই থাকে, সেই তার বেসুরো, মানুষ বলে না সেই তারে ঝঙ্কার লাগাও, যেহেতু আমি বাস্তবের আওয়াজ শুনব, সে বলে সাধাসুরের তারে আমি গান শুনতে চাই, সংসারে সেই সুর সর্বত্র শুনতে পাইনে বলেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকি। মানুষ এতকাল বলে এসেছে সাধাসুরের বীণাযন্ত্রে গল্প জমাও। আজ বলছে সাধাসুর বানানো সুর— ওতে সাহিত্যের এরিস্টোক্রেসি। তাকে মানব না, আমি চাই যদৃচ্ছাকৃত তারের ঝঙ্কার ক্রেঙ্কার হুঙ্কার— অর্থাৎ গান চাইনে, শব্দ চাই— শব্দ ডিমক্রেসি। শব্দ নির্মম বাস্তবতা, শব্দ চিৎকর্ষের আদর্শে ভোলায় না

মানবসংসারে ভোলাবারই একটা বিভাগ আছে, যাচাই বাছাইয়ের বিভাগ, মানুষের প্রকৃতিকে অতিপ্রাকৃতে নিয়ে যাবার জন্যে যুগে যুগে তার নিরন্তর আকর্ষণ, কেবলি সে সুর বাঁধছে, রসসাহিত্য সেই বিভাগেই তো পড়ে। যত কিছু রিট্রেঞ্চমেন্ট সে কি আজ সেই বিভাগের উপর দিয়েই যাবে? আজ রব উঠেছে আমি স্পষ্ট কথা কব— অনেক দিন থেকে মানুষ বলেছে স্পষ্ট কথা বোলো না, ঠিক কথা বলো। ঠিক কথা কাকে বলে? কাঁসরে লাঠি লাগ্‌লে সে অত্যন্ত স্পষ্ট কথা কয়, তাতে বধির দেবতা ছাড়া পাড়াসুদ্ধ অন্য সকলের কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে। জাপানী দেবমন্দিরে ঘণ্টার ধ্বনি শুনেছি, তাকে বলি ঠিক সুরের ধ্বনি,— এই ঠিক সুর অনেক যত্নে তৈরী ঘণ্টায় তবে ঠিকটি বাজে। মানুষ আপন সৃষ্টির আদর্শকে অনেক যত্নে খাঁটি করে তুলবে এই ছিল কথা— সে চেয়েছিল নিজের মূল্য কমাবে না, নিজেকে অনাদর করবে না। আজ সাহিত্য কি তার কানে কানে এই কথা বলবারই ভার নিয়েছে যে, আসলে তুমি আদরণীয় নও, যথার্থ ই তুমি অশ্রদ্ধেয়, অতএব ভড়ং কোরো না। তুমি কত নোঙ্‌রা তা দেখিয়ে দিচ্ছি— নোঙ্‌রা তোমার নাড়িভুঁড়ি রসরক্ত, নোঙ্‌রা তোমার মগজ, তোমার হৃৎপিণ্ড, তোমার পাকযন্ত্র। তোমার চেহারাটা উপরের খোলসমাত্র, সেই চেহারার বড়াই কোরো না— যারা ছবি

আঁকে তারা মিথ্যেবাদী, যারা মূর্তি গড়ে তারা খোশামুদে। অতএব গল্প বলব না, জোগাব মনস্তত্ত্বের তথ্য তালিকা।

একথা বলাবাহুল্য মানুষ নিছক জন্তু নয় এই কারণেই মানুষের স্বভাবে প্রাকৃতের মধ্যেই অতিপ্রাকৃত আপনাকে উদ্ভাবিত করছে— মানব স্বভাবের এই দ্বন্দ্ব সাহিত্যে প্রকাশ না পেলে সে সাহিত্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না এবং তাতে তার যথার্থ উপভোগ্যতা কমে। ছেলেভোলানো সাহিত্য তাকেই বলে যাতে সমস্ত কাঁটা ফেলে পাতে মাছ দেওয়া হয়— কিন্তু শুধুমাত্র কাঁটার চচ্চড়ি রাঁধাকেই যারা ওস্তাদি বলে ক্রূর হাস্য করে মাসিকপত্র দ্বারা তাদের কৃত নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করতে পারব না। সাহিত্য সাবালকের সাহিত্যই হোক, কাঁটার ভয় করব না যদি তাতে পুরো মাছটাকেই পাওয়া যায়।

গল্পের ছল করে তুমি যে-কথা বলতে চেয়েছ ব্যাখ্যান করে আমি সেই কথাই বলবার চেষ্টা করেছি। তোমার বইয়ের যে নাম দিয়েছ রিয়ালিস্ট্ তার মধ্যে বিদ্রূপের অট্টহাস্য রয়েছে। নিছক রিয়ালিজ্‌ম যে কত অদ্ভুত ও অসঙ্গত তা তোমার গল্পে ফুটিয়ে তুলেছ। মানুষ দুর্বৃত্ত হতে পারে স্বভাবতই, কিন্তু মানুষ রিয়ালিস্ট্ হবার জন্যে কোমর বাঁধলে সেটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েই। অর্থাৎ সেও হয় unreal, তুমি তোমার গল্পে বারবার দেখিয়েছ আদর্শবোধে রিয়ালিজ্‌মের যারা চর্চা করে তারা একটা ভঙ্গির সাধনা করে মাত্র, তারা নিজেরাও ভুলতে পারে না তারা রিয়ালিস্ট্ অন্যকেও ভুলতে দিতে চায় না ;— তারা রিয়ালিজ্‌মের পুতুলবাজি করে। এই সঙ্গে এই কথা বলাও চলে, আদর্শবাদেরও পুতুলবাজি আছে— সেইটেই যাদের একমাত্র ব্যবসা তারা ভুলে যায় মানুষ চিরকেলে অপোগণ্ড নয়, বাস্তবের পাথরবাটিতেই সত্যের পরিবেষণ সঙ্গত— ফীডিং বট্‌লটা লজ্জাজনক।

কাল রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত তোমার বইখানি পড়েছি। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে "বাঁশরী" নামক আমার নূতন লিখিত নাটকের ভিতরে ভিতরেও অবাস্তব রিয়ালিজ্‌মের প্রতি এই রকমেরই একটা হাসির আমেজ আছে। তোমার লেখনীর প্রতি আমার একমাত্র অভিযোগ এই যে, দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায় যারা আরামে অনায়াসে গল্প করতে চায় তাদের প্রতি ওর কোনো মমতা নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"অন্তঃশীলা"র বিচার

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

প্রতিবাদীর নাম—অন্তঃশীলা।

পিতার নাম—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

জাতি—মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস অথবা ঔপন্যাসিক মনস্তত্ত্ব।

বয়স—ছয়মাস।

নিবাস—হট্টমন্দিরে।

স্বামীর নাম—প্রবুদ্ধ পাঠক।

বাদী—রক্তলোচন সমালোচক।

অপরাধ—বইমাত্রই জন্ম-অপরাধী (আদম-হবার বংশধরের মতো!) যতক্ষণ না স্বীয় অস্তিত্বের সার্থকতা লোকসমাজে প্রতিপন্ন করতে পারে।

বিচারক ও কৌঁস্থলী—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

স্বপক্ষে বক্তব্য—

(১) বইখানির গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক না হলেও, বঙ্গ-সাহিত্যে নতুনতর। Virginia Woolfe-এর Mrs. Dalloway-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নায়কই প্রধান বক্তা বা মূল গায়েন। অন্যান্য চরিত্র দোহার মাত্র। বাহ্য ঘটনাও মেজ্‌রাফের মতো কেবল মনের তারে অনুরণন তোলবার জন্য যতটুকু থাকা আবশ্যক, তাই আছে।

(২) লেখকের খুঁটিনাটি বর্ণনার ক্ষমতা উপভোগ্য। কেউ ছবি আঁকে মোটা লম্বা দু'চার টানে কাঠামো গড়ে। কেউ শত-সহস্র সূক্ষ্মরেখা দিয়ে সেই কাঠামো ভরিয়ে তোলে। কিন্তু দুটোই ফুটে ওঠা চাই। এখানে দ্বিতীয় উপায়টাই অবলম্বিত হয়েছে। এর একজন বিশিষ্ট সমর্থকের কথা সেদিন কাগজে দেখলুম। Ruskin নাকি বলেছেন: **Greatness is the aggregation of minuteness; nor can its sublimity be felt truthfully by any mind**

unaccustomed to the affectionate watching of what is least.

(৩) গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কথোকথন ও মন্তব্যগুলি বেশ স্বাভাবিক মনে হয়। যথার্থ বই-বিলাসীর বর্ণনাটিও ভালো লাগে। বোধহয় নায়কটিকে প্রথম থেকেই বইয়ের পোকা ধরে নিয়েছি বলে।

বস্তুতঃ নায়কের পুস্তকপ্রীতি থেকে আরম্ভ করে দুর্গন্ধভীতি, সুগন্ধপ্রীতি, চা-সিগারেটপ্রীতি, এমনকি রমাপ্রীতিও (?) লেখকে আরোপ করতে কেন যে ইচ্ছে হয় বলা শক্ত। হয়তো এই মনে করে যে, উদো তার বোঝাটা প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব না করলে বুদোর ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টিত ও সক্ষম হয় না। তাহলে অন্ততঃ একথাটা মানতে হবে ত যে, একটা নকল মানুষকে আসল মানুষে পরিণত করতে লেখক কথঞ্চিৎ সমর্থ হয়েছেন; এবং গল্প লেখবার প্রধান উদ্দেশ্য সেই-পরিমাণ সিদ্ধ হয়েছে।

(৪) আর ভালো লাগে ঐ চিন্তাস্রোতের কুলুকুলুধ্বনি। বাস্তবিকইত জীবনক্ষেত্রে কর্মস্রোত ও চিন্তাস্রোত নিয়ত পাশাপাশি বয়ে চলেছে,—একটি প্রকট, অপরটি "অন্তঃশীলা",—এক তর্কের সময় ছাড়া! আমার মনে হয় এই জায়গায় লেখক তাঁর বইয়ের মূল সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছেন—

"অন্তঃশীলা ইতিহাসই হলো Pure novel…জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ, তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয় এরই বিচার ও মূল্যনির্ধারণই আর্টিস্টের কাজ—অভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতার তাৎপর্য গ্রহণ ও প্রকাশ। কিন্তু প্রধান কথা স্রোত চল্‌ছে— কুলকুল তার ধ্বনি, কুলকুল করে' কোথায় ভেসে যাচ্ছে কে জানে?…কেবল শোনা যায় কুল কুল শব্দ, কুল কুল কুল·· কুল—।"

(৫) বইয়ের চরিত্রের মধ্যে চাকর ক'টিই ভালো ফুটেছে আমার মনে হয়। সামান্য দু-চার টানে আঁকা হলেও চিন্তামণিকে (নামের গুণে তার খগেনবাবুর চাকর হওয়াই উচিত ছিল!) চেনা যায়, এবং মুকুন্দকেও দেখেছি বলে মনে হয়। বামুনটা একটু আত্মম্ভরী হলেও চাকর ভালো; যদিও মাইনে একটু বেশি! ওরকম চাকর পেলে কুগৃহিণী কেমন আরামসে তার উপর সংসারের ভার চাপিয়ে নভেল-পড়া ও পশম-বোনায় মনোনিবেশ করতে পারেন, তা ভাবলেও পুলকিত হতে হয়। আশাকরি রমলা •গিয়ে তাকে বেশি দাবিয়ে দেয়নি, গার্হস্থ্য-শাসনতন্ত্রেও তুয়াকি চলে না।

(৬) লেখকের (বা নায়কের) অনেক স্বগতোক্তির জলুস আছে, প্রমাণ-স্বরূপ যদৃচ্ছা কতকগুলি তুলে দিচ্ছি—

"মেয়েমানুষ হিংসেতে সব করতে পারে, কিন্তু ছেলের মা হতে পারে না।"

"শিক্ষাব মুখে ছাই, শিক্ষার দ্বারা ভালোবাসতে শেখে না, পরকে ভালোবাসাতে শেখায়।"

"ভাবতে ভয় হয়। পরিষ্কারভাবে দেখাই অন্যায়; ঘোলাটে অবস্থাতেই সোয়াস্তি।"

"হয়তো জন্মেছিলেন ভীষণ একলা হয়ে·· মনে কেউ যমজ হয় না, দেহেই হয়।"

"মাতৃগর্ভে অন্ধকার, কবরের মধ্যে অন্ধকার, মানুষ সীতার সন্তান, সীতাই হলেন আদিম মাতা।"

"পিন-এ আটকান মরা প্রজাপতি হওযার চেয়ে মরা গুটি হয়ে রেশমের যোগান দেওয়া ঢের বেশি সামাজিক কাজ।"

"যে রুচি কযেক বৎসর পবে জাহাজেব খোলে বন্ধ হাওযায় ভেপ্‌সে উঠে পচা অবস্থায় ভাবতবর্ষে হাজির হয়।"

"সব মনে থাকে না, পরে তৈরি করে মানুষে, আর সুবিধা বুঝে পূর্বতনের স্কন্ধে চাপায়।"

"পবিচযেব জন্য ধীর, শান্ত ও মৌন প্রতীক্ষার প্রয়োজন।"

"মেয়েরা সব কষ্ট সহ্য করতে পারে ···কিন্তু ভাববার কষ্ট সহ্য করতে পাবে না।"

"সত্য চিবন্তন নয়, কালোপযোগিতার খাদে অশুদ্ধ।"

"যেই সপ্তপদী শেষ হলো, অমনি সমাজ-ধর্ম জীবনের সব অর্থ, সব মূল্য সব তাৎপর্যকে চিবকালের জন্য স্থিরীকৃত করে দিলে।"

"স্বামীকে খুব ভালো না বাসলে স্ত্রী আত্মহত্যা করে না।"

"প্রত্যেক কথাব প্রত্যেক বাক্যে শিকড থাকে, অনুবাদক অপটু মালীর মতো গাছ উপডে ফেলে।"

"সাহিত্যের জন্য চাই অবসর, অবসরের জন্য বড়লোকের দল থাকতে বাধ্য, যাবা নিষ্কামভাবে চিন্তা করে যাবে।"

"ভিড আর স্ত্রীলোক একই বস্তু, দুটোই স্বাতন্ত্র্য বিরোধী", ইত্যাদি।

(৭) কথার বাঁধুনি ছাড়া লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টির কতকগুলি পরিচয় পেযে মন খুশি এবং চিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে। যথা, ট্যাক্সিতে যাবার সময়—

"খগেনবাবু সিগারেটটা উল্টে পাঁচ আঙুল দিয়ে ঢেকে রাখলেন। ফাঁক দিযে গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছিল, হাতটা ট্যাক্সির বাইরে রাখলেন।"

সাবিত্রীর মৃতদেহ বর্ণনায়—

"পায়ে সেই ছেলেবয়সে গরম দুধ পড়ে যাওয়ার দাগ।"

নায়কের রূপবর্ণনায়—

"কামালে দু'চারটে সাদা চুল থুৎনীতে দেখা যেত, অথচ অন্য কোথাও পাকা চুল নেই", ইত্যাদি।

নিশিতে ডাকার উপমাটি ঈষৎ দুর্বোধ্য হলেও সুন্দর, নতুন এবং ইঙ্গিতপূর্ণ।

মর্গের বর্ণনাটিও এত জীবন্ত যে, মনে হয় যেন স্বচক্ষে সব দেখছি। কারও কারও মতে প্রথম পরিচ্ছেদের অন্ত্যেষ্টি-সৎকারের বর্ণনাটি একটু অনাবশ্যকরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খ বোধ হতে পারে, কিন্তু সুচিত্রণের গুণে অপ্রীতিকর ব্যাপারও উপাদেয় হয়ে ওঠে, বিশেষতঃ যদি তার সঙ্গে রহস্যভেদের কৌতূহল মিশ্রিত থাকে। প্রথম পরিচ্ছেদটি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, এবং আগে বোধহয় স্বতন্ত্ররূপেই প্রকাশিত হয়েছিল; তবে এখানে সেটিকে পরবর্তী গল্পের ভূমিকা-স্বরূপ ব্যবহার করাটা অসঙ্গত হয়নি।

(৮) আদর্শবন্ধুত্ব সম্বন্ধে লেখকের ধারণা অতীব উচ্চ, এবং আশা করি সত্য। প্রেমের সঙ্গে বৃথা তুলনা বাদ দিয়ে, গভীর, স্থায়ী এবং একনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বলে একটা স্বতন্ত্র জিনিষ যে পৃথিবীতে আছে, তা কল্পনা করতে কার না ভালো লাগে, এবং পেতে কার না আকাঙ্ক্ষা হয়? তবে পেলে বুকটা 'ধ্বক্' করে ওঠে কি না, তা অবশ্য বন্ধুভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই বলতে পারেন। সকল আদর্শ বস্তুর মতো, এটিও যেমন বাঞ্ছনীয় তেমনি দুর্লভ,—সাধারণভাবে এইমাত্র বলা যেতে পারে।

এ স্থলে একটি অখ্যাতনামা ইংরেজ কবির পদ্যরচনা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

Each man a separate life must lead,
Each soul a separate path must wend;
Content am I if I succeed
In sometimes meeting with a friend.

বিপক্ষে বক্তব্য—

(১) সজারুর উপমাটা ভালো বুঝলুম না। হয়ত মানব বা জান্তব সজারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়াভাবাৎ। পুরুষ মানুষের অত ভয়ই বা কিসের?— তবে সংসারকে সমাজকে তারা অনেকে ভয় করে বটে। অথচ এই সমাজ, সংসার ও সংস্কারের ভিতর খাপ খাওয়া দুর্বলা নারীর পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। তাই হয়ত দুই দলে বনে না। পুরুষরা বেশি দৈহিক বা সাংসারিক ছাঁচের হলে অনেক সময় পাশবিক হয়ে পড়ে। আর মেয়েরা বেশি আধ্যাত্মিক বা মানসিক

ছাঁচের হলে কি হয় ?— 'নস্ত্রীক' বলে কোন কথা যদি না থাকে ত তৈরি করা উচিত।

(২) খগেন, সাবিত্রী, রমলা—কারোই চেহারা তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সময়ে সময়ে খুঁটিনাটি বর্ণনায় ধরি-ধরি মনে করি ; কিন্তু এদের পরিচ্ছিন্ন রূপ মনশ্চক্ষের সামনে ভেসে ওঠে না। 'ভাবৈকরূপং'-এ পাঠকের বিশেষত পাঠিকার মন সন্তুষ্ট হয় না।

(৩) আর এত নাম থাকতে 'খগেনবাবু' কেন ?—নামটাতে আমার আপত্তি আছে। যেটুকু পরিচয় তাঁর পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ও নামটা খাপ খায় না। সাধারণ নাম দিতে চাইলে ত পরেশ, সুরেশ, রমেশও ছিল—বিশেষতঃ শেষটা।

(৪) কীর্তনটা প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয় ; যেন বর্ণনা করবার জন্যই তার অবতারণা করা হয়েছে। ওটা নিজগুণে একলাই দাঁড়াতে পারে ; মূল গল্পের পূরের পক্ষে যেন একটু ভারি হয়েছে। তাছাড়া অতক্ষণ রমলা দেবীর ওখানে জিরবার পর খগেনবাবুর মাথাটা আর একটু ঠাণ্ডা ও পা-গুলো আর একটু চালু হওয়া উচিত ছিল।

(৫) মানুষ ছাড়া জিনিষেরও দুই একটি নামকরণে আমার আপত্তি আছে, বা ছোট হলেও কাঁকরের মতো চোখে কানে বেঁধে। 'ডিস্' এবং 'কাপ' বলা হয় কেন ? পেয়ালাপিরীচ কি যথেষ্ট চল্‌তি বাংলা শব্দ নয় ? এ বইয়ে না থাক্, প্রায়ই বাংলা গল্পের বইয়ে 'কাপ'-এর ছড়াছড়ি দেখি ; আর এখানেও ত 'ডিস্' গড়াগড়ি যাচ্ছে। যদিও বা 'কাপ'-এ পেয়ালা বোঝায় ত, 'ডিস্'-এ কিছুতেই পিরীচ বোঝাতে পারে না। 'বাথরুম' কথাটাতেও আমার ঘোর আপত্তি এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখি। 'স্নানের ঘর' বা 'নাবার ঘর' কি দোষ করলে ? যদি বল ঘরটা ইংরেজদের নকলে করা হয়েছে, তবুও স্নান জিনিষটা ত খাঁটি স্বদেশী ?— বরং ওরা আমাদের কাছে প্রাত্যহিক স্নান শিখেছে বলে শুনতে পাই।

(৬) কিন্তু কুলুকুলুধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লে ত চলবে না—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ! নইলে দেখবে,

'নিদ্রার আবেশে ঘোর
গৃহেতে পশিল চোর
কণ্ঠের কাটিল ডোর
মণি হরে নিল !'

সাবিত্রীহরণ না হোক, সাবিত্রীমরণ ত হলো ; আর তাকে বাঁচাবার জন্য

কোন জাগ্রত সত্যবানকে হাতের কাছে পাওয়া গেল না। তার জন্ম দায়ী কি ঐ সর্বনেশে চিন্তাজ্বর নয়? সর্বমত্যন্তগর্হিতং। নজির হিসাবে পূর্বোক্ত কাগজে পঠিত আর একজন বড় লেখকের উক্তি উদ্ধার করতে পারি। Coleridge নাকি বলেছেন আমরা (আধুনিকরা?) হচ্ছি 'a mindridden race।' এর উপর Arundale সাহেব মন্তব্য করেছেন যে, 'Intellect was being served to the exclusion of, and at the cost of the other faculties, especially the emotions.'

সেই জন্যই হয়ত (মাসিমার মতে) আধুনিকাদের emotions শুকিয়ে গেছে?— অপর পক্ষে কারো কারো মতে তাঁদের intellectও গজায়নি। তবে কি 'ধোবিকা কুত্তা, ন ঘরকা, ন ঘাট্‌কা' সেই দশা হয়েছে তাঁদের?

এই বইয়েতে একটি ক্রিয়াশীল বা ক্রীড়াশীল মনের স্পর্শ পাওয়া যায়,— কিন্তু সেটি একটু বেশি সক্রিয়। মন হচ্ছে সেই জাতীয় জিনিষ, যাকে নাই দিলে মাথায় চড়ে, তাকে বেশি প্রশ্রয় দিতে নেই। নূনের মতো, তা সব তরকারিতেই লাগে, কিন্তু অবিমিশ্রভাবে সুখাদ্য নয়। খগেনবাবু কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় চিন্তাশীল। সেই তবলার বোলের মতো— 'রাতদিন চিন্তা, এ কেবলি চিন্তা' ইত্যাদি।

(৭) আমরা কত সেকেলে হয়ে পড়েছি, তার প্রমাণ পদে পদে পাই। মির্জাপুরের যে গলির মধ্যে মোটর পর্যন্ত ঢোকে না, তার কোন বাড়ির ভিতর কি অতবড় নাবার ঘর থাকা সম্ভব?— অবশ্য ফরমাস দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে; আর গোড়াতেই তার বিশেষত্ব উল্লেখ করে দোষ কাটিয়ে রাখা হয়েছে। তা যেন হলো; কিন্তু বাঙালী হাজার সাহেব কিম্বা মেম হলেও, ক'জনে লম্বা টবে হেলান দিয়ে স্নান করে, বা সুগন্ধী লবণ জলে ব্যবহার করে?— হতে পারে আজকাল করে। আর তারা কি সবাই চায়ে loaf-sugar খায়?

(৮) আর একটা বিষয়ে খটকা লাগে। বিলাতফেরৎ, ব্রাহ্ম কিম্বা হিন্দু, যে কোন ভদ্রঘরের অল্পবয়স্কা মেয়ে অবশ্য ঘটনাচক্রে রমলা দেবীর মতো একলা থাকতে বাধ্য হতে পারে। নেপথ্যের বর্ষীয়সীকে না হয় ছেটে ফেল্লুম। কিন্তু তদুপরি যদি যুব-বন্ধুদের সেখানে অবাধ গতিবিধি থাকে— এমন কি সদ্যো-বিপত্নীক বন্ধুপতি অম্লানবদনে সেখানে রাত্রিবাস ও স্নানাহার করেন, তাহলে সমাজের উপর একটু জুলুম করা হয় না কি?— দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজেরও একটা মন আছে। স্বাধীন জেনানা আকাশকুসুম মাত্র,— বিশেষতঃ এ দেশে। People don't do these things.

(৯) গল্পের আখ্যানভাগটি খুব প্রাঞ্জল নয়; অর্থাৎ সাবিত্রী এবং রমলা

দুজনে কেন স্ব স্ব স্বামীকে ত্যাগ করলে, তা শেষ পর্যন্ত ঝাপ্‌সা থেকেই যায়।

অবশ্য ছবির মতো গল্পেও আলোছায়া চাই; কাউকে আবছায়ায় রেখে কারো উপর খররশ্মিপাত করা চাই; অনেক কথা স্পষ্ট করে না বলে আভাসে ইঙ্গিতে জানানো চাই, তবেই সমগ্র ছবি ফুটে ওঠে— এই রকম শুনেছি। রমলার ঘটনাটা বোধহয় Forsyte Saga-র Irene-র উপর Soames-এর অত্যাচারের অনুরূপ হবে; সে বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভালো। রমাপতিরই বা শেষ গতি কি হলো?

(১০) চিন্তাশীলের চিন্তার ধারা সব সময়ে অনুধাবন করতে পারিনে। কিন্তু সেটা হয়ত লেখকের চেয়ে পাঠক কিম্বা পাঠিকার দোষ বেশি। বইখানি তৃতীয়বার পড়লে হয়ত পরিষ্কার বুঝতে পারতুম কথোপকথনচ্ছলে কোন্ পক্ষ কোন্ মত সমর্থন করছেন এবং নায়ক শেষ পর্যন্ত জীবন-সমস্যার কি সমাধান করলেন; বা কিছু করতে পারলেন কি না। কিন্তু 'ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা।' বোঝবার অল্প চেষ্টা সাধারণ মনকে সতেজ করে (যেমন ধাঁধা); কিন্তু বেশি চেষ্টা সেই মনকে শ্রান্ত করে (যেমন অঙ্ক)।— অবশ্য কার কোথায় শ্রান্তি আসে, সেটা তার মানসিক স্তরের উপর নির্ভর করে।

সব কথোপকথন নাট্যাকারে লাইনপরম্পরায় সাজালে ভাল হতো। স্থানে স্থানে স্থানে উত্তর-প্রত্যুত্তর একাকার টানাভাবে ছাপানোর দরুণ সব সময় বোঝা যায় না যে, কে কোনটা বলছে এবং ব্যক্তির চেয়ে মতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

বাহাজ

লেখক আধুনিক বঙ্গমহিলার পক্ষপাতী নন। কোন দেশে কোনকালেই সমসাময়িকে লোকের মনস্তুষ্টি হয় না; হয় আগে ভালো ছিল বলে বিশ্বাস, নয় পরে ভালো হবে বলে আশা থাকে। অবশ্য ত্রিকালজ্ঞ হবার সৌভাগ্য সকলের হয় না; কিন্তু দ্বিকালজ্ঞ আমরা সকলেই হতে পারি এবং হয়ে থাকি। আমরা প্রত্যেকেই নিকট অতীত ও নিকট ভবিষ্যতের মধ্যবিন্দু। তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছের ছায়ার মতো অতীতটা দীর্ঘতর হতে থাকে বলে তার প্রতিই আমাদের ভক্তি বেশি।

দিবস ফুরায় যত ছায়া যায় দূরে তত
কভু না ছাড়ায় তবু পাদপবন্ধন।

* * *

লেখকের মতে মেয়েরা ভাবেন না, ভাবতে ভালোবাসেন না। কথাটা সত্য।

সাধারণ বাঙালী মেয়ের সেই অবকাশ নেই, সে শিক্ষা নেই, সে ইচ্ছে নেই, সে প্রয়োজন নেই,— হয়ত সে মাথাই নেই। মাথা নেই তার মাথাব্যথা। কিন্তু সেটাত বাঙালী পুরুষদের পক্ষে ভালোই। মেয়েদের মাথায় ব্যথার চেয়ে হাতে হাতা থাকাতেই তাঁদের মঙ্গল বেশি। অন্নপূর্ণা ভাববেন কখন? তাঁর ত ভাত বাড়তে ও সিদ্ধি ঘুঁটতেই সময় যায়; আধুনিককালে যাকে সংক্ষেপে রন্ধন ও রঞ্জনবিদ্যা বলে নির্দেশ করা যেতে পারে। ভাবতে পারেন, ভাবে বিভোর হতে পারেন ভূতভাবন ভোলামহেশ্বর,— ধূর্জটি, প্রমথনাথ, পশুপতি, গিরিজাপতি, যে নামেই তাঁকে অভিহিত করি।

* * *

একেলে মেয়েদের বিরুদ্ধে আর একটা গুরুতর অভিযোগ আছে। তারা নাকি ভালোবাসতে জানে না, শুধু ভালোবাসাতে জানে। তবু ভালো. সে ও ত একটা দুর্লভ ক্ষমতা। অবশ্য মাসিমার মুখে একথা বসিয়েছেন, কিন্তু লেখক শতমুখ হলেও একমন। স্বীকার করছি, আগে যেমন পাত্রাপাত্র-নির্বিশেষে মন ঢেলে দেবার জন্য মেয়েরা যেন হাতে করে নিয়ে বসে থাকত— 'এইবার বলিলেই দিব'—গোছ ভাবে. তার তুলনায় আজকাল হয়ত তারা হাত গুটিয়ে রাখে, সৎপাত্রের অপেক্ষায়। কিন্তু অত সোজায় ও সস্তায় মন পাওয়ার চেয়ে, একটু যোগ্যতা অর্জনপূর্বক পেতে হলে কি তার মূল্য বেশি হয় না? আজকাল মেয়েরাও হয়ত মনে মনে বলে থাকে: 'হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়', কিন্তু যাকে-তাকে দিতে চায় না,— এই যা তফাৎ। কেনই বা দেবে?— মন কি একটা ফেল্‌না না খেলনা?

যদি যোগ্য পাত্র অনেকে না পায় ত সেটা তাদের দোষের চেয়ে দুর্ভাগ্য বেশি। মেয়েদের মন কাড়তে যে না পারে, সে পুরুষের পৌরুষ কিসের?— অবশ্য দুর্বলেতেও কাড়ে, অসহায়েতেও কাড়ে। রবীন্দ্রনাথ কোথায় যেন এই ভাবের কথা বলেছেন না? যে, মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখে আপন করাই মেয়েদের আসল কাজ, তা সে যতই তুচ্ছ ও নগণ্য হোক না কেন। যদি সর্বদা যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন হয়, তবে অযোগ্যেরা যায় কোথায়? 'গুণহীন যে সন্তানগণ মাঝে' ইত্যাদি। তাহলে বলা যেতে পারে মেয়েরা যে-অংশে জননী, সেই পরিমাণে অধমতারণ, আর যে-অংশে প্রিয়া, সেই পরিমাণে বর-বরণ করে। এবং আজকাল প্রিয়াজাতিরই প্রাধান্য বলে যত গোল হচ্ছে। এতক্ষণে থিওরি টাঙ্গাবার একটা পেরেক পাওয়া গেল, বাঁচা গেল।

* * *

লেখক যে মেয়েজাতটাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না, তার একাধিক প্রমাণ

উদ্ধার করতে পারতুম, কিন্তু পাড়াকুন্দুলী নাম কেনবার ভয়ে বিরত হলুম।

কেবল এইটুকু না বলে থাকতে পারছিনে যে, খগেনবাবুর মতো পুরুষের উপরও মেয়েদের বিশেষ শ্রদ্ধা থাকে না— ভালোবাসা ত দূরের কথা। সাবিত্রী মল্লিকাণী সম্বন্ধে একটি অতি স্বাভাবিক, নিরীহ প্রশ্ন করায় ভদ্রলোক নাকি চটেমটে সরতে সরতে একেবারে শিবপুরে গিয়ে হাজির! সাধারণ না হবার এরকম অসাধারণ ক্ষমতা, এরকম শুচিবাই সচরাচর মানুষের বা পুরুষের দেখা যায় না,— সৌভাগ্যবশতঃ। সাধে স্ত্রীবেচারি আত্মহত্যা করেছিল?—করে নিজেও বাঁচল, তাকেও বাঁচালে। আশা করি ঠেকে শিখে দ্বিতীয়পক্ষের সঙ্গে ভদ্রলোক একটু ভদ্র ব্যবহার করবেন। এই শিক্ষার ফলেই সে হয় মাথার মণি, আর তার অভাবে প্রথমটি হয় শ্রীচরণে-ষু! ওরকম আত্মকেন্দ্র, গ্রন্থসর্বস্ব, অকর্মণ্য, "অসম্ভব" জীবকে কোন মেয়ে যে কি করে ভালোবাসতে পারে;— অথচ সাবিত্রী রমলা দুজনেই ত বেসেছিল। সাবিত্রী নিজের স্বামী বলে, এবং রমলা পরের স্বামী বলে? এবং দুজনেই, অসহায় ও আতুরে বলে?— সময়ে সময়ে তার উপর মায়া হয় কিন্তু সত্য। আবার সময়ে সময়ে বিজনের সঙ্গে একমত হতে হয়।

রমলা দেবীর মতো 'ভীষণ গালাগালি' দিচ্ছি?— কি করব, স্ত্রী-পুরুষ গোড়া থেকেই স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢালা. এই জাতিভেদই আদিম ও আসল জাতিভেদ, বিধাতার স্বহস্তনির্মিত জাতিভেদ, যে ভেদেব উপর ভিন্ন মিলন সুপ্রতিষ্ঠিত হয না; যে ভেদ ঘোচাবার সাধ্য কারো নেই— এক শিশুজাতিসঙ্ঘ ছাড়া! সাবিত্রীর ছেলে থাকলে কি সে মরতে পারত?

রায়

অতঃপর? রাণীর কি মত? এক জায়গায় ত 'আমার কথাটি ফুরলো' বলতে হবে, নইলে প্রস্তাব ক্রমেই দীর্ঘ ও জটিল হয়ে পড়ছে।

লেখকের পাণ্ডিত্য আছে, সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, রসবোধ আছে,—ভূয়োদর্শন, ভূযোপঠন ও ভূয়োচিন্তন আছে। মালমসলা সবই আছে, তবে ইমারত গড়েছেন কিনা; রঙরেখা সবই আছে, তবে ছবি এঁকেছেন কিনা; সে বিষয়ে আমি নীরব, কারণ বুঝতে অক্ষম। মেয়েরা যেমন চাল ঝাড়তে, ডাল বাছতে (এবং আজকাল হয়ত প্রুফ দেখতে) পটু; আমি তেমনি বিশ্লেষণ (না আজকাল বুঝি বলতে হয় 'বিকলন'?) করতেই পারি। একটা চৌকোষ সমালোচনা গড়ে তোলবার ক্ষমতা আমার নেই। গল্প উপন্যাস পড়ে ভালো-মন্দ লাগা সম্বন্ধে দু'কথা হয়ত গুছিয়ে বলতে পারি; কিন্তু গল্প লেখবার আইন-

কানুন জানা না থাকায় বে-আইনী কাজ ধরতে পারিনে। বিচারকের বিচার করে কে ?

সুতরাং পিঠ-থাবড়ানোর পক্ষে সুবিধাজনক কিন্তু আসলে আরামদায়ক এই উচ্চাসন থেকে নেমে পড়ে হাঁফ ছাড়বার আগে খগেনবাবুকে অপর এক কবির কথায় যৎকিঞ্চিৎ হিতোপদেশ দিয়ে এই বাগাড়ম্বরের উপসংহার করি।— মধুরেণ সমাপয়েৎ।— বইখানি আমার ভালো লেগেছে, এইটেই লাখ কথার এক কথা এবং সমালোচনার শেষ কথা।—

There are hermit souls that live withdrawn
In the place of their self-content ;
There are souls like stars, that dwell apart
In a fellowless firmament ,
There are pioneer souls, that blaze their paths
Where highways never ran—
But let me live by the side of the road,
And be a friend to man.

* * *

Let me live in a house by the side of the road,
Where the race of men go by,—
The men who are good and the men who are bad,
As good and as bad as I.
I would not sit in the scorner's seat,
Or hurl the cynics ban—
Let me live in a house by the side of the road,
And be a friend to man.

বয়ান্-ই-তহ্রিরি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাহেস্-এর পূর্বেই বয়ান্-ই-তহ্রিরি আদালতে দাখিল করা হয়। কিন্তু রায় যখন অনেকটা আসামীরই স্বপক্ষে তখন 'বয়ান্'-পেশে দেরী হলে কোনো ক্ষতি নেই।

বিপক্ষে বক্তব্যের জবাব-উল্-জবাব দিচ্ছি। কিন্তু তার পূর্বে, প্রথমেই বিচারক ও কৌঁসুলীর একাধারত্ব সম্বন্ধে আপত্তি হুকুমে হাজির করছি। ইংরেজের আইনে বিচারক ও কৌঁসুলী পৃথক ব্যক্তি। যদিও রাজ্য-সংক্রান্ত বিচারে নয়। আসামীর অপরাধ পলিটিক্যাল নয়, সাহিত্যিক। দফা পিছু জবাব দিতে পারব না।

(১) সজারুর উপমা আমার পূর্বে একজন দার্শনিক ব্যবহার করেছেন, নাম তাঁর শপেনহ'র। খবরটি পরে টের পাই। কাফ্‌কা নামে একজন উৎকৃষ্ট গল্পলেখক ঠিক ঐ ব্যাপারে মানুষকে ferret বলেছেন। কৌঁসুলী কি হিন্দুপরিবারে বিবাহের রাত্রে সোনার সজারু দেখেননি? উপমার সার্থকতা খগেনের উত্তেজিত মেজাজে। Morgue থেকে স্ত্রীর শব নিয়ে খগেন ঘাটে গিয়েছে, যুবকবৃন্দ চলে গেল,— খগেন একলা হলো। তার একাকিত্ববোধ আবার জেগে উঠল সংসারের কাঁটার খোঁচায়! তার একাকী, নিরালম্ব হবার সাধনাই বইখানির একটি বিষয়। একাকী হওয়া যায় না, বিশেষতঃ খগেনের মতন লোকের পক্ষে . এই অক্ষমতাই হলো লোকটির ট্রাজেডি। 'পুরুষরা বেশি দৈহিক বা সাংসারিক ছাঁচের হলে, অনেক সময়ে পাশবিক হয়ে পড়ে'·· মেয়েরা অন্ততঃ অতিরিক্ত সাংসারিক হলে, অর্থাৎ সংসারের সঙ্গে খাপ খেলে নিতান্তই জৈব-ধরণের পরাশ্রিত হয়ে ওঠে। ঐ ধরণের মেয়েদের Parasitical বলা চলে। Parasites alone are most well-adjusted to their environment. সাবিত্রী ঐ ধরণের, রমলা নয়। সেইজন্য খগেনের রমলাকে বেশি ভালো লাগে। রমলা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার খাপ খায় না— তার

মধ্যে পুরুষালী ভাব আছে। এই চরিত্র কি এতই কল্পনাতীত যার ব্যবহার সম্বন্ধে বলা চলে— People don't do these things ?

(২) চরিত্রের পরিচ্ছিন্ন রূপ যদি প্রথম থেকেই ফুটে ওঠে, অবশ্য নভেলে তবে তার পরিণতি থাকা অসম্ভব। চিত্রের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র; নভেল চিত্র নয়, অন্ততঃ অন্তঃশীলা ত নয়ই। খুঁটিনাটি বর্ণনা জড় করে পাঠক-পাঠিকার মনে কোনো একটি চিত্র ফোটান নয়, ভাবের সঞ্চার করাই অন্তঃশীলার লেখকের উদ্দেশ্য। পাঠকের রসবোধ মিনার্ভার মতন আবির্ভূত হবে, না তারও একটা ইতিহাস থাকবে? যদি কোনো স্ত্রী ফুলশয্যার রাত্রেই স্বামীকে বলেন, 'যা উপহার দেবে আজই দিয়ে দাও— অন্ততঃ তার একটা ফর্দ দাও, সেই কবে তুমি গত হবে, তোমার ইনসিওরেন্সের টাকা পাব! তার চেয়ে আজই বোঝাপড়া, লিখিত পড়িত হয়ে যাক্', তখন স্ত্রীর ব্যবহারিক বুদ্ধির তারিফ করতে স্বামী বাধ্য অবশ্য, কিন্তু ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে যাবেন না কি? আমার উত্তর, চরিত্র ফুটিয়ে তোলা লেখকের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ তিনি জানতেন সেজন্য অন্য মনের ক্যাম্বিশ কি প্লেট চাই। লেখকের মতে রূপ কিম্বা চিত্র পাঠকেরই দান। লেখক মোটেই বিশ্বাস করেন না, যে দু একজন ভিন্ন কোনো সাহিত্যিকের চোখের সামনে পূর্ব থেকে কোনো চরিত্রের সমগ্ররূপ ভেসে ওঠে। যদি তাই হয়, তবে সে রূপ নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তির হতে বাধ্য, নচেৎ আর্টিস্ট হবেন একজন medium মাত্র।

খগেনবাবুর নামে কৌস্তুলীর 'অরুচি' নামে রুচির মতনই ভক্তি-সাপেক্ষ!

(৩) কীর্তনটা প্রক্ষিপ্ত নয়, বইখানির একটি প্রধান অঙ্গ। নগর-কীর্তন কেবল ভিড়ের কোলাহল—খগেন চায় ভিড় থেকে নিজেকে সরাতে— সে সত্যকার 'বিরক্ত'। বিরাগ-সাধনের গোড়ায় থাকে বিরক্তি, সেই বিরক্তি দিয়েই সে ভিড়কে দেখেছে, যেমন দেখেছে, ইনস্টিটিউটের সামনে মোটরের ভিড়কে। খগেনের বিরক্তভাব (দুই অর্থেই) মনে রাখলে কীর্তন প্রক্ষিপ্ত মনে হতো না। বইখানি study in temperament বলা চলে— অন্ততঃ লেখকের উদ্দেশ্য ছিল তাই, চরিত্র-চিত্রন নয়।

কোন্‌টা প্রক্ষিপ্ত আর কোন্‌টা উপযুক্ত বিচার হবে নভেলের আঙ্গিকের দিক থেকে। অন্তঃশীলার আঙ্গিক সঙ্গীতের, যন্ত্রসঙ্গীতের। বিদেশী সঙ্গীতে বিশেষতঃ fugue-এর, যাতে subject, একাধিক Counter-subject থাকে, একটি অন্যটির জবাব, মাঝে মাঝে ঝগড়া, গড়ে তৈরি হচ্ছে রূপ নয়, style; Bach's fugues are not a form but a style— মন্তব্যটি বিখ্যাত। তাতে counter point আছে— যেন কার্পেট বোনা হচ্ছে। সাহিত্যে vertical

কিম্বা block harmony চলে না— চলে horizontal harmony, যেটা উপভোগ করা বাঙালীর পক্ষে শক্ত নয়, ভাবতাম। দেশীযন্ত্রের মধ্যে সুরবাহার-সেতারের যোড়, লড়ি, লড়গুথাই-এর আঙ্গিক গৃহীত হয়েছে। ঠোক্‌ও আছে। কৌসুলী বিদেশী ও স্বদেশী যন্ত্রসঙ্গীতে অভিজ্ঞ— তাই এই জবাব দিলাম।

আসামীর মনে হয়— চিত্র হিসেবে এই নভেল পড়া চলে না। যোড়ের বাজনায় রাগিণীকে সর্বদাই মনে রাখতে হয়— fugue-এও তাই, নয় কি? অন্তঃশীলার টেক্‌নিক উপভোগে পাঠকপাঠিকার চিন্তাশীলতার চেয়ে স্মৃতি-শক্তিরই প্রয়োজন বেশি। সঙ্গীত যেমন melody, অন্তঃশীলার তেমনি মেজাজ। বইখানির অনেক স্থলেই স্মৃতির খেলা আছে— বিশেষতঃ তার সহচারী শক্তির— association-এর, কৌসুলী চিন্তাধারাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন— স্মৃতিধারাকে ধরলে অর্থাৎ স্মরণ রাখলে বোধহয় সুবিধা হতো। সেইজন্যই বোধহয় বলেছেন, 'ভাবতে পারি না পরের ভাবনা' এবং 'রাতদিন চিন্তা এ কেবলি চিন্তা'। আবার বলি, বইখানিতে চিন্তার চেয়ে তার সংযোগই অনুধাবনযোগ্য। এ-ক্ষেত্রে প্রুস্ত ও উল্‌ফ-এর পন্থাই লেখকের একমাত্র পন্থা। খগেন intellectual giant মোটেই নয় এযুগের intellectual type মাত্র, যার মননক্রিয়া বিশুদ্ধ নয়, স্মৃতি এবং ভাবমিশ্রিত। খগেন অন্তরে অন্তরে ভাবপ্রবণ, চাকর-বাকর, মাসীমা, রমলা, সাবিত্রী, এমনকি বইয়ের প্রতি ব্যবহারেও তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সে ভালবাসতে চায়, কেবল স্বীকার করতে চায় না, আদর খেতে সে খুবই ব্যগ্র, কেবল দাম্ভিকতায় ঘা পড়ে বলে সঙ্কুচিত হয়।

রমলা দেবীর কি emotions নেই! সে ইক্‌মিক্‌ কুকার কিনলে কেন? ওর চেয়ে sentimental কাজ তার পক্ষে আর কি হতে পারে?

মোদ্দা কথা এই: চিত্রকলায় সাহিত্যের উৎপাতের বিপক্ষে অনেকেই আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু সাহিত্যে চিত্রকলার উৎপাতের বিপক্ষে মাথা তোলবার সময় হয়নি কি? আধুনিক সাহিত্যে সঙ্গীতের আঙ্গিক গৃহীত হয়েছে— বাংলা সাহিত্যে কেন হবে না? এটা অনুকরণ নয়— সাহিত্যের নিজের তাগিদ। চিত্রের চেয়ে সঙ্গীতের সঙ্গে তার মিল বেশি। কৌসুলী সঙ্গীতজ্ঞ—তাঁর কি মত?

(৪) ঘটনার অসম্ভবনীয়তার বিচার করেন জুরী, বিচারক করেন না। একাধারে কৌসুলী, বিচারক ও জুরী হলে আসামী নাচার! মির্জাপুর স্ট্রীটের গলিতে বড় বাড়ি ও সাজান স্নানের ঘরের সাক্ষাৎ মেলে।

(৫) রমলা 'স্বাধীন জেনানা' নয়, নচেৎ কাশী ছুটবে কেন? তবে তার বাড়ীতে ছেলে-ছোকরা আসে— সকলেই সুজন-বিজনের আত্মীয়— সুজন-

বিজন রমলার আত্মীয়েরই সামিল। সমাজের উপর এ-টুকু জুলুম অনেক পূর্বাচার্যেরাই করেছেন— আমি মহাজনের পথ অনুসরণ করেছি মাত্র।

(৬) রমলা দেবীর স্বামীত্যাগের কারণ বিশদভাবে লেখা যেত, কিন্তু জরিমানা দিতে রাজি নই, জেলে যেতে ত নয়ই। কৌঁস্‌লী ঠিকই ধরেছেন— আইরীনের কারণ— অতএব সেটা খোলাখুলি লেখবার কি প্রয়োজন? বই বেশি বিক্রী ছাড়া?

(৭) কথোপকথন লাইনের পর লাইন হিসেবে ছাপানো উচিত ছিল— কিন্তু প্রকাশকের বিল্‌ বাড়বে ভয় হলো।

বাহেসের জবাব দিলাম না। খগেনের মেয়েদের প্রতি মনোভাব কেবল সাবিত্রীর প্রতি এবং তার প্রতিক্রিয়াজনিত মনোভাবের নামান্তর। ছেলেরা যখন চটে যায় কারুর উপর তখন বহুবচন ব্যবহার করে। কী আশ্চর্য! অন্য একজন পাঠিকা খগেনবাবুর স্ত্রীজাতির প্রতি আন্তরিক দরদ পর্যন্ত লক্ষ্য করেছেন।

খগেনবাবুকে খুব সহজেই ঘৃণা করা যায়। তাকে নিয়ে ঘর করা বোধহয় চলে না, অন্ততঃ সাবিত্রীর চলেনি। রমলার চলবে কি? খগেন চরিত্র হিসেবে কেবল impossible নয়, futile। অসার্থক পুরুষকে ঘৃণা করা মেয়েদের পক্ষে, এবং মেয়েলীপুরুষদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক কর্ম— যেটা পিতা-মাতার শিক্ষার কৃপায় কর্তব্যের কোঠায় উঠেছে।

কিন্তু খগেনের কি দোষ? এ যুগের তথাকথিত intellectual ঐ রকমেরই। বর্তমান কৃষ্টিই সেজন্য দায়ী। বইখানিতে সমাজ-সমালোচনা আছে— বিশেষতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের।

এই বয়ানের প্রয়োজন ছিল। কৌঁস্‌লীকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর ভালো লেগেছে— নানা দোষ সত্ত্বেও— এই আমার সকল প্রয়াসের যথেষ্ট প্রতিদান। নিরপেক্ষতা আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে দুর্লভ— আমি সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।